বঙ্গলক্ষ্মী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রী হেমলতা দেবী সম্পাদিত

অগ্রহায়ণ ১৩৩৬—কার্ত্তিক ১৩৩৭

বঙ্গলক্ষ্মী কার্য্যালয়
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা চার আনা।

সূচী

বঙ্গলক্ষ্মী—১৩৩৬এর অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৩৭এর কার্ত্তিক পর্য্যন্ত

পৃষ্ঠা বিষয়

অ

অর্ঘ্য (কবিতা)—শ্রী হিরণ্ময়ী দেবী বি-এ
অন্বেষণ (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৩৯১
অতীতের কথা (গল্প)—শ্রী গিরিবালা রায় ৩৯২
অনুপমা (কবিতা)—শ্রী ধরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৪২৭
অমৃত (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৫২৫
অপ্রকাশ (কবিতা)—শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস ৬১৬
অভিভাষণ—শ্রী শুকদেব দত্ত আই-সি-এস ৭৬১
অভিযান (কবিতা)—শ্রী গগনবিহারী রায় চৌধুরী ৫০৭

আ

২৫, ১২২, ১৮৯, ২৯১, ৩৫৪, ৪৫৮, ৫৬৭, ৬০৬, ৬৯৩, ৭৭৩
আমাদের মহিলাকর্ম্মী ৭৫, ১৫৪, ৪০৩, ৪৭০, ৫০২, ৬৪৪
আলো জ্বালা ৮১
আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন—
শ্রী দীরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন) ১১৭
আঁধারে আলোক (গল্প)—শ্রী কিরণবালা দেবী ১৮৪
আড়কাটি (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ২৯৮
আমি-অন্বেষণ (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৭২২
আহ্বান বীরাঙ্গনা বালা গাওত—শ্রী নলিনীকুমার রুদ্র ৭৮১
আবর্জ্জন (গল্প)—শ্রী সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১৬

ই

ইংলণ্ডে বিবিধ নারী শিক্ষায়তন—
শ্রী দীপা চক্রবর্ত্তী ১০, ১৩৪, ২০১, ৩৯৭, ৫৫৪

এ

এ বিনোদের পথে—শ্রী ধীরেন্দ্রমোহন সেন এম-এ
একরাত্রি (গল্প)—শ্রী নীতীশচন্দ্র রায়

ঐ

ঐশ্বর্য্যের আবরণে (গল্প)—শ্রী উষারাণী দেবী ৪৮৯

ক

কল্যাণী (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী
কবি ভারতচন্দ্র—
শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, আই-সি-এস
কন্যাকে শিক্ষাদানের গৌরব—
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৩১
কেন্দ্রসমিতির কথা:— ৭২, ১৮৭, ২৪৪, ৩২৩, ৩৯৮, ৪৮২, ৫৬৩, ৬৪৭, ৭২৯, ৮০৫, ৮৮৫, ৯৭০
কৃষি ও গার্হস্থ্য নারী-শিক্ষায়তন—হেজেল, বেলজিয়াম—
শ্রী ন. চৌধুরী ৩৪৫
কৃতজ্ঞতা (গল্প)—শ্রী আশীষ গুপ্ত ৫৮৪
কবিতা (গল্প)—শ্রী ভক্তি ৭০৭
কৃষিমঙ্গল—সাময়িক কার্য্যকথা—শ্রীসন্তোষবিহারী বসু ৭১৭
কন্যার প্রতি (কবিতা)—শ্রী প্রতিভাসুন্দরী ঘোষ ৭২৯
কাজরী (কবিতা)—শ্রী পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩৮
কেন কবিতা)—শ্রী শান্তিলতা দেবী ৮১২
কেন ? (গল্প)—শ্রী দীপ্তি দেবী ৮৩৬
কর্ম্মযোগ—শ্রী শুকদেব দত্ত আই-সি-এস ৯৮৫
কল্পনা ও বাস্তব (কবিতা)—শ্রী প্রবীর রায়

খ

খোকাখুকীর পাতা—খেলা— ৩১, ১২৪, ১৯৭, ২৮৮, ৩৬৭, ৪৪৩, ৫২৯, ৬০৮, ৬৮০, ৭৭০, ৯২৭

গ

গুরুদক্ষিণা আট—শ্রী যজ্ঞেশ্বর রায় ৯৩
গান্ধারাণী বা জাইটাখিন—শ্রী বিমলচন্দ্র রায়

পৃষ্ঠা

গুজরাটে নারীপ্রগতি—শ্রী সীতা দেবী বি-এ
গান—শ্রী হেমলতা দেবী
গান (কবিতা)—শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক ১২১
গৌরীদান (কবিতা)—শ্রী সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ৩১৫
গান— ২০৩, ৪১৩
গীতা (কবিতা)—শ্রী আশুতোষ সান্যাল ৭৩৮
গান (কবিতা)—শ্রী করুণাময়ী বিশ্বাস ৭৭৭
গোপন কথা (কবিতা)—শ্রী মনোজ বসু বি-এ ৮৫০
গোরক্ষা ও গোপালন—শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র ৮৯০
গর্ভাবস্থায় ব্যায়াম—ব্যায়ামাচার্য্য,
শ্রী শ্যামসুন্দর গোস্বামী

ঘ'র বাইরে— ৫৯, ১৩৬, ২০৮, ৩০২, ৩৭৬ ৪৪৫,
৫৪১, ৬১৩, ৭১১, ৭৯৩, ৮৭২, ৯৪০
ঘরকন্নার কথা—অপরিষ্কৃততা—শ্রীকমলা দেবী ১৮
ঘরকন্নার কথা—ঔষধ রাখা ও ব্যবহার—
শ্রী নৃপলাল বসু
ঘরকন্নার কথা—রন্ধন, কেশরী পোলাও—
শ্রী পুষ্পকুন্তলা রায়
ঘর ও বাহির—শ্রী পরিমলকান্তি রায়

চিনির বলদ (কবিতা)—
শ্রী সতীশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ ২২৪
চিঠির তাড়া (গল্প)—শ্রীঅদ্ভুত চট্টোপাধ্যায় ৪২১
চিঠি—শ্রী অদ্ভুত চট্টোপাধ্যায় ৮১১
চিঠির তাড়া ৮১৯
চক্রবাকী (কবিতা)—শ্রী প্রমথনাথ কুণ্ডু ৬২৪

ছড়া গান—মনোরঞ্জন ছাত্রোত্তান সেনা ১১৬

বিষয়

পৃষ্ঠা

জয়ী কে ? (গল্প)—শ্রী সন্তোষকুমার বসু বি-এ
জীবন-সঙ্গিনী—শ্রীশুকসখার ধর আই-সি-এস
জীবনের দাবী—শ্রী—
জাগরণী—
জেনেভা-যাত্রী বঙ্গনারীর পত্র—
শ্রী সুকুমারী রায় চৌধুরী
জননী (গল্প)—শ্রী কবীন্দ্র পাল
জয়শ্রী (কবিতা)—শ্রী হেমলতা দেবী
জীবনের গৌরব—শ্রী অরুণা দেবী

ঠাকুরের কথা—শ্রী অবনীনাথ রায়

তরুণ-সাহিত্যে নারী—শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার
তামিলের তাড়া (গল্প)—
শ্রী জ্যোতীশচন্দ্র ঘোষ গুপ্ত
তিনশো পঁয়ষট্টির এক দিন—শ্রী পূর্ণচন্দ্র রায়
তিন বছরের মেয়ে (কবিতা)—
কামের নওয়াজ বি-এ

দোসর (উপন্যাস)—শ্রী সতীশ রায় ১১, ১২৬, ১৪৯,
২৭৭, ৩৪৭, ৪১৮, ৫১৪, ৫৯৮, ৭১৪, ৭৫০, ৯২৩
দান (কবিতা)—শ্রী বিমল সেন ৯১
দেশ ও জাতি-সমস্যায় নারী
শ্রী বিজনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল
দু'নৌকায় পা—শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ডি-লিট, সি-আই-ই
দৌলতের দায় (কবিতা)—
শ্রী গগনবিহারী রায় চৌধুরী
দ্রৌপদী—শ্রী গিরিবালা রায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
ব	
বর্ষের অপরাবস্থায়—শ্রীমোহিনী সেন	৫১০
বর্ষফল (গল্প)—শ্রী অদ্ভুত চট্টোপাধ্যায়	৫২৩
বর্ষা মেঘ—শ্রী পরিমল গোস্বামী এম-এ	৭৪৯
বাণী প্রেম (কবিতা)—শ্রী প্রকৃতি সিংহ	৮৮২
বাচার (গল্প)—শ্রী সান্ত্বনা গুহ	৮০
নানা কথা—	৬১, ১৭৯, ২২৭, ৩১৪, ৩৮৩, ৪৬৪, ৬০২, ৮০৩, ৮৭৪, ৯৪২
নিরাকরণ (কবিতা)—শ্রী নির্মলা দেবী	৯২
নারী—শ্রী গোপালদাস দে বি-এ	১৭৬
নারীপ্রগতি - শ্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি-এ	১৭৭
নারীর গান—বন্দে আলি মিয়া	১৯৮
নারীমঙ্গল—শ্রী নির্মলা সরকার	৫৫১
নারীর মুক্তি—শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস	৩৫৩
নারীত্বের আদর্শ—শ্রী কমলা সেন	৩৯৫
নারী সম্বন্ধে বিবেকানন্দের অভিমত— শ্রী গিরিবালা রায়	৪১৭
নারীত্বের আদর্শ—শ্রী ষোড়শীবালা ঘোষ	৪৭৫
নারীশিক্ষা—আয়েসা আহমদ	৫১২
নারীস্বাধীনতা—শ্রী শুভাষিণী রায়	৬১৭
নারী (কবিতা)—শ্রী আশাপূর্ণা দেবী	৬৬২
নারীসমিতি—শ্রী উমাশশী দেবী	৬৮৩
নিশীথ (কবিতা)—শ্রী মোহিনী সেন	৭০৪
নূতন গর্ত (কবিতা)—	৮২৩
নদীতলে ভগবানের প্রতিমা দর্শনে (কবিতা)— শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	
প	
পুত্রলাভ (কবিতা)—শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ	
পাথের (উপন্যাস)— শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৭ ১৬৩, ৩৪৮, ১৭৮
প্রকৃত সৌন্দর্য (কবিতা)—শ্রী কালিদাস রায় বি-এ	৭১
পরিত্যক্তা (গল্প)—শ্রী ইন্দিরা দেবী	১০১
প্রাচীন ভারতে বাল্য বিবাহ ছিল না— শ্রী যোগেশচন্দ্র পাল	৫
পূর্ববঙ্গবাসীর শিক্ষার জগৎ-সভা— শ্রী শৈলেন্দ্রচন্দ্র সেন বি-এ	২২৩
পুরুষ রচিত পৃথিবী—শ্রীপ্রভাবতী দেবী বি-এ	২ ৫ ৪৪৮
পূর্বস্মৃতি অস্তিব্যক্তি (কবিতা)—শ্রী নিরুপমা দেবী	৩৩১
প্রকৃতি (কবিতা)—শ্রী প্রমথনাথ কুণ্ডার	৮৭৬
প	
পাথের (কবিতা)—শ্রী প্রমথনাথ কুণ্ডার	
প্রতাপ ও দেবদাস—শ্রী অবনীনাথ রায়	
প্রার্থনা (কবিতা)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ মজুমদার	
প্রকৃতি-মঙ্গল—শ্রী কমলা সেন	
প্রকৃতিরঞ্জন—পরীর বার্তা—শ্রীকমলা সেন	
প্রদীপকুমার (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী	
পরলোকে রসায়নাচার্য্য চুনীলাল বসু শ্রী শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ	৮০০
পাশ্চাত্য শিশুজগৎ—শ্রী নিশুগাধী	৮৪২, ৯১১
পুরী-বিবরণ (নক্সা)—শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস	৮৫৯
পুরীর শ্রীক্ষেত্র-তীর্থে—শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস	৯০৭
প্রাচীন শিল্পকলার রেখাছন্দ— শ্রী অসিতকুমার হালদার	
পাথের (কবিতা)—শ্রী সেবক	
পূজার চিঠি—শ্রী দীপ্তি দেবী	৯৩১
প্রত্যুপকার দান (গল্প)—রাণী শ্রী সুরুচিবালা চৌধুরাণী	৯৪৯
পথহারা (কবিতা)—শ্রী লীলা দেবী	৯৬২
ফ	
ফাগুনমাসে (কবিতা)—শ্রী সতীশ রায়	২৭১
ফুল ও প্রদীপ (কবিতা)—শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ সান্যাল	৫৮৪
ফল (গল্প)—শ্রী বিমলাপ্রসাদ রায়	৬৬৬
ব	
বিদেশ-বিভূঁয়ে (ভ্রমণ গ্রন্থ)— শ্রী কনকলতা বসু ২৯,১৩৮,১৯১,২৭২,৩৫১, ৪৪৪, ৭৪৭	

বিষয় পৃষ্ঠা

বর্ষামঙ্গল—শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডাঃ, সি-আই-ই

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা—
শ্রী সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ

বিদেশের মহিলা-সমিতি ১৪২, ২৮২, ৪৪০, ৫৬৮, ৬২৬, ৭১৯, ৭৮৭

বিশ্বপথাতক (কবিতা)—শ্রী জ্যোতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ২২২

ব্যর্থ উৎসব (কবিতা)—শ্রী অমৃতা গুপ্ত ২২৬

বিদেশী (গল্প)—শ্রী আশোদিনী ঘোষ ২২৭

বসন্ত ও টিকা—শ্রী সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ ২৯৮

বাল্যবিবাহ ও স্ত্রীর স্বাধীনতা—শ্রী সুধাংশুমুখী ঘোষ ৩৬৭

বাঙ্গার বীরবধূ—শ্রী ঠগেন্দ্রচন্দ্র সরকার বি-এ ৩৭৮

দুঃখের কাঁটা—শ্রী অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ৩৮২

বর্ষশেষ (কবিতা)—শ্রী প্রভাময়ী মিত্র ৪০৭

বৈশাখ বর্ণনা—শ্রী কামিনী বসু ৪০৭

বঙ্গনারীর বিশেষত্ব—শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ৪৩৩

বৌ কথা কও (কবিতা)—শ্রী কামিনী রায় বি-এ ৪৫৬

বরযাত্রি—সুফিয়া এম হোসেন ৪৬৭

ব্রহ্ম বৃক্ষতার আবেদন-পত্র—ডাঃ শ্রী সুন্দরীমোহন দাস

বাংলার মাটি (কবিতা)—শ্রী কালি দাস ঘোষাল

বিবাহে পণপ্রথা ও তাহার প্রতিকার—শ্রীগিরিবালা রায়

বাংলার গান (কবিতা)—শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস ৪৮৮

বিদায় (কবিতা)—শ্রী জ্যোতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ৫৫১

বিদেশিনীদের কথা—শ্রী তারা মুখোপাধ্যায় ৫৬০, ৬৩৫

বাংলার মাটি (গান,—শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস

বর্ত্তমান যুগের নারীসমস্যা—ডাঃ শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্ ৬৫৯

বৌ কথা কও (কবিতা)—শ্রী অক্রূরচন্দ্র ধর

বিবেকানন্দ (কবিতা)—শ্রী অবনীনাথ রায়

বুকের ভাষা—শ্রী সরোজনাথ ঘোষ

বাংলাদেশে বালিকাদের শিক্ষা—শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বিদায়-আরতি (কবিতা)—শ্রী সেবক ৮৭১

বরণ-ডালা (গল্প)—শ্রী আশীষ গুপ্ত ২০৩

ভ

ভরাডুবি—রজনীকান্ত গুপ্ত ১৭৫

ভবিষ্যৎ (গল্প —শ্রী সুনীলকুমার বসু ২০১

ভিটার মায়া (কবিতা)—শ্রী তারা মুখোপাধ্যায় ২৪৯

ভায়ের গৌরব (কবিতা)—শ্রী ক্ষিতিমোহন মজুমদার ৫৭১

ভাস্ত্র (কবিতা)—শ্রী শম্ভু মু খোপাধ্যায় ৭১০

ম

মেয়েদের কথা—শ্রী সরোজনাথ ঘোষ ১৩০

মেয়েদের পরিবর্ত্তনে দেশের আমূল পরিবর্ত্তন—শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ৩৩১

মানব-জীবন (কবিতা) ৪৭৩

মায়েদের কাজ—শ্রী শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ ৩৭৩

মায়ের উপবোধে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা—শ্রী অযোধ্যানাথ ঘোষ ৬১০

মহাভারত-অনুবাদে পরাগল খান—মহম্মদ এনামুল হক এম-এ

মহা অষ্টমী (কবিতা)—শ্রী হেমাঙ্গিনী সেন

য

যুগপরিবর্ত্তনে নারীর স্থান—শ্রী শকুন্তলা রায় এম-এ ৩

যে ফুল ফুটে বনে (কবিতা)—শ্রী আশোদিনী ঘোষ ৪৯৯

যুগবধূ (গল্প)—শ্রী জ্যোতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ৭৩১

র

রজনীগন্ধা (কবিতা)—শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

রবীন্দ্রনাথ ও অচলায়তন—শ্রী অবনীনাথ রায়

রাজাবাজা—চন্দ্রপুলি—শ্রী স্বর্ণলতা বসু

রামমোহনের স্বপ্ন—শ্রী শান্তা দেবী বি-এ

ল

লটারীর চিঠি (গল্প)—শ্রী জ্যোতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

লুপ্ত শিখা (কবিতা)—শ্রী হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ

শিশুমঙ্গল—শিশুর কল্পনা বা কবিত্বশক্তির উদ্বোধন—শ্রী তারা মুখোপাধ্যায়
শিক্ষয়িত্রীর অভিজ্ঞতা—শ্রী শান্তিলতা দাস
শিশুমঙ্গল - শিশুপালনের কয়েকটি নিয়ম—শ্রী কবিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি ১৯১
শিশুমঙ্গল—শিশুশিক্ষা, ভয়—শ্রী সুধাময়ী দেবী বি-এ ৩০৪
শিশুমঙ্গল—শ্রী যোগেশচন্দ্র পাল ৩৬৯
শিশুমঙ্গল—শ্রী তারা মুখোপাধ্যায় ৪৫৮
শেষ রাগিণী (কবিতা)—শ্রী অমূল্যকুমার রায়চৌধুরী ৪৮১
শেষ উত্তর (গল্প)—শ্রী উষা মিত্র ৪৯৫
শিশুমঙ্গল—শ্রী যোগেশচন্দ্র পাল ৫৩৮
শিশুমঙ্গল—শ্রী উষা মিত্র ৬০১
শিক্ষয়িত্রীদের সামাজিক জীবন—শ্রী নীরজবাসিনী সোম বি-এ, বি-টি ৬৮৪
শিশুমঙ্গল—শ্রী অমিয়া দেবী ৭৮০
শিক্ষার আদর্শ—শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস ৮৪৪
শক্তিপূজা ও স্ত্রীশিক্ষা—ডাঃ শ্রী সুন্দরীমোহন দাস ৮৬৭
শিশুরক্ষণ-কেন্দ্র—শ্রী সীতাদেবী বি-এ ৯৫২

স

সত্যের ডাক— ১
সমিতির কথা ১৬, ১৪৭, ২৩৮, ৩১০, ৪০৯, ৪৬৫, ৫৫৭, ৬৩৩, ৭২৩, ৭৯৫, ৮৮৩, ৯৬৭
সত্যপদ (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ১৪৪
সেবার মূল্য (গল্প)—শ্রী মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল ১৬৬
সরোজনলিনী ও বর্ত্তমান যুগের আদর্শনারী—শ্রী হেমলতা দেবী ১৭৩
সুরের আগুন (গল্প)—শ্রী অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ২১৭
সরোজনলিনী ও নারীত্বের আদর্শ—শ্রী অনিন্দিতা চক্রবর্ত্তী ২৯৪
সাধের আয়না (গল্প)—শ্রী বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এ ৩৫৮
স্বাধীন (কবিতা)—শ্রী হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮১
সন্তানশিক্ষায় আমাদের কর্ত্তব্য—শ্রী সরযূবালা সেনগুপ্তা
স্বাস্থ্যমঙ্গল—শ্রী কুমুদিনী গাঙ্গি
স্বাস্থ্যমঙ্গল—শ্রী সন্তোষবিহারী বসু
স্বরলিপি—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কুমারী ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায় ৬৪২
সাধুবার কথা—শ্রী— ৬৮৬, ৭৮৭, ৮৫৪
সংঘের গান—শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস ৬৯২
সনাতন (কবিতা)—শ্রী চামেলী বসু ৭১৬
সমন্বয়সূত্র—শ্রী সুধীরচন্দ্র সেন ৭২৭
স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার—ডাঃ শ্রী পঞ্চানন নিয়োগী সি এইচ ডি ৭৩৩, ৮২৭, ৯১৬
সুন্দর (কবিতা)—শ্রী কুমুদিনী গাঙ্গি ৮০২

হ

হিন্দুনারীর প্রতি হিন্দুনারীর নিবেদন—শ্রী উমাশশী দেবী ২১২
হেঁয়ালী (কবিতা)—শ্রী জ্যোতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ৩৬৩
হোমিওপ্যাথ (গল্প)—শ্রী অবনীনাথ রায় ৯১৩

ক্ষ

ক্ষীর ও নীর (সমালোচনা) ৮০, ১৫৬, ২৩৫, ৩৮৭, ৮৮০, ৯৯৩
ক্ষুদ্র (কবিতা)—শ্রী মন্মথী সিংহ ২৯৪
Appendix ৮৯০

বঙ্গলক্ষ্মী

"আমি তাই আমাদের দেশের মা-বোনদের অনুরোধ করি, জেগে উঠুন, প্রতি ঘরে, প্রতি সমাজে, প্রতি গ্রামে মহিলা-সমিতি স্থাপন করুন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাবে দেশ ছেয়ে ফেলুন, তা ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন, বধূরা ঘরই স্বাধীনতার আশা করি না কেন, সবই বিফল হবে।"

—সরোজনলিনী

৫ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ [৭ম সংখ্যা

জাগরণী

সারা পৃথিবী জুড়ে মেয়েদের রাজ্যে যে এক আশ্চর্য্য জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে, অন্তর্যামীর প্রেরণা যে তার মূলে কাজ করছে এই প্রত্যক্ষ অন্তর্যামী সকলের অন্তরে বসে প্রেরণা জোগাচ্ছেন, আর মানুষের মুখ থেকে বের হচ্ছে, "মেয়েরা চলতে শিখুক, ভাবতে শিখুক, নিজের মান-অপমান বুঝতে শিখুক, আত্মসম্মান রাখতে শিখুক, তাদের মধ্যে আত্মার ভাব জেগে উঠুক, এক কথায়, তারা মানুষ হোক।" সকলের মনেই এই ভাব, সকলের মুখেই এই কথা। ভিতরের প্রেরণা ব্যতীত এরূপ সার্ব্বজনীন জাগরণ ঘটা কি সম্ভব? এখন সকলে—বিশেষ মেয়েরা এই প্রেরণা সম্বন্ধে সচেতন হোন, এরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অগ্রসর হোন, কার্য্যে প্রবৃত্ত হোন, সকল মেয়ের শক্তি একত্র হয়ে জীবনে এই প্রেরণাকে সফল করে তুলুক, এই প্রার্থনা।

মেয়েরা কোমল, মেয়েরা সৌন্দর্য্যের আধার, মেয়েরা স্নেহশীলা, আত্মদানে সদাই উন্মুখ, মেয়েদের এই সকল সদ্‌গুণরাশিকে জগৎ চিরদিন অপব্যবহার করে এসেছে। তাই তলে জগতের আজ দুর্গতির সীমা নেই! বর্ত্তমান যুগের প্রেরণায় মেয়েদের আত্মশক্তি বিকাশ হয়ে তাঁরা আত্মস্থানে অধিকারিণী হবেন। তাঁদের সকল কোমলতা, অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশি, অপরিসীম স্নেহ, জগতের দুঃখের কারণ না হয়ে এখন থেকে আনন্দের কারণ হবে। আত্মজ্ঞানলাভে মেয়েরা সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত হবেন, অটল আত্মশক্তি লাভ করবেন এবং তাঁদের সেই শক্তিতে জগতে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হবে। নূতন যুগের চারিদিকে আজ নানা আয়োজন হয়ে গিয়েছে, সবাইই প্রস্তুত হচ্ছেন, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলকে এই আয়োজনে যোগ দিতে হবে, না দিলে উপায় নাই, রক্ষা নাই।

নিজের কল্যাণ বুঝুন, নিজের উন্নতিতে যত্নবতী

সকলে একত্র মিলিত হয়ে জগতে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হোন —এই প্রার্থনা।

এই উন্নতির পথ বা উপায়—সকল মেয়েকে শিক্ষিত করে তোলা। কেবল একজনের উন্নতিতে সমস্ত পৃথিবীর উন্নতি হয় হয় না, পৃথিবীর উন্নতি না হলে উন্নতি স্থায়ী হয় না। অতএব সকল অশিক্ষিত মেয়েকে শিক্ষিত করতে হবে, সকল অনুন্নতকে উন্নত করতে হবে তবেই নিজের চরম কল্যাণ সাধন হবে। পরোপকার এখন থেকে আর দয়ার কার্য্য বলে গণ্য হবে না, এখন থেকে পরোপকারে আত্ম-স্বার্থ স্থাপন করতে হবে। অন্যকে বাঁচালে তবেই নিজে বাঁচতে পারবে—নিজের বাঁচবার আর দ্বিতীয় পথ নেই। কথায় বলে—

পরের মন্দ করতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়,
পরের ভাল করলে পরে তবেই নিজের ভাল হয়।

যে ফুল ফুটে' ঝরে

শ্রী আমোদিনী ঘোষ

যে ফুল ফুটে' ঝরে আঁধারে ভূমিতলে,
বিলীন তার চারুতার
কে রাখে সযতনে আঁকিয়া হৃদিপলে?—
চপল বেলাকুল যার
মিশিয়া যায় বেই মধুর সৌরভ,
রাখে কে অন্তরেতে ধরি'?—
থামে যে বীণা-রব ছিন্ন তন্ত্রীতে,
বাজে সে কার চিত্ত ভরি'!
যে গান হয় শেষ, হৃদয়-হিল্লোলে
কাহার প্রাণে তোলে গুঞ্জ,—
যে দীপ নিভে যায়, কিরণ-ছটা তার
তিমির করে কার দূর!
যে পথ হয় শেষ, দিনের অবসানে
কে চায় ফিরি' তার পানে,—
তবু এ ক্ষণিকের খেলার উৎসবে
বাঁশরী বাজে আবাহনে!

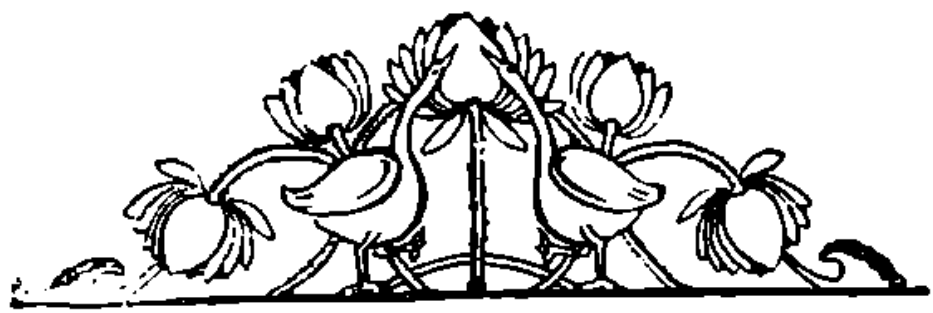

শেষ উত্তর

শ্রী উমা মিত্র

ছিন্ন অঞ্চলখানি গলায় জড়াইয়া সন্ধ্যাদীপ আলিয়া ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন উঠান-পার্শ্বস্থিত তুলসীতলায় আরাধনা যখন হৃদয়ের কামনা উজাড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সন্ধ্যা তখন স্বীয় নীল শাড়ীর অঞ্চল দিয়া উহাদের উঠানটুকু ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল; তুলসীতলার ছোট্ট দীপের ক্ষীণ আলোয় কিয়দংশ আলোকিত হইয়াছিল মাত্র। পুনরায় প্রণাম করিতে গিয়া আরাধনার অর্দ্ধনিমীলিত দৃষ্টি অদূরে দণ্ডায়মান অসিতের হাসিভরা চোখে মিলিত হইয়া নম্র হইয়া পড়িল। দেবপ্রাণা প্রণাম বুঝি মানবের চরণে নীরবে নিবেদিত হইল। অসিত হাসিয়া উঠিল,—"আবার তুলসী-গাছে প্রণাম হ'চ্ছে?" মধুর হাসিয়া আরাধনা উত্তর দিল,—"ঠাকুরদেবতার নামে ঠাট্টা করতে নেই।"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে অসিত কহিল,—"আমার এতদিনের পরিশ্রম ব্যর্থ গেল রাধা, এই অন্ধ বিশ্বাসগুলোই যদি রাখবে তবে এত লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ হ'ল কি?" "কিন্তু লেখাপড়া শিখলেই যে দেবতায় অবিশ্বাস করতে হবে এমনই কি কথা আছে?" "পাহপালাগুলোও যদি দেবতা হয়ে ওঠে তবেই গেছি।"

"কিন্তু—" "কার সঙ্গে কথা বলছিস রাধা? অসিত এসেছে?" স্বীয় বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া সে বলিল,—"হাঁ মা।" "পাঠিয়ে দে এখানে।" "কেমন আছ আজ মামী?" কণ্ঠে উপাধান হইতে মাথা তুলিয়া কল্যাণী কহিল, "আজ জ্বর কিছু কম আছে;—তোর দাদাকে বলতে যে রাধা।" "আমার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ো না মামী!" অর্দ্ধশয়ান রোগীর উপর ঝুঁকিয়া অসিত বলিল,—"কবিরাজ কি বলছে এখন? বলুন মামাকে আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দিতে, ও-সব ম্যালেরিয়া দু'দিনে সেরে যাবে—জানি যে সে কথা শুনবেন না।" ম্লান হাসিয়া কল্যাণী কহিল,—"হিঁদুর মেয়ে, মরণ-ভয়ে কি শেষে ডাক্তারের কতকগুলা অখাদ্য খেতে পারি রে?" "ও তো তোমাদের যত সব কুসংস্কার। মামা যে কি ক'রে এসব বিশ্বাস করেন সেইটাই হ'চ্ছে সব চেয়ে আশ্চর্য্য।"

কল্যাণী উত্তর দিল না, মুখ টিপিয়া একটু হাসিল মাত্র। উহার মূলে যে সত্যটুকু লুকান ছিল সেই কথা মনে পড়িয়া তৃপ্তির শ্বাস বহিয়া গেল সে অনেক দিন আগের কথা—উহার স্বামীকে যখন অকাল বার্দ্ধক্যে স্পর্শ করে নাই, চাঞ্চল্য যখন স্ত্রী-নান স্বাস্থ্য-সম্পন্ন স্বামীর নিকটে আসিবার সাহস করে নাই, যে দিন উহার ভাবনা-চিন্তা ছিল না, হাসি আর আনন্দ ছিল মাত্র সাথী। দুনিয়ার আলোর আবিরের রঙ ফুটিত, দখিন হাওয়ার সানাইয়ে সুর বাজিত, দুঃখের চিহ্ন ছিল আপনার বাহিরের বস্তু। প্রফেসর সুরেন চৌধুরী দরিদ্র পুরোহিত-কন্যা কল্যাণীকে দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীরূপে পরম আদরে গৃহে তুলিয়া-ছিলেন। কলিকাতার এক বিতল সজ্জিত গৃহে বালিকা বধূ স্বামীর অভক্ষ্য খাওয়াকে উপ-লক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিল, "আমায় তো কোন দিন এসব অনাচার করাবে না?" স্বামী উত্তর দিয়াছিলেন, "না, তোমার মতের বিরুদ্ধে জোর ক'রে কোনদিন কিছু করাব না। তুমি আমার ক্রীতদাসী নও—আমার স্ত্রী, মানুষ হিসাবে তোমার মতও তো মূল্যহীন নয় কল্যাণী!" গভীর তৃপ্তিতে উহার ক্ষুদ্র বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল,—পূর্ণবিশ্বাসে স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তারপর সহসা একদিন ভোজবাজীর ন্যায় সেসব সুখের দিন অন্তর্হিত হইয়া গেল পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বামীর চিকিৎসায় দেহের অলঙ্কারগুলা পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া গেল। কতকষ্টে উঁহাকে সুস্থ করিয়া, মাধুরী-হ্রাসে শ্বশুরের চিঠির আসিয়া উঠিল—সে দিন গোটা দুই টাকা মাত্র সম্বল ছিল। আরাধনা ও আরতিকে লইয়া কল্য স্বামীর সহিত দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচয় সুরু করিয়া দিল। গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য মাহিনায়

সুরেন পণ্ডিত নিরুত্তর হইলেন। পাখের জমিটুকুতে শাক-সব্জী উৎপন্ন করিয়া কোনও রূপে সংসার চলিত। উহা লইয়াই সে সন্তুষ্ট ছিল; কিন্তু বৎসরাবধি ম্যালেরিয়ার ভোগ এবং বয়স্থা কন্যা আরাধনার বিবাহের চিন্তা তাহাকে অস্থির—অশান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। আজ বহুদিন পরে জমিদারপুত্র অসিতের কথায় স্বামীর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া গভীর তৃপ্তিতে অন্তর ভরিয়া উঠিল।

অসিত কলিকাতায় কলেজে পড়িত, ছুটিতে গ্রামে আসিত। এই দুঃস্থ পরিবারকে সে স্নেহের—সম্মানের চক্ষে দেখিত। কল্যাণীর মুখে হাসি দেখিয়া অসিত বলিয়া উঠিল, "তুমি হাসছ মামী, কিন্তু তোমার এমন অসুখেও আমার এ—" বাধা দিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কল্যাণী কহিল,—"ও কথা যেতে দাও বাবা, কলকাতায় থাক, কত লোকের সঙ্গে আলাপ আছে, রোমাটির জন্যে পাত্র দেখ, আমার তো দিন ফুরিয়ে এসেছে, মেয়েটির জন্যে যা ভাবনা।"

আরাধনা লজ্জিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। উচ্চ হাস্য করিয়া অসিত কহিল, "ক্ষেপেছ মামী? কিই বা এমন বয়স ওর! এখন থেকেই বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হ'লে চলবে কেন?" বিস্মিতা কল্যাণী বলিয়া উঠিল, "বয়েস হয়নি বলিস কিরে? ও যে চোদ্দ পার হ'তে চলল!" "তা হোক, অমন সুন্দর মেয়ের বিয়ের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না—কি বলিস রাধা?" পলায়নরতা রাধা পিছন ফিরিয়া বক্রদৃষ্টি প্রদর্শন করিল। "দেখ মামী, রাধা আমায় ভয় দেখাচ্ছে মারবে ব'লে।" মৃদু হাসিয়া কল্যাণী কহিল,—"তুই-ই ওকে আস্কারা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছিস।" স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে অসিত উত্তর দিল, "বড় ছেলেমানুষ যে!" "তা যাহা হোক বাবা, তুমি পাত্রের সন্ধান নিও।"

"কেন ব্যস্ত হ'চ্ছ তুমি, মাষ্টার এখন পড়াচ্ছেন—পড়ুক ও। বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।" দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কল্যাণী কহিল, "মেয়ে বড় হ'য়ে উঠল, এখন থেকেই কত গঞ্জনা সইছি, এর পর একঘরে করবে।" "ইঃ, কার এত সাহস দেখব তখন"—

সুরেনবাবু গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে কতকাংশ শুনিতে পাইয়া হাসিয়া উঠিল, "কি হে কাকে নিয়ে পড়েছ আবার?" দুষ্টামির হাসি হাসিয়া অসিত বলিল, "এবার মামীকে।" "অর্থাৎ—?" "ওঁর কতক গুলো কু—" "নে থাম অসি,—হাঁ শোন বলছিলুম কি মেয়ে যে বড় হ'য়ে উঠল—তার কিছু করছ কি?"

"কার মেয়ে?" উত্তেজিত কণ্ঠে কল্যাণী বলিল,—"তোমার গো তোমার!—অত বড় মেয়ে হ'ল কিছু কি খেয়াল নেই?" "কিন্তু তাই ব'লে যাকে তাকে ধ'রে দিতে পারব না চেষ্টা তো করছি। রূপ যে কেউ চায় না, সবাই চায় টাকা।"

ছাতা, ধুতি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিবার সময় পিতার বাধিত স্বর রাধা শুনিতে পাইল। ক্ষিপ্রপদে বিবর্ণমুখে সে ফিরিয়া আসিল। স্নেহময় পিতামাতা আজ উহার ভাবনায় অস্থির। দেবতা, দেবতা—হয় মৃত্যু দাও, নয় ত পিতামাতাকে এ দায় হইতে অব্যাহতি দাও। উহাকে এ ভীষণ লজ্জা হইতে উদ্ধার কর। নিজের উপর সে বিরক্ত হইয়া উঠিল,—এত শীঘ্র শীঘ্র উহার বাড়িবার কি এমন প্রয়োজন ছিল!

(২)

"এই,—কি করছিস?" রন্ধনরতা আরাধনা পিছনে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, "তবে এলে তুমি অসিত দা?" "আজ।" "ইঃ, তারি রোগা হ'য়ে গেছ?" "রোগা? না—অনেক দিন পরে দেখেছিস কিনা।" "প্রায় বছর খানেক বাদে এলে বটে;—পরীক্ষা কবে শেষ হবে?" "এক্ষুণি কি? তার এখনও দেরী আছে।" একটু কি ভাবিয়া মৃদু হাসিয়া আরাধনা বলিল,—"কলকাতায় প্রাক্‌টিস করবে নিশ্চয়?" "সে তখন দেখা যাবে। তুইও যে বেশ বড় হ'য়ে উঠেছিস, পড়া চলছে কেমন?" "কই আর পড়ছি,—বাবার অসুখ যে। জান অসিত দা, জ্যাঠামশায় কনে ঠিক করেছেন, তোমার পরীক্ষা শেষ হ'লেই বিয়ে,—কি মজাই হবে!" "আচ্ছা থাম, আগে তোকে বিয়ের করি!—কি হয়েছে মামার?" "সেই বাধা আবার বেড়েছে, বিছানা থেকে উঠতে পারেন না।" "আমায় জানালে পারতিস। আচ্ছা এখন আর চিঠি লিখছিস না কেন?" রাধা উত্তর দিল না। "কেন লিখছে না রাধা?" একটু ইতস্ততঃ করিয়া অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল,—"আমি যে এখন বড় হয়েছি, মা তাই বারণ করেছেন।" "ওঃ।" তরকারীর কড়াই নামাইয়া

আরাধনা বাহিরে হাত ধুইতে ধুইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"ছুটি আছে ক' দিনের?"

"সে এখন আছে! আবার অমনি ক'রে চুল বেঁধেছিস?" অসিত এভাবে চুলবাঁধা দেখিতে পারিত না বলিয়া রাধা বাঁধিত না। কিন্তু কাল সারারাত্রি উপবাস গিয়াছিল, ক্ষুধার তাড়নায় রাত্রে ঘুম হয় নাই, ভোরের সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—যখন ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল তখন রোদে উঠানটুকু ভরিয়া গিয়াছে। কল পিতার একটু বাসি-মুখ, তাও সময়মত দেওয়া হইল না। ব্যস্তভাবে স্নান করিয়া, ভিজা চুলগুলা চূড়া করিয়া মাথার উপর বাঁধিয়া, উনান জ্বালিয়া পিতাকে বার্লি দিয়া—বাড়ীর কুমড়াটুকু কুটিয়া চাপাইয়া দিয়াছিল। চাল কাল থেকে বাড়ন্ত।

অসিত উহার চুল ধরিয়া টান দিল। রাশীকৃত কুঞ্চিত কেশ পৃষ্ঠে বক্ষে ছড়াইয়া পড়িল। "কি করলে বল' ত? ছুতো পায়ে আমায় ছুঁয়ে দিলে?—আবার চান করতে হবে যে।"

অভিমানক্ষুরিতাধরে সে উহার দিকে চাহিল। কেশ-বেষ্টিত, অনশনক্লিষ্ট, অভিমানাহত আরাধনার মুখখানা—অসিতের চক্ষে বড় মিষ্ট লাগিল। পরমমমতা রাধার অকল-প্রান্ত টানিয়া অস্ফুট জড়িতকণ্ঠে অসিত ডাকিল, "রাধা, ও রাধা!"

"কেমন আছে বৌ সুরেন—ওমা এ কি?" ক্ষ্যান্ত ঠাকুরাণী উঠানে পা দিয়া অবাকভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। চোখের সামনে কী ভীষণ দৃশ্য! অপদস্থ অসিত বৃদ্ধার রক্তাভ চক্ষের দিকে চাহিতে পারিল না। অবনত মস্তকে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল—আরাধনার অকলপ্রান্ত যে তখনও উহার হাতের মুঠায় সে কথা ভুলিয়া গেল। নিজের অবস্থা বুঝিতে আরাধনার একটু সময় লাগিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অঞ্চলখানি টানিয়া, অঙ্গুলি-সঙ্কেতে গৃহনির্দ্দেশ করিয়া ধীরকণ্ঠে কহিল,—"ও ঘরে বাবা আছেন অসিত দা।—এস ঠাকুমা বস, মা কাপড় কাচতে গেছেন।"

বৃদ্ধাকে বিনাবাক্যে ফিরিতে দেখিয়া আরাধনা শিহরিয়া উঠিল। উহার এই যে নীরবে ফিরিয়া যাওয়া—উহা কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গ্রামের মাঝে কী বিষ উদ্গীরণ করিবে সে কথা ভাবিয়া এইবার লজ্জায় ঘৃণায় উহার সাদা মুখখানি কালো হইয়া উঠিল। বড় রাগ হইল অসিতের উপর, কেন উনি অমন করিলেন যোল বছর পার হইতে চলিল এখনও কি সে সেই ছোটটিই আছে! সব চেয়ে বেশী রাগ হইল নিজের উপর—কেন সে ওভাবে চুল বাঁধিতে গিয়াছিল? কিছুক্ষণ পরে, বেড়ার গায়ের অর্দ্ধশুষ্ক ছিন্ন মলিন শাড়ীখানা টানিয়া লইয়া পুকুরের দিকে অগ্রসর হইল।

কিন্তু সেখানে এমন দৃশ্য দেখিতে হইবে জানিলে সে কখনই আসিত না। ক্ষ্যান্ত বক্তমুখ-সকালবেলা কত কি বলিয়া যাইতেছেন এবং উহার মাতা বৃদ্ধার পদসেবন করিয়া কি যেন বলিতেছেন। অপমানের বেদনায় অন্তর তাহার কাঁপিয়া উঠিল। ফিরিতে চাহিল, কিন্তু জননীর বহুদিন কয়ের কণ্ঠের আহ্বানে পদদ্বয় সেই স্থানে স্থাণুবৎ অচল হইল।

"উনি যা দেখেছেন, তা সত্যি?—উত্তর দে রাধা!" রুদ্ধ বাষ্প কণ্ঠস্বর চাপিয়া ধরিল, সংক্ষোভিতার হাত আপনা হইতেই আরাধনার মস্তক সম্মতি জ্ঞাপন করিল। কয়ের দৃষ্টিতে বন্যার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কল্যাণী ক্ষ্যান্ত ঠাকুরাণীর হাত ধরিল,—"দিদি—" "না, না—তুই করিস না বোন, ওকে কি একথা বলতে পারি? পাগল!"

গৃহে ফিরিয়া কল্যাণী ভিজা কাপড়েই উহানে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। করুণনেত্রে বারম্বার মায়ের দিকে চাহিয়া, তুলসীর জলে স্নান করিয়া রাধা রন্ধনগৃহে যাইতে চাহিল কিন্তু উহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় কল্যাণী রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল,—"খবর্দ্দার, ছেঁবেল ছুঁস না।" সুরেনকে দেখিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে অসিত কল্যাণীর কথাগুলা শুনিতে পাইল, অপরাধীর ন্যায় একবার উনানের প্রতি চাহিয়া নতমস্তকে বাহির হইয়া গেল। আরতির ক্রন্দনে রাধার লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। উহাকে আদর করিয়া ভুলাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। ক্ষুধাতুর বালিকা দিদির দেওয়া অর্দ্ধভুক্ত পুতুল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উহার বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া ক্রন্দন ভুড়িয়া

দিল,—"খাবার যে দিদি···" "লক্ষ্মী মেয়ে চুপ কর, এই যে অভয় দা বাজার থেকে ফিরল ব'লে।"

অসুখ হওয়া অবধি সুরেন পাঠশালায় যাইতে পারেন নাই। প্রথম মাসে মাহিনা কিছু পাইয়াছিলেন। রোগ কিন্তু না সারিয়া বাড়িয়াই চলিল, অগত্যা অকর্মণ্য-বোধে উঁহাকে কাজ হইতে জবাব দেওয়া হইল। কল্যাণীর নিকট সামান্য যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল তাহা দিয়া বৈদ্যের খরচ ইত্যাদি চালাইয়া আসিতেছিল। প্রতিবাসিনীদিগের অনুকম্পায় এবং পুরাতন ভৃত্য অভয়ের চেষ্টায় গ্রাসাচ্ছাদন কোনও প্রকারে চলিতেছিল। কিন্তু কিছু দিন পরে প্রতিবাসিনীগণ বিরক্ত হইয়া সাহায্য বন্ধ করিলেন। উপার্জ্জনের অভাব, কে উহা পূরণ করিবে? কিন্তু বৃদ্ধ অভয়, সে তো চক্ষের সম্মুখে অনশনে এই পরিবারকে মুহ্যমুখে যাইতে দেখিতে পারে না। যাহা কিছু সে উপার্জ্জন করিত নিজে একবেলা আহার করিয়া কল্যাণীর শত নিষেধ সত্ত্বেও আনিয়া দিত। যখন সুরেন গ্রামে বাস করিতে প্রথম আসেন,—অভয়কে কল্যাণী বলিয়াছিল, "বাবুর চাকরী গিয়েছে, আমরা দেশে যাচ্ছি—তোমায় তো আর রাখতে পারব না বাবা, ছেলের মতই ছিলে তুমি, ছুটি-ছাটিতে মাঝে মাঝে গাঁয়ে গিয়ে আমাদের দেখা দিয়ে এস।"

উত্তরে সে কিছুই বলে নাই। কিন্তু ট্রেনে উঠিবার সময় দেখা গেল—ক্ষুদ্র পুঁটুলীটি লইয়া সেও উহাদের সহযাত্রী হইয়া রেলে চাপিয়া বসিল। কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি কোথা যাচ্ছ অভয়?" অবহেলাভরে সে উত্তর দিয়াছিল, "কলকেতা ভাল লাগল না মা, তাই তোমাদের গাঁয়ে যাচ্ছি।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া কল্যাণী পুনঃ প্রশ্ন করিয়াছিল, "কলকাতা ভাল লাগল না—না খুকীদের ছেড়ে থাকতে পারবে না ব'লে যাচ্ছ?"

প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সে উত্তর দিয়াছিল, "না গো না, সে সব কিছু নয়।" তাহার পর দেখা গেল অভয় পরিশ্রম করিয়া সে যাহা কিছু পাইত খুকীদের জন্যে অকাতরে ব্যয় করিত,—প্রত্যহ দুইবার করিয়া মেয়ে দুটিকে না দেখিতে আসিলে বৃদ্ধার সেদিন আহারে তৃপ্তি থাকিত না।

একটুকাল চুপ থাকিয়া আরতি আবার কাঁদিয়া উঠিল, "অভয়-দা আর আসবে না, তুই যে খেতে।" রাধার মনে পড়িল, পিতার গৃহের কুলুঙ্গির উপর আগের দিন সে একটুকরা মিছরি দেখিয়াছিল। ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া রাধা মিছরিটুকু আনিতে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। মাতা তখন পিতার সহিত উহারই আলোচনা করিতেছিলেন। বিতৃষ্ণায় অন্তর ভরিয়া উঠিল। আরতি চীৎকার করিয়া উঠিল, "ভাত যে দিবি।" দুই হাতে ভগিনীকে টানিয়া লইয়া দ্বারের সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া আরাধনা সেই ক্ষুদ্র বুকে মুখ লুকাইল। উহার দুই চক্ষের জলে বালিকার জামা ভিজিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র অবোধ শিশু, সে তো আজ উহার লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা কিছু জানে না, বোঝে না। রাধা বড় যেন সান্ত্বনা পাইল। "আবার ওকে ছুঁচ্ছিস কালামুখী, লজ্জা করে না?" মায়ের কথায় জোটার হাত সরাইয়া দিয়া আরতি আশ্চর্য্যভাবে সরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুদ্র ভগিনীর বিস্মিত দৃষ্টি অনুসরণে অনুভব করিয়া রাধাহতা রাধা অপমানে ঘৃণায় রাঙিয়া উঠিল। "মা,—মা, কি করেছে দিদি?" মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া আরতি প্রশ্ন করিল: "আর কি করেছে, আমার সর্ব্বনাশ করেছে—" মাতার সম্মুখে সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, জোর করিয়া সকল জড়তা কাড়িয়া ফেলিয়া অনুত্তেজিত কণ্ঠে রাধা জিজ্ঞাসা করিল,—"তার মানে?"

কল্যাণী বুঝিয়াছিল,—আজ উহারই রাগ, দুঃখ, ঘৃণা, আঘাত সহিবার কারণ হইয়াছে; কিন্তু যাহাকে লইয়া আজ সকাল হইতে এত দুঃখ সে পাইতেছে, সেই দোষী, সে আবার উল্টিয়া উহাকেই প্রশ্ন করিতে পারে, এমন অসম্ভবের সম্ভাবনা মনে আসে নাই,—ইহার জন্য সে প্রস্তুতও ছিল না।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া কল্যাণী রাধার দিকে চাহিয়া রহিল,—তবে কি আগাগোড়াই ভুল? কিন্তু উহার স্বীকার করা? না—না—কস্মিন্ কালে তো ভুলিলে তো চলিবে না। ঐ কলঙ্কিনীর জন্যে উহাকে 'একঘরে' হইতে হইবে। যদিও ক্ষ্যান্ত ঠাকুরাণীর হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক কিছু বলা হইয়াছে—হয় ত এ যাত্রা রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে। কিন্তু ক্ষ্যান্ত ঠাকু-

রাণীকে বিশ্বাস কি? এই তো সে দিন মিত্রদের বিধবার কার্য্যটাকে লইয়া গ্রামে কি কম্বটই না বলিয়া গিয়াছে। অবশেষে মৃত মিত্র মহাশয়ের শব—কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কল্যাণী শিহরিয়া উঠিল,—নারায়ণ, নারায়ণ, রক্ষা কর প্রভু! বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় ভবিষ্যৎ চিত্রগুলা উহার চোখের সামনে ঘুরিয়া যাইতে লাগিল। কন্যার বিবাহ এখন কত বেশী শক্ত কথা আজ কল্যাণীর চেয়ে কে তা বেশী বুঝিবে? সব অনর্থের মূল যে ঐ হতভাগী—তার সামনে মুখ উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে। রাগে অধিক ক্রুদ্ধভাবে কল্যাণী কহিল,—"তার মানে তুমি কলঙ্কিনী, স্বয়ম্বরা তো হচ্ছে, কিন্তু একথা একবার ভাবলে না যে সে জমিদার কালীকিঙ্করের ছেলে,—তোমায় রক্ষিতার মত রাখতে পারে কিন্তু স্ত্রী—" "চুপ,চুপ কর মা!—আজ সকাল থেকে তোমরা আমায় শুধু শুধু অপমানই করছ, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। ছোট বোন আমার, তারি সামনে—" দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রাধা বসিয়া পড়িল। দেয়াল ধরিয়া অতি কষ্টে আসিয়া সুরেন কন্যাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। "আরতি, তুমি বাইরে যাও।" কতক্ষণ পরে জড়িত কণ্ঠে রাধা ডাকিল, "বাবা—" "না মা, কিছু শুনতে চাই না, শোন গিন্নি,আমার মেয়ে এমন কোন অপরাধ করতে পারে না—যার জন্যে তার বাবার মাথা হেঁট হ'তে পারে।" খানিক অবাকভাবে পিতা ও কন্যাকে দেখিয়া কল্যাণী কহিল, "যখন ধোপা-নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ হবে তখন বুঝবে কি মেয়েই—"

"থাম গিন্নি।—মা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে!" "আসি বাবা—" দ্রুতপদে আরাধনা রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল।

(৩)

জমিদার কালীকিঙ্কর বিরক্তিভরে আলবোলার নল সরাইয়া, আশে পাশের মোটা গুল্ল তাকিয়াগুলার উপর দুই হস্তের ভর দিয়া সম্মুখের সোফার উপবিষ্ট খর্ব্বাকৃতি ক্ষুদ্র চক্ষুবিশিষ্ট বন্ধুবর অঘোর মুখার্জ্জির দিকে চাহিয়া অধৈর্য্যভাবে কহিলেন,—"হেঁয়ালী ছাড়, সুরেশের বাড়ীর মেয়েটার প্রকৃত নাম বল।" কেশবিরল মস্তকে বারত্রয় হস্ত বুলাইয়া কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া হাই তুলিয়া অঘোর স্বীয় রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলেন, —"সে কথা কি চট ক'রে বলতে পারি হে!" "নাম বলতেই যদি এত বড় লজ্জা ছিল—তা হ'লে আগেকার সব কথাগুলো না বললেই পারতে। কিন্তু এও মনে রেখ, কালীকিঙ্করের চোখে ধুলো দিয়ে কেউ এ গাঁয়ে থাকতে পারে নি,পারেও না।" অঘোর কাঁপিয়া উঠিলেন,—যত বেশী টাকার মালিকই হোন তিনি, কিন্তু জমিদারের ক্রোধ, সে যে কি ভয়াবহ বস্তু একথা তিনি ভালভাবেই জানিতেন। উঁহার পুত্রের নাম বলিতেই আসিয়াছিলেন —কিন্তু এত শীঘ্র কি উহা বলা চলে। তাহা হইলে উদ্দেশ্য, জমিদারকে সহায়রূপে না পাইলে সে উদ্দেশ্য সে নিষ্ফল হইয়া যাইবে। যদিও চরিত্রের কাছাকাছি গিয়া গৃহিণী মারা গিয়া ছিলেন, কিন্তু সে পর্য্যন্ত একটিও ছোট শিশুর কলহাস্যে গৃহ মুখরিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। অগাধ অর্থের মালিক, কিন্তু ভোগ করিবার লোক নাই। গৃহিণীর জীবিতাবস্থায় পুনর্ব্বিবাহের চেষ্টা যে করা হয় নাই একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়! কিন্তু গৃহিণীর গলাবাজীর জোরে সে পর্য্যন্ত উঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। গৃহিণীর মৃত্যুর পর পূর্ণযৌবনা আরাধনার উপর হঠাৎ একদিন দৃষ্টি পড়িল। সেই অবধি আরাধনাই ছিল একমাত্র কাম্য বস্তু।

"আমার ধর্ম্মের রাজ্যে যদি এমন সব ব্যভিচার, অধর্ম্ম হ'তে লাগল তবে কত দিন টিকবে এ গাঁ?—মোটে একটি মাত্র ছেলে!...নাম বল অঘোর, এখুনি ও দুটোকে গাঁয়ের বার করে দেব।" অঘোর অন্তরে হাসিয়া বলিলেন,—"কাকে বার করবে হে?—সে যে আমাদেরই অসিত!" "অসিত—অসিত—মিছে কথা, আমার ছেলে অসিত?" অঘোর মুখ টিপিয়া হাসিলেন মাত্র, উত্তর দিলেন না। ক্রোধে কাঁপিয়া কালীকিঙ্কর হাঁকিলেন, "রামসিং!" "আজ্ঞে।" "ডাক খোকাকে।"

চকিতে জমিদারের হস্তধারণ করিয়া অঘোর কহিলেন, —"কি কর, চিতে বিনয়ীত হবে যে, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে একবার ভেবে দেখ। ওরে রাম, ডাকিস না বাবা।" আরক্তনেত্রে জমিদার বলিলেন,—"আবার হেঁয়ালী?—পরিষ্কারভাবে বল।" "কলকাতার কলেজে তোমার ছেলে শিক্ষা পাচ্ছে। অবস্থাটা একবার ভাল ক'রে

ভেবে দেখ, আজকালের ছেলে এদের কি ধর্মজ্ঞান আছে? ইচ্ছাই হ'ল সব। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি ছটাং বাধা পায়, হয় ত ছুঁড়িকে নিয়েই চম্পট দেবে। কি করবে তুমি তখন? হয় ত ধমক দেবে, জোর তাগাদা করবে—কিন্তু বদনাম যা হবে, অধর্ম যা হবে, সে গুলো কি ফিরে যাবে?" "আমার পবিত্র বংশের ছেলে—সে-ই এমন করবে? বল কি তুমি?" "কলিকাল, কলিকাল যে,—তার ওপর ইংরেজি শিক্ষা। তার চেয়ে বরং এর পর তাকে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে ব'লো।" "যদি সে না শোনে?" অস্ফুট কণ্ঠে অঘোর কহিলেন, "তা হ'লে না হয় চৌধুরীর মেয়েকেই ঘরে আন।" ফিতের ন্যায় জমিদার উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—'সেই গরীব মাষ্টারের মেয়েকে বৌ করব! নিশি গাঁয়ের জমিদার যে দশ হাজার টাকা নিয়ে সাধছে।" "তা তো বটেই, তা তো বটেই, আমি কি আর সত্যিই বলেছি! এখনও যে চাঁদ ও সূর্য্য উঠছে, এমন হ'তে পারে? পারে না। অত ভাবছ কেন? অঘোর বুধুয়ে সর্দার থাকতে তোমার ভাবনা কি?—উপায় কিছু করবই।" জমিদার জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন। "মেয়েটির এই সময় যদি বিয়ে দেওয়াতে পার তা হ'লে সব গোল চুকে যায়।" উত্তেজিত জমিদার বলিলেন, "তার মানে? আমি টাকা খরচ ক'রে দেব ওর বিয়ে!" 'আহা চট কেন হে! যোগাড়যন্ত্র ক'রে দেওয়া যায় যদি,—তা হ'লে তোমার ছেলেও ফিরে পাও—দশ হাজার টাকাও ঘরে আসে। বদনামের হাত থেকেও বাঁচ!" "কে করবে ঐ বুড়ো মেয়েকে বিয়ে?" জমিদারের নিকট একটু ঘেঁসিয়া নির্লজ্জভাবে হাসিয়া অঘোর বলিল, "তোমার ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে—আমি সব করতে পারি।" অবিশ্বাস্য কণ্ঠে জমিদার বলিলেন, "তুমি নিজে?" "হাঁ গো কর্ত্তা আমি নিজে,—শুধু তোমার জন্যে।"

বার্দ্ধক্যকবলিত, দারিদ্র্যলীন, কৃষ্ণবর্ণ ঐ বৃদ্ধের পার্শ্বে সেই সুন্দরী তরুণীকে একবার কল্পনা করিয়া কালীকিঙ্করও শিহরিয়া উঠিলেন। বিবেকও বুঝি একবার চক্ষু রাঙাইল। কিন্তু স্বার্থ-আস্ফালনের নিকট তুচ্ছ সে বিবেকের ক্ষণিক কম্পন। দুনিয়ার লোকে কে কি করিল, এতে তাঁহার প্রয়োজন? বামন হইয়া চাঁদে হাত! গরীবের মেয়ে—সে হইবে কি না রাজরাণী? সাহসও কম নয়, স্পর্দ্ধাও কম নয়! দশ হাজার টাকার মিষ্টি টিন্ টিন্ শব্দ কানের কাছে বাজিয়া উঠিল।

"তাই হোক অঘোর, আজ আমি সুরেনকে ব'লে পাঠাচ্ছি।" আনন্দ-গোপনের ব্যর্থ প্রয়াসে কুৎসিৎ মুখখানাকে আরও কুৎসিত করিয়া অঘোর কহিলেন, "তাই পাঠাও—কিন্তু একটি কথা।" "কি আবার!" "আজ ঠাকরুণ এতক্ষণ গাঁয়ের একথা বলেছে নিশ্চয়। হয় ত গাঁয় বাঁড়ুয্যেও শুনেছে, সুরেনদের 'একঘরে' করলে তখন সেই বাড়ীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে—সমাজে ঠেকা হ'য়ে কি করে থাকি বল?" "সমাজ, কিসের সমাজ? কোথায় সমাজ? এ গাঁয়ের সমাজ আমি! কার কাঁধে দুটো মাথা কালীকিঙ্করের অমতে কাজ করে?—ডাক শ্যামকে।"

(৪)

"হাঁ গা, ও জমিদারের গোমস্তা নয়?" উদাসভাবে বুকখোলা-পথে আকাশের দিকে চাহিয়া সংক্ষিপ্ত কণ্ঠে সুরেন উত্তর দিলেন, "হাঁ।" "এত কথা কিসের বলছিল?" হতাশভাবে সুরেন উত্তর দিলেন, "রাধার বিয়ের।" আশ্বস্তভাবে কল্যাণী কহিল, "তাই বল'—আমি বলি খাজনা-টাজনার কথা বলে বুঝি?" ম্লান হাসিয়া সুরেন বলিলেন,—"সে কথা সে এর চেয়েও ঢের ভাল ছিল গিন্নি!" "তার মানে?"

"মানে, ধনীর গরীবের ওপর জুলুম, সমাজশাসন, স্বেচ্ছাচারিতা,—এক পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে আমার ষোল বছরের মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—নয় ত—নয় ত—" দুঃখে, অপমানে উঁহার গলা বুজিয়া আসিল। দুই হাতে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া মরণপথের যাত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। বাকিটুকু না বলিলেও কল্যাণী আন্দাজে বুঝিল, স্বামীর অসমাপ্ত বাক্যের মাঝে কতখানি গরল থাকিয়া গেল।

বিকালের দিকে শয্যায় পড়িয়া যাতনায় সুরেন ছটফট করিতে লাগিলেন। নিখিলের মা উঁহার অবস্থা দেখিয়া চুপি চুপি কল্যাণীকে বলিলেন, "সবই তো বুঝছ মা, এখন ডাক্তারকে কিছু করতে পারবে না, যদি কিছু পারে সে দৈবী। জমিদারদের মা-কালী বড় জাগ্রত দেবতা।

আমার জামাইয়ের বেলায় ওলাউঠা হয়, সেবার দেখেছি. বরে পেত্তয় যাবে না, সেই রাতে ভিজে কাপড়ে মার পায়ে লুটিয়ে পড়লুম, একটু চরণামেত্ত এনে খাইয়ে দিলুম। গায়ে কাঁটা দে উঠছে।—ডাক্তারের নাড়ী খুঁজে পায় না। আর সেই একফোঁটা চরণামেত্ত! জামাই আমার উঠে বসল। মা সবারি কল্যাণ করেন।" বৃদ্ধা যুক্তকরে উদ্দেশে দেবীপদে প্রণাম জানাইলেন,কহিলেন,"তুই যা মা—হাতের নোয়াগাছটি যদি বজায় রাখতে পারিস।" "কিন্তু একে ছেড়ে কি ক'রে যাই মা—দেখছ ত কেমন অস্থির হচ্ছেন? তুমি যদি দয়া কর মা।" "আরে পাগলী, সে কি আর বাইরের লোক যে' হবে? মনের সাধে ওঁকে ডাকা চাই। পরের আর অত দরদ হয়? তুই যদি না যেতে পারিস রাধিকে পাঠিয়ে দে।" একটু কাল কি চিন্তা করিয়া কল্যাণী উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু স্বামীর সজ্ঞাহীন রক্তবর্ণ চোখের দিকে চাহিয়া মন উঠিল না। "ওমা, তুই কোথা যাবি? সন্নিপাতের রুগী ছেড়ে কি কেউ নড়তে পারে? রাধি,—ওলো রাধি।" "যাই ঠাকুর মা—" বালিটুকু ঘরে ঢাকা দিয়া আরাধনা পিতার শিয়রে বসিল। "ও কি—বসিস্ নে মা। বাপের প্রাণ যদি রাখতে চাস তবে পীগ্‌গির যা।" আরাধনা মায়ের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল। কল্যাণী উহাকে বুঝাইয়া দিল। মাতার কথালিঙ্গন করিয়া আকুল কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, "মা,—বাবা, আমার বাবা কি—" যথাশক্তি নিজকে সংযত করিয়া কল্যাণী উত্তর দিল, "ভাল হ'য়ে উঠবেন বই কি মা,—আর দেরী করিস না।"

জমিদার-ভবন-সংলগ্ন বৃহৎ উদ্যান-মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র মন্দিরের ক্ষুদ্র কালিকামূর্ত্তির পাদমূলে করজোড়ে, সদ্যস্নাতা, মুক্তিতনয়না, মূর্ত্তিমতী আরাধনারই ন্যায় বসিয়াছিল আরাধনা। এমনই সময় নীরবে মন্দিরে আসিয়া ঢুকিল অসিত। সে কিছু পূর্ব্বে বাতায়ন হইতে আরাধনাকে মন্দিরে যাইতে দেখিয়াছিল। উহারই একটু ভুলের ফল আরাধনার সাধনার সীমা ছিল না। যদিও সে-দিবস হইতে তাহার সহিত দেখা হয় নাই—কিন্তু গৃহে বসিয়া সে প্রত্যেকটি সংবাদ লইয়াছিল। সহানুভূতি,—ইহা যেমনই স্বাভাবিক তেমনই মহান, কিন্তু উহারই সহিত,—না না যুবক জোর করিয়া দুর্ব্বলতাকে বাড়িয়া ফেলিয়া বারবার বলিয়াছিল, উহা শুধু স্নেহ—শুধু সহানুভূতি। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সে ভাবিয়াছিল—উহার সহিত দেখা করিয়া দুটা সান্ত্বনার বাক্য, সে দিনের জন্য একটু ক্ষমা,—সে চাহিয়া লইবে। সেই ঘটনার পর উহার সহিত দেখা করা উচিত কি না,—যদি আবার কেহ দেখিয়া লয়—যদিও উহাদের মনে কোন পাপ লুকান নাই, কিন্তু না থাক, কাজ নাই। কিন্তু কখন্, কোন্ মুহূর্ত্তে উহার অজ্ঞাতে যে সে রাধার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যারতি শেষ করিয়া পূজারী বহু পূর্ব্বে গৃহে গিয়াছিলেন। বাহিরে সূচীভেদ্য আঁধার। মন্দিরের ঘৃত-দীপ ক্ষীণ রশ্মি বিস্তার করিয়া মন্দিরের কতক অংশ আলোকিত করিয়াছিল মাত্র। কৃষ্ণ পাথরের কালিকা-মূর্ত্তির পাদমূলে বসিয়া রোরুদ্যমানা যুবতী। মিষ্ট ধূপের সুগন্ধে মন্দির ভরিয়া গিয়াছিল। আরাধনার নিমীলিত নেত্র বহিয়া অবিরাম অশ্রু ঝরিতেছিল। সামনের এই দৃশ্য যুবকের পক্ষে কি এক মোহজাল রচনা করিয়া তুলিতে লাগিল। উহার অশ্রু তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। আত্মহারা অসিত সব ভুলিয়া অপলক নেত্রে ধ্যানমগ্না তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে আরাধনা একটু চরণামৃত ছোট্ট একটি পাত্রে লইয়া একধারে রাখিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণামান্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। সবল বাহুর আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ব্যাকুলস্বরে সে কহিল, "ছিঃ, অসিত দা।" "রাধা!" "কেন?—আমায় ছুঁও না, নয়।"

"না নয়ন না,—নিজের স্ত্রীকে স্পর্শ করবার সময়ের দরকার হয় না।" আরাধনা শিহরিয়া উঠিল। উহার অণু-পরমাণুগুলার পর্য্যন্ত মৃদু শিহরণ জাগিয়া উঠিল। অন্তরে বাহিরে ধ্বনিয়া উঠিল—স্ত্রী, নিজের স্ত্রী। সে অসিতের স্ত্রী। ঐ ছোট্ট কথাটুকুর মাঝে কতখানি মধুই লুকান ছিল। পরম বিশ্বাসে, বিনা বাধায় সে অসিতের আজকের দেওয়া অধিকার মানিয়া লইল। ভক্তিভরে কালীর পায়ে প্রণাম করিয়া অসিতের পাদমূলে নত হইয়া পড়িল। এবার সে বাধা দিল না—অসিতের বিশাল বক্ষে মুখ লুকাইয়া মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কিন্তু বাবা-মা রাজি

হবেন কি ?"

রাধার বাক্যে অসিতের মনে হইল—হাজার বিচার কানড়ে উহার দেহ একবার কাঁপিয়া অসাড় হইয়া আসিতেছে। উহার কম্পন অনুভব করিয়া রাধা বিস্মিত দৃষ্টি তুলিল। কিন্তু ক্ষীণ আলোয় ভাল করিয়া সে উহার মুখ দেখিতে পাইল না। যদি পাইত তাহা হইলে বুঝিত, দুই এক মুহূর্ত মানবের কতখানি পরিবর্তন আনিতে পারে।

রাধার গমনরতা মূর্তির পানে অসিত স্তম্ভিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল।

(৫)

অশ্রু মুছিতে মুছিতে সদ্যবিধবা কল্যাণী কন্যার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। কয়েকজন প্রতিবাসিনী উহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। আরাধনার আজ বিবাহ। আরাধনার বিবাহের জন্য জমিদার যখন শেষ উত্তর চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সুরেন তখন মরণ-বাঁচনের সন্ধিস্থলে। কষ্টে শ্বাস লইয়া উত্তরে বলিয়াছিলেন, অঘোরের সহিত বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা কন্যাকে তিনি বিষ খাওয়াইতে প্রস্তুত আছেন। জমিদারের আদেশ লইয়া পুনরায় যখন কর্মচারী গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, উহার স্বামী তখন মানবের ক্রোধ-ঘৃণার বাহিরে। তাহার পরের ঘটনা,—না কল্যাণী আর ভাবিতে পারে না। সেই সারারাত্রি মৃতকে লইয়া বসিয়া থাকা,—দ্বারে দ্বারে গিয়া মৃত-সৎকারের জন্যে আতুর মিনতি। কিন্তু জমিদারের ক্রোধের নিকট সকলই ব্যর্থ হইয়াছিল। একবাক্যে উহারা জানাইয়া দিয়াছিল—কল্যাণীরা 'এক ঘরে'। পরের দিন একই ভাবে দুপুর পর্যন্ত মৃতদেহ আগলাইয়া সে বসিয়াছিল। প্রবীণার পিসিমা যখন উহাকে তুলিয়া, আরতিকে ক্রোড়ে নিয়া বলিয়াছিলেন, "এ কি করছ বৌমা—যে গেছে সে তো গেছেই কিন্তু তার সঙ্গে ও দুটোকেও খেবে কি ? বাসী মড়া প'চে উঠে দুর্গন্ধে শুধু তোমাদের নয় পাড়াশুদ্ধকে যে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে,—ভূত হ'য়ে থাকবে। জমিদারের কথায় রাজি হও, মেয়েটারও একটা সদ্গতি হোক। ওই বুড়ো থুবড়ো মেয়ের বর কোথায় খুঁজে পাবে বাছা! শেষে পস্তাবে, স্বামীর ভিটেয় ওই মেয়ে যখন অনাচার করবে। শুধু একটাই তো নয়, আরও একটা আছে যে।" হতাশভাবে কল্যাণী তখন সম্মতি দিয়াছিল—অশৌচান্তেই বিবাহ দিতে হইবে। তখন স্বয়ং কাণীকিঙ্কর দাঁড়াইয়া থাকিয়া মৃতদেহ উঠাইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। সে সকলই সত্য, কিন্তু আজ যে এক বালিকাকে বলি দিতে সে প্রস্তুত হইয়াছে—ইহার সবটুকু শাস্তি কি উহাকেই মাথা পাতিয়া তুলিয়া লইতে হইবে না ? ভরাযৌবনা সুন্দরীর পিপাসা মিটাইবে কি ঐ স্থবির ? কিন্তু কি দিয়া ? তারপর দুদিন পরে—খানপরিহিতা নির্দোষ বালিকা যখন উহারই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে তখন জবাব দিতে হইবে তাহাকেই। এ সকলই সত্য—কিন্তু উপায়ও যে নাই। সকল জানিয়া শুনিয়া—সোনার প্রতিমাকে আজ সমাজের দ্বারে আহুতি দিতে হইবে উহারই মাকে। পিতামাতার অপরিণাম-দর্শিতার শাস্তি তুলিয়া ধরিতে হইবে ঐ আশা-আনন্দে উদ্বেলিত, স্ফুটনোন্মুখ নিষ্পলঙ্কযৌবনা বালিকার মাথায়। উহার কল্পনার সংসারের রঙীন আভাকে বিষ দিয়া কালো করিয়া দিতে হইবে তাহারই গর্ভধারিণীকে। মা,—মা যে সে! কিন্তু জীবন ভগবানের দান। আছে সবারই মত উহারও এক পবিত্র আত্মা, তাকে জোর করিয়া স্বর্গের সীমানায় ঠেলিয়া দিবার কিছু কি অধিকার আছে তার ? হইলই বা সে মা, উহার গর্ভধারিণী। কিন্তু মানুষ হিসাবে উহার কন্যার নিজের কি কোন সত্তাই নাই ?

"হাঁ গো বৌ, ব'সে ব'সে শুধু কাঁদবিই না মেয়েটাকে চেলি-চৈলি দিবি ? বর যে এসে গেছে।" কল্যাণী মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমি পারবো না।" "কি অলুক্ষণ কর তুমি বাছা, কোথায় আছে বল, আমিই না হয় পরিয়ে দি। আয় বাছা, উঠে আয়।" বিবাহের সমস্ত খরচ অঘোর দিয়াছিলেন। "এ কি মেয়ে গো, উঠে আয় না!" বিবাহতরা মুখখানা কিঞ্চিৎ তুলিয়া আরাধনা কহিল, "কিন্তু হিন্দুসমাজে দু'বার ক'রে বিয়ের প্রথা আছে কি মা?" পিসি-শাশুড়ী ঘর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তার মানে ? ওমা সে কি কথা গো, অবাক করলে যে!" মায়ের বিবর্ণ মুখের দিকে বারেক চাহিয়া সে উত্তরে বলিল, "মা, আমি বিবাহিতা।" উল্লা-

দিনীর ন্যায় কাঁপাইয়া কল্যাণী রাধার মুখ চাপিয়া ধরিল, "চুপ, চুপ কর রাক্ষুসী!" আরাধনা আশা করিয়াছিল অন্ততঃ বিবাহের দিবসও অসিত উহার স্ত্রীত্ব স্বীকার করিয়া উহাকে এ দায় হইতে উদ্ধার করিবে। শেষ আশায় নির্ভর করিয়া ব্যাকুল নেত্রে সে একবার দ্বারের দিকে চাহিল—কিন্তু সে, উহার স্বামী এত বড় বিপদে নীরবেই রহিলেন, তবে, তবে কি—আর সে আর ভাবিতে পারে না। করুণ নেত্র দ্বারের মুখে নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে রাধা কহিল, "যদি এতে কোন পাপ না হয় তা হ'লে আমি প্রস্তুত আছি। তোমার দুঃখ দিতে তো আমি চাই নি, কিন্তু আমি বিবাহিতা অন্যের স্ত্রী।" কল্যাণী বোধশক্তি হারাইল—রাধার মুখে, মাথায়, গায়ে যথাশক্তি প্রহার করিতে লাগিল। আরাধনা বাধা দিল না। কল্যাণীর এক দুরন্তভেদী চীৎকারে আরাধনা কিপ্রকরে উহার পতনোন্মুখ দেহ ধরিয়া যত্নে স্বীয় ক্রোড়ে মস্তক লইয়া বসিয়া পড়িল। রাধার চারিধারে যে ভীড় জমিয়া গিয়াছে, শত-শত কৌতূহলী দৃষ্টি যে উহাকে বিদ্ধ করিতেছে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা আরাধনা সে কথা জানিতেও পারিল না। মায়ের মৃত্যুমলিন মুখের উপর মুখ রাখিয়া আকুলকণ্ঠে রাধা কাঁদিয়া উঠিল, "মা, মা আমার, শেষে কি আমিই তোমার খুন করলুম?"

"ও সব কান্নাকাটি পরে করিস, আগে আমার কথার উত্তর দে হারামজাদী!"

রক্তশূন্য মুখে রাধা সামনের দিকে চাহিল,—জমিদার কালীকিঙ্করের পার্শ্বে বর-বেশে দণ্ডায়মান অঘোরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষণতরে দৃষ্টি ফিরাইতে গিয়া যাহার মুখে উহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল সে মুখে আর যাহাই থাক রাধার আশা করিবার মত কোন কিছু ছিল না। স্নেহ, কর্ত্তব্য, খুব ছোট একটুখানি সংসাহস, না—এগুলার সন্ধান তো মিলিলই না, বরং সে মুখে যাহা ছিল উহাকে রাধা আন্তরিক ঘৃণা করে। এত দুঃখ-অপমানের মাঝেও সেই কপিকের দৃষ্টিপাতে রাধার চোখে অসিতের ভীত, কম্পিত মুখখানা ধরা পড়িয়া গেল। অন্তর ব্যাপিয়া হাহাকার উঠিল—ছিঃ, এই তুমি—এই তুমি! সে বাহিরের আবরণই দেখিয়াছিল, কিন্তু অন্তরের নগ্ন অংশ দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে যে স্বামী, উহারই স্বামী,—ছোটবেলা হইতে মায়ের নিকট শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে—স্বামী ইহ-পরকালের দেবতা!

"আবার চুপ ক'রে রইলি?—উত্তর দে!"

রাধা কি উত্তর দিবে ইহার? কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলে নিষ্কৃতি মিলিবে কি? যত বড় নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বাক্যই কেন না হউক আজ যে ইহার জবাব দিতে হইবে শুধু তাহাকেই—কি বলিতে গিয়া রাধা পুনরায় মুখ নত করিল। অঘোর জ্বলিয়া উঠিলেন,—"আমার এতগুলো টাকা খরচ করবার আগেই—"

"থাম অঘোর, হ্যাঁ, আমার এ পুণ্যের রাজ্যে পাপ ক'রে তো কেউ বাঁচতে পারে না—তোমার স্বামীর নাম জানতে চাই।"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কালীকিঙ্কর অধৈর্য্য কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "বল তোমার স্বামীর নাম, ভয় ক'রো না।"

পিতার আজ্ঞার বরযাত্রীরূপে অসিতকে আসিতে হইয়াছিল, সে পিতার পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল। রাধা অতি কষ্টে অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিল—"আমায় মাফ করবেন, সে যে আমি বলতে পারব না।"

আরতি কাঁদিয়া উঠিল, "দিদি, দিদি,—মা যে নড়ে না!"

চারিধার থেকে শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা উদারা, মুদারা, তারার সুরে উঠিতে পড়িতে লাগিল। রাধা কোনদিকে চাহিয়া দেখিল না। স্তব্ধ বুকে মায়ের প্রাণহীন দেহ কোলে লইয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রে অন্তরের মৃদু স্পর্শে অশ্রুশূন্য দৃষ্টি মেলিয়া আরাধনা চাহিয়া রহিল। "রাধা দি ওঠ, রাত হয়েছে। সকালে এ গাঁয়ে থাকা যেতে পারবে না। রাত থাকতেই বেরুতে হবে।"

কল্যাণীর সব সৎকার করিতে গ্রামের যে কেহ সাহায্য করিবে না একথা বুড়া জানিত। মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। গৃহ যখন নিস্তব্ধ হইল তখন সে উহাদিগের এবং নিজের সামান্য জিনিষপত্র বাঁধিয়া রাতের আঁধারে ষ্টেশনে রাখিয়া আসিল—বাকি মাত্র রাধা আর আরতি, এবং কল্যাণীর সৎকার। "ওঠ দিদি, আর দেরী ক'রো না।"

যন্ত্রচালিতবৎ রাধা উঠিয়া দাঁড়াইল। আরতির হাত ধরিয়া অভয় বলিল, "চল দিদি।"

এতক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া রাধার চমক ভাঙিল, "অভয় দা,—মা?"

"হাঁ দিদি, মার সৎকার আমি এই বাড়ীতেই করব—চেঁচিও না, কেঁদ না, চুপ কর।" "মা—"

"না, ছেলেমানুষী ক'রো না,—আমার পিছনে চ'লে এস, কেমন তো বেশী দূর নয়।"

কোথায় যাইতে হইবে সে কথা রাধা জিজ্ঞাসা করিল না, নীরবে উহার অনুসরণ করিল। উহাদের নিরাপদ স্থানে বসাইয়া বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিল। উঠানের পাশে তুলসী-তলার কিছু পূর্ব্বে সে চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কল্যাণীর দেহ তাহাতে রাখিয়া আগুন জ্বালিয়া দিল। চিতা জ্বলিয়া উঠিল—অভয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। কতক্ষণ পরে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সে দ্রুত প্রস্থান করিল।

(৬)

সে প্রায় বছর কয়েক আগেকার কথা, কলিকাতার দরিদ্র পল্লীতে যখন আরাধনা ছোট বোনটির হাত ধরিয়া অভয়ের সহিত আসিয়া উঠিয়াছিল। অভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের অর্থে এবং উহার সূচের কাজ বিক্রয়ের সামান্য অর্থে দিনগুলা কাটিতেছিল। আরতিকে অভয় স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। পিতার নিকট পূর্ব্বেও সে খানিক পড়িয়াছিল। দীর্ঘ দীর্ঘ প্রমোশন পাইয়া সে এখন থ্রী ষ্টেপ্‌কে উঠিয়াছে। অভাব-অনাটন কিছু ছিল না, দিনগুলা মন্দ কাটিতেছিল না। কিন্তু অভয়ের অসুখ হওয়ায় বড় মুস্কিলে পড়িল আরাধনা। ভাবনায় চিন্তায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। স্কুলের কেয়ার তখিনী আঁধার মুখে বসিয়া ছিল—নিকটে ডাকিয়া রাধা জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ করেছে আরতি?" সেও এখন ছোটটি নাই—দিদির দুঃখ-কষ্ট বুঝিতে শিখিয়াছে। নিজে শত তালি-যুক্ত বস্ত্র পরিয়া, একবেলা আহার করিয়া,—জোর করিলে পেট-ব্যথার কারণ দর্শাইয়া আরাধনা উহার পড়ার খরচ চালাইয়া পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া স্কুলে পাঠাইয়াছে। এই অনাটনের মাঝে কি করিয়া বইয়ের কথা বলিয়া উহার দিদিকে জ্বালাইয়া তুলিবে। যদিও শিক্ষয়িত্রী ভয় দেখাইয়াছেন,—এক মাস হইতে চলিল সে ক্লাসে উঠিয়াছে, এখনও যদি সে বইগুলি না আনে ক্লাস হইতে নামাইয়া দিবেন। তবুও—সে কি করিয়া বলিবে সে কথা? সে উত্তর দিল, "না দিদি।" "তবে?" প্রশ্ন করিয়াই রাধা বুঝিল কি উত্তর উহাকে শুনিতে হইবে। "বই গুলোর জন্যে বকুনী খাচ্ছিস না রে! আচ্ছা, দু'চার দিন বাদেই পাবি তুই।" বাহিরে যাইবার সময় একবার অভয়ের গৃহে উঁকি দিয়া দেখিল—সে ঘুমাইতেছে। আরতিকে বলিল, "অভয় দা উঠলে ডেকিস।"

পার্শ্বের বাড়ীর ছোট্ট দরজা ঠেলিয়া রাধা ডাকিল,—"মাসী।" এক বৃদ্ধা বাহির হইয়া আসিল, "কে রাধা দি? আয় বাছা।" বিনাড়ম্বরে রাধা কহিল,—"মাসী, তুমি যে-বাড়ীতে কাজ কর সেখানে আমারও জুটিয়ে দাও।" কতক্ষণ বিস্মিতভাবে চাহিয়া বৃদ্ধা অবিশ্বাসপূর্ণ কণ্ঠে কহিল,—"তুই চাকরী করবি কি দিদি!" এই শিক্ষিত মেয়েটির নম্র ব্যবহারে দরিদ্র পল্লীর সকলে উহার অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাহারও চিঠি লেখাইতে হইলে, ছেলে-মেয়েদের জামা সেলাই করিতে হইলে রাধা-দির কাছে আসিত। অবসরমত সেও মেয়েদের একটু লেখা-পড়া শিখাইত। রোগে, দুঃখে শিয়রে গিয়া বসিত। প্রতিবাসী-প্রতিবাসিনীগণ শুধু সম্মানই করিত না রাধাকে, ভালবাসিত অনেকখানি। বৃদ্ধা পুনরায় কহিল,—"তুমি ভদ্দর লোকের মেয়ে, চাকরী করবে কি গা? তার চেয়ে অভয় যত দিন না সারে আমরা সবাই চাঁদা ক'রে চালাব। ওসব খেয়াল ছাড় মা!" রাধা দৃঢ় কণ্ঠে জানাইল, যদি সে লইয়া না যায়—তবে যা হইয়াই উহাকে অন্যত্র চাকুরী খুঁজিয়া লইতে হইবে। মোটকথা চাকুরী সে করিবেই। এই শান্ত মেয়েটির একগুঁয়েমীর কথা কাহারও অপরিচিত ছিল না। বৃদ্ধা বুঝিল, যখন সে স্থির করিয়াছে তখন করিবেই। "তা বেশ চল মা, তবে আমি তো মাসখানেক বাদে বোনপোর সঙ্গে গাঁয়ে চ'লে যাব—তাই ভাবছি।" "মাসখানেক বাদে হয় ত আমার কাজেরও দরকার থাকবে না মাসী। এখন তো চল, তবে মাহিনা যেন কিছু আগাম পাই।" "তাই পাবি মা,—আর

বাসন-কোসনও মাজতে হবে না বাছা। গিন্নিমার মেয়ে নীলা দি শ্বশুরঘর থেকে এসেছে—খুব বড় জমীদারের বাড়ী বিয়ে হয়েছে কিনা, বৌ পাঠায় না। এবার অনেক বলা-কওয়ায় পাঠিয়েছে। গিন্নিমা কালই বলছিল—নীলা দির খোকনের জন্যে লোক খুঁজতে। তা তুইই চল বাছা।"

রাস্তায় বাহির হইয়া আরাধনা বৃদ্ধার নিকট জানিয়া লইল—তাহারা যাহার বাড়ী আছেন খিটখিটে স্বভাবের গৃহিণী,—উঁহার কন্যা নীলিমা ও অবিবাহিত পুত্র ডাক্তার রঞ্জিৎ। আরাধনা কার্য্যে বাহাল হইল। এই সুন্দরী তরুণীকে রাখিবার গৃহিণীর ইচ্ছা ছিল না কিন্তু নীলিমা আবার ধরিল—ইহাকে রাখিতেই হইবে। উহার শান্ত বাধ্যতরা চক্ষু দুটি নীলিমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। প্রথম দর্শনে এই দরিদ্র মেয়েটিকে সে বুঝি একটু ভালবাসিয়াও ফেলিয়াছিল কেহ রাধাকে কি বলিয়া ডাকাতে সে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল—"ওকে কি ব'লে ডাকতে লজ্জা করে না? কোনখানটা ওর ঝির মত?" তাহার পরই মধুর কণ্ঠে সে রাধাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তোমার নাম কি ভাই?" "রাধা।" একটু ইতস্তত: করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, —"কিছু মনে কর না, তোমায় কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়ের মতই মনে হচ্ছে, আচ্ছা তোমার স্বামী? আচ্ছা থাক ভাই, যদি কষ্ট হয় সে কথা বলতে, নাই বা বললে।" ইহার পর একদিন নীলা আবিষ্কার করিল নূতন ঝি লেখা-পড়া তার চেয়েও ঢের বেশী জানে।

আরাধনা কাহারও সহিত মিশিত না, খোকনকে লইয়া প্রকাণ্ড অট্টালিকার এক দিকে থাকিত। এ পর্য্যন্ত সে রঞ্জিৎকেও দেখে নাই। সেদিবস দ্বিপ্রহরে মনিব-বাড়ী পা দিয়াই রাধা বুঝিল—নীলিমার শ্বশুরগৃহ হইতে তত্ত্ব আসিয়াছে। স্নানান্তে গৃহে যাইবার সময় তত্ত্ববাহিকাদিগের মধ্যে দুই-চারিজনের মুখের উপর দৃষ্টি পড়ায়—আতঙ্কে আরাধনা শিহরিয়া উঠিল। সে চিনিতে ভুল করে নাই ত? না—উহারা যে কালীকিঙ্করের বাড়ীরই দাসী। ভুল হইতেই পারে না। অসাড় পা দুটিকে কোনও ক্রমে টানিয়া লইয়া গিয়া গৃহের কোণটিতে খোকাকে লইয়া বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে কলরব করিতে করিতে রমণীর দল খোকাকে দেখিতে আসিল।

বড়লোক কুটুম্ববাড়ীর ঝি-চাকর,—গৃহিণী স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। "এত শীগ্‌গির যাবে কি বাছারা—এ বেলাটা থেকে যাও।" "না মা, গিন্নিমা ব'লে দিয়েছেন বিকেলের ট্রেনে ফিরতে। দাদাবাবুর আবার শরীর ভাল নেই।" "কি হয়েছে অমিতের!" গৃহমধ্যস্থিতা আরাধনা চমকিত হইয়া উঠিল,—"তবে, তবে সুশীলা অমিতের স্ত্রী—" "ওমা এ কে গা?" তাচ্ছিল্যভরে গৃহিণী কহিলেন,—"ও ঝি।" "কই গা মুখ তোল—দেখি একবার, ওমা এযে সেই সুরেন চৌধুরীর ঘর-আলানি মেয়ে!" প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষিত হইতে লাগিল। রাধা একটিরও উত্তর দিল না। কি উত্তর দিবে অভাগী ঐ কুৎসিত প্রশ্নগুলার। "এ কি করেছ মা? এ কোন্ কুলটাকে ঘরে ঢুকিয়েছ?" গৃহিণী রাগিয়া উঠিলেন,—"দূর—দূর হ কালামুখী···" নীলিমা উহার অসাড় দেহটাকে কোনওক্রমে তুলিয়া বাহিরে আনিল। হিমের ন্যায় শীতল হাতের মধ্যে কয়েকটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া নীলিমা কহিল,—"যাও ভাই, অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নিও।"

(৭)

"শীগ্‌গির শীগ্‌গির এস দিদি, দেখ না অতসীর কেমন করছে।"

আরতির মুখের দিকে অর্থশূন্য দৃষ্টি মেলিয়া আরাধনা চাহিয়া রহিল। উহাকে নাড়া দিয়া শঙ্কিতা আরতি কহিল, "দিদি, কি হয়েছে তোমার? কথা কচ্ছনা কেন? এত শীগ্‌গির কাজ থেকে ফিরলে কেন? ওকি, অমন করছ কেন? দিদি—দিদি।"

আরাধনার পতনোন্মুখ দেহ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আরতি কাঁদিয়া উঠিল। আরতির চীৎকারে প্রতিবাসিনীগণ ছুটিয়া আসিল। অদ্য দুই দিবস হইল—রাধার মানদা মাসী মনিবগৃহ হইতে ছুটি লইয়া আসিয়াছিল। সে গ্রামে বোনপোর বাড়ী যাইবে। মানদাকে দেখিয়া আকুলকণ্ঠে আরতি কাঁদিয়া উঠিল, "ডাক্তার—ডাক্তার নিয়ে এস মাসী, দিদি যায় যে।"

ডাক্তারের ফি যে কোথা হইতে দিবে সে কথা আরতি একবারও ভাবিল না। জ্বরের ঘোরে গৃহমধ্য হইতে

অন্তর কি বলিয়া উঠিল। মানদা একবার গৃহমধ্যে একবার আরাধনার সংজ্ঞাহীন দেহের পানে চাহিয়া সামনের দিকে ছুটিল।

ডাক্তার রক্ষিতের পদ বেষ্টন করিয়া আলুলায়িত-কুন্তলা আরতি কাঁদিয়া উঠিল, "আমার দিদিকে বাঁচাও ডাক্তার—" ঘরে উহাকে উঠাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাক্তার কহিল,—"চেষ্টার ত্রুটি হবে না মিস্ চৌধুরী!" অল্পক্ষণ চেষ্টার পর সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া রাধা উঠিয়া বসিল। আশ্চর্য্যভাবে চারিদিক চাহিয়া ছিন্ন অঞ্চল দ্বারা গা-বাধা ঢাকিয়া লইল। একটা প্রেসক্রিপ্‌শন লিখিয়া ডাক্তার আরতিকে দিয়া কহিল,—"আপনার দিদি বড় দুর্ব্বল, এটা এঁকে নিয়মিত কিছুদিন খাওয়াবেন মিস চৌধুরী। তা হ'লে এখন—"

করুণ হাসিয়া আরতি কহিল,—"এখন যাবেন না, আরও একজন বাকি আছে যে—"

রক্ষিৎ অন্তরঙ্গে দেখিয়া বাহিরে আসিলে অসহায়ভাবে, নতমস্তকে, স্বীয় শাড়ীর অঞ্চল অঙ্গুলি দ্বারা জড়াইতে জড়াইতে, লজ্জিতকণ্ঠে আরতি বলিল,—"আপনার কি কিছু এখন—"

বাধা দিয়া রক্ষিৎ কহিল,—"কি এখন দরকার নেই, রোজ দু'বেলা রোগী দেখে যাব।"

ডাক্তার বিদায় লইলে আরাধনা নির্জ্জনে ভগিনীকে এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারকে কি আগে থেকে তুই চিনতিস?" অকারণে আরতির গণ্ডদ্বয় লাল হইয়া উঠিল—ধীরে ধীরে কহিল, "স্কুলে যাবার সময় সেদিন যখন গরুতে আমায় তাড়া করে তখন উনি—"

আরাধনা ভগিনীর লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া, মুচকিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—"তারপর?" ধীরে ধীরে রাধা সকল কথা জানিয়া লইল—সেই ঘটনার পর হইতে প্রত্যহ স্কুলে যাইবার সময় ডাক্তারের সহিত চারি চক্ষের মিলনের ইতিহাস। রক্ষিতের ভিসপেনসারী উহার স্কুলপথে পড়িত। কতক্ষণ পরে ব্যথিত কণ্ঠে রাধা কহিল, "কিন্তু ওদের বিশ্বাস করিস না বোন! এত বড় স্বার্থপর কাপুরুষের জাত—" বাধা দিয়া আরতি বলিল,—"না দিদি, ডাক্তার বাবু খুব সাহসী, সে দিন গরু যখন তাড়া করে, তখন তার পিঠ দুটা ধ'রে এমন ক'রে নাড়া দিলেন, দেখতে যদি তুমি।"

(৮)

বর্ষাকাল মেঘগুলা আকাশের কোণে অবিরাম ছুটাছুটি মাতামাতি করিয়া বেড়াইতেছিল। ভিজা মাটির মিঠা গন্ধটুকু ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছিল। উঠানের পত্রবহুল নিম গাছটা বাতাসে এক এক বার কাঁপিয়া উঠিয়া নিঝুম হইয়া কাহার যেন আকুল প্রতীক্ষায় ধ্যানরত হইয়া রহিতেছিল। দালানে টাঙান, খাঁচার মধ্যেকার টিয়া মাঝে মাঝে শীস দিয়া উঠিতেছিল। গৃহ-মধ্যস্থিতা মাদুরে আসীনা আরতি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। আশে পাশের খোলা বইগুলা পাঠিকার মনোযোগ অভাবে পড়িয়াছিল। খোলা জানালার সামনেকার মেঘে-ভরা একটুকরা আকাশ আরতির চোখে বড় মিঠা লাগিতেছিল। সারিয়া উঠিয়া অন্তর আবার কাজে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যেদে যাইবার সময় মানদা রাধাকে অনেক করিয়া বলিয়া গেছে সে যেন কাজ না করে। রাধা পাড়ায় বাহির হইয়াছিল কিছুক্ষণ আগে। অন্তর সারিয়া উঠিল কিন্তু ডাক্তারের আসা বন্ধ হইল না। ক্রমে সে উহাদের অভিভাবক স্থানীয় হইয়া উঠিল।

জুতার শব্দ অনুসরণ করিতে গিয়া আরতির দৃষ্টি যাহার উপর যাইয়া পড়িল, উহাকেই বুঝি—এই নির্জ্জনে উহার অন্তর সঙ্গীকণে চাহিতেছিল। ঐ তরুণীর মুগ্ধ, পুলকিত মুখের দিকে চাহিয়া মোহাবিষ্টের ন্যায় রক্ষিৎ উহারই পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—"পড়ছিলে আরতি?" "হাঁ।" "কের মিথ্যে?" সলজ্জে আরতি মস্তক নত করিল। সন্ধ্যার ছায়ায় তরুণীর লাজরক্তিম মুখখানা রক্ষিতের দৃষ্টিতে বড় মোহন লাগিল। মৃদু কণ্ঠে রক্ষিৎ ডাকিল,—"আরতি!" উহার ডাকে আরতির সারা দেহ পুলকে কম্পিত হইয়া উঠিল। মিষ্ট হাসিয়া উত্তর দিল, "কেন?" কতক্ষণ পরে আবেশকম্পিত কণ্ঠে ডাক্তার কহিল, "দিদির কাছে যদি আমাদের বিয়ের প্রস্তাব করি অন্যায় হবে কি?···বল, বল আরতি, চুপ ক'রে থেক না।" মৃদু কণ্ঠে আরতি উত্তর দিল, "দিদিকে বলো।"

অধীর স্বরে রঞ্জিৎ বলিল, "আর তুমি?" আরতির চেষ্টা সত্ত্বেও কণ্ঠ হইতে স্বর ফুটিল না কিন্তু উহার অর্দ্ধ-নিমীলিত দৃষ্টি হইতে যুবক স্বীয় প্রশ্নের উত্তর পাইয়া গেল।

"আলো জ্বালিসনি কেন আরতি?" রঞ্জিৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "দিদি, আগে আমার কথার উত্তর দাও—" "কি ভাই?" "বেশী কিছু বলতে পারব না, শুধু এইটুকু বলছি, তোমার সত্যিকার ভাই হবার অধিকার আমায় দাও।" আরাধনা একটুও বিস্মিতা হইল না, সে যেন উহাই আশা করিয়াছিল। "কিন্তু তোমার মা-বাবা রাজি হবেন কি? আমরা যে গরীব—ভাই!" "বাবা আমার নেই—আছি আমি, ছোট বোন, আর মা। বিয়ের পর আমরা যখন ওঁর পায়ের নীচে গিয়ে বসব—মা তো তখন ওকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবেন না। মা যে আমায় বড় বেশী স্নেহ করেন।"

একটু কাল নীরবে থাকিয়া রাধা কহিল, "এখন তা হ'লে ওঁকে জানাবে না?" "না দিদি বিয়ের পর একেবারে মা জানবেন।" "কিন্তু পরে যদি—" "সে ভাবনা তোমার নেই, আমার মাকে জানি আমি।" "দেখছ তো ভাই রোগ নিয়ে ভুগছি,অভয় দাও বুড়া মানুষ,এর পর মা যদি—" "আমার ওপর একটু কি বিশ্বাস নেই তোমার?" বিশ্বাস! পুরুষের কথায় বিশ্বাস? উন্মাদ বলে কি? আজ যে উহাদেরই একজনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে দুনিয়ার মাঝে উন্নত মাথায় দাঁড়াবার অধিকার হারাইয়াছে।

"ভাল ক'রে ভেবে দেখ ভাই,—এত ঝঞ্ঝাটের দরকার কি?" অধৈর্য্য রঞ্জিৎ উত্তর দিল, "বিশ্বাস কর দিদি, ভয়ের কিছু নেই।" আবার বিশ্বাস!···ব্যথিত হাসি হাসিয়া রাধা সম্মতি দিল, "বেশ ভাই হোক্; আমাদের বংশ-পরিচয়—" "আগেই সে সব—বাবার সব কথা অভয় দার কাছে জেনে নিয়েছি।" "সব জেনেছ ভাই?" সন্দেহে অবিশ্বাসে রাধা উহার দিকে চাহিল। হাসিয়া রঞ্জিৎ বলিল, "হাঁ দিদি, সব।" "আমার সব—" রাধা ফিরিয়া রঞ্জিত বলিল, "সব—সব তোমারও।" রাধা স্বস্তির শ্বাস লইল। রাধা বুঝিতে পারিল না যে উহার কথা উঠিতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভয় সাংকেতে কি ভাবে সে কথা শেষ করিয়াছিল। সে ধারণাই করিতে পারিল না যে কত বড় মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বুড়া বলিয়াছিল—বিবাহের পরদিন হইতে রাধার স্বামী নিরুদ্দেশ। সে ডাক্তারের কথায় বুঝিল সত্যকার সব ঘটনা শুনিয়াই আরতিকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছে সে। বুকে চাপান মস্ত পাথর আজ যেন নামিয়া গেল যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে কিন্তু ছোট বোনটি—সারা প্রাণ দিয়া সে উহাকে সুখী করিতে চাহিতেছিল, কাতর প্রার্থনা ভগবান্ শুনিয়াছেন। রাধা আরও এক ভুল করিল—রঞ্জিৎ যে নীলিমার ভাই এও সে জানিল না।

বিবাহের পর আরতির সহিত রঞ্জিৎ মাতার পদনিম্নে বসিয়া পড়িল। প্রথমতঃ মাতা রাগিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। কিন্তু সন্তানের উপর মায়ের ক্রোধ শান্ত হইতেও বিলম্ব হইল না। আরতির সুন্দর মুখখানাও বুঝি উহার ক্রোধ শান্ত করিতে সাহায্য কিছু করিয়াছিল। নির্জ্জনে পুত্রকে পাইয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগে কেন বলিসনি রঞ্জিৎ—আমার এক ছেলে—" একমাত্র সন্তানের বিবাহ হইল কি না গোপনে, গরীব দুঃখীর ন্যায়। এ কথা গৃহিণী কিছুতে ভুলিতে পারিতেছিলেন না। "মা, মা, আমায় মাপ কর এবারটি আর কোন দিন তোমার অবাধ্য হব না।" রঞ্জিৎ মাতাকে জড়াইয়া ধরিল।

স্নেহে উহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া গৃহিণী কহিলেন "না বাবা, আর কিছু বলব না। তা ওদের বংশপরিচয় ভাল ক'রে নিয়েছিলি ত?" "সে সব নিয়েছি—গরীব ছাড়া আর কোন দোষ নেই।···ওর এক বড় বোন আছে,—আহা তাকে দেখলে বড় দুঃখ হয় মা!" "থাক থাক তাকেও না হয় এনে রাখ বাবা!" "এন মা, বড় ভাল সে।" "তা জানব,—বিধবা বুঝি?" "না মা, ওর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছেন সেই বিয়ের পর থেকে।"

(৯)

ঘড়ির দিকে চাহিয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কি আবার তোমার দিদিকে দেখতে যাবে না? মুহূর্ত্তে আরতি জবাব দিল—সে যাইবে। বিস্মিতমুখে গৃহিণী বলিলেন. "পোয়াতী অবস্থায় সেখানে রোজ রোজ নাই বা গেলে।" বিনীতভাবে আরতি বলিল, "দিদির বড় অসুখ মা।" "আচ্ছা যাবে যাও, ওসব বিশ্রী রোগ-

ছুঁয়ো ছুঁয়ো না যেন। শীগ্‌গির ফির'। না, দাঁড়াও, যাব যাব ক'রে যাওয়া হয় নি, চল আমিও না হয় দেখে আসি তাকে।"

মলিন বিছানায় ততোধিক মলিন মুখে আরাধনা শুইয়াছিল। জুতার শব্দে সে মুখ তুলিল। কিন্তু রঞ্জিৎ ও আরতির পশ্চাতে শুভ্র বাসপরিহিতা দুলকায়া কে ও? সহসা সে দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িল। সেই অল্প সময়ের মধ্যেও গৃহিণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কন্যার মুখের উপর পড়িয়াছিল।

বধূর দিকে চাহিয়া বিরক্তিকর্কশ কণ্ঠে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কিটা আবার এখানে কেন?" অপ্রস্তুত রঞ্জিৎ মাতার ভুল সংশোধন করিল, "মা উনিই বৌদি।" কিন্তু আরাধনার ভাব দেখিয়া অন্তরে রঞ্জিৎ বিস্মিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এদিকে ক্রোধ, দুঃখ আসিয়া গৃহিণীর অন্তঃকরণ অধিকার করিল, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, "আঁত, ধর্ম্ম সব দিয়েছ বাবা! তারা শুনলে মেয়েটাকে—আমার নীলিমাকে যে দূর ক'রে দেবে।" বিরক্ত হইয়া রঞ্জিৎ কহিল, "আঃ কি কর মা!" মাতার রসনা কিন্তু পুত্রের বিরক্তিতে বিষ উদ্গীরণ করিতে পশ্চাৎপদ হইল না। উহার বিগিরি হইতে লইয়া নীলিমার শ্বশুরগৃহের লোকেদের মন্তব্য এবং নীরবে রাধার উহাদের সকল কথা মানিয়া লওয়া,—বিস্তারিতভাবে গৃহিণী কহিয়া শুনাইলেন।

পরনিন্দে পণ্ডিতা বধূকে সরাইয়া দিয়া গৃহিণী ডাকিলেন, —"ও'লে আয় রঞ্জিৎ, ওরা দু'বোনে বেশ থাকবে এখন। এত বড় ধাপ্পাবাজীর শাস্তি ভগবান দেবেন। আমার পবিত্র কুলে কালি দিলে..." স্তম্ভিত রঞ্জিৎ নড়িল না। "ও'লে এস বাবা!"

বিবর্ণ মুখে রঞ্জিৎ বলিল—"আরতি!" চীৎকার করিয়া গৃহিণী কহিলেন, "পাগল হয়েছিস? ঐ কালামুখী পতিতার বোনকে ঘরে নেব? মিটমিটে ডান এই ক'মাসের মধ্যে একদিনও ওর বোনের কথা বলে নি। ও বেজার বোন—সে কি আর ভাল আছে রে বাবা! ভাইনী—ওরা ভাইনী: মায়াজালে তাই আমার দুধের ছেলেকে বাদু ক'রে নিলে। মা যার প্রাণ—সেই ছেলে কি না লুকিয়ে বিয়ে করলে। জাত ধর্ম্ম সব গেল। ওরে, তারা শুনতে পেলে যে আমার নীলিমাকে ত্যাগ করবে।" গৃহিণী ললাটে করাঘাত করিলেন। সত্যই তো বিবাহের পূর্ব্বে উহার স্ত্রীও যে ভগিনীর সকল কথা উহাকে বলিতে পারিত। অন্তরকে দেখিয়া—রঞ্জিৎ দৃঢ়করে উহার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "মিছে কথা কেন বলেছিলে তুমি? দাও, দাও উত্তর—কেন আমার সর্ব্বনাশ করলে?" আব্বাজে অন্তর কতক বুঝিয়া উত্তর দিল,—"কিসের সর্ব্বনাশ?" ঝঙ্কার দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "নেকা সেজ' না—বিয়ের বোনের সব কথা কেন মিছে বলেছিলে?"

"সব সত্যি; তখন না বললেও তাতে হয়েছে কি?"

"শয়তান বলে কি? কি বলছ তুমি? কিছু দোষ হয় নি তাতে?"

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ উত্তর দিল,—"না, কিছু না। লোকেদের সামনে না হ'লেও কালীর মন্দিরের দরের সামনে রাধা-দির বিয়ে হয়েছিল এ তো মিথ্যে নয়। আর, মা যে আমার সতী-সাধ্বী এও মিছে নয়।" "পরিষ্কার ক'রে বল অন্তর দা—তুমি বুঝছ না এ সময় মাথায় আমার আগুন জ্বলছে!" আরাধনার নিকট—শুধু উহার স্বামীর নামটুকু বাদে যাহা কিছু শুনিয়াছিল এবং নিজপক্ষে সে যাহা কিছু দেখিয়াছিল—রাধার পিতামাতার মৃত্যু, বিবাহে অস্বীকার, সকলই সংক্ষেপে সে কহিল। "বেশ ভাই; কিন্তু ওঁর স্বামীর নাম? সে বলতে ওঁর আপত্তির কি আছে? এখন আজ ত ওঁর বোনের জন্যেও বলা উচিত।" "সে কথা রাধা-দি'ই জানেন।"

কাঁপিতে কাঁপিতে এক ঝলক রক্ত আরাধনার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ছুটিয়া আরতি জোঠার মুখের নিকট গামলা ধরিল। বড় অনিষ্টের মূল ঐ কঙ্কালসার পাংশুমুখী নারী।—সত্যই যদি সে অপরাধিনী নয় তবে স্বামীর নাম বলিতে উহার আপত্তি কি থাকিতে পারে। তবে, তবে—মাতা যাহা শুনিয়াছেন উহাই কি সত্য! উহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। ঘৃণা এবং ক্রোধ নিমেষে রঞ্জিতের মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। জ্ঞানশূন্যের ন্যায়

এক টানে স্ত্রীকে তফাৎ করিয়া—আরাধনার গ্রথ অঞ্চল টানিয়া নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, "মরণের আগে আমার শেষ উত্তর দিয়ে যাও—তোমার স্বামীর নাম ব'লে যাও।" রঞ্জিতের ওষ্ঠ হইতেছিল, ঐ রক্তহীন মূর্ত্তির চক্ষু দুটা স্বামিরহস্য প্রকাশ করিয়াই বুঝি যে-কোন মুহূর্ত্তে জন্মের মত মুদ্রিত হইয়া যাইবে। মানবের বড় রকম স্বার্থে যখন আঘাত লাগে তখন সে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলে, হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলা ঘুমাইয়া পড়ে,—জাগিয়া থাকে উঠে সে-পশুর নিকট সে তখন ক্রীতদাস। একটা ঝাঁকানি দিয়া রঞ্জিৎ আবার বলিল,—"বল, বল।" কষ্টে শ্বাস লইয়া দৃঢ়স্বরে আরাধনা কহিল, "কিন্তু আমার চরিত্রের সাক্ষাই দিতে আমি যদি প্রস্তুত না হই।" "কিন্তু কেন তা তুমি দেবে না? সে কথা বলতে তুমি বাধ্য।" কি বলিতে গিয়া আরতির দিকে চাহিয়া রাধা নীরব হইল। "চুপ ক'রে থেক না, তোমার স্ত্রীত্বের সাক্ষাই কেন তুমি দিবে না?" "তাতে আমার নারীমর্য্যাদাকে ছোট করা হবে।" অধীর কণ্ঠে রঞ্জিৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হ'লে তুমি অসতী, তা স্বীকার করছ?" উদাসভাবে ব্যথিত কণ্ঠে রাধা উত্তর দিল, "এই কথা স্বীকার করলে যদি তোমার পৌরুষ বজায় থাকে,—সন্তুষ্ট হও তাই—"

"এ কি—কি এসব?" নীলিমা উহার স্বামী অসিতকে লইয়া গৃহে ঢুকিল।

শ্বশুরগৃহে সে শুনিয়াছিল, ভ্রাতা এক দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। খোকার অসুখের জন্য এতদিন সে আসিতে পারে নাই। উহাদের চমকিত করিবার ইচ্ছায় কোনও রূপে সংবাদ না দিয়াই আসিয়াছিল। গৃহে পঁহুছাইয়া শুনিল—উহারা মোটরে করিয়া বধূর পীড়িতা ভগিনীকে দেখিতে গিয়াছেন। কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল সেও দাদাবাবুকে লইয়া অনেকবার উঁহার শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিয়াছে। খোকাকে ঝিয়ের নিকট রাখিয়া স্বামীর সহিত সে গাড়ীতে চলিয়া বসিল। হঠাৎ উহাকে দেখিলে উঁহারা কতই না সুখী হইবেন! সে কিছু পূর্ব্ব হইতেই দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল। কন্যাকে দেখিয়া গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন, "মা নীলা, রঞ্জিৎ আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে! সেই ঝির বোনকে বিয়ে করেছে—"

যদিও ঐ কথা, সৌন্দর্য্যহীনা নারীকে চিনিতে অসিতের একটুমাত্র বিলম্ব হইল, কিন্তু চিনিতে পারার পর লজ্জার শিহরণ যত বেশীই হইয়া থাকুক—বুকের মাঝে আঘাতও যে সে কম পাইল একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এতদিন পরে উহার মনে হইল—সত্যই সে বড় বেশী অন্যায় করিয়াছে। ঐ যে শুভ্র অনেতমুখী নারীর জ্যোতি-হীন দুই নেত্র বাহিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে ইহার নিমিত্ত দায়ী কি সে নিজে নহে? এক সময়ে যে লালিত্যমণ্ডিত মুখখানা উহার অন্তরে রং ধরাইয়া দিয়াছিল, যে রূপ দেখিলে সে সব-ভুলিয়া বিধাতার নির্ম্মাণের তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিত না, যাহার স্পর্শে উহার শিরা-উপশিরাগুলা পর্য্যন্ত আনন্দে মাতিয়া উঠিত—সেই নারীকে আজ মরণের দ্বারে ঠেলিয়া দিয়াছে কে? সমাজলাঞ্ছিতা অভাগী নারী—কিন্তু তার এই লাঞ্ছনার জন্য দায়ী কে? সে নিজেই নয় কি? সমাজের সামনে গর্ব্বভরে সে একদিন স্ত্রীত্বের দাবী লইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—স্বামীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাকে লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিয়া সমাজের শাসন মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল,—সেই সহনশীলা নারীর, উহারই স্ত্রীর এই দুর্দ্দশার জন্যে দোষী কি সেই নয়? আজও যে মরণের দ্বারে আসিয়াও উহারই জন্যে শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিতেছে, সে দিনের মত আজও কি সে আত্মাভিমান লইয়া দাঁড়িয়া থাকিবে? অন্তরের অন্তস্তল হইতে কেহ বলিয়া উঠিল,—ভীরু কাপুরুষ!...অসিত কি বলিতে গেল কিন্তু নীলিমার দিকে দৃষ্টি পড়ায় কণ্ঠে স্বর ফুটিল না।

আরাধনার উপাধানহীন মাথাটা বক্ষে বালিসে তুলিয়া দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে নীলিমা বলিল, "ছিঃ দাদা, এ কি করছ?" সকরুণ কণ্ঠে রঞ্জিত বলিল, "মরণের আগে ও আমার শেষ উত্তর দিয়ে যাক।" এতক্ষণ পরে আরাধনা অসিতের দিকে চাহিল। দেহ কাঁপিয়া উঠিল,—মলিন মুখখানা সহসা স্বর্গীয় দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিল,—"তুমি এসেছ? শুধু আমার ছোট বোনটির জন্য আমার এ শেষ উত্তরের হাত থেকে উদ্ধার কর।" নীলিমার চক্ষের সম্মুখের নশ্বমান

আবরণ মুহূর্ত্তে অপসৃত হইল—পলকের পৃথিবী সরিয়া গেল। মাথা ঘুরিয়া উঠিল—স্বামী—উহার স্বামী প্রতারক? কিন্তু ঐ মৃত্যুময়ী নারী···সে জোর করিয়া নিজেকে সংযত করিল।

একটুকু গামলার ধরিয়া অঞ্চল দ্বারা সযত্নে রাধার মুখ মুছাইয়া ধীর কণ্ঠে নীলিমা বলিল, "তোমার শেষ উত্তর আমি শেষ দাবা,—বিদিকে এখন শান্তিতে যেতে দাও।"

অসিত নিজের অজ্ঞাতে কখন যে রাধার শিয়রে আসিয়া বসিয়াছিল—সে কথা জানিতে পারিল নীর আকর্ষণে। কাতর কণ্ঠে নীলিমা কহিল, "তোমার নির্য্যাতিতা স্ত্রীর শেষ নিশ্বাস এখনও পড়েনি—ওর পবিত্র দেহ স্পর্শ ক'রে শেষ সময় আর অপমানিত ক'রো না।"

ধর্ম্মের অপব্যবহার

৺ হেমাঙ্গিনী দেবী

ঈশ্বরকে যে জেনেছে সেই বলতে পারে ঈশ্বর ও জীবে কি সম্বন্ধ। আর সকলের কথা অনুমান মাত্র। এই উদ্যানের একটি ধূলি যদি বলতে যায় হিমালয়ের স্বরূপ, তার যেমন অবস্থা, আমারো সেই অবস্থা। তবে যাঁরা সাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের কাছে শুনেছি বেদান্তেই না কি মুনিঋষিরা ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপ ও সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন। কি শাক্ত কি বৈষ্ণব, সমুদয় শাস্ত্রেরই মূলতত্ত্ব বেদান্ত-ধর্ম্ম। এই বেদান্তের ব্যাখ্যা অনেকে অনেক রকম করেছেন। আমি তার কি জানি? তবে শুনেছি কেউ কেউ বেদান্তের মতে আপনাকে ঈশ্বর জ্ঞান ক'রে এতদূর পর্য্যন্ত ভ্রান্ত হয়েছেন, যে, গ্রন্থ-রচনাকালে মঙ্গলাচরণ করতে গিয়ে কাকে প্রণাম করবেন ঠিক করতে পারলেন না। বল্‌লেন, "ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, ঈশ্বর—সবই ত আমি! তবে আর কাকে প্রণাম করি?" এই ব'লে তাঁর আর প্রণাম করাই হ'ল না। অচিন্ত্য ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদই না কি আজকালকার পণ্ডিতেরা মেনে নিয়েছেন। এই মতে মায়াবদ্ধ জীব মায়াতীত ঈশ্বর হ'তে স্বতন্ত্র কিন্তু অবস্থা-বিশেষে জীব শিবত্বাপন্ন বা ব্রহ্মীভূত হয়। এই অবস্থা-বিশেষেই খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "আমি এবং আমার পিতা এক।" শঙ্কর বলেছিলেন, "সোঽহং", এবং চৈতন্য বলেছিলেন, "দুই নেই।" কিন্তু যখনই মহাপ্রভুকে কেউ স্বয়ং ঈশ্বর ব'লে পদধূলি নিতে গিয়েছেন, তখনই তিনহাত পেছনে হ'টে গিয়ে জিভ কেটে বলেছেন, "ছি, ছি, এ কি কথা, 'দুই কৃষ্ণদাস মাত্র'"। তিনি পরিষ্কার ক'রে বলে গিয়েছেন—

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয়।"

তাই তিনি বলেছেন ব্রহ্ম অপাদান, করণ এবং অধিকরণ অর্থাৎ তা হ'তে জীব উৎপন্ন, তাঁর দ্বারাই জীব জীবিত, আর যখন জীব সাধনা দ্বারা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, কাম-ক্রোধ-লোভের অতীত হ'য়ে একমাত্র সচ্চিদানন্দ অখণ্ড পরব্রহ্মে মগ্ন হ'য়ে যায়, তখন প্রেমমুগ্ধ প্রণয়ীযুগলের ন্যায় একাত্ম ও একপ্রাণ হ'য়ে যায়। তখন আর কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। তাই ব'লে কি তুমি আমি স্বামী স্ত্রী সকলেই বল্‌বে—আমি ঈশ্বর হয়েছি। মহাপ্রভু যখন নৃসিংহাবতার ভেবে ভেবে আবেশে হুঙ্কার করতে করতে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে দৈত্যদলন করবেন ব'লে ছাতার ছুটেছিলেন, তাঁর কি কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান ছিল? খ্রীষ্ট যখন ব্রহ্ম, জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের ভেদ ভুলে গিয়ে, সমুদয় মানবের প্রতিনিধি বিশ্বমানব আপনাকে জ্ঞান ক'রে পাপীর জন্য আপনাকে ক্রুশে পরমানন্দে বলিদান করেছিলেন, তাঁর নিকট তখন কি বাহ্যজগতের কোন অস্তিত্ব ছিল? এরূপ অবস্থা কি যায় তার হয়? কিন্তু আজ, কাল তাই হয়েছে। সকলেই এক এক অবতার হয়েছেন। ইনি বলেন, আমি স্বয়ং ভগবান, উনি বলেন আমি স্বয়ং মহাপ্রভু। আর

আধুনিক শিক্ষার কি তারিফ,—অমনি উকীল, ডাক্তার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী প্রভৃতি শিবা জুটে এক এক জায়গায় লোকে লোকারণ্য। অবশ্য স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, কারণ স্ত্রীলোকেরা সরল, সোজা ভাষায় বলতে গেলে বোকা। কেউ বললেন, ঐ যে দেখছ উনিই স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁর কথা এত গভীর যে সকলে বুঝতে পারে না। তাই ব'লে সামান্য কথার কত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়। একজন শিষ্য একখানা সন্দেশ নিয়ে এসেছেন, প্রভু সন্দেশ এক নিশ্বাসে গেয়ে বললেন, "আ! কি মিষ্টি!" ভক্ত শিষ্যের চক্ষে অমনি জলধারা—"আহা! আহা। কি গভীর তত্ত্ব! কি অন্তর্নিহিত গভীর বিজ্ঞান!" শ্রীভগবান প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করছেন—আর ভক্তের কথা শেষ না হ'তে হ'তে অত্যধিক ভোজনবশতঃ প্রভুর বমন হয়েছে। কেঁদে কেঁদে ভক্ত বলছেন—"দেখ্ দেখ্ স্বচক্ষে দেখ্ ভগবানের গ্রাসে কেমন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রতিমুহূর্ত্তে অন্তর্প্রবিষ্ট হচ্ছে, আবার কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নূতন আকার ধারণ ক'রে উদ্গীরিত হচ্ছে।" অন্য ভক্তেরা বোঝালেন—বাস্তবিক ত, এ শুধু সন্দেশ নয় ত, পূর্ব্বোক্ত আম-জাম-প্রভৃতির সংমিশ্রণে উদ্গীরিত পদার্থ নূতন আকারই ধারণ করেছে বটে!

প্রভু যদি কিছু ভেল্‌কীবাজী শিখে থাকেন তবে ত কথাই নাই। আপনারা হিপ্‌নটিজ্‌ম্ বা মেস্‌মেরিজমের কথা শুনেছেন। লোকবিশেষের এই ক্ষমতা আছে, এতে অলৌকিকত্ব কিছুই নাই। আমি যদি বলি আপনি স্ত্রীলোক নন পুরুষ আপনাকে ভাবতেই হবে "আমি পুরুষ।" এই শক্তিবশতঃ অনেক বুদ্ধিমান বিদ্বান আকৃষ্ট হ'য়ে আত্ম-বিসর্জ্জন করে। একটু শক্তি দেখ্‌লেই লোক পাগল হ'য়ে যায়, মনে করে এই শক্তি যাঁর তিনি নিশ্চয় ঈশ্বর। কিন্তু এরূপ শক্তিশালী লোক ঢের আছে, যাদের ধর্ম্মজগতে কোন উচ্চ স্থান নাই। এক জন মুসলমানকে সঙ্গে ক'রে একজন বি-এল-উপাধিধারী বুদ্ধিমান উকীল এক মেলায় গিয়েছিলেন। একটি ঘোড়া দেখে উকীলের খুব পছন্দ হয়েছিল; মালিক বলে ২৪০৲, তিনি বলেন ২০০৲। এইরূপ দর-দাম করতে করতে ঘোড়ার মালিক অনেক দূরে চ'লে গেল, উকীল ও তাঁর মুসলমান বন্ধুও সঙ্গে সঙ্গে চললেন। এক জায়গায় গিয়ে মালিক বললে, "আচ্ছা ২০০৲ টাকাই দাও কিন্তু টাকা এখনই চাই।" উকীলের কাছে কেবলমাত্র ৫০৲ টাকা ছিল। তখন সেই মুসলমানকে বললেন, "সা সাহেব এখনই ১৫০৲ দিতে হবে।" অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ঐ সা সাহেব মাটিতে একখানা রুমাল পেতে কি আওড়াতে লাগলেন, আর রুমাল ফুলে উঠ্‌ল। রুমাল তুলে দেখেন নতুন গরম দেড় শত টাকা। ঘোড়াওয়ালাকে টাকা দিয়ে সা সাহেব উকীলকে বললেন, "বাড়ী গিয়ে এখনই কিন্তু টাকা চাই।" বাড়ী গিয়ে উকীল দেড়শত টাকা যখন দিলেন, সা সাহেব রুমাল চাপা দিয়ে কি বলতে লাগ্‌লেন, রুমাল মাটিতে লেগে গেল, আর টাকা নেই। তাই ব'লে কি সা সাহেব পরব্রহ্ম? তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় জমিদারী নিয়ে মোকদ্দমা করেন, আর প্রায় স্বভাববশতঃ পুলিশ দেখ্‌লে ভয় পান। সেদিন একটি সামান্য লোক একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের কাছে এসে বললে, "হাত পাতুন ত।" তিনি হাত পাতলেন। তার নিজের হাত শুঁকতে বললে, ডাক্তার বললেন তোমার হাতে ত কিছুই নাই। তখন ডাক্তারের হাতে ঐ লোকটি তার বুড়ো আঙুল রগড়াবা-মাত্র হাতে বহু এসেন্স-মিশ্রিত একপ্রকার সুগন্ধ অনুভূত হ'ল। ডাক্তার স্বয়ং এবং তাঁর বন্ধুরা রুমাল শুঁকিয়ে দেখ্‌লেন, রুমালেও সেই অপূর্ব্ব সুগন্ধ। তাই ব'লে কি সেই ব্যক্তি পরমেশ্বর? অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ কত লোক এই প্রকার ভেলকীবাজীতে ভুলে যায়।

আমাদেরই একজন ভগিনীর কথা বলি। তিনি এই স্থানে অনেকবার বক্তৃতা করেছেন, কাগজেও লিখেছেন, ব্রাহ্ম-সমাজেও যাতায়াত করতেন। রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের বেতনভোগী একজন ব্রাহ্মণ আপনাকে পরব্রহ্ম ব'লে ঘোষণা করেছেন। তাঁর নিকট ধরে বসে লোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। আমাদের ভগ্নীও দীক্ষিত হয়েছেন। দীক্ষাগ্রহণের পর তাঁকে বলা হয়েছে, "এই মন্ত্র গ্রহণ করলে আর ভুলে থাকা যায় না, তুমি যদি ভুলে থাক তোমার স্বামী-পুত্র মারা যাবে।" সরলা পতিব্রতার মনে বিষম ভাবনা, প্রাণে দারুণ আঘাত। "আমি যদি ভুলে থাকি, তবে ত আমার স্বামী-পুত্র মারা যাবে!" এই

ভাবনায় সম্পূর্ণ উন্মাদ হ'য়ে একদিন তেতলার ছাদ থেকে পালাবার চেষ্টা ক'রে এমনভাবে রাস্তায় প'ড়ে গেলেন যে চার ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু এসে তাঁকে সমুদয় ভাবনা থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে গেল।

এই ঘটনার উল্লেখ এই জন্য করছি যে কত লোক এই প্রকার আত্মপ্রতারিত হ'য়ে বা প্রতারণা ক'রে সমাজে নানাবিধ দুর্ঘটনা আনয়ন করে।

সকল শাস্ত্রেই ঈশ্বর এক—অদ্বিতীয়, অনীম, মায়াতীত। জীব সসীম মায়াবদ্ধ। কিন্তু সাধনা দ্বারা জীব শিবত্বপ্রাপ্ত হয় বা ব্রহ্মীভূত হয়, অর্থাৎ আবেশে আপনার অস্তিত্ব ভুলে যায়। প্রেমেতে সাধক আত্মহারা হ'য়ে সম্মিলিত নদী-জলধির ন্যায় একাকার হ'য়ে যান। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সেই প্রেমলাভে সমর্থ হই।"

* ডাঃ শ্রী সুন্দরীমোহন দাসের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী ৺ হেমাঙ্গিনী দেবী ১৯২২ সালে একটি মহিলা-উদ্যানে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, এবং ইহা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই।

নারীশিক্ষা

আয়েসা আহ্‌মেদ

নারীশিক্ষা সম্বন্ধে দুইএকটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পর হইতে বিশ্বের সর্ব্বত্রই জাতীয় জাগরণের আহ্বান আসিয়াছে। এ আহ্বানধ্বনি ভারতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত রাজনীতিজ্ঞগণ ও দেশহিতৈষীগণ বহু আন্দোলনে ব্যাপৃত। কিন্তু নারীজাগরণ—যাহা ভিন্ন দেশের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নহে সে বিষয়ে কয়-জনের দৃষ্টি পড়িয়াছে? নারীজাতির শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কয়জনের হৃদয় বিগলিত হইয়াছে?

নারীর জাগরণই যে জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত তাহার দৃষ্টান্ত আমরা বর্ত্তমান কালে চীন, জাপান, তুরস্ক ইত্যাদি দেশে দেখিতেছি। আমার মনে হয় নারীজাগরণ আনয়ন করিবার পক্ষে নারীশিক্ষাই প্রকৃষ্ট উপায়। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতেছি যে এই সাধু সঙ্কল্পে সহায়তা লাভ করা দূরে থাকুক, কোন কোন স্থলে নারীকে প্রতিবন্ধকতারই সম্মুখীন হইতে হয়। কারণ নারী শিক্ষিতা হইয়া পুরুষের সহিত সমান-পদ অধিকার করিবে, কেহ কেহ এই অভিলাষকে দুঃসাহসিকতা বলিয়া মনে করেন,—ইঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কেহ কেহ বা নারী শিক্ষালাভ করিলে তাহার নারীজনোচিত বৃত্তিসকল লুপ্ত হইয়া তথায় ভোগবিলাসপ্রিয়তা ও স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া পড়িবে এই অমূলক ভীতি পোষণ করেন। ইহারা বিস্মৃত হন যে শিক্ষালাভ করিয়াই নারী তাহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইবে। শিক্ষা যেরূপ নারীকে স্বাধীন চিন্তা, সৎসাহস দান করিবে, সেইরূপ চরিত্রের মাধুর্য্য ও জীবনের মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতে সহায়তা করিবে। শিক্ষা হইতেই নারী সংসারের বিষমসঙ্কুল পথে চলিবার পাথেয় সংগ্রহ করিবে। নারী শিক্ষালাভ করিলে পারিবা-রিক, সামাজিক ও দেশীয় মঙ্গলসাধনে নিরত থাকিবে। বলা বাহুল্য, নিরক্ষরা নারীর দ্বারা সমাজের কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। ভারতবর্ষ এই জাতীর সমকক্ষতার দিনে—এই survival of the fittestএর দিনে, অপ-রাপর সভ্যজাতি যাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ সমভাবে জাতীয় মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত, তাহাদের সহিত সমকক্ষতা কিরূপে করিবে? এক্ষণে নারী-পুরুষের সংখ্যায় পূর্ণশক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে কিন্তু কার্য্যতঃ নারীকে নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতারূপ পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখিয়া বাকী অর্দ্ধ-সমাজ দেশ উদ্ধার করিতে বাসনা করিয়াছেন। ইহা কিরূপ

যুক্তিসঙ্গত তাহা ভাবিবার বিষয়। নারীজাতি মাতৃজাতি; ইহারা অজ্ঞানতার তিমিরে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া থাকিলে দেশের পরবর্ত্তী বংশধরগণের যে উন্নত হইবার আশা নাই ইহা অতীব সত্য।

কথায় আমরা বলি "Great men have great mothers." শিশু মাতৃক্রোড়ে যে শিক্ষা ও সংস্কার লাভ করে উত্তরকালে কোন ক্রমেই তাহাদের বিলোপ হয় না। শিশুর কমনীয় হৃদ্‌বৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত করিতে, শিশুর কোমল হৃদয়ে দেশপ্রেমের বীজ বপন করিতে জননী ভিন্ন আর কে সমর্থ? অশিক্ষিতা জননীর নিকট কিন্তু শিশুর কুনীতি, কু-অভ্যাস ও কুসংস্কার শিক্ষা করিবারই সম্ভাবনা অধিক। এককথায় বলা যায় যে কোন দেশের জাতীয় উন্নতি সেদেশ শিশু-সন্তানের ভিতর দিয়া ঐ দেশস্থ প্রতিগৃহের জননীর উপর নির্ভর করে। জাতিসংগঠনে আমাদের এই যে দারিদ্র, শিক্ষার অভাবে ইহা আমরা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আপন গৃহে গৃহকার্য্য ও সন্তানপালন ভিন্ন নারীর নিমিত্তও যে পৃথিবীতে সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত আছে এক্ষণে ইহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যজাতীয় নারীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়া ইঁহারা কিরূপ আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছেন। শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিল্প, বাণিজ্য সর্ব্ব বিভাগেই ইঁহারা পুরুষের সহিত সমকক্ষভাবে কার্য্য করিতেছেন—কোন কার্য্যেই ইঁহারা পশ্চাদ্‌পদ নহেন।

ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে নারী তাহার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত—নারী মূর্খ ও হেয় বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে নারীর মূর্খতার, নিরক্ষরতার জন্য পুরুষই কি অনেকাংশে দায়ী নহেন? পিতা পুত্র সম্বন্ধে বহু উচ্চাশা পোষণ করেন কিন্তু কন্যাসন্তানকে শৈশবেই বিবাহ দিয়া সকল দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। শিক্ষার আলোকদানে নারীকে অজ্ঞান-তিমির হইতে পরিত্রাণ করিলে দেখা যাইবে যে নারী পুরুষাপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। অধুনা অন্যান্য সভ্যজাতীয় নারীর অপেক্ষা আমাদের হীনাবস্থার কারণ আমাদের শিক্ষার অভাব ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা। নারীনির্য্যাতন বিষয়ে আমাদের ঘোসলেম ভ্রাতাগণ যে হিন্দু ভ্রাতাদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন এ প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহারা নারীকে অবরোধের কঠিন কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া আভিজাত্যের গৌরব অনুভব করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অবরোধপ্রথা নারীজাতির স্বাস্থ্য, বিদ্যা, জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব লাভের কিরূপ অন্তরায়, সমাজের পক্ষে ইহা কত অনিষ্টকর তাহা কেহ চিন্তা করেন না। অবরোধের এই নিষ্পেষণে প্রতিনিয়ত কত মোসলেম নারী ভিল ভিল করিয়া দৈহিক ও মানসিক মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে কে তাহার সংবাদ রাখে? শিক্ষার দৈন্যতার দরুণ আমরা সর্ব্বপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। এ দেশে শিশুমৃত্যুর হার অপরাপর দেশের তুলনায় অনেক অধিক। কারণ এ দেশের হতভাগ্য জননীদের ভাগ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও সন্তানপালন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ ঘটে না। অতঃপর দেখুন, স্বাস্থ্য-সম্বলবিহীন স্ত্রীলোক শিক্ষাভাবের দরুণ স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনে অসমর্থ হইয়া পরগৃহে অবস্থান করে; দুর্ভাগ্য অন্নের নিমিত্ত ইহারা কি বিষম নির্য্যাতন ভোগ করে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এ দেশের ধারবনিতাগণের অধিকাংশই অন্নসংস্থানের নিমিত্ত এই ঘৃণ্য বৃত্তি অবলম্বন করে। এখানেও শিক্ষার অভাব আসিয়া পড়ে। আবার এক শ্রেণীর লোক আমাদের দেশে আছে, ভিক্ষাবৃত্তিই যাহাদের একমাত্র পেশা। শিক্ষাদান করিয়াই ইহাদের পরিশ্রমবিমুখ দেহ-মনকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে—সৎপথে থাকিয়া জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় শিক্ষা করাইতে হইবে। নারীশিক্ষা বিস্তৃত হইলেই দেশ জ্ঞানলাভ, স্বাস্থ্যলাভ, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই উন্নত হইবে ও দেশের অধিকাংশ অনিষ্টের মূলে কুঠারাঘাত হইবে। বিদ্যাশিক্ষা বলিতে যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কিত উপাধি বোঝায় তাহা নহে। যে শিক্ষা নারীসুলভ বৃত্তিগুলি বিলুপ্ত না করিয়া তাহাকে কার্য্যক্ষম, সরল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবে—যাহা হইতে নারী স্বাবলম্বন, পরিহিতব্রত ও দেশপ্রেম লাভ করিবে সেই-ই শিক্ষা; যে শিক্ষা নারীকে উপযুক্তা জননী ও প্রকৃতপক্ষে সহধর্ম্মিণী করিয়া গঠিত করিবে—যে শিক্ষা নারীকে জ্ঞান, সত্য, আনন্দ ও মুক্তির আলোক দান করিবে সেই-ই শিক্ষা। এই শিক্ষার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া দেশের আপামর সাধারণের মনে জ্ঞানপিপাসা জাগাইতে হইবে।

দোসর

শ্রী সতীশ রায়

(৯)

বিশ্বেশ্বরীর শেফালিকে বড় ভাল লাগিয়াছে। তাঁর কন্যা অনীতার মৃত্যু হওয়ায় গৃহ যেন একেবারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। যে খাটখানিতে সে শুইত, যে আলনায় সে কাপড় রাখিত, যে মশলার চটি পরিয়া কোঁকড়া চুলের রাশ দুলাইয়া হাসিয়া খেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত—সব-ই আছে, কেবল মানুষটি নাই।

কন্যার মৃত্যুর প্রথম শোকাবেগ কমিলে তিনি তার ব্যবহারের জিনিষগুলি, তার বইগুলি একটি ঘরে সযত্নে মিউজিয়ামের মত সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঘরটি বন্ধই থাকিত,—মাঝে মাঝে খুলিয়া জিনিষপত্রের ধূলা তিনি স্বহস্তে ঝাড়িয়া রাখিতেন।

ভবতোষ বাবুও তাঁহার খেয়ালে কোনোদিন বাধা দেন নাই। যদি তাঁর মেয়ের ঘরটির জিনিষগুলা নাড়িয়া চাড়িয়াই তিনি সান্ত্বনা পান, তাহাতে তিনিই বা বাধা দিবেন কেন?

কিন্তু জীবিত মানুষ স্মৃতির শ্মশানে বেশী দিন কাটাইতে পারে না। ক্রমে ছেলেটির আশা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-পূরণই তাঁহার জীবনযাপনের একটি উপলক্ষ্য হইয়া উঠিল।

ছেলেটি তার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে সব জিনিষই শীঘ্র শীঘ্র আয়ত্ত করিতে শিখিল,—শিখিল না কেবল আত্ম-সংযম। যাহা সে দাবী করিবে তাহাতেই যেন তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার। কাহারো মঙ্গলের জন্য নিজের ইচ্ছার অপ্রতিহত গতি রুদ্ধ করিতে সে রাজি নয়।

সন্তানের মনে কোন বাসনা ভাল করিয়া জাগিবার পূর্ব্বেই উৎসুক বিশ্বেশ্বরী সযত্নে তাহা আবিষ্কার করিতেন, এবং যে কোনো উপায়ে তাহা পূরণ করিয়া তিনি যেন একমাত্র কন্যালোকের সান্ত্বনা পাইতেন।

কিন্তু সেও ত অধিকাংশ সময় মা'র কাছে থাকিতে পায় না—মেডিকেল কলেজে পড়িবার জন্য তাহাকে কলিকাতায় হষ্টেলে থাকিতে হয়। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার দিন কাটে!

ভবতোষ বাবু ত বেশ তাঁহার মামলামকদ্দমার নথি-পত্রের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া, অনায়াসে দিন কাটাইয়া দিতেছেন। এত যে টাকা-রোজগারের নেশায় ডুবিয়া আছেন, তাহার সার্থকতা কিসে হইবে?

তাই শেফালিকে দেখিয়া মেয়ে-হারানোর বিরহ তাঁহার প্রাণে নূতন করিয়া বাজিল। মেয়েটিকে বউ করিতে পারিলে ত বেশ হয়! কেমন নম্র, লাজুক, সুন্দর মেয়েটি! কেমন চমৎকার গান শিখিয়াছে! উহাকে তিনি তাঁহার সব চেয়ে দামী সাড়ীগুলি একে একে কল্পনায় পরাইয়া দিলেন। তাঁহার হীরার ব্রেসলেটটা হাতে দিয়া, তাঁহার মুক্তার নেকলেসটি গলায় পরিয়া সে তাঁহাকে প্রণাম করিবে! তাহার পায়ে তিনি কাঁটাটি ফুটিতে দিবেন না। তাঁর একটি ছেলের বউ,—তাহাকে তিনি বুকের মধ্যে করিয়া রাখিবেন! ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের ত টাকার অভাব নাই, তবে আর এত ভাবনা কিসের? সে হারমো-নিয়ম বাজাইয়া গান করিবে, তিনি শুনিবেন। তিনি তাহার চুল বাঁধিয়া দিবেন, সাজপোষাক পরাইবেন; তাহাকে সাজান গোছানই যেন দিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ হইবে।

সে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে—অনীতার হারানো ডাক ছেলের বৌয়ের মুখে শুনিলে তাঁর প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে। মেয়েটি আর দিনকতক পরে আই-এ পাশ করিবে—বাঙালী হিন্দু ঘরে তাই যথেষ্ট। ইংরাজি লেখা-পড়া অনেক শিখিয়াছে, উঁহাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইবে। আর তাঁহার একলা ঘরের সঙ্গিনী হইবে। বিশ্বেশ্বরীর মনের সবখানি শেফালি এক মুহূর্ত্তে জুড়িয়া বসিল।

হায়! জীবনের মেলায় মৃত্তের আসন কত ধীরে ধীরে সরিয়া যায়!...মানুষের মনের বুভুক্ষার ত তৃপ্তি নাই, সে ঠিক তাহার অভাবের স্থান-পূরণের প্রতিনিধি ঠিক করিয়া লয়। যাহাকে ছাড়িয়া জীবনধারণ কল্পনা করা পর্য্যন্ত অসম্ভব—কালের নিয়মে সেও ক্রমশঃ জীবিতের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। মানুষের মন আবার ব্যগ্র হইয়া নূতন অবলম্বন খুঁজিতে থাকে। তাহাকে আবার আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-সাধে ফিরিয়া নিজের মনের মৃত্যু মিটাইতে অগ্রসর হইতে হয়।

সঞ্জীব মেয়েটির প্রতি যেমন মনোযোগ দেখাইল, তাহাতে ত মনে হয় সে তাহাকে অপছন্দ করে নাই। আর তরুণ বয়সে মানুষের মন যেন চুম্বক ও লোহার মত—তখনকার পরস্পরের মধ্যে প্রীতির আকর্ষণ স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

তাঁহার বিবাহের প্রথম মাসগুলির কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় মুখে হাসি আসিল, চোখে দুফোঁটা অশ্রুবিন্দুও দেখা দিল। তাঁহার প্রতি অমনোযোগী এই যে গম্ভীর মানুষটি কিসে আরো টাকা হইবে আজ এই ভাবনায় ঘুরিতেছেন, একদিন তাঁহার মনের সব ভাবনাটুকু তিনিই ত অধিকার করিয়াছিলেন। কতদিন, হঠাৎ দুপুরে মাথাধরার অছিলায় কোর্ট হইতে তিনি সকাল সকাল চলিয়া আসিয়াছেন। অভিকলোনের জলপটি মাথায় দিতে দিতে কখন তাহার হাতখানি হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া, আঙুলে আঙুল জড়াইয়া তাহার লজ্জিত, আরক্ত মুখের পানে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া আজিকার এই গম্ভীর উকীলটি কত ছেলেমানুষি প্রলাপই না অন্তরের আবেগে বলিয়া যাইতেন! অধিকাংশ কথায় তাঁহার বড় হাসি আসিত—তিনি যে সাধারণ হইতে এত স্বতন্ত্র, এত পৃথক, এ তিনি কোনো মতে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু সেই তোষামোদ পরম আনন্দে উপভোগ করিতেন। অথচ তখন টাকা ছিল না। কিন্তু সামান্য অভাবের কষ্টও যৌবনের সেই আনন্দময় দিনগুলির উপর ছায়াপাত করিতে পারিত না।

এত দামী সোনার গহনাও তখন তিনি পরিতে পান নাই; কিন্তু সেজন্য তাঁহার মনে ত তখন কোনো ক্ষোভ ছিল না। স্বর্গময় যৌবনে, ভালোবাসার সোনার কাঠির স্পর্শে, এই বিশ্বের তুচ্ছতম জিনিষও তাঁহার কাছে সোনার অপেক্ষা বেশী মূল্যবান বোধ হইত। হায়! সে স্বর্গময়, আনন্দময় দিনগুলি এখন গেল কোথায়?...আর তাঁহার সখীটি—অন্নপূর্ণার সহিত তাঁহার যেন একযুগ পরে দেখা হইল।

বিদেশে থাকিলে, আত্মীয়পরিজনের সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ না থাকায় মন সেরূপ সঙ্কীর্ণ হইতে পারে না। বহুদিন পরে ছেলেবেলার সখী অন্নপূর্ণার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বিশ্বেশ্বরী যেন আকাশে চাঁদ হাতে পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের অল্প বয়সের অকৃত্রিম সখিত্বের স্মৃতিতে কোনোরূপ হীনতা স্পর্শ করে নাই। গ্রীষ্মাবকাশের পর যখন একে একে সকলেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেল, তখন তাঁহার মন আবার এক বিরাট শূন্যতায় ভরিয়া গেল।

এক ছুটির দিনের দুপুর বেলায় ভবতোষ বাবু যেখানে বিশ্রামের পর ইজিচেয়ারে শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, সেইখানে তাঁহার পায়ের কাছে একটি ছোট কুশানের উপর বিশ্বেশ্বরী বসিয়া পড়িলেন। নিজ্জনতার শুরুভার তাঁহার স্ত্রীকে কিরূপ পীড়িত করে, তাহা তাঁহার সহানুভূতির কাছে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। বিশেষ করিয়া সেদিন আকাশে বড় মেঘ করিয়াছিল।—যৌবনে, কর্ম্মহীন বর্ষা-দিনের শূন্য ঘরে প্রিয়াকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রৌঢ়ত্বের ভিতরও প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল—যদিও তাহার ভিতর যৌবনের সে আবেগ ও ব্যাকুলতা আর ছিল না। ভবতোষ বাবু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, খবরের কাগজখানা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "ব'সে ব'সে তোমার কথাই ভাবছিলাম, তা' আজ অধীনের উপর মহারাণীর এতটা কৃপা হ'ল যে? স্মরণ করলেই ত হুজুরে হাজির হ'তাম!"

বিশ্বেশ্বরী উঠিয়া গিয়া পরদাটা ভাল করিয়া টানিয়া দিলেন, হাত নাড়িয়া বলিলেন, "যেয় হ'য়েছে—এত সৌভাগ্য আমার কপালে সইবে না! বাড়ীর ভিতর একলা প'ড়ে থাকি, ডেকে একবার খোঁজও নাও না লোকটা মরেছে কি বেঁচে আছে!" বলিয়া তিনি ফোঁস করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এ ভঙ্গীটি কোনো একটি আবদারের পূর্ব্বাভাস। ভবতোষ বাবু তাঁর স্ত্রীর ভাবভঙ্গীর সহিত পরিচিত ছিলেন।

উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "তোমার সই কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন না কি?"

ইতিমধ্যে বিশ্বেশ্বরী তাঁহাদের বাড়ীতে প্রীতিভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। ওখানকার পরিচিত কয়েকটি পরিবারেও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। অন্নপূর্ণা এবং ছেলেমেয়েরাও বাদ যায় নাই।

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, "হ্যাঁ তাঁরা ত অনেকদিন ফিরেছেন। মনটা বড় খালি হ'য়ে গেছে। চিরদিন আর একলা থাকতে কি ভালো লাগে? সজীবের ত বিয়ের বয়েস হয়েছে,—বিয়ে দিয়ে কবে? বউ এনে দাও—অনীতার শূন্য ঘর আর দেখতে পারছি না!"

"ছেলে কি বিয়ে করতে চাইবে? আজকাল ছেলেদের যে নতুন ধুয়ো উঠেছে—তারা নিজে স্বাধীন, উপার্জনক্ষম না হ'য়ে বিয়ে করতে চায় না যে!"

"সে আমি বুঝব'খন। ছেলেকে রাজি করানোর ভার আমার উপর। আমরা বেঁচে থাকতে বৌ-এর খাওয়া-পরার ভাবনা ছেলেকে ভাবতে হবে না।"

"আরো দিন কতক যাক্‌না, সজীব ডাক্তারিটা পাশ করুক, তার পর না হয় দেওয়া যাবে। ইতিমধ্যে মেয়ে দেখা চলতে থাকুক। দেশে চিঠি লিখে দিই—ভালো মেয়ে খোঁজ করুক তারা!"

"তোমাকে কিন্তু একটা কথা বলেই, তুমি কেবল কাজের অছিলায় দেরী করতে বল। সজীবের এই চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হ'ল, তোমার ও বয়সে যে আমার প্রথম সন্তান হ'য়ে মারা যায়…" বিশ্বেশ্বরী যাহাতে মন স্থির করিতেন তাহাতে বিলম্ব কিংবা প্রতিবাদে আরো অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেন।

ভবতোষ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে যে মেয়ে-দেখা কাজটা তুমিই মিটিয়ে ফেলেছ। এ কোল-সাঁওতালের দেশে কোন্ কন্যাকে যে পছন্দ করলে ভেবে উঠতে পারছি না!"

"আচ্ছা, অনুমান কর ত! দেখি—আমার সঙ্গে মেলে কি না।"

ভবতোষ বাবু খানিক গম্ভীরভাবে ভাবিবার ভাণ করিয়া বলিলেন, "উপলী!"

উপলী একটি ওঁরাও মেয়ে, কালো পাথরে কোঁদা নিটোল গড়নের, ১৭।১৮ বছর বয়েস; তাঁহাদের বাড়ীতে দাসীর কাজ করে।

ক্রত্রিম কোপে বিশ্বেশ্বরী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "অ আমার পোড়াকপাল! কোল মেয়ে হবে আমার ছেলের বৌ? তোমার অলক্ষুণে ঠাট্টা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে। বাংলা দেশের যে-কোন ধনীঘরের মেয়ের মা আমার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে ভাগ্য ব'লে মানবে তা' জান তুমি?"

পুত্রগর্ব্বে বিশ্বেশ্বরীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—"বি-এস্‌সি পাশ করবার পর কত ভালো ভালো সম্বন্ধ এল, তুমি ত তাদের সব ফিরিয়ে দিলে।"

"তা হ'লে তুমি-ই বল সে কে—যাকে পুত্রবধূ করবার জন্যে তোমার এত সাধ হয়েছে।"

"এই ত কাজের কথা; এতক্ষণ ঠাট্টা ক'রে সব উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলে!" বিশ্বেশ্বরীর মুখচ্ছবি প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "যখন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, কেবল তোমাকেই বিয়ে করেছিলুম, ঠাট্টা করবার সম্পর্কের একজন শালী পর্য্যন্ত পাইনি, এমনি দুর্ভাগা। শ্বশুরমশায় আমাকে কেবল স্ত্রীটিকে দিয়েছিলেন—কিছুই কাউ দেন নি! এখন তুমি ছাড়া আর সঙ্গে ঠাট্টা করি বল দেখি নি?"

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, খুব হয়েছে! এখন একটু চুপ ক'রে শোন দেখি—বাজে কথা রেখে কাজের কথা হোক।"

"তুমি ত Now to business ব'লে ডাকছ; আমাকে মাসের মধ্যে সব দিনগুলোই শুধু কাজের কথা নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হয়, এর মধ্যে একটু বাজে কথা বলবার অবসর পেলে আমি বেঁচে যাই! ছুটির আনন্দ পুরোপুরি ভোগ করতে পাই।"

বিশ্বেশ্বরী খুসী হইয়া উঠিলেন। তাহা হইলে তাঁহার সেই আগেকার দিনের হাস্যতরল সরল স্বামীটি কাজের গোলকধাঁধায় একেবারে হারাইয়া যান নাই—তা' তিনি বাহিরে এতকাল যত গম্ভীরতার ভাণই করুন না কেন। সরল কথাবার্ত্তার ভিতরে তিনি যেন আবার সেই পুরানো দিনগুলির ছবি দেখিতে লাগিলেন।

সরোজনলিনী দত্ত নারী শ্মরণ সমিতির পরিচালক সভার সভাপতি

সন্তোষের রাজা

মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী, এম, এল, সি

"তুমি জান বোধ হয়, সেদিন যিনি আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলেন তিনি আমার ছেলেবেলার সখী—আমরা দুজনে একসঙ্গে শিব-পূজা করেছি! ছেলে-বেলায় পুতুলের বিয়ে দেবার সময় আমরা পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে, ভবিষ্যতে যখন আমাদের ছেলেমেয়ে হবে, আমরা তাদের বিয়ে দিয়ে আমাদের সখিত্ব অটুট রাখব।"

ভবতোষ বাবু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে, সামাজিক কাজের মধ্যে, তোমাদের সে অনাবিল স্বার্থশূন্য সখিত্ব-বন্ধন কি অটুট থাকবে মনে কর?"

"কেন নয়? আমাদের ত সে রকম দাবী-দাওয়া নেই! আর ওঁদের অবস্থা এমন কিছু মন্দ নয় যে কিছুই দিতে পারবেন না। আর আমার সইয়ের মেয়েটিকেও ত দেখেছ?—রংয়ের সে রকম জলুষ না থাকলেও মুখখানি কেমন চলচলে—একটা আলাদা শ্রী আছে। ছোট্ট এত-টুকু কপালের তলায় ভুরু আর চোখের পাতাগুলি যেন তুলি দিয়ে আঁকা। ওর বাবাও নেহাৎ যে-সে লোক ছিলেন না,—তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। সুখ-সম্পদের মুখ ওরাও দেখেছে একদিন, আজ না হয় কালের চক্রে প'ড়ে গরীব হ'য়ে পড়েছে!"

নিজে গরীবভাবে জীবন আরম্ভ করিয়া নিজের চেষ্টায় ভবতোষ বাবু এত বড় হইয়াছেন। তাই টাকা জিনিষ-টাকে তিনি মানুষের জীবনে একটি বড় স্থান দিতেন। তিনি যখন শুনিলেন যে অন্নপূর্ণার তেমন বিশেষ কিছু টাকাকড়ি নাই, তখন তাঁহার মন স্বভাবতঃই বিমুখ হইয়া উঠিল। তথাপি তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে তুমি ত অনেক কাজ মিটিয়ে রেখেছ, বল! যখন মেয়েও পছন্দ হ'য়েছে, সবকিছু মনোনীত হয়েছে, তখন আবার এর মধ্যে উকীলের পরামর্শ নেবার দরকার হ'চ্ছে কেন?"

বিশ্বেশ্বরী বুঝিলেন—এ রাগের কথা। হাসিয়া বলিলেন, "নির্বাচনটা ঠিক ন্যায়-সঙ্গত হ'ল কি না, এ ত উকীলেই দেখবে!"

"বাঙালী পরিবারে এসব বিষয়ে গৃহিণীই কর্ত্তাকে যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে থাকেন।—তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে আর কোথাও আপীল করা চলে না।"

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, "বিশেষতঃ ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনা ব্যাপারে। বউ নিয়ে ত আর দিনরাত তোমাদের ঘর করতে হয় না, করতে হয় গৃহিণীদের! কাজেই তাদের মনের মত বউই তো চাই-ই।

কর্ত্তা মুহূর্তকাল বলিলেন, "তাও আর বেশী দিন নয়, সেখানেও মনের টানাটানি আর বেশী দিন টিকছে না; এখন একতরফা ডিক্রি হবে—

"গিন্নি-কর্ত্তা নয় বিধাতা—
রাখবে নিজের পণ,
মন জিনে' যে আসন লবে
সে-ই মনের মতন।"

বলিয়া কর্ত্তা চুপ করিলেন।

"এত ছড়া আবার শিখলে কোথা থেকে! যাই হোক এখন তোমার মন কি বলে তাই শুনি, পরে তার মন নিয়ে আসল করবার তার সঙ্গে বোঝাপড়া করব।"

কর্ত্তা 'তথাস্তু' বলিয়া গিন্নির কাঁধের উপর দুই হাতটি রাখিয়া আদরের সঙ্গে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে লাগিলেন।

বাহিরে তখন ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। বাদলীর মত কলরবে, শিখীর ঘুমাগত মুদন কেকায়, বর্ষা-সমারোহে, আকাশ-ধরণী মিলনাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

বিশ্বেশ্বরী ধীরে ধীরে স্বামীর উরুর 'পরে মাথা রাখিলেন। হারানো কন্যার বিচ্ছেদ-বেদনা, সন্তীবের ভবিষ্যৎ সুখ-কল্পনা ও স্বামীর গভীর স্নেহ-আদর যুগপৎ মিশ্রিত হইয়া বিশ্বেশ্বরীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

(১৪)

সুধীর এবং অশোক দুই বন্ধুতে যে কলেজে বি-এ পড়িত, হরমোহন ছিলেন সেই কলেজের অধ্যাপক। সুধীরের কাছে এই অল্পদিনের জীবনে ফেল কাটানর মত সহজ কাজ আর কিছুই নাই। এ বিষয়ে সে হরমোহনেরই চেলা ছিল। সংসারের গভীর কাজের লোকদের দেখিয়া তাহাদের উপরেই হাসি পাইত। ছেলেদের সঙ্গে সমান

হাসোপরিহাসে অবসর-কাটানর উত্তরের বয়স এবং পূর্ব-মর্যাদার কোনোই হানি হইত না।

সুধীরের মন চিন্তা-কষ্ট-হীন সুখ-সৌভাগ্যে ভরা ছিল,—তাই প্রচলিত প্রায় কিছুর উপরই তার শ্রদ্ধা ছিল না, এবং কাহাকেও ভয় করিত না। আত্মীয়সম্পর্কিত গুরু-জনদের মান্য করা না করা তাহার বিবেচনার মধ্যে ছিল। সে বলিত, "উনি বয়সে বড় ব'লেই যে আমার শ্রদ্ধার পাত্র এমন কিছু নয়। বয়সে বড় আত্মীয়-গুরুজন—ও ত একটা accident of birth! দু' দিন আগে-পরে পৃথিবীতে আসায় যে উনি বড় আর আমি ছোট—এমন কিছু প্রমাণ হয় না,—যেহেতু এ বিষয়ে আমাদের দু'জনেরই কিছু হাত নেই।"

তাহার দেহ বিপুল স্বাস্থ্যে এবং মন প্রচুর জীবনানন্দে ঝলমল করিত। তাহার ঋজু শরীর, যাহা একটু মোটা হইয়া পড়িতেছিল—দেখিয়া মনে হইত যে উহা যথেষ্ট শক্তি এবং দুর্দ্দমনীয় মানসিক বাষ্পবেগে অহরহ চঞ্চল। তাহার বিপুল দেহে, বিশাল বক্ষে এবং স্থূল মাংসপেশীতে যথেষ্ট শক্তি ছিল। আবার গোলগাল মুখে, অল্প কুঁকিয়া পড়া নাকে এবং নীলাভ চক্ষুর দ্রুত স্পন্দনে তাহাকে হাস্য-রসিক বলিয়া মনে হইত। সে জগতের সুখদুঃখ আশা-নিরাশার অন্তরালে আনন্দের সংবাদ পাইত—যে দেশের অধিকাংশ লোক দুঃখবাদী, সেখানে সে ছিল পূর্ণ আনন্দবাদী।

সুধীর জীবনের পূর্ণ উপভোগের কেবল সুযোগ খুঁজিত। জীবন-যাত্রায় সে এক বে-পরোয়া ভবঘুরে। পৃথিবীতে সে যে প্রাণ লইয়া জন্মিয়াছে তাহাই প্রমাণ করিতে সব সময়ে উৎসুক। দশ জনের সামাজ খাওয়া-পরা, ঘর-সংসার পাতা, অবস্থার উন্নতি করাকে অতিক্রম করিয়া সে একটা নূতন কিছু করিবে এই তাহার মতলব ছিল।

অশোক রাঁচি হইতে ফিরিয়া গেল। দিনকতক অনবরত বৃষ্টির পর বিকালের দিকে মেঘ কাটিয়া গিয়া রোদ দেখা দিয়াছিল। বর্ষাজলচিক্কণ শ্যামল পল্লবের উপর বহু-দিন-বাঞ্ছিত রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করিতেছিল। ক্ষণিক বিরহ-অবসানে যেমন নিবিড় মিলন-ব্যাকুলতা প্রণয়িনীকে অভিভূত করিয়া ফেলে, ধরণীকে সেইরূপ আনন্দ-উচ্ছ্বল দেখাইতেছিল। সুধীর ও অশোক আজ অনেকদিন বৃষ্টির জন্য ঘরে বন্ধ হইয়া থাকায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ক্লান্ত-বর্ষণ সন্ধ্যায় দু'জনে মিলিয়া ইডেন গার্ডেনের দিকে বেড়াইতে গিয়াছে।

মাঠের খোলা হাওয়ায় দুইজনে খুসী হইয়া উঠিল। সুধীর বলিল, "তুমি আজকাল মন খুলে একটা কথা বল না, কি হয়েছে তোমার বল দেখি? আর এত গম্ভীর হ'য়ে পড়েছ।...স্বাস্থ্যকর জায়গায় লোকে শরীর সারাবার জন্যে যায়—তুমি রাঁচি থেকে এলে যেন অসুখ থেকে উঠে এসেছ।"

বাস্তবিকই অশোকের শরীর-মন ভাল ছিল না। যৌবনের দ্বিতিস্থাপকতায় মানুষের মনের ব্যথা সহজে আরাম হইয়া যায়; কিন্তু সে কিছুতেই সেফালিকে ভুলিতে পারিতেছিল না।

অশোক বলিল, "তোমাকে ত সব বলেছি বন্ধু! যা' পেয়েছিলাম তা' হারাতে হ'ল। আলো থেকে অন্ধকারে, জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাত দেশে এসে পড়লাম। যে ভাল-বাসা একদিন পেয়েছি মনে করেছিলাম হঠাৎ একদিন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে চমকে জেগে উঠে দেখ্‌লাম, তা' আমার জন্যে নয়! বল্ল এর চেয়ে আমার কি বেশী ক্ষতি করতে পারত!"

অশোকের উচ্ছ্বাসে সুধীরের মনে মনে হাসি পাইয়া-ছিল। কিন্তু তাহার মনে শরীরের তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম সহানুভূতি-বোধ ছিল, তাই সে সান্ত্বনার সুরে বলিল, "ছিঃ অশোক! তুমি ভারি সেন্টিমেন্টাল। তোমার ভালবাসায় যেন যেরকমও নেই, তারি দুর্ব্বল তুমি। মনটাকে একটু সবল কর। আজ হয় ত সে তোমার প্রতি বিমুখ,—কিন্তু কাল তা'র মন ফিরতে পারে। আর সময়টা কি? পত-পাখীর মিলনের জন্যে আজ-কাল ছাড়া আর সময় নেই,—কিন্তু মানুষের জন্যে ত অনন্তকাল রয়েছে। ব্রাউনিংয়ের এই কবিতাটা পড়নি কি?—

"You will love me yet! And I can tarry,
Your love's protracted, growing.

June roared that bunch of flowers you carry
From the seeds of April's sowing !"

অশোক হাসিয়া বলিল, "তুমি ত ব্রাউনিং নিয়ে মশগুল হয়ে আছ ;—জীবনে এত অসম্ভব স্বপ্নের আকাশ-কুসুমও এই কবিটি দেখেছেন ! মৃত্যু ত তাঁর জীবনের শেষ নয়, আর আত্মার কথা ছেড়ে দাও—তা'র ত মরণের বালাই নেই।"

সুধীর গর্ব্বিতভাবে বলিল, "এই দেখ আমি যেমন দেশকে ভালবাসি !...তুমি শেফালির ক্ষুদ্র উপেক্ষায় কত কাতর হও, আর আমার ভালবাসা এত বিরাট, এত উদার যে তার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের অবহেলা, উপেক্ষা এত ছোট যে চোখে পড়ে না। দেশকে 'আমার' বলা হয় ত এ জন্মে হবে না ; কিন্তু তাই ব'লে কি তার আশা আমি ছেড়ে দেব ? তার জন্যে অপেক্ষা করবার, তাকে ভালবাসবার অধিকার অর্জ্জন করবার অসীম ধৈর্য্য আমার মধ্যে আছে।"

অশোক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাব যেমন ভূদেহ অন্তর্গূঢ় ব্যথায় আন্দোলিত হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, তেমনিভাবে বলিয়া চলিল,—"কোনো ব্যক্তিবিশেষের মন জয় করার আমার আর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। আমার ভালবাসার প্রবল বন্যা একটা মানুষের এতটুকু মনের মধ্যে আটকা প'ড়ে থাকতে পারে না। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে আমার প্রেমের পরিণতি ! সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা তার স্বপ্ন ! বিশ্বের সমস্ত সভ্যজাতির সঙ্গে সমানতালে পা মিলিয়ে চলা তার জয়যাত্রা !"

বলিতে বলিতে তাহার বুক দুলিয়া উঠিল, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইল, উত্তেজনায় গৌরবর্ণ মুখ লাল হইয়া উঠিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল।

এই উলঙ্গ বেশাব্রুবোধের সাম্নে অশোকের পরিহাসের হাসি আপনা হইতে মিলাইয়া গেল। সে চকিতে বুঝিতে পারিল, যে, কোন গূঢ় কল্পনাপ্রবণ চিত্তের গোপন প্রেরণায়, বাহিরে আপাতঃ মতভেদ এবং অসঙ্গতি থাকিলেও ভিতরে ভিতরে এক অখণ্ড প্রকৃতি তাহাদের পরস্পরকে বন্ধুত্বের বন্ধনে মিলিত করিয়াছে। তাহার ব্যথায় কেমন একটা সমবেদনা অনুভব করিয়া, সুধীরের কাঁধে হাত রাখিয়া অশোক বলিল, "এস, এই আয়গাটা বেশ নির্জ্জন,—এইখানে বসা যাক্। আচ্ছা, তুমি বলছিলে আমার ভালবাসার কথা খুব সামান্য,—একটা মানুষের প্রীতিতেই তার মনের জঠর ভ'রে যায় !—কিন্তু তা'ত নয়। জগতের সকল শ্রেষ্ঠ ভালবাসার সেই ত উৎস ! সেইখান থেকে পাথেয় সঞ্চয় ক'রে জগতের নব নব কল্যাণের পথে এই মঙ্গল-ধারাটি চলবে,—তার দুই পাশে সোনার ফসল ফলিয়ে, উষর মরুকে উর্ব্বর ক'রে, প্রকৃতির মনোগাত্রকে শ্যামল সম্পদে ভরিয়ে, হাজার ক্ষুৎ-পিপাসাকাতর জীবের সে তৃষ্ণা দূর করবে। আমার মনের মধ্যে প্রেম জাগিয়ে দিল যে তার সৌন্দর্য্য,—সে ত একটা প্রতীকমাত্র। অসীম যে কত সুন্দর, সীমা যেন তাই মোহন অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছে ! তুমি জান, কবিরা বাহিরে যতই নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্যান করুন না কেন, অন্তরে তাঁরা পৌত্তলিক। পৃথিবীময় তাঁরা কেবল শেলির মত Idol of thought বা মানসীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—সেই সুন্দরীর দেখা পেলেই তাঁর পায়ে অন্তরের পূজা-উপচার নিঃশেষে অর্পণ করবেন ব'লে। তোমার স্বদেশ-প্রেমের কোনো বস্তু নেই,—তাই মাঝে মাঝে মনে হয় ওটা আকাশ-কুসুম !"

সুধীর তাহার খদ্দরের পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটাইল। তাহার পেশীবদ্ধ ডান হাতখানি আর এক হাতে ঠুকিয়া বলিল, "আমার স্বদেশ-প্রেম যে কত শক্তিমান সেইদিন বুঝবে, যে দিন আমি এর জন্যে চরম ত্যাগ করব আর হরমোহনবাবুর কাছে আমার এ দেশ-প্রেমের দীক্ষা হয়েছে, এই হিসাবে তিনি আমার গুরু। তাঁর আবার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা !—তুমি যেমন ব্যক্তিবিশেষকে ভালবেসে, শক্তিসঞ্চয় ক'রে, সমগ্রের দিকে অগ্রসর হ'তে চাও, উনি একেবারে সমগ্রকে বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে ধরেছেন ! সকলকে না পেলে ওঁর আর তৃপ্তি নেই ! ওঁর Stake সব চেয়ে বেশী,—এ জন্য ত খোয়াবেনই, কোনো জন্মে সে পণ মুহূর্ত্ত আসবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

অশোক আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছিল সেই ছেলেবেলার পরিহাস-নিপুণ সুধীরের সহিত আজিকার সুধীরের কত

প্রভেদ। যে হরমোহনবাবুর ত্রিসীমানায় সে পারতপক্ষে ঘেঁসিত না, যাঁর মন্দিরের উপদেশের দিন গভীর দার্শনিক তত্ত্ব শুনিবার ভয়ে আধ ঘুরি করিয়া আসিতে পলাইয়া যাইত, সে-ই কেমন করিয়া চিত্ত-জগতে এতদূর অগ্রসর হইল। তাহার বাধভাঙা চপলতা যেন কোন্ অদৃশ্য তটভূমির নিবিড় বাহুবাঁধনে ধরা দিয়াছে—অশোকের সন্দেহ হইতে লাগিল। দেশ-হিতব্রতে হরমোহন হইলেন সুধীরের গুরু; সে কলিকাতায় আসিয়া হরমোহনের কাছে একদিনও যায় নাই। কিন্তু নিজের মনোভাবে সে এত বিভোর ছিল যে সুধীরের সম্বন্ধে বেশী কৌতূহলী হইতে পারিল না।

সে বলিল, "আমি কিন্তু এ ভয় সম্বন্ধেই দ্বিধানিশ্চয় হ'তে পারি। কবির কথা quote ক'রে আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, 'She has lost me, I have gained her. They never lived but I have lived and so I can die.' পৃথিবীর অধিকাংশ জীবনই ত এইরকম অসমাপ্ত,—এই অসমাপ্তির সবো যে অনন্ত আশা ও বাসনা মানুষকে জাগিয়ে রেখেছে, জীবনে এই ত সবচেয়ে বড় লাভ!"

সুধীর উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। তাহার আশঙ্কা কল্পনা করিয়া অশোক হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই তোমার, অত বড় নাটক আমি রচব না; আমি কেবল তোমাকে বোঝাতে চাই, যে, আমি যা খুঁজে পেয়েছি, তা' আমার এই সংক্ষিপ্ত জীবন-যাত্রার পক্ষেই যথেষ্ট পাথেয়। মানুষের এমন কিছু একশ' বছরের বেশী পরমায়ু নেই, যাতে ক'রে তাকে খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে।"

সুধীর সবিস্ময়ে তার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, অযত্ন-বর্দ্ধিত দাড়ি-গোঁফে তাহার তরুণ মুখের নিরাভরণ কাণো হইয়া আছে। মাথার চুল রুক্ষ—মুখের আশে-পাশে বড় হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মাথার মাঝখানে সোজা সিঁথি কাটা—কপাল উজ্জ্বল—চোখ অস্বাভাবিক জ্যোতিতে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে—মুখে কেমন একটা প্রখর নির্লিপ্ত ভাব।

হঠাৎ সুধীরের চোখ ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডার সামনে ব্রীজের রাস্তাটির উপর পড়িল। সে অশোকের হাতে মৃদু চাপ দিয়া বলিল, "দেখ! দেখ! কে যাচ্ছে—মেয়েটিকে তোমার শেফালি ব'লে মনে হচ্ছে না?—আর ও কে?—ও সঞ্জীব! ওই বা ওখানে ছুটল কি ক'রে?"

সুধীর অশোকের মুখের পানে তাকাইলে দেখিতে পাইত, সঞ্জীবকে দেখিয়া এক মুহূর্ত্তে তার মুখের সমস্তভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। এক মিনিট পূর্ব্বে বন্ধুকে প্রবোধ দিবার জন্য যে ব্রাউনিংয়ের কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল সে ধৈর্য্য আর নাই—প্রতিপক্ষকে দেখিলে হিংস্র পশু যেমন অধীর হয় তেমনি তাহার চোখের আগুন থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে!

কিন্তু অশোক সুধীরের দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিল না। সে চাহিয়া দেখিল, শেফালির বেশটি তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত। রাঁচির পাহাড়ের উপর তাহারা যে দিন বেড়াইতে গিয়াছিল, সে দিন যে জরিপাড়ের খদ্দরের চাকাই সাড়ীটি সে পরিয়াছিল,—সে ঘি-রংয়ের মটকার ব্লাউসটি সে গায়ে দিয়াছিল, আজও সেই বেশ।

সঞ্জীবকে সে চিনিত না। হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়া নির্ব্বাক সুধীরকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আর ও ভদ্র-লোকটি কে?—ওকে তুমি চেন?"

সে গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওর নাম সঞ্জীব রাঁচির কোন্ এক বড় উকীলের ছেলে,—মেডিকেল কলেজে fifth yearএ পড়ে।"

অশোকের মুখে কেমন একটা বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল; সে বলিল, "রাঁচি থাকতে শেফালিদের বাড়ীতে গিয়ে শুনেছিলুম, উকীল ভবতোষ বাবুর ছেলের সঙ্গেই ওর বিয়ের ঠিক হ'চ্ছে—সঞ্জীবই বোধ হয় সে।"

সুধীর হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, "তাই নাকি? হাঁ ওর বাপের নাম ভবতোষ সেন! কিন্তু বিয়ের আগে বরকনের পড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়ার মত এতখানি অবাধ-স্বাধীনতা হিন্দু-সমাজে কি দেওয়া উচিত?"

"হয়ত না! কিন্তু হিন্দু-সমাজে মেয়ের বিয়ে কি রকম দায় হ'য়ে পড়েছে, তা বোধ হয় তুমি খবর রাখ না? তাই মেয়ের মা'রা পুরানো দিনের স্বয়ম্বরপ্রথার ব্যাপারটা আবার সমাজে পুনঃ প্রচলন করবার চেষ্টায় লেগে পড়েছেন।"

সুধীর লক্ষ্য করিল, একটা কৌতুক-হাসি অশোকের ঠোঁটের কোণায় কঠিন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, "সেই জন্য আজকাল এদেশে মেয়েদের অন্যান্য শিল্প কলা-প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের মনোহরণ করবার ছলাকলা বিদ্যাও শিখতে হ'চ্ছে বুঝি? এ পশ্চিমের আমদানী। sensitive হৃদয় নিয়ে কিছুর খেলা—পশ্চিম যাকে flirting বলে, আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে তারও অল্পবিস্তর চলন হ'চ্ছে। আর ছিপ ফেল্‌লে যে সব-সময়ে মাছ বঁড়শি গিল্‌বেই, এমনও কিছু নিশ্চয়তা নেই। বাজারের চারের গন্ধে কতক মাছ এসে খানিক ঠোক্‌রাঠুক্‌রি ক'রেও ত চ'লে যেতে পারে! বিলাতী-সমাজে অবিবাহিতা মেয়েদের এসব বিষয় ওরা সে রকম seriously নেয় না। মনোহরণ-বিদ্যা-নিপুণা হ'লে ওদেশে পরিত্যক্তা মেয়েদের সমাজে বিয়ে হওয়াও বিচিত্র নয়, কিন্তু আমাদের সমাজে তা' চল্‌বে কি ক'রে!"

অশোক ম্লান হাসিয়া বলিল, "কালস্য কুটিলা গতি" এ প্রবচনটা শুনেছ ত? অনেক কিছু আগে চলত না, এখন অবস্থা-ভেদে তাও ত চলছে। প্রয়োজন হ'লে আরও কত কি যে চলবে তার কি কিছু স্থিরতা আছে!"

কথাবার্ত্তায় আর অশোকের মন বসিতেছিল না। সঞ্জীবের সহিত শেফালির হঠাৎ উপস্থিতি তাহার মনে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। তাহার বাহির অদ্ভুত-রস তার-ই সামনে পরিবেশিত হইতেছে, আর সে বুদ্ধু ভিক্ষুকের মত দূরে দাঁড়াইয়া! যদি সে শেফালির একান্ত ভালবাসা নিঃশেষে পাইত, এবং উপবাসী সঞ্জীব শেফালির নিকটে সেই ভালবাসার কণা ভিক্ষা করিতেছে দেখিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই উদার মনে বলিতে পারিত, "আমিও তোমাকে ভালবাসি সঞ্জীব, কারণ তুমি আমার শেফালিকে ভালবেসেছ!" কিন্তু এ ত তা নয়, এ যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

তাই যাহাকে দেখিলে তার আনন্দ হয়,—সমস্ত সময় চোখের সামনে বসাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে—এ বেলার যেন আর শেষ নাই—চোখের দেখা শেষ হইয়া যায়—মনের দেখা অন্তকালেও ফুরাইতে চায় না, তাহার উপস্থিতি অশোকের কাছে বিষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যে একটু কথা বলিলে, একটু হাসিলে, তার কানে মুখ প্রকৃতি কথা বলে, চোখে বিশ্বজগৎ হাসিয়া ওঠে, অন্তরে সুখ অনুভব হয়, সার্থকতার আনন্দে বুক ভরিয়া যায়,—বিশ্বের সমস্ত সঙ্গীত যাহার কণ্ঠস্বরে কানের ভিতর দিয়া অন্তরের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে, সে কণ্ঠস্বর তাহার কাছে আজ সাধারণ মেয়ের গলা ছাড়া আর কিছুই মনে হইল না।

তবুও সেখানে তাহারা জনের মাঝে, বন্ধুজনানুরূপেরা বেঞ্চটির উপর তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া ছিল, সেই দিকে হতাশদৃষ্টিতে তাকাইয়া সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার সমস্ত সত্তা যেন উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের দুরুচ্চ মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা অনুধাবন করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় ফিরিতেছিল।

সুধীর বন্ধুর মনোবেদনা এবং অস্থিরতার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিল, "চল হে—ওঠা যাক, সন্ধ্যা হ'য়ে এল। আজকাল আমি আবার boxing clubএ training নিচ্ছি—ফিরতে দেরী হ'য়ে যাবে।

তখন সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু চারিদিকে আলো জ্বলে নাই। অদূরের নিভৃত লতাকুঞ্জ অন্ধকারে নিবিড় হইয়া আসিতেছিল। সুধীরের অনুযোগে অশোক উঠিল বটে, কিন্তু দাঁড়াইল না। সঞ্জীব ও শেফালি যেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিল, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে লাগিল।

সুধীর আশ্চর্য্য হইয়া শুধু একবার সেই দিকে ফিরিয়া তাকাইল—চকিতে দেখিল দুই জন সশস্ত্র গোরা সৈনিক, একজন সঞ্জীবের সহিত বচসা শেষ করিয়া হাতাহাতিতে প্রবৃত্ত, অপরজন শেফালিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অসহায়া শেফালি স্রোতাহত বেতসলতার মত কাঁপিতেছিল। ব্যাপারটি চক্ষের নিমেষে তাহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল।

তাহার ডাম্বেল-পরিপুষ্ট বিশাল বাহুটির এতদিনে সদ্ব্যবহারের সুবিধা হইয়াছে!—আস্তিন গুটাইল। আজ

সে তাহার বন্ধিং শেখার দাম উঠাইয়া লইবে—তাহার পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে :

হঠাৎ ধার্ম্মিক সুধীরের মনে গরিলার মত মুষ্ট যুদ্ধ-প্রবৃত্তি নাচিয়া উঠিল। অশোকের পৌঁছিবার আগে সে তিন লাফে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইল, এবং পরুষ কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, "You brute! how dare you insult a lady!"

"Mind your own business damn Native!"

"Well, I will teach you a lesson of etiquette which you shall never forget in life!"

তখন আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া, সুধীর মাতাল গোরার কোর্ত্তার কলার ধরিয়া কাঁকাইয়া, কাণের কাছে মুখের উপর এমন কয়েকটি মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিল, যেন সে স্যাণ্ডব্যাগের উপর খুসি মারিয়া হাত শক্ত করিতেছে।

হতভম্ব গোরা একটি কুৎসিত গালাগালি দিয়া, তাল সামলাইয়া উঠিতে না উঠিতে তাহার পিঠের মেরুদণ্ডের উপর একটি ভীম পদাঘাত অনুভব করিল।

সে আর উঠিবার চেষ্টা না করিয়া 'My God' বলিয়া কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

সঙ্গীর শেফালিকে এক পাশে টানিয়া লইয়া নিরাপদে দাঁড়াইয়াছিল।

এ দিকে অপর গোরাটির সহিত অশোকের অনেকক্ষণ ধরিয়া লাফালাফি চলিতেছিল। অশোকের নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছিল,—দারুণ উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল! এবং তার অবস্থা দেখিয়া উহার শেফালির মনে হইতেছিল যে আর বোধ হয় সে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। ব্যাপার তখনকে দেখিয়া শেফালির অনিচ্ছাসত্ত্বেও সঙ্গীর তাহাকে টানিয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে রাস্তায় পড়িয়া ট্যাক্সি চড়িয়া বসিল।

এমন সময় সঙ্গীর দুরবস্থা দ্বিতীয় গোরাটির চোখে পড়িল, অশোককে ছাড়িয়া সে এক লম্ফে সুধীরের ঘাড়ের উপর গিয়া উঠিল।

কিন্তু এ বড় শক্ত মাই!—সুধীর তখন রোজ সকালে হিন্দুস্থানী ওস্তাদ পালোয়ান রাখিয়া কুস্তি শিখিত। কুস্তির অনেক কৌশল তাহার জানা ছিল। সে কালবিলম্ব না করিয়া সামনে ঝুঁকিয়া পড়িল,—এবং তাহার দুই বজ্রহাতের প্রবল ঝাঁকানিতে মাতাল গোরা উল্টাইয়া গিয়া সপাত—! 'By Jove' বলিয়া ধরণীতলে চাপকুমড়াবৎ পড়াইতে লাগিল সে।

নেটিভের কাছে পরাজয়ের দুঃসহ ব্যথায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া এইবার দুইজনে একযোগে সুধীরের উপর গালাগালি বর্ষণ করিয়া ছুটিয়া আসিল।

সুধীর বিচিত্র কৌশলে দুই জনের মাথা দুই হাতে ধরিয়া এমন প্রবলবেগে ঠুকিয়া দিল যে তাহারা চোখে সর্ষে ফুল দেখিতে দেখিতে প্রায় হতজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা সঙ্গত নয়; বিশেষতঃ নাক দিয়া অধিক রক্তস্রাবে অশোক অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

তখন ইডেন গার্ডেনের বৈদ্যুতিক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ব্যাণ্ড বাজিতে সুরু করিয়াছে, এবং দলে দলে সৌখীন নরনারী বিচিত্র কলকাকলী প্রমোদমেলা মুখর করিয়া গল্প করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কেহ যদি—বিশেষ করিয়া কোনো গোরাসৈনিক নারী এদিকে ওদিকে দুই চারি জনে মিলিয়া সিগারেট ফুঁকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—এদিকে আসিয়া পড়ে ত সর্ব্বনাশ! বিশেষ করিয়া তাহাদের ছিল খদ্দরপরা—আবার এক নূতন গোলোযোগের সৃষ্টি হইবে। এখন সরিয়া পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া সুধীরের মনে হইল।

সে অবসন্ন অশোককে চলিতে সাহায্য করিয়া বাগানের বাহিরে কলের কাছে লইয়া গেল; এবং রুমাল ভিজাইয়া নাকে, চোখে, মুখে জল দেওয়ায় অশোক অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। সে তাহাকে সাবধানতার সহিত ট্রামে করিয়া মেসে পৌঁছাইয়া দিল। তারপর সে এমন করিয়া বুক ফুলাইয়া শিস দিতে দিতে ক্লাবে ফিরিল, যেন সে আজ একটা মস্ত বড় জয় করিয়াছে!

ধর্ম্মঘট

শ্রী অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

একগুঁয়ে 'মিশা' একেবারে চুপ্‌টি কোরে রইল। একটিও কথা কইবার ইচ্ছে নেই। দুপুরে খেতে ডাকা হ'লে গম্ভীরভাবে ব'লে পাঠালে,—"দরকার নেই..."

চা'র সময় ডেকে পাঠাতে একই ভাবে উত্তর দিলে, "চা, কাফি যা-খুসী তোমরা খাওগে, আমাকে একলা থাকতে দাও; আমি কিছু চাই না।

মিশার বড় বোন ত একথা শুনে হেসেই খুন, বলে, "তুই ভাবছিস, বুঝি তোর জন্যে আমরা ভেবেই অস্থির —না? তুই যদি একেবারে নাইই খাস্—আমাদের থোড়াই ভিম!" ব'লেই সে নাচ্‌তে নাচ্‌তে দরজার বাইরে অদৃশ্য।

বোনের কথাবার্ত্তা চালচলনে মিশা ভাব্‌লে, বুঝি তা'র প্রতি ওর সহানুভূতি আছে। সে এমন ভাবটা দেখিয়ে গেল যেন সত্যিই ওর বাপ-মা ওর খাওয়া-না-খাওয়া সম্বন্ধে আদৌ 'কেয়ার' করেন না।...অবিশ্যি কেমন কোরে যে ওকে কিছু খাওয়ান যায় সেকথা যে ওঁরা ভাবছিলেন না—তা নয়।...ওঁরাই ভাবুন।...এ ত তাঁদের নিজেদেরই দোষ। ...প্যাটিনে যার এক নম্বর পেয়েছে বোলে বুঝি সকলের সাম্‌নে এনি কোরে ধম্‌কাতে হয়? আবার বলা হ'ল—জুতো সেলাই ছাড়া আর কিছু কর্ব্বার তার মুরোদ নেই... বেশ মুচি মুচিই—তাতে আর ভাবনা কি...যাইই বলো, ঠোঁটে ফুটোটি কাটা হ'চ্ছে না।...

বৈঠকখানায় ব'সে একখানা পত্রিকা ওল্টাচ্ছে, তবে পাশের ঘরে কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে সেই দিকেই কান। নিশ্চয়ই তা'র সম্বন্ধে ওরা বলাবলি কর্চ্ছে—হয় ত বল্‌ছে—"উঃ কী জেদী ছেলে! কিছুতেই খেতে এল না। যাই বলো, ভারী চালাক কিন্তু।"

"খাইকেল কই?...এখনও খেঁা ছাড়লো না বুঝি?"—ও শুন্‌তে পেল, মা বল্লেন।

"বাবুর রাগ হয়েছে," নীনা আস্তে আস্তে বল্লে।

"যেমন কোরে হোক্ কিছু খাওয়াতে হবে বৈকি—" বাবা গম্ভীর গলায় বল্লেন—"ও শুন্‌তে পেল।"

"ঃ, 'কিছু খাওয়াতে হবে বৈকি'! আমি যেন চাইছি,—মুচীর জন্যে আবার অত ভাবনা কেন?"—মিশা বল্লে।

"মাইকেল!"—বাবা ডাক্‌লেন।

মিশা চুপ্ কোরে রইল। বাবা আবার ডাকলেন।

"কি বল্‌ছেন?"—বইখানার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে গম্ভীরভাবে মিশা উত্তর দিলে।

"ওখানে চুপ কোরে ব'সে আছিস্ কেন? এদিকে আয়..."

"চুপ কোরে ব'সে নেই, আমি পড়্‌ছি...মুচীকে ত আর সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে নেই..."

"গোঁয়ার কোথাকার!"

"বেশ, বেশ, আমি গোঁয়ার..." মিশা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। পরে আস্তে আস্তে বল্লে,—"খোঁয়ার শোনাবো'খন তোমাদের একচোট!"

"ইঃ বাবুর যে ভারী রাগ!"—ওর বোন বল্লে।

"থাম্, থাম্ লক্ষ্মীছাড়ি!" মিশা বল্লে, অবিশ্যি আস্তে আস্তে। বোনের প্রতি মেজাজ ওর মন চ'রে গালো। ভাব্‌তে লাগ্‌লো—কি কোরে এর শোধ তোলা যায়... আঃ বাবা যদি না থাকতেন... ও-পোড়ারমুখী কি জন্যে কথা কয়? কেউ ত ওকে জিগ্যেস করে নি! সে রেগে, কেশে বইখানাকে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর পকেট হাৎড়ে একটা পেন্সিল বা'র কোরে বইখানা কুড়িয়ে নিয়ে ভেতরের একখানা ছবির তলায় লিখ্‌লে,—"নীনা আর তোকা, আট ছুটি বোকা।" ছবিটা হ'চ্ছে—একটা ছেলে আর একটা মেয়ে,—ছেলেটা হাসা গুড়ি দিয়ে একখানা বেঞ্চের তলায় ঢুকে ছুরী দিয়ে কেটে কেটে মেয়েটার নাম লিখ্‌ছে,—বেঞ্চের সমস্ত ওপরটা ওর নামে নামে ভ'রে গাছে, মেয়েটা পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বইখানার ঐ

পাতাটা টেবিলের ওপর এমনভাবে খুলে রেখে দিলে যেন সকলে টের পায়। তারপর ওর শোবার ঘরে চ'লে গ্যালো। মীনার টুপিটা টেবিলের ওপর প'ড়ে রয়েছে দেখে সেটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

"আমার টেবিলের ওপর যত সব জঞ্জাল!"—ও চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, যদিও ওর কথা কেউই শুনতে পেল না। মিশার মনে হ'ল—সকলেই যেন ওর শত্রু। বাড়ীটার ভেতর যেন চ'পক্ষের তাঁবু পড়েছে। একটাতে থাকি মিশা নিজে—অন্যটাতে বাড়ীর বাকী সকলে।—সেই সময় যেই কি ঘরে ঢুকেছে—ও তাকে এদি তেড়ে উঠেছে···

"মাইকেল!"

"যাও, যাও বাইরে যাও।"

"তোমাকে একজন ডাকছে।"

"যাও, বাইরে যাও বলছি!"

"কিচ্ছুটি খাওনি ব'লে বুঝি রাগ হয়েছে..."

মিশা বুঝতে পারে, কেন কিকে ওর কাছে পাঠানো হয়েছে। সেজন্যে ওর মনে একটু দুঃখ হ'ল,—ভাবলে, আর কেন ও...না, না, কিছুতেই না, সে ত আর কচি খোকাটি নয়..তোরা ওঁরা রাস্কেল!···কিন্তু কিদেয় তখন ওর নাড়ী চন্ চন্ করছে। ভাব্‌লে, রান্নাঘরে একবার ঘুরে এলে হয় না? না, না, তা হ'লে আর কি হ'ল, রাঁধুনী ব'লে দেবে কিকে, কি বল্‌বে কর্ত্তা-গিন্নীদের—ব্যাস্ ওরা নিশ্চিন্ত!···

খিদে চেপে থাকাই হ'চ্ছে ঠিক। যদি বাবা কি মা এসে বলেন, "ছিঃ মিশা, রাগ করে না···তুমি ত জানো না-খেলে অসুখ করে আর তা হ'লে কি রকম মুস্কিল হবে... যা হ'য়ে গেছে হ'য়ে গেছে—আর কখ্‌খোনো তোমায় এমন বোল্‌বো না,"—হাঁ, তা হ'লে রাজী হ'য়ে ও তক্ষুণি খাবার ঘরে যাবে। নিশ্চয়ই তার জন্যে ওঁরা কিছু রেখেছেন।··· পালংগোড়ার খোল হয়েছে।...জিভের লালা গিলে ফেলে দরজার পাশে গিয়ে মা'র পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইল। বাবা নিশ্চয়ই আসবেন না, হয় ত মা এসে বলবেন—"যা হ'য়ে গেছে, হ'য়ে গেছে···"

কিন্তু মাও এলেন না।···ভয়ানক খিদে পেয়েছে। যে আস্‌বে ব'লে সে আশা কর্চ্ছিল সে না এসে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল চমৎকার শিকারী কুকুর 'কলষ্টাফ্'টা। আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর ঢুকে এসে সে মিশার গা-টা একবার শুঁকলে, তারপর ল্যাজ নাড়তে সুরু করলে। 'কলষ্টাফ্' ওর বাবার ভারী প্রিয়—তাঁর পড়ার ঘরের টেবিলের তলাই হ'চ্ছে তার আড্ডা। ও কেন এখানে এল? মনিবের কাছে গিয়ে নাড়ুকৃপে ওর ল্যাজ! খেয়ে খেয়ে এ মুটিয়েছে যেন কেটে পড়বে।...

"দূর্ দূর্".—মিশা তাকে হঠাৎ একটা লাথ লাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। ও খানিকক্ষণ ঘেউ ঘেউ ক'রে ল্যাজটা নেড়ে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাইরে চ'লে গ্যালো—যেন ও ভয়ানক মনোক্ষুণ্ণ হয়েছে। মিশা খিদেয় অস্থির···

বাঁ হাতের আঙুলটা চুষ্‌তে চুষ্‌তে অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবতে লাগলো—কি করা যায়! শেষে একটা চমৎকার মৎলব মাথায় এলো। তারই বয়সী ইভ্ত থাকার 'অ্যালজেব্রা'খানা বেচে একখানা ছুরী কিনলে...

গেল-বছরের বইগুলো বিক্রী করলে যা পাবে তা দিয়ে ত 'প্যাটি' কিনতে পার্ব্বে···হয় ত চধও খানিকটা পেতে পারে ···আর এখানে এরা বেশ জব্দ! ···ওদের নিজেদেরই দোষ।···এর পরে তারা নিশ্চই আর ওর সঙ্গে ও রকম ব্যবহার কর্ব্বে না।···

শেলফ্ থেকে শেষ একখানা চটি বই বা'র কর্লে।··· "এটা ত দরকার হবে, তবে এখনও দেরী আছে। ততদিনে এটার কথা ওরা ভুলে যাবে, একখানা নতুন কেনা যাবে তখন।"—মিশা ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—শেষকালে বিক্রীই ঠিক করলে।

বাইরে যেতে গেলে খাবারঘরের ভেতর দিয়ে যেতে হবে···সেটি হ'চ্ছে না···ওরা সকলে সেখানে রয়েছে ···হয় ত ভাব্‌বে, খাবার ছুতোয়···না, না, কখখোনো। বোধে গ্যালো, ধরলা না হ'লেও তার চলবে...

বইখানাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে জান্‌লা টোপকে বাইরে এসে বাজারের দিকে দৌড়। সন্ধ্যা হয় হয়—শীগগিরই দোকানপাট বন্ধ হ'য়ে যাবে...তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।···মিশা হাওয়ার মত উড়ে চল্‌লো··· কতকগুলো আধভেজা বাড়ীর ওপর দিয়ে 'শর্টকাট্' কর্ত্তে গিয়ে বুটজিতে হ'ল এক প্রস্থ কাদা। অন্য সময়ে

হ'লে চক্ষু চড়ক গাছে হ'ত কারণ জুতোটা একেবারে নতুন, এবং এই সেদিন দেবার সময়ে তাকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে—যেন না ছেঁড়ে। এখন আর সে কোনই 'কেয়ার' করে না,—ছেঁড়ে, নতুন কিনে দেবে। অবিশ্যি তারা ত বলতে পারে,—ও বুড়ীর মতই খালিপায়ে বেড়াক ···ও জানে নিশ্চয়ই ওরা কিনে দেবে···উকীলের ছেলে ছেঁড়া জুতো প'রে বেড়ালে কি রকম অপমান···ব্যস্ত হবার দরকার নেই···ছেঁড়ে, ওরা ঠিক কিনে দেবে···এমনি কর্ত্তে কর্ত্তে সে বাজারে এসে পৌঁছুলো। আনন্দমুখর প্রাণবন্ত বাজার··· কী হৈচৈ, চ্যাচামেচি, ঝগড়াঝাটি···একেবারে নরক গুলজার।

"গরম প্যা-অ্যা-টি—" নাকীসুরে এক হাবাগোবা চাষা চ্যাচাচ্ছে—"গরম প্যা-অ্যা-অ্যা টি?" মিশার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস্ কর্ল্লে,—"চাই নাকি—প্যাটি চাই?"

"কিসের তৈরী হে?"—মিশা শুধোলে।

"এই যে বাবা, এস না, আমি বিক্রি গরম গরম,—ওর ওগুলো ঠাণ্ডা হ'য়ে গ্যাছে।"—প্যাটির পাত্রটিকে তুলে ধ'রে একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে একটা বুড়ী চিঁচি ক'রে উঠ্‌লো···

"আস্‌চি, আস্‌চি, ঘুরে এসেই কিন্‌বো। এখন সময় নেই"— রং বেরংএর পোষাকপরা লোকগুলোকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ভীড়ের মধ্যে পুরোনো বই'র দোকানের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ও বল্লে। তবে তবে একজন দোকানীর কাছে এগিয়ে গ্যালো। খোদ্দেরের প্রতীক্ষায় দোকানী দরজার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল—গম্ভীর বুড়োলোক, তাকে দেখ্‌লে দোকানীর চেয়ে গুরুমশাই ব'লেই বেশী মনে হয়। স্কুলের ছেলে আস্‌চে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর দিকে ঢুকে গিয়ে একখানা বই খুলে ব'সে-পড়্‌লো, যেন পড়্‌ছে।

"বই চাই?"

"কি বই?"

"এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা। একেবারে নতুন"—মিশা হাঁকাতে হাঁকাতে ব'লে ফেল্‌লে।

"কার—"খুনের?"

"হ্যাঁ।"

"ইউরোপ হ'লে না হয় রাখা যেত, এ বই অনেকগুলো রয়েছে···" মিশার হাত থেকে অনিচ্ছার সঙ্গে বইখানা নিয়ে দোকানী বল্লে।

"এঃ, পুরোনো সংস্করণ···যা হোক দশ পয়সা দিতে পারি—" বইখানার দু'চারপাতা উল্টে দোকানী বল্লে।

"পাঁচ আনার কমে বিক্রী কর্ত্তে বারণ—" মিশা আস্তে আস্তে উত্তর দিলে।

দোকানী হাই তুলে মিশাকে বইখানা ফেরৎ দিলে।

"আচ্ছা না হয় পনের, এ ত নতুনই প্রায়—"

দোকানী কোন উত্তর দিলে না।

"যা হোক, দশ পয়সাই দিন্।"

"তোমারই ত জিৎ হ'ল হে"—টেবিলের ওপর দশটা পয়সা রেখে চাই তুল্‌তে তুল্‌তে দোকানী বল্লে। তারপর একটা শেলফের ওপর বইখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যে বইটা পড়্‌ছিল সেইখানা তুলে নিলে।

"ইউরোপখানাও তা হ'লে আন্‌বে নাকি?"—পকেটে পয়সাগুলো পুরে মিশা জিজ্ঞেস্ কর্ল্লে।

"হ্যাঁ···তবে যদি এই রকম নতুন হয়, তা না হ'লে দশ পয়সা দাম হ'তে পারে না। তোমার বন্ধুদেরও আন্‌তে বোলো না। সকলের চেয়ে বেশী দরে আমি জিনিষ কিনি···"

"বোল্‌বো তাদের—"

দোকান থেকে বেরিয়ে খাবারের ষ্টলের সামনে গিয়ে মিশা দাঁড়াল। 'প্যাটি'র ষ্টলে খাবার আগেই হাল্‌কা আর পোস্তোর বড়া দেখে ওর ভারী লোভ হ'ল। তিন পয়সায় কিনে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ও তাই খেলে। তারপর সেই প্যাটিওয়ালীর কাছে গ্যালো।

"কি কি রকম আছে?"

"পাতালকৌড়ের, মাংসের আর গাজরের।"

"কত কোরে?"

"পাঁচ পয়সায় দু'খানা।"

"গাজরের চাই না। একখানা কৌড়ের আর একখানা মাংসের দাও।"

প্যাটি দু'খানা খেয়ে ওর জল তেষ্টা গেল। শেষ দু'পয়সা দিয়ে দু'গেলাস সরবৎ কিন্‌লে। দ্বিতীয় গেলাসটা

আর শেষ কর্ত্তে পারে না···বিশ্রী মিষ্টি···তবুও ফেলে দিতে মায়া হয়।

"উঃ!" অনেক কষ্টে শেষ ক'রে মিশা বিশ্রাম নেয়।

"কি হ'ল, মাথায় চুকলো নাকি?"—চালিয়াৎ সরবৎ-ওয়ালা জিজ্ঞেস্ কর্ল্লে; তারপর সুর কোরে চ্যাঁচাতে লাগ্‌লো—"মিঠিয়া সারবৎ···ঠাণ্ডা সারবৎ···"

বাড়ী ফিরে মিশা দেখ্‌লে তার টেবিলের ওপর সাজান রয়েছে একপ্লেট ঠাণ্ডা মাংস, খানকত রুটি, একগ্লাস দুধ আর তিনখানা পিঠে। ওই পিঠে কখানা দেখে ওর ভারী লোভ লাগলো—পিঠে খেতে ভারী ভালোবাসে ও, কিন্তু না, না, কিছুতেই না। যদি এমন হ'ত যে অনেক কখানা দিয়েছে—ওদের মনে থাকবে না, তা হ'লে না হয় একখানা খাওয়া যেত। ও কর্ল্লে কি, সব কখানা থেকে একটু একটু ক'রে দাঁত দিয়ে কুরে কুরে খেয়ে তারপর একচুমুক দুধ খেলে। ভারী চমৎকার···কিন্তু না, আর নয়···কিছুতেই নয়...

সরবৎ বুঝি সত্যিই ওর মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। জালুয়া আর পোস্তোর বড়া, কোঁড় আর পচা মাংস ওর পেটের মধ্যে গোলমাল সুরু কর্ল্লে।

"হু-উ-উ। আঃ।" শব্দ কর্ত্তে কর্ত্তে প্যাচ্ প্যাচ্ কোরে মেঝের ওপর থুথু ফেল্‌তে লাগলো।

"এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"—দরজার কাছ থেকে নীনা জিজ্ঞেস কর্ল্লে।

"সে আমি বুঝ্‌বো তুমি কোথায় ঘুরে বেড়াও—আমি ত তা জিজ্ঞেস করি না।"

যাবার সময় নীনা দেখ্‌তে পেলে মিশার খাবার যেমন তেমনিই রয়েছে—ও হাতও দেয় নি।

"মাংসটা অন্ততঃ খেতে বলেছেন মা তোমায়।"

"আমার খাবার দরকার নেই। আমি গোয়ার—আমি মুটী...তোমরা সব উকীল, মোক্তার···গোঁয়ারের অন্তে আর অত ভাবনার দরকার কি।"

"যা খুসী বল।"

"বেশ বেশ। যাওনা তোকার সঙ্গে বেড়াতে যাও না। আমায় আর কেন জ্বালাও···"

"ইডিয়াট্"—ব'লেই নীনা হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে গ্যালো।

বাড়ীতে মা থেকে মিশা জান্‌লে, সে তার শত্রুপক্ষের আক্রমণের প্রতিরোধ কর্চ্ছে। প্যাটি আর জালুয়া, পোস্তোর বড়া আর সরবৎ এরাই তার সহায়।

এ-ব্যাপারটা বোধহয় অনেকক্ষণ ধ'রেই চল্‌তো, যদি না এক অঘটনপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান ক'রে দিয়ে যেত। মিশার পেটব্যথা সুরু হ'ল—যত সময় যায় তত বাড়ে। ব্যথায় চোখে উপুড় হ'য়ে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়্‌লো। এ অবস্থাতেও তবু সে তার জেদ ছাড়ে নি। বালিসে মুখ গুঁজে কান্না চেপে চেপে অনেকক্ষণ নিজেকে সাম্‌লালো। কিন্তু কোঁড়ের প্যাটি আর মিষ্টি সরবৎ তখন কাজ সুরু করেছে। ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দু'হাতে বালিশ চাপড়াতে লাগ্‌লো সে।

"উঃ কী সাজা!"—পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাঝে মাঝে ব'লে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সন্ধ্যের সময় আর থাকতে পার্‌লে না, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। তার সমস্ত শত্রুরা বিছানার চার-পাশে এসে দাঁড়াল কেবল বাবা ছাড়া—ঐ সময় সাধারণতঃ তিনি ক্লাবে থাকতেন। মা ওর টেম্পারেচার দেখ্‌লেন, নীনা ছুটে গিয়ে সল্টের শিশিটা নিয়ে এল, কি খেতে ডাক্তার ডাকতে গেল, এমন কি ফলঠাকও রোগীকে দেখ্‌তে এল—বড় বড় চোখ দিয়ে মিশার দিকে করুণভাবে চেয়ে রইল।

"কি কোরিচিস্ রে?—" ওর মার ভয়ানক ভয় হ'ল—বিষ খেয়েছে না কি—তাহলেই হয়েছে কতবার ওর দেখিয়েছে বিষ খাবে ব'লে—

"কিছু কি খেয়েচিস্? মিশা, বল্ বাবা লক্ষ্মীছেলে, শীগ্‌গির বল্।"

"মা! ওঃ ওঃ ওঃ মাগো। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা বেচে···ওঃ ওঃ ওঃ খানকত কোঁড়ের প্যাটি..."

"এ কি হোল? মিশা ভুল বক্‌চে। শীগ্‌গির ওর বাবাকে ক্লাব থেকে ডেকে নিয়ে আয়!—ও ভগবান!"

মা তার পায়ের ওপর মুখে প'ড়ে কপালে হাত বুলিয়ে দ্যান, বোন ছলছল্ চোখে ঘরময় ঘুরে বেড়ায় আর

অস্থিরভাবে জান্‌লা দিয়ে দ্যাখে—ডাক্তারবাবু আসছেন কি না। ডাক্তারবাবু এলেন।

"কোথায় যন্ত্রণা হ'চ্ছে? পাশ ফের ত।" মিশা পাশ ফিরে শুলো। ডাক্তার বেশ কোরে এক্‌জামিন কর্ত্তে লাগ্‌লেন।

"কি খেয়েছ আজকে?"

"কিছু খাই নি, ডাক্তার! ইস্কুল থেকে এসে এপর্য্যন্ত দাঁতে কুটোটি কাটে নি"—মা বল্লেন।

"এ ত ভাল নয়···যা হোক, নিশ্চয়ই কোনো কিছু খেয়েছ। আমাকে সত্যি কোরে বলদিকিনি···"

"হাঁ, আমি কৌড়ের প্যাটি খেয়েচি···এসিয়া-আফ্রিকা কিক্রী করেচি···"

"কি ব্যাপার?"—তাকাবেলা ফেলে ছাব্‌ থেকে টাল্লি ক'রে এসে লাফিয়ে নেমেই বাবা জিজ্ঞেস্ করেন।

একঘণ্টা পরে সমস্ত বাড়ীখানা নিস্তব্ধ!—পেটের ওপর পুল্টিস-দেওয়া মিশা বিছানায় শুয়ে রয়েছে, মা আর বোন পাশে ব'সে আছেন, উঠে ওর ফাইফর্‌মাজ খাট্‌ছেন।

যন্ত্রণা আর নেই—মিশা পরম তৃপ্তি বোধ কর্ত্তে লাগ্‌লো। •

• Russian লেখক Eugene N. Chirikov'এর একটি গল্পের অনুবাদ।

ঠাকুরের কথা

শ্রী অবনীনাথ রায়

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নাম ভারতবর্ষের, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের সাধারণের মনে চিরজাগরূক হ'য়ে আছে। পাশ্চাত্য দেশে এঁর সম্বন্ধে এখনো বল্‌বার প্রয়োজন হয়। তাই ফরাসী দেশীয় মনীষী রোমাঁ রোলাঁ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একখানা বই লিখলেন।

ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ঠাকুরের বিষয় নিয়ে যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল সেইটুকু আজ শুধু বল্‌ব।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন, আপনি পরমহংসদেবকে অবতার ব'লে মানেন?

প্রশ্নটি যেমন direct তেমনি blunt—কোন আড়াল রাখ্‌তে চায় না। মানুষের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে এমন সব বস্তু টেনে আন্‌তে হয় যা' তার নেহাৎ নিজস্ব—পরকে একদম বলার নয়।

আমি ইতস্ততঃ ক'রে সবিনয়ে বল্‌ব, আমার ব্যক্তিগত মত যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে মানি।

বন্ধু বল্লেন, কেন?

আমি বল্লুম, তাঁকে চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি তখন আমি জন্মাই নি। তাঁর বিষয় শুধু পড়েছি—তাইতে এমন সব ব্যাপারের উল্লেখ আছে যা' আমার মতে অলৌকিক—শুধু অবতারদের পক্ষেই সম্ভব।

বন্ধু বল্লেন, তিনি সাদা কথায় যে সমস্ত ধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা ক'রে ব'লে গিয়েছেন সেই সব কথাই তাঁর আগে কবীর, দাদু, নানক এঁরা অন্য ভাষায় অন্য দেশে ব'লে গেছেন; আপনারা খবর রাখেন না—তাই এ সব জানেন না।

আমি এসব খবর রাখি না স্বীকার করলুম, আরো বল্‌ব যে ঠাকুরকে আশ্রয় ক'রেই যদি কেউ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হ'তে চায় তবে ঐ বৃদ্ধঠাকুর জন্যে তার আট্‌কাবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস—সে শুধু এগিয়ে যেতে পারবে।

মোট কথা আমাদের তর্কটা যুক্তির বিষয়ই ছিল না—ওটা ছিল যার যা' অন্তরের বিশ্বাস। বোধ হয় তাই বুঝ্‌তে পেরে অন্য এক বন্ধু তর্কের মোড় ফিরিয়ে দিলেন। তিনি

বল্লেন, আমাদের কথা হ'চ্ছে এই যে আমাদের দেশের পক্ষে এখন Economicsএর চর্চ্চা করা দরকার—আগে আমাদের খেতে হবে, বাঁচ্‌তে হবে, সেই বাঁচার উপায় করতে হবে—তার পরে অন্য আলোচনায় মন দেওয়া উচিত।

বন্ধুর কথার ইঙ্গিতটুকু সুস্পষ্ট—বুঝ্‌তে কষ্ট হ'ল না। ভাষান্তরে বলা যায়, রেখে দাও তোমাদের ধর্ম্মালোচনা আর কীর্ত্তন—আগে খাও, পরকে খাওয়াও, জাতিকে বড় কর, তারপর পরমার্থ-চিন্তায় হাত দিয়ো।

কথাটা ভেবে দেখ্‌বার মত। জাতিহিসাবে আমরা যদি ছোট হ'য়ে যাই, ঘরে যদি অন্নাভাব থাকে, পেটে যদি ক্ষুধা থাকে, পাশেই যদি প্রতিবেশীকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেখি, তবু সেই সব তুচ্ছ ক'রে ধ্যানধারণা, কীর্ত্তন করতে পারব কি না?

সেদিন রাত্রি পৌনে চারটার সময় এর একটা উত্তর খুঁজে পেয়েছি। তখন গির্জ্জার ঘড়ি বাজ্‌ছিল—চং চং চং—one more soul is passing away—passing into eternity. দিনের আলোয় যে সত্য খুঁজে পাই নি, রাত্রির অস্পষ্ট আঁধারে সেটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল।

বন্ধু বলেছিলেন, বাঁচ, অপরকে বাঁচাও। মন বলেছিল সত্যিই ত। তখন দেখলুম বাঁচাটাই যে সত্য নয়।...বহুকাল বিস্মৃত কবিতার দুটি চরণ অজ্ঞাতে স্মৃতিপথে উদিত হ'ল:—

"জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে!"

মরণটাই যদি সত্য হয় তবে এ সত্যের দিকে চোখ ফেরাই কি ক'রে? এই জন্মমৃত্যুর অধীনতা কাটাতে জীব যদি চেষ্টা করে তবে তাকে ত দোষ দেওয়া যায় না। সেই ত তার পথ। এখানে সেখানে দুঃখ-দারিদ্র্যের যে সব পৃথক পৃথক ছবি ফুটে উঠ্‌তে দেখি সে সব ও সেই বিরাট দুঃখের, সেই অপরিসীম দারিদ্র্যের অংশমাত্র—জীবনমৃত্যুর লীলার দ্বারে অবিচ্ছেদ্যভাবে গাঁথা। এই বিরাট দুঃখ অবসান করবার চেষ্টায়, এই বিশ্ব-দারিদ্র্য ঘোচাবার উপায় খুঁজে বার করতে ভগবান বুদ্ধ ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন—ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে কঠিন তপশ্চর্য্যা করেছিলেন। তাঁরাও মানুষকে বাঁচ্‌তে ব'লে গেছেন—তবে সে বাঁচা অর্থনীতি শাস্ত্রের বাঁচা নয়—অমৃতের মধ্যে বাঁচা—তাঁকে পিতা জেনে বাঁচা—

'ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি'

—তুমি আমাদের পিতা, সর্ব্বজগতের পিতা, তুমি পিতা এই বোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত কর। ওঁ শান্তিঃ।

খেলা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

গোল্লাছুট—খেলোয়াড়দিগকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া ৬০।৭০ ফুট ব্যবধানে মুখোমুখি করিয়া দাঁড় করাইতে হইবে। প্রত্যেক দলের পশ্চাতে কিছু দূরে এক একটি 'গোল' থাকিবে। প্রত্যেক দলের উদ্দেশ্য থাকিবে অপর দলের 'গোল' অধিকার করা। নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত পাইবামাত্র দুই দল পরস্পরের 'গোল' অধিকার করিবার জন্য ছুটিবে। যদি বিপক্ষের কোন খেলোয়াড় আক্রমণের সময় স্পর্শ করে তবে যাহাকে স্পর্শ করিবে সে বন্দী হইবে। এইরূপভাবে অন্যের স্পর্শ এড়াইয়া যদি কেহ শত্রুর 'গোলে' ঢুকিতে পারে, তবে আবার নূতন করিয়া খেলা আরম্ভ হইবে; তখন বিজয়ী দল ১৫ ফুট পেছনে আসিয়া দাঁড়াইবে। এইরূপভাবে একদল যদি অপর দলকে হটাইতে হটাইতে 'গোল' ছাড়াইয়া নিতে পারে তবে সেই দল জয়ী হইল। এই খেলার মাঠ যত বড় হয় এবং খেলোয়াড় সংখ্যা যত বেশী হয় ততই সুন্দর হয়।

কুরুপাণ্ডব—খেলোয়াড় সংখ্যা ১০ হইতে ৩০ জন। খেলোয়াড়গণ সব দুই ভাগে বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক দলে একজন করিয়া দলপতি থাকিবে। এক দলের নাম হইবে কুরু আর এক দলের নাম পাণ্ডব। কুরুগণ তাহাদের ঘরে থাকিবে, পাণ্ডবেরা তাহাদের ঘরে থাকিবে। ভাগ্যপরীক্ষা দ্বারা যে দল জয়ী হইবে তাহাদের মধ্য হইতে দলপতির নির্দ্দেশানুসারে একজন বাহির হইবে, এবং ক্ষেত্রের মধ্যস্থানে যাইয়া "এক, দুই, তিন," বলিয়া তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিবে। সে "তিন" বলামাত্র বিপক্ষের একজন দৌড়াইয়া বাহির হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত খেলোয়াড় ঘরে আসিবার পূর্ব্বে তাহাকে ছুঁইতে চেষ্টা করিবে। যদি সে ঘরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে স্পৃষ্ট হয় তবে বন্দী হইয়া বিপক্ষের বন্দিশালায় যাইবে এবং তাহার দলের কেহ অস্পৃষ্ট অবস্থায় তাহাকে যাইয়া স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে বাহির হইতে পারিবে না। বন্দীকে নিয়া ফিরিয়া আসিবার কালে কেহ মোচক দিয়া বন্দীকে ছুঁইতে পারিবে না। প্রথম যে বাহির হইবে সে ঘরে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার দলপতি অপর একজনকে পাইতে পারে। সে যাইয়া আক্রমণকারীকে ছুঁইলে আক্রমণকারী বন্দী হইবে।

আক্রমণকারীর দলপতিও তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য একজন পাঠাইতে পারে। এইরূপ ভাবে এ পক্ষের একজন অপর পক্ষের একজন করিয়া সমস্ত খেলোয়াড়ই ঘরের বাহির হইতে পারে, কিন্তু যে যখন বাহির হইবে সে তাহার পরে যাহারা বাহির হইবে তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, করিলে নিজেই বন্দী হইবে। কাজেই প্রত্যেক খেলোয়াড়ের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহার পর

কে বা কাহারা বাহির হইয়াছে এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে এড়াইয়া চলিতে হইবে। যদি কেহ অস্পৃশ্য অবস্থায় ফিরিয়া ঘরে আসিতে পারে, তবে বাহিরের সমস্ত খেলোয়াড় নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়া যাইবে, এবং অপর পক্ষ নূতনভাবে বাহির হইয়া খেলা আরম্ভ করিবে। যে পক্ষ অপর পক্ষের সকলকে বন্দী করিতে পারিবে অথবা শূন্য থাকা অবস্থায় বিপক্ষের ঘর দখল করিতে পারিবে তাহারা জয়ী। একজন খেলোয়াড় বিপক্ষের ঘর শূন্য থাকা অবস্থায় তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিলেই ঘর দখল করা যাইবে। একবার এক পক্ষ জয়ী হইলে পক্ষদ্বয় ঘর পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া নূতনভাবে খেলা আরম্ভ করিবে।

টেনিকট্—এই খেলা টেনিস্ এবং ব্যাড্‌মিন্টন্ খেলার সম্মিলন কিন্তু র‍্যাকেট আবশ্যক হয় না। খেলার সামগ্রী—৬" ইঞ্চি ব্যাসের ২টি চাকা, তাহাকে টেনিকট্‌রিং বলে। টেনিকট্‌রিং খেলার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়, মূল্য ৮৲ কি ১০৲ টাকা। কিন্তু ইহা টাকাপয়সা ব্যয় না করিয়া অতি সহজে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ১৯" ইঞ্চি কি ২০" ইঞ্চি লম্বা একগাছা মোটা কাছির মুখ একত্রিত করিয়া তাহাতে একটু শক্ত ফাকড়া জড়াইয়া দিলে সুন্দর টেনিকট্‌রিং প্রস্তুত হইবে।

ক্ষেত্রের মধ্যস্থানে ব্যাড্‌মিন্টনের মত জাল থাকিবে। জালের মধ্যস্থল মাটি হইতে ৫ ফুট উচ্চ থাকিবে, খেলোয়াড়-সংখ্যা টেনিসের মত প্রতি পক্ষে ২ জন। পয়েন্ট গণনা ব্যাড্‌মিন্টনের মত। ১৫ বা ২০ পয়েন্টে গেম্। ৩ গেমের মধ্যে যাহারা ২ গেম জিতিবে তাহারা জয়ী। টেনিসের মত ক্ষেত্রের বাহির হইতে সার্ভিস করিতে হইবে। প্রথম সার্ভিস ভুল হইলে আর একটি সার্ভিস পাওয়া যাইবে কিন্তু দুইটিই ভুল হইলে বিপক্ষে সার্ভিস করিবে। ব্যাড্‌মিন্টনের মত যে পক্ষ সার্ভিস করিবে তাহাদেরই পয়েন্ট হইবে। তাহারা মিস্ করিলে অপর পক্ষ সার্ভিস পাইবে।

চাকা নিক্ষেপের নিয়ম :—চাকা সর্ব্বদা নিজের বুকের কাছে ধরিয়া জালের উপর দিয়া বিপক্ষের ঘরে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

সার্ভিস :—যে খেলোয়াড় সার্ভিস করিবে সে ক্ষেত্রের বাহিরে থাকিয়া এক পায়ের দ্বারা সীমারেখা ছুঁইয়া তাহার বিপক্ষ ঘরে জালের উপর দিয়া পূর্ব্বোক্তভাবে চাকা নিক্ষেপ করিবে। বিপক্ষ ঘরের খেলোয়াড় চাকা মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বে তাহা ধরিয়া পূর্ব্বোক্তভাবে জালের উপর দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘরে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে খেলা ব্যাডমিন্টনের মত চলিতে থাকিবে। সার্ভিসকারী 'মিস্' করিলে বিপক্ষ সার্ভিস করিবে। গ্রহণকারীদল মিস্ করিলে সার্ভিসকারীদের ১ পয়েন্ট হইবে। সার্ভিস যদি সার্ভিসঘরের বাহিরে পড়ে তবে সার্ভিস ভুল হইবে। লাইনে পড়িলে সার্ভিস ভুল হইবে না। চাকা নিক্ষেপের নিয়মটি সর্ব্বদা পালন করিতে হইবে। মাথার উপর হইতে চাকা নিক্ষেপ করিলে তাহা 'মিস্' বলিয়া ধরা হইবে। দুইটি চাকার অভাবে একটি চাকার দ্বারাও খেলা চলিতে পারে; প্রথম সার্ভিস ভুল হইলে চাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে—এইমাত্র অসুবিধা। এই খেলা অভ্যাস করিলে এমন সুন্দর হয় যে টেনিস্ কিম্বা ব্যাড্‌মিন্টন অপেক্ষা কোন ক্রমেই কম আমোদের হয় না।

নামদাইড়—খেলার সময় অর্দ্ধঘণ্টা। খেলা দুই দলে হইবে এবং প্রত্যেক দলের খেলোয়াড়-সংখ্যা ৬ জন।

প্রথম ১৫ মিনিট একদল ঘরে থাকিবে এবং দ্বিতীয় ১৫ মিনিট অপর দল ঘরে থাকিবে। মধ্যে ৫ মিনিট বিশ্রাম।

খেলা শেষে যে দল অধিক সংখ্যক পয়েন্ট করিয়াছে সেই দলই জয়ী।

খেলার নিয়ম :—খেলা আরম্ভের পূর্ব্বে একদলের খেলোয়াড়গণ ঘরের বাহিরে চিহ্নিত স্থানে থাকিবে এবং অপর দলের খেলোয়াড়গণ নির্দ্দিষ্ট ষষ্ঠসংখ্যক লাইন গুলির প্রত্যেকটির উপর এক একজন দাঁড়াইবে।

বাহিরের খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য থাকিবে বিপক্ষের খেলোয়াড়গণ ছুঁইতে না পারে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শেষ লাইন হইতে এই লাইনগুলি অতিক্রম করিয়া একটি ত্রিভুজ-চিহ্নিত স্থানে যাইয়া তথা হইতে আবার পূর্ব্ববৎ ফিরিয়া পূর্ব্ব-চিহ্নিত স্থানে পৌঁছাইবে। একজন মাত্র খেলোয়াড়ও যদি নিরাপদে গিয়া ফিরিয়া আসিতে

পারে তবে এক পয়েন্ট হইল। প্রত্যেক পয়েন্টের পর খেলা নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে। খেলোয়াড়গণ যে পর্য্যন্ত ত্রিভুজ-চিহ্নিত স্থানে না যাইতে পারে সে পর্য্যন্ত তাহারা "কাঁচা", তথা হইতে ফিরিবার সময় তাহারা পাকা।"

আক্রমণকারী কোন খেলোয়াড় এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইবার কালে অথবা ঘরের মধ্যে থাকিবার কালে যদি লাইনস্থিত কোন খেলোয়াড় দুই পা লাইনের মধ্যে রাখিয়া তাহাকে ছুঁইতে পারে তবে সে "মরিবে।" কোন খেলোয়াড় মরিলে, খেলা আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে।

আক্রমণকারী কোন খেলোয়াড় শরীরের যে কোন অংশ দ্বারা ক্ষেত্রের লাইন স্পর্শ করিয়া যাইবার সুবিধার জন্য শরীরের অপরাংশ ক্ষেত্রের বাহিরে দিতে পারে কিন্তু ক্ষেত্র স্পর্শ করা না থাকিলে সে "মরিবে"।

"কাঁচা" এবং "পাকা" খেলোয়াড় এক ঘরে গেলে মরা হইবে, কিন্তু "কাঁচা" ও "পাকা" দুই ঘরে থাকিলে যুগপৎ লাফ দিয়া ঘর বদল করিতে পারিবে।

এক এক লাইনে রক্ষক-খেলোয়াড়দের এক এক জন থাকিবে। তাহাদের উদ্দেশ্য থাকিবে আক্রমণকারী খেলোয়াড়দের স্পর্শ করা। পূর্ব্ব হইতেই নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া কে কাহাকে রক্ষা করিবে ঠিক করিয়া নেওয়া ভাল।

"কাঁচা" খেলোয়াড়কে ছুঁইতে হইলে শেষ লাইনের খেলোয়াড় শেষার্দ্ধ লাইনে যাইতে পারে। এইরূপ পঞ্চম লাইনের খেলোয়াড় পঞ্চম শেষার্দ্ধে ইত্যাদি। আবার পাকা খেলোয়াড়কে মারিতে হইলে প্রথম লাইনের খেলোয়াড় প্রথম ও দ্বিতীয় শেষার্দ্ধ হইয়া তৃতীয় প্রথমার্দ্ধে যাইবে, ইত্যাদি। যদি রক্ষী-খেলোয়াড়ের দুই পা লাইনের মধ্যে না থাকে তবে আক্রমণকারী তাহাকে ধাক্কা দিয়া অন্য ঘরে যাইতে পারে। এই খেলাতে খুব সতর্ক এবং চটপটে হওয়া আবশ্যক। ১৫ মিনিট মধ্যে আক্রমণকারীগণ যত পয়েন্ট করিল, মধ্যস্থ তাহা লিখিয়া রাখিবেন। ১৫ মিনিট পরে রক্ষীগণ আক্রমণকারী হইবে এবং পূর্ব্ববৎ খেলা চলিবে। খেলা-শেষে যাহাদের পয়েন্ট বেশী তাহারা জয়ী। নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে যদি কোন পয়েন্ট না হয় তবে প্রত্যেক দলকে পাঁচ মিনিট করিয়া সময় দিয়া খেলা হইবে; তাহাতে যাহাদের "পাকা" খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেশী হইবে তাহারা জয়ী।

এই খেলায় অন্ততঃ দুই জন মধ্যস্থ থাকা আবশ্যক।

মরণ-বাঁচন—খেলোয়াড় সংখ্যা ১০হইতে ১০০জন। খেলোয়াড়গণকে সংখ্যানুসারে সমান কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া একটি লাইনের পশ্চাতে 'কাইলে' দাঁড় করাইতে হইবে। কাইল এমনভাবে করাইতে হইবে যাহাতে পিছনে যথেষ্ট জায়গা থাকে এবং প্রত্যেক দুই 'কাইলের' মধ্যে অন্ততঃ ৪ হাত স্থান থাকে। খেলোয়াড়গণ সামনে বড় এবং ক্রমে পশ্চাতে ছোট এইভাবে দাঁড়াইবে।

মধ্যস্থ 'প্রস্তুত' (Ready) বলিলে প্রত্যেক খেলোয়াড় দুই পা ফাঁক করিয়া প্রত্যেকের ডানহাত দুই পায়ের মধ্য দিয়া পিছনের দিকে চালাইয়া দিবে এবং প্রত্যেক খেলোয়াড় বাঁ-হাত দিয়া সম্মুখের খেলোয়াড়ের ডান হাত শক্ত করিয়া ধরিবে।

মধ্যস্থ সঙ্কেত করামাত্র সর্ব্বপশ্চাতের খেলোয়াড় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িবে এবং সম্মুখের খেলোয়াড়গণ পশ্চাৎ দিকে চলিতে থাকিবে। প্রত্যেকে তাহার ঠিক পিছনের খেলোয়াড়কে অতিক্রম করা মাত্র ঐভাবে শুইয়া পড়িবে। এইভাবে ১নং খেলোয়াড় সকলের পশ্চাতে যাইয়া শুইয়া পড়িয়া আবার উঠিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাহার হাতে টান পড়ে সে উঠিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইভাবে যে দল সর্ব্বপ্রথমে ঠিক পূর্ব্বাবস্থায় পৌঁছিবে তাহারা জয়ী।

খেলার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে কাহারও হাত না ছুটিয়া যায় এবং কাহারও গায়ে 'পাড়া' না পড়ে। যদি কাহারও হাত ছুটিয়া যায় তবে তাহার দল খেলায় বাদ হইবে। প্রায়ই দেখা যায় যাহারা ধীরভাবে চলে তাহারাই জয়ী হয়।

লাঠিয়াল—দুই বা ততোধিক দলে প্রতিযোগিতা এক সঙ্গে চলিতে পারে। ২ দলের প্রতিযোগিতা বেখান হইল। এক এক দলে ১২ হইতে ২০ জন খেলোয়াড় থাকিবে। ২ দল খেলোয়াড় সমান ২ ভাগে বিভক্ত হইয়া

মধ্যের ২ দিকে এমনভাবে দাঁড়াইবে, যাহাতে ২ দলের ১নং খেলোয়াড় মধ্যের সঙ্গে সমরেখায় থাকে। ৩, ৪, ৭, ৯, ১১ ক্রমে ক্রমে তাহাদের পাছে পাছে থাকিবে। অপরার্দ্ধ অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যক খেলোয়াড়গণ তাহাদের বিপরীত দিকে ঐভাবে তাহাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে প্রত্যেক দলের ছোট ছোট ছেলেরা সামনে থাকিবে মধ্যস্থ ১নংদের হাতে ২ খানি লাঠি দিয়া সকলে প্রস্তুত হইলে বংশীধ্বনি করিবেন, অথবা "যাও" বলিবেন তখন ১নংদ্বয় লাঠি নিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া ১নংদের হাতে দিয়া পশ্চাতে যাইয়া ১২নংদের পেছনে দাঁড়াইবে ২নং সেই লাঠি নিয়া ৩নংদের হাতে দিবে এবং পেছনে গিয়া দাঁড়াইবে. এবং সমস্ত খেলোয়াড় এক পদ অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপভাবে লাঠি যখন ১২নংদের হাতে পড়িবে তখন তাহারা লাঠি নিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া মধ্যের হাতে দিবে। যে দলের শেষ খেলোয়াড় আগে যাইয়া মধ্যের হাতে লাঠি দিবে তাহারা জয়ী। যদি ৩ বা ততোধিক দলে খেলা হয় তবে শেষ খেলোয়াড় লাঠি নিয়া মধ্যের হাতে লাঠি না দিয়া মধ্যস্থ যে লাইনে দাঁড়াইয়া থাকিবেন সেই লাইন স্পর্শ করিবে। যে দলের শেষ খেলোয়াড় ঐ লাইন পূর্ব্বে স্পর্শ করিতে পারিবে তাহারাই জয়ী।

লাঠি হাতে আসিবার পূর্ব্বে কেহ সীমারেখা ত্যাগ করিতে পারিবে না। খেলোয়াড়দের দৌড়ের পাল্লা ২০ গজ হইবে, কিন্তু যদি ছেলেরা ছোট ছোট হয় তবে পাল্লা কমাইয়া দেওয়া ভাল। ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে অন্ততঃ ২ গজ স্থান থাকা আবশ্যক, অন্যথা দৌড়ের সময় ধাক্কা লাগিতে পারে।

ক্রমশঃ

বিবাহে পণপ্রথা ও তাহার প্রতিকার

শ্রী গিরিবালা রায়

পৃথিবীতে বহু প্রকার জাতি—সভ্য, অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, বর্ব্বর। তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা পরিণত বা অপরিণত যাহাই কেন হউক না, সকলেই সমাজের বহুবিধ রীতি-নীতি, আচার এবং সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই চলে। বিবাহ সমস্ত জাতি ও সমাজেই অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার বলিয়া প্রচলিত আছে। তাহার মধ্যে হিন্দুর বিবাহবন্ধন একটি প্রধানতম সংস্কার বলিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন এবং বিবাহকে হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধন বলিয়াছেন। ঋষিরা হিন্দুসমাজটাকে সর্ব্বতোভাবে একটা ধর্ম্মভিত্তির উপরে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং হিন্দুবিবাহ একটি অতি পবিত্র ধর্ম্মমূলক সংস্কার। আজ-কাল নানাকারণে, বিশেষ—ধর্ম্মভাবের শৈথিল্য-হেতু বিবাহ-বন্ধনের পবিত্র ভাব যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার একটি বৃহৎ কারণ বিবাহে পণপ্রথা।

হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাই বিবাহ অষ্টম প্রকার বর্ণিত আছে, যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। বিদ্যা ও সৎগুণসম্পন্ন পাত্রকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাকে বস্ত্র-অলঙ্কার দ্বারা শোভিতা কন্যাদান—ব্রাহ্ম বিবাহ। যজ্ঞের ঋত্বিককে কন্যাদান—দৈব বিবাহ। যাগাদি ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য একজোড়া গাভী গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে যে কন্যাসম্প্রদান—তাহার নাম আর্ষ বিবাহ। "তোমরা উভয়ে একত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিবে", বরকে এই কথা বুঝাইয়া অলঙ্কার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কন্যাপ্রদান—প্রাজাপত্য বিবাহ। কন্যার পিতাকে এবং কন্যাকে অর্থ দিয়া কন্যাগ্রহণ করা—তাহার নাম আসুর বিবাহ। এই অর্থের নাম কন্যাশুল্ক বা কন্যাপণ। বর-কন্যা নিজ নিজ প্রণয়বশতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক যে বিবাহ-তাহার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। ছলে পরাজিত করিয়া কন্যা-গ্রহণ—রাক্ষস বিবাহ। আর নিদ্রাভিভূতা কন্যাগ্রহণ অর্থাৎ

জোর করিয়া সতীত্ব নাশ করা—পৈশাচ বিবাহ। এই অষ্ট প্রকার বিবাহের ভিতর শেষোক্ত বিবাহ নাতিসঙ্গত নিন্দনীয় ও পাপজনক বিবাহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বৈদিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, বেদের কালে যৌবন-বিবাহ ও গান্ধর্ব বিবাহ বিশেষ প্রচলিত ছিল। যুবক-যুবতীর ইচ্ছা থাকিলে, উভয়ের পিতামাতার সম্মতি, বিশেষ—কন্যার পিতার সম্মতি পাইলে বর কন্যার বাড়ীতে যাইয়া কন্যা বরণাদায় গ্রহণ করিতেন। কালধর্মে এখন সমস্ত বিবাহ লোপ পাইয়া (কেন কি কারণে এসব বিবাহ লোপ পাইল তাহার সম্যক আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে) ব্রাহ্ম ও আসুর এই দুই বিবাহই সমাজে চলিতেছে।

বর গুণবান না হইলে কন্যার পিতাকে ধনলুব্ধ করিয়া পত্নী পাইতে হয়, আর কন্যা রূপবতী গুণবতী না হইলে বরের পিতাকে ধন দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া পাত্রলাভ, এই দুই প্রথাই আসুর বিবাহ মধ্যে গণ্য। সমগ্র হিন্দু-সমাজ পর্যবেক্ষণ করিলে এই দ্বিবিধ আসুর বিবাহ বিস্তর দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ সকল জাতির মধ্যেই নির্গুণ বর ও নির্গুণা কন্যা আছে। কুৎসিত, দুর্বল, মূর্খ, বৃদ্ধ—ইহাদের বিবাহ শাস্ত্রে নিষেধ আছে। ব্যাধিগ্রস্তা, কুরূপা, অঙ্গহীনা কন্যার বিবাহও শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু সে বিধি-নিষেধ সমাজের স্তরে অন্তর্ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এখন কুৎসিত, দুর্বল, বৃত্তিহীন, মূর্খ বরও অবাধে কন্যা পাইতেছেন, আর কুরূপা, দুর্বলা, হীনাঙ্গী নারীর বিবাহ তো সমাজের আইনানুসারে পিতামাতা দিতে বাধ্য, নতুবা তাঁহারা সমাজে নিগৃহীত হইবেন।

শাস্ত্রে কন্যা-বিক্রয়ের উল্লেখ ও তজ্জনিত যে ঘোরতর নরক অবশ্যম্ভাবী ইহারই বর্ণনা বিশেষভাবে দেখা যায় কিন্তু বরপণের বিষয় কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহাতেই বেশ নিরূপিত হইতেছে যে বরপণ শাস্ত্রীয় নহে।

বর্তমান যুগে কন্যাপণ শিক্ষিত সমাজে উঠিয়া যাইতেছে, বরপণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে। বরের মূল্য নিলামের ঘরে ক্রমশঃ বাড়িতেছে। অবস্থা যাহা দাঁড়াইতেছে, আর কিছুদিন এরূপ থাকিলে রীতিমত বর-বিক্রয় ব্যবসায়ের কোম্পানী খুলিতে পারা যাইবে।

কন্যার দোষ থাকিলে বর জোটে না, বরের দোষ থাকিলে কন্যা জোটে না,—ইহা বরপণ ও কন্যাপণের উৎপত্তির একটি প্রধান কারণ। কিন্তু সমাজের গতিতে কন্যার বিবাহের নির্দিষ্ট কাল রহিল আর পুত্রের বিবাহের তাহা রহিল না। এজন্য (ভদ্রগৃহে) বরপণের ভয়াবহ আর্ত-নাদে দেশ পরিব্যাপ্ত। একই ব্যক্তির পুত্রকন্যা দুই-ই আছে ; সুতরাং সে কন্যার বিবাহ দিবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া—সে অর্থ সংগ্রহের হেতুও পিতার অনেক স্থলে ব্যগ্র হইয়া বরপণের প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব হয় না।

শাস্ত্র কন্যাগুরুকে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞগণের চেষ্টাতে মধ্যযুগে সমাজে গৌরীদান প্রথা প্রবর্তিত হয়।

"দশপূর্ব্বান্ পরান্ বংশ্যানাত্মানঞ্চৈক বিংশকম্।
ব্রাহ্মী সুতঃ সুকৃত কৃদ্মোচয়ত্যা নরঃ পিতৃন্॥"

ইহাতে মনু ব্রাহ্ম বিবাহের সমর্থন করিতেছেন। সংবর্ত বলিয়াছেন :—

"অলঙ্কৃতা কৃতঃ কন্যা বরায় প্রদীয়তে।
ব্রাহ্মোদ্বাহেন বিধিনা বদ্যাতাং সুপূজিতাম্॥
সকন্যায়াঃ প্রদানেন প্রেত্য তিষ্ঠতি পুরুষাম্।
সাধুবাদং লভেৎ স্বর্গে কীর্তিং প্রাপ্নোতি পুরুষাম্॥
অলঙ্কৃতা পিতা কন্যাং যুবগাচ্ছাদনা সনৈঃ।
দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নোতি পূজিতস্ত সুরাদিবু॥"

"অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মবিবাহ-বিধানানুসারে কন্যাকে সমর্চিতা ও বিভূষিতা করিয়া সবস্ত্র পাত্রে দান করেন, তিনি সেই কন্যাদানরূপ সুকৃতিবলে অনায়াসেই মঙ্গল, সজ্জন-বর্গের সাধুবাদ এবং সৎকীর্তি লাভে অধিকারী হন। যে ব্যক্তি হোমমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত করিয়া কন্যাদান করেন, তিনি জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের শত শত গুণ ফল প্রাপ্ত হন। যে পিতা কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার ও আসনাদি দ্বারা সুসজ্জিতা করিয়া সম্প্রদান করেন, তিনি স্বর্গপ্রাপ্ত হন এবং সুরগণের মধ্যে সম্মিলিত হইয়া থাকেন।"

এই প্রকারে শাস্ত্রকারগণ কন্যাদানের ফলস্বরূপ বহু-বহু উক্তি করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বে বরপণ বলিয়া কিছু ছিল না তখন বরগণের নানা উপায়ে কন্যাগ্রহণই বিধি ছিল। কন্যা স্বয়ম্বরা হইতেন, ইচ্ছানুরূপ

শক্তিশালী করিতেন। কন্যাকে কতটুকু দান পিতার ইচ্ছা ও অবস্থার উপর নির্ভর করিত; তবু ঋষিগণ নিয়ম করিয়া গেলেন—কন্যা গ্রহণোপলক্ষে অর্থ দান অথবা গ্রহণে ঘোর নিরয়গামী হইতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ বিবাহ-প্রথার এইরূপ বিপরীত ফল দাঁড়াইবে বুঝিলে বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ বরপণের জন্যও মহাপাতকের ব্যবস্থা করিতেন। জানি না, তাঁহারা নারীজাতির প্রতি অন্যান্য কঠোরতার সৃষ্টি যেমন খুবই সন্তর্পণতার সহিত করিয়া গিয়াছেন, ইহাও সেই উদ্দেশ্যমূলক কি না। নতুবা দূরদর্শী ঋষিগণ কেন এমন ভুল করিলেন?

যাক্, শাস্ত্রোক্ত বিবাহের একটির ভিতরও যখন বরপণের কিছুমাত্র উল্লেখ দেখা যায় না তখন ইহা যে কেমন করিয়া কি প্রকারে সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল ইহা বস্তুতঃ ভাবিবার বিষয়। হিন্দুসমাজ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বালাবিবাহ-রোধে ভয় পাইয়া থাকেন, কিন্তু এই বরপণরূপ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার কিরূপে সমাজে স্থান পাইয়া গৌরীদানপ্রথা কেন কি কারণে হিন্দুসমাজে একালে বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছিল সে রহস্য ভেদ করা দুরূহ। তবে বরপণের জন্য এপ্রথা কতকাংশে যে দায়ী নহে ইহা বলা যায় না। কন্যার একটি নির্দ্দিষ্ট বয়ঃকাল, এই নিয়মহেতুই সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়—যে বয়সে মেয়ের বিবাহ-সময় উপস্থিত হইত (এখনো কোনও জাতের ভিতর বহুল পরিমাণেই দৃষ্ট হয়) অর্থাৎ অষ্টম বৎসরের মেয়ের অনুরূপ। পাত্রের জন্য বিবাহ-বয়সের অনুশাসন ছিল না, সুতরাং বরের পিতাকে কন্যার পিতার ধনদ্বারা বশীভূত করিয়া কন্যাদানে প্রবৃত্ত হইতে হইত। বল্লালের কৌলীন্যপ্রথাও ইহার জন্য প্রভূত দায়ী। অবশ্য ইহাতে কুলমর্য্যাদাহেতু বরপণ ও কন্যাপণ উভয়ই চলিত অর্থাৎ কুল যাহার থাকিত ঘরের পুত্রকন্যার অভাবহেতু তাহাকে অর্থদ্বারা বর অথবা কন্যা আনয়ন করিতে হইত। এখন এ কুলমর্য্যাদা অবশ্য খুব বিরল, যাহার পুত্র তাহারই কুল। কন্যার পিতার কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে, এই প্রচণ্ড বাধ্যবাধকতা সমাজের একটি বড় কথা। যিনি মেয়ে বিবাহ দিতে অক্ষম হইবেন সমাজে তাঁহাকে একঘরে হইয়া থাকিতে হইবে। কুৎসিৎ, কুরূপা, নির্গুণা কন্যাকেও পিতা বিবাহ দিতে বাধ্য নতুবা জাতি যায়। অতএব বরের পিতাকে তাঁহার অর্থদ্বারা বশীভূতের প্রয়াস স্বাভাবিক।

আর একটি প্রধান কথা—অর্থসমস্যা। কন্যার পিতৃধনের কোনো অধিকার নাই, নিজে স্বাবলম্বী হইবারও অধিকার নাই, এজন্য শিক্ষিত উপার্জ্জনক্ষম বরের হস্তে কন্যা প্রদানের জন্যে গরীব পিতা ভিটামাটি বিক্রয় করিতেও প্রস্তুত হন। অবশ্য ধনীসম্প্রদায়ের ইহাতে ক্ষতির কোনও কারণ নাই, তাঁহারা বেশ সুখে কন্যাকে রাখিবার প্রয়াসী হইয়া অতিরিক্ত পণ দিয়া পণের রেট বাড়াইয়া দিতেছেন।

একটি ভাগচেলের পিছনে দশটি কন্যার পিতা ঘোরাঘুরি করিতেছেন, ইহাতে বরের চাহিদা বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে।

আজকাল জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতন্ত্র ও ব্যয়বহুল, বিবাহবন্ধন অর্থসমস্যার একটি প্রধান অঙ্গ। দেশের দারিদ্র্য-দূরীকরণের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান যত কিছুর উন্নতিই আমাদের হউক না কেন অর্থসমস্যা আমাদের তো কমিতেছে না। সুতরাং নারীরাও কিছু কিছু উপার্জ্জনক্ষম হইলে মঙ্গলজনক নহে কি? এদেশে সমাজ একটি নহে, এক বাংলাদেশেই বহু জাতি বহু সমাজ। সমাজিক বন্ধনের সহিত বিবাহবন্ধনের বিশেষ সংযোগ আছে। কোন কোন সমাজে (বিশেষ নিম্নশ্রেণীর সমাজে) কন্যাপণ এখনো প্রচলিত আছে। দেখা যায় যে সমাজে কন্যাসংখ্যা কম সে সমাজেই কন্যাপণের আধিক্য। এ সব সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে কন্যাপণের হ্রাস হওয়া সম্ভব। ভদ্রসমাজে তো বিবাহ-বন্ধন একটা রীতিমত ব্যবসায় পরিণতি হইয়াছে। পিতামাতার ইচ্ছার প্রতি পাত্রপাত্রীর বিবাহ নির্ভর করিতেছে। ইহা একপক্ষে যেমন ভাল আবার একপক্ষে মন্দও, কারণ বেতন-পটোলের ন্যায় বরের পিতা কন্যা বাছিয়া নিতেছেন—বিবাহের দায়িত্ব বরকন্যার কাহারো ভাবিবার বা বুঝিবার শক্তি নাই। বিবাহের আদর্শ ইহাতে অনেক দূর হইয়া গিয়াছে। মেয়েদের পরাধীনতা ইহার জন্য দায়ী নহে কি? পাত্রের পিতার ও পাত্রের ইচ্ছার উপর তাহাদের জীবনকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতে হয়। কন্যার শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা

নাই অধিকন্তু পুত্রের শিক্ষায় অর্থ প্রচুর ব্যয় হয় ও বধূকে গৃহে আনিয়া আজীবন ভরণপোষণ করিতে হয় প্রত্যেক গৃহেই পুরকন্যা আছে, অর্থসমস্যাও আছে।

এ সামাজিক দুর্নীতি অপনোদনের জন্য দরিদ্র পিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্তি দিবার জন্য এদেশে শোচনীয় ঘটনাও বিস্তর পরিলক্ষিত হইতেছে, কিন্তু সে দিকে দুর্ভাগ্যের দৃষ্টি কোথায়? আজকাল নারীজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, প্রত্যেক নারীর ভিতর কিছু না কিছু মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিতেছে, তাঁহারা সমাজের দ্বারা কিরূপ অনাদৃতা ও অপমানিতা হইতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। যে গৃহে কন্যা জন্মিতেছে সে গৃহেই পিতামাতার মুখ উদ্বেগাকুল হইতেছে; কন্যা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জন্মের জন্য নিজেকে দায়ী করিতেছে ও পিতামাতার দুঃখ দূর করিবার জন্য অনন্যোপায় হইয়া অনেক স্থলে মৃত্যুকেই বরণীয় মনে করিতেছে। এই পাপ সমাজদেহ হইতে যত দিনে দূর না হইবে, কত শত স্নেহলতার যে আবির্ভাব হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তারপর অর্থের অভাবে পিতামাতা বৃদ্ধ অকর্মণ্য বরে যুবতীকন্যা সম্প্রদান করিয়া তাহার ফলে বৈধব্যের নিদারুণ সঙ্কট আনয়ন করিতেছেন। সমাজ ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ বরকে কন্যাদানে বাধা দিতেছেন না, ১০বৎসরের বিধবা মেয়েকে চিরদিন পরের গলগ্রহ থাকিয়া হাহাকারে দিন কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও আজকাল মুখে অনেকে সমাজ-সংস্কারক সাজিতেছেন, সভাসমিতি বক্তৃতাও কম হইতেছে না, কিন্তু কাজ খুবই ধীরভাবে চলিতেছে।

যদি জনমতে কাজ চলিত তবে বাল্যবিবাহ-রোধ হেতু আজ আর সর্দ্দারিবেশের প্রয়োজন হইত না। ইহাতে বরপণের কিছু উপকার হইতে পারে, ভদ্রসমাজের সর্দ্দারিবেশে উপকার ছাড়া অপকার হয় নাই কিন্তু অভদ্র সমাজে ইহার ফল কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা ভাবিবার বিষয়। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন বাল্যবিবাহ ইহাতে রোধ হইবে সত্য কিন্তু অভদ্র শ্রেণীর ভিতর কন্যাপণের অত্যাচার বেশী চলিবে। ছোট মেয়েটিকে যে দামে বরের পিতা ক্রয় করিতে পারিত বড় হইলে তাহার দাম আরো বাড়িয়া যাইবে।

যাক্, যে নারী একদিনে শক্তিস্বরূপিণী—পুরুষের সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণী ছিলেন, আজ বর্ত্তমানে সেই নারী হীনা, পরাধীনা, পুরুষের বিলাসসঙ্গিনীরূপে পরিণতা। নারীর সম্মান ও আদর কোথায়? রবি বাবু বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা দেশে মেয়ে ও ম্যালেরিয়া কাহারো খুঁজিয়া আনিতে হয় না, আপনি ঘরে আসে।" এ বড় সত্য কথা। কিন্তু এ দেশেই একটি কন্যার স্বয়ম্বরে লক্ষ রাজার অধিষ্ঠান হইত; পত্নী-গ্রহণের জন্য প্রত্যেকের আকুল আগ্রহ ছিল; কত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া কঠোর শক্তি সঞ্চালন দ্বারা পুরুষ নারীকে নিজ সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতেন। আর আজকাল? কন্যার পিতার প্রচুর অর্থের ভাণ্ডারের উপর তাহার ভাগ্য নির্ণয় করিতেছে। এসব দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় যে কন্যা-শুল্ক বরং ছিল ভাল, তাহাতে নারীর একটা দাবী নির্দ্ধারণ হইত; এই যে একটি বরের পিছনে শত মেয়ের আবেদন—নারীসম্মানের বিস্তর হানি করিতেছে। তাই বলি, নারী যে দিন আত্মসম্মানের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিবে—নিজের হাল নিজে ধরিতে পারিবে, পুরুষ তখনই নারীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে। এই দারুণ ব্যাধি সমাজদেহ হইতে কি প্রকারে দূর হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া প্রতিকারের চেষ্টায় প্রত্যেক সমাজ-নেতাগণ অবহিত না হইলে আর উপায় নাই। দেশের ধনীসম্প্রদায় ইহার প্রতি দৃষ্টি দিলে এই বরপণরূপী মহাপাপ দেশ হইতে সমাক না পারিলেও কতকাংশ অবশ্যই দূর করিতে পারেন।

কন্যার পিতাকে কন্যার বিবাহের জন্য সমাজের নিকট লাঞ্ছিত হইতে না হইলে অর্দ্ধেক বরপণ দূর হইবে। পুত্র-কন্যাকে আপন আপন বিবাহের জন্য কতক স্বাধীনতা হিন্দুসমাজেও দিতে হইবে বই কি? কিন্তু তাহাদের শিক্ষার প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি করিতে হইবে, স্কুলকলেজ ছাড়াও গৃহে নৈতিক শিক্ষার জন্য পিতামাতাকে সতর্ক থাকিতে হইবে। অর্থাৎ অর্থকরী বিদ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া জ্ঞান ও নীতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। তরুণতরুণীর মন যাহারা বিবাহ করিবে, তাহাদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে—এই বিবাহের পণপ্রথা। তাহারা যদি একযোগে "বিবাহে পণ গ্রহণ করিব না" এই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তার সহিত করিতে পারে তবে অবশ্যই কাজ হয় সন্দেহ নাই।

তরুণগণ উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করিবে না, দরিদ্র ও কন্যা পিতার অর্থনাশনার ইহন বিবাহ করিয়া না যোগাইয়া নিজ কার্য্যকারিতা শক্তিদ্বারা পূরণ করাই সঙ্গত নহে কি?

মেয়ের বাপ যেমন বরের পাশ-ফেল্ দেখিয়াই মূল্যাত্ব নির্ণয় করিতেছেন, আবার বরের বাপ তেমনি কন্যার গুণাগুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া: শারি রূপের উপরই আগ্রহ দেখাইয়া থাকেন। প্রত্যেকেই "কালো মেয়ে বিবাহ করিব না" বলিলে এদেশে চলিবে কেন? কারণ এ দেশের অধিকাংশ মেয়েরই রংই সম্বল। কুরূপ বরের সুন্দরী মেয়ে আকাঙ্ক্ষা না করাই ভাল। এই রং কালোর জন্যও কন্যার পিতাকে বিস্তর বরপণ যোগাইতে এবং বিপদগ্রস্ত হইতে হয়।

পিতৃধনের অধিকারিণী কন্যাকেও করিতে হইবে। আইনদ্বারা ইহা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক ধনী পিতার কর্ত্তব্য।

এক কথায় দেশ যতদিন নারীকে নিজের আসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিবে ততদিন কার্য্যতঃ কিছুই হইবে না। স্বামীজি বলিয়াছেন—"আমরা কি মানুষ? আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি, তার ফলে আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন এবং দরিদ্র।"

অবশ্য আমার প্রবন্ধ পড়িয়া কেহ মনে না করেন আমি বলিতেছি প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে পিতামাতার অবাধ্য হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইতে হইবে এবং বিবাহ-ব্যাপারেও আপন ইচ্ছায় যোগাযোগের বিচার রহিত হইবে। পাশ্চাত্য যুবকযুবতীর উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থন আমি মনেও করিতেছি না। পূর্ব্বেও বলিয়াছি আবারও বলিতেছি—অভিভাবক-দেরই উচিত তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষায় এমনভাবে গঠিত করিবেন যে প্রয়োজন বুঝিয়া তাহারা নিজ নিজ বিবাহের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হইতে পারে এবং ভুল না করে। কদাচিৎ কেহ ভুল করিলে সে জন্য কেহ দায়ী হইতে পারে না।

আজকাল যে দুই একটি বরপণ ছাড়া বিবাহ হইতেছে, তাহাতে দেখা যায় কন্যার পিতা তাঁহার সাধ্যানুসারে যৌতুক দিয়া থাকেন। ইহাতেই বুঝা যায়, আপন সন্তানকে যৌতুকদান করিতে কাহারো অসাধ নহে। পূর্ব্বাপর কন্যাজামাতাকে যৌতুকদান প্রথা আমাদের আছে। জোর করিয়া আদায় না করিলেও অর্থশালী পিতা কন্যাজামাতাকে বরণ করিয়া যৌতুকে পরিতুষ্ট করেন; বোধ হয় ধনী পিতার তাহা কর্ত্তব্যও, কারণ সন্তান বাপ-মায়ের নিকট উপকারের আকাঙ্ক্ষা রাখে। এজন্য গরীব পিতার সে সাধ মিটিলনা বলিয়া তাহার কন্যাজামাতার অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং নিজেদের ক্ষমতায় পিতা ও শ্বশুরের দারিদ্র্য-মোচনের সহায়তা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি প্রত্যেক দেশ ও জেলাতে যুবসম্মিলনীতে তরুণ-গণ "বিবাহে পণ গ্রহণ করিব না" এই প্রতিজ্ঞা করিতেছে —ইহা অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা। সমাজপতিদিগের প্রতি হাজার দোহাই দিয়া দেখা গিয়াছে, ফল যাহা হইতেছে তাহাতো সকলেই দেখিতেছেন। সমস্ত ভরসাই তরুণ-তরুণীদের উপর। আমাদের পরাধীন সমাজ গতানুগতিকভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন বহু আয়াসসাধ্য। যাহার পিছনে রাজশক্তি নাই অর্থাৎ যে দেশের রাজাই বিদেশী, তাহাদের সমাজের মূল্য কতটুকু? নিয়ন্তার যেখানে অভাব সেখানে নিয়ন্ত্রণের শক্তি কতখানি হইতে পারে? এ দেশের একই জাতির ভিতর রাজার সমাজ ও হাজার নিয়ম। যে বরপণ প্রথা নিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, আজ যদি দেশীয় শাসন থাকিত তবে কোন্ দিন তাহা উড়িয়া যাইত। যাহা নিন্দনীয়, দেশের অনিষ্টকর তাহা এইরূপে চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব হইত কি? নতুবা বিশ বৎসর যাবৎ এ বিষয় নিয়া সভা-সমিতি ও বলাবলি কম চলিতেছে না, কে কার কথা শুনিতেছে? এ দেশের মানুষ সকল অবস্থাকেই প্রকৃতিগত ভাবিয়া মানিয়া লইতেছে। রাজাও নাই, নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার শক্তিও নাই।

পৌরাণিক একটা উদাহরণ মনে আসিল—ত্রেতাযুগে রামরাজত্বে শূদ্রকের তপস্যায় ব্রাহ্মণবালকের প্রাণহানি হইল। ব্রাহ্মণ রাজার নিকট বিচারপ্রার্থী হইলেন, জোর করিয়া বলিলেন, "রাম, কেন এমন অঘটন হইল? তুমি রাজা, সুতরাং তোমাকে এর বিহিত করিতে হইবে।" অবশ্য ইহা সৎ কি অসৎ তাহার বিচার এ স্থলে করিবার

কথা নহে, কথা হইতেছে ব্রাহ্মণের কথার অন্তরালে কত বড় দাবী। যেখানে শক্তি সেখানেই দাবীর অধিকার।

বিলাতে বেকার-সমস্যা আছে, কিন্তু তাহারা তো আর করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট নিজেদের ন্যায্য দাবী করিতেছে এবং আদায়ও করিতেছে। আর এ দেশের বেকার-সমস্যার জন্য কতটুকু দাবী আছে আর তাহার গ্রাহ্যই বা কোথায়?

স্বাধীনতা না থাকিলে ধর্ম্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে যেখানে যেরূপ সংস্কারের প্রয়োজন তাহার সহজ প্রবর্ত্তন অসম্ভব। অতএব আমাদের কথিত নীতির উপর দিয়াই চলিতে হইবে। সমাজের প্রতি ভরসা করিয়া তাহার দায়িত্ববোধ উদ্রেক করিবার জন্য চেষ্টা আমার মতে বিফল প্রয়াস।

আমার মূল বক্তব্য এই যে, এ অপমান তরুণ-তরুণীদের, সুতরাং তাহাদের মস্তকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহারা এ অপমান নীরবে গ্রহণ না করিয়া উচ্ছেদ-সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

অভিযান

শ্রী গগনবিহারী রায়চৌধুরী

ছুটির দেবতা, জান কি কেমনে তোমারে ধরিতে চাই?
ছুটাছুটি-ভরা জীবনের মাঝে তোমারে বরিতে যাই।
পূর্ব্ব-অচলে তূর্য্য বাজায়ে
আঁধারের বুক আলোকে সাজায়ে
সূর্য্য যেমন সুরু করে তার
উজ্জ্বল অভিযান,
প্রভাতে, দিবসে চিনে নিয়ে করে সন্ধ্যায় সন্ধান,—
মেঘে মেঘে তার বুক ঢেকে ফেলে, তবু সে পরাণ-পণ
ছুটে ছুটে যায়, সব টুটে যায়, দুর্দ্দম সে জীবন,—
অমনি করিয়া যাব আমি ছুটে,
সুখ-দুখ সব লঘো লুটে লুটে,
বাধা বন্ধন যাবে সব টুটে
জীবনের পথে;
দিবসের শেষে চিনে লবো মোর সুন্দর সন্ধ্যায়।

আমি বলিব না বৈরাগী হ'য়ে—'কোথায় মোক্ষদাতা?'
কর্ম্মের বলে ডাকি দিয়ে সে যে ধর্ম্মের ফল পাতা!
পথে না চলিয়া পথের প্রান্ত
কল্পনা করি' হব না ক্লান্ত,
জীবনে না চিনে জীবন মিথ্যা
বলিব না আমি কভু,
ছুটির দেবতা, ছুটাছুটি-শেষে তোমারে লভিব প্রভু!

শিশুমঙ্গল

ভবিষ্যৎ মাতা ও শিশু

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

আজ যে কুমারী, কাল সে স্ত্রী, পরশ্ব সে মাতা, তার পর দিন হইতে সে শিশুর ধাত্রী, শিক্ষক, ডাক্তার, গুরু সব। ইহা সত্য কথা, যুবতী কুমারী যখন বিবাহিত হইবার জন্য তৈয়ার হয়—তখনই তার বুঝা উচিত সে মাতা হইতে চলিয়াছে। মাতা হইবেই, ইহা তার স্থির জানিয়া লওয়া উচিত। বিবাহের সব চেয়ে পবিত্র কথাটি বোধ হয় এই—দেশের ভবিষ্যৎ সন্তানগণের মাতা হওয়া, অর্থাৎ তারা দেশের ভবিষ্যৎ বীরপুরুষগণের মাতা হইয়া জীবন ধন্য করিবে, দেশকে ধন্য করিবে, জাতিকে ধন্য করিবে, পুত্র-কন্যাকে ধন্য করিবে: ইহার চেয়ে পবিত্র কথা বোধ হয় বিবাহের ভিতর নাই। কিন্তু আজকাল কুমারীরা হয় ত সে কথা মোটেই ভাবে না; তারা ভাবে তাদের জীবনের সাথীর কথা। কিন্তু এটা তাদের বুঝা উচিত, মাতা হইবে বলিয়াই তাদের সাথী চাই, সাথী লাভ করাই উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য মাতা হওয়া—বীরসন্তান প্রসব করা।

যুবতী কুমারীদের কর্তব্য

যখনই কুমারী জানিতে পারিল যে তার প্রাণে মাতা হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, বিবাহের ইচ্ছা তার অন্তরের গোপন কোণে ঘা দিতেছে, আর যৌবনের পরশ আসিয়া তার মনে প্রাণে লাগিয়াছে, তখন হইতেই তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কেন প্রস্তুত হইতে হইবে? কিসের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে? উত্তরে ইহাই বলা চলে,—তাদের সন্তানকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য। আদর্শ মাতা হওয়াই কিন্তু ভারতনারীর প্রধান পবিত্র আদর্শ। ইহার চেয়ে বড় আদর্শ কোন দেশে আছে কি না জানিনা।

মেয়েরা বার-তের বৎসরেই বুঝিতে পারে যে তার হৃদয় চায় মাতা হইতে; অবশ্য এইভাব পরিস্ফুট হয় আরো অনেক পরে—বোধ হয় ষোল-সতর বৎসরে। ভারতের নারীদের দেহে যৌবনের প্রথম পরশ আসিয়া লাগে ১২।১৩ বৎসরের সময়। আর যৌবন পরিপুষ্টি লাভ করে ১৭।১৮ বৎসরে। বার বৎসরের সময় হইতেই তাদের হৃদয়ে মাতৃভাবের প্রথম বিকাশ দেখা যায়। তখন হইতেই অন্য ছোট ছেলেকে বুকে ধরিতে, তাহাকে আদর করিতে, তাহাকে চুমু খাইতে তার ইচ্ছা হয়—মেয়েরা করেও তাই। বার বৎসর হইতে যে পর্যন্ত তারা পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত না হয় এ পর্যন্ত তাহাদের মাতা হওয়ার জন্য শিক্ষার সময়।

ভবিষ্যৎ শিশুর জন্য কর্তব্য

আজকাল ভারতবর্ষে শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশী; ইহার অন্যান্য যত কারণই থাকুক না কেন, মাতাদের অজ্ঞতার জন্য যে অনেক শিশুর মৃত্যু হয় তাহা বলাই বাহুল্য। শিশুদের পীড়াও বেশী, তারও কারণ মাতাদের অনভিজ্ঞতা। তারপর শিশুরা উপযুক্তরূপে বৃদ্ধি পায় না, তাদের শরীর উপযুক্তরূপে পুষ্টিলাভ করে না, তাদের জ্ঞান রীতিমত বৃদ্ধি পায় না, বৃদ্ধির অভাব দেখা যায়, স্বভাবে স্ফূর্তি থাকে না বরং তারা মন-মরা হইয়া পড়ে, ইহার অধিকাংশ কারণ মাতাদের অজ্ঞতা। কাজেই যারা দু'দিন পরে মাতা হইবে, তাহাদিগের পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া সংসারে প্রবেশ করা দরকার।

মাতা হইবে বাগানের মালির মত। মালির যেমন বাগানে কাজ করিবার আগে সমস্ত জানা দরকার, তাহা

না জানিলে সে বাগানের বৃক্ষ ভাল হইবে না, ভাল ফুল দিবে না, ভাল ফল দিবে না আর সে ফল মিষ্টি হইবে না।

মাতা হইতে হইলে রমণীর অনেক কিছু শিক্ষা করা দরকার। কিন্তু আমরা এখানে বিশদরূপে তাহা না বলিয়া কেবল ইহাই বলিব যে, শিশুকে গর্ভে ধারণ করিবার পূর্ব্বে সেই অনাগত শিশুর লালন-পালন শিক্ষাদীক্ষার জন্য কি করা কর্ত্তব্য।

সব চেয়ে বড় কথা—মাতা হইবার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের ভোগবিলাসের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত স্নেহমমতা ঢালিয়া দিতে হইবে শিশুর প্রতি। সাধারণতঃ আজকাল বড় ঘরে দেখা যায় মাতা সন্তান প্রসব করিয়াই দায়িত্ব শেষ করে। শিশুকে ধাইএর হাতে সঁপিয়া দিয়া সে ভোগ-বিলাসের কথাটাই বেশী করিয়া ভাবে। শরীরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে, তাহাতে ভোগ-বিলাসের পথে বাধা আসিবে, অনেকে তাই বুকের দুধ শিশুকে পান করিতে দেয় না। ভোগ-বিলাসের জন্য যে মাতা শিশুকে মাতৃবুকের স্নেহ হইতে বঞ্চিত করে, সে মাতা ত নয়ই —শিশুর শত্রু। তাহাকে মাতা আখ্যা আমরা দিতে পারি না। অন্য কিছু বলিলে বোধ হয় দোষের হইবে না। তাহারা দেশেরও শত্রু। মাতাকে এই ভোগ-বিলাসের পথ ত্যাগ করিতে হইবে। মাতা অর্থ যে ত্যাগ—মাতা অর্থ যে শিশুর জন্য মৃত্যু।

মনস্তত্ত্ব শিক্ষালাভ করা কুমারীদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। শিশুর মনকে বুঝিতে না পারিলে শিশুকে বুঝা যায় না। শিশুর মনকে বুঝিতে না পারার দরুণই ত অনেক শিশু অকালে রোগে ভোগে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশু কাঁদিতেছে, মাতা মনে করিল শিশুর ক্ষুধা লাগিয়াছে: অমনি এক বাটি দুধ খাওয়াইয়া দিল। হয় ত শিশু তখন পাইতে চাহিয়াছিল মাতার স্নেহ,—দেখিতে চাহিয়াছিল মাতার হাসিভরা মুখখানা। আবার যখন শিশুর ক্ষুধা পায় তখন তাকে খুব পাড়াবার চেষ্টা করিয়া শিশুর মনকে অনর্থক জটিল করিয়া তোলা হইল। এই সব না জানার দরুণ শিশু রোগগ্রস্ত হয়। অকালে প্রাণ-ত্যাগ করে।

আর ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে মাতাদের কিছু কিছু জানা দরকার। সামান্য অসুখ হইলেই মাতা অস্থির হইয়া উঠিল। ডাক্তার ডাক হইল। ডাক্তার দেখিল তার টাকা পাওয়ার সুবিধা হইয়াছে—সে অমনি ঔষধের ব্যবস্থা করিল। হয় ত তখন শিশুর এমন কোন অসুখ ছিল না যার জন্য ডাক্তার ডাকা আবশ্যক হইতে পারে। এই ভাবে ঔষধ খাওয়াইয়া শিশুদের কচি নাড়ী পচাইয়া মারা হয়। সামান্য ধাত্রীবিদ্যা জানা থাকিলে আর কোন মুস্কিল নাই। তারপর শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে (Physiology and Anatomy) জানা থাকিলে আরো ভালো।

'A child learns from within"—শিশু মন হইতেই সব শিখে। কাজেই তার শিক্ষার জন্য বাহিরের চাপ দেওয়া ঠিক নয় বা একটু বড় হইলে গৃহশিক্ষকের হাতে দেওয়াও ঠিক নয়, যদি সে গৃহশিক্ষক শিশুশিক্ষায় অভিজ্ঞ না হয়। যদি গৃহশিক্ষক শিশুর মনের মত তাহাকে পরিচালনা না করিয়া নিজের প্রভাবের (Dogmatism) শক্তি ব্যবহার করে, তবে শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট হইল। এইজন্য মাতার জানা আবশ্যক শিশুকে কিভাবে শিশুর ইচ্ছামত সকল সুবিধা দিয়া আদর্শ মানব তৈয়ার করিতে হয়।

তারপর বর্ত্তমান জগতে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে যে বিপ্লব চলিতেছে তার ঢেউ প্রত্যেক নারীর বুকে লাগা আবশ্যক। কমের পক্ষে মন্টেসরী যেসনার (apparatus) ব্যবহার ও শিশুর বুদ্ধি, জ্ঞান, শরীরের বৃদ্ধির পক্ষে তার উপযোগিতা জানা আবশ্যক।

বিবাহিতা ভবিষ্যৎ মাতা

যেসব যুবতীদের বিবাহ হইয়াছে এবং সন্তান হয় নাই, তাহাদেরও দেশের ভবিষ্যৎ-শিশুদের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে। ভোগবিলাসই তাহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। তাহারা মাতৃত্বের ভিতর দিয়া দেশে সমাজে শান্তি বহিয়া আনিবে। দেশের ভবিষ্যৎ-বংশধরদিগকে বীর করিয়া তুলিবে, মানুষ করিয়া তুলিবে। তাহাদিগকে সংযমী হইতে হইবে। বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই যে তাহারা সৃষ্টি করিবার অবাধ অধিকার পাইয়াছে তাহা

নহে। নিজে তৈয়ারি না হইয়া মনকে শরীরকে ভবিষ্যৎ শিশুর জন্য তৈয়ার না করিয়া কেবল বিলাসের খেয়ালে শিশুকে গর্ভে ধারণ করা পাপ বই আর কিছুই নয়। আমরা এখানে একটা কথা বলিতেছি যে, অনেক নারী আছে যারা মোটেই সন্তান চায় না বা সন্তান জন্মগ্রহণ করুক এই উদ্দেশ্যে বিবাহ করে না বা সন্তান-ইচ্ছায় স্বামীর সহবাস করে না, তাহারা কামুকতাকে প্রশ্রয় দিয়াই তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের গর্ভে সন্তান ধারণ করে। যেসব শিশু মাতাপিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জন্মগ্রহণ করে তাহারা মাতাপিতার আদর ত পায়ই না বরং দুনিয়াতে আসিয়া তাহারা নানা বড় ভুল করে না হয় তাহাদের বিকাশ, না হয় তাহাদের জীবনের পরিবর্তিতরূপ। এই সব শিশু যেন মাতা-পিতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এখানে বক্তব্য, কামপিপাসা চরিতার্থ করিতে গিয়া শিশুর জন্ম দেওয়া যেন মাতাদের এবং পিতাদের কর্তব্য না হয়। শিশুকে পাইতে হইবে আপন বলিয়া—তাই তার জন্ম। এই মঙ্গল-ইচ্ছা যদি মাতাপিতার থাকে তবেই সে শিশুর দুনিয়াতে আসার সার্থকতা আছে। আর যদি মাতা শিশুকে পালন-পালন, এক কথায় মানুষ করিয়া তুলিবার ক্ষমতা লাভ না করিয়া শিশুকে গর্ভে ধারণ করে, তবে সে মাতা শিশুর ইষ্টের চেয়ে অনিষ্টই করিবে বেশী। তাই বিবাহিতা হইয়াই যেন যুবতী মাতা না হয়, যতদিন শিশুর জন্য শিশুর জীবন-গঠনের জন্য সে তৈয়ার না হয়। এইজন্য স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি ভবিষ্যৎ শিশুর প্রতি কর্তব্য আছে। সে স্ত্রীকে শিশুর জন্য উপযুক্ত না করিয়া তুলিয়া শিশুকে অকালে ডাকিয়া আনিবে না। তাহাকে সংযমী হইতে হইবে, স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্বন্ধ বজায় রাখিতে হইবে, ব্রহ্মচার্য-সাধিতে হইবে।

মাতাপিতার কর্তব্য

যুবতী মেয়েদের প্রতি তাহাদের মাতাপিতারও একটা কর্তব্য আছে। বিবাহ দিবার পূর্বেই মাতাপিতা মেয়ে-দিগকে মাতা হইবার জন্য তৈয়ার করিবে। আজকাল মাতাপিতা মেয়েকে বিবাহ দেয় যে, মেয়ে বড় হইয়াছে এজন্য। তাহারা খেয়াল করে না যে, এই সব মেয়ের বিবাহ দেওয়া অর্থ তাহাদিগকে জননীর পথে প্রমোশন দেওয়া; জননীর পথে প্রমোশন পাইল কিন্তু জননী হইয়া জননীর কর্তব্য কি তাহা শিখিল না। তাই যতদিন মেয়েরা জননী হইবার গুণ লাভ না করে ততদিন তাহাদের বিবাহ দেওয়া ঠিক নয়। এইজন্য তাহাদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। স্কুল না থাকিলে মেয়েদের জন্য এই প্রকারের স্কুল খুলিতে হইবে। তবে না তারা দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের বীর মাতা হইবে।

অন্ধ্রদেশ কি করে?

গ্রীষ্মের ছুটিতে গিয়াছিলাম—কাথিওয়াড় প্রদেশে সেখানকার শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে অনুষ্ঠানগুলি দেখিতে। কাথিওয়াড়কে ভারতের মধ্যে শিশুশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। কাথিওয়াড়ের ভাবনগরে মণ্টেসরী বালমন্দির একটি আছে। সেখানে শিশুদের (৩ হইতে ৭ বৎসর) মণ্টেসরী প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ভিন্ন মণ্টেসরী শিক্ষার জন্য শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীও তৈয়ার করা হয়। সেখানে দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, একজন বড়ঘরের মেয়ে মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করিতেছেন। তিনি বিবাহিতা। তিনি ত আর মাষ্টারী করিবেন না, তবে কেন তিনি এমন করিতেছেন? তাঁহার সাথে আলাপে জানিতে পারিলাম, তিনি দেশের ভবিষ্যৎ মাতা, কাজেই সেই সব অনাগত শিশুদের জন্য পূর্ব হইতেই তৈয়ার হইতেছেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা শিশুশিক্ষায় অভিজ্ঞা না হইয়া তিনি মাতা হইবেন না। কথাটা আমার মনে খুব লাগিল,—খুব আনন্দ পাইলাম।

তারপর ইউরোপে আর অনেকেই মেয়েকে বিবাহের পূর্বে মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষা দিতেছে। যাহাতে তাহাদের মেয়েরা আদর্শ মাতা হইতে পারে এবং শিশু-দিগকে খেলাধূলা, স্বাধীনতা ও প্রেমের ভিতর দিয়া মানুষ তৈয়ার করিয়া তুলিতে পারে। সেদিন বিলাতের একটি ট্রেনিং কলেজের নিয়মাবলী (Prospectus) পড়িতে ছিলাম, তাহাতে দেখিলাম যাহারা মাষ্টারী করিবে না অথচ শিশুদের জন্য শিক্ষাগ্রহণ করিতে চায় তাহারও বন্দোবস্ত আছে। আমাদের বাংলাদেশে মণ্টেসরী স্কুলই নাই, তার আবার ট্রেনিং দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকিবে কি! বাংলা কিন্তু শিশুশিক্ষার দরার পিছনে।

কলেজের সভানেত্রী

ডাঃ ডোরোথি ষ্টিমশন ব্যাপ্টিস্ট মিশনের গাউচার কলেজের প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে ইহার প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষার পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সম্প্রতি ইনি ইহার কার্য্যপরিচালক-সভার সভানেত্রীরূপে মনোনীতা হইয়াছেন।

প্রতিজ্ঞা-পালনে নারী

কুমারী শন্নো দেবী অমৃতসর কন্যামহাবিদ্যালয়ের (পাঞ্জাব) একজন শিক্ষয়িত্রী ইনি ঐ মহাবিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহের জন্য এই প্রতিজ্ঞা করেন যে উল্লেখিত সংখ্যক মুদ্রা তাঁহার দ্বারা সংগৃহীত না হইলে তিনি আর তথায় প্রত্যাগমন করিবেন না। প্রাণপণ চেষ্টাতেও ভারতবর্ষ হইতে ৮৫ হাজার টাকার অধিক সংগৃহীত হইল না।

দেখিয়া তিনি আফ্রিকা গমন করেন এবং তথায় একমাত্র টাঙ্গানীকা হইতে অবশিষ্ট ৩৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন। টাঙ্গানীকার য়ুরোপীয়ানরা ও তাঁহাকে বাধা দিতে কৃপণতা করেন নাই। কুমারী ভারতের একজন গরীয়সী মহিলা সন্দেহ নাই

সহযোগী সম্পাদিকা

মিসেস্ এথেল মিন্‌জে একখানি বিখ্যাত ডেনিস্ সংবাদ-পত্রের মহিলাপৃষ্ঠার লেখিকা হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছেন। কোপেনহেগেন হইতে প্রকাশিত "এক্‌ট্রা ব্লাডেৎ" পত্রের ইনি সহযোগী সম্পাদিকাও বটেন।

যুদ্ধকান্তি ও শান্তি-মহাসংসদে নারী প্রতিনিধি

ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রাগাপ্যাক্তাম্বিলিত মহা-সংসদে নিম্নলিখিত মহিলারা প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। (বাম হইতে দক্ষিণে—) ১। মিস্ কেথ্‌লিন ডি, কোটনী, ইংলণ্ড; ২। ওয়ানি পন্‌ৎলেৎ, জাপান; ৩। ফ্রু ডোরোথি জন্ ভিসেন, জার্ম্মানী; এবং ৪। মাদাম ঘেরিয়ে দুই পুত্রেফ, ফ্রান্স।

তুর্কীর বিখ্যাতা লেখিকা

শ্রীমতী খালিদে ভাদুব—ইনি তুর্কীর একজন বিখ্যাতা লেখিকা। ইঁহার মূল লেখা নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

সিংহল নারীপ্রগতি সংঘের সভানেত্রী

লেডী বীরাস ভাণ্ডার নায়ক সিংহল নারীপ্রগতি সংঘের সভানেত্রী। সিংহলের নারীসমাজের উপর ইঁহার প্রভাব অনন্যসাধারণ।

চীনে মাটি শিল্পে নারী

এই চিত্রে মাদাম নাথেলিয়া তেসিলেফ-এর পরিকল্পিত ও অঙ্কিত কয়েকটি চীনে মাটির পাত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। শ্রীমতীর শিল্পাগার ওয়াশিংটন নগরীতে। এই শিল্পে ইনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

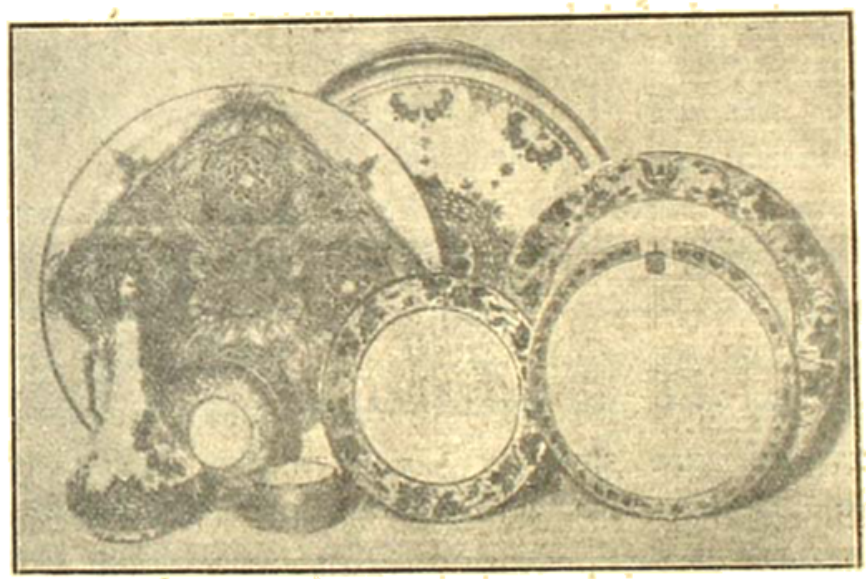

বিদেশ-বিহার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী কমলকলতা বসু

২৩শে জুন। আজ সকালে আমরা জাহাজে করিয়া লেক লেম্যানের উপর বেড়াইতে গেলাম। জাহাজগুলিও বেশ বড়; যাইবার ব্যবস্থা ইত্যাদি সব আছে। জাহাজ ছাড়িবার অল্পক্ষণ পরেই বাজনা আরম্ভ হইল। লেকের দুধারে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্যান্য সহর—প্রত্যেক জায়গায় জাহাজ থামিতেছে এবং যাত্রী উঠা-নামা করিতেছে। দু'ধারে পাহাড় কোথাও খুব উঁচু; এক-এক জায়গায় বরফ পড়িয়া আছে; পাহাড়ের গায়ে চমৎকার বাড়ীগুলি এবং সুন্দর ক্ষেত ও বাগান। লেকের ধারে এখানকার জমি খুব উর্ব্বরা মনে হইল। দৃশ্য অতি রমণীয়। মন্ট্রো নামক স্থানে জাহাজ থামিল। পাহাড়ের গায়ে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের লাইন সোজা উঠিয়া গিয়াছে দেখা গেল; এই ট্রেনে করিয়া গিরি ইত্যাদি পাহাড়ে যাইতে হয়। লেকের শেষ পর্য্যন্ত গিয়া আমাদের জাহাজ অন্য দিক দিয়া ফিরিতে আরম্ভ করিল; এখানে রোন্ নদী লেকে আসিয়া পড়িয়াছে। লেকের এদিকটা ফ্রান্সের অন্তর্গত। আমরা ইভিয়ান নামক স্থানে ৫' ঘণ্টার জন্য নামিয়াছিলাম এখানে কাশা নামক কলের জল খুব ভাল,—প্রবাদ আছে এই জলে বাত সারে। ঝরণার উৎপত্তিস্থান অতি সুন্দরভাবে বাঁধান। সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া সেখানে যাইতে হয়; সমস্ত পথ ইলেক্‌ট্রিক লাইট দ্বারা আলোকিত। একটি কাচের চৌবাচ্চার জল পড়িতেছে এবং পাইপ দ্বারা সহরের নানা স্থানে ইহার জল সরবরাহ করা হয়। এই সুড়ঙ্গের দরজা চাবি-বন্ধ থাকে। ইহার সামনে এখানকার মিউনিসিপ্যাল কেসিনো। এখানে এই জলের ফোয়ারা এবং কল আছে; লোকে এক গ্লাস করিয়া জল কিনিয়া খায়। এখানে এই জলে স্নান করিবার ব্যবস্থা আছে।

সহরটি ছোট হইলেও পাহাড়ের উপর খুব সুন্দর সুন্দর হোটেল আছে এবং অনেকে বাতের চিকিৎসার জন্য এখানে আসিয়া থাকেন। ইভিয়ানে সকলে হেঁটে কথা বলে এবং এখানে ফরাসী ভাষা প্রচলিত আছে। আমরাও জল খাইলাম কিন্তু কিছুই স্বাদ মনে হইল না। ৬টার সময় আবার এক জাহাজে চড়িয়া আমরা জেনিভায় ফিরিলাম। হোটেলে ফিরিতে ৮টা হইল—এ কিন্তু রাত ৮টা বলা যায় না, বিকেল ৮টা বলা উচিত। সর্ব্বসমেত আমরা ১১ ঘণ্টা জলের উপর ছিলাম। আজকের দিনটা খুব ভাল লাগিল

২৪শে জুন। আজ আমরা এখানকার বড় মিউজিয়ম ও রাশিয়ান চার্চ্চ দেখিয়া আসিলাম। রাশিয়ান চার্চ্চে অনেক মূর্ত্তি, সোনার ছবি, সোনা ও রূপার তৈজস-পত্র রহিয়াছে দেখিলাম।

এখানে লেকের উপর একটি প্রকাণ্ড ফোয়ারা আছে—এটি নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়, এখানে শুনিলাম ইহা ৫০০ শত ফুট উপরে উঠে; প্রত্যেক রবিবারে সারা দিন চলে, কিন্তু কোন কারণে এবার রবিবারের বদলে সোমবারে চলিতেছিল। ইহা এক অদ্ভুত দৃশ্য! এত উঁচু যে শেষ দেখা যায় না, কাছে গিয়া দেখিবারও উপায় নাই, জল ছিট্‌কাইয়া কাপড় ভিজিয়া যায়। এই ফোয়ারার উপর রৌদ্র পড়িয়া রামধনুর সৃষ্টি করিয়াছিল।

রাত্রে আহারের পর লেকের ধারে বেড়াইতে গিয়া একজন ভারতবাসীর সহিত আলাপ হইল. ইনি বাঙ্গালোরের লোক, ২১ বৎসরে চাকরী লইয়া লিগ অব নেশ্যানসের অফিসার হইয়া আসিয়াছেন। ইনি কালকালে আমাদের লিগ অব নেশ্যানস্ দেখিতে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন বলিলেন।

২৫শে জুন। আজ সকালে আমরা লিগ্ অব্ নেশ্যানসের বাড়ী দেখিয়া আসিলাম। একজন ভারতীয়

অফিসার আমাদের সঙ্গে করিয়া অধিবেশন-হল, লাইব্রেরী ইত্যাদি দেখাইলেন। এই প্রকাণ্ড অধিবেশন-হলটি কাচের। বিকেলে লেকের ধারে বাগানের ভিতর একটি ছোট মিউজিয়ম দেখিয়া আসা গেল। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের অসভ্য জাতিদের নানা রকম জিনিষ আছে। দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি বহু পুরাতন মৃতদেহ রহিয়াছে। ছোট খড়ির বোনা ঘরের মত—এগুলি তাহার ভিতর যেন বসিয়া আছে! মাংস চামড়া সব আছে কিন্তু সব শুকাইয়া কাঠের মত হইয়া গিয়াছে। মানব-দেহের পরিণাম দেখিয়া মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়।

২৬শে জুন। আজ সকালে দেশের পাঁচখানা চিঠি পাইলাম। কাল যেন যাইবে, সেজন্য আজকেই অনেক-গুলি চিঠি লিখিয়া ডাকে দেওয়া হইল। রাত্রের আহারের পর স্টেশনের দিকে একটি নতুন পার্কে বেড়াইয়া আসা গেল। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে।

২৭শে জুন। আজ আমার স্বামী একটা ক্যামেরা কিনিলেন, মিঃ গুহ এঁকে ক্যামেরার দোকানে লইয়া গিয়াছিলেন। মিঃ সরকার আমাদের খবর লইতে আসিয়া-ছিলেন। বিদেশে স্বজাতি পাইলে সকলেই সাহায্য করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

২৮শে জুন। আজ সকালে খানিকটা জিনিষপত্র গুছাইলাম; রবিবারে আমরা প্যারিস রওনা হইব। রাত্রে লেকের ধারে বেড়াইতে গিয়া মিঃ কুরের সঙ্গে দেখা হইল, উনিই আমাদের লিগ্ অব নেশানস্ দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

৩রা জুলাই থেকে এখানে তিনদিনব্যাপী উৎসব চলিবে। লেকের ধারে ও পোলগুলির দু'ধারে আলো লাগান ও নিশান লাগান হইয়াছে। ইহা বাৎসরিক উৎসব, তিন দিন আলো দেওয়া, বাজী পোড়ান হইবে। আজ কতক-গুলি আলো জ্বালিয়াছে; আমাদের কতকটা দেখা হইয়া-গেল।

এখানে আলোর বাহার দেখিতে হইলে রাত দশটার পর আসিতে হয়। সেদিনে ফ্লোসিনোর একটি ফোটো তোলা হইয়াছিল। তখনও ভাল রকম অন্ধকার হয় নাই বলিয়া আলোর ফোটো ভাল হয় নাই, তখন কিন্তু সবটা হইয়া গিয়াছিল।

২৯শে জুন। আজ জিনিষপত্র সব গুছাইয়া রাখা হইল। বিকেলে খানিকটা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমরা জেনিভার চিহ্ন করেকটি জিনিষ কিনিয়া আনিলাম। এখানে একটি বড় এমব্রয়ডারীর দোকানের সামনে প্রত্যেক দিন তিন-চারিটি মেয়ে বসিয়া এমব্রয়ডারী করে দেখিতে পাই, এদের পরিচ্ছদ সুইস গ্রাম্য মহিলার বেশ, নতুন ধরণের এবং রুচিকর মনে হইল। সুইস এমব্রয়ডারী অতি সুন্দর। নীচে আমাদের হোটেলে একটি সুইস মহিলা তাঁর মেয়েকে লইয়া ছিলেন; তাঁর কাছে শুনিয়া-ছিলাম, তাঁহারা ভাষা শিখাইবার জন্য সন্তান আদান-প্রদান করেন।

এই মহিলা বড় রহস্যপ্রিয়া ছিলেন। তাঁর চেহারা, সাজসজ্জা ও গতিবিধি দেখিয়া তাঁহাকে মধ্যবয়স্কা মনে হইত, কিন্তু পরে শুনিয়াছিলাম, তিনি সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। ফ্রেঞ্চ্‌ল্যাংগুয়েজের হাওয়া অবশ্য খুব ভাল, কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের দেশের সত্তর বৎসরের বৃদ্ধার সহিত উঁহার তুলনা হইতে পারে না।

রাত্রে সকলে শেষবার একবার লেকের ধারে বেড়াইয়া আসিলাম। আজ যেন লেক আরও সুন্দর মনে হইল।

৩০শে জুন। দুপুরে জেনিভা ছাড়িয়া পাহাড়, ঝরণা, নদী ও ছোট ছোট সহর দেখিতে দেখিতে রাত ১১ টার পর আমরা প্যারিসে পৌঁছাইলাম: রাত প্রায় ১২॥ টা—প্যারিসের রাস্তা একেবারে সরগরম—সমস্ত জায়গা আলোকে একেবারে দিন করিয়া রাখিয়াছে। নানা রংয়ের আলো; রাস্তার উপর সুসজ্জিতা সুন্দরী ফরাসী মহিলারা নানারকম পানীয় লইয়া বসিয়া আছেন। এখানে পানীয় কেহ ঘরে বসিয়া পান করেন না। এই দোকানের নাম ক্যাফে। আলো, বাজনায় এবং সাজসজ্জা ও রূপের ঘটা দেখিয়া এ যেন কোন স্বপ্নরাজ্য বলিয়া মনে হইতেছে!

ক্রমশঃ

বাংলার গান

(ইমন্ কুপালী—দাদ্‌রা)

শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি এস্

বাংলার মাটি, বাংলার হাওয়া, বাংলার ভাষা, বাংলার গান,
বাংলার নদীর সলিল-ধারা সকল ছোক্ হে ভগবান্!
বাংলার ছেলে লভুক শক্তি, বাংলার মেয়ে লভুক জ্ঞান;
বাংলার মায়ের স্তনা-দুগ্ধে গ'ড়ে উঠুক্ বীরের প্রাণ।
বাংলার কৃষক-শ্রমিকের রক্ত খেটে শিখুক শ্রমের মান;
বাংলার যুবক পরের অন্ন-ধ্বংসের মুখুক্ অপমান।
বাংলার মেয়ে পুষ্টি পেয়ে করুক্ প্রচুর সন্তান;
বাংলার ছোট-বড় সবাই হউক পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্।
বাংলার পুরুষ-নারী করুক্ দশের সেবায় আত্মদান;
বাংলার হিন্দু-মুসলমানের প্রাণে বহুক্ প্রেমের বান্।
বাংলার প্রতি গ্রামে হাসুক্ শিল্প-কর্মের প্রতিষ্ঠান;
বাংলার পণ্যদ্রব্যের সম্ভার জগৎ জুড়ে লভুক্ মান।
বাংলার মানুষ চলুক্ হ'য়ে সকল কাজে আগুয়ান্;
বাংলার বলে লভুক্ ভারত বিশ্ব-সভায় শীর্ষস্থান।

স্বাস্থ্য-মঙ্গল

শ্রী কুমুদিনী গাঙ্গুলি

আমাদের দৈনিক কাজের মধ্যে যে ক'টি অতি ছোট-খাট কথা আমাদের মনে থাকলে আমাদের স্বাস্থ্য, সংসারের উন্নতি ও আনন্দ অনেক বৃদ্ধি পায় আমি সে বিষয়ে দু'একটি কথা বলছি। সংসারের অনেক সৌভাগ্য বা সমৃদ্ধির মূল্য আমরা বুঝি, কেবল বুঝি না স্বাস্থ্যের মূল্য। রোগ যেমন অশেষ কষ্টের কারণ, স্বাস্থ্য তেমনি সকল আনন্দ ও শ্রীবৃদ্ধির উৎস। তবে যাঁরা দুরুভোগী, কোন গুরুতর রোগে অনেক ভুগেছেন, তাঁরা স্বাস্থ্যের দাম বুঝেছেন। তাই এই কথাগুলি ছোট ও সহজ হ'লেও দৈনন্দিন জীবনে বড় দরকারী। হয় ত বা অনেকে তা জানেন। তবু এর পুনরুক্তিতে উপকার হবে।

আমাদের দেশের প্রাচীন ধারণা এখনও যায় নি। তাই সকালে উঠে সব দরজা-জানালা খোলা বা খোলায় আমাদের অভ্যাসগত হয় নি। বিশুদ্ধ হাওয়ার দাম যে কি তা যদি আমরা বুঝতাম তা হ'লে এমনটি হ'ত না। যত বিশুদ্ধ হাওয়া আমাদের ঘরে-দোরে বুকে-গায়ে খেলতে পাবে তত আমরা সুস্থ ও সুখী হব। আজকাল কঠিন রোগেও অনেক সময় রোগীর ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খুলে রাখা হয়। নিউমোনিয়া রোগীর আরোগ্যের জন্য বারান্দা প্রশস্ত জায়গা। রোগীর পক্ষে বিশুদ্ধ প্রচুর বাতাস অত্যন্ত দরকার। সেই জন্য একটি সামান্যিতে নিয়ম মনে রাখতে হবে। রোগীর ঘরের জানালা এমনভাবে খুলে রাখবে যে ঘরের মধ্যে হাওয়া বেশ এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত চলাচল করতে পারে কিন্তু রোগীর গায়ে তার ঝাপ্‌টা না লাগে। আমরা সর্ব্বদা শুনতে পাই—অমুক হাওয়া বদলাতে বা হাওয়া খেতে গেছেন। এতেই বোঝা যায় যে হাওয়া এত বড় একটি জিনিষ যে তার সন্ধানে বা সেবনের জন্য লোককে অন্যত্র বা দেশান্তরে যেতে হয়।

হাওয়ার মত রোদও একটি বড় জিনিষ। হাওয়ার মত রোদও যত ঘরে-দোরে, বিছানা-পত্রে, উঠানে-নর্দ্দামায় ও

দুর্গন্ধময় স্থানে আসতে পারবে তত আমাদের গৃহের কল্যাণ। রোদ আমাদের গৃহ-সংসার, পবিত্র করেন—সাঁতসেঁতে ও দুর্গন্ধ-দোষ থেকে মুক্ত করেন, আর রোগের বীজ নষ্ট করেন। আর আমাদের দেহের পক্ষেও রোদ অতটাই উপকারী। ইহা আমাদের দেহ সবল ও শক্ত করে,আর পুষ্টি করে। বিলেতে আজকাল অনেক ভীষণ রোগ রোদে আরোগ্য হ'চ্ছে। রোদ আমাদের চির বন্ধু। এজন্যে ছোট ছেলেদের খালি গায়ে রাখা খুব ভাল। রোদে বসা, বেড়ান বা শোয়া স্বাস্থ্যকর। যত আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে-মিশে, ভাবসাব ক'রে, স'য়ে-ব'য়ে চলতে পারবো তত আমাদের মঙ্গল।

এখন আমাদের খাবার জলের কথা একটু বলি। যখনই দেখবে সহরে বা গ্রামে কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক রোগ দেখা দিয়েছে, তখনই খাবার জল ফুটোবে। জল বেশ ভাল ফুটবে। ফোটান জল কিছু ঠাণ্ডা হ'লে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে কলসীতে ছেঁকে ঢাকা দিয়ে রাখবে। কলসী যেন মেটে জায়গায় অর্থাৎ মাটির উপর না বসান হয় মাটি রোগের বীজ বহন করে। কলসী সামিয়ানো জায়গা বা কাঠ কিংবা ইটের উপর রাখবে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল পান বা স্নানের পক্ষে ভাল নয়। শীতকালে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ভাল। এই জল যদি রৌদ্র-তপ্ত হয় তবে বেশী উপকারী।

আর একটি কথা বলি। কথাটি যত ছোট তত বড়। মায়েরা খাবার সময় দেখবেন ছেলেরা যাতে তাড়াতাড়ি না খায়। স্কুলে যাবার বা খেলবার সময় তারা ভাত খায় না, ভাত গেলে। আমাদের গলার দু' দিকে gland আছে। ভাত চিবিয়ে খেলে এর থেকে saliva juice বাইর হয়। এতে হজমের সাহায্য হয়। তাড়াতাড়ি খেলে saliva বেশী বাইর হ'তে পারে না, তা'তে হজমের কাজে বাধা হয়। খাওয়ার সময় অল্প জল খাওয়া উচিত। খাওয়ার দু'ঘণ্টা পরে বেশী জল খাওয়া যায়। রাত্রে খেয়ে ২ ঘণ্টা পরে শোওয়া উচিত। রাত্রের খাওয়া হাল্কা হ'লেই ভাল। একবার পেট ভ'রে খেলে তার ৫।৬ ঘণ্টা পরে আবার খাওয়া যেতে পারে। তবে শিশুদের পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। বয়স ও পরিশ্রমের উপর খাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে। বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়াবস্থায় খাওয়ার পরিমাণ কম হওয়াই ঠিক।

আমাদের দেশে উপবাসের নিয়ম আছে ব্রতাদিতে, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশীতে উপবাস অনেকে করেন। এ যে কি মহৎ নিয়ম আমরা তা ভুলে যাচ্ছি। উপবাসের দ্বারা অজীর্ণ বা অজীর্ণসংক্রান্ত অনেক রোগ এবং বহুমূত্র রোগও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছে।

এই কয়টি মহৎ বিষয়ে কিছু দিন আমরা আলোচনা করি ও একটু অভ্যাস করি। এর পর আমরা অন্য অনেক জানতে পারবো ও জেনে আনন্দ পাবো

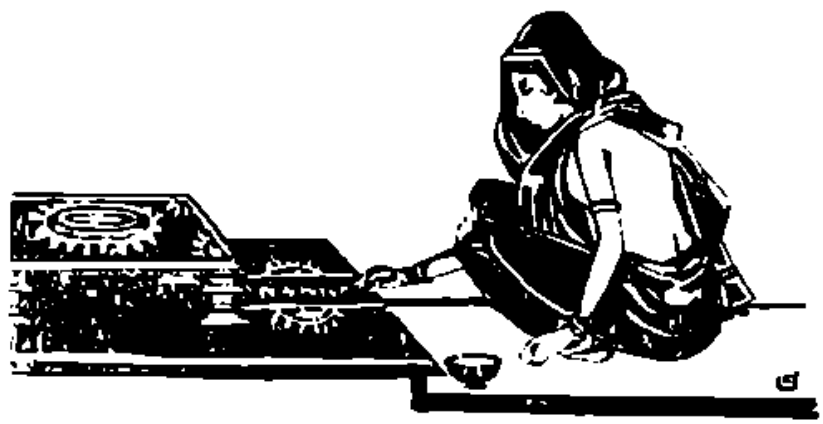

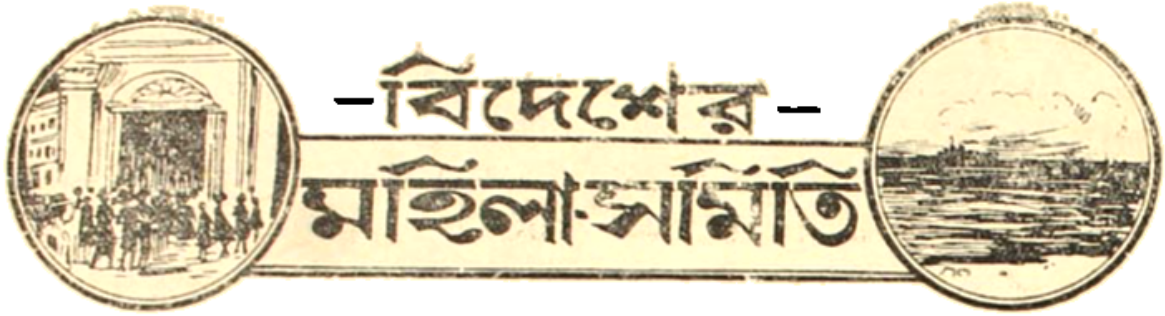

শিল্প-প্রদর্শনী

লণ্ডন সহরের জাহাঙ্গীর-হলে গত বৎসর জাতীয় মহিলা-সমিতি-সংঘের শিল্প-প্রদর্শনী অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মিস্ আরমিজ, মিস্ টার্ণার এবং তাঁহাদের সাহায্যকারিণীরাই এজন্য বিশেষ প্রশংসা পাইবার যোগ্য। অপরাহ্নে যাঁহারা ঐ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের

জাতীয় মহিলাসমিতির শিল্পপ্রদর্শনীতে সভ্যা

মধ্যে বহু সমিতির সভ্যারা রাণীর উপস্থিতিতে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া রাণী যখন সমিতি বিশিষ্ট চিহ্ন (Badge) ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছেন বলিয়া বলে দুঃখপ্রকাশ করেন, তখন নরফোক্ সমিতির একজন সহযোগী সভ্যা রাণীকে তাঁহার নিজ ব্যাজে ভূষিত করিয়া দেন। ইংলণ্ড এবং ওয়েলস্ প্রদেশের সকল মহিলাসমিতিগুলির পক্ষ হইতে লেডী ডেন্‌হাম মহারাণীকে একটি মোমজড়িত বিচিত্র রং-এর কাপড়ে হলদে রেশমে সুন্দর সূচি-শিল্পযুক্ত একটি বিছানার চাদর উপহার দেন। মহারাণী এই উপহারে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া বলেন যে, উইন্ড্‌সর প্রাসাদের হল্‌ঘে-প্রকোষ্ঠে ইহা রক্ষিত হইবে। এই উপহারটি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রত্যেক জেলার সূচিশিল্পে নিপুণা মহিলাদের নয় মাস সময় লাগিয়াছিল। পূর্ব্ব দুই বৎসরের প্রদর্শনীতে এতই নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল যে সকলেই মনে করিয়াছিলেন ইহা হইতে উচ্চশ্রেণীর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়

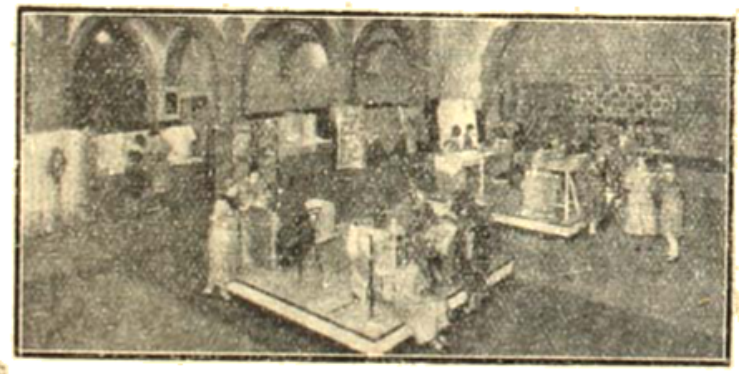

জাহাঙ্গীর-হলে জাতীয় মহিলাসমিতি-সঙ্ঘের শিল্পপ্রদর্শনী

উল্লিখিত প্রদর্শনী তাহা অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। জাহাঙ্গীর-হলে সমবায় প্রণালীতে কৃত দ্রব্যগুলির সুন্দর আনন্দপূর্ণ ঐশ্বর্য্য আগমনমাত্রই দর্শকদের মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিত নরফোকের পুতুলগৃহটি দর্শকদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ওয়ারউইক সায়ার, ইয়র্ক সায়ার, এবং ট্যাফোর্ড

সাজার অতি সুন্দর গৃহ সাজাইবার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া ছিল। ওয়েষ্ট কেন্ট কি ভাবে দর্শকপ্রকোষ্ঠ সুষমভাবে রক্ষিত হওয়া উচিত তাহা প্রদর্শন করার জন্য একটি স্বর্ণতারকা পুরস্কার পান।

বিলাতের এই সার্থক প্রদর্শনীর কথা শ্রবণে স্বতঃই আজকালকার আমাদের দেশের প্রদর্শনীগুলির কথা মনে আসে। আজকাল আমরা প্রায়শঃ এদেশে তিন প্রকার অথবা তিনের মিলিত প্রদর্শনী লক্ষ্য করিয়া থাকি—শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শিল্প প্রদর্শনী। আমাদের প্রদর্শনী সম্পর্কে মনে রাখা উচিত যে, নূতন কথা শিক্ষা করা, জ্ঞানলাভ করা এবং তাহা দ্বারা ব্যবহারিক জীবনের উন্নতিসাধনই এই শিল্পপ্রদর্শনীগুলির উদ্দেশ্য। যাঁহারা সাধারণতঃ পুস্তকপাঠ, বিদেশভ্রমণ,

জাহাঙ্গীর-হলে মহিলা-শিল্পপ্রদর্শনীর একাংশ

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের অভাবে অথবা সাধারণ অবস্থার প্রতিকূলতায় এবং নিরক্ষরতার জন্য ব্যবহারিক জীবনের সাধারণ জ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকেন তাঁহাদিগের মনে ছবি, চার্ট, ম্যাজিকলণ্ঠন বক্তৃতা, কথকতা, গান, ভাবসঙ্গীত, অভিনয়, মূক অভিনয়, শারীরিক ব্যায়াম ইত্যাদি দ্বারা অল্পকালের মধ্যে বহুবিষয়ের জ্ঞান পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে এই জাতীয় প্রদর্শনী করার পুরুষ এবং মহিলাদের বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। মহিলা-দিবসে বহু মহিলারা দিনান্তে স্রোতের মত এই প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কিন্তু উপস্থিতির অনুপাতে ফললাভ হয় বলিয়া মনে হয় না। প্রদর্শনী-পরিচালকগণ যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বিশেষ দৃষ্টি দেন তবে ভাল হয়:—

(১) প্রদর্শনী ক্ষেত্র এমন স্থানে হওয়া উচিত যেখানে বহুসংখ্যক লোক অতি সহজে পদব্রজে অথবা অল্পব্যয়ে উপস্থিত হইতে পারেন।

(২) প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে সাময়িকানা টাঙাইয়া খোলা জায়গায় সভার ব্যবস্থা করা ভাল।

(৩) শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সুগঠিত এবং শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকার থাকা আবশ্যক।

(৪) প্রদর্শিত দ্রব্য সুরক্ষিতভাবে নিপুণতার সহিত যথাযোগ্য স্থানে রক্ষিত হওয়া কর্তব্য।

(৫) কার্য্যসূচী প্রস্তুতে বিশেষ নিপুণতা এবং স্থান-ভেদে বিশেষ দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। কার্য্যসূচী বিশেষভাবে মানিয়া চলা আবশ্যক। অনাবশ্যক অথবা অতিরিক্ত বিষয়ের অবতারণা করিলে দর্শকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। সময়-নির্দ্ধার বিশেষ প্রয়োজন।

(৬) শিশুপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে শিশুদের নাম সংগ্রহ ও ঠিকানা রাখা আবশ্যক।

(৭) চার্টগুলি ঝুলাইবার জন্য সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্তভাবে লোক রাখা প্রয়োজন।

(৮) বক্তৃতার 'হলে' শুধু যাঁহারা শ্রবণোৎসুক তাঁহাদেরই যাইতে দেওয়া প্রয়োজন। শিশু-সহ মেয়েদের যাইতে দেওয়া উচিত হয় না। কারণ বদ্ধ-প্রকোষ্ঠে শিশুর স্বাস্থ্যহানি ও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। বহু লোক উপস্থিত হইলে একই সময়ে বহু স্থানে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্বেচ্ছাসেবিকাগণ এমন ক্ষিপ্র এবং চতুর হওয়া প্রয়োজন যেন তাঁহারা আবশ্যকমত শৃঙ্খলা এবং সুব্যবস্থা রক্ষা করিতে পারেন; তাহা না হইলে শুধু ব্যাজ ধারণ করিয়া স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী ঘোষণা করার কোনই মূল্য হয় না।

(৯) কৃষি এবং শিল্প সম্বন্ধীয় গুরু হিসাবনিকাশ ব্যতীত কৃষি এবং শিল্প সম্বন্ধীয় উন্নত কলকব্জা এবং তাহার ব্যবহারপ্রণালী, জমিতে সার দেওয়া, গো-পালন, বিভিন্ন শিল্পের নমুনা এবং তাহার প্রস্তুত-প্রণালী হাতেকলমে দেখাইয়া দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। কারণ এদেশে বহু লোক অজ্ঞানতার জন্য নিবার্য্য ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করে। সাধারণ লোকদের

নিকট খুব সহজ সরল ভাবে স্বাস্থ্যতত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন জেলাসংঘের সংবাদ

কুকুর, শাল, বাঘ সম্বন্ধে আমরা কি জানি ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন মহিলাসমিতিতে বক্তৃতা হইয়াছে। অক্সফোর্ড মহিলাসমিতি-সংঘে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বক্তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্মরণ করাইয়া দেন যে আজকালও রাজা কাশ্মীর-রাজ্য হইতে ১২ লাখ কুন্দর শাল প্রতিবৎসর উপহার পান। ইষ্ট সাসেক্স জেলা-সংঘের প্রয়োজন বশ একটি শিল্পদ্রব্য-বিক্রয়ের হল খুলিয়াছিলেন। বাজার-কমিটির সভানেত্রী জানান যে ১৯২৯ সনের জুন মাস হইতে ১৯৩০ সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১৯০৬ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে ১৪৪২ পাউণ্ড সমিতির তহবিলে যায়। প্রতি সপ্তাহে গড়ে প্রায় ৪৩ পাউণ্ড করিয়া বিক্রয় হয়।

মহিলা শিক্ষা-'ব্রতী'

দক্ষিণস্থ বিভিন্ন জেলার প্রায় ২০ জন মহিলা গৃহ-শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য হ্যাম্পষ্টেড Swiss cottage-এ অন্ধদিগের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন। তাঁহারা শিক্ষাসমাপনান্তে গৃহে গৃহে অন্ধদিগকে শিক্ষাদান কার্য্য করিবেন। আমাদের দেশে অন্ধ বালকদিগের জন্য বিদ্যালয় আছে। অন্ধ বালিকাদের জন্য মহিলাসমিতির পক্ষ হইতে অনুরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা খুব সম্ভবপর। অন্ধ বালিকারাও ছেলেদের মত বহু শিল্পশিক্ষা এবং সাধারণ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন এবং তাহা হইলে তাঁহাদের অনেক দুঃখ-দুর্গতি দূর হইতে পারে। আমাদের মহিলাসমাজ এবিষয়ে অগ্রণী হইতে পারেন। কবি তাঁহাদিগকেও বলিতেছেন,—"অন্ধজনে দেহ আলো।" যাঁহারা চিরস্মরণীয়া মহিলা হেলেন কেলার-এর জীবনী পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন এই অন্ধ-এবং বোবা নিঃসহায় বালিকা জীবনে কত উন্নতি-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বেতারবার্ত্তা

বর্ত্তমান মে মাসের ২০ তারিখে ব্রাকনেলে বিলাতের জাতীয় মহিলাসমিতি-সংঘের বার্ষিক সভা হইবে। ব্রিটিশ বেতার-বার্ত্তা-সমিতি এই সভার উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের কার্য্যাবলী বেতার-বার্ত্তায় ঘোষণা করিতে সম্মত হইয়াছেন। বক্তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হওয়ায় বহু সভায় বড়ই অসুবিধা হয়। অনেক মহিলা সময় ও সুযোগ করিয়া উপস্থিত হইতে না পারায় বক্তৃতাশ্রবণে বঞ্চিত হন। কিন্তু এবার বেতারবার্ত্তায় বহু মহিলা এবং বিভিন্ন সমিতির সভ্যারা অনেক দূর হইতে উদ্বোধন-উৎসবে যোগ দিতে পারিবেন। শিক্ষা-সংসদের সভাপতি সার চার্লস ট্রেভেলিয়ান এবং লেডী জেনকামের বক্তৃতা ঘোষিত হইবে।

মাতৃত্ব ও শিশুমঙ্গল পুস্তকাগার

জাতীয় মাতৃত্ব এবং শিশু-মঙ্গল সমিতির শিশুমঙ্গল এবং মাতৃত্ব বিষয়ক একটি পুস্তকাগার আছে। শেষের মাতৃত্ব এবং শিশুমঙ্গল বিষয়ে উৎসাহী যে-কোন লোক ঐ পুস্তকগুলি ব্যবহার করিতে পারেন। যাঁহারা ঐ পুস্তক ব্যবহার করিতে চান তাঁহাদিগকে জাতীয় শিশুমঙ্গল সমিতিতে অথবা ইহার কোন অন্তর্ভুক্ত শাখার বার্ষিক পাঁচ শিলিং অর্থাৎ প্রায় চারি টাকা চাঁদা দিতে হয়। আমাদের বিভিন্ন মহিলাসমিতিগুলি শাখা, শিশু-মঙ্গল এবং মাতৃত্ব-বিষয়ক একটি পুস্তকাগার রক্ষা করিলে সভ্যারা তাহা পাঠে বিশেষ উপকৃত হইতে পারেন।

গ্রাম সৌন্দর্য্য-সংরক্ষণ আইন

গ্রামেই যে জাতীয় জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ জাতি তাহা বিলক্ষণ বোঝেন। বর্ত্তমান ব্যবসা এবং বাণিজ্য-প্রধান যুগে সহরের বিশেষ প্রয়োজন এবং উপকারিতা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া থাকিলেও গ্রামের উন্নতি এবং রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহারা বিশেষ অবহিত। গ্রামসৌন্দর্য্য-সংরক্ষণার্থ সম্প্রতি সে দেশে একটি আইন পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় দ্বিতীয়বার পাশ হইয়াছে। এই আইন-অনুসারে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ রোপণ করিয়া গ্রামের সৌন্দর্য্য রক্ষা, গ্রামের ময়লা উপযুক্ত প্রণালীতে বিশেষ স্থানে দূর করা ইত্যাদি বিষয় পরিচালিত হইবে।

সুখী দম্পতি

লর্ড কর্জেটি এবং তাঁহার পত্নী গত মাসে পরস্পর চারদিন স্বাস্থ্যানে যাত্রা গিয়াছেন। ৬৫ বৎসর তাঁহারা পরম সুখে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। বিবাহের ৬০ বৎসর পরে লর্ড কর্জেটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে তিনি যতই তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রশংসা করুন না কেন তাঁহার সহিষ্ণুতার সম্যক প্রশংসা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

আমাদের দেশের কবি বলিয়াছেন—যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চিত কল্যাণ।

মহিলাসমিতির সুফল

কেনাডার টেলিগ্রাম জারনাল পত্রিকা সম্প্রতি মন্তব্য করিয়াছেন যে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের উত্তর কূলে মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠার ফলে মহিলাদিগের অভাব-অভিযোগ এবং তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির সম্যক জ্ঞান এবং উপলব্ধি হইয়াছে।

সমিতির সংবাদ

গত ৩০শে জানুয়ারী এডেলেডী মহিলাসংঘের ৫ম-মোৎসব সম্পন্ন হয়। প্রায় সকল সমিতির প্রতিনিধিরাই উপস্থিত ছিলেন। সংঘের প্রধান কর্ম্মী জেলাসংঘের কার্য্যাবলী বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মিস মরিস জোনস্ এম-এ এই জেলার ৪টি সমিতিতে বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন সমিতিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা হয়:—

জাতীয় সংঘ এবং জেলাসংঘের কাজ, মহিলাসমিতি-আন্দোলনের উদ্দেশ্য, মহিলাসমিতিতে আয় এবং ব্যয়, রাসিক অধিবেশনের প্রয়োজন এবং মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য, সমিতিতে সহযোগিতা, মহিলাসমিতির সহিত গ্রাম্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ, কার্য্যসূচী ও ইহার মূল্য। কেমিয়াস জুনিয়ার, ল্যাঙ্গোয়েজ, পেনিমার্থ, পেনফ্রেন, ষ্ট্রের বাচ এই ৫টি সমিতিতে পাকপ্রণালী এবং সূচিশিল্প বিষয়ে পঞ্চম বিভাগীয় মাপের ব্যবস্থা করা হয়। জেলাসংঘ হইতে প্রাপ্ত সাহায্য দ্বারা শিক্ষকের মাহিনা দেওয়া হয়। কেমিয়াস্ জুনিয়ার ক্লাস এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয়। ৩১ জন ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছিল; তাহাদের গড়ে বয়স ১৮ বৎসর। কেমিয়াস হইতে সংঘবদ্ধ কার্য্যেরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিপদ

শ্রী জ্যোতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

একেলা আসেনা কভু,—
সাথে আসে দুখ-জ্বালা,
পরায় কঠোর হাতে
গাঁথিয়া কাঁটার মালা।

আমাদের মহিলাকর্ম্মী

স্বর্গীয়া সুধাদেবী বি-এ

বঙ্গলক্ষ্মীর পাঠক-পাঠিকাগণ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইবেন যে আমাদের পাবনা জেলার অন্তর্গত গোপালনগর মহিলাসমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী এবং একনিষ্ঠা মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সুধাদেবী বি-এ আর ইহলোকে নাই। জীবিতকালে যাঁহারই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ এবং মিলনের সুযোগ হইয়াছে তিনিই জানেন, স্নেহ-মমতা, স্বজনবাৎসল্য, পরদুঃখকাতরতা, সরলতা, অহঙ্কার এবং ঔদ্ধত্যহীনতা, অন্যায়ের প্রতিবাদে ধীর এবং স্পষ্ট ভাষা, ক্ষমাশীলতা, সাহসের সহিত স্ত্রীজনসুলভ মৃদুতা তাঁহার স্বচ্ছ চরিত্রকে কতই মধুময় করিয়াছিল। বাংলা দেশের সাধারণ মেয়ের মত গৃহবেষ্টনীকেই তিনি একমাত্র সাধনা-ক্ষেত্র মনে করেন নাই, তিনি গৃহকে বাহিরের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি গৃহে স্বামিসেবা, শিশুপালন, রন্ধন ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলির সহিত সমাজসেবা, নারী-মঙ্গল, প্রাণের উন্নতিমূলক কাজ-গুলির এক অপূর্ব্ব যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যাঁহারা উচ্চশিক্ষিতা নারীর এক বিকৃত রূপ কল্পনা করিয়া ভীত হন, তিনি তাঁহাদের অকারণ ভয় এবং ভ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কলিকাতা মহানগরীতে ১০০২ সালের ৭ই বৈশাখ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। Bethune Schoolএ ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ার সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদারের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহ-পরে নিজের চেষ্টায় ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ, বি-এ প্রভৃতি পরীক্ষা পাশ করেন। পাঠকালে তিনি ভাল ছাত্রী বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং পুরস্কার-পারিতোষিক লাভ করিতেন।

বালীগঞ্জে বাসকালীন তিনি এবং তাঁহার ভগ্নী বালীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বয়সের সহিত জনসেবা এবং সমাজসেবার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হয়। 'দেশের ও দশের কাজে জীবনটাকে কাটিয়ে দেব' এই ছিল তাঁহার অন্তরের কামনা। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির কাজের সহিত যুক্ত হন, এবং গোপালনগরে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বৎসরেই তিনি সমিতির কাজের জন্য কেন্দ্র-সমিতি হইতে একটি ২০৲ টাকার পুরস্কার পান। গোপাল-নগরে প্রত্যেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। বালিকাবিদ্যালয়, পল্লীসংস্কার সমিতি, এণ্টি-ম্যালেরিয়া সমিতি প্রভৃতি প্রত্যেক কাজ তাঁহারই প্রেরণায় পরিচালিত হইত। তাঁহার অভাবে আজ এইগুলি মৃতপ্রায়। হিন্দুর সেবা, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং জাতীয়তা-বোধ তাঁহার চরিত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

নরনারায়ণ-রূপ তাঁহার চিত্তকে এই অধিকার করিয়াছিল যে তিনি কখনই পরিবারের সামান্য চাকর-চাকরাণীর প্রতিও কোন কর্কশ বাক্যপ্রয়োগ অথবা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা সহ্য করিতেন না। কোন বন্ধুকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এ আমাদের

স্বর্গীয়া সুধা দেবী

চাকর এ কথা বলতেও আমার কষ্ট হয়।" বলেছিলেন, "আফিস চালাতেই যা কঠোরতার প্রয়োজন কি?" পরিবারে তাঁর শাসন ছিল প্রেমের,—সত্য, প্রেম এবং ন্যায়ের শাসনই ছিল তাঁহার আদর্শ। একবার শিয়ালদহ ষ্টেশনে কোন ভিখারী রমণীর প্রতি ষ্টেশনের কোন কর্ম্মচারীর ঔদ্ধত্যের এমন তীব্র প্রতিবাদ করেন যে কর্ম্মচারী বিশেষ লজ্জিত হন।

ছাত্রকাল হইতেই সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহার কোন I. C. S. পাশ করা প্রবাসী দেবরের শিক্ষানবিশীকালে তিনি তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া 'ভুলের কারসাজি' নামক একখানি উপন্যাস লিখেন। উপন্যাসখানির প্রধান চিত্রে তিনি অজ্ঞাতসারে আপনারই রূপ অঙ্কিত করিয়াছেন। উপন্যাসের ঘটনাবিবৃতি এবং ভাষাবিন্যাসে বিশেষ স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। Bethune College-এর প্রিন্সিপাল মিস রাইট, মিসেস কেনো প্রভৃতি ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কলেজের পরীক্ষা পাশ করার পর তাঁহারা ইঁহাকে অনেকগুলি পুস্তক উপহার দেন। নিজের প্রশংসায় সর্ব্বদাই ইনি অত্যন্ত লজ্জিত হইতেন। কোন বন্ধু এক প্রদর্শনীক্ষেত্রে মহিলাদের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করার জন্য কোন প্রশংসার কথা বলিলে তিনি বলেন, "অত বলবেন না, বলবেন না!" গত বৎসর কলহতায় ভিতরেও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া বি-এ পাশ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার মৃত্যুতে স্বামী শোকতপ্ত, শিশুরা নিঃসহায়, বন্ধুরা নিরাশ এবং সহযোগী কর্ম্মীরা অভাবগ্রস্ত। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে মুহ্যমান স্বামী গিরিজাবাবুকে কোন আত্মীয় লিখিয়াছিলেন, "তুমি স্ত্রী হারাইয়াছ, আমরা একজন সহৃদয় বন্ধু হারাইয়াছি।" আজ আমরা এই বলিয়াই সান্ত্বনা লাভ করিব—"Whom God loveth, dieth young." তিনি অনেক সময় স্বামীকে বলিতেন, বি-এ পাশ করিয়া আমি নারীমঙ্গল সমিতির কার্য্যে আত্মদান করিব ভগবান্ তাঁহার অসমাপ্ত আশার এই সেবা-আকাঙ্ক্ষাই পরিতৃপ্ত করুন। এই বিধবা মহিলা দুইটি বালক এবং দুইটি বালিকা শিশুসন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

পাথেয়

শ্রী প্রমথনাথ কুণ্ডার

মুখের হাসি একটু তবু,
আর তো কিছু চাহি না প্রিয়া,
দুখের পথে তব না কাঁটা—
কহিনু বুকে হাতটি দিয়া।
স্বরগে আমি চাহি না যেতে,—
হাসিটি চাহি ভিক্ষা নেতে ;
সদা-ফোটা ফুলের হাসি
তুলে কি কভু রাখুর প্রিয়া ?

চরিত ফুল হয়তো শেষে
ছলিবে নৃপকণ্ঠহারে,—
পথিক বায়ু তাহারে বাধা
আনিবে দিতে কি অধিকারে ?
গন্ধ-স্মৃতি রহিয়া মনে
বনের বায়ু ফিরিবে বনে ;
হাসির স্মৃতি পাথেয় করি'
ফিরিব আমি পথটি দিয়া !

ইংলণ্ডে বিবিধ নারীশিক্ষায়তন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী দীপা চক্রবর্ত্তী

Domestic Science বা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

The National Training School of Cookery and other branches of Domestic Economy. 72-78, Buckingham Palace Road, London, S. W. I.

১, ২, ৩, ৪ বৎসরের বিভিন্ন কোর্স বা যাগ এখানে আছে। অতএব বেতনও বিভিন্ন। সংক্ষিপ্ত ডিপ্লোমাহীন যাগের বেতন সামান্য। ছাত্রীদিগকে গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং গৃহস্থালী-পরিচালন বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রদত্ত হয় এবং উহা প্রদান করা হয় এডুকেশন বোর্ড বা শিক্ষাসংসদ হইতে। ছাত্রী স্বরূপ একটি বৃত্তিও দেওয়া হয়। গৃহসংরক্ষণ, সেনানিবাসে মদ্যালয় চালন (Canteen Supervise) রান্নাবান্না প্রভৃতি বিষয়ের সার্টিফিকেট-কোর্সের বন্দোবস্ত আছে। ঘর-করার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় (সেলাই প্রভৃতিও) হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

The Gloucestershire Training College of Domestic Science. Barrack Square,. Gloucester (affiliated to Bristol University).

(১) ৪ বৎসরের বি-এস্‌সি ডিগ্রি কোর্স ; (২) ২-৩ বৎসরের গার্হস্থ্যবিজ্ঞান-শিক্ষয়িত্রীদের কোর্স ; (৩) ঘরকন্নার খুঁটিনাটি ; (৪) গৃহস্থালী-পরিচালন (৩ টার্ম)। প্রত্যেক কোর্সে বিশেষভাবে রন্ধন, কাপড়চোপড় পরিষ্কার করা, গৃহিণীর কর্ত্তব্য, সূচের কাজ, পোষাক তৈরী, গৃহসজ্জার হেপাজৎ (upholstery), প্রাথমিক সাহায্য-চিকিৎসা, শুশ্রূষা, শিশুমঙ্গল, স্বাস্থ্যনীতি, হিসাবরক্ষণ প্রভৃতি শিখানো হ'য়ে থাকে। প্রিন্সিপ্যালের নামে আবেদন পাঠানো প্রয়োজন।

Training College of Domestic Science. Battersea Polytechnic, London, S. W. 11.

বিভিন্ন কোর্সে বিভিন্ন বিধি ও বেতনাদি। শিক্ষয়িত্রীদের কোর্স—২, ৩, ৪ বৎসর। গৃহপরিচালিকার সার্টিফিকেট-কোর্স—১ বৎসর। ছাত্রীদিগকে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান-শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। এডুকেশন বোর্ড (শিক্ষাসংঘ) ও ট্রেনিং কলেজ থেকে ডিপ্লোমা প্রদত্ত হয়। বৃত্তি বা ভাতার বন্দোবস্ত আছে। ছাত্রীদের জন্য হোষ্টেল আছে। স্কুলমেট্রন (School Matrons) ও গৃহসংরক্ষণ-শিক্ষার্থিনী-দের জন্য কোর্স আছে। গৃহস্থালীর কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াও হ'য়ে থাকে। বিবরণীর জন্য প্রিন্সি-প্যালের নিকট আবেদন করতে হয়।

King's College of Household and Social Science (University of London). Campden Hill Road, W. [Warden Miss H. Reynard, M. A.]

ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি এবং কলেজ ডিপ্লোমা পেতে ৩ বছর লাগে; বেতন প্রতি বৎসর—৪৫ গিনি। অন্যান্য কোর্সে ৩৫ থেকে ৪৫ গিনি। শিক্ষার্থিনীরা এখানে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে পারে। বি-এস্‌সি, এম্‌-এসসি (লণ্ডন); ডাক্তারীর প্রাথমিক এবং উপাধি-পরীক্ষা; ঘর-গৃহস্থালীর বিধিব্যবস্থা এবং গৃহিণীপণার পরীক্ষা—১ এবং ২ বৎসর; প্রধানা-ধাত্রী-শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষার এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শিক্ষার্থিনীর (D. A. ডিপ্লোমাধারিণী) জন্য ১ বৎসরের কোর্স। থাকিবার স্থানসহ কলেজ—৭৫ থেকে ৯০ গিনি।

National Society's Training College for Teachers of Domestic Subjects. Berridge House, Fortune Green Road, West Hampstead, N. W. 6. Principal Miss Maughan, M. Sc.

শিক্ষয়িত্রীর ডিপ্লোমার জন্য ৩ বৎসরের কোর্স। গৃহিণী-পণা, রন্ধন প্রভৃতির জন্য—৩ মাস থেকে উর্দ্ধতন কাল। গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের সর্ববিধ শাখারই ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। শিক্ষাসংঘ থেকে ডিপ্লোমা প্রদত্ত হয়। বৃত্তি বা ভাতা প্রাপ্তব্য। ধোপানের এবং গৃহসংরক্ষয়িত্রীর সার্টিফিকেট-কোর্সও আছে। থাকিবার স্থান মেলে। আবেদন করলে বিবরণী পাওয়া যায়।

Northern Counties' Training College for Teachers of Domestic Science. 54, Northumberland Road, Newcastle-upon-Tyne. Recognised by the Board of Education.

(১) শিক্ষয়িত্রী-ডিপ্লোমা কোর্স—২ অথবা ৩ বৎসর; (২) ঘরকন্নার বিধিব্যবস্থা সম্পর্কীয় সার্টিফিকেট—৩ অথবা ৪ টার্ম; (৩) গৃহস্থালী-সংরক্ষণ সার্টিফিকেট—২ অথবা ৩ টার্ম। রন্ধন, ধোপের কাজ, পোষাক তৈরি এবং সূচের কাজের জন্য সংক্ষিপ্ত কোর্সও আছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য অধ্যক্ষের নামে পত্র প্রেরিতব্য।

Leicester Domestic Science Training College. Victoria Park, Leicester.

বিষয়ানুযায়ী ২ থেকে ৩ বৎসর। শিক্ষাসংঘের ডিপ্লোমার জন্য যাঁরা পাঠগ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে বৃত্তি বা ভাতা প্রদান করা হয়। থাকবার জন্য হোষ্টেল আছে। "Director of Education, Town Hall, Leicester"—ঠিকানায় পত্র লিখলে বিস্তৃত বিবরণী পাঠানো হয়।

Glasgow and West of Scotland College of Domestic Science (Incorporated). Principal D. H. Melvin.

(১) রন্ধন, ধোপ এবং গৃহিণীপণার শিক্ষয়িত্রী-সার্টিফিকেট পেতে ৩ বৎসর লাগে।

(২) পোষাক তৈরী এবং সূচের কাজের শিক্ষয়িত্রী-সার্টিফিকেট—২ বৎসর।

শিক্ষাসংঘ এবং স্কটিশ শিক্ষাবিভাগ থেকে শিক্ষয়িত্রী-ডিপ্লোমা প্রদত্ত হয়। রন্ধন, ধোপ, গৃহিণীপণা, পোষাক তৈরী ইত্যাদির সার্টিফিকেট-পরীক্ষা আছে। ঘরকন্নার খুঁটিনাটি এবং প্রধানা-ধাত্রী-শিক্ষয়িত্রীর কোর্স নিয়ে সবশুদ্ধ ১০টি বিষয়ের সার্টিফিকেটের বন্দোবস্ত আছে। ছাত্রীবাস মেলে। প্রিন্সিপ্যালের নিকট আবেদন করলে বিবরণী প্রেরিত হয়।

The Domestic miles.

১ থেকে ৩ টার্ম; ফুল কোর্স—১ বৎসর (৩ টার্ম)।

বাসিন্দা (Resident) ছাত্রীদের প্রতি টার্ম—৩০ পাউণ্ড; বাহির হইতে আসিয়া যাহারা পাঠগ্রহণ করেন তাঁহাদের প্রতি টার্ম—১২ পাউণ্ড ১১ শিলিং। গৃহস্থালীর কর্ত্তব্য, গৃহশিল্পণা, এবং পাচিকার কাজের জন্য এখানে শিক্ষার্থিনীদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। গৃহকর্ত্রীর কাজের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়; কোর্স—২ থেকে ৩ টার্ম। রন্ধন, যোগ, পোষাক তৈরি, সূচের কাজ প্রভৃতির জন্য সংক্ষিপ্ত কোর্স আছে।

Edgbaston School of Domestic rience. 179, Broad Street, Five Ways, Birmingham. Principal Miss Etty Potter.

গৃহিণীর কাজের সার্টিফিকেট ১ মাসে পাওয়া যায়। বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন কোর্স ও বেতন। প্রত্যেক বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। গৃহস্থালী সম্পর্কীয় সকল বিষয়ের জন্য সার্টিফিকেট প্রদত্ত হয়। প্রিন্সিপালের নিকট আবেদন করলে বিস্তৃত বিবরণী প্রদত্ত হয়।

The Eastbourne School of Domestic Economy, 2, Silverdale Road. Principal: Miss E. O. Randall.

গৃহসংরক্ষণ এবং রন্ধনের সার্টিফিকেট কোর্স—২ থেকে ৪ টার্ম। পড়িয়ে এবং হাতেকলমে কাজ করিয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের সকল বিষয় শেখানো হয়। বাসিন্দা (Resident) এবং অ-বাসিন্দা (Non-resident) উভয় রকম ছাত্রীই গৃহীত হয়। বিবরণীর জন্য প্রিন্সিপালের নিকট আবেদন করতে হয়।*

গৃহ ও গৃহস্থালী নারীর স্থান ও কর্ম্মক্ষেত্র। নারী তাই গৃহলক্ষ্মী। গৃহহীন বাইরকে আমরা অস্বাভাবিক মনে করি। অবশ্য, বাইরে চলতেই হবে—কিন্তু গৃহকে ত্যাগ ক'রে নয়, গৃহের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে। শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। গৃহেই বঙ্গলক্ষ্মী তথা ভারতলক্ষ্মীর পদ্মাসন পাতা রয়েছে।

ক্রমশঃ

---

* সুইজারল্যাণ্ডে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান-শিক্ষার একটি আদর্শ শিক্ষায়তন আছে। শিক্ষার্থিনীরূপে যাঁরা তথায় যেতে ইচ্ছা করবেন, তাঁদের সুবিধার জন্য এইখানে ঠিকানা দেওয়া গেল—

"*Ecole Nouvelle Menagere. Jogny S every. Switzerland. Principal Madame Auderfuhren.*

শ্রীরামপুর

সন ১৩৩৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে শ্রীরামপুর মহিলা-সমিতি স্থাপনকল্পে আকনা বালিকা-বিদ্যালয়ে স্থানীয় মহিলাগণের একটি সভার অধিবেশন হয়। প্রায় ৪৫ শত স্থানীয় মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা কর্ম্মী শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। এবং উক্ত সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন মহাশয় আলোকচিত্র সাহায্যে বিভিন্ন দেশের নারীসমিতি ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। অতঃপর স্থানীয় কতকগুলি বিশিষ্ট মহিলা লইয়া শ্রীরামপুর মহিলাসমিতির কার্য্যকরী সভা গঠিত হয়। সমিতির উদ্দেশ্য :—

নারীজাতির শিক্ষা; সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতিবিধানের চেষ্টা করা।

২। ঘরে ঘরে নারীদিগকে, বিশেষভাবে বিধবা-দিগকে গৃহশিল্পের শিক্ষাদান ও তাহাদের প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করা।

বর্ত্তমানে মহিলাসমিতির সভ্যাসংখ্যা ২৫ জন। প্রতি শনিবার বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত আকনা বালিকা-বিদ্যালয়ে সমিতির অধিবেশন হয়। এই সভায় যে সমস্ত মহিলা লেখাপড়া, সেলাই ও অন্যান্য গৃহশিল্প শিক্ষা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে যথারীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। উপরন্তু প্রতি অধিবেশনে নিয়মিত-ভাবে সৎগ্রন্থ ও নারীজাগরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধপাঠ করা এবং চরকায় সুতা কাটা হয়। সমিতির সভ্যাগণ বার্ষিক চাঁদা দিয়া সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যেই সমিতি যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে শ্রীরামপুর মহিলাসমিতির কার্য্যকলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইবে।

শ্রীরামপুরের মহিলাগণের সহানুভূতি ও সমিতিতে যোগদান প্রার্থনা করি।

শ্রী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ,
সম্পাদিকা।

দীপালি

ঢাকা নগরীতে ১৯২৩ সনের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ১২ জন সভ্যা লইয়া দীপালির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আজ একমাত্র ঢাকা সহরেই ইহার ৫০০ শতাধিক সভ্যা আছেন। দীপালির আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা বর্ত্তমানে ঢাকা সহরেই কেবলমাত্র আবদ্ধ নাই, বাংলাদেশের কয়েকটি সহরেও দীপালি-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দীপালির আদর্শ ও কর্ম্মপন্থাকে অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

দীপালি কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত। ইহাতে মহিলাদের মধ্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাব ও কর্ম্মকুশলতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ তাঁহারা নিজেরাই দূর করিতে সচেষ্ট হইতেছেন। ইহার দ্বারা বাংলার নারীসমাজে যে প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে

দীপালিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য তাহাতেই বহুল পরিমাণে সফল হইতেছে।

বিগত বৎসরের কার্য্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতেই প্রমাণ হইবে দীপালি-সঙ্ঘ কতদূর সফল হইয়াছে।

১। ১৭ই মার্চ্চ—একটি সভায় স্বদেশী বস্ত্র-আন্দোলনে মহিলাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং সকলেই স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে সংকল্প করেন।

২। ২৭শে মার্চ্চ—বোলপুর শ্রীনিকেতনের সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় "গঠন-মূলক কার্য্যে নারীর কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। প্রায় ১৫০ শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

৩। বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর সম্পাদক অক্লান্তকর্ম্মী ডাঃ বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় "নারীর সমাজ-সেবা" সম্বন্ধে ১ ঘণ্টাকাল অতি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। প্রায় ১০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

৪। ২৭শে জুন—শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি স্থানের বন্যা-প্রপীড়িতের সাহায্য সম্বন্ধে মহিলাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থে সভা হয়। এই সভাতে ঢাকার সকল মহিলা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন। মহিলাদের নিকা হইতে চাঁদা তুলিয়া স্থানীয় রিলিফ-কমিটির হস্তে দেওয়া হইবে ইহা নির্দ্ধারিত হয়। ঢাকার মহিলারা এক হাজারের অধিক টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন।

৫। ২৪শে জুলাই—পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয় "সনাতন ধর্ম্মে নারীর অধিকার" সম্বন্ধে সুন্দর একটি বক্তৃতা দ্বারা নারী কিরূপে নিজের অধিকারের ব্যবহার না করিয়া ক্রমে ক্রমে অধিকারচ্যুত হইতেছে তাহার বর্ণনা করেন। প্রায় ১৫০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

৬। ৩১শে আগষ্ট—সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা সমাজ-সেবক বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর ডাঃ বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র মহাশয় "সমাজে নারীর স্থান" সম্বন্ধে ছায়া-চিত্র-যোগে বক্তৃতা করেন। প্রায় ৪০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

৭। ১৪ই সেপ্টেম্বর—শর্দ্দা বিল সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে এবং ঢাকার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র নিয়োগীর উক্তির প্রতিবাদার্থে এক সভা হয়। ৩০০ শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রায় শশাঙ্কমোহন ঘোষ বাহাদুর কে, সি, আই, ই মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ সভানেত্রীর কার্য্য করেন। শ্রীযুক্তা সুজাতা রায়, শ্রীযুক্তা সুহাসিনী বিশ্বাস, শ্রীযুক্তা প্রভা রায় প্রভৃতি শর্দ্দা বিল সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। একটি মহিলা বিলটির প্রতিবাদ করেন। তৎপর অধিকাংশের মতানুসারে বিলটি গৃহীত হয়।

৮। ১৭ই সেপ্টেম্বর—ভারতের বীরসন্তান যতীন্দ্র দাসের দেশের কল্যাণার্থে তিল তিল করিয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁহার অকালমৃত্যুতে বেদনা প্রকাশার্থ মহিলাদের এক সভা হয়।

দীপালির ছাত্রী-সঙ্ঘের জন্ম এক ছাত্রী-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা প্রায় ২ বৎসর হইল হইয়াছে। এই ছাত্রী-সঙ্ঘে বর্ত্তমানে প্রায় দুই শতাধিক সভ্যা আছে এবং তাহাদের কাজ সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে।

ছাত্রীসঙ্ঘের গত বৎসরের কার্য্য

সভ্যসমিতি—ঢাকায় যে তিনটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে, তাহার প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রী প্রতি সপ্তাহে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে মিলিত হইয়া পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ এবং নানাবিধ আলোচনা করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত প্রতিমাসে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়।

নিম্নলিখিত সভাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

১। জুলাই মাসে "রাজনৈতিক সংস্কার বনাম সমাজ-সংস্কার" সম্বন্ধে একটি বিতর্ক সভা আহূত হয়। বহুসংখ্যক ছাত্রী এই সভায় যোগদান করেন।

২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে দীপালি-ছাত্রীসঙ্ঘ হইতে "নারীর অর্থনৈতিক অধিকার," "স্বাধিকারবঞ্চিতা নারী, ও "ঘৃণিতা নারীদের সমাজে গ্রহণ" সম্বন্ধে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপন ও বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা—এই সকল বক্তৃতা ব্যতীত ছাত্রীদের মধ্যে একটা ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার আয়োজন হইয়াছিল। বহুসংখ্যক ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান যাহারা অধিকার করিয়াছিল তাহাদের পুরস্কৃত করা হইয়াছিল।

দরিদ্র ছাত্রী-ভাণ্ডার—দরিদ্র ছাত্রীগণের সাহায্যার্থে ছাত্রীসঙ্ঘের সভ্যাগণ প্রতিমাসে সেলাই বিক্রয় অথবা অন্যান্য উপায়ে অর্থসঞ্চয় করিয়া দরিদ্র ছাত্রী-ভাণ্ডারে দান করিয়া থাকেন। এই অর্থে কয়েকটি দরিদ্র ছাত্রীকে সাহায্য করা হইতেছে।

জ্ঞান প্রচারে দীপালির প্রচেষ্টা

(ক) সকল শাখাগুলিতে সাপ্তাহিক বৈঠকে সংবাদ-পত্রপাঠ, পুস্তকপাঠ, প্রবন্ধপাঠ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত এই বৎসর কয়েকজন সভ্যা বিভিন্ন শাখায় ভাল ইংরেজী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করিয়া পড়িয়াছেন।

(খ) দীপালি-পাঠাগারে এই বৎসরও কয়েকটি ভাল পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। তবে উপযুক্ত সংখ্যক পুস্তক অর্থাভাবে এখনও ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই। কোন প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে যদি জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানসম্পদ না থাকে তবে তাহা জাতিগঠনের কার্য্যে সত্যিকার কোন সহায়তা করিতে সক্ষম হয় না।

(গ) অবৈতনিক বিদ্যালয়:—১৯২৬ সনে ঢাকার দুইটি পল্লীতে মুষ্টিমেয় বালিকা লইয়া অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে উয়ারি, বক্সীবাজার, জিঞ্জিরাবাজার, কয়েৎটুলী, চাঁটাখীবাজার এই কয়েক স্থানে প্রায় আড়াই শত বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছে এবং ইহাদের সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এক পাঠ্য তালিকা ও প্রণালী এই সকল বিদ্যালয়গুলিতে অনুসৃত হইয়া শিক্ষাদানের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। সাধারণতঃ দীপালির সভ্যাগণই শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া থাকেন। তবে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি ও কোন সভ্যার সাময়িক অনুপস্থিতির জন্য কোন কোন কেন্দ্রে বেতনভোগী শিক্ষয়িত্রী রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বালিকাদিগকে স্কুলে আনা ও বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বি রাখা হয়।

শিল্প প্রচারে দীপালির প্রচেষ্টা

দীপালির শাখাগুলিতে নানা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই বৎসর হইতে একজন শিল্প-শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া বিশেষ ভাবে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থাও দীপালি করিয়াছে।

(ক) সঙ্গীত-সঙ্ঘ:—১৯২৭ সনে এই সঙ্গীত-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ত্তমানে উয়ারি ও বক্সীবাজার কেন্দ্রে বহু বালিকা ও মহিলা সঙ্গীত শিক্ষা পাইতেছেন। অবসর-প্রাপ্ত সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত মহাশয় সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন।

(খ) চিত্রাঙ্কণ:—দীপালি হইতে অল্প ব্যয়ে চিত্রাঙ্কণ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কয়েকটি কেন্দ্রে বালিকারা ও মহিলারা চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা করিতেছেন।

(গ) শিল্পপ্রদর্শনী:—দীপালি শিল্প-প্রদর্শনী বিগত বৎসরে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ২রা হইতে ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী উয়ারিস্থিত রেজিন ষ্ট্রীটে ১নং বাড়ীতে উন্মুক্ত ছিল। প্রতিদিন দলে-দলে মহিলা ও পুরুষ এই প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং এই কয়দিনে ১০০০৲ টাকার উপর জিনিষ বিক্রয় হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য—ইহা কেবলমাত্র মহিলাদের জিনিষই গ্রহণ করিয়া থাকে।

ব্যায়ামশিক্ষায় দীপালির প্রচেষ্টা

বর্ত্তমান সময়ে ব্যায়ামশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন, এবং তৎসঙ্গে আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষাও একান্ত প্রয়োজন, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। বিগত বৎসরে বক্সীবাজার, উয়ারি, কয়েৎটুলি, নারিন্দা, আর্ম্মানীটোলা ও পুরানাপল্টন কেন্দ্রে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল শিক্ষা দ্বারা যেরূপ বালিকা-দের ব্যায়াম শিক্ষা হয়, সেইরূপ আত্মরক্ষার কৌশলও শিক্ষা হয়। অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গনারী রাজপুতরমণীগণের ন্যায়ই আত্মরক্ষায় সক্ষম হইবে এই আশা করা অন্যায় নহে।

শ্রী লীলাবতী নাগ,
সম্পাদক

বিদেশিনীদের কথা

সংগ্রাহক—শ্রী তারা মুখোপাধ্যায়

[বিদেশিনীরা কোথায় কি কাজ করছেন তার খবর বঙ্গনারীর পাঠিকাগণের জানা দরকার। এর থেকে তাঁরা বুঝতে পারবেন জগতের মহিলাগণ সাংসারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর হ'তে পেরেছেন। আমেরিকা আজ নারী-আন্দোলনে অন্য সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। রাশিয়ার মহিলা-আন্দোলন নিত্য নূতন শক্তি সংগ্রহ করছে। জাপানের নারীসমাজও পাশ্চাত্য নারীদের পিছনে প'ড়ে নেই। এমন কি চীন—যার এই কয়েক বছর আগে ঘুম ভেঙেছে—সেও আজ নারী-আন্দোলনে নগণ্য নয়।

ভারতে নারী-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে অনেকদিন, কিন্তু রক্ষণশীল দেশ ব'লেই হ'ক বা দারিদ্র্যের জন্যে শিক্ষা-বিস্তারের অভাবেই হ'ক এখনও ভারতনারী যে আধুনিক জগতের অনেক পিছনে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বিদেশে নারী-আন্দোলন কোথায় এ কিভাবে চলছে সেই খবর আমরা বঙ্গনারীর পাঠিকাগণকে কিছু একটু ক'রে জানাতে চেষ্টা করবো। বিদেশের অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী আমরা অবশ্য নই; তবে তাঁদের মধ্যে যেটা ভাল, যা অনুকরণীয় তা আমাদের নিতেই হবে। নইলে ভারতের নারীসমাজ কোনদিনই জগতের নারীসমাজে আসন গ্রহণ করতে পারবে না।]

কারখানা-পরিচালিকা নারী

গত মহাযুদ্ধের সময় ওভিগার্ড কোম্পানীর লোহার কারখানা ১৪ বছরে পড়েছে। এই কারখানায় রণপোত, লোহার রেল প্রভৃতি জাহাজ মেরামতের উপযুক্ত জিনিষ তৈরী হয়। কিন্তু মজার কথা এই যে এত বড় কারখানার পরিচালিকা একজন স্ত্রীলোক—এই কারখানা-স্থাপয়িতার মেয়ে—নাম শ্রীমতী ঈস্থবচ্।

১৪ বছর বয়সের সময় তিনি স্কুলের সামান্য লেখাপড়া শিখে বাপের কারখানায় টেলিফোন ধরতেন আর দু'একটা খুচরো কাজ করতেন। বাড়ীটা ছিল পুরোনো ক্যাশানের—সামনের পাশটায় অফিস, পিছনটায় কারখানা; আর দোতালায় ছিল তাঁদের বাড়ী। শ্রীমতী ঈস্থবচ এইজন্যই বালিকা-বয়স থেকে কারখানা আর আফিসের আবেষ্টনে মানুষ হয়েছেন। বাপের কাছ থেকে লেখা ছাড়া শ্রীমতী ঈস্থবচের আর কোন শিক্ষার সুযোগ হয় নি। কিন্তু এতেই তিনি নিজের কারখানার ইঞ্জিনিয়ার, হিসাবলেখিকা এবং বিক্রয়িত্রী। বাজেট করা, বিল করা প্রভৃতি সব কিছুই তিনি নিজ হাতে করেন। কোরম্যান অনুপস্থিত থাকলে তিনিই সমস্ত কর্মচারীদের কে কোন্ কাজের উপযুক্ত ঠিক ক'রে দেন। তাঁর কারখানায় যাঁরা কাজ করেন তাঁরা বড় সহজে কাজ ছাড়তে চান না। কারণ তিনি প্রত্যেক কর্মচারীর অভাব-অভিযোগ সবচে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখেন এবং প্রত্যেককেই লাভের অংশ দেন। খরিদ্দারগণ তাঁর বাড়ীতে ঠিক বন্ধুর মত আশা যাওয়া করেন।

প্রথম যেদিন তিনি এই কারখানা পরিচালনা করতে যান সেদিন স্ত্রীলোকের কারখানা চালাবার অযোগ্যতা ভেবে সবাই তাঁকে উপহাস করেছিল। কিন্তু আজ তিনি প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে স্ত্রীলোকের হাতে যে-কোন কাজই পুরুষের মতই পরিচালিত হ'তে পারে।

আমেরিকায় গৃহশ্রী-আন্দোলন

আট বছর আগে মিসেস উইলিয়ম ব্রাউন মিলোনী নিউইয়র্ক নগরে গৃহশ্রী-আন্দোলন আরম্ভ করেন। যারা সংসারের খরচপত্র কুলিয়ে উঠতে না পেরে ছতজ্ছাড়ার মতন এঁদো নোংরা ঘরে প'ড়ে থাকে আর অসুখে ভুগে মরে,

তাদের ঘরকে সুন্দরতর ক'রে তোলবার জন্যে মিসেস মিলোনী এই আন্দোলন আরম্ভ করেন।

প্রথমে তিনি স্থান করেন যে একটা বাড়ী যোগাড় ক'রে তাতে বাগান ক'রে ঘরগোর সাজিয়ে বেশ সুন্দর ক'রে তুলতে হবে। পরে জনতার সামনে সেই ঘরটাকে কিভাবে কত কম খরচের মধ্যে সুন্দর করা হয়েছে তাই বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রথম বছরে প্রায় ৫০০ লোক এই কাজে তাঁর সহায় হয়। ঘরকে অল্প কম খরচের মধ্যে কতখানি সুন্দর ও আরামদায়ক করা যেতে পারে এইটুকু দেখবার সুযোগ তারা এই আন্দোলন থেকে পেয়েছিল।

পরের বছর প্রায় হাজার লোক এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এই সময়ে এই কাজটার প্রয়োজনীয়তা দেশের গবর্ণমেণ্ট বুঝতে পারেন। কাজেই ওয়াশিংটন সহরে কেন্দ্র স্থাপন ক'রে এই আন্দোলনটিকে শিক্ষাবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই সময় থেকেই এর উন্নতি আরম্ভ হয়েছে।

গৃহশ্রী-আন্দোলন আমেরিকার লোকদের অশেষ উপকার-সাধন করেছে। সবাই যে একটু সৌন্দর্য্য এবং আরামের মধ্যে থাকতে চায় একথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু পয়সার অভাবে অনেক লোকেই তা পেয়ে ওঠে না। সেই জন্যে অল্প পয়সায় ঘরকে কিভাবে সুন্দর করা যায় তা দেখবার আগ্রহ সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান।

আমেরিকার স্কুলের ছেলেরা ঘর-তৈরীর বিদ্যেটা তাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ক'রে নিয়েছে। মেয়েরা—যারা শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষা করে—আসবাব সাজানো, আলনা তৈরী ও গৃহিণীপণার কাজ করে। এই অক্লান্ত কর্ম্মীদের হাতে সমস্ত সহরটাই এক নবশ্রীমণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে। এই বছর তাদের গৃহশ্রী-আন্দোলনের প্রদর্শনী খোলা হবে। প্রদর্শনী গৃহ তৈরী হবে, কৃত্রিম ঘরকে সুন্দর করা হবে, আর পূর্ব্বে যে স্থান বিশ্রী ছিল সেখানে সুশ্রী ফুলের মেলা বসবে।...এ আট বছর পূর্ব্বে এক নারীর দূরদৃষ্টির ফল।

তুরস্কে নারীর ভোটাধিকার

কনষ্টান্টিনোপলের টাইম্‌স্ পত্রিকা লিখছে যে তুরস্কের মহিলাগণ জাতীয় মহাসভার (Grand National Assembly) জন্যে ভোট দিতে পারবেন এবং ইলেকশনের জন্যেও দাঁড়াতে পারবেন।

মহিলা-পরিচালিত কারখানা

আটলান্টা এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর সমস্তটাই মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত। সেখানে একজনও পুরুষ নেই। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা থেকে আরম্ভ ক'রে ছোটখাট কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক। এই কারখানার বিশেষত্ব হ'চ্ছে যে, যেসব কাজে খুব সূক্ষ্ম গণিতবিদ্যার প্রয়োজন সেই সব কাজই এরা ক'রে থাকে। কর্ম্মকর্ত্রী মিস এলিটি আস্‌বেরী এ, এম,এস, ই, কারখানা-সমিতির (Engineering Society) প্রথম মহিলা সভ্য। আটলান্টা কোম্পানীর সভানেত্রী মেডী পরসন্ নিজেও এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় বিশেষ সুদক্ষ।

যে সব মেয়ে আটলান্টা কোম্পানীতে কাজ করে তাদের প্রত্যেকেরই এই কোম্পানীতে অন্ততঃ এক পাউণ্ড অংশ আছে। এতে খুব ভাল কাজ হয়। অপচয় অত্যন্ত কম হয়, কেন না সবারই স্বার্থ রয়েছে এই কোম্পানীর কাজের উপরে। যদি কোন রকম বন্দোবস্ত খারাপ ব'লে বোধ হয় তবে প্রত্যেক কর্ম্মীই জানতে চায় এর কারণ কি এবং যত সত্বর সম্ভব তার প্রতিকার করা হয়

মোটর-সার্ভিসে নারী

মিস তুলসী ক্রিকোর্ড একটা মোটরের দোকানে হিসেব লিখতেন। এই কাজে মোটরে কত তেল খরচ হয়, কত মেরামতি খরচ হয় এ সব তাঁর জানা হ'য়ে গিয়েছিল। কিছু দিন পরে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু করবার মতলব করলেন। পূর্ব্ব কাজের অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগাবার জন্য তিনি মোটর-সার্ভিস খুলতে মনস্থ করলেন। তাঁর একটি বন্ধুও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। দুজনে কিছু টাকা যোগাড় ক'রে দু'খানা বড় মোটর-বাস কিনে ফেললেন। কোন্ রাস্তায় বাস চালাবেন তাও ঠিক হ'ল বাস চালাবার জন্যে লাইসেন্স ইত্যাদি নেবার ব্যাপারেও তাঁদের কম পোয়াতে হয় নি। গ্রীনাউথ থেকে বার্মিংহাম অবধি ১১২ মাইল রাস্তায় তাঁদের বাস-চলাচল করবার কথা। কিন্তু প্রথম সপ্তাহে তাঁরা দু'দশজন যাত্রী পেলেও

পরের সপ্তাহে রীতিমত শীত প'ড়ে যাওয়ায় বহুলোকে আর হাঁটা চলতে আগ্রহ দেখালে না।

মিস্ ক্লিফোর্ডের আয় এমন ক'মে গেল যে গাড়ী ধোওয়ার জন্যে একটা লোক রাখবার ক্ষমতাও রইল না। তিনি নিজেই সমস্ত করতেন। সমস্ত দিনের খাটুনীর পরে এই গাড়ী ধোওয়ার জন্যে রাত্রে তাঁকে আরও দু'ঘণ্টা ছাড়তাড়া খাটুনী খাটতে হ'ত। তাই সপ্তাহ ঘ'রে ক্রমাগতই তাঁদের ক্ষতি হ'তে লাগলো। হাতে আর বিশেষ কিছু নেই—এমন সময় তাঁদের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। গরম প'ড়ে যাওয়ায় লোকজন আবার রাস্তায় যাওয়া-আসা করতে লাগলো। মিস্ ক্লিফোর্ডের গাড়ী ভাল থাকার দরুণ খুব দ্রুত যেতে পারতো এবং অন্যান্য বাসের চেয়ে দু'ঘণ্টা আগে পৌঁছাত, এই জন্যে তাঁর বাসেই যাত্রী বেশী আসতে লাগল।

বাস চালাবার বিস্তর অন্তরায় আছে। সবগুলোকে জয় ক'রে একাজে টিকে থাকতে পারে কম লোকই। যা'ই হোক, মিস ক্লিফোর্ড কাজ ভালবাসেন তাই এ কাজ করতে পেরেছেন। তিনি এই বাস-সার্ভিসকে আরও বাড়াতে চান। তাঁর 'বাসের' জয়-জয়কার হ'ক।

চীনের নারীসমাজ

প্রাচ্যের বংশধরগণ আধুনিক জগতে কতখানি উন্নতি সাধন করেছেন সেই সম্বন্ধে ব্যাডিড লাইসিয়াম ক্লাবে মিস্ মারসিলি জুন নামে এক চীনা তরুণী একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাকারিণীর ব্যক্তিত্ব এবং কথা বলার ভঙ্গিই তরুণী সেদিন স্পেন দেশের এক বিশাল জনসভাকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে-ছিল। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চীন দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা কি রকম প্রসার লাভ করেছে তাই প্রকাশ করা ছিল মিস জুনের বক্তৃতার বিষয়।

চীনদেশে আজকাল যে সমস্ত সৌখীন দ্রব্যের ব্যবহার চলেছে তা যে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, যখন পাশ্চাত্যের অসভ্যগণ চুল আঁচড়াতে জানতো না তখন থেকেই চীনদেশে প্রচলিত ছিল সেই কথাটা মিস জুন তাঁর শ্রোতৃবর্গকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন। দু'হাজার বছর আগে চীন দেশে যে কাব্য রচিত হয়েছে আজও তার তুলনা মেলে না। তিনি বলেন,—"১৯২৮ সাল থেকে চীনদেশে নারী-স্বাধীনতার একটা বিপুল সাড়া প'ড়ে গেছে। যে সব কাজ কেবল পুরুষদের জন্যেই খোলা ছিল ঐ বছর থেকে মেয়েরাও সেই সব কাজে যোগ দিতে লাগল। পিকিন ও সাংহাই সহরের দুটো বড়-বড় ব্যাঙ্ক শুদ্ধ মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হ'চ্ছে। ব্যাঙ্ক দুটো এমন সুন্দরভাবে চলছে যে দেউলে হবার কোন ভয় নেই। চীনদেশে মেয়েদের জন্যে বড় বড় স্কুল-কলেজ হয়েছে—ব্যায়াম শেখারও স্কুল হয়েছে। চীনা মেয়েরা এখন টেনিস, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলায় রীতিমত পারদর্শিনী। কিন্তু মজার কথা হ'চ্ছে এই যে বিবাহবিচ্ছেদ ব্যাপারটা এখনও চীনদেশে প্রচলিত হয় নি। নানারকম শিল্প, এমন কি চুলকাটা শেখবার জন্যেও চীনারা স্কুল করেছে। চীনা মেয়েরা বাপের পয়সায় বড়মানুষি করতে এখন ঘৃণা বোধ করে। নিজেরাই যাতে জীবিকা-উপার্জ্জন করতে পারে সেই চেষ্টাই তারা করছে। আজকাল চীনা মেয়েরা প্রায়ই সমপদস্থ বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে আনে। নিজেরাও প্রায়ই অপরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যায়।"

মিস্ মারসিলি জুন

মিস মারসিলি জুনের বয়স মাত্র ২ বৎসর। কিন্তু এই বয়সেই তিনি আটটি বিভিন্ন ভাষায় চমৎকার কথা বলতে পারেন। স্পেনদেশে তিনি স্পেনীয় ভাষাতেই সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। লাইসিয়াম ক্লাবের সভ্যগণ তাঁর বক্তৃতার জন্যে তাঁকে অশেষ প্রশংসা করেছেন।

কেন্দ্রসমিতির কথা

রেঙ্গুন সরোজনলিনী সমিতি

ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন নগরে "রেঙ্গুন সরোজনলিনী সমিতি" নামে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেন্দ্রসমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা সুজাতা দেবী সমিতির সভানেত্রী এবং শ্রীমতী নমিতা রায় বি-এ, বি-টি সমিতির সম্পাদিকা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। প্রধানতঃ বাঙালী মহিলাদের লইয়াই এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। আমরা এই সমিতির সাফল্য কামনা করি।

মাননীয় সন্তোষের রাজা

আমাদের পরিচালক-সভার সভাপতি মাননীয় সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের একখানি চিত্র বঙ্গলক্ষ্মীর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিরূপে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। কেন্দ্রসমিতির পরিচালক-সভার সভাপতিরূপে ইঁহার কার্য্যে অনেক অমূল্য সময় প্রদান করিয়া তিনি সমিতিকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। মনীষা, বিচক্ষণতা, প্রতিপত্তি এবং কর্ম্মক্ষমতা দ্বারা তিনি সমিতিকে প্রকৃত পথে পরিচালন করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। আমরা কামনা করি, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া দেশের কল্যাণকার্য্যে উত্তরোত্তর প্রভূত যশ ও অগ্রগের খ্যাতি লাভ করুন।

পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম

হিন্দু বিধবাগণকে সাধারণ লেখাপড়া ও নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা দিয়া স্বাবলম্বী করিবার জন্য লেডী শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী দেবীর দানে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির পরিচালনে এই বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৬ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা হিন্দু বিধবাগণকে এই আশ্রমে ভর্ত্তি করা হইতেছে। সাধারণ লেখাপড়া, ইংরাজি, বাংলা, গণিত, এবং নানাপ্রকার সেলাইয়ের কাজ, সকল প্রকার জামার ছাঁটকাটের কাজ, কার্পেট ও শতরঞ্চ বোনা, রঞ্জনরঞ্জন, এমব্রয়ডারী প্রভৃতি শিল্পকার্য্য এখানে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রীগণের স্বাস্থ্য বিষয়ে তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত লেডী ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য ও রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হয়। সমুদ্রতটের উপর অতি সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ ২ হইতে ৩ বৎসর কাল এখানে শিক্ষালাভ করিয়া শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এবং শিক্ষা সমাপনান্তে যাঁহারা বেতন লইয়া কাজ করিতে চাহেন তাঁহাদের কাজ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আশ্রমে শিক্ষার জন্য কোন বেতনাদি নাই; খাওয়া এবং অন্যান্য খরচ বাবদ প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীকে মাসিক ১০৲ টাকা প্রদান করিতে হয়। শিক্ষার্থিনীগণ ভর্ত্তির জন্য সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর নিকট ৬৫ নং বোসপাড়া লেন, কলিকাতা ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

৺সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রবধূ শ্রীমতী উষাবতী দেবী বিধবাশ্রমে ২০৲ টাকা দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন।

কেন্দুয়াতে মহিলাসমিতি

স্থানীয় সাব রেজিষ্টার মিঃ আবুল হুসেনের চেষ্টায় ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কেন্দুয়া গ্রামে একটি নূতন মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতি হইতে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গুলি

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গুলি কেন্দ্রসমিতির অন্যতমা কর্ম্মীরূপে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিদুষী এবং উন্নতমনা মহিলাকে

কর্ম্মীরূপে পাইয়া সমিতি বিশেষ লাভবান হইয়াছে। তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল নারীসমাজের কল্যাণকার্য্যে ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আমরা তাঁহাকে সংগঠনশীলা নারীমঙ্গল সমিতির কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া লইলাম।

স্কুল-কমিটি

গত ১৭ই এপ্রিল শুক্রবার কেন্দ্রসমিতির পরিচালক সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্কুল-কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—সভাপতি—মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী এম, এল, সি ; সম্পাদিকা—শ্রীমতী নিস্তারিণী ঘোষ বি-এ, বি টি ; সভ্যাগণ—শ্রীমতী হেমলতা দেবী, ডাঃ এইচ, এন, রায় এম-বি, শ্রীমতী নলিনী হিন্দা বি-এ, অধ্যাপক ডাঃ পি, নিয়োগী পি-এইচ-ডি, রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, আই-এস-ও, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু সি-আই-ই, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ বি-এল, শ্রীমতী প্রতিভা সেন বি-এ।

প্রচারকার্য্য পরিচালন কমিটি

উপরোক্ত পরিচালক-সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রচারকার্য্য সম্পর্কীয় কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল (সম্পাদক) ; শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, মিঃ এ, এন, ব্যানার্জ্জি এম-এ, শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, ডাঃ এইচ, এন, রায় এম-বি, এবং কেন্দ্রসমিতির সহকারী সম্পাদিকা।

অভিনয় সংক্রান্ত কমিটি

মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এম, এল, সি (সম্পাদক), মিঃ সি, এম, ঘোষ বি-এল, মিঃ টি, সি, বোস, মিঃ এইচ, কে, দে বার-এট্-ল, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, এবং শ্রীযুক্ত কণিকুমার দত্ত এম-এ, বি-এল অভিনয় ও আমোদপ্রমোদ সংক্রান্ত কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মহিলাসমিতি-পরিদর্শন কমিটি

মফঃস্বলের মহিলাসমিতিগুলি কিরূপ কার্য্য করিতেছে তাহা পরিদর্শন এবং কিভাবে কাজ করিলে তাহাদের উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য একটি মহিলাসমিতি পরিদর্শন কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির সভ্যগণ মফঃস্বলের মহিলাসমিতি পরিদর্শন করিবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তি তাহার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—শ্রীমতী হেমলতা দেবী, শ্রীমতী নীরজবাসিনী সেন বি-এ, বি টি, শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী সেন, শ্রীমতী মনীষা রায় বি-এ, শ্রীমতী উমাশশী দেবী এবং শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী।

বাকাইয়ে মহিলাসমিতি

বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাকাই নামক পল্লীতে স্থানীয় পল্লীসঙ্ঘের উদ্যোগে সম্প্রতি একটি মহিলাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। গ্রামের অধিকাংশ মহিলাই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পল্লীসঙ্ঘের কর্ম্মীগণের চেষ্টায় এস্থানে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেন্দ্রসমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা সরযূবালা বসু সমিতির সম্পাদিকা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। সর্ব্ববিষয়ে স্থানীয় মহিলাদের উন্নতি করিবার জন্য সমিতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এবিষয়ে পল্লীসঙ্ঘের কর্ম্মীগণের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

সমিতির নূতন সদস্য

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, ডেপুটি ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ঢাকা, হরমনসিংহ, এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে সরকার আজীবন সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। সাধারণ সদস্য :—(১) শ্রীযুক্তা চিন্ময়ী দেবী, নেত্রকোণা ; (২) শ্রীমতী জীবনমোহিনী বালো, জলপাইগুড়ী ; (৩) মিসেস এস, কে, সেন, বেলতলা রোড, কলিকাতা ; (৪) শ্রীমতী পাকলবালা বসু ; (৫) মিঃ জে, এন, চ্যাটার্জ্জি, সিমলা হিলস্ ; (৬) শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ বর্দ্ধন, সিঙ্গাপুর ; (৭) কর্ণেল এইচ, সুরাবর্দ্দি, কলিকাতা ; (৮) মিসেস এডেলা কটস্, কলিকাতা ; (৯) শ্রীমতী হেমবালা সেন, শান্তিনিকেতন ; (১০) মিস্ এফ, সেকার, কলিকাতা, (১১) মিসেস এস, কে, সেন, আলিপুর।

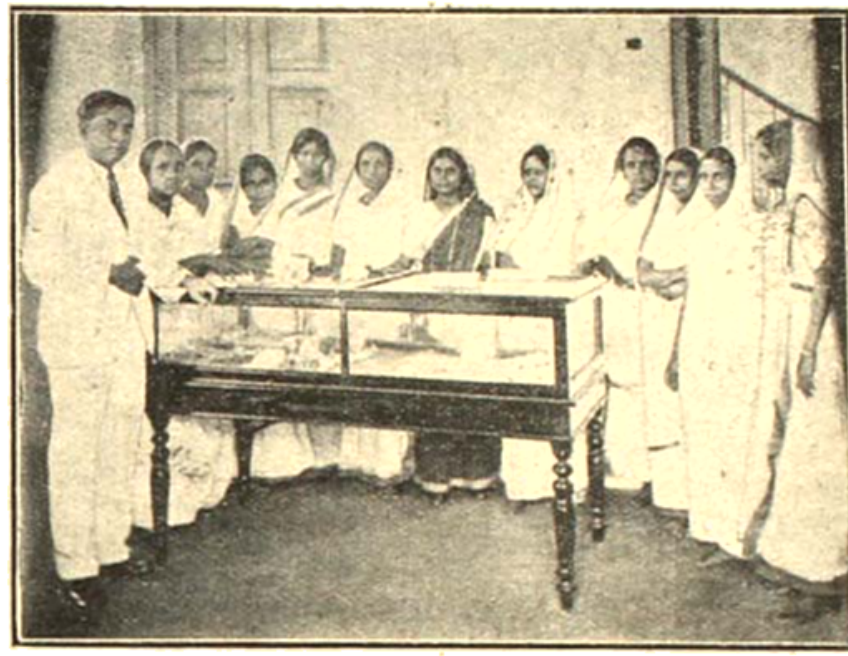

সরোজনলিনী নার্সিং শিক্ষালয়ের একটি শ্রেণী

মেসার্স ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট কোং

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কর্ম্মীগণের যাতায়াতের মাসিক টিকিট ক্রয় করিবার জন্য ৬ মাসের ভাড়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মাসে উক্ত কোম্পানী আরও ৬ মাসের যাতায়াতের মাসিক টিকিট ক্রয় করিবার ৬ মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রদান করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

মফঃস্বল-কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের সাহায্য

কেন্দ্র সমিতির মফঃস্বল-কার্য্য পরিচালনের জন্য পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও গভর্ণমেণ্ট ইনডাস্ট্রিস্ ডিপার্টমেণ্ট হইতে মাসিক ৪০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে।

সরোজনলিনী নার্সিং শিক্ষালয়

ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের বক্তৃতাবলীর ও ডাঃ কে, কে, ঘোষ, ডাঃ এস,এন,চ্যাটার্জ্জি এবং ডাঃ এম, সাহা মহোদয়গণের সহযোগিতায় সরোজনলিনী নার্সিং শিক্ষালয়ের কার্য্য বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান সেসনে Anatomy, Surgical Home Nursing, Midwifery, First Aid & Bandaging এবং Physiology-র ক্লাসের বক্তৃতা শেষ হইয়াছে। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য (Practical Training) নিয়মিত ভাবে হাসপাতালে যাইয়া শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নের ফলে এই নার্সিং শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

বেলগাছিয়ায় স্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রদর্শনী

গত ১৩ই এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রদর্শনী উপলক্ষে বেলগাছিয়া ভেটারীনারি কলেজ-বোর্ডিং কম্পাউণ্ডে একটি বিরাট মহিলাসভার অধিবেশন হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুক্ষণ পূর্ব্বেই এত অধিক সংখ্যক মহিলা উপস্থিত হন যে হল-ঘরে স্থানাভাব হওয়ায় নিকটস্থ সুবিস্তৃত ময়দানে সভার আয়োজন করিতে হয়। সভায় প্রায় এক হাজার মহিলা যোগদান করেন। সর্ব্ব প্রথমে একটি সঙ্গীত হইলে পর সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্ট মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তীকে সভানেত্রী নির্ব্বাচন করা হয়। মহিলাসমিতির সভ্যারা সঙ্গীত, আবৃত্তি, ছোরা খেলা, লাঠি

খেলা ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া সকলকে আনন্দিত ও বিস্মিত করেন। ব্যায়ামসমিতির বালিকারাও লাঠি খেলায় নিপুণতা ও কৌশল প্রদর্শন করেন। তৎপরে টালা মহিলা-সমিতির সুযোগ্যা সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মোহিনী সেন সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া সভানেত্রীকে বক্তৃতা দান করার জন্য আহ্বান করেন। সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, নারীজাতির সর্বপ্রকার অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দারিদ্র্য-হীনতা, হীনতা তাঁহাকে বড়ই ব্যথিত করে; যতদিন নারীর সর্বপ্রকার দুর্গতি দূর না হইবে ততদিন দেশের উন্নতি সম্ভব হইবে না। সঙ্গীতান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়।

পাইকপাড়া রাজবাটীতে স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী

গত ১৭ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার কর্পোরেশনের ৩১নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী উপলক্ষে টালার পাইকপাড়া রাজবাটীতে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। ঐ পল্লীর বহু মহিলা অতি উৎসাহের সহিত ঐ সভায় যোগদান করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী এই সভায় সভানেত্রীর কার্য্য করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, অকালে শিশুমৃত্যু এবং প্রসূতিমৃত্যু এ দেশের একটি ভয়ানক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান বহু পরিমাণে মহিলাদের উপর নির্ভর করে। মহিলারা যদি স্বাস্থ্যের নীতি যথাবিহিত পালন করেন এবং শিশুপালনে দক্ষ হন তবে এই অকালমৃত্যু বহু পরিমাণে রোধ করা যায়। সরোজ-নলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির অন্যান্য মহিলা কর্ম্মীরাও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

হাওড়ায় মহিলাসভা

গত ২৮শে এপ্রিল হাওড়ায় শাঁটরা মহিলাসমিতির উদ্যোগে বেলিয়স্ পার্কে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। হাওড়ার অনেক বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্ট মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গুলি সভানেত্রীর কার্য্য করেন। সর্ব্ব প্রথমে একটি সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপরে বালিকারা ছোরা খেলা, লাঠি খেলা ইত্যাদি প্রদর্শন করেন এবং কয়েকজন বালিকা আবৃত্তি ও গান করেন। সভানেত্রী নারীর শিক্ষা এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে বলেন যে, মহিলাদের শিশুপালন এবং শিশু-শিক্ষায় বিশেষ দক্ষ এবং নিপুণ হওয়া উচিত কারণ মায়ের হাতেই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয়। সভানেত্রীর বক্তৃতা শেষ হইলে নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে আলোকচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা করেন।

টালিগঞ্জে স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী

গত ২৯শে এপ্রিল রবিবার টালিগঞ্জে স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী উপলক্ষে গ্রেস গোলাম মাতৃসদন হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। বহু পর্দ্দানশীন মুসলমান মহিলাও এই সভায় অতি উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্ট মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী সভানেত্রীর কার্য্য করেন। মহিলারা কি ভাবে সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারেন, তিনি উপস্থিত মহিলাদিগের নিকট তাহা বিশেষ ভাবে উপস্থিত করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির অন্যান্য কর্ম্মীরাও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সালকিয়া মহিলাসমিতি

গত ৮ই মে বৃহস্পতিবার সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা চাটার্জ্জি সালকিয়া মহিলাসমিতির কার্য্যাবলী পরিদর্শন করেন। তিনি মহিলা-সমিতির কার্য্য দেখিয়া খুব সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। মহিলাসমিতির সভ্যারা খুব উৎসাহের সহিত শিল্পশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা-প্রচেষ্টা পরিচালনা করিতেছেন।

নিমতা মহিলাসমিতি

গত ৩রা মে শনিবার নিমতা মাতৃসমিতির উদ্যোগে স্থানীয় বারওয়ারী মন্দিরে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। গ্রামের বহু পুরুষ ও মহিলা এই সভায় যোগদান করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-চরণ শাস্ত্রী আলোকচিত্র সাহায্যে নারীশিক্ষার ধারা এবং শিশুপালন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মহিলারা অতি ধৈর্য্যের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই বক্তৃতা শ্রবণ করেন। এই সমিতি পর্য্যায়ক্রমে বহু গ্রাম্য নারীকে শিক্ষা দিয়াছেন।

খেলনার প্রভাব

শ্রী—

খেলনা শিশু-চিত্তের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, মানবচরিত্র-গঠনে কতখানি সহায়তা করে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। খেলনা মানুষকে 'মানুষ' করে বা 'অমানুষ'ও করিতে পারে। পোটা-দুইচার খুব সাধারণ খেলনার দৃষ্টান্ত বিচার করিয়া দেখা যাউক। আমাদের পল্লীগ্রামে কোন পাল-পার্ব্বণে মেলা হইলে বাঙ্গলার শিল্প-নিদর্শন যে-সকল খেলনা আমদানী হয়, তন্মধ্যে দেখা যায়, মাটির বেণে পুতুল, মাটির একটি মেয়ে কিম্বা মাটির একটি বুড়ো,—তার হাতে হুঁকা-কলিকা প্রভৃতি, কিম্বা মাটির কতকগুলি হাঁড়ি-কুঁড়ি থালা-বাসন ইত্যাদি। ছেলেদের জন্য টীনের তরওয়াল, ধাঁকারির তীরধনুক। শৈশবে এই সকল খেলনা লইয়া যাহারা খেলা করে, পরিণতবয়সে তাহারা প্রায় হয় শান্তিপ্রিয়, অলস-প্রকৃতির গৃহস্থ। মেলায় বাঁশের বাঁশী, কাগজের ফুল, সোনার পাখী, জীবজন্তু প্রভৃতিও আমদানী হয়। ইহাদের মধ্যে যেটি যে শিশু পছন্দ করে, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার প্রকৃতি যে সেই ধরণের হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। যে বাঁশী পছন্দ করিল, সে হয় ত বড় হইয়া গীত-বাদ্যে অনুরক্ত হইতে পারে। সেইরূপ, যে শিশু পাখী বা জীবজন্তু পছন্দ করিল, সে যদি বেশী বয়সে জীবন্ত জীবজন্তু পশুপক্ষী পুষিতে আরম্ভ করে, তবে তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইব না। আজকাল বিদেশ হইতে নানারূপ খেলনা আমাদের দেশে আমদানী হইতেছে। তাহাদের বিক্রয়ও বিলক্ষণ। এই সব খেলনা লইয়া যাহারা খেলা করিতেছে, তাহারা বড় হইয়া, আমাদের সেকালের মত না হইয়া যদি কিছু ভিন্নপ্রকৃতির হয়, তাহা হইলে তাহাতেও বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। সেইজন্য মনে হয়, যাঁহারা জাতি-গঠনের কথা চিন্তা করেন, যাঁহারা জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, ছেলেমেয়েদের খেলনা-নির্ব্বাচনের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত—কিরূপ খেলনা নির্ম্মিত হইয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ আনীত হইবে, কোন্ কোন্ খেলনা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়, এ বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত; এমন কি, এক এক প্রকার খেলনা শিশু-চিত্তের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বিদেশে, সভ্যদেশে, উন্নতিশীল দেশসমূহে তাহাই হয়। শিশুচিত্তের উপর ক্রীড়নকের প্রভাব সম্বন্ধে একজন চিন্তা-শীল লেখক একখানি প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে তাঁহার মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রায়ই দেখা যায়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার যে সকল প্রতিভাবান্ ব্যক্তি সবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের বিজ্ঞানালোচনায় প্রথম প্রেরণা পাইয়া-ছেন—ছেলেবেলায় তাঁহারা যে সকল খেলনা লইয়া খেলা করিয়াছিলেন তাহা হইতে। একটা বড় খেলনার কারখানার বড় কর্ত্তা তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই কারখানার মালিক আবার এমন কথাও বলেন যে, এমন কোন উদ্ভাবক নাই, যিনি তাঁহার শৈশবের ক্রীড়নক-গুলিকে তাঁহার বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের প্রথম প্রেরণাদাতা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। কেহ যদি কোন কলকব্জা উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, তবে তিনি তাঁহার শৈশবের দিনগুলি স্মরণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার সেই সময়কার খেলনাগুলি হইতেই—যত অল্প

পরিমাণেই হউক না কেন তাঁহার মস্তিষ্কে এই উদ্ভাবনী-শক্তির অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল। মিঃ ইস আরও বলিতেছেন, অনেক যুবক তাহাদের জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়া থাকে কেমন করিয়া? তাহাদের শৈশব-জীবনের সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, তাহারা প্রথম যে খেলনাটি পাইয়াছিল, তাহার গঠনপদ্ধতি ও কার্য্যপদ্ধতি অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া সেই খেলনা পর্য্যবেক্ষণের ফলেই সে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র-নির্ব্বাচনের প্রাথমিক উৎসাহ ও উত্তেজনা লাভ করিয়াছিল। শিশুরা তাহাদের খেলনার অংশগুলিকে বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট ও পুনঃসংযুক্ত করিতে করিতে নূতন বস্তুগঠনের প্রেরণা পাইয়া থাকে।

কোন্ কোন্ জিনিস দিয়া খেলনাটি গঠিত এবং কেন সেই সকল বস্তু সংযুক্ত করা হইল, এই সকল রহস্য ভেদ করিবার জন্য শিশুচিত্তের কৌতূহল অনেক অধিক। ছেলেরা আরও জানে, খেলনাটির কাজ কি, কেমন করিয়া তাহা ঐ কাজ করে। এইরূপ আলোচনা উপলক্ষে শিশুর চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটে এবং সে অনেক বিষয় শিক্ষা করে। ইতিহাসে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, যেক্ষেত্রে লোকে তাহাদের শৈশবের ক্রীড়নক হইতে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মের প্রথম প্রেরণা পাইয়াছে।

সকলেই জানেন যে, টমাস এ, এডিসন তাঁহার সমস্ত খেলিবার বয়সটা যন্ত্র-তন্ত্র লইয়া খেলা করিয়া কাটাইয়াছিলেন। রাইট ব্রাদার্স যে বিমান আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত দৈবক্রমে ঘটে নাই। রাইট ভ্রাতারা শৈশবে ক্রমাগত রেলুন লইয়া খেলা করিতেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন আকারের রেলুন বায়ুপূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন উচ্চতা পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিয়া দেখিতেন—প্রবল বায়ু কেমন করিয়া তাহাদের ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং কোন্ আকারের রেলুনটা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে উঠিতে পারে।

কার্ল একজন বড় উদ্ভাবক ও বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পী। তিনিও তাঁহার শৈশবকাল ছোট ছোট যন্ত্র লইয়া খেলা করিয়া কাটাইয়াছিলেন। তিনি একদা একটি পকেট-কল উপহার পাইয়াছিলেন। সেটি খোলা এবং মোড়া যাইত। এই জিনিসটি পাইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। সেই ছেলেবেলাতেই তিনি তাঁহার যন্ত্র-তন্ত্র লইয়া খেলনা এবং গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতেন। পরবর্ত্তী কালে যখন তিনি অরণ্যবাস করিয়া খাতিলাভ করেন—লোকালয় হইতে শত শত ক্রোশ দূরে সেই গভীর অরণ্যমধ্যে তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার কোন উপায় ছিল না। শৈশবের গঠনকার্য্যনিপুণতা তখন তাঁহাকে অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছিল। যে যন্ত্রপূর্ণ বাল্য শৈশবে তাঁহার ক্রীড়নকরূপে তাঁহাকে আনন্দ দান করিত, আজ তাহা তাঁহার মহোপকার সাধন করিল।

আর একজন প্রধান লোকের শৈশবজীবনে খেলনা বহু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইনি মাউন্ট উইলসন অবজারভেটারীর ডাক্তার জর্জ এলারী হেল। ইনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদগণের অন্যতম। শৈশবে তাঁহার প্রিয় খেলনা ছিল এঞ্জিন, বিদ্যুৎতরঙ্গী ও অন্যান্য কলকব্জা-বহুল ক্রীড়নক। এই সব খেলনা হইতে তিনি গঠন-মূলক কলকব্জার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে একটি যন্ত্রের বাক্স উপহার দেন। আট বৎসর পরে তিনি যে একটি কারখানা গঠন করেন, তাহার সূত্র-পাত হয় এই খেলনার বাক্সে। সেই বাক্সে করাত, অণুবীক্ষণ, ক্যামেরা, দূরবীক্ষণ ও অন্যান্য যন্ত্র ছিল। এইগুলিকে তিনি লেবরেটরীর আকারে সাজাইয়া লয়েন। সেই লেবরেটরীতে তিনি সরল পদার্থ-বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতিষিক যন্ত্র-তন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন। ডাক্তার হেল তাঁহার সেই ছেলেবেলাকার যন্ত্র এখনও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

তার পর রিয়ার এডমিরাল মোফেটের কথা ভাবিয়া দেখুন। ইনি যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবিভাগীয় বারোর কর্ত্তা। তিনি বলিয়াছেন, বাল্যকালে তিনি ঘুড়ি উড়াইতে বড় ভালবাসিতেন।

লিণ্ডেন এবং মোজেস্কি—দুইজন সেতুনির্ম্মাণের ওস্তাদ। তাঁহারা যদি তাঁহাদের শৈশব-জীবনের কথা কখনও করেন, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, খেলাঘরের সেতু নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা শৈশব যাপন করিয়াছিলেন।

খেলনা প্রস্তুত করার ব্যাপারের একটা নিজস্ব বিশেষ মনস্তত্ত্ব আছে। পরিণত বয়সে মানুষ যাহা হইবে, খেলনা তাহারই ক্ষুদ্র সংস্করণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, একটি বালক জেপেলিনের বিবরণ শ্রবণ করিল। তখন তাহার মনে নানারূপ কল্পনার উদয় হইল। এই কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে একটা সংযোগ রহিয়াছে। তাহার ফল—খেলনার আকারে জেপেলিন নির্ম্মাণ। এই খেলাঘরের জেপেলিন এমনভাবে প্রস্তুত হইবে যে বাস্তব জেপেলিনের সমুদয় অঙ্গ-

প্রভাব ক্ষুদ্রাকারে খেলাঘরের ছেলেদিনে থাকিবে। তাহা হইলে খেলনাটি কেবল শিশুর প্রীতিদায়ক হইবে না, উহা শিক্ষাপ্রদ হইয়া উঠিবে।

আর একটা কথা, খেলনা বলিয়া তাহা ক্ষণভঙ্গুর হইলে চলিবে না—তাহা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের অধিকাংশ খেলনা ক্ষণস্থায়ী। মাটির খেলনা, কাঠের খেলনা এমন কি ধাতুময় খেলনাও বেশীক্ষণ টিঁকে না। আজকাল জাপান হইতে প্রচুর ও নানারকমের সস্তার খেলনা এ দেশে আমদানী হইতেছে। সেগুলি দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু অতিমাত্র ভঙ্গুর। রবারের বেলুন, সেলুলয়েডের পুতুল ও নৌবহর, কাগজের সুদৃশ্য খেলনা—ইহারা এতই ক্ষণস্থায়ী যে, কিনিয়া বাড়ীতে আনিতে পর্য্যন্ত হয় না—রাস্তাতেই কিম্বা দোকানেই ভাঙ্গিয়া যায়। জাপানী খেলনা সম্বন্ধে বেশী বলিতে চাহি না। কেবল এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই খেলনার যাবদ যে অর্থব্যয় করা হয়, তাহার প্রত্যেক পয়সাটি অপব্যয় মাত্র। কিন্তু আমাদের দেশীয় খেলনা দীর্ঘস্থায়ী যাহাতে হয়, সে চেষ্টা করা উচিত। খেলনা-প্রস্তুতকারীরা দুঃখ করিয়া বলে, সুন্দর সুদৃশ্য দীর্ঘস্থায়ী খেলনা প্রস্তুত করিতে হইলে তাহার পড়তা অধিক হয়, তাহা সস্তায় বিক্রয় করা যায় না; অথচ খরিদদার বেশী খেলনা বলিয়া তাহার যথোচিত মূল্য দিতে প্রস্তুত নহে। ইহা বাস্তবিকই দুঃখের কথা। দেশীয় শিল্পকে খরিদদার উৎসাহিত না করিলে কে উহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে? কাজেই উহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা ন্যায্যমূল্যে বেশী খেলনা কিনিতে চাহেন না, তাঁহারাই বেশী মূল্য দিয়া বিদেশী খেলনা কিনিতে লজ্জা বোধ করেন না। অথচ ছেলে "মানুষ" করিতে, তথা জাতি-গঠন করিতে খেলনার প্রভাব কত বেশী।

"ছেলেদের খেলনা" বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। তাহা মজবুত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। সাধারণতঃ বয়স্ক লোকের ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় জিনিস যতটা মজবুত করিয়া তৈয়ার করা হয়, খেলনা তাহার অপেক্ষাও মজবুত হইবে; কেন না, মনে রাখিতে হইবে যে, ছেলেমেয়েরা তাহা ব্যবহার করিবে। কেবল ব্যবহার করিবে বলিলে ঠিক বলা হয় না—অপব্যবহারেও যাহাতে না শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়, এমনভাবে মজবুত করিয়া খেলনা প্রস্তুত করিতে হইবে।

পুতুলটা ছেলেদের হাত হইতে শত শত বার পড়িয়া যাইতেছে। পড়িবামাত্র তাহা যেন ভাঙ্গিয়া না যায়, কিম্বা যদি 'ডল' হয়, তবে তাহার ভিতরকার জিনিস যেন বাহির হইয়া না যায়। যদি কলের খেলনা হয়, তাহা হইলে ছেলেদের হাত হইতে মাটিতে পড়িলেও যেন তাহার কল-কব্জা ভাঙ্গিয়া না যায়, যেন তাহা অচল হইয়া না পড়ে। বাঁশী বাজাইবার সময় শিশু তাহা জোরে কামড়াইয়া ধরিবে। সেই কামড় সহ্য করিয়া যেন বাঁশীর বাজিবার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। খেলনা লইয়া ছেলে যদি নিরাশ হইয়া পড়ে, তবে উহা তাহাদের মনে চিন্তাশীলতার উদ্রেক করিতে পারিবে না।

কলের খেলনা ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃই বেশী পছন্দ করে এবং তাহাই তাহাদের মনে বেশী পরিমাণে চিন্তার উদ্রেক করে। জাপান হইতে যেমন সস্তায় কৃষ্ণ কাঁচীর খেলনা এদেশে আমদানী হয়, জার্ম্মাণী ও আমেরিকা হইতে তাহার ঠিক উল্টা মজবুত, দামী কলের খেলনা আসে। যাহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা এই কলের খেলনা কিনিয়া দিলে ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়। এই খেলনা তাহাদের মনে কৌতূহল জাগায়, চিন্তার উদ্রেক করে—কল বিগড়াইয়া গেলে ছেলেরা নিজেরাই তাহা মেরামত করিবার চেষ্টা করে, যদিও সব সময় পারে না।

কলের খেলনা সকল দেশের ছেলেমেয়েদের এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, যে সব দেশে এইরূপ খেলনা প্রস্তুত হয় (প্রধানতঃ জার্ম্মানী, আমেরিকা এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইংলাণ্ড, ফ্রান্স), সেই সকল দেশে কলের খেলনার বড় বড় ফ্যাক্টরী খুব ভালরকম চলিতেছে। স্বদেশে-বিদেশে লক্ষ-লক্ষ গৃহে এই খেলনা ব্যবহৃত হয়, কোটি কোটি টাকা এই কারবারে খাটে।

আমি এদেশের খেলনা প্রস্তুতকারকদিগকে এবং ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকদিগকে এই কথাও স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে, কেবল ছেলেভুলানো—খেলনার উদ্দেশ্য নহে এবং হওয়াও উচিত নহে। খেলনা চরিত্রগঠনের একটি প্রধান উপাদান। এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া খেলনা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে, এবং এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া খেলনা নির্ব্বাচন করিয়া ছেলেমেয়েদের খেলনা কিনিয়া দিতে হইবে। শিশুরা স্বভাবতঃ কল্পনাপ্রিয়; খেলনার সাহায্যে যাহাতে তাহাদের কল্পনা "বহুযাত্বে"র পথে প্রধাবিত হইতে পারে, তাহাই যথার্থ উপযুক্ত খেলনা। শৈশবকাল শরীর ও মনের গঠনের কাল। এই সময়ে যাহাতে তাহাদের শরীর ও মন সুগঠিত হইতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের খেলনা, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য জিনিস নির্ব্বাচন করিতে হইবে। তবেই ছেলে 'মানুষ' হইবে, সুসন্তান হইবে—জাতিও সুগঠিত হইবে। ছেলে খেলিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা (এক্সপেরিমেণ্ট) করিবে, তবে ত ছেলে 'মানুষ' হইবে। খেলনা লইয়া খেলা করিবার সময় তাহার মনে যে 'ভাবে'র সৃষ্টি হইবে, তদনুসারেই তাহার ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠিত হইবে।

—বসুমতী

তিনশো পঁয়ষট্টির একদিন

শ্রী পূর্ণচন্দ্র রায়

অপমান, —অপমান আর অপমান,—শুনে শুনে কান ঝালাপালা হ'য়ে গিয়েছে···উঠতে বসতে চিপ্‌টে ধরে—কলে-পড়া ইঁদুর আর কি! এ যেন হুইচে পড়া মড়ার গলায় দড়ি বেঁধে টানাটানি করা, এমনি ক'রে লাঞ্ছনা দিনরাত। হ'য়ে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যেন একটা নিত্যনৈমিত্তিক তোলা বস্তুর মধ্যে, বিশ্রী বিদ্রূপ,—না হ'লে যেন আর আমাদের চলে না ওদেরও চলে না।

দিনে বিশ বার চাপরাসী-বেহারার কাছ থেকে পর্যন্ত এই বিদ্রূপ আসছে।—অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

একদিন যদি কাজের ভিড়ে বেহারা দরওয়ানরা ভুলে গেল, নিজেরা নিজেদের অপমান করবে সেদিন।

ফাঁক পেলেই চটোর কথা আরম্ভ করবে—বক বক—তার মধ্যেও একে অপরকে ছোট করবার একটা নীচ প্রবৃত্তি—শুরুত্ববোধ নেই। যত বড় অপমানজনকই হোক না কেন হা হা ক'রে হেসেই হালকা ক'রে ফেলবে—কাণ্ডজ্ঞান নেই অপমান জিনিসটা মানুষের কোথায় গিয়ে আঘাত করে। জানোয়ার আর কি! দেখতে নিরীহ এদিকে পেটে পেটে শয়তানিতে ভর্ত্তি—চেহারা দেখলেই গালে চটাৎ ক'রে একটা চড় কসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। আর অমনি ছুছু···নইলে আর এত নাম থাকতে কেরানী বলেছে কেন?—একাদনে ব'সে জীবনটা কর্পূরের মতন উড়িয়ে দেয়।

জীবনভোরই তো দুঃখের জাল বুনতে বুনতে কেটে গেল, তবুও যখন এদের মধ্যে এসে পড়লাম, তখন বলতে হলো—চা বাবা, একটা সত্যিকার দুঃখ বটে! এমিকটা জানাই ছিল না; বাদ প'ড়ে গেলে একটা কাণ্ডই বাদ প'ড়ে যেত।

এর চেয়ে আমার সে ছিল ঢের ভাল—রাজার হাল, নাই বা পেলাম দু'বেলা খেতে, তবুও অন্নদাতার গলায় দু'বেলা তো ছুরি দিতে হ'ত না।

আফিসে এসে ঢুকলাম। মানুষগুলো যেন সব পক-ছাগলের মতন হাম্‌লে বেড়ায়···চব্বিশ ঘণ্টাই এমন ক'রে বেড়ায়, মনে হয় বাস্‌রে আর একটু কম করলেই বুঝি কোম্পানীর ব্যবসা তুলে দিতে হবে! এর মধ্যে আবার বেহারা ডাকে, টুলের উপর ব'সে ব'সেই হাঁকতে লেগে যায়—এ বাবু, এ বাবু, আরে এ কিট্টোবাবু (কৃষ্ণবাবু), সাহেব বোলাতা হ্যায়। কাপড়খানা একটু ক'ষে নিয়ে মুখখানা বেয়াকুলের মতন ক'রে আবার সেখানে যেতে হয়। সাহেব গাধা-টাধা কি বলে, শুনে বেরিয়ে আসে এও একটা কাজের মধ্যে! আর নিয়ে আসে এক বুড়ি কাগজ। বেহারাকে বলে—আরে ধরো ধরো, প'ড়ে যাবে হ্যায়, দেখতা নেই হ্যায়। সে বলে—উ ও উসকো বোলাইয়ে, হাম আপকো বেহারা নেই। নাজেহাল হ'য়ে আবার কাকুতি-মিনতি ক'রে তাকে ডাকে, সে শুনতে পায়—কথা কয় না, আড় চোখে একবার দেখে নিয়ে ঘুলে আবার পাগড়ী বাঁধতে থাকে। দু'বারের বেশী তিনবার ডাকাডাকি করলে বিঁচিয়ে উঠে,—নয়তো বড়বাবুর টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, আর ডাকবার হুকুম নেই। নিজেই নিয়ে এসে কাগজগুলো টেবিলের উপর ফেলে, আবার যায় যেগুলো বাঁধতে পড়েছিল কুড়িয়ে আনতে।

একই টেবিল—ওদিকে যে ব'সে থাকে গোবর্দ্ধন মহন চেহারা, এখন তার সুসময় যাচ্ছে, কথায় কথায় বলে—ভদ্রলোক!···মনে মনে ধারণা—ভারি বলিয়ে-কইয়ে। ঠিক যেমন গোবের উপর বিষ-ফোড়া, সে আবার চেঁচিয়ে উঠে—আপনার জন্যে দেখছি আর কাজকর্ম হবে না। বলে—পাড়াগেঁয়ে লোক কি না procedure জানে না। আপনার উচিত ছিল বেহারা ডেকে কাগজ-পত্তর নিয়ে এসে শুছিয়ে রাখা; জানেন এ সব কি রকম দরকারী কাগজ।

রাগ এইবার বেধায় চ'ড়ে যায়—মারি গালে এক ঝাঁটো, মুখ থুবড়ে প'ড়ে যায় তবে ঠিক হয়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই এগোয়—ঠিক আর হয় না। মনেই কেবল হয়—দিই জন্ম-মা-তারা ব'লে এক ঘা—procedureটা একবার দিই দেখিয়ে। রাগ প'ড়ে যায়; বুড়ো মিন্‌সে—কান্না পায়, কিন্তু সময় হয় না। বার কতক ঢোক গিলে স্বভাবের ডাকে বাইরে যেতে হয়, ফিরে আসতেই বড়বাবু ডাকেন—কোথায় ছিলে হে?

আজ্ঞে, একবার বাইরে গিইছিলাম।···বোঝেন,—স্বভাবের তাড়নায়; কিন্তু তিনি সে স্বভাবের লোক নন। এসব তিনি বহুদিন জয় করেছেন। নইলে আর তিনি বড়বাবু, আর আমরা—বার বার বাইরেই টানে আমাদের।···

তাই বলেন—তোমার কি ব্যারাম আছে হে?···আট ঘণ্টার মধ্যে এক-আধবার স্বভাবের অনুরোধে বাইরে যাওয়া ব্যারাম কি একেবারে নিশ্চল পুঁটি হ'য়ে বসে থাকা ব্যারাম ঠিক বুঝতে পারিনে, তবে বোঝা যায় বড়বাবু না হ'য়ে বেঁচে

থাকাই ব্যাধি। কিন্তু সেটা আর জিজ্ঞাসা করা হয় না। ঝুল ঝুল ক'রে তাকাতে তাকাতে ফিরে আসতে হয়। গোবরা তখন খুব কাজ করছে; আমি—বাঁচা গেল। হঠাৎ গোবরার আবার হয় রসোদ্গার। তাও আবার বৈষ্ণব-সাহিত্য, বস্তুশক্তিকবাদ এই নিয়ে, চায়ের দোকান থেকে শিখে আসে। আর আমাকে পেয়ে বকতে সুরু করে। অল্প জ্ঞানের অগাধ মূর্খতা! তাও স'য়ে যেতে হয়। ওর এখন সময় ভাল। এমনি ক'রে পড়ে টিফিনের ঘণ্টা। কিন্তু টিফিনের ঘণ্টা পড়লেই তো টিফিন আসে না! তা হ'লে চব্বিশ ঘণ্টাকে অনেক রকম কাজে লাগিয়ে ফেলা যেতো। টিফিনের ঘণ্টা যাদের জন্যে তাদের টিফিন আসে।

আমাদের দলের মধ্যে বোরাল কাঁধে ক'রে একটু মাছি তাড়াতে পারে। কেউ বা গেল বারান্দায় একটু হাওয়া টিফিন ক'রে আসতে; কেউ বা ব'সে ব'সেই পাখার বাতাসে সে কাজ সারলে। তবুও টিফিনের ঘণ্টা—ঠাট্টা আর কি! খেতেই পায় না তবুও ঐ টুকুর জন্যেই হ্যা-হ্যা ক'রে মরে। টিফিনের সময় বড় সাহেবের কুকুর বিস্কুট খায়। এবার বেহায়া—না ডাকতেই চানা চিবুতে চিবুতে এসে বলে—বাবু, কুছ মাঙ্গাওগে নেই? এক গাল হাসি আর চিবুনো চানা···যা যা আর চালাকি করতে হবে না!

গোবরা যায় বাবুর্চির সঙ্গে ভাব ক'রে কুকুরের বিস্কুট থেকে দু'খানা বাগাতে। কিদের জ্বালা যে কি তা শুধু জানে না—ছুটে বেড়ায়; তবু যদি পেটের দায়ে একটা নতুন লোক এলো, লাগবে তার পেছনে ঘন বেঁধে—কি জানি বাঙলার মনসদ যদি হাত ছাড়া হ'য়ে যায়? তাই আর চলে না; ওরা বলবার আগেই নিজেই স'রে পড়ি নতুনের সন্ধানে।

আফিস না কসাইখানা! শনিবারের দিন ছুটোর সময় বেরিয়েই সেই রোদ মাথায় একেবারে যাই ইডেন গার্ডেনে—একটু নির্জ্জন স্থান দেখে বসি। ঝোঁক সামলাতেই যায় এক ঘণ্টা! তার উপর চন-চনে রোদে হেঁটে আসা—মাথা, কান ঝি-ঝি করতে থাকে। কাজ তো গেল—পাব কি? তবুও হালকা বোধ করি, গোবরার হাত থেকে তো বাঁচা গেল! আবার আপশোষ হয়, আহা, শুধু শুধুই ছাড়লাম, ছাড়লাম তো একেবারে রীতিমত ছাড়লাম না কেন, সে কিছুদিন মনে থাকতো? এমনি ক'রে তো এরা কত লোককে টিঁকতে দেয় না; কিন্তু তাই বা কৈ, এপার বার তো এমনি ক'রে পালিয়ে আসতেই হয়েছে! মনে পড়তেই নিজের অক্ষমতার ক্ষোভে চোখ দিয়ে আপনি খানিকটা জল গড়িয়ে পড়লো; সত্যিই এদের তুলতে ইচ্ছে হয় কিন্তু ছুঁতে ইচ্ছে হয় না—যদি কেউ দড়ি বেঁধে দেয় প্রাণপণে টানতে রাজি আছি। আর বলতে পারি না—কেমন ছটফটানি ধরে—কতকগুলো কেরাণী ঠ্যাঙাবার ইচ্ছে হয়। পাঁচটা নাগাদ ফের হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দাঁড়াই ডেলহৌসি স্কোয়ারে সিরাজুদ্দৌলার কুকীর্ত্তির কাছে—আজ গোটা কতক সুকীর্ত্তি করবো!···একটু পরেই কি হ'য়ে যায়—যেমি ছুটো তিনটে কনেস্টবলের ওম দাম কিল-চড় পড়ছে—এই শালা, তুম আদমী মারা হ্যায়···

তারপর হাজত। সেখান থেকে আর বাড়ীতে খবর পাঠাতে পারলাম না। তারা যে কতক্ষণ আমার পথ চেয়ে বসেছিল, তারপর কোথায় গেল জানিনে—জানে যদি ঐ ভগবান ব'লে কেউ থাকে। আমি বলি মুক্ত—সব ভুয়ো।···জেল থেকে তিন মাস পরে ফিরে এলাম, অনেক সন্ধান নিয়ে খুঁজে বের করলাম—বৌ ভাবিনীপুরে কোন্ এক বড়-লোকের বাড়ী ঝিগিরি করছে, মেয়ে দু' বছরের কচি—না খেতে পেয়ে দুধের অভাবে হাত-পা সিঁটকে পটল তুলেছে···গোবরা এ খবরে ভারি খুসি!···

শুনলাম, বাঁশটা যে মেরেছিলাম তাতে গোবরার হেঁটো ভেঙে গিয়েছে—এখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে আফিসে যায়, মাইনেও বেড়েছে।

ভারের গৌরব

শ্রী ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার

যেথা কিছু মাত্র চাহিনা কাহারো দুয়ারে
চরণের কাছে বসিতে যেন গো পারি,
গরবীর বেশে চলিতে চাহিনা ওপারে
এপারে আমার ধূলার আসন ছাড়ি'।
এ ধূলা আমার সোনার সমান,
স্বর্গ হইতে অধিক মহান,
রাজার প্রাসাদ সাজুক প্রাচীর-প্রাকারে—
খোলা কিশের তলে এ আমার বাড়ী।

তোমার স্নিগ্ধ বদনপ্রান্তখানি
মুছাও তুলিয়া সকল দুঃখের আঁখিজল
জননি তোমার করুণ কণ্ঠবাণী
ডুবাইবে আমি কুকথার যত কোলাহল।

মঙ্গল তব গন্ধালেপনে
বিপুল ললাটে প্রাতে—গগনে
মুগ্ধ আমার শ্রান্ত নয়ন আনি'
ভুলিব সকল বিষাদ-বেদনা-ছলাকল।

কত দুখে শোকে কত অনশনে রহিয়া
শতের শাসন-সংযত মুখ চরণে,
রোষি' আঁখিজল নির্ম্মম তার বহিয়া
বিশ্বের তুমি চলিছ রাত্রি-চরণে।
তোমারে ফেলিয়া যাব কোথা আর,
যাও যাও মোরে কিছু তব ভার,
সকল দুঃখ তব গৌরবে সহিয়া
সে ভার বহিয়া চলিব জীবনে-মরণে!

স্লোনের লিনিমেণ্ট
বাতরোগ আরোগ্য করে।

স্লোনের লিনিমেণ্ট শরীরের যন্ত্রণাদায়ক গ্রন্থি এবং বেদনাকর পেশী সমূহে অতি সত্বর স্নিগ্ধ আরাম প্রদান করে।

আক্রান্ত স্থানে একটু স্লোনের লিনিমেণ্ট লাগাইয়া দিন তাহা হইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই যন্ত্রনার উপশম হইবে। কারণ স্লোনের লিনিমেণ্ট শরীরে স্বাভাবিক রক্তস্রোত প্রবাহিত করে।

Sloan's Liniment kills pain!

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him at 45 Beniatola Lane, Calcutta

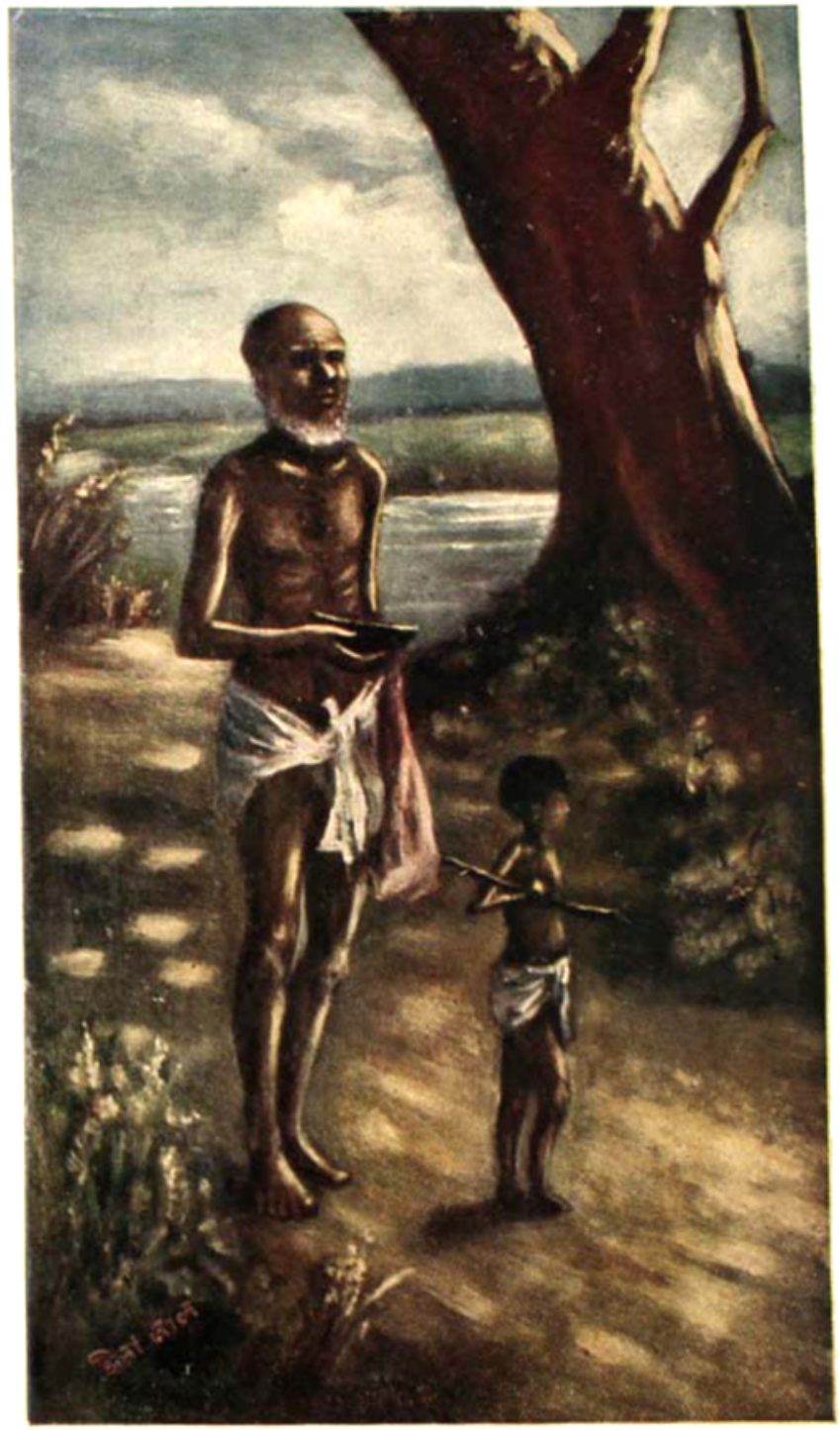

অন্ধের নড়ি

শিল্পী—শ্রী চীরালা

বঙ্গলক্ষ্মী

"আমি তাই আমাদের দেশের মা-বোনদের অনুরোধ করছি, ছেলে মানুষ, প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলা-সমিতি স্থাপন করুন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাবে দেশ ছেয়ে ফেলুন, তা ছাড়া, দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন, তবুও যতই স্বাধীনতায় আশা করি না কেন, সবই বিফল হবে।"

—সরোজনলিনী

৫ম বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৭ [৮ম সংখ্যা

মানব-জীবন

খেলা-ঘরে খেলেছিলে শিশু ছিলে যবে
ভেবেছিলে সেথা বুঝি চিরদিন রবে,
জানিতে না—পরে পরে নূতন জীবন
দিনে দিনে কালে কালে করিবে গ্রহণ,
নব নব জ্ঞান আর নব নব ভাব
পূরাইতে জীবনের সকল অভাব
লভিতে হইবে সবে, যাহার কারণ
সুন্দর মানবরূপ করেছে ধারণ ;
শত শত ত্যাগ আর শত শত দান,
পুঞ্জীভূত জ্ঞানরাশি, ধ্যানদীপ্ত প্রাণ
রক্ষিত হইবে যবে জীবনের শেষে,
উত্তরিত হবে পার সেই মহা দেশে
যেথায় মনের সীমা করি' দিয়া দূর
চিরানন্দে ভাসে প্রাণ একান্ত মধুর।

দ্রৌপদী

শ্রীগিরিবালা রায়

আর্য্য-নারীদিগের [illegible] প্রকৃতির আদর্শই [illegible] অঙ্কিত দেখিতে পাইতে-ছিলেন। গুরুজনের আশীর্ব্বাদ, পতিদেবতার উপদেশ—"সীতার মত সতী হও, সাবিত্রীর মত পতিব্রতা হও।" কিন্তু "দ্রৌপদীর মত হও" এমনতর কথা কই বড় একটা শোনা যায় না। অথচ পুরাণশ্রেষ্ঠ মহাভারত—যাহা একাধারে ইতিহাস ও কাব্য, যে মহাভারত "পঞ্চম বেদ"

শ্রী গিরিবালা রায়

নামে অভিহিত, বেদব্যাস যাহার রচয়িতা—সেই মহা-ভারতের শ্রেষ্ঠা নারী দ্রৌপদী, যত গুলি গুণ নারীজীবনের কাম্য প্রত্যেকটির শ্রেষ্ঠ আদর্শে ভূষিতা।

মহাভারত সত্য ঘটনা। ইহা কেবল কবিকল্পনা নহে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, সুতরাং ইহা ইতিহাস, কাব্য,—হিন্দুদিগের বিখ্যাত ধর্ম্ম এবং মোক্ষ-শাস্ত্র। এই গ্রন্থের [illegible] তাঁহাকে কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তথাপি ইতিহাসের সঙ্গে যখন কাব্য-সংযোগ রহিয়াছে তখন কাব্যকে সরস করিবার জন্য রচয়িতা যে কিছু না কিছু কল্পনার আশ্রয় নিয়াছেন তাহা অবশ্য নিঃসন্দেহ, কিন্তু কোন্‌টা কল্পনা কোন্‌টা সত্য তাহার বিচার করিয়া কাহারো চরিত্র সমালোচনা করা বড় কঠিন সমস্যা। ইহাতে নানা জনের নানা মত স্বাভাবিক। বিশেষতঃ পৌরাণিক-ইতিহাস কাব্যের সঙ্গে এত জড়িত যে হেঁয়ালী ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্যাসত্য-নির্ণয় সোজা ব্যাপার নহে। মূল গ্রন্থ হইতে আবার কাশীরাম দাসের মহাভারত লোকপ্রিয় বেশী, কিন্তু ইঁহার রচনার সঙ্গে মূলের অনেক স্থানে অনৈক্য দেখা যায়। কাশীরাম দাস ভক্ত এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয়, তাঁহার রচনা-ভঙ্গীতে সরলতা ও রসপ্রিয়তার বিশেষ পরিচয় আছে। লোকে বলে কাশীরাম অশিক্ষিত ছিলেন, কথক ঠাকুরদের মুখে শুনিয়া মহাভারত লিখিয়াছেন। যাক্ আমি মূল ও কাশীরাম দাস দুই গ্রন্থ হইতেই নিজ সাধ্যমত অভিজ্ঞতানুযায়ী সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

অন্যান্য আর্য্যাদিগের চরিত্র হইতে দ্রৌপদী-চরিত্রের যে বিরাট একটা ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে—তাহার কারণ ও বিশেষত্ব মহাভারতে কিছুমাত্র অপরিস্ফুট নহে; কবি কাব্যে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করেন নাই। দ্রৌপদী ইতিহাসের নারী ও কাব্যবিজয়িনী।

কিন্তু তবু যে দ্রৌপদী আমাদের সংসার ও সমাজের বাহিরে রহিয়াছেন, সেই যে সতীকুলশিরোমণিগণ হইতে একটুখানি দূরে-দূরে রহিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ কবি তাঁহাকে "পঞ্চস্বামিত্বের" আখ্যা দিয়াছেন বলিয়া। মানুষ চায় তাহাদের মানুষী-বৃত্তি লইয়াই থাকিতে, দেবত্বের কল্পনা তাহাদের পক্ষে দুরূহ। তাই এই "পঞ্চস্বামিত্ব" দ্রৌপদী-চরিত্রের কোন্ স্থান উজ্জ্বল করিয়াছে সে চিন্তা

মানুষী-দুর্বলতার ভস্ম করিতে আমরা অক্ষম এবং সেই জন্যই দ্রৌপদী মহাভারতের সহস্রবার সতী আখ্যা পাইয়াও নারীজগতে সতী-নারীদের নীচে স্থান পাইয়াছেন। ইহার বিশ্লেষণ কঠিন।

সীতার সতীত্ব, সাবিত্রীর পাতিব্রত্য, দময়ন্তীর নিষ্ঠা এ-সকলই একটি কথার ছায়া, এক স্বামী-ভক্তিরই নিদর্শন অথবা উপাখ্যানে গঠিত; ইহা ছাড়া অন্য বিশেষত্ব কিছু নাই, যাহা দ্রৌপদীর ছিল। যাহা স্পষ্ট, যাহা আধুনিক জগতেও নারীজীবনের কাম্য তাহার সমস্ত আদর্শই দ্রৌপদীর ভিতরে রহিয়াছে। এবং ইহাও সত্য, যাহা আমরা চাই, বহুকাল আগে মহর্ষি বেদব্যাস তাহাই আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন।

দ্রৌপদী রাজনীতিবিশারদা, স্বামী-ভক্তিপরায়ণা, যুধিষ্ঠিরপ্রাণা স্বামী, সর্ব্বোপরি কৃষ্ণ-ভক্তিপরায়ণা; এমন নারী আর পুরাণবিদ্‌গণ খুঁজিতে পারেন নাই। স্বাধীনতাপ্রয়াসিনী দ্রৌপদী নিজের মহিমায় নিজে উদ্ভাসিতা,—জ্ঞান, শক্তি, প্রেম এই তিনের সাম্য এক দ্রৌপদীর মধ্যে কবি এমন সুন্দর করিয়া সমাবেশ করিয়াছেন যাহা একান্তই অনির্ব্বচনীয়। জ্ঞানের পথ, শক্তির পথ, প্রেমের পথ একমাত্র দ্রৌপদীই আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন।

দ্রৌপদীর বিষয় বলিতে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার পঞ্চ স্বামীর কথা মনে পড়ে এবং সেইখানেই তাঁহার সকল আদর্শ মুছ হইয়া যায়—তাঁহার উদ্দেশ্য ও জ্ঞানগম্য চিন্তার বাহিরে মানুষ রহিয়া গিয়াছে; নতুবা সীতার চরিত্র হাজার নারীর বাঞ্ছনীয় এবং আর্য্য-নারীগণ প্রায় অনেকেই তাঁর নির্দ্দেশ-পথানুবর্ত্তিনী, অথচ দ্রৌপদীর পথ কেহ অনুসরণ করে নাই কেন, ভাবিবার কথা।

সীতা কোমলা, লজ্জাশীলা, কুণ্ঠিতা, একান্ত স্বামী-আজ্ঞাবর্ত্তিনী—যাহা জগতে সকল নারীপুরুষের আদরণীয়; আর দ্রৌপদী তেজস্বিনী, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারিণী অথচ কোমলা, সাধ্বী, গুরুজনের একান্ত অনুরক্তা, কর্ত্তব্যপরায়ণা। সকল ঐশ্বর্য্যের গৌরব ও নারীত্বের পূর্ণ-আসন এক দ্রৌপদীকেই বেদব্যাস দিয়া গিয়াছেন।

যে দুটি বিরুদ্ধ লক্ষণ দ্রৌপদী-চরিত্রে সুস্পষ্ট তাহা একটি ধর্ম, দ্বিতীয় দর্প; এই দুই অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য একাধারে সমাবেশ হইলে কতদূর প্রকৃত পন্থা অবলম্বন সাধ্যায়ত্ত তাহা দ্রৌপদী বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। দ্রৌপদীর দর্প আত্মপ্রসাদসম্ভূত নহে—আত্মসম্মানেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

দ্রৌপদীকে পঞ্চ স্বামী দেওয়া সত্ত্বেও মহাভারতকার তাঁহাকে কুলটা বলেন নাই বরং বারংবার সতী আখ্যা দিয়া গিয়াছেন কেন? পঞ্চ স্বামী দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? ইহা ঐতিহাসিক না কবি-কল্পনা? এ সকল কথার সম্যক মীমাংসা দুরূহ।

মহাভারত একাধারে ইতিহাস ও উপন্যাস একথা স্বীকার্য্য। প্রক্ষিপ্ত ও বাস্তবের বিচার প্রকৃত কঠিন ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইলেও দ্রৌপদীর মূল চরিত্রে প্রক্ষিপ্ত কিছু আছে ইহা স্বীকার করা যায় না—বোধ হয় এতবড় দুঃসাহস কাহারও নাই। কারণ দ্রৌপদীকে নিয়াই মূল মহাভারত। মহাভারতের দুই একটি স্থানে এমন একটু আভাস পাওয়া যায়—হয় ত দ্রৌপদী এক যুধিষ্ঠিরের পত্নীই ছিলেন, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রমাণও কিছু নাই। কেবল দুই এক স্থানে এ সন্দেহ হইতে পারে। ধনঞ্জয় বলিয়াছেন —"বড় ভাই বিবাহ না করিলে আমার বিবাহ হইতে পারে না সুতরাং দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির বিবাহ করিবেন।" তাহার পর ইহার খণ্ডন-হেতু বহু কথার অবতারণা আছে। কাজেই ইহাই মৌলিক সত্য বলিয়া ধারণা জন্মিবার অন্তরায়ও অনেক। আরো একটু সন্দেহজনক দৃষ্টান্ত মহাভারতে দেখা যায়—অর্জ্জুন ও ভীমের অন্য অন্য পত্নী ছিল আর যুধিষ্ঠিরের ছিল না। নকুল ও সহদেবের কথা অজ্ঞাত, কারণ তাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল না। নকুল-সহদেব অন্য পাণ্ডবদের ছায়া, যেন পঞ্চ-পাণ্ড পুরণের জন্যই ইঁহাদের সৃষ্টি; সুতরাং শুধু এই প্রমাণের প্রতি নির্ভর করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিত্ব উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এবং তাহা হইলে মহাভারতের সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ঐতিহাসিক নারী যাহাই থাকুন তাহা লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—কাব্যের নারী লইয়াই কথা। বিশেষতঃ পঞ্চস্বামিত্বেই দ্রৌপদী এত পরিস্ফুট,—পঞ্চ স্বামী না হইলে দ্রৌপদী এত স্পষ্ট হইতেন

কি না, তাঁহার প্রকৃতির সকল তাৎপর্য্য রক্ষা হইত কি না সন্দেহ। সুতরাং অভিনবত্বই দ্রৌপদী-চরিত্রের বিশেষত্ব।

দ্রৌপদীর কথা বিস্তারিতভাবে বলিতে গেলে একটি একটি করিয়া তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনার উল্লেখ করিতে হয়। প্রথম যখন বেদব্যাস কাব্যরচনা মনন করিলেন তখনই নূতনত্বের ছাঁচে নারী গড়িবার অভিপ্রায় লইয়া লেখনী হাতে লইলেন। এই নূতনত্বের মূলে যে সত্য রহিয়াছে তাহার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া—দ্রৌপদী। সেই ঐতিহাসিক ভিত্তি হইল—যজ্ঞ।

দ্রৌপদীর জন্ম হইল যজ্ঞ হইতে অর্থাৎ তেজ-উপাদান দ্বারা। কিন্তু এজন্য দ্রৌপদীর জন্ম যে মানুষের গর্ভে নহে ইহা প্রতিপাদন করিতে গেলে বস্তুতঃ উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। এখন দেখা যাউক মূল তাৎপর্য্য কি? দ্রৌপদী ধর্ম্মপরায়ণা-হেতু দৈব প্রভাবে প্রভাবান্বিতা ছিলেন; এজন্য জন্মও তাঁহার মানুষী-লীলায় নহে, সেই ইঙ্গিতই এই "যজ্ঞসম্ভূতা যাজ্ঞসেনী"তে মহাভারতকার করিয়াছেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভা মহাভারতের একটি বিশেষ অঙ্গ। দ্রুপদ রাজা কন্যার অলৌকিক প্রতিভায় অভিভূত হইলেন এবং কন্যানুরূপ বরের জন্য অদ্ভুত লক্ষ্য সৃষ্টি করিলেন—যাহাতে জগতের শ্রেষ্ঠ বীর-নির্ব্বাচনের অপূর্ব্ব কৌশল রচিত হইল। দ্রুপদ বিলক্ষণ জানিতেন, পাণ্ডব অবধ্য ও অজেয়,—একমাত্র অর্জ্জুন ছাড়া আর কেহ এই দুর্ব্বেধনীয় লক্ষ্য ভেদ করিতে সক্ষম হইবে না।

এইরূপ লক্ষ্য নির্ম্মাণ করিয়া দ্রুপদ রাজা ঘোষণা করিলেন, "যে এই লক্ষ্য ভেদ করিতে সক্ষম হইবে সে-ই আমার কন্যার যোগ্য পতি হইবে।" নতুবা এই বীর-নারীর উপযুক্ত পতি খুঁজিয়া বাহির করা অর্থাৎ গোপনাচারী পাণ্ডবদের সন্ধান করা সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহা বুঝিয়াই বুদ্ধিমতী কন্যার যোগ্য পিতা দ্রুপদ-রাজের মস্তিষ্কে এমন কৌশল প্রবেশ করিয়াছিল।

ঘোষণাপত্রে আহ্বান পাইয়া লক্ষ লক্ষ রাজগণ দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিলেন। এই স্বয়ম্বরসভার যে বিরাট বর্ণনা মহাভারতে আছে সেসব বর্ণন আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

দ্রৌপদী কাঞ্চন-মালা হাতে লইয়া এই বিরাট সভায় নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করিলেন—ভিক্ষুমাত্র চিত্তাক্ষিপ্তা অথবা বিচলিতা নহেন, অতীব সপ্রতিভ ভাব। একান্ত বিশ্বাস-পরায়ণা—জগতে যে অজের বীর সে-ই এই লক্ষ্য বিঁধিবে। এই স্থানে সীতা সহ দ্রৌপদীর প্রভেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়—জনক-রাজসভায় "রাম বুঝি হরধনু-ভঙ্গে সক্ষম হইলেন না" এই ভয়ে সীতা নিতান্ত অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোমলা সীতাকে সখিগণ অতি কষ্টে সচেতন রাখিয়াছিলেন। পৌরাণিক স্বয়ম্বরসভায় যেরূপ বর্ণনা,—যেরূপ লক্ষ রাজগণ একটি নারীর আশায় প্রলুব্ধ হইয়া উপনীত হইত, প্রত্যেকেই কন্যালাভের জন্য মুহ্যমান করিয়া দাঁড়াইত—সেই অনন্ত-সাগরতুল্য সভামধ্যে কন্যার নিজ বর-নিরূপণ করা ও নারীজনোচিত শক্তিতে নিজেকে স্থির রাখা কম কথা নহে। এগুলি বর্ত্তমানে আমরা ধারণাই করিতে পারি না।

একে একে সমস্ত রাজগণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া হতশক্তি হইলেন। বড় বড় রাজগণের এইরূপ বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত দুরবস্থা দেখিয়া কেহ আর উঠিতে সাহসী হইলেন না। দ্রৌপদী-লাভের ইচ্ছা সকলের অন্তর হইতে দূর হইল। এমন সময় কর্ণ উঠিলেন। কিন্তু কর্ণ সূতপুত্র, সূতপুত্র ক্ষত্রিয়ের কন্যা কিরূপে গ্রহণ করিবে? কর্ণ প্রথমেই বলিলেন—"আমি লক্ষ্য বিঁধিলে লইবে দুর্য্যোধন।" ইহা কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে, মূলে নাই। দ্রৌপদী অবলীলাক্রমে কর্ণকে প্রত্যাখান করিলেন এবং নিঃশঙ্কচিত্তে বলিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" কর্ণের শক্তি দ্রৌপদীর অজ্ঞাত না থাকিবারই কথা, অর্জ্জুনের সমকক্ষ বীর কর্ণ অবশ্য লক্ষ্য-ভেদে সক্ষম হইতেন, সেজন্য পূর্ব্ব হইতেই দ্রৌপদী এ সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। ইহাতে তাঁহার আভিজাত্যের গর্ব্ব ও স্বাধীনতার অপরূপ দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এখানে কর্ণের বীরত্ব, অর্জ্জুনের গৌরব দুইই অক্ষুণ্ণ রহিল। মহাভারতকারের ইহাই যেখান উদ্দেশ্য—কর্ণের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়া নহে।

তারপর রাজকুমার যখন চারি বর্ণের সকল বর্ণকেই লক্ষ্য-ভেদের জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এমন কি চণ্ডাল পর্য্যন্ত যদি লক্ষ্য বিঁধিতে পারে সেও দ্রৌপদীকে

লাভ করিতে পারিবে এইরূপ পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিতে লাগিলেন তখন ব্রাহ্মণমণ্ডলী-মধ্য হইতে অর্জ্জুন দণ্ডায়মান হইলেন এবং ব্রাহ্মণ ও রাজগণের শত বাধা সত্ত্বেও ছদ্মবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। দ্রৌপদী তাঁহাকে চিনিলেন কি না জানি না, মহাভারতকার তাহার আভাষ গোপনেই রাখিয়াছেন। যিনি লক্ষ্য বিঁধিবেন তাঁহাকেই যখন তিনি বরণ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ রাজগণের নিষেধ সত্ত্বেও সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকেই মাল্যদানে প্রবৃত্ত হইলেন—কিছুমাত্র বিচলিতা হইলেন না, একবার হা-হুতাশ করিলেন না, অবলীলাক্রমে সেই ব্রাহ্মণেরই অনুসরণ করিলেন। অবশ্য, অর্জ্জুনের নিষেধে মাল্যদান এখানে হইল না।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল, একক ছিন্নমলিন-বসন অস্ত্রহীন ব্রাহ্মণকে লক্ষ রাজা বেষ্টন করিল, আশ্চর্য্য, তাঁহারই পশ্চাতে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া দ্রৌপদী। মূল মহাভারতে দেখা যায়—দ্রৌপদী একটা কথাও বলেন নাই; কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারতে দ্রৌপদী পিতার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। অর্জ্জুন আশ্বাস দিতেছেন—

"অর্জ্জুন বলেন তুমি রহ মম কাছে।
দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধে দেখহ তুমি পাছে॥
কৃষ্ণা বলে দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বলে শুন গুণবতী।
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি॥"

কৃষ্ণার এরূপ ভীতিপ্রদর্শন দ্রৌপদী-চরিত্রের সহিত অসমঞ্জস হইয়া যায়; বোধ হয় অর্জ্জুনের চরিত্রের বল দেখাইবার জন্য কাশীরাম এরূপ অবতারণা করিয়াছেন। আরো কথা, কাশীরাম দাস সৃষ্টি করিয়াছেন—লোক-রঞ্জনের পক্ষে তাহা মধুর সন্দেহ নাই।

দ্রৌপদী অধীর হইয়া কৌশিনীকে পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন। এখানে দ্রুপদ আর ধৃষ্টদ্যুম্নের একটু মনোমালিন্য হইল। ভগিনীকে কাহার নিকট দিলাম ইহা না জানিয়া ফিরিব না বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গৃহে ফিরিলেন না, দ্রুপদ গৃহে গেলেন।

দ্রৌপদীকে অধীর দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভয় দিবার জন্য বাম হস্ত উত্তোলন করিলেন, পাঞ্চজন্য-শঙ্খে আশ্বাস প্রদান করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ রাজগণকে একা অর্জ্জুন পরাজয় করিতেছেন ইহা দেখিয়া বীরপ্রসবিনী দ্রৌপদীর ভীত হইবার কথা নহে; কিন্তু নারীহৃদয়ের কোমল বৃত্তির সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য কাশীরাম দাসের বর্ণনা প্রশংসনীয় এবং বেশীর ভাগ লোকেরাই কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করে।

যুদ্ধান্তে ভীমার্জ্জুন দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে ভার্গব কর্ম্ম-শালে গমন করিলেন। ভীম গৃহদ্বার হইতে ডাকিয়া মাতাকে বলিয়াছিলেন, "মা, দেখ কি সুন্দর জিনিষ আনিয়াছি।" কুন্তী গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, কিছু বুঝিতে না পারিয়া জবাব দিয়াছিলেন—যাহা আনিয়াছ পাঁচজনে ভাগ করিয়া লও। পরিশেষে যুদ্ধ হইয়া "আমি কি বলিলাম" বলিয়া ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া প্রথম-পুত্রের নিকট দ্রৌপদীকে লইয়া গিয়া সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক, মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না, পাঁচজনেই বিবাহ করিবেন বলিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবার ইহাও একটি প্রধান কারণ বলিয়া মহাভারতকার উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চ স্বামী লোকাচার বিরুদ্ধ ও অবিহিত সুতরাং ইহার সামঞ্জস্য করিবার জন্য দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মের ব্রতভঙ্গ এবং এজন্মের যুধিষ্ঠিরের "মাতৃআজ্ঞা পালন" এরূপ অনেক কিছু নূতনত্বের অবতারণা গ্রন্থকারকে করিতে হইয়াছে। পড়িতে বসিলে এসব উপন্যাসেরই সৃষ্টি মনে হয়, কিন্তু তখনকার সমাজের সত্যাসত্য নির্ণয় করাও দুরূহ ব্যাপার। এ সকল বিষয়ের অর্থ কেহই এখন বুঝিবেন না। মূল কথা দ্রৌপদীর জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল তেমন বিড়ম্বনা স্ত্রীলোকের পক্ষে আর কিছুই নাই, কিন্তু দ্রৌপদীর পক্ষে ইহা—ধর্ম্মাচরণ। পঞ্চ স্বামী গ্রহণ না করিলে তাঁহার ধর্ম্মসাধন হয় না। পঞ্চ স্বামীকে ভালবাসা কোনো সহজ নারীর পক্ষে অতি অসম্ভব; তাই দ্রৌপদীকে দিয়া কবি যে ভালবাসার রীতি দেখাইয়াছেন তাহা মানবীয় নহে। মূলতঃ এই, যাঁহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছে—তাঁহার পক্ষে ইহা কিছুই পাপ নহে।

দ্রৌপদী কৃষ্ণভক্তিতে প্রকট, প্রেম তাঁহার শ্রীকৃষ্ণেই নিঃশেষ হইয়াছিল। পঞ্চ পতি শুধু ভারতকার্য্য

বলিয়া নির্মম পরিহাস করিতেছে। দ্রৌপদীর এইরূপ তীব্র ধিক্কার ও অনুযোগ-শ্রবণে ভীষ্ম-দ্রোণাদি নিঃশব্দে লজ্জায় অধোবদন। সভাস্থ রাজমণ্ডলী দ্রৌপদীর তেজ-দর্শনে মুগ্ধ হইলেন, আর পরস্পর কুরুদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

বস্তুতঃ বস্ত্রহরণ এক অদ্ভুত ব্যাপার। দ্রৌপদীর কৃষ্ণ-ভক্তির একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এই সভাপর্ব্বের বস্ত্রহরণ। যখন দ্রৌপদীর নারীত্বের অবমাননার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি—উলঙ্গ করিবার প্রস্তাব পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক হইল, তখন দ্রৌপদীর আর ধৈর্য্য রহিল না। অবলার ন্যায়ই তাঁহা হইলেন, আপন নারীধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এখানে আর তিনি কৃষ্ণা সিংহী নহেন। কেহ কিছু বলে না। স্বামিগণ নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিয়াছেন। দুঃখে, লজ্জায়, অভিমানে দ্রৌপদীর চক্ষে জলধারা বহিল। এবার দ্রৌপদী সত্যই কাঁদিলেন, কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস-পরায়ণা নারী দ্রৌপদী দুঃশাসনের সহিত বস্ত্র লইয়া কাড়াকাড়ি করিলেন না। আত্মরক্ষা-হেতু এক হাতে বস্ত্র ধরিয়া রাখিলেন, অন্য হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন—এ বিপদে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। কাশীরাম দাস বড় বধূর চক্ষে সে স্তব আবৃত্তি করিয়াছেন—

"ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু,
অখিলের ও বিপদভঞ্জন।
এই এ সভার মাঝ, ইথে নিবারিতে লাজ,
তোমা বিনা নাহি অন্য জন।
যে প্রভু পালিত সৃষ্টি, সংহার করিতে দৃষ্টি,
পুঃ পুনঃ হও অবতার॥
তাঁহার চরণ ছায়া, ধরিয়া সঁপিনু কায়া,
অনাথার কর প্রতিকার।
বিষধরী ধরক্রোধে, কুলজ ধরতীর পদে,
যেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।
তাঁহার চরণযুগে, দ্রৌপদী শরণ মাগে,
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে॥
ধরিয়ার উজ্জ্বল চক্র, কাটিয়া মস্তক নক্র,
নিস্তার করিল গজরাজ।
বল করে দুরাশয়ে, শরণ নিলাম তবে,
তাঁহার চরণপদ্ম যাব।…"

মহাভারতের এই স্থান পড়িলে ভক্তির এতবড় প্রবাহিত উৎসে এখনও পাষণ্ডেরও অন্তর দ্রব হইয়া যায়।

ভক্তিমতী দ্রৌপদীর এত কাতরতা ব্যর্থ হইল না। শ্রীকৃষ্ণের আসন টলিল, "ভক্তের ভগবান্" দেখা দিলেন। দ্রৌপদী যখন একান্তে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন তখন অলক্ষিতে বস্ত্র দিয়াই হউক অথবা যে প্রকারেই হউক অর্থাৎ নিকটে আসিয়া বাধা দিয়াই হউক (মানবীর ভগবানের তাহা অস্বাভাবিক নহে, অথচ ভারতকার অলক্ষিতে বস্ত্র যোগাইবার কথাই বলিয়াছেন) ভগবান্ তাঁহার লজ্জা রক্ষা করিলেন—দুঃশাসনের সকল গর্ব্ব ও শ্রম ব্যর্থ হইল।

দ্রৌপদী দুঃশাসনের রক্তে কেশ বাঁধিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হইলেন না। মুক্তকণ্ঠে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—ভবিষ্যতে কার্য্যতঃ তাহা করিয়াও ছিলেন। যতদিন দুঃশাসন জীবিত ছিল দ্রৌপদী কেশ বাঁধেন নাই। আপন অপমানের প্রতিশোধ লইবার এমন সৎসাহস ধরিত্রী ভারতনারীর ভিতর বর্ত্তমানে একজনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি?

দ্রৌপদীর প্রতি এত বড় পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছিল যে সমস্ত দেব সভায় লজ্জায় ক্রোধে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, নানারূপ দৈব অমঙ্গলের সূচনাজনিত বেগে নানা প্রকার বিপদের আশঙ্কা পরিলক্ষিত হইতেছিল—সুহৃদ্‌গণ অন্ধরাজকে গিয়া তাহা জানাইল। বৃদ্ধ নরপতি তখন আপন রাজ্যের মঙ্গলচিন্তায় অধীর হইলেন; পাণ্ডব-গণের ভয়ে ভীত হইলেন না এমন নহে,—প্রকৃত অবস্থা যে কত বৃহৎ হইয়াছে তাহাও বিলক্ষণ অনুধাবন করিলেন। তাই দ্রৌপদীকে ডাকিয়া আনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার সৎসাহস ও গুণে মুগ্ধ হইয়া বর-প্রদানে প্রস্তুত হইলেন।

এখানে দ্রৌপদী আর ধর্ষিতা রাজমহিষী নহেন। জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের নিকট আসিবামাত্র তিনি ধর্ম্মানুরাগিণী, গুরুজনের একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, অন্তঃপুরবাসিনী কুলবধূ।

মহাভারতে এসময় শ্বশুর ও বধূর বাক্যালাপ এতই

ক্ষত্রিয়প্রাণী যে সহস্রবার পতিলেও এ স্থানে অতৃপ্তি জন্মে না। হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, "হে ভদ্রস্বভাবে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাষিত বর প্রার্থনা কর; তুমি আমার সমুদয় বধূগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রটি যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় 'দাস' না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়। কেন না প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ সুপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রত্ব হওয়া নিতান্ত অবিধেয়।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুযায়ী এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদানে ইচ্ছা করি, তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই,—তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমস্ত বধূগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভগবান্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু; অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্তা নহি, যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়-পত্নীর দুই বর; রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।"

দ্রৌপদী কত বড় ধর্ম্মপরায়ণা, আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্না নারী। এখানে তিনি মুক্ত অন্ধরাজার নিকট হইতে যাহা ইচ্ছা বর গ্রহণ করিতে পারিতেন। লোভ সকল অনর্থের হেতু, সেজন্য তিনি তৃতীয় বর গ্রহণ করিলেন না। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্বের সমাবেশই দ্রৌপদী-চরিত্রের রমণীয় উপাদান।

পুনশ্চ পাশা-ক্রীড়া করিয়া দুর্য্যোধন যখন পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইলেন—দ্রৌপদী কিছুমাত্র বিরুক্তি করেন নাই, জ্যেষ্ঠ শ্বশুরকে গিয়া অনুরোধ করেন নাই; স্বামিগণের সঙ্গে সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়া বনগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কুন্তী দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। দ্রৌপদী শাশুড়ীর নিতান্ত প্রিয়পাত্রী বধূ, এক্ষণে শাশুড়ীকে অধীর দেখিয়া দুঃখে অভিভূত হইলেন। এখানে শাশুড়ীর বধূপ্রীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুন্তী দেখিলেন বধূ বনগমনে অটল, তখন তাঁহাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানারূপ সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বনগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। গুরুজনে ভক্তিমতী দ্রৌপদী শাশুড়ীর অনুমতি ব্যতিরেকে অগ্রসর হয়েন নাই। কুন্তীর উপদেশের মধ্যে প্রধান একটি যে—"আমার পুত্রদিগের ভিতর সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব, তাহাকে অধিক স্নেহে দেখিবে।" দ্রৌপদী শাশুড়ীর এই স্নেহের পক্ষপাতিত্ব সাদরে গ্রহণ করিলেন। এখানে তিনি শ্বশুর নিকট কোমলা, সরলা কুলবধূ ও মমতাময়ী নারী।

মহাভারতকার দ্রৌপদীর বনগমনের যে চিত্র ও তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বড় চিত্তাকর্ষক। মুক্তকেশা, পরিধানে শোণিতার্দ্র বসন, দুই হস্তে মুখাবরব আচ্ছাদন করিয়া যাইতেছেন—অঙ্গুলিছিদ্র-পথে অশ্রুরাশি সহস্রধারায় পড়িতেছে; ইহাতে যেন ইহাই সূচিত হইতেছে—"আমার এই দশা যাহারা করিয়াছে, তাহাদের স্ত্রীরাও যেন পতিপুত্র-বন্ধুবান্ধব-নাশে এই বেশ ধারণপূর্ব্বক হস্তিনায় প্রবেশ করে।"

দ্রৌপদীর প্রতিভা-বিকাশে যেমন নূতনত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তেমনি তাঁহার গর্ব্বোদীপ্ত মনোহর নারীচরিত্র-মাধুরীর পুণ্যপ্রভায় ভারতগ্রন্থ সমুজ্জ্বল রহিয়াছে।

স্বামীদিগের অতিথি-সম্বর্দ্ধনা যাহাতে বনমধ্যেও সুসম্পন্ন হয়, সেই মানসে সূর্য্যদেবের নিকট হইতে পাকপাত্র গ্রহণ করা একটি অলৌকিক শক্তি ও দৃঢ়তার নিদর্শন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য।

কাম্যকবনে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন ছল করিয়া দুর্ব্বাসাকে প্রেরণ করে। দ্রৌপদীর আহার হইলে, পরে আর তাঁহার অতিথি-সম্বর্দ্ধনার উপায় থাকিবে না। অর্দ্ধরাত্রে দুর্য্যোধন-

প্রেরিত সশিষ্য দুর্ব্বাসা আসিয়া নিষিদ্ধ বনমধ্যে পাণ্ডব-দিগকে বিপন্ন করেন। নিরুপায় যুধিষ্ঠির গিয়া দ্রৌপদীর শরণাপন্ন হয়েন। যুধিষ্ঠির জানিতেন, উপস্থিত বিপদমুক্তির সহায় দ্রৌপদীই। কার্য্যতঃ এ বিপদ হইতে কৃষ্ণ-সহায়ে দ্রৌপদীই উদ্ধার সাধন করেন। এক কথায়, পঞ্চপাণ্ডবের সখী, মন্ত্রী, সহধর্ম্মিণী ও বীরগণের প্রকৃত বীরেন্দ্রাণী ছিলেন দ্রৌপদী।

যখন এই কামাকবন-মধ্যে একাকিনী রূপদ-সুতাকে হরণ-মানসে দুষ্ট জয়দ্রথ গিয়াছিল—দ্রৌপদী দেখিবামাত্র তাহাকে শত্রু বলিয়া কিছুমাত্র উপেক্ষা করেন নাই অধিকন্তু অতিথি-হেতু বিস্তর সৌজন্য প্রকাশ করিয়া-ছিলেন; 'মনমাই' হিসাবে মামুলী ঠাট্টা-তামাসাও একটু করিয়াছিলেন—কিন্তু যখন তাহার মন্দ অভিপ্রায় বুঝিলেন, বৃদ্ধা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, অসহায়া ও ভীতা নারীর ন্যায় ক্রন্দন না করিয়া বারংবার স্বামীদিগের গুণ কীর্ত্তন করিয়া তীব্র ভৎর্সনায় মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। পাপিষ্ঠ জয়দ্রথ তাহাতেও নিবৃত্ত হয় না দেখিয়া পুনরায় মিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া স্বামীদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতেও ফল হইল না, দুই বলপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইল—দ্রৌপদীর অঙ্গ আকর্ষণ করিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ভীমার্জ্জুনের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী বীরনারী দ্রৌপদী নিজ বাহুবলে পাপিষ্ঠকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। মহাবীর সিন্ধুরাজ দ্রৌপদীর বাহুবলের নিকট পরাস্ত হইলেন। এস্থান পাঠ করিলে বীরনারীর অদ্ভুত কীর্ত্তি-স্মরণে হৃদয় পুলকসাগরে নিমগ্ন হয়।

দ্বিতীয়বার বলপ্রয়োগে জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে রথারোহণে বাধ্য করেন তখনও দ্রৌপদী যে ধৈর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বারংবার প্রণিধান-যোগ্য। এবার আর তিনি বৃথা বাক্যব্যয় করিলেন না, স্বামীদের বিনষ্ট-হেতু উদ্বেগে ভৎর্সনা বা অবথা চীৎকার কি ক্রন্দন করিলেন না। পুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক আপনিই রথে উঠিয়া বসিলেন—দাসী বায়েত্রিকাকে স্বামিগণের নিকট সংবাদ দিতে বলিয়া-দিলেন। দূরে পাণ্ডবদের দর্শনে জয়দ্রথ যখন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল—গর্ব্বিতবচনে নিজ স্বামীদের গুণরাশি উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন, কিছুমাত্র ভীতা অথবা কুণ্ঠিতা না হইয়া। অন্যত্রথের পরিণাম যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই—প্রত্যেক পাঠক-মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ভারত-সমর-হেতু যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত যে প্রেরণা ও উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন তাহা জগৎবিখ্যাত গীতা নামে অভিহিত। দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ-হেতু দেবার উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাও অবহেলার কথা নহে।

সরস্বতী নদীতীরে বৃহৎ শালবনে অবস্থানকালীন সন্ধ্যার নির্জ্জন অবকাশে যুধিষ্ঠিরের পাশে বসিয়া প্রায়ই দ্রৌপদী কৌরবদিগের অবিচারের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে প্রয়াসী হইতেন। সকল দিনের সকল কথা উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে, এক এক দিনের এক একটি কথা—শ্লোকের অনুবাদ—যাহা মনোরম বলিয়া বোধ হইল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"আপনি লোকমান্য ব্যক্তি, স্ত্রীলোকের উপদেশ আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে বিশেষ অশোভনীয়। আপনার বংশের প্রত্যেকটি রাজা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম দেখাইয়া চিরদিন রাজ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা হেলায় হারাইলেন।"

"যে রাজা শঠের প্রতি শাঠ্যাচরণ না করেন তাঁহার ধ্বংসে অবশ্যম্ভাবী। আপনি ছাড়া কোন্ রাজা নিজের স্ত্রীকে অন্যের দ্বারা অপমানিতা করিতে পারে? আপনি যে-পথ গ্রহণ করিয়া দুর্গতি পাইয়াছেন সম্মানিত মানুষ মাত্রেই তাহার নিন্দা করেন; কিন্তু আপনার যে কেন এখন পর্য্যন্ত রাগ হইতেছে না ইহাই আশ্চর্য্য।"

অর্জ্জুন ও ভীমের শক্তি কত বৃহৎ এবং একমাত্র যুধিষ্ঠিরের ক্ষমার জন্যই তাঁহাদের এত ক্লেশ সে কথা দ্রৌপদী পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া রাজার অন্তরে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন :—

"মহারাজ, আপনার তেজ-প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে।—ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কি ক্ষমার পাত্র?"

"সদা ক্ষমী না হইবে সদা তেজবন্ত।
সদা ক্ষমা করে তার দুঃখে নাহি অন্ত॥
শত্রুর অন্যায় কার্য্য মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া নারীবাক্য নাহি শুনে॥"

"হে নাথ! যাঁহারা মোহ উৎপাদন করিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্মে আপনার বুদ্ধির ভ্রম জন্মাইতেছেন, সেই ধাতা-বিধাতা উভয়কেই আমার নমস্কার! কর্ম্ম দ্বারাই উত্তম, অধম লোক প্রাপ্তি হয়। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, লোকাপবাদ, ভীরুতা অবলম্বনে কখনও উন্নতি হইতে পারে না। স্বামিন্! আমি জানি আপনার রাজ্য ও জীবন কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত। আপনি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এবং আমাকেও ত্যাগ করিবেন, তথাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। আর আমি শুনিয়াছি যে রাজা ধর্ম্ম রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন —কিন্তু ধর্ম্ম তো আপনাকে রক্ষা করিতেছেন না। এই বন্যসমাকীর্ণ বনেও আপনার যাগযজ্ঞ নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমস্তই চলিতেছে—তবে দ্যূত-ব্যসনজনিত বিপরীত বুদ্ধি কিরূপে আসিয়াছিল?"

"আপনি বীরগণের অগ্রগণ্য, কীর্ত্তিই আপনার একমাত্র ধন। আপনার মত লোক যদি এইরূপ অসহ্য অপমান প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বোদ্রেকই আশ্রয় করে, তাহা হইলে তেজস্বিতা উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবে বিলুপ্ত হইবে।"

"শত্রুগণ আপনার অবমাননা করিতেছে। আপনি প্রকৃত শক্তিসম্পন্ন। অতএব সন্ধির শাসন আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ বিজয়প্রার্থী নৃপতিগণ শত্রুর প্রতি মিথ্যা সন্ধিভঙ্গের আরোপও করিয়া থাকেন।"

"যেহেতু আপনার এই দুর্দ্দশা শত্রুকৃত, তজ্জন্য ইহা আমার মনকে যেন সমূলেই উৎপাটিত করিতেছে। আত্মাভিমানী বীরদিগের, যাহাদের প্রকৃত বীরত্ব শত্রুগণ-কর্ত্তৃক বিদলিত হয় নাই, তাহাদিগের পরাজয়ও উৎসব-স্বরূপ বটে।"

"রাজন্! উঠুন, যুদ্ধ করুন, লক্ষ্মীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করুন, আপনার ন্যায় বীর এবং সদ্বংশসম্পন্ন ব্যক্তির এইরূপ অশোভনীয় কার্য্য বড়ই নিন্দনীয়।"

ইহাই দ্রৌপদীর বাক্যসমূহের সারাংশ। আর কোন আর্য্যনারী স্বামীকে এইরূপ দর্পের সহিত উপদেশ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া জানি না।

বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাসকালীন দ্রৌপদী যখন সৈরিন্ধ্রীর বেশে অবস্থান করিতেছিলেন তখন নিজ সম্মানরক্ষা-হেতু অনেক কিছুই করিয়াছেন।

"না লব উচ্ছিষ্ট আর না ছোঁব চরণ।
পুরুষের ঠাঁই না পাঠাবে কদাচন॥"

এই দুটি কথার ভিতর কতখানি তেজ ও গর্ব্বের সন্নিবেশ আছে তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। সৈরিন্ধ্রীর কর্ত্তব্যকার্য্যে রতা, রাণীর প্রিয়পাত্রী দ্রৌপদীকে যখন কীচক অপমান করিয়া বসিল, বিস্তাড়িত অবস্থায় রাজসভায় লইয়া গিয়া লাথি মারিল—তখন অপমানিতা দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে স্বামিগণকে অনুযোগ করিয়া রাজাকে উত্তপ্ত বাক্যে নিজ অপমান নিবারণ করিতে বলিলেন। কিন্তু কীচক হইতেই বিরাট রাজার সকল সম্পদ, সুতরাং রাজা সৈরিন্ধ্রীর জন্য তাহাকে বিশেষ কিছু বলিতে সক্ষম হইলেন না। দ্রৌপদী ইহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন।

নিজের নারীধর্ম্মের অপমানের জ্বালায় জর্জ্জরিতা দৃপ্তা দ্রৌপদী এই অন্যায়ের প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং রন্ধনশালায় যাইয়া ভীমকে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে অনুরোধ করিলেন। ভীমের হস্তে দুরন্ত কীচক নির্ম্মমভাবে হত হইল।

অশ্বত্থামা নিষ্ঠুর অন্যায় করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে নিধন করিল। দুঃখ জীবনে দ্রৌপদী যত পাইয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়, কিন্তু এততেও ক্ষত্র-নারীর দৃপ্ত তেজ হইতে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইতে দেখা যায় নাই। অশ্বত্থামা অন্যায় করিয়া বাঁচিয়া যাইতে পারেন নাই। অমর অশ্বত্থামার মৃত্যু হইল না বটে কিন্তু পাপের শাস্তি যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল—দ্রৌপদী নিজ অন্যের স্বামীদিগকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার মস্তকমণি ছেদন করিয়া তবে ছাড়িয়াছিলেন। অশ্বত্থামা বাঁচিয়া থাকিয়াও চিরজীবন দারুণ যাতনা পাইয়াছেন—মহাভারতকার একথা বলিয়া গিয়াছেন। পাপীর-শাস্তি হেতু কৃষ্ণা জগতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

ফুল ও প্রদীপ

শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ সান্যাল

আজি পূর্ণিমার রাত্রি—শুভ্র চারিধার ;
কর্ণে আসি পশে কার ব্যর্থ হাহাকার—
তারায় তারায় তার ব্যথা যেন বাজে !
দুটি আঁখি চেয়ে আছে অশ্রুধারা-মাঝে—
মনে হয় বুঝি কোন্ স্বপ্নলোক হ'তে
কে যেন ভাসায়ে দেছে জ্যোৎস্না-জলস্রোতে
অস্ফুট কমল-কলি কি যে নীলাম্বরে !
গন্ধ তার কর হানে রুদ্ধ বক্ষ 'পরে,
বর্ণ তার সুকোমল !···বসিয়া একেলা
হৃদয় ভাসায়ে দিয়া একি তব খেলা ?
তুমি কি জাননা হায় কোন্ নিরুদ্দেশে
নিঠুর তরঙ্গ-ঘায় যাবে ভেসে ভেসে
অবশেষে জগতের অশ্রুজল
দেখায় নিয়েছে আসি' স্নিগ্ধ অচঞ্চল !

আমিও জ্বালাই দীপ তোমার উদ্দেশে।
আনি রাখিবে না তারে তব দ্বারদেশে
পথিক জনের লাগি' ;—পশ্চিমের বায়ু
অকস্মাৎ অর্দ্ধপথে হরি' লবে আয়ু।
নিশার প্রভাতে তপ্ত রৌদ্রস্পর্শ লেগে
আসনে বসিয়া তুমি নিদ্রা হ'তে জেগে
বাতায়ন-পথ দিয়ে চাহিবে যখন,
নিশি-জাগরণশ্রান্ত এ দুটি নয়ন
দৃষ্টিতে ছুঁইয়া যেয়ো নিমেষের তরে।
আঁখি মোর সিক্ত হবে শিশির-নির্ঝরে !

কৃষ্ণদাস

শ্রী আশীষ গুপ্ত

রাজার মেয়ে দোল খেলিবেন,—সোনার পিচ্‌কারী চাই।···

কৃষ্ণদাস স্বর্ণকার,—সোনা তৈরী করে না, গহনা গড়ায়। পরের সোনা, পরের গহনা,—মধ্যে দিনকয়েক সোনার তালটা নাড়িয়া চাড়িয়া যা বৃত্তি,—লক্ষ লক্ষ টাকাওয়ালা ব্যাঙ্কের একশ' টাকা মাহিনার কোষাধ্যক্ষ, পঞ্চম তারিখের তিরিশ টাকা মাহিনার মনি-অর্ডারের কেরাণী।

রাজার মেয়ের সোনার পিচ্‌কারী,—উপরে থাকিবে নক্সা—রাজকুমারী কুসুম ছুঁড়িতেছেন—কিছু লাগে আকাশের গায়ে, কিছু পড়ে নদীর জলে, কিছু ছড়ায় নদীতীরের কৃষ্ণচূড়া গাছটির ছোট ছোট পাতায়,—ঝিক্‌মিক্ করে,—রাজার মেয়ে তীরে দাঁড়াইয়া হাততালি দিয়া হাসেন। কাজ করিতে হইবে নিখুঁত, কুসুম গড়িতে হইবে মিনা'র,—কারিগরের কেরামতি চাই,—রাজকুমারী দোল খেলিবেন, পারিশ্রমিক মিলিবে ভালো।

কৃষ্ণদাসের বয়স তখন কম ছিল,—রাস্তার ধারে লোহার শিকের আড়ালে সোনারূপার গহনার মাঝখানে যে লোকগুলা বসিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি কৃষ্ণদাসের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। কত সোনা, কত গহনা উহাদের,—কোন ভাবনা নাই,—বাড়ীর ঘটিবাটিগুলাও যখন খুসী

সোনা দিয়া বানাইতে পারে। সম্মুখে টাকাগুলা ঢালিয়া রাখিয়াছে, দশ টাকার নোট্ ভাঙাইতে গেলে একটা পয়সা বাটা চাহিবে। অত টাকা যাহার, তাহার একটা পয়সা নিলেই বা কি, না নিলেই বা কি! কৃষ্ণদাস শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, পৃথিবীতে যদি কোন কাজ করিতে হয় তবে ডাক্তার,—যদি কেহ প্রকৃত সুখী থাকে তবে সে-ই।

কৃষ্ণদাস ডাক্তার দোকানে ভর্ত্তি হইল। ব্রাহ্মণের ছেলে,—অনেক কিছুই করিতে পারিত, কিছু না হইলেও পৌরোহিত্য অথবা রাঁধুনীর কাজ করা কেহ ঠেকাইত না। পৌরোহিত্যে মন্ত্রের প্রয়োজন নাই, রাঁধুনীগিরিতে দ্রৌপদী হওয়ার আবশ্যক নাই। প্রথমটার দরকার হয় নিজেদের মনকে অলীক সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, এবং দ্বিতীয়টা স্বাস্থ্য ও রসনাকে পীড়িত মুক্ত করিয়া তুলিবার পক্ষে অপরিহার্য্য। ইহলোকের দেহ এবং পরলোকের আত্মা, দুইই ভাবিবার বিষয়,—কিন্তু তাহাদের বর্ত্ত সম্বন্ধে হিন্দুর ঔদাসীন্যও অপরিমিত। দুইটার ভারই চারণাহি স্মৃতার উপর অর্পিত আছে, আর কোনও প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন নাই,—ফলে ইহকালের ফলও ভালো হইতেছে না, পরকালের ব্যাপারও বোধ হয় লোভনীয় নহে। তবে, শেষেরটার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাববশতঃ জোর করিয়া কিছু না বলাই ভালো, নহিলে হয় ত অপর পক্ষের খোঁচা খাইতে হইবে।

কৃষ্ণদাসের গলায় সুতা-কয়গাছা তাহার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় প্রদান করে, এবং যথার্থই সে ব্রাহ্মণ, অন্য কিছু নয়।—লেখাপড়া এণ্ট্রান্স্ ক্লাস অবধি হইয়াছিল,—কিন্তু ঝোঁক ছিল ডাক্তারিগিরির উপরে,—আসিয়া গেল শিক্ষানবীশিতে,—নহিলে, ইহা তাহার পৈতৃক ব্যবসা নহে যে, উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে।

শিক্ষানবীশি করিয়া কাজ শেখা, সোজা উত্তরদিকে ঘোড়াইয়া দক্ষিণদিকে পৌঁছানর মত, অর্থাৎ একরকম, অসম্ভব। শিক্ষানবীশির সহিত বামাচরণ দাসের তামাক সাজিতে হইত, বাজার করিতে হইত, হাপর চালাইতে হইত, ছেলে ধরিতে হইত, বড় ছেলেটাকে নামতা পড়াইতে হইত,—তবে শিক্ষানবীশি হইয়া উঠিল দুষ্কাকার, সোজা উত্তর দিকে রওনা হইয়া পাক্ দিতে দিতে গিয়া একদিন দক্ষিণে পৌঁছাইবার আশা তখন হইল,—কিন্তু, সময় লাগিবে। তবুও সিধা দক্ষিণে যাত্রা করিবার জো রহিল না, উত্তর দিক দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতেই যাইতে হইবে। সোজা-কথায় বামাচরণ তাহাকে কাজের কাজ কিছু শিখাইতে চাহিত না, কোন কিছু জানিতে চাহিলে তাহাকে দোকান ঝাড়িতে, ঘর ঝাঁট দিতে এবং বকুনা খাইতে বলিত। তবুও কিন্তু কৃষ্ণদাস শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারই হইল।

লোহার শিকের আড়ালে ছেলের বন্দীর মত বসিয়া থাকিতে প্রথম প্রথম বড় ভালো লাগিত। সম্মুখে টাকা, বাঁ পাশে নিক্তি, ডান দিকে গহনার সিন্দুক, কোমরে সিন্দুকের চাবি, সামনের দিকে সো-কেসে গহনা, কিছু দূরে মাজ্—ওদিকে নেহাই, এদিকে বাঁতা।

রাস্তার দিকে চাহিয়া কৃষ্ণদাসের মনে হইত, তাহার মত সুখী কে? স্বর্গ আজ করতলগত হইয়াছে, এবং বেশী সিঁড়ি ভাঙিতে হয় নাই।—যেটুকু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহার সহিত এ আনন্দের তুলনা করিতে গিয়া কৃষ্ণদাসের নিক্তিতে লাভের দিকটাই ঝুঁকিয়া পড়িল। বামাচরণের ভাঙা হুঁকা, বাজারের থলে, শ্লেষ্মা ও খোস-বিজড়িত শিশু, রসনাসর্ব্বস্ব গৃহিণীর প্রতিসুখকর বাক্যাবলী, সব তাহার কাছে এই স্বর্গের সিঁড়ি, এবং অত্যন্ত সহজ, নীচু, ভালো এবং কয়েকখোক সিঁড়ি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভাবিল, বামাচরণের সঙ্গেই উপকার করা হয় নাই, একদিন গিয়া তাহার কুৎসিৎ-দর্শন ছেলেটাকে সমস্তক্ষণ কোলে-কাঁখে করিয়া আদর করিয়া আসিবে,—নিজের খরচে একদিন বামাচরণের বাজার করিয়া দিয়া আসিতে হইবে,—বামাচরণকে একদিন স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে।

—কিছুদিন কাটিয়া গেল,—সম্মুখের টাকাগুলা পরের, বাটার পয়সা কয়টাই বা নিজের থাকে—তাই বা কয়টা? দশ টাকায় এক পয়সা। একটা টাকা করিতে হইলে,

চ'শ চল্লিশ টাকার ভাঙানি দিতে হয়। সিন্দুকের ভিতরকার গহনার মালিক অন্য লোক,—পরের কাছ থেকে কেনা সোনা, পরকে গহনা করিয়া ফিরাইয়া দিতে হয়। যাতে সোনা কেনে, গহনা বানাইয়া দিয়া টাকা লইয়া সোনার দাম শোধ করে;—ফিরাইয়া দিবার পূর্ব্বে নোটের বদলে টাকা দিয়া কয়েক পয়সা বাটা পায়,—ইহাই ত ব্যাপার। সোনা আসে গিনির আকারে, ছোকা লাঠির চেহারায়, ফিরিয়া যায় গহনা হইয়া;—পারাপারের মাঝখানে থাকে কৃষ্ণদাস সেতুর মত, পারানীর পয়সা-কয়টা গণাধঃকরণ করিয়া চোঁক গেলে।

কৃষ্ণদাস অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল,—নীলাকাশের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যখেই নাগনাচি করিবার পরে যেন ঠের পাওয়া গেল, ওগুলা ধূলিকণার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়! কৃষ্ণদাস যথেই কুণ্ঠ হইল,—কিন্তু রাগটা যে কাহার উপরে তাহা ঠিক বুঝিল না।

—দিন যায়,—কোন রকমে মাথায় মাথায় সংসার চলে। ফেলিয়া, ছড়াইয়া খাইবার মতন হালচাল নয়। কৃষ্ণদাসের মনে হয়, এ রকম হওয়া উচিত হয় নাই।—সে স্বর্ণকার, সোনাখানাতে ঘর তাহার ভর্ত্তি থাকিবে,—গিন্নি বাজিবে টুন্ টুন্, শব্দ হইবে মিষ্টি মিষ্টি,—ছেলেরা সোনার দোয়াত-কলমে লিখিবে, গৃহিণী সোনার কলসীতে জল তুলিবেন, সোনার থালায় ভাত বাড়িবেন, পা হইতে মাথা অবধি সোনা দিয়া মুড়িয়া বসিয়া সোনা-বাঁধান দাঁতে ফিক্ ফিক্ হাসিবেন,—কৃষ্ণদাস বসিয়া বসিয়া সোনার গড়্গড়ায় তামাক খাইতে খাইতে, সোনার চশমা চোখে, সোনার ঘড়ি হাতে, দশ আঙুলে সোনার আংটি লাগাইয়া, সোনার খাটে বসিয়া খক্ খক্ কাসিবে!—তাহার পরিবর্ত্তে এ কি! বাজার রে, হাট রে, অভাব রে, অনাটন রে,—কৃষ্ণদাস বুঝিল, কোথায় যেন ভুল হইয়া গিয়াছে।—স্বর্ণকার হইয়া যদি তাহার এ-ই লাভ হইল, তবে অন্যান্য কাজ, হয় ত পৌরোহিত্য, হয় ত রাঁধুনীগিরি, কিংবা আফিসের চাকরী, নতুবা অন্য ব্যবসায় কি অপরাধ করিয়াছিল।

ছেলেমেয়েগুলা হইয়াছে কৃষ্ণদাসের সর্ব্বস্ব,—তাহাদের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য সে পৃথিবী ওলট্-পালট্ করিতে পারে, অন্ততঃ কৃষ্ণদাস তাহা করিতে চায়,—কিন্তু সে চাহিলেই পৃথিবী ওলট্-পালট্ হয় না,—শক্ত পৃথিবী, যেখানকার জিনিষ সেখানেই থাকে,—মাঝখান হইতে কৃষ্ণদাসের ছেলেমেয়েগুলো চীৎকার করে, ক্রন্দন করে,—এবং কৃষ্ণদাস অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বারে কথা বলে, "দেব, দেব,—সব এনে দেব, কিছু ভাবিস্‌নে, আজ না হয় কাল,—দেবই এনে, কি চাই বল্—"

স্ত্রী জয়ন্তীকে কৃষ্ণদাস বলে, "আমি তোমার অযোগ্য স্বামী জয়ন্তী, কিছুই করতে পারিনে তোমাদের জন্যে—" জয়ন্তী বলে, "আমাদের দুঃখ, এ আর কতদিন?—তোমার দোকানটা আর একটু ভাল হ'ক, কিছুদিন যাক্, তখন সব ঠিক হবে,—ক'টা দিন বৈ ত নয়—"

এক ভদ্রলোক বালা গড়িতে দিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস যত্ন করিয়া কাজ করিল,—সুন্দর শিল্পচাতুর্য্য,—ভদ্রলোক খুসী হইয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস বালার সোনা হইতে একভরি সোনা এবং মজুরীর টাকা লইয়া মুচ্‌কি হাসিয়া বাড়ী ফিরিল,—ভদ্রলোক একভরি সোনার পরিবর্ত্তে একভরি খাদ লইয়া গেলেন।

কৃষ্ণদাসের জীবনে এ কাজ এই প্রথম,—এ মতলব কোনদিন ছিল না,—তাহার সমস্ত অতীত জীবনের আচরণ এরূপ কার্য্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। দোকানে ঢুকিয়াই সম্মুখের দেয়ালে চোখ পড়ে। দুইটি লেখা বাঁধাইয়া দেয়ালের গায়ে টাঙাইয়া রাখা হইয়াছে,—"সততাই কার্য্যসিদ্ধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়,"—"সততাই আমাদের ব্যবসায়ের মূলধন।" এই দুইটা কথার কথা নয়, ব্যবসাদারি ফিকির নয়,—বাস্তবিকই ইহা কৃষ্ণদাসের অন্তরের কথা ছিল,—কিন্তু কৃষ্ণদাসের মনে হয়, তাহার কার্য্যপদ্ধতিতে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে,—ছেলেমেয়েগুলাকে তাহাদের প্রার্থিত দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া যাইতেছে না।

কৃষ্ণদাস সোনার পরিবর্ত্তে খাদের কারবার সুরু করিল। —সোনার গেলাসে জল খাইয়া একদিন দেখিতে হইবে, সোনার থালায় একদিন ভাত বাড়িয়া খাইতে হইবে। আগের চাইতে টাকা আসে বেশী, কিন্তু সেই অনুপাতে খরচও বাড়িয়াছে,—নিয়া-দিয়া শেষ পর্য্যন্ত আবার আগে-

কার অবস্থাই দাঁড়াইয়া যায়। কৃষ্ণদাস ভাবে, এ রকম করিলে চলিবে না, খরচ কমাইতে হইবে,—অনেক কষ্টের পয়সা, একটা অপব্যয় হইতে দিলে বড় গায়ে লাগিবে।

সোনার গেলাসে জল খাইতে হইলে কত টাকা আবশ্যক হইবে তাহা কৃষ্ণদাস হিসাব করিয়া দেখিল, সোনার থালা গড়িতে হইলে ক'ভরি সোনা লাগিবে কৃষ্ণদাস তাহাও স্থির করিয়া ফেলিল। রাজারাজড়ারা বোধ হয় সোনার খাট-পালঙ্কে শোয়,—কৃষ্ণদাস মতলব করিল, সেও একবার একটা সোনার খাট বানাইয়া দেখিবে রাজাদের মত হওয়া যায় কি না। সমস্ত খাটটা যদি সোনা দিয়া না বানাইতে পারে, তাহা হইলে শুধু পায়া-কাঁটাই না হয় তৈরী করিয়া দেখিবে।

কৃষ্ণদাস দিবারাত্র সোনার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। স্ত্রী জয়ন্তীর সহিত কৃষ্ণদাসের বিচ্ছেদ ঘটিল এইখানে। তাহার ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজের প্রারম্ভে জয়ন্তীর উৎসাহ এবং পরামর্শ তাহাকে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল, এবং ব্যবসায়ে কৃষ্ণদাসের উন্নতি দেখিয়া জয়ন্তীর খুসীর অবধি ছিল না,—সেই পুলকের সহিত আত্মপ্রসাদ মিশিয়া জয়ন্তীকে বাতাসের অপেক্ষা লঘু করিয়া তুলিয়াছিল,—কিন্তু বিষাদ ঘটিল কৃষ্ণদাসের মনে। স্বামীর মনের স্বর্ণ-সিন্ধুকের সংবাদ জয়ন্তীর অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

স্বামীর ভালবাসা যেদিন পাইয়াছিল, সেদিন আনন্দ ছিল বেশী,—সেই উল্লাসেই মনটা ভরা ছিল,—প্রতিদিনকার খুঁটিনাটির হিসাব নিকাশের কথা মনেও ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণদাসের মনের জোয়ারে সোনার ভাটায় টান দিয়াছিল।—জয়ন্তী একদিন দেখিল, অত্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে জলের পরিবর্তে শুকনা বালিতে পা বসিয়া গেল,—নদীর জল আর দুকূল ভাসায় না, তীর ছাড়িয়া মাঝপথে সরিয়া গেছে। জয়ন্তী চোখের জল মুছিল,—ছেলেমেয়েগুলা ভীত হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণদাস দোকানের দেয়ালের দিকে চাহিয়া "সততাই কার্য্যসিদ্ধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়"—"সততাই আমাদের ব্যবসায়ের মূলধন"—লেখা দুইটা দেখে,—অত্যন্ত বাঁকা ধরণের একটু হাসি হাসে,—কোনদিন ওই সহজ নীতিকথা মানিয়া চলিবার মতন মূর্খতা তাহার ছিল, একথা মনে করিয়া বড়ই আমোদ অনুভব করে।

কৃষ্ণদাস রাত্রিতে দোকান বন্ধ করিয়া হাঁটিয়াই বাড়ী ফেরে,—ট্রামে বাসে কোনরকম বাজে খরচ করাটা সে মোটেই পছন্দ করে না। সেদিন মন লইয়া খুঁকিতে খুঁকিতে হাঁটিয়া দোকানে আসিবার সময়ে রিক্সা গাড়ী ডাকিবার প্রস্তাব করিয়া জয়ন্তী তাড়া খাইয়াছিল;—কৃষ্ণদাস বলিয়াছিল, "হাঁটার মতন এক্সারসাইজ আর নেই। কি সুস্থ শরীরে, কি অসুখ-গায়ে—"

শ্রাবণের রাত্রি,—মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে—দিক্‌চক্রবালরেখার সিঁড়ি বাহিয়া মহাসাগরগুলা সূর্য্যকিরণের হাত ধরিয়া আকাশপথে উঠিয়া গিয়াছিল, এখন সূর্য্যরশ্মির দৃষ্টি এড়াইয়া মাথার উপর দিয়া অন্ধকারে অন্ধকারে নদী কলস্বরে ফিরিয়া আসিতেছে।

কৃষ্ণদাস বাড়ী ফিরিবার জন্য রাস্তায় নামিল,—ছাতা নাই, কিন্তু নাই,—কারণ, কেনে নাই,—প্রথমতঃ হারাইয়া যাইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ চুরি যাইতে পারে, তৃতীয়তঃ আবশ্যক নাই,—যেহেতু দুইফোঁটা বৃষ্টি গায়ে লাগিলে গলিয়া যাইবে এমনতর ননীর শরীর কৃষ্ণদাসের নয়।

রাস্তায় পা বাড়াইয়া কৃষ্ণদাস মুস্কিলে পড়িল,—উপরের ধারাবর্ষণে পথ-চলা অসম্ভব, কিন্তু হাল ছাড়িল না। পুরুষসিংহ,—জীবনের রণস্থলে সংগ্রাম করিতে আসিয়াছে—সে কখনই এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিয়া গাড়ীতে চড়িয়া পয়সা খরচ করিয়া ফেলিবে না! রোষক্ষিপ্ত নয়নে হাত মুঠা করিয়া কৃষ্ণদাস সম্মুখের অন্ধকারের দিকে তাকাইল,—কড়্‌কড়্‌ শব্দে বাজ ডাকিয়া উঠিতেই, তাহার রুষ্ট আঁখি ঘর্ষিতসহিতে নিমীলিত করিয়া মুঠা করা হাত খুলিয়া ফেলিয়া কৃষ্ণদাস কানে আঙুল দিল। রাস্তার জল জমিয়া গিয়াছে, ট্রামগাড়ী চলে না, সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—কৃষ্ণদাস ত্বরিতচরণে সম্মুখের গাড়ীটায় উঠিয়া বসিল।

বৃষ্টি থামিয়া, রাস্তার জল কমিয়া যাওয়ার পরে ট্রামগুলা চলিতে আরম্ভ করিল।—সামনের বেঞ্চিটায় পাড়ার রামপ্রসাদ বসু বসিয়া,—কণ্ডাক্টার টিকিট চাহিতে কহিল, "মাথনি—"

ট্রামের রিপ্লিশের উপরে নোটিশ আঁটা,—যদি কেহ মাথলি টিকেট সম্বন্ধে কোন চুরির সংবাদ ট্রাম-কোম্পানীকে জানাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি পঁচিশ টাকা পুরস্কার পাইবেন.—সংবাদদাতার নাম তাঁহার বিনানুমতিতে প্রকাশ করা হইবে না।

কৃষ্ণদাস বিজ্ঞাপনের দিকে চাহিয়া রহিল।—সম্মুখের বেঞ্চিটায় রামপ্রসাদ বসুর মুণ্ডিতে ঢেলা টাকপড়া মাথাটার উপরে ট্রামগাড়ীর বৈদ্যুতিক আলো পড়িয়া আয়নার মত চক্‌চক্ করিতেছে.—আর একটুখানি উজ্জ্বল হইলে চোখ ঝল্‌সিয়া যায়। ভিতর দিয়া মুখ দেখা চলিত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়ে রামপ্রসাদ বসুকে হারাধন বিশ্বাসের কাছ হইতে মাথলি টিকেট চাহিয়া লইতে কৃষ্ণদাস দেখিয়াছিল।

পঁচিশ টাকায় ক'খানা জিনিষ হয়, তাহা কৃষ্ণদাস ভাবিয়া দেখিল,—এখন বাজার সস্তা, আর গোটা তিন-চার টাকা বোগাড় করিলে হয় ত খান-দুয়েক হইতে পারে। —তাহাই বা মন্দ কি? পথে পাওয়া টাকার আঠারো-আনা লাভ। কৃষ্ণদাস হাতছানি দিয়া কণ্ডাক্টারকে ডাকিল, রামপ্রসাদ বসুর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল, "ওর নাম রামপ্রসাদ বসু,—ওর মাথলি টিকেটটার কি নাম লেখা আছে দেখে এসো দিকিনি,—ওটা বোধ হয় ওর নয়,—অপর কারও টিকেট নিজের ব'লে চালাচ্ছে। আমার নাম কৃষ্ণদাস পোদ্দার,—তুমি লিখে নাও,—আমার পুরস্কারের পঁচিশ টাকা নিতে আমি কাল তোমাদের হেড্ আফিসে যাব একটার সময়ে, তুমি তখন সেখানে থেকো,—আমার নাম যেন না বাইরে কেউ জান্‌তে পারে—" বলিয়া কৃষ্ণদাস তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল।

কৃষ্ণদাসের মনে হয়, যাহার অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে তাহা কে খণ্ডাইবে?—কাই ক্লাস ট্রামে চড়িয়া দুইটা পয়সা খরচ করিয়া যে হঠাৎ এইরকম ভাবে মাটি ফুঁড়িয়া পঁচিশটা টাকা পাওয়া যাইবে, ইহা কি সেই ভাগ্য-পথ? কৃষ্ণদাস ভাবে, জোর বরাত!—সে অত্যন্ত সুখী হইয়া বাড়ী ফিরিল।

রাজকুমারীর সোনার পিচ্‌কারী গড়া হইতেছে;—আরও অনেক জায়গা হইতে অনেক কাজ আসে,—কৃষ্ণদাসের হাতের গুণ আছে, কাজ করে ভাল। দিনে রাত্রিতে নিশ্বাস ফেলিবার সময় পায় না যেন—এত ব্যস্ত। রসিকতা করিয়া বলে, "যম যদি আসে তা হ'লেও আমায় বল্‌তে হবে, একটু সবুর কর হাতের কাজটুকু সেরে তার-পর যাচ্ছি—"

কৃষ্ণদাস অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বলে, "আজকালকার খাবারওয়ালাগুলো যা বদমাইস, বাজারের সব জিনিষেই ভেজালের একশেষ—ছেলেপুলেগুলোকে কি যে খাওয়াই? এক মুড়ি ছাড়া আর কোনও জিনিষই টাট্‌কা খাঁটি পাওয়ার উপায় নেই—"

আবার অন্যসময়ে বলে, "দেশটা বিলাতী জিনিষে ছেয়ে গেল, আমাদের নিজেদের ব'লে আর কিছু রইল না, কিছু কেনা মানেই বিলেতকে পয়সা দেওয়া, তা কি কাপড়-চোপড়ে, কি খাবার দাবারে, কি অন্য জিনিষ-পত্তরে—"

কৃষ্ণদাস স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের আহারের খরচ কমাইয়া দিল, পরিধেয় বস্ত্রের সংখ্যা অল্প হইতে অল্পতর এবং অল্পতম করিয়া তুলিল। কাপড়-জামার পটি ও তালির সংখ্যা বাড়িয়া চলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়িল কৃষ্ণদাসের সোনা।

সোনার বাটি সোনার থালা তৈরী হইয়াছে! কৃষ্ণদাস ভাত খাইতে বসিয়া বারবারই চোখ বুজিয়া কল্পনা করিতে লাগিল, সে যেন ভারী খুসী হইয়া উঠিয়াছে, আনন্দ যেন আর তাহার মনে ধরিতেছে না। একবার ভাবিল, সে হয় ত উল্লাসের চোটে লাফ মারিয়া ছাদের নীচে মাথাটা ঠুকিয়া লইবে!—হঠাৎ মনে হইল, রাস্তায় আসিতে আসিতে কয়েকটা স্কুলের ছেলেকে একটার পরে আর একটা পা-ফেলিয়া ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে "লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট" বলিয়া যাইতে দেখিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পর্য্যায়ক্রমে ডান-পা বাঁ-পা উঠাইয়া-নামাইয়া লাফাইতে লাফাইতে বলে, "লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট।" হ্যাঁ, আনন্দ বলে বটে উহাকে! কিন্তু কৃষ্ণদাস অনেক কষ্টে "লেফ্‌ট রাইট" বলার লোভ সম্বরণ করিল

ভাতগুলা যেন অমৃত হইয়া উঠিয়াছে। সোনার থালা বলিয়াই এমনটি হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য গুণ আছে এই সোনার—কৃষ্ণদাস চোখ বুজিয়া জল খাইল, খাড় নাড়িতে নাড়িতে শাক, চচ্চড়ি, বেগুনপোড়া খাইল, জিভ দিয়া ঠোঁটটা চাটিয়া-পুটিয়া বলিল, আহা, অমৃত স্বর্গে আছে, কে বলে?—অমৃত আছে কেষ্টো গোসাইয়ের সোনার থালায়—"

কিন্তু অন্নপূর্ণার এবং ছেলেমেয়েগুলার দেহের রক্ত এবং ক্ষুধিত প্রাণবায়ু জল হইয়া উঠিল সোনার ভাতের গোড়ায়। যখন অসুখে পড়িল তখন সব ক'টা মিলিয়া এক-সঙ্গেই পড়িল। কৃষ্ণদাস সেদিন অপরাহ্নে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বাহির হইয়া গেল। পাড়ায় একজন ডাক্তার থাকেন, হাতুড়ে নন, ডাগই—উপাধিটাও পড়িয়া শুনিয়াই পাইয়াছেন, স্বকল্পিত নয়। কৃষ্ণদাস তাঁহাকেই ডাকিয়া লইয়া আসিল, তিনি সকলকেই দেখিলেন, কি ভাবিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন—ওষুধ লিখিয়া দিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে কৃষ্ণদাস তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিল, হাত জোড় করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "আমি বড় গরীব, ডাক্তারবাবু, ছাপোষা মানুষ, এতগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কোনরকমে ঘর করি, আপনারই প্রতিবেশী, যদি দয়া ক'রে ভিজিটটা না নেন—"

ডাক্তার কৃষ্ণদাসের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিলেন, শেষে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস গুটি পাঁচেক টাকা লইয়া, প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান্‌-হাতে ওষুধ কিনিতে চলিল। ছেলেমেয়েগুলার এবং অন্নপূর্ণার কথা ভাবিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল,—সংসারে রোগেরও এত আছে! কিন্তু যাক্, পাঁচটা টাকা ব্যয় করিলে যদি সারিয়া ওঠে, তবে না হয় সে তাহা খরচ করিয়াই দেখিবে,—যদিও ভগবান না করুন মরিলেও এমন বিশেষ কিছু বন্ধ হইবে না—খরচ কমে, সোনার খাটটাও শীগ্‌গির শীগ্‌গির বানান হয়। স্ত্রী-পুত্র ত নয়, গুটকতক টাকার যম! আর অন্নপূর্ণার ইহা বড় অন্যায়, সে তাহা করিয়াই জানে, কৃষ্ণদাসের অবস্থা ভাল নয়, তবু এরকম বেমক্কাভাবে অসুখে পড়িয়া তাহার এতগুলা টাকার শ্রাদ্ধ দেওয়া অন্নপূর্ণার পক্ষে অত্যন্ত চিন্তাহীনতা এবং অবিবেচনার পরিচায়ক।

"ধন্বন্তরি ফার্ম্মাসী"র ওষুধ ভালো,—কৃষ্ণদাস সেখান হইতে কোন দিন ওষুধ কেনে নাই, কাহারও কাছ হইতে তাহাদের ওষুধ সম্বন্ধে কোন দিন কিছু শোনেও নাই,—কিন্তু তবুও কৃষ্ণদাসের মনে হইল "ধন্বন্তরি ফার্ম্মাসী"র ওষুধ নিশ্চয়ই ভালো হইবে। কৃষ্ণদাসের বাড়ী শ্যাম-বাজারের কাছাকাছি—গলির মধ্যে। "ধন্বন্তরি ফার্ম্মাসী" বহুবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত। মাঝে এক-ক্রোশের বেশী ব্যবধান,—কৃষ্ণদাসের মনে হইল, "ধন্বন্তরি ফার্ম্মাসী"র ঔষধ ভালো না হইয়া যায় না। "ধন্বন্তরি"র আর একটা গুণ কৃষ্ণদাস লক্ষ্য করিয়াছে—তাহাদের দোকানের সাম্‌নের বড় বোর্ডটায় লেখা থাকে, "প্রেস-ক্রিপ্‌শান্‌স্ সার্ভড্ ডে এ্যাণ্ড নাইট্", কিন্তু অনেকদিন দিবা দ্বিপ্রহরেও কৃষ্ণদাস তাহাদের দোকানে তিনটা বড় বড় তালা লাগানো দেখিয়াছে। কৃষ্ণদাস স্থির করিল, উহাদের দোকান হইতেই ওষুধ আনিতে হইবে।

গলির ষ্ট্রীট দিয়া হাঁটিয়া আসিয়া কৃষ্ণদাস মনে মনে করিল, "মহাত্মা গান্ধীর নাম ইংরেজীতে বানান কর্‌ব। যদি জোড় অক্ষর হয় তা হ'লে নিবেদিতা যাব "ধন্বন্তরি ফার্ম্মাসী"তে-আর যদি বিজোড় হয় তা হ'লে যাব যুধিষ্ঠির গুধিষ্ঠির।" কিন্তু মহাত্মার নাম ইংরেজীতে বানান করিয়া জোড় অক্ষরে দাঁড়াইয়া গেল,—সে তিন-চার বার গণিল, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী,—কিন্তু বিজোড় হইল না কিছুতেই। কৃষ্ণদাস ভাবিল, "আচ্ছা তিনটে নাম দেখ্‌ব, তার ভিতরে দুটো যদি বিজোড় হয় তা হ'লে যাব যুধিষ্ঠির গুধিষ্ঠির, আর জোড় হ'লে যাব নিবেদিতা—" স্থির করিয়াই সে বলিল, "পণ্ডিত মতিলাল নেহরু"—কিন্তু গণিয়া আবার হইল জোড়। কৃষ্ণদাস এবার ভাবিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,—কিন্তু ফল একই হইল। আবার আরম্ভ করিল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়,—কিন্তু বিজোড় হইল না! হাল ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণদাস ভাবিল, লোকের নামে হইবে না, সামনের দোকানের নামটার অক্ষরগুলা দেখিয়া স্থির করিতে হইবে,—"য়ার এ্যাণ্ড সন্স" —ইহাও হইল যুগ্ম।—আচ্ছা, তার পরেরটা?

"বসু এণ্ড কোম্পানী"—এখানেও নেই। কৃষ্ণদাস বিচলিত হইয়া ক্রুদ্ধভাবে নিজের মনেই বলিল, "আমি যাব খুঁজতে খুঁজতে, হ'চ্ছে জোচ্চুরি, তারী আমার ইয়ে,—হাঁ—"

সান্যালের দোকানটা "ধন্বন্তরি এণ্ড সন্স", অক্ষর পড়িয়া হইল বিভোর—কৃষ্ণদাস উল্লসিত হইয়া উঠিল,—সে ঘুরিতে ঘুরিতেই যাইবে! আপার সার্কুলার রোড, লোয়ার সার্কুলার রোড, পার্ক ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী রোড, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট দিয়া অত্যন্ত মৃদুমন্থরগতিতে হাঁটিতে হাঁটিতে এদিক-সেদিক তাকাইয়া, এখানে একটু ওখানে একটু দাঁড়াইয়া অবশেষে যখন "ধন্বন্তরি ফার্ম্মাসী"র সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সমস্ত দোকানই বন্ধ হইয়া গেছে! ভীষণ রাত্রি, চারিদিক খাঁ খাঁ করিতেছে,—এক যে-সকল দোকান বাস্তবিকই দিবারাত্র খোলা থাকে বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারে, সে সকল দোকানও আর খোলা নাই,—"ধন্বন্তরি" ত দিন দুপুরেই ভাল লাগায়, অতএব সেটা যে তখন বন্ধ থাকিবে এটা বোধ হয় আন্দাজ করা যায়।—কৃষ্ণদাস কি ভাবিয়া একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল, সে বাড়ী ফিরিয়া চলিল,—রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া নাই—অর্দ্ধ-আলোকিত রাজপথে লোকচলাচল করিয়া আসিয়াছে। একটা ডাক্তারখানার দরজার একটা পাট বন্ধ আর একটা খোলা,—ভিতরের লোকগুলা যাই-যাই করিতেছে,—কৃষ্ণদাস নিমেষমাত্র সেদিকে চাহিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল,—টাকা পাঁচটা শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিল, ঠিক যেন কোন দস্যুর হাত হইতে কেহ তাহার যথাসর্ব্বস্ব রক্ষা করিয়া গৃহে ফিরিতেছে।—বাড়ীতে আসিয়া যখন পাঁচাইল, তখন রাত্রি বহুদূরে পড়াইয়া আসিয়াছে,—ছেলেমেয়েগুলা মরিয়া হিমশীতল হইয়া গেছে!

অন্তরী নিদ্রাহীন চোখে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল, কৃষ্ণদাসকে দেখিয়া উগ্র আগ্রহের সহিত কহিল, "ওষুধ এনেছ?"

অন্যদিকে চাহিয়া কৃষ্ণদাস জবাব দিল, "দোকান বন্ধ হ'য়ে গেছে—"

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠিয়া কৃষ্ণদাস "দুর্গা, দুর্গা, শ্রীহরি, শ্রীহরি" বলিয়া দোকানে যাইবার উদ্যোগ করিয়া দরজায় পা দিতেই মনে হইল, অন্তরীর খাস পড়িতেছে না,—কাছে আসিয়া নাকের গোড়ায় হাত রাখিল,—ছেলেমেয়েগুলাকেও দেখিল। ইহারা কৃষ্ণদাসের খরচ বাঁচাইয়া দিয়া চলিয়া গেছে—কিন্তু ইহাদের শেষ নিশ্বাস রহিল কৃষ্ণদাসের স্বর্ণসিংহাসন ঘেরিয়া।

কৃষ্ণদাসের একবার মনে হইল, আজ যাহারা কথাটি না কহিয়া নিঃশব্দে মরিয়া গেল, তাহারা তাহার জীবনে একদিন কতখানি ছিল। সেদিনকার কথা মনে হইল, যখন কৃষ্ণদাস বলিত, "আমি তোমার অযোগ্য স্বামী, অন্তরী,—তোমাদের জন্যে কিছুই কর্‌তে পারিনে—"

অন্তরী বলিত, "তোমাদের চাঁদ আর ক'দিন? তোমার দোকানটা ভালো হ'ক—আর ক'টা দিন বৈ ত নয়।"

কৃষ্ণদাস অন্তরীর কঠিন মৃত্যুনিথর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ভাবিল—ইহাদের সৎকার করিতে হইবে।

নিজের জিনিষপত্র, ব্যাঙ্কের পাশ-বই, সোনার জিনিষ, গহনা ইত্যাদি ট্রাঙ্কে ভর্ত্তি করিয়া কৃষ্ণদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। সান্যালের বাড়ীটার একতলার ঘরে একটা ছেলেধরা চোর বাস করে—জেলের ঘুঘু, বার সাতেক ভিতরে-বাহিরে আনাগোনা করিয়াছে,—তাহাকে ডাকিয়া কৃষ্ণদাস তাহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া, কাঁদিয়া কহিল, "আমার বউ, আমার ছেলেমেয়েগুলা সব ম'রে গেল একদিনে,—তাদের সৎকার কর্‌তে পারি এমন সামর্থ্য আমার নেই,—সংসারে আমার আর কোন বন্ধন রইল না, এককড়ি! তোমায় একটা টাকা দেব, ভাই, বিকেল পর্য্যন্ত কর্পোরেশানে একটা খবর দিয়ে এসো, যে, কৃষ্ণদাস বাবু আজ তিনদিন হ'য়ে গেল মফঃস্বলে গিয়েছেন, ইতিমধ্যে তাঁর ছেলেমেয়ে-বউ সব মারা গিয়েছে—কৃষ্ণদাস বাবু কবে ফির্‌বেন কিছু স্থির নেই,—অথচ মৃত ব্যক্তিদের সৎকার না হ'লে পাড়ার লোকের স্বাস্থ্যহানি হবে নিশ্চয়ই,—কর্পোরেশান থেকে যেন তার ব্যবস্থা করা হয়—" বলিয়া কৃষ্ণদাস এককড়ির হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "আমার এই উপকারটি করো এককড়ি,—ভগবান্ তোমার মঙ্গল করবেন—"

হাঁড়ির মতন মুখ করিয়া এককড়ি কহিল, "এক টাকায় হবে না, পাঁচ টাকা দিতে পারো?"

"পাঁচ টাকা কোথায় পাব এককড়ি, দু'টি টাকা না হয়

দেব—দরীব বাবুদের এ রকম অবস্থায় কি "না" বলতে আছে ভাই ?"

অবশেষে এককড়ির হাতে আড়াইটি টাকা দিয়া কৃষ্ণদাস তাহার ট্রাঙ্ক-ভরা সোনার গহনা, ব্যাঙ্কের পাশ-বই লইয়া রওনা হইল,—দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একবার পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিল—স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের মৃতদেহগুলা তখন শক্ত হইয়া উঠিয়াছে।—তাহাদের অতৃপ্ত, ক্ষুধিত আত্মাগুলা যেন ট্রাঙ্কের তলায় অত্যন্ত সঙ্কোপনে জমা হইয়া রহিল—তাহারই বোঝা বহিয়া সোনার তাল কাঁধে করিয়া কৃষ্ণদাস বাহির হইয়া গেল।

প্রতাপ ও দেবদাস

শ্রী অবনীনাথ রায়

বিবাহ-সমস্যা ও দেবদাস ব'লে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলুম। সেটি যখন স্থানীয় সাহিত্য-সভায় পড়া হয় তখন প্রবন্ধ শুনার পর আমার এক অধ্যাপক-বন্ধু আমাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বলেন যে আমি দেবদাসের চরিত্রের মাত্র একটি দিক দেখিয়েছি অর্থাৎ দেবদাসের প্রতি সহানুভূতিই আমার প্রবল—তার ফলে তার নৈতিক অবনতির দিকটা আমার লেখায় ফুটে ওঠেনি অথবা তার নৈতিক অবনতি ব্যাপারটা আমি খুব বড় ব'লে মনের মধ্যে স্থান দিই নি।

বন্ধুর অভিযোগ ঝেড়ে ফেলতে পারলুম না। মনের মধ্যে অবিরত জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম, আচ্ছা, এই যে দেবদাসের এই রকম শোচনীয় অধঃপতন হ'ল, কিসের ফলে হ'ল ? কি সে বস্তু যার অভাবে তার সমস্ত কর্ণধার একেবারে লক্ষ্যহীন হ'য়ে গেল,—তার কর্ণধারবিহীন নৌকা চোরাবালির কবলে প'ড়ে একেবারে আঘাটায় আছাড় খেলে ?

একটু ছুটি পাওয়ার আশায় আমার অন্য এক অধ্যাপক-বন্ধুর সঙ্গে একদিন এই প্রসঙ্গে আলোচনা করলুম। আমাদের প্রশ্নোত্তরমালাটা এই রকম :—

'দেবদাসের অধঃপতনের জন্য আপনি তাকে দোষী মনে করেন ?'

বন্ধু একটু সাবধান হ'য়ে উত্তর দিলেন, বল্লেন, 'দেবদাসের প্রেমের নিষ্ঠাকে প্রশংসা করি, সে খুব যা খেয়েছে একথাও স্বীকার করি, কিন্তু তার অধঃপথে নেমে যাওয়াটা আদৌ সমর্থন করি নে। তার জন্যে আমার মনের মধ্যে দুঃখ আছে, ব্যথা আছে, সহানুভূতি আছে কিন্তু শ্রদ্ধা নেই।'

শ্রী অবনীনাথ রায়

এই বন্ধুটি আইডিয়ার রাজ্যে ultra-modern ব'লে খ্যাত। সুতরাং তাঁর উত্তর শুনে ভাবনা বেড়েই গেল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা, দেবদাস পরবর্তী জীবনে কি করতে পারত, একটা

আওয়াজ করুন ত,—তার জন্যে একটা alternative জীবনযাত্রার পথ কল্পনা করুন।'

বন্ধু কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে বল্লেন, 'কেন, সে বড় অধ্যাপক হ'য়ে পড়াশুনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে সব ভুলতে চেষ্টা করতে পারত; না হয় ত দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারত—কত পথ তার জন্যে খোলা ছিল। তা না ক'রে সে আবদেরে ছেলের মত না-পাওয়ার দুঃখে কান্না জুড়ে দিলে, নিজেকে ধ্বংস ক'রে ফেল্‌লে। আপনি যা'ই বলুন, এ কিন্তু তার নিছক দুর্বলতা —এর স্বপক্ষে বলার কিছু নেই।'

স্বপক্ষে ত বলার কিছু নেই জানি, কিন্তু জগতের মতে মত দিতেও আমার যেন কোথায় বাধ্‌তে লাগ্‌ল। মনে হ'তে লাগ্‌ল কি যেন একটা element আমরা হিসাবের মধ্যে আন্‌ছি নে—তাই যত গোল বাধ্‌ছে—দেবদাসের পরিপূর্ণ বিচার হ'চ্ছে না। কি সে বস্তু যা আমাদের মানসিক চিন্তার হাতকে clude করছে, সন্ধান করতে লাগলুম। সুতরাং দেবদাসের আখ্যায়িকা আবার গোড়া থেকে বুঝে দেখার চেষ্টা করতে হ'ল।

দেবদাসের কাহিনী সংক্ষেপে এই :—দেবদাস বড়-লোকের দুরন্ত ছেলে—পড়াশুনার প্রতি গোড়া থেকেই তার দারুণ বৈরাগ্য। ভাল লাগ্‌ত মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ান, ঘুড়ি উড়ান, পাড়াময় উপদ্রব ক'রে বেড়ান প্রভৃতি বন্ধনের স্বাধীন আনন্দ। এই আনন্দে একবার সঙ্গী জুটেছিল পাশের বাড়ীর মেয়ে পার্ব্বতী। দেবদাস পাঠশালা ত্যাগ করলে—পার্ব্বতীও আর পাঠশালায় পড়তে গেল না। সমস্ত দিন দুজনে দুজনের সহচর। দেবদাসের জেদাজেদি-অনুসারে কখন আদর কখন মারধোর খাওয়া ছিল পার্ব্বতীর পাওনা। এই রকম ক'রে তালসোনাপুরের ক্ষুদ্র গ্রামে তাদের যে সংসার, সেখানে দুজনে দুজনের কাছে একান্ত। ভবিষ্যতের কোন ভাবনা না ভেবে দুটি অসামাজিক মন পরস্পরকে জড়িয়ে এক হ'য়ে বেড়ে উঠ্‌ছিল—তাতে না ছিল কোন স্বার্থের গন্ধ, না ছিল কোন কামনা। কিন্তু এই অতি-স্বাভাবিক সম্বন্ধ মানুষের সমাজে টেঁকে না! মানুষ তাকে কোন পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে ফেলে তার একটা ব্যবহারিক নাম দিতে চায়। কিন্তু সে কথা পরে।

দেবদাস বড় হ'ল—তালসোনাপুর গ্রাম আর তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লে না, তাকে পড়ার জন্য কল কাতা যেতে হ'ল। এইবার বৃহৎ জগতের সঙ্গে মোকাবিলা। সে জগতে কত আকর্ষণ—সোষাক, পরিচ্ছদ, সিনেমা, বায়স্কোপ, থিয়েটার, ফুটবল ম্যাচ্, কলেজ, প্রফেসার ইত্যাদি। এ জগতে কিছুরই সঙ্গে পার্ব্বতীর পরিচয় নাই— সে তার ক্ষুদ্র তালসোনাপুর গ্রামে দেব-দা'র পাঠশালা-পলায়ন, বাঘের ঘরে ছোটাছুটি, কি একটা কাজে গাফি-লতি হওয়ায় দেব-দা'র হাতে কঠিন শাস্তি প্রভৃতি বাজার রকমের স্মৃতি আঁকড়ে প'ড়ে রইল।

ইতিমধ্যে পার্ব্বতীও বড় হয়েছে। তার বিয়ে দেওয়া দরকার। দুটিকে ছোটবেলা থেকে একত্র মেখে মেখে জীবনেও তারা একত্র গ্রথিত হয় এ ইচ্ছা পার্ব্বতীর বুড়ো ঠাকুর-মায়ের মনে জেগেছিল এবং তিনি কথাটা দেবদাসের জননীর কাছে একবার তুলেও ছিলেন, কিন্তু সমাজের পাষাণ-প্রাচীরে সজোরে মাথা ঠুকে তাঁর এ ইচ্ছা চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গেল—রইল শুধু অপমানের জ্বালা। দেবদাসের জননী স্পষ্ট বলেছিলেন, বেচাকেনা-ঘরের মেয়ে তিনি নেবেন না। একটা অতি সহজ সরল সম্বন্ধ সমাজের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের বাষ্পে দুষ্ট ক্ষত হ'য়ে গেল!

পার্ব্বতী সুন্দরী ছিল—সুতরাং তার বিয়ের জন্য তার বাপ ভাবিত হন নি। বরং দেবদাসের বাড়ীতে প্রত্যা-খ্যাত হ'য়ে তাঁর জেদ বেড়ে গেল এবং একমাসের মধ্যেই তিনি মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ পাকা ক'রে ফিরে এলেন। এইবার পার্ব্বতীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল।

স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ আঁকড়ে ধরবার প্রবৃত্তি। ছোটবেলা থেকেই পার্ব্বতীর চিত্তাকাশে দেবদাস ব্যতীত আর কেউ বিরাজ করে নি। সে একেবারে সমর্পিতপ্রাণা —সুতরাং অন্যকে ভজনা করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য। দেবদাসের উপযুক্ত সহচরী সে—ভয়-ডর-লজ্জা তার ধাতে ছিল না। সে রাত্রে গোপনে দেবদাসের সঙ্গে দেখা ক'রে বল্লে, আমাকে পায়ে স্থান দিও।

পুরুষ নিজের মনের খবর নিজেই অনেক সময় রাখে

না। দেবদাস শুনেছিল, পার্ব্বতীর সঙ্গে বিয়েতে তার বাপমায়ের আপত্তি। পার্ব্বতী যে এতটা দুঃসাহসের পরিচয় দেবে এর জন্যেও সে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং পরের দিন বাপের কাছে বিয়ের কথা তুলে বন্ধুনি দেবে সে কলকাতায় চ'লে গেল এবং সেখানে থেকে পার্ব্বতীকে লিখে দিলে সে তাকে কোনদিনও খুব ভালবাসত না।

ভাগ্যদেবতা অলক্ষ্যে হাসলেন। চিঠি তাকে দেওয়ার পর থেকেই দেবদাসের মনে উল্টা স্রোত বইতে আরম্ভ হ'ল। সহসা তার নজরে পড়ল কলকাতায় এসে যা পেয়েছে তার চেয়ে সে হারিয়েছে অনেক বেশী। কলকাতার পাওনার তুলনায় যে পার্ব্বতী অনেক বড়! ফলে সে আবার বাড়ী ফিরে এল এবং চেষ্টা ক'রে পার্ব্বতীর সঙ্গে দেখা করলে। পুকুরের পাড়ে দুজনের এই দেখা হওয়ার দৃশ্য শুনেছি চলচ্চিত্রের জগতে অতুলনীয় হ'য়ে আছে। পার্ব্বতী চিরকালই অভিমানিনী মেয়ে—দেবদাসের যে অর্ঘ্য সে দেবদাসের পায়ে নিবেদন করেছিল তাকে পদদলিত করায় সিংহীর কণ্ঠস্বরও আলোড়িত হ'য়ে উঠেছিল। সে বলে, চলচ্চিত্ত তোমাকে বিশ্বাস নেই। তখন ভুল এবং অভিমানের ভিতর দিয়ে জীবনের নাটাগীলা হ'য়ে উঠল।

পার্ব্বতীর বিয়ে হ'য়ে গেল, দেবদাসও কলকাতায় ফিরে এল। এখন তার জীবনের যেন আর অবলম্বন রইল না। পার্ব্বতী গত এবং অনাগত জীবনের কতখানি স্থান অধিকার করেছিল, তাকে হারানোর আলোয় সেটা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল। সামনের বাকী জীবন মরুভূমির মত ধূ ধূ করছে—শুধু বিষাদ, ক্লিন্নতার মৈত্রে অবসন্ন। জীবনে আর কিছু করণীয় নেই—করার শক্তিটুকুও পার্ব্বতী নিয়ে চ'লে গেছে। সুতরাং কোন আশা নেই, কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, কোন উদ্যম নেই—আছে কেবল নিরাশার তপ্ত জ্বালা, যে নিতান্তই আপনার ছিল তাকে গ্রহণ না করার শাস্তিপূর্ণ আত্মগ্লানি। ভবিষ্যতে জীবনমরুর মাঝখানে কোন ওয়েসিসই চোখে পড়ে না—কানে আসে দিগন্তপ্রসারী ক্লান্তিকর একটানা একটা সুর—পার্ব্বতী নেই, নেই, নেই! মনের যখন এই রকম আলুথালু নিরাবলম্ব অবস্থা তখন দেবদাসের বন্ধু জুটলো চুণিলাল।

দেবদাসের মনে শান্তি নেই, অথচ চুণিলাল দিব্য নিশ্চিন্ত। দেবদাস মনে করলে তবে হয় ত চুণিলালের সঙ্গে গেলে স্বস্তি পাওয়া যাবে। পাপের প্রথম দর্শনে দেবদাসের ভদ্র মন সঙ্কুচিত হয়েছিল কিন্তু ক্রমশঃ তার পিচ্ছিল পথে অবতরণ করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হ'ল না। এ কাহিনী আর বাড়িয়ে লাভ নাই—বাকিটা সকলেরই জানা।

যে বস্তুর অভাবে দেবদাস তর-তর ক'রে অধঃপথে নেমে গেল, সেটি যে ইচ্ছাশক্তি এ কথা সম্ভবতঃ বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের বাঙালীর মনে আর-একটি এই ধরণের প্রেমের ইতিহাস প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে—সেটি হ'চ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ এবং শৈবলিনীর প্রেমকাহিনী। দেবদাসের সঙ্গে প্রতাপের প্রভেদ এই যে প্রতাপ বিপুলভাবে করেছিল—দেবদাস পারে নি। প্রতাপ শৈবলিনীকে কম ভালবাসতো তা নয়,—শৈবলিনী বলেছিল, তুমি থাকতে আমার সুখ নেই; তাই প্রতাপ বুকে ছোরা দিলে। গঙ্গার গর্ভেও প্রতাপ অনেকবার ডুবে মরতে গেছে—শৈবলিনীই মরতে দেয় নি। প্রতাপের প্রেম মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত—শৈবলিনীকে পাওয়া অসম্ভব জেনে সে সংসারের মধ্যে বৃথা কোলাহলের সৃষ্টি করতে চায় নি, নিজেই আস্তে আস্তে স'রে গেছে। শৈবলিনীর পরম মঙ্গলই তার কাম্য ছিল—তার দেহ কোনদিন সে চায় নি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সগর্ব্বে বলেছেন যে প্রতাপের পুণ্যকাহিনী বর্ণনা ক'রে তাঁর লেখনী ধন্য হ'ল।

এই প্রসঙ্গে একটা অবান্তর কথা ব'লে রাখি। আমার বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর উপর অবিচার করেছেন। প্রতাপকে মনে মনে ভজনা করার জন্যে তিনি শৈবলিনীকে যে রকম প্রায়শ্চিত্তের তুফানে নাকানি-চুবুনি খাইয়েছেন অতটা না করলেও পারতেন। বাস্তবিকই বিবাহের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা যদি দুটি প্রাণকে একত্র করা হয়, তবে প্রতাপই ত শৈবলিনীর স্বামী—চন্দ্রশেখরের সঙ্গে যে লোকাচার তাকেও ত সে কোনদিন ক্ষুণ্ণ করে নি। সমাজের কাঠামোকে অবিচলিত রাখার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই উপন্যাসে একটি চিরবিশ্বাসিত

shibboleth কে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন মাত্র। কিন্তু সে কথা যাক।

ইচ্ছাশক্তির অভাবে মানুষ যে কিরকম নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে তার আর একটি উদাহরণ আমরা পাই টুর্গেনিভের "রুডিন্" নামক উপন্যাসে। এই রুডিনের চরিত্রে অনেক-গুলি গুণের সমাবেশ হয়েছিল—সে বক্তৃতা ক'রে মানুষের মন হরণ করতে পারত, বুদ্ধি ছিল তার সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী, সব কথা চট্ ক'রে বুঝতে এবং বুঝিয়ে বলতে তার দক্ষতা ছিল। মাধারও অনেক মতলব খেলত—কিন্তু বিধাতা তাকে মেরুদণ্ডহীন ক'রে গড়েছিলেন। যদি বক্তৃতা ক'রেই জীবনকে পুষ্পিত ক'রে তোলবার উপায় থাকত তবে রুডিনের জীবন ব্যর্থ হ'ত না, কিন্তু মানুষের ভাগ্যবিধাতা চান কাজ এবং কাজকে গ'ড়ে তোলবার অটুট ইচ্ছাশক্তি। তাই রুডিন জীবন-স্রোতে ভেসে ভেসেই বেড়াল—কোথাও স্থিতিলাভ করতে পারলে না। সংগ্রাম ক্ষেত্র হ'ল তার শেষ শয্যা—এ বিষয়ে প্রমথেশের সঙ্গে রুডিনের মিল আছে।

দেবদাসও যে নিছক কামনার তাড়নায় বেহুপথা-জীবনীদের দ্বারস্থ হয়েছিল এ কথা বলতে পারি নে। মনের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় চুনিলাল তাকে যে পথের পথিক ক'রে দিয়েছিল সে নির্বিচারে সেই পথ বেছে নিয়েছিল এবং তাকে কাটিয়ে ওঠবার শক্তি তার ছিল না। প্রবৃত্তির লাগাম চড়িয়ে জীবনকে পিশাচের লীলাভূমি করলে যে শাস্তি পাওয়া যায় না, শাস্তি যে সংকল্পনীর্ণা নিবৃত্তি-কামীদেরই করায়ত্ত, এ কথা কেউ কোনদিন দেবদাসকে বুঝিয়ে বলে নি। তাই সে হতভাগ্যের হিসাবের ভুল হ'য়েছিল। কিন্তু সেই কারণে দেবদাসকে পেঁচি-মাতালের কোঠায় ফেলে তার উপর অবিচার করা হবে। তার মধ্যে প্রেমের স্পর্শমণি ছিল—তা না হ'লে তাকে অবলম্বন ক'রে চন্দ্রমুখী সোনা হ'য়ে উঠতে পারত না। সে নিজে মন্দ হ'য়েও অন্যের ভালকে উদ্বোধিত ক'রে তুলেছিল। সে বিপথগামী কিন্তু চরাচারী নয়—নিজের শরীরের উপরই সে অযথা অত্যাচার করেছিল কিন্তু মন ছিল তার নিষ্কলুষ। শেষ পর্য্যন্তও তার মনে নীচতার প্রকাশ পায় নি। 'নারান' বলেন মানুষের মধ্যে একরকমের স্বভাব আছে যা ভালবাসা ব্যতীত কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। * এ কথা যদি সত্য হয় তবে দেবদাস যে সেই স্বভাবের মানুষ ছিল একথা বোধ হয়, হলফ্ ক'রে বলা যায়। জীবনে সে অনেক শাস্তিই পেয়ে গেছে—মরণের পরে এপারের দেনা এপারেই চুকিয়ে দিয়ে সে যেন বিধাতার সাম্‌নে দাঁড়াতে পারে এই প্রার্থনাই আজ করি। যদি তাকে পুনর্জন্ম নেন তবে যেন এই বহুসংস্কারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষে আর সে না জন্মায়।

---

* 'There are certain natures—and they are frequently the highest type of our kind—who cannot drown love by any means, except love. With them, it is a homœopathic kind of treatment that is is indicated—to cure like with like. Work, other interests, travel—nothing on God's earth will drive away the melancholy and fretting of the soul with such unhappy creatures. Nothing but love···

Breo Narran.

অখণ্ড

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী

(হাত পাঁব্ মুখ শীর ধরি বেগর বেগর নাম—ইত্যাদি। কবীর)

ঐ যে হাত-পা, ঐ মাথা-মুখ,—
পৃথক্ পৃথক্ নাম ধ'রে
করিলে বিচার কোথা ভ'দ তুই ?
কোন্ নামে ডাক দিই তোরে ?

সব অনৈক্য ঐক্য যোজনা—
সব ঠাঁয়ে এক 'আমি' তুই,
'আমার কথা' যে সকলের কথা,
এক অখণ্ড—নাহি দুই।

কবীর করিছে বিচার করিয়া,—
পূরবের কথা বলি সেই,
প্রতীচীর প্রাণ পূর্ণ করে যে
আমার পূরবী কথা সেই !

এল্‌সিনোরের পথে

ডাঃ শ্রী ধীরেন্দ্রমোহন সেন, এম-এ, পি-এইচ ডি (লণ্ডন)

কোপেনহেগেন ষ্টেশন। এখানে নামতে হবে। আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। ভারবাহী কুলির বালাই নেই বল্লেই হয়। তরুণ, তরুণী, প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ়া সবাই নিজের নিজের তল্পীতল্পা ব'য়ে নিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ আগে তরুণীদের নাক-পাউডার করবার পালা দেখেছি। এর যেন আর সময়-অসময় নেই। ইউরোপ-প্রবাসে এদের এই নাসিকাপ্রসাধন ভারি মজার লেগেছে। এরা কি মনে করে—বিশ্বজগৎটা সব সময় দূরবীক্ষণ লাগিয়ে এদের নাকের দিকে চেয়ে আছে ! লণ্ডনে, প্যারিসে, বার্লিনে, রাস্তায়-ঘাটে, 'বাসে'-ট্রেনে সর্বদাই এ ব্যাপারটা চোখে পড়ে। নবীনা মাত্রেরই হাতব্যাগের মধ্যে একটি ছোট আয়না ও পাউডারের কৌটা থাকবেই থাকবে—এ যেন ওদের নবীন মনের রক্ষা-কবচ বিশেষ। গাড়ীর করিডোর দিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে গাড়ীর গায় আয়না লাগান। নবীনারা যেতে যেতে এক একবার নিজেকে দেখে নিচ্ছেন। এ নিয়ে পিছনে আমার পাশেই কয়েকজন তরুণ বেশ আমোদ পাচ্ছেন। আমাদের একটি বন্ধু তাঁর বোনের উপর বেশ একটু চটেছেন, বল্‌ছেন, 'এদের নিয়ে পথে চলাই বিড়ম্বনা।' এখানেও কি তবে 'পথি নারী বিবর্জিতা' হবেন ? অবশ্য নারীদের ভয়ের কিছু কারণ নেই, কারণ তাঁরা নিজেরাই পথ চলতে শিখেছেন।

প্লাটফর্মের উপর এক জায়গায় আমাদের জিনিষগুলি রাখা হ'ল। দুদিন পথ-চলার যে ক্লান্তি সঞ্চিত হওয়া উচিত ছিল তার বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হ'চ্ছে না। শরীরের কোথায়ও পথের মলিনতা অনুভব করছি না। একেবারে অপরিচিত দেশে এসে যে নেমেছি এ কথা মোটেই মনে হ'চ্ছে না—কেন না আমাদের মনগুলি পরস্পরের মনকে অল্প ক'রে চলেছে। অজানার যতটুকু সঙ্কোচ, যতটুকু লজ্জা সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ে—তাই সেটা মোটেই লাগ্‌ছে না। একা হ'লে কি অসহায়ই না নিজেকে মনে হ'ত। আমাদের এজেন্টের প্রতিনিধি এসেছেন—তাঁর টুপির উপর তাঁর পরিচয় বিদ্যমান। লোকটি যদিও ডেনিস্,

কিন্তু বেশ অবাধে ইংরেজি ও জার্মান বলছেন। তিনি বল্লেন, যে, ওঁর লোক আমাদের তল্লীতল্পার ভদারক করবে। ষ্টেশনের খাবার-ঘরে আমাদের ব্রেকফাষ্ট (প্রাতরাশ) তৈরী,—সেটা সবার আগে সেরে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এতে দলের কেউ আপত্তি করলেন না।

এতবড় ষ্টেশন—অথচ ডেনমার্কের চারদিক থেকে জনস্রোত ব'য়ে আসছে, বিরাম নাই। অথচ চারিদিক সুন্দর পরিপাটী। এরা পরিচ্ছন্নকে অপরিচ্ছন্ন করে না; তাতে যেন এদের নিজেদের অবমাননা করা হয়। ইংরেজ ও ফরাসী সঙ্গী-সঙ্গিনীরা এদের পারিপাট্যের খুবই প্রশংসা করছেন। খাবার-টেবিলে ব'সে ভিন্ন-রুচির মানবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কেউ বা কফি, কেউ বা কোকো, কেউ বা গরম দুধ চেয়ে নিল। চা নিল দু' একজন—তারা জাতে ইংরেজ। খাবার জিনিষের রকমটা মোটেই ইংরেজী প্রাতরাশের মত নয়। অপর্য্যাপ্ত তাজা মাখন, পাঁউরুটী এবং 'পেষ্ট্রি' রয়েছে। খাওয়ার পরিমাণ দেখে ডেনমার্কের চাষীরা মনে মনে তারিফ করছি, এমন সময় একজন মার্কিন তাঁর আনুনাসিক কণ্ঠে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সহসা সচেতন ক'রে দিলেন—"May I have two fried eggs with both sides done, Miss? (আমাকে দুটো ডিম এনে দাও, তার দুধারই যেন ভাজা হয়)" মিস্ (পরিচারিকা) তো অবাক্! মেয়েটী তাড়াতাড়ি ইংরেজী ও জার্মানে যার যা চাই তাই বুঝে নিচ্ছিল। এ নতুন আধা সহসা তার হৃদয়ঙ্গম যে হয় নি তা তার মুখের ভাবেই প্রতীয়মান। একটি জার্মান-মহিলা পরিচারিকাটিকে তার সঙ্কট থেকে উদ্ধার করলেন। সবারই কৌতূহলী দৃষ্টি পড়ল এই ডিমপ্রিয় মার্কিনটির দিকে। আমেরিকা থেকে লোকটা ডেনমার্ক পর্য্যন্ত এসেছে তবুও তার ঘরোয়া অভ্যাস ঘুচল না। লোকটার আর একটি বিশেষত্ব দেখছি তার অনর্গল কথার স্রোত—দেশ থেকে দেশান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে এই কথার জাল বুনেই চলেছে। রকম অনেকটা আমাদের দেশের নবজাতাদের মত—যাঁরা কোন বিষয়ই তলিয়ে দেখেন নি, সুতরাং সর্ব্বত্রই তাঁদের বিশেষজ্ঞতার দাবী। ইউরোপে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেখেছি সবাই শুধু শোনাতে ব্যস্ত নয়, শোনবার আগ্রহও আছে বেশ। অন্যের মতকে তারা শ্রদ্ধা করে, নতুন ক'রে যারা ভাবতে চায় তাদের এরা পথ ছেড়ে দেয়। মনে পড়ে, আমাদের কোন ভারতীয় কলেজের 'প্রফেসর'—যাঁর মৌলিক চিন্তাশক্তির প্রতিভা তাঁর পরিবারের পরিধি ছাড়ায় নি—ইউরোপের একটি খ্যাতনামা বিজ্ঞানবিদ্‌কে তাঁরই বিষয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে অত্যন্ত পরিষ্কার ক'রে কি যেন একটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। মার্কিন মনোবয় চাবি-দেওয়া কলের পুতুলের মত ব'লেই চলেছেন—তফাৎ এই যে তিনি self-winding—। এই রকমের মার্কিন লোক এ দেশে এসে কত দেখেছি। খানিকটা এখন বুঝতে পারি—ডাঃ ওয়াটসনের 'Behaviourist's Psychology'র* সূচনা কোথায়? এদের মনোজগতটা একটা যান্ত্রিক Action ও Re action (ঘাত-প্রতিঘাতের)-এর মধ্য দিয়েই চলেছে। ঘাত ও প্রতিঘাতকে ব্যবধান ক'রে কোন যে মানসিক বৃত্তির স্থান আছে এদের দেখলে তা তো মনে হয় না। অনুভব করবার সময় কোথায় যে এদের মনোজগতে অনুভূতি স্থান পাবে?

শোনা গেল, প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রায় এগারোসিনোরের গাড়ী এখান থেকে ছাড়ে। আবহুকের তাগিদ যখন মিটে গেল তখন আমাদের জানবার ও দেখবার ইচ্ছাটা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রস্তাব হ'ল—সকাল বেলাটা কোপেন্‌হেগেনে কাটিয়ে সহরটার সঙ্গে একটু মুখচেনা পরিচয় ক'রে নেওয়া। মার্কিন কয়েকজন একটি 'গাইড' পাকড়াও করলেন, অপেক্ষাকৃত কম খরচে বলে তাঁদের সঙ্গ নিলেন। ব্যাপার দেখে আমরা ছয় সাত জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ম'রে পড়লাম। যা'ই দেখি না কেন, গাইডের হাত থেকে নিষ্কৃতি তো পাওয়া গেল। আমাদের মধ্যে দু' তিন জন ভাল ফরাসী ও জার্মান জানত, তারা খুব তরদা দিল। বেশ রোদ উঠেছে। মাথায় টুপি ছিল না; অনেকক্ষণ হেঁটে বাঙালী-মাথাটাও আপত্তি করতে লাগ্‌ল। তরুণীদের সঙ্গে রফা হ'ল যে কোন দোকানের সাজান জানালার কাছে

* ডাক্তার ওয়াটসনের মতে মানুষ একটি যন্ত্র-বিশেষ, যদিও অতি সূক্ষ্ম।

তারা এক মিনিটের বেশী দাঁড়াতে পারবে না। একটা বণিকাগ্রী দোকান থেকে সবাই স্থানীয় ছবিওয়ালা কার্ড কিনতে ব্যস্ত—যার যার বাড়ীতে চিঠি লিখতে হবে। এই ছবি-দেওয়া কার্ডগুলি একদিকে ভারি সুবিধের। লেখবার জায়গা কম, কিন্তু চিঠিটা অপূর্ণ দেখায় না, এবং মনে মনে একখানি চিঠি লেখবার ষোল আনা তৃপ্তিটুকুই হয়। লিখবার কথার জন্যও ঘণ্টা খানেক হয় না, ছবিটার নাতিদীর্ঘ বর্ণনা ক'রে দিলেই হ'ল। সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাছের বাজারে এসে পড়া গেল। ছোট ছোট ডিঙি নৌকো ক'রে সমুদ্রের মাছ নিয়ে এসেছে বিক্রী করতে। বিক্রেতারা সবাই মেয়ে—বাজারে ভিড় নেই বোটেই। অবাক্ হ'য়ে তারা আমাদের দেখছে—বিদেশী আমরা। মিরমফিট ভদ্রমহিলা নিরামিষাহারের গুণ-ব্যাখ্যায় মেতে গেলেন। সঙ্গীদের মধ্যে দু'টি নিরামিষাশী; তাঁরা সগর্বানুভূতি জানালেন। মাছের বাজার পার হ'য়ে যখন ফুল ও ফলের হাটে এসে পড়লাম তখন মিরমফিট মহিলা যেন ঈশ্বরের সৃষ্টির সীমানা দেখতে পেলেন। এখানে ইংলণ্ডের তুলনায় ফলফুলের দাম কম। সেখানেক পাকা 'চেরি' কেনা গেল। পা যখন চলতে থাকে, কথা বলতে বা শুনতে যখন ভাল লাগে না, চোখদুটো যখন যা দেখা উচিত তা দেখতে নারাজ এবং নিকটের ব্যবধান ভেদ ক'রে কোন্ দূরে চ'লে যেতে থাকে, তখন মনটা অন্যমনস্ক হবার জন্য ঐ জাতীয় কোন জিনিষ খুঁজতে থাকে। কতকগুলি বড় বড় ইমারত দেখা হ'ল। তাদের ভিতরে ও বাইরে দেখবার জিনিষ অনেক—কিন্তু এখানে লিখবার মত নয়।

ষ্টেশনে যখন ফেরা হ'ল তখন সবাই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। জিনিষ-পত্রের তদারক করতে গিয়ে দেখি আ-১-এর সহযাত্রী অনেকেই আমরা যে ট্রেনে যাব সেই ট্রেনেই যাচ্ছেন। বসবার স্থানের অভাবে সুটকেসগুলো তার স্থান অধিকার করল। 'গাইডে'র অনুরোধে 'Dologate-badge' (ডেলিগেট ব্যাজ) প'রে নিলাম।

ট্রেন এল। এঞ্জিনটা দেখতে অনেকটা ওয়াটনের তৈরী প্রথম এঞ্জিনের অনুরূপ। তৃতীয় শ্রেণীতে যাচ্ছি, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। ট্রেনটি সমুদ্রের উপকূলে নগরগুলির মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে চ'লে যায়। ধারে সমুদ্র মাঠের কিনারার আরও ঘন-সমুদ্র বন। মাঝে মাঝে ঘরবাড়ী দেখা যাচ্ছে। ডাইনে ঘন-নীল সমুদ্র। ছোট ছোট পালতোলা নৌকা; ছোট-বড় জাহাজের অভাব নেই। সমুদ্রের ওপারে সুইডেনের সীমারেখা দেখা যাচ্ছে। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকে সুইডেনের প্রান্ত মাত্র আধ ঘণ্টার পাড়ি। ছোট ছোট ষ্টেশনে থেমে থেমে গাড়ী মন্দগতিতে চলেছে। অনেক লোক উঠছে-নামছে—কিন্তু কোন কোলাহল বা ইতর ব্যস্ততা নেই। সহরের সঙ্গে এদের তফাৎ বেশ দেখতে পাচ্ছি। অথচ স্পষ্ট ক'রে বলা মুস্কিল বিশেষ তফাৎটা কোথায়। ইংলণ্ডে কালো চোখ কালো চুল চোখে পড়ে, কিন্তু এখানে সবই প্রায় সোনালি রং-এর চুল এবং নীল চোখ। প্রায় মেয়েদের অধিকাংশেরই লম্বা চুল, ফ্রকের ধরণও বেঁকেলে. হাঁটুর নীচেই পড়েছে। তাদের মধ্যে দু' একজন অসঙ্কোচ-ভাবে অবাক্ হ'য়ে বিদেশীদের দেখছে। তাদেরই অপেক্ষাকৃত চকুরা সখীর ইসারায় হঠাৎ হৈতক্লোদয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

দুপুরবেলা গাড়ী এলসিনোর পৌঁছিল। ডেনিশ কায়দায় উচ্চারণ করতে গেলে বলা উচিত 'হেলসিংগোর'। ষ্টেশনে সহরের 'বয়-স্কাউট' দল আমাদের অভ্যর্থনা করল। এখানে কাষ্টমস্ পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা আন্তর্জাতিক শিক্ষা-কন্‌গ্রেসের প্রতিনিধি, কর্তৃপক্ষ ভদ্রতা করলেন—আমাদের কোন জিনিষই খুলতে হ'লো না।

একটি এগার-বার বছরের স্কাউট্ এসে আমাকে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল। প্রত্যেক প্রতিনিধিই প্রায় একটি ক'রে স্কাউট পেয়েছেন—তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। পকেট থেকে কার্ড বের ক'রে আমার গন্তব্য বাড়ীর ঠিকানা দেখালাম। খুব সপ্রতিভভাবে হাসিমুখে অধিকাংশ ডেনিশে ও অল্প ইংরেজিতে মিশিয়ে সে যা বল্ল তার সারার্থ বুঝে নিলাম—আমায় বেশী দূর যেতে হবে না, পায় হেঁটেই যাওয়া যাবে। তার কথা শুনেই বুঝলাম, না তার ভঙ্গীতে অনুমান করলাম—তা বলা কঠিন।

ক্রমশঃ

দোসর

শ্রী সতীশ রায়

(১৪)

ছুটির দিনের দুপুরবেলায় শোফায় শুইয়া, সেফালি তাহাদের বাংলা মাসিক পত্রিকাখানি পড়িতেছিল, আর ভাবিতেছিল—অশোকদা' কেন এ বাড়ীতে আর আসেন না। এ মাসের সংখ্যায় অশোকের একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে—কবিতাটির নাম "মঙ্গল-মন্ত্র।" সেটি আজ সে অনেকবার পড়িয়াছিল,—প্রায় মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। বাংলা ভাষার প্রত্যেকটি অক্ষরের মধ্যেও যেন কত মধু আছে। সে লেখার অক্ষরগুলির উপর পরম প্রীতির সহিত চোখ বুলাইয়া, বারংবার পড়িতে লাগিল—

মঙ্গল-মন্ত্র

বল দেবি প্রিয় এ মর-জগতে কি অমর, অবিনাশী ?
ভালবাসা-ভালবাসি।
কবিরা কাহার তুলেছে বিজয় পতাকা অযোধ্যাসা ?
ভালবাসা—ভালবাসা!
কে বিনা জগৎ সমাধি-ভবন ? কারি লাগি' হেথা আসা ?
ভালবাসা—ভালবাসা !

নিখিল-জগৎ জিনিয়া লইব ফেলিয়া প্রাণের পাশা
ভালবাসা—ভালবাসা !
প্রলয়ে যখন সব লয় হবে, জাগিবে কাহার আশা ?
ভালবাসা—ভালবাসা।
সকল তীর্থ-সলিল-শ্রেষ্ঠা গঙ্গা কলুষনাশা
ভালবাসা—ভালবাসা !

মানব-মনের পরম বিরাম নির্ভরতরা বাসা
ভালবাসা—ভালবাসা।
দয়িতে, সাগরে,বন-মর্ম্মরে, নির্ঝরে, স্বরে ভাষা
ভালবাসা—ভালবাসা !

দেহের মিলনে ক্ষণিকের সুখ, অনন্ত কার আশা !
ভালবাসা—ভালবাসা !

স্বজনের নীলা-কমল চাহিছে কোন্ সূর্য্যের হাসা ?
ভালবাসা—ভালবাসা !
নির্ম্মল দীপ কবির, বিশ্ব-রহস্য-পরকাশা
ভালবাসা—ভালবাসা !
মানব-মনের ক্ষুদ্র বাঁশীতে বাজে অসীমের ভাষা
ভালবাসা—ভালবাসা !

এই বুভুক্ষা-পীড়িত ভালবাসার করুণ ক্রন্দন যে-জগতে ফুটিয়াছে তাহার কতখানি স্থান যে সে জুড়িয়া আছে, সেফালির কাছে তাহা একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। সে পত্রিকা হইতে পাতাখানি ছিঁড়িয়া লইল,—এ আর কাহারও জন্যে কবি লিখে নাই,—এ তাহার একান্ত আপনার! সে সেমিজের মধ্যে হাত চালাইয়া ছিন্নপত্রটি নগ্ন বুকের মধ্যে রাখিয়া দিল—সে যেন অশোকের হৃদ্ স্পন্দন অনুভব করিতে পারে! কিংবা হয় ত সে জানে না এ দিব্য প্রেরণা কবির মনে কে সঞ্চারিত করিয়াছে। পুরাকালে নিরক্ষর কবিদের কণ্ঠে যেমন সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হইয়া তাহাদের মনের অচিন্তিতপূর্ব্ব সঙ্গীতের ঝরণা খুলিয়া দিতেন,—সেও কি তেমনি অশোকের মনের পদ্মাসনে মূর্ত্তিমতী সরস্বতী? ভালবাসার "মঙ্গল-মন্ত্র"—অশোক কি তাহারি আবাহন-গীতি গাহিয়াছে? মেলির এমিলা ডিকেন্সি, রাস্তের বিয়াট্রিস, ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসী, ব্রাউনিংয়ের এভিলিন হোপের মত সেও কি সেই ভগবান-দত্ত দিব্য প্রেরণারূপে, যুগে যুগে, দেশে দেশে, কবিদের স্বর্গ-সঙ্গীতের আনন্দের রেশ বহন করিয়া আনিয়াছে! প্রেমের অমৃতদানে তাঁহাদিগকে দেবতাদের মত অমর

করিয়াছে! বারংবার তরার মিথ্যা ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিয়া, মৃত্যুহীন চির-যৌবনের সিংহাসনে হাত ধরিয়া বসাইয়াছে!

অশোকের জীবনে মঙ্গলের যে আনন্দ-গান বাজিতেছে—সে শেফালি! তরুণ চিত্রকর মনের পটে যে সুন্দর ছবিখানি আঁকিয়াছেন—সে শেফালি! এ কবিতাটি অশোক পত্রিকার কয়পুটে তাহাকেই অর্ঘ্যনিবেদন করিয়াছে। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া, তাহার জন্যই লেখা। মানব-জীবনের এ আনন্দবার্ত্তা সেই ত পরিবেশন করিয়া দিবার অধিকারিণী!—তা না হইলে এই পত্রিকায় অশোক লেখা পাঠাবে কেন? সে স্বার্থপরের মত কেন লেখাটি সমগ্রভাবে অনুভব করিবার জন্য বুকের মধ্যে চাপিয়া দিবে—ঐ ত এখন সাধারণের সম্পত্তি। সে বুকের মধুর উত্তাপে উষ্ণ ছিন্ন পত্রখানি বাহির করিয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

একটা সার্থকতার আনন্দে শেফালিকার বুক ভরিয়া গেল। সেদিন তাহাকে রক্ষার জন্য অশোকের রক্তাক্ত ছবি শেফালিকার মনে জাগিয়া উঠিল। সে চোখ বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। সে স্বপ্ন দেখিল—

আদিম যুগের অরণ্যাবৃত পার্ব্বত্যভূমি। বাঘের ডাকে প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে,—হরিণের বিচিত্র দেহ বনের মধ্যেকার আলো-ছায়ার ভিতর প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

তাহারই প্রতিবেশী এক যুবক—নিজের দেহাদের নেশায় মশগুল হইয়া আছে। যে গুহায় সে থাকে, তাহার প্রাচীর ঘুরিয়া সে বিচিত্র মূর্ত্তি গড়িয়াছে, লতাপাতা আঁকিয়াছে। তাহার সহিত গল্প করিবার জন্য সে প্রায়ই যায়। সে তাহার ছিন্ন বল্কল গাছের আঁশ দিয়া সেলাই করিয়া দিত।

গুহাবাসী যুবকটি বনের পুষ্প সংগ্রহ করিয়া তাহার কর্ণভূষণ করিয়া দেয়, পুষ্পমেখলা গড়িয়া ক্ষীণ কটিতে দুলাইয়া দেয়, পুষ্পহারে উন্নত বক্ষের ফুলসজ্জা করে। কিশলয়-পুষ্পে মুকুট গড়িয়া, তাহাকে পরাইয়া, মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। আপনহারা হইয়া তাহাকে ধরিতে গেলে সে ছুটিয়া পলায়—আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। জ্যোৎস্না-রাতের পূর্ণ জোয়ারে, যখন সমুদ্রের সিকতাভূমি ডুবিয়া যায়,—তখন তাহারা ডোঙা লইয়া পাশাপাশি বসিয়া কত দূরে ভাসিয়া যায়।

তখনো তাহার সৃষ্টি হয় নাই। প্রাণের ভাষা তরীর ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার সে কি আকুতি! আনন্দ জানাইবার জন্য হাসি,—আর বেদনার অভিব্যক্তি অশ্রুজল, এই দুইটির মুখ্য ব্যবহার তাহারা করিত। কিন্তু ইঙ্গিত তখন ভাষা অপেক্ষা বেশী ভাব প্রকাশ করিত!

পূর্ণিমারাত্রে কুল-কুল শব্দে যখন জোয়ার আসিত, সে-শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাইত, সে আর ঘুমাইতে পারিত না। কি এক অভাব-বোধের বেদনায়, হৃদয়দ্বারে ব্যথিত হইয়া, সে নারিকেলবনবেষ্টিত সমুদ্রতীরে একটি প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসিয়া আনমনে আনন্দ-স্ফীত জলরাশির রঙ্গক্রীড়া দেখিতে থাকে। বালুকায় ভরা তটভূমিকে গ্রাস করিবার জন্য জলরাশির কী উন্মত্ত উচ্ছ্বাস! একলা তাহার ভাল লাগে না—সে ওহার দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রতিবেশী বন্ধুর গায়ে ফুল ছুঁড়িয়া মারে—তাহার ঘুম ভাঙায়! সেও এতক্ষণ যাহাকে স্বপ্নে দেখিতেছিল, জাগরণে তাহাকে মূর্ত্তিমতী দেখিয়া আনন্দে তৃণশয্যা ছাড়িয়া লাফাইয়া ওঠে।

হাসিয়া, হাতধরাধরি করিয়া, গলাগলি হইয়া, লাজমুক্ত দুইটি আদিম প্রেমিক প্রেমিকা সেই জোয়ার-স্ফীত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কতদিন জলক্রীড়া করিয়াছে। আনন্দের পূর্ণিমা-টানে তাহাদের হৃদয়োচ্ছ্বাস যেন নদীর জোয়ার-জলকেও ছাপাইয়া উঠিত।

যুবকটি কতদিন তাহাকে ইঙ্গিতে জানাইত, "চল, আমরা ঘর বাঁধি। এমন দূর হইয়া আর থাকিতে পারি না যে!"

কিন্তু মেয়েটির মনে কি একটা অনির্দ্দেশ্য ভয় হইত। আর মনে হইত, তাহা হইলে এ পূজা, এ সব-ভোলা একান্ত মনোযোগের অবসান হইবে? ধরা দিবার পূর্ব্বে নারীর একশেষ করিয়া নিজের মূল্য যাচাই করিবার স্ত্রী-চরিত্রে যে চিরন্তন চেষ্টা, তাহা তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধা দিত। অপাঙ্গে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া মধুর ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া সে জানাইত, "না গো, না!"

বিহ্বল প্রেমিক হৃদয়াবেগে অধীর হইয়া, দুই হাত

বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিত। সে হাসিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে ছুটিয়া পলাইত।

মদমত্ত অচেতন করিয়া, প্রণয়িনীকে আত্মাধীন করিবার প্রচলিত রীতি—এই আদিম কবির সুস্থ সৌন্দর্য্য-বোধে আঘাত করিত। যাহাকে মন দিয়া ভালবাসিয়াছে, সেই কমলের মত কোমল অঙ্গে সে কেমন করিয়া ব্যথা দিবে?—সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত।

দেহ-অধিকার করিবার লোভকে জয় করিয়া মন পাইবার প্রথম চেষ্টা জগতের এই প্রথম কবিটির মনে জাগিয়াছিল। প্রতীক্ষা করিবার ধৈর্য্যের এবং সংযমেরও অভাব ছিল না। তারপর আসিল এক বিপদ, যাহাতে ভাগ্যবিধাতা দু'জনের জীবনধারাকে একখাতে বহাইয়া দিলেন।

যে গুহায় সে বাস করিত, তাহারই অনতিদূরে, পাহাড়ের উচ্চভূমি হইতে একটি ছোট নির্ঝর তরল রূপালি ধারায় ঝর্ঝর শব্দে দিনরাত করিয়া পড়িতেছে—আর কিছু দূরে গিয়া সাগরের সহিত মিশিতেছে।

সেই ঝরণার তলে বসিয়া জলের উপর সূর্য্যকিরণ-রচিত ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণবিলাস দেখিতে দেখিতে সে স্নান করিত। সেদিনও সে তেমনি স্নান করিতে আসিয়াছিল। মাঝে মাঝে একটা মধুর দমকা হাওয়া বনের ভিতর দিয়া চৈত্র-ফুলের নিশ্বাসিত গন্ধ বহন করিয়া উত্তপ্ত আগ্রহে ছুটিয়া আসিতেছিল। সে বল্কল একটি বৃক্ষমূলে ছাড়িয়া রাখিয়া, দীর্ঘ কেশ-গুচ্ছে খোঁপা চাকিয়া, নির্ঝরিণীর ধারে আসিয়া বসিল।

সূর্য্যকিরণ জলের স্বচ্ছতাকে ভেদ করিয়া রূপালি বালুকাচিত তলদেশ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছিল। সে কৌতূহলের সহিত দেখিল, বিস্তীর্ণ উপলরাশি মধ্যে নানা রংয়ের ছোট ছোট মাছ চঞ্চলভাবে ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। এত ছোট প্রাণীরও জীবনের আনন্দ দেখিয়া তাহার হাসি আসিল। তাহার অনাবৃত পেলব দেহের ছায়া সেই স্বচ্ছ জলের আরসির উপর পড়িয়া বুকের সৌন্দর্য্য-স্বপ্নের মত দীর্ঘরেখায় কাঁপিতেছিল। সে আজ সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার ক্ষীণ দেহলতা কি এক অপূর্ব্ব লাবণ্যের রসে নিটোল আঙুরের মত পুরিয়া উঠিয়াছে! বালিকা-বয়সের বাহিরের চাঞ্চল্য আর নাই,—এখন অন্তর চঞ্চল হইয়া অহরহ নূতন খেলার সাথীকে খুঁজিয়া বেড়ায়!

পীন বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া সে লজ্জিত মৃদুলজ্জে তাহার বাদামী রংয়ের দীর্ঘ কেশগুচ্ছে লালিমামণ্ডিত শুভ্র বক্ষ আবৃত করিল। তাহার মৃণাল-বাহু লীলায়িত করিয়া, সে বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রবাল দিয়া কেশ-প্রসাধন করিতে লাগিল। তারপর দীর্ঘ কেশপাশ পল্লবের মত নিতম্বে বেড়িয়া, নির্ঝরিণীর তলায় বসিয়া, গানের মত অস্ফুট আনন্দধ্বনি করিয়া সে স্নান করিতে লাগিল।

তাহার এ নির্জ্জন স্নান-লীলা আর একজন গুহাবাসী প্রৌঢ় মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিতেছিল। বৃক্ষপত্রান্তরালচ্যুত সূর্য্যকর তাহার মুখে, বুকে, অনাবৃত সিক্ত তনু-সৌষ্ঠবের কোমলতার উপরে এক অপরূপ মোহ-লাবণ্য বিস্তার করিতেছিল।

এ নরসৌন্দর্য্য-দৃশ্যে আদিম পুরুষ-তৃষ্ণা সেই দীর্ঘ শুষ্ক-পুরুষবহুল জীবনকায় গুহাবাসীকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির নিগূঢ় আকর্ষণে বৃক্ষান্তরাল হইতে নির্ঝরিণী-কূলে নামিয়া আসিল। হঠাৎ শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরশব্দে চমকিত হইয়া, তরুণী তাহাকে দেখিতে পাইয়াই নারীর সহজ সংস্কারের দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সে আর্ত্ত-চীৎকারে অরণ্যের পশুপক্ষীকে সচকিত করিয়া ছুটিয়া পলাইতে লাগিল—কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। পরক্ষণেই সে নরপশু তাহাকে আড়কোলা করিয়া তুলিয়া ধরিয়া, তাহার মুখে, বুকে, গ্রীবায় উত্তপ্ত চুম্বন দিতে লাগিল। সে আর্ত্ত-চীৎকারে হাত পা আছড়াইয়া, তাহার দাড়ি-গোঁফ ছিঁড়িয়া, তাহাকে হাত দিয়া বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই অবশদেহে অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল সে। গুহাবাসী খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় তার প্রতিবেশী তরুণ বন্য শিকার-শেষে সেই পথে গুহায় ফিরিতেছিল—কোমরে পাথরের সূক্ষ্মাগ্র ছোরা, স্কন্ধে লম্বিত ধনুঃশর। সে তাহার প্রিয়তমার সেই আর্ত্তস্বর শুনিয়া, পাগলের মত পথের বাধাবিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়া আসিল। তখন প্রৌঢ় গুহাবাসী তাহার সুখস্বপ্ন ভার নামাইয়া রাখিয়া, তুমুল যুদ্ধযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। স্ত্রী লইয়া দুই পুরুষের দ্বন্দ্ব প্রাণিজগতের চিরন্তন রীতি।

শীঘ্রই তরুণ প্রৌঢ়-শুচাবাসীর বাহুবন্ধে ধরাশায়ী হইল। তখন সেই দানব তাহার বুকে বসিয়া, গলা চাপিয়া, শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইল।

তরুণী এতক্ষণ স্তব্ধ-ভয় বশ উত্তেজনায় দেখিতেছিল। কখনো পাগলের মত লাফাইয়া, চীৎকার করিয়া যুবককে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার পরিণাম দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। প্রতিবেশী যুবককে সে যে কত ভালবাসিত এতক্ষণে তাহা যেন বুঝিতে পারিল। সে পাগলের মত দুইজনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, চকিতে যুবকের কোমর হইতে ছোরা খুলিয়া তাহার উদ্দেশ্য অনুমান করিবার পূর্ব্বেই প্রণয়ীর আততায়ীর কণ্ঠে সজোরে বসাইয়া দিল।

আহত জন্তুর মত যন্ত্রণায় বিকট একটা আর্ত্তনাদ করিয়া, সে একটা পাথরের উপর পড়িয়া গেল। তাহার দেহভারে পাথরটি স্থানচ্যুত হওয়ায় গড়াইতে গড়াইতে বহুদূর নিম্নে একটা খাদের মধ্যে সে অন্তর্হিত হইল।

তখন সেই নারী হতজ্ঞান যুবকটির পাশে বসিয়া, তাহার ক্ষতস্থানের রক্ত হাতে করিয়া তুলিয়া করুণ নয়নে দেখিতে লাগিল—আকুল স্বরে কাঁদিতে লাগিল; তাহার মাথাটি কোলে করিয়া তাহার কপালে মুখে চুম্বন করিল! করুণায় বক্ষল ভিজাইয়া তাহার মুখে-চোখে-মাথায় জল দিতে লাগিল। ক্ষতস্থানের রক্তলেখা সিক্ত বক্ষলে মুছাইয়া দিল। খানিকক্ষণ পরে যুবকের চেতনা হইল,—চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল যে সে তাহার প্রিয়ার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে।

তাহার চোখ-মুখের বিস্ময় যেন বলিল, "আমি কি স্বর্গে গিয়ে, দেববালার কোলে মাথা রেখে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম! দানবটা ত আমাকে মেরেই ফেলেছিল!"

তরুণীর সাধনাময় স্মিতহাস্য বলিল, "এই ত আমরা একসঙ্গে আছি,—যমের সাধ্য কি আমাদের বিচ্ছিন্ন করে!"

সে তাহার অধরোষ্ঠে ওষ্ঠ স্পর্শ করিল। যুবকটির আনন্দিত হাসি যেন বলিল, "তোমার ও অধরের অমৃত পেলে মৃতও প্রাণ পায়,—আমি ত মাত্র অজ্ঞান হ'য়েছিলাম।"

তরুণীর চোখের কৌতুকস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে হাসি ভরিয়া উঠিল, বলিল, "তাই না কি?"

তখন যুবকটি ধীরে ধীরে উঠিয়া সস্নেহে তার কপোলের উপর একটি মৃদু চুম্বন দিল—যেন তখনো তাহার স্নেহের স্নিগ্ধতা প্রেমের অলোককে দ্বিপ্রহরের দীপ্তজ্বালায় পরিণত হইতে দেয় নাই। যুবতী পুলকিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর যেন কিছুই হয় নাই—এইরূপে তাহারা পরস্পরের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া এক গুহায় ফিরিল

"ও দিদি!—দিদি ভাই! বেলা প'ড়ে গেল এখনো ঘুমোচ্ছিস্? ঘুমের ঘরবাড়ী দেখ্‌ছিস্ না কি!—ওঠ্, মা তোকে চা খেতে ডাকছেন্ যে!"

পাতুর কণ্ঠস্বরে শেফালি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ঘামে তাহার সমস্ত শরীর একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে,—উত্তেজনায় মাথার শিরা দব্‌দব্ করিতেছে।

(৫)

সন্ধ্যা। সেদিন নিজের উপর যত না রাগ করিয়াছিল তত বিরক্ত হইয়াছিল। কেন সে অন্নপূর্ণার কথায় রাজি হইয়া শেফালিকে ইডেন্ গার্ডেনে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিল? আর ঐ মোহের পুতুলের জন্যই ত এতসব হাঙ্গামা ঘটিল; মেয়েদের সঙ্গ সঙ্গীবের মত বিষ লাগিত, তাতই সে নিজের কাছে তাহা প্রবলভাবে অস্বীকার করিবার যুক্তি খুঁজিত। অন্নপূর্ণার যত্ন-অভ্যর্থনা তাহার অভ্যস্ত গায়ে-পড়া বলিয়া বোধ হইল। আর শেফালিকার আচরণের ভিতর সে এমন কিছু খুঁজিয়া পাইল না, যাহাতে সে উৎসাহিত হইতে পারে।

এতদিন তাহার মধ্যে যে ভালবাসা পাইবার আকাঙ্ক্ষা সুপ্তভাবে ছিল, শেফালির অবহেলার আঘাতে তাহা যেন সজাগ হইয়া উঠিল।

মেডিকেল কলেজে, সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে সে ইন্দুলেখার সঙ্গ পাইত। এক একদিন সে অত্যন্ত মনযোগের সহিত কোনো একটি দুরূহ জটিল বিষয়ে প্রফেসরের বক্তৃতা অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িত ইন্দুলেখার দিকে। দেখিতে পাইত সে একাগ্র-দৃষ্টিতে তাহার দিকেই চাহিয়া আছে—চোখাচোখি হওয়ায়

সে অপ্রতিভ হইয়া চোখ নামাইত। চোখের সেই আকুল দৃষ্টিতে যেন তাহার নিবেদিত হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত!

সে মাঝেমাঝে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিত, তাহার পেন্‌সিল, নামলেখা খাতা, পেন-নাইফ, কেমন করিয়া যেন ইন্দু-লেখার সহিত অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। সে বিরক্ত হইত—তাহার উদ্দেশ্য কি বুঝিত না—অথচ জিনিষগুলি ফিরিয়া চাওয়া নিজের কাছে অভদ্রতাবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইত। সেই অনিচ্ছাকৃত দানই ইন্দুর যেন স্মৃতির সম্বল ছিল সন্দীবের স্বহস্তে নাম-লেখা খাতাটি সে তাহার টেবিলের ড্রয়ে রাখিয়া দিয়াছিল। আর অবসর-সময়ে সুদৃষ্টিতে তাকাইয়া সেই হাতের লেখার টানের মধ্যে সন্দীব প্রাণ অনুভব করিত!

ইন্দুলেখা এক একদিন হঠাৎ কাছে আসিয়া বলিত, "আমি কাল কলেজে আসিনি—কালকের নোটটা আমায় দিতে পারেন কি?"

সন্দীব হাসিয়া বলিত, "স্বচ্ছন্দে—এই নিন।" বলিয়া সে তাহার নোটটি তাহার হাতে দিত। সেও এমনি ব্যস্তভাবে লইত—যেন এই একদিনের অনুপস্থিতিতে তাহার অনেকটা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, তাহা পূরণ করা অত্যাবশ্যক।

Practical class-এ সে যাচিয়া সন্দীবের সহযোগী হইত। সমস্ত দিনের মধ্যে কেবল নানা কাজের ছল খুঁজিয়া সে তাহার চারিপাশে অনমনাভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। সন্দীব কোনোদিন একটু হাসিয়া কথা বলিলে ইন্দু যেন একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইত! একজন যে তাহাকে এতখানি প্রীতির চক্ষে দেখে তাহা হৃদয়ের সূক্ষ্ম সহানুভূতির অভাবে সে কোনদিন বুঝিতে পারে নাই। আর, এতদিন পর্য্যন্ত ভালবাসার সহানুভূতিটুকু তাহার প্রাণেই জাগে নাই।

কিন্তু শেফালির অবহেলার আঘাতে তাহার এই নূতন মনোভাব হঠাৎ কুম্ভকর্ণের মত দুঃসহ ঘুমঘোরের কথা লইয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। নারীকে সে এতদিন ফিজিওলজির দিক দিয়া বৈজ্ঞানিকের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে;—তাহার অন্তরালে যে এক আশা-আকাঙ্ক্ষাভরা মানুষের জীবন্ত মন আছে, ইন্দুলেখার মধ্যে তাহা যেন সে নূতন করিয়া অনুভব করিতেছিল।

সকলকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার প্রতি সমস্ত মনোযোগ দিয়া এই মেয়েটি তাহার সঙ্গ-কামনা করে—সন্দীবের উদাসীন দৃষ্টি দিন দিন পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল। বিশেষ করিয়া সেদিন তাহার কোনো একটি সহপাঠী বন্ধু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, "বেশ আছ ভাই সন্দীব! তোমার উপর আমাদের হিংসা হয় কিন্তু।"

সন্দীব আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তার মানে?"

"—এই নীরস শরীর-তত্ত্বের ভিতর যদি তোমার মত একটু সরস মনস্তত্ত্বের আমদানী করতে পারতাম তা হ'লে জিনিষটা অনেক পরিমাণে মুখরোচক হোত!"

সন্দীব অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "হেঁয়ালী আমি কোনকালেই বুঝতে পারি না। আমি সোজা কথার মানুষ তা' ত জান। এখন কি বলতে চাও সোজা বাঙ্‌লায় বল।"

বন্ধুরা সকলে এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন সময়ে ইন্দুলেখা আসিয়া পড়ায় সহসা তাহারা একেবারে চুপ করিয়া গেল। ইন্দুলেখা ডাকিল, "সন্দীব বাবু! শুনুন!"

সন্দীব সকলের কাছে নিজেকে রহস্যের উপাদান হইতে দেখিয়া, কারণটা যে ইন্দুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা—তাহা খানিকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। অগ্রসর হইয়া বলিল, "কি বলছেন"

একজন বলিয়া উঠিল, "আহা যান না মশায়! আপনার সঙ্গে কি private কথা আছে, সকলের সাম্‌নে তা' বলবেন কি ক'রে?"

অধিকাংশের মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটিতে ফুটিতে ভদ্রতাবোধের কথা স্মরণ হওয়ায় তখনি মিলাইয়া গেল। ইন্দুলেখা লোকটার অভদ্রতায় বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে রোষদীপ্ত তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সন্দীবও তাহার অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর দেখিল না।

ইন্দু মনে মনে আশ্চর্য্য হইল। আজ সন্দীবের সহিত সহজভাবে কথা বলিতে তাহার যেন কেমন বাধ-বাধ ঠেকতেছে! নিজের অন্তরের এ দুর্ব্বলতার আভাস পাইয়া সে লজ্জিত হইল। কলেজের এক নিভৃত অংশে সন্দীবকে

ডাকিয়া আনিয়া ইন্দুলেখা বলিল, "সঞ্জীববাবু! আমার দুর্ভাগ্য যে আমি মেডিকেল কলেজে পড়তে এসেছিলাম। এখানে আমার একজন বন্ধুও নেই, যার সঙ্গে আমি অবসর-সময়ে দুটো কথা বলবার অধিকার পেতে পারি। পুরুষেরা কি এত নীচ যে বন্ধুত্বের বন্ধনকেও সন্দেহের চোখে দেখে?" অপমানের বেদনায় তার চোখ অশ্রুসজল এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত বোধ হইতেছিল।

সঞ্জীব বাধিত হইয়া বলিল, "আপনি বড় sensitive! ওদের কথায় কান দেন কেন? They are a pack of nonsense!"

ইন্দুলেখা বিনাইয়া বলিল, "আপনারা পুরুষমানুষ; ওরকম ব্যাপারকে আপনারা হাল্কা ভাবে নিতে পারেন। আমাদের বিষয়ে এ রকম পরিহাসের আভাসমাত্র যে দোষের কথা হয়!"

ইন্দুলেখার বয়স বেশী নয়—প্রায় সঞ্জীবেরই সমবয়সী। কিন্তু এ বয়সে সে অনেক কিছু দেখিয়াছে, নানাপ্রকৃতির লোকের সহিত মিশিয়াছে। এ বিষয়ে তার স্বাধীনতা—ঘরে কোনো স্ত্রী-অভিভাবিকা না থাকার দরুনই হোক্, আপন-ভোলা হরমোহনের স্বাধীন মত-বাদের জন্যই হোক—সচরাচর ব্রাহ্ম-মেয়েদের চাইতে অনেক বেশী। সেইজন্য তাহার জীবনের অভিজ্ঞতা বয়সের নবীনতাকে ছাড়াইয়া যাইত।

সঞ্জীব তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, "ও কথা থাক্। আজ আর কলেজের lecture attend ক'রে কাজ নেই; সে রকম important ও কিছু নেই, চলুন, কাছাকাছি কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসা যাক্।"

ইন্দুলেখা খুশী হইয়া উঠিল, বলিল, "কোথায় যাওয়া যায় বলুন ত?"

"আপনি একটা নাম করুন।"

"বোটানিকেল গার্ডেন—"

"আপনি গরম কাপড় কিছু নিয়ে আসেননি ত? বিকেলের দিকে ঠাণ্ডা পড়বে যে।"

"বিকেলের দিকে ফিরে আসব 'খন! চলুন, লোকের ছোট কথা আর ভালো লাগে না,—প্রকৃতির নির্জনতার মধ্যে তার চিরকালের উদার বাণীটি শুনতে ইচ্ছা করে।" ইন্দুলেখা এক মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সঞ্জীব হাসিল—মানুষের মনের এই উচ্ছ্বাসময় দিকটা সে কোন দিন দেখিতে পাইত না। কবিত্ব তাহার কাছে মানুষের জীবনে অনাবশ্যক এবং কথার অলঙ্কার বলিয়া মনে হইত। বলিল, "আচ্ছা বেশ, তা হ'লে চলুন।"

নানা যাত্রীর ওঠানামার ব্যস্ততায়, গঙ্গার স্নিগ্ধ হাওয়ায়, দৃশ্যের বিচিত্রতায় তাহাদের মন শীঘ্রই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ইন্দুলেখার অন্তরের নিভৃত অংশে যে গোপন কথাটি নিজের অজ্ঞাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, সেই রহস্যলোকের পর্দাখানা যেন বন্ধুত্বের পরিহাসে সহসা উড়িয়া গিয়াছিল। নিজের মনের কাছে যাহা ইঙ্গিতমাত্র ছিল তাহা হঠাৎ স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম-প্রেমের নিভৃত কেবিনে তাই যখন তাহারা গিয়া পাশাপাশি বসিল তখন যদিও তাহার আনন্দের অবধি ছিল না, তবুও কেমন যেন পুলকময় লজ্জার গায়ে কাঁটা দিতেছিল! বাগানে তাহারা অনেকক্ষণ পাশাপাশি ঘুরিয়া বেড়াইল। চারিদিক নির্জন নিস্তব্ধ। কচিৎ দু'একটা কাঠঠোক্রা পাখী ডাকিতেছে—তাহাও যেন নির্জনতার কণ্ঠস্বর! বাঘ-বিড়ালী পিঠে লেজ তুলিয়া গাছের গায়ায়, মাটিতে দৌড়া-দৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছে। আর বৃক্ষশাখে, সরোবরে, বাগানের চারিদিকে প্রাণচঞ্চল, মূক কীট-পতঙ্গের রহস্যময় নিঃশব্দ জীবনযাত্রা—যাহা কেবল অনুভব করিলে বুঝিতে পারা যায়।

বৃক্ষপত্রনিবিড় বীথিকার পথে তাহারা ফুল-পালানো বালকবালিকার মত হাল্কা ভাবে হাসিয়া, গল্প করিয়া, সারাদুপুর ঘুরিয়া বেড়াইল।

"আপনি" সম্বোধন আপনাকে ধরা দেওয়ার পথে বড় বাধা দেয়। তাহাদের কথাবার্তার মধ্যে আর সে ব্যবধান ছিল না।

নারী যখন পুরুষের অনুরাগিণী হয়, তখন পুরুষের পক্ষে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা বিশেষ শক্ত। বিশেষতঃ যৌবন যখন দেহমনে বাসনার আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে!—তখন সে যুক্তির অনল-শিখায় যে-কোনো ইন্ধন-আহুতি অগ্রাহ্য করা পুরুষের ক্ষমতার বাহিরে। উদ্দাম রৌদ্রে

ঝলমল করা গঙ্গার উপরে কত পানসি ভাসিয়া যাইতেছে। সেই দিকে উদাস-দৃষ্টিতে চাহিয়া দুইজনে বসিয়াছিল। সঞ্জীব অস্বস্তিভাবে হাতের উপর ভর দিয়া বসিয়া—তাহার চোখের কালো তারাটি কখনো প্রবাহিতা গঙ্গার উপরে, কখনো বা ইন্দুর মুখের উপরে মুগ্ধ ভ্রমরের মত উড়িয়া বসিতেছিল। যদিও ইন্দুর বৈচিত্র্যহীন মুখের সৌন্দর্য্যে কোনো ঝরনা ছিল না, তথাপি উত্তপ্ত যৌবন-মোহের মাদকতায় তাহা সঞ্জীবের কাছে মনোরম বোধ হইতেছিল।

সে কি ইহা বলিয়াছিল? না, সন্দেহ হয়! মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা যেন কথার মূর্ত্তি ধরিয়া চুপি চুপি বাহির হইয়া আসিয়া, প্রস্ফুটিত ফুলটির কানে রহস্যভরা প্রণয়-গুঞ্জনের মত বিহ্বলভাবে বলিল, "ইন্দু! একটা জিনিষ আমাকে দেবে?"

ইন্দুলেখা কি যেন একটা তন্ময় ভাবনা হইতে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কি?"

হাতখানি তাহার নিজের অজ্ঞাতে সঞ্জীবের হাতের মধ্যে কখন কুণ্ঠাপ্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখীর মত লুকাইয়া ছিল। সঞ্জীব বলিল, "চেয়ে নিলে তার মর্য্যাদা অর্দ্ধেক ক'মে যায় ইন্দু! না চেয়ে পেলেই পাওয়ার আনন্দ পুরাপুরি থাকে।

ইন্দুর শ্যামল পল্লবের মত মুখশ্রী কিশলয়ের মত আরক্তিম হইয়া উঠিল! কিন্তু সে জানে না সে কেমন করিয়া সে একথা বলিল, "কিন্তু চাইবার আগে যে নিজের থেকে নিতে পারে—এ জিনিষ তার। আর যার কাছে থেকে নেয়, তার মনের গোপন বাসনারও আনন্দের অবধি থাকে না!"

আর একটি মিনতিকরুণ স্বর বলিল, "সে ত শুধু নেওয়ার সুখ ইন্দু! পাওয়ার আনন্দ ত তাতে কিছুই নেই। নেওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে অনেকখানি সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে। কেবল নিতে গেলে পাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'তে হয় যে!"

এ কি সঞ্জীব বলিতেছে? আশ্চর্য্য! কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য্য, ইন্দু কেমন করিয়া সহজে বলিয়া বসিল, "পুরুষের নেওয়াই ত মেয়েদের পাওয়া।" সত্য মানুষের মুখে এ কিরকম আদিম প্রণয়-জ্ঞাপন? কিন্তু মনের সেই অনাড়ম্বর আদিম সরলতা সময়ে সময়ে যে চিরন্তন শিশু দেবতার মুখে হারিয়াবিহীন ছেলেমানুষের কথার মত বাহির হইয়া আসে তাহা ত আমরা লক্ষ্য করি না!

সঞ্জীব আকুল হইয়া, তাহার করতলগত ইন্দুলেখার হাতখানি নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "পুরুষের কি কোনো পাওয়ার দাবী-দাওয়া থাকতে পারে না ইন্দু!"

ইন্দু ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি সরাইয়া লইয়া, কথার সুর ফিরাইয়া, বালিকাসুলভ হাসিয়া বলিল, "ওকথা এখন থাক্। আসুন, আমরা লুকোচুরি খেলি—কেমন? আচ্ছা আমায় ধরুন ত!—যেমি কেমন ধরতে পারেন? ঐ গাছটা বুড়ি।" বলিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের লুকোচুরি খেলার মত সে দৌড়াইয়া দূরের একটি গাছের আড়ালে লুকাইল। তাহারা যে পূর্ণবয়স্ক—সে কথা যেন সেদিন ভুলিয়া গিয়াছিল। গাছের পাতার ছায়া নদীর জলে কাঁপিতেছে,—দূরে অপরাহ্নের উদাস আলোকে মৃদু বাতাসে ছোট নৌকা পাল মেলিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে যেন পূর্ণতার আবেগ।

সঞ্জীব তাহার পিছু পিছু ছুটিল। গাছের আড়ালে, পথের বাঁকে খানিক দৌড়াইয়া সে তাহাকে ধরিল। কোমরে আঁচল জড়ানো, খালি পায়ে দৌড়াদৌড়ি দৌড়াইবার উত্তেজনায় আরক্ত, বিস্রস্ত কৃষ্ণ অলকে ঘেরা ইন্দুর স্নেহবিন্দুশোভিত হাসি-অশ্রুভরা মুখশ্রী আজ সঞ্জীবের কাছে অপরূপ বোধ হইতেছিল। ছুটাছুটির জন্য দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্থানপতনের আবেগে ইন্দুর বুক আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছিল। সঞ্জীব আত্ম-হারা হইয়া পড়িল।

"তারি অদ্ভুত তুমি! বাইরে দেখতে তুমি যেন কত বড় হ'য়েছ, মনের মধ্যে এখনো কিন্তু সেই ছোট মেয়েটি আছ!"

ইন্দু সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "চল, ঐ পুকুরের ধারে বেঞ্চটির উপর গিয়ে বসি।"

দু'জনের মধ্যে এখন আর কোনো অন্তরাল ছিল না। ইন্দু সঞ্জীবের বাহুতে হাত রাখিয়া, চপলভাবে হাসালাপ করিতে করিতে বেঞ্চে গিয়া বসিল। এই গম্ভীর মেয়েটির

ভিতরে যে এতখানি চপলতা লুকাইয়া থাকিতে পারে, সঞ্জীব তাহা কোনোদিন ভাবে নাই! কিংবা হয় ত সে মেয়েদের সঙ্গে বেশী মেশে নাই বলিয়া, তাহাদের আত্ম-গোপন নিপুণতার সহিত তেমন পরিচিত ছিল না।

সঞ্জীব বলিল, "আমাকে এমন কিছু একটা জিনিষ দাও ইন্দু! যেন এই দিনটার স্মৃতি চিরদিন আমার মনের ঘরে রঙীন পেলনা হ'য়ে থাকে।"

ইন্দু বলিল, "তোমাদের চঞ্চল মনের স্থিরতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে! এত বিভিন্ন দিকে যে উড়ে বেড়ায়—বাসা বাঁধা তার ধর্ম নয়।"

মেয়েদের মন পুরুষের কাছে এক চিরন্তন প্রহেলিকা! বারবার সেই চপল খেলাটি দুই মিনিট পূর্বে যে ইন্দু খেলিয়াছিল, এ গম্ভীরা ইন্দু ত সে হাস্যচপলা ইন্দু নয়—এ যেন আর একজন!—প্রতিদিনের বাস্তব জীবনযাত্রার একমুহূর্তে সে ফিরিয়া আসিয়াছে। সঞ্জীব আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছিল,—মেয়েরা এত আত্মভাব-গোপন-নিপুণ।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দুলেখা বলিল, "আজ আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি—তার অনুরূপ এমন কিছু keepsake আমি খুঁজে পাচ্ছি না যা দিলে সে দানের প্রকৃত সম্মান রক্ষা হয়।"

"জিনিষের কি কিছু দাম আছে ইন্দু! দেওয়াই ত দাম।" কথাটা সঞ্জীব হরমোহনবাবুর কাছ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল।

ইন্দু মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি যদি তাই সত্যি মনে করেন—তা হ'লে এই নিন্!"

বলিয়া, মাথার খোঁপা হইতে একটা চুলের কাঁটা খুলিয়া, আঙুলের চাপে বাঁকাইয়া সেটাকে সে একটা আংটির মত করিয়া সঞ্জীবের আঙুলে পরাইয়া দিল।

সঞ্জীব কণ্ঠে একটু উচ্ছ্বাস আনিয়া বলিল, "পৃথিবীর কোনো খনিতে এমন কিছু ধাতু নেই, যা তোমার এই লোহার তারের আংটির চেয়ে আমার কাছে বেশী মূল্যবান হ'তে পারে! পরশপাথর ছোঁয়ালে লোহা সোনা হয় শুনেছি,—কিন্তু সোনা এর কাছে সামান্য জিনিষ, প্রাণহীন!"

এই বলিয়া নত হইয়া তাহার করগত ইন্দুর সেই আঙুলটির উপর সে একটি আবেগময় চুম্বন করিল।

কি এক অজানা আনন্দ-শঙ্কায় শিহরিয়া ইন্দুলেখার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে বাম হাত বুকে রাখিয়া—দেবী যেমন করিয়া ভক্তকে বর দেন, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে ডান হাত-খানি আনত সঞ্জীবের ভ্রান্তমদন চুলের উপরে সস্নেহে বুলাইতে লাগিল।

মহিমাময়ীর মত প্রেম-করুণা-ভরা দৃষ্টিতে সে তাহার পানে চাহিয়া রহিল—সঞ্জীব মুখ তুলিলে দেখিতে পাইত যে ইন্দুর চোখদুটি যেন সুদূর নক্ষত্রলোক হইতে তাহার পানে তাকাইয়া আছে!

বাউল গান

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল-পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল-দলের সঙ্গে আমার সর্ব্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা চ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল-সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স,—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,

"কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশ বেড়াই ঘুরে।"

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, "তং বেদাং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"—যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম, তার খেয়ো সুরে, সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। "অন্তরতর যদয়মাত্মা" উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন "মনের মানুষ" ব'লে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেককাল পরে...এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোক-সাহিত্যে এমন অপূর্ব্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করিনে।

সকল সাহিত্যে যেমন লোকসাহিত্যেও তেম্‌নি, তার ভালমন্দের ভেদ আছে। কবির প্রতিভা থেকে যে রসধারা বয়, মন্দাকিনীর মতো অলকালোক থেকে সে নেমে আসে; তারপর একদল লোক আসে যারা খাল কেটে সেই জল চাষের ক্ষেতে আন্‌তে লেগে যায়। তারা মজুরি করে, তাদের হাতে এই ধারার গভীরতা, এর বিশুদ্ধতা চ'লে যায়, কৃত্রিমতায় নানাপ্রকারে বিকৃত হ'তে থাকে। অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমৃলতা চলে গেছে, তা চলতি হাটের সস্তা দামের জিনিষ হ'য়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা-তুলনার দ্বারা আকীর্ণ,—তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগ্যধর্ম্মে টানবার প্রচারকগিরি। এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিষের পরিমাণ বেশী হওয়া অসম্ভব,

খাঁটির জন্যে অপেক্ষা করতে ও তাকে গভীর ক'রে চিন্‌তে যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এইজন্যে কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চল্‌তে থাকে। এইজন্যে সাধারণতঃ যে-সব বাউলের গান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কি সাধনায় কি সাহিত্যের দিক্ থেকে তার দাম বেশী নয়।

তবু তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অর্থাৎ এর থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতবর্ষীয় চিত্তের যে একটি বড় আন্দোলন জেগেছিল সেটি মুসলমান অভ্যাগমের আঘাতে। অন্য হাতে বিদেশী এলো, তাদের সঙ্গে দেশের লোকের মেলা হোলো কঠিন। প্রথম অসামঞ্জস্যটা বৈষয়িক অর্থাৎ বিষয়ের অধিকার নিয়ে, স্বদেশের সম্পদের ভোগ নিয়ে। বিদেশী রাজা হ'লেই এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মুসলমান শাসনে সেই বিরুদ্ধতার তীব্রতা ক্রমশঃই ক'মে আস্‌ছিল কেন না তারা এই দেশকেই আপন দেশ ক'রে নিয়েছিল, সুতরাং দেশকে ভোগ করা সম্বন্ধে আমরা পরস্পরের অংশীদার হ'য়ে উঠ্‌লুম। তা ছাড়া, সংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মগত জাতিতে মুসলমান। সুতরাং দেশকে ভোগ করবার অধিকার উভয়েরই সমান। কিন্তু তীব্রতর বিরুদ্ধতা র'য়ে গেল ধর্ম্ম নিয়ে। মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল থেকেই ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্য-প্রচারে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয়-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমস্যা যতই কঠিন ততই পরমাশ্চর্য্য তাঁদের প্রকাশ। বিধাতা এম্‌নি ক'রেই দুরূহ পরীক্ষার ভিতর দিয়েই মানুষের ভিতরকার শ্রেষ্ঠকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে আনেন। ভারতবর্ষে ধারাবাহিক ভাবেই সেই শ্রেষ্ঠের দেখা পেয়েছি, আশা করি আজও তার অবসান হয়নি। যে-সব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হ'য়ে পড়েছে, সেইসব চিত্তে সেই সম্মিলনের ভারতবর্ষের যথার্থ মানব-তীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেই সব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদূ, রবীদাস, নানক প্রভৃতির চরিত্রে এইসব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রইল। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্ত্তা মিলিতকণ্ঠে ঘোষণা করেছে।

আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্যদেশের ঐতিহাসিক স্থলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন ক'রে এসেছে। বাউল-সাহিত্যে বাউলসম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ মিলিত হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্য্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে-বিরোধে বর্ব্বরতা। বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা স্কুলকলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ ক'রে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল-গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। ...আমি তার অন্তর্নিহিত করি,—সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার ক'রে না, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানব-চিত্তের যে তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধ'রে আপন সত্য রক্ষা ক'রে এসেছে তারই পরিচয় লাভ করব এই আশা ক'রে।

ভূমিকা—"হারামণি"

খেলা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

নিশান দৌড়—এই খেলা দুই বা ততোধিক দলে চলিতে পারে। খেলোয়াড়দের অবস্থিতি ঠিক "বেঙ্‌চলা" খেলার মত। খেলোয়াড়দের সম্মুখে ১৫ হইতে ২০ গজ দূরে যে সীমা-রেখা থাকিবে তাহার উপর প্রত্যেক দলের ঠিক সোজাসুজি এক একটি নিশান, তদভাবে লাঠি প্রোথিত থাকিবে, যদি লাঠিও না পাওয়া যায় তবে এক একটি ছেলে দাঁড় করাইয়া রাখিলেও চলে; মধ্যস্থের বংশীধ্বনি বা অন্য সঙ্কেতমাত্র ১নং খেলোয়াড়গণ দৌড়াইয়া সম্মুখের নিশান বা আর যাহা থাকে তাহা ঘুরিয়া আসিয়া ২নং খেলোয়াড়দিগকে স্পর্শ করিবে, এবং পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইবে। ২নং খেলোয়াড়গণ ঐরূপে ঘুরিয়া আসিয়া ৩নং খেলোয়াড়দিগকে স্পর্শ করিবে। এই ভাবে প্রত্যেক দলের শেষসংখ্যক খেলোয়াড়দের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভ-রেখা স্পর্শ করিতে পারিবে তাহার দল জয়ী হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী খেলোয়াড় ঘুরিয়া আসিয়া স্পর্শ করার পূর্ব্বে কেহ আরম্ভ-রেখা ত্যাগ করিতে পারিবে না, কিন্তু সম্মুখের খেলোয়াড় রওয়ানা হইলে পরবর্ত্তী খেলোয়াড়গণ একপদ অগ্রসর হইয়া আরম্ভ-রেখার উপর আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

দাদুরী—এই খেলা পূর্ব্ব খেলারই রূপান্তর মাত্র, কিন্তু সমস্ত খেলোয়াড়ের সমান পরিশ্রম হয়—কাজেই অধিকতর উপকারী। সমস্ত দলের বিজোড়সংখ্যক খেলোয়াড়গণ সামনে দাঁড়াইবে, এবং জোড়সংখ্যক খেলোয়াড়গণ তাহাদের পিছনে দাঁড়াইবে। মধ্যস্থের সঙ্কেতমাত্র সামনের খেলোয়াড়গণ হাত মাটিতে লাগাইয়া হাঁটু ভাঙিয়া পড়িবে এবং পিছনের খেলোয়াড়গণ তাহাদিগকে লাফাইয়া পার হইয়া ৪ পা যাইয়া ঐরূপভাবে পড়িবে। তখন পূর্ব্বে যাহারা পড়িয়াছিল তাহারা উঠিয়া উহাদিগকে লাফাইয়া পার হইয়া ৪ পা অগ্রসর হইয়া পূর্ব্ববৎ পড়িবে; এই ভাবে একবার জোড়সংখ্যকগণ পড়িবে, বিজোড়সংখ্যকগণ পার হইবে; অন্যবার বিজোড়সংখ্যকগণ পড়িবে, জোড়সংখ্যকগণ পার হইবে; এইভাবে পড়িয়া-উঠিয়া যে দলের অধিকসংখ্যক খেলোয়াড় পূর্ব্বে সম্মুখের সীমারেখা অতিক্রম করিবে সেই দল জয়ী। খেলোয়াড়দের বয়স ও শক্তি দ্বারা দৌড়ের পাল্লা নিরূপিত হইবে।

অঙ্গভঙ্গ—প্রত্যেক দল একজনের পিছনে আর একজন এই ভাবে 'কাইল' করিয়া দাঁড়াইবে। মধ্যস্থ 'প্রস্তুত' বলিতেই সকলের পিছনের খেলোয়াড়গণ ছাড়া আর সকলে মাথা নীচু করিয়া দুই হাতে হাঁটুতে ভর করিয়া দাঁড়াইবে। পশ্চাদ্বর্ত্তী খেলোয়াড়গণ তাহাদের নিজ নিজ সম্মুখের খেলোয়াড়ের পিঠের উপর হাত দিয়া দাঁড়াইবে। তারপর মধ্যস্থের সঙ্কেতমাত্র পিছনের খেলোয়াড়গণ

অন্যান্য খেলোয়াড়গণের পিঠে ভর করিয়া তাহাদের উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে সম্মুখে আসিয়া অন্যান্য খেলোয়াড়ের ন্যায় নীচু হইয়া পড়িবে এবং তখনকার পিছনের খেলোয়াড় আবার ঐরূপ লাফাইতে লাফাইতে সামনে আসিয়া পড়িবে। এইরূপভাবে প্রত্যেক খেলোয়াড় লাফাইতে লাফাইতে অগ্রসর হইবে। যে দলের খেলোয়াড় সর্ব্বপ্রথমে সীমারেখায় পৌঁছিতে পারিবে তাহারা জয়ী।

বেঙ্‌চল্লা—দুই বা ততোধিক দলে খেলা চলিবে। প্রত্যেক দলে ৬।৭ জন খেলোয়াড় থাকিবে। প্রত্যেক দলের ১নং সামনে এবং তার পিছনে পর পর ২।৩ করিয়া অন্যান্য খেলোয়াড় দাঁড়াইবে। দুই দলের মধ্যে অন্যূন ২ গজ ফাঁক থাকিবে। ১নং খেলোয়াড়গণ যে লাইনে দাঁড়াইবে তাহার ২০ গজ পরিমাণ দূরে একটি সীমা-রেখা থাকিবে। সেই রেখার একপার্শ্বে মধ্যস্থ দাঁড়াইবেন। খেলোয়াড়গণ প্রস্তুত হইলে মধ্যস্থ সঙ্কেত করিবেন। তখন ১নং খেলোয়াড়গণ ৩ পা অগ্রসর হইয়া হাঁটু ভাঙিয়া পড়িবে এবং ২নং খেলোয়াড়গণ অগ্রসর হইয়া তাহাদের উপর দিয়া লাফাইয়া ৩ পা আসিয়া ঐরূপ হাঁটু ভাঙিয়া পড়িবে এবং ৩ নং খেলোয়াড়গণ পূর্ব্ববৎ লাফ দিয়া তাহাদের সামনে আসিয়া পড়িবে। এইরূপে শেষ খেলোয়াড়গণ তাহাদের দলের অন্যান্য সব খেলোয়াড়কে ডিঙাইয়া দৌড়াইয়া সম্মুখের সীমারেখায় আসিবে। যে দলের শেষ খেলোয়াড় প্রথমে সীমারেখায় আসিতে পারিবে তাহারা জয়ী।

গুটিকা—এই খেলা দুই-তিন বা ততোধিক দলে চলিতে পারে। খেলোয়াড়দের অবস্থিতি ঠিক "বেঙ্‌চল্লা" খেলার মত। খেলোয়াড়দের সম্মুখে ১০ বা ১৫ গজ দূরে যে সীমারেখা আছে, তাহার উপর প্রত্যেক দলের জন্য এক একটি টুপী বা ঝুড়ি, তদভাবে এক একটি বৃত্ত আঁকিয়া রাখিতে হইবে। সীমারেখার বাহিরে একটির পর একটি করিয়া প্রত্যেক দলের জন্য ৬টি ছোট বৃত্ত আঁকা থাকিবে এবং প্রত্যেক বৃত্তের মধ্যে একটি করিয়া মাটির অথবা পাথরের গুটিকা অথবা আলু থাকিবে। মধ্যস্থের সঙ্কেত-মাত্র ১নং খেলোয়াড়গণ দৌড়াইয়া যাইবে এবং প্রথম ঘরের গুটিকাটি আনিয়া টুপির মধ্যে রাখিয়া আবার যাইয়া দ্বিতীয় ঘরের গুটিকাটি আনিবে এবং টুপীর মধ্যে রাখিবে; এইভাবে একটি একটি গুটিকা একেবারে আনিয়া সমস্ত গুটিকা যখন আনা হইবে তখন ফিরিয়া আসিয়া ২নং খেলোয়াড়গণকে ছুঁইবে এবং পাছে গিয়া দাঁড়াইবে। ২নং খেলোয়াড়গণ যাইয়া ১টি গুটিকা টুপী হইতে নিয়া প্রথম ঘরে রাখিবে, আবার আসিয়া আর একটি গুটিকা নিয়া দ্বিতীয় ঘরে রাখিবে—এইভাবে একটি একটি করিয়া সমস্ত ঘরে গুটিকাগুলি রাখিয়া দিবে। প্রত্যেক বিজোড়সংখ্যক খেলোয়াড় যাইয়া ঐভাবে গুটিকাগুলি টুপীর মধ্যে একত্রিত করিবে এবং জোড়সংখ্যক খেলোয়াড়গণ যাইয়া তাহা এক একটি করিয়া প্রত্যেক ঘরে রাখিয়া আসিবে। এই প্রকারে যে দলের শেষ খেলোয়াড় সর্ব্বপ্রথমে তাহার কার্য্য শেষ করিয়া আরম্ভ-রেখায় ফিরিয়া আসিবে সেই দলই জয়ী হইবে।

এই খেলাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের অনুশীলন খুব ভাল হয় এবং ছেলেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জড়তা দূর হয়। দেখিতে হইবে ছেলেরা যেন সর্ব্বদা মুখ বন্ধ করিয়া শ্বাসক্রিয়া করে।

আঁকা-বাঁকা—দুই বা ততোধিক দলে খেলা চলিবে। এক এক দলে ৬।৭ জন খেলোয়াড় থাকিবে। মধ্যস্থের সঙ্কেতমাত্র ১নং খেলোয়াড়গণ ২নং খেলোয়াড়দের ডান দিক দিয়া ৩নং খেলোয়াড়ের বাম দিক দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ৩নংএর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। ২নং খেলোয়াড়গণ ঐরূপ আঁকিয়া বাঁকিয়া ৩নংএর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। যে দলের ১নং সর্ব্বপ্রথমে ৩নংএর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে সেই দল জয়ী। খেলোয়াড়দের দৌড়াইবার সময় এমনভাবে দাঁড়াইতে হইবে যাহাতে ২ জনের মধ্য দিয়া অপর একজন অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। একজন খেলোয়াড় গন্তব্য স্থানে যাইয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বে অপর খেলোয়াড় স্থান ত্যাগ করিতে পারিবে না।

কাছিটানা—(১) খেলোয়াড়-সংখ্যা এক এক দিকে ১০।১২ জন। দুই দলের দুই নেতা মুখোমুখি হইয়া একটি লাইনের দুই দিকে দাঁড়াইবে। তাহারা দুইজনে পরস্পরের হাতের কব্জি শক্ত করিয়া ধরিবে। উভয় দলের অন্যান্য খেলোয়াড় তাহাদের দলপতির পশ্চাতে যাইয়া লাইন করিয়া দাঁড়াইবে এবং দলপতির পিছনের

জন তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিবে; তাহার পিছনের জন তাহার কোমর ধরিবে; এইভাবে দুই দলই পরস্পর ধরা-ধরি করিয়া দাঁড়াইবে। মধ্যস্থের সঙ্কেতমাত্র এক দল অপর দলকে টানিতে আরম্ভ করিবে। যে দল টানিয়া অপর দলের ৩ জনকে লাইন ছাড়াইয়া নিতে পারিবে তাহারা জয়ী। সাধারণতঃ ৩ বার টানিয়া যাহারা ২ বার জয়ী হয় তাহারাই জেতা। দলপতিরা যদি পরস্পরের কব্জি ধরা অসুবিধা মনে করে তবে একখানা লাঠি ধরিতে পারে।

(২) খেলোয়াড়-সংখ্যা: এক এক দলে ১০ বা ততোধিক। ২ দল একটি রেখার দুই দিকে ঠিক মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইবে। ১ম দলে ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ইত্যাদি; ২য় দলে ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি। প্রত্যেক খেলোয়াড় ২ হাতে বিপক্ষের ২ জনের ২ হাত ধরিবে। মধ্যস্থের সঙ্কেতমাত্র এক দল অপর দলকে টানিতে আরম্ভ করিবে। ৩ বারের মধ্যে ২ বার যাহারা অপর দলকে রেখা ছাড়াইয়া আনিতে পারিবে তাহারাই জয়ী।

মল্লযুদ্ধ—প্রতিদ্বন্দ্বিগণ বিপরীত দিকে পা দিয়া পাশাপাশি চিৎ হইয়া এমনভাবে শুইবে যাহাতে একজনের বুকের কাছে আর একজনের মাথা থাকে। তারপর দুই জনেই ডান হাতে হাত আটকাইয়া ধরিবে। মধ্যস্থ "এক" বলিলেই সকলে ডান পা তুলিবে, "দুই" বলিলেই পায়ে পায়ে মিল লাগাইবে, "তিন" বলিলেই দুই জনে জোর করিতে থাকিবে—যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে উল্টাইয়া ফেলিতে পারে। যে অপরকে উল্টাইয়া ফেলিতে পারিবে সেই জয়ী। খেলা-শেষে যে দলে বেশীসংখ্যক জয়ী সেই দলই জেতা বলিয়া গৃহীত হইবে। খেলোয়াড়গণ সুবিধা মনে করিলে ডান হাত ও ডান পায়ের পরিবর্ত্তে বাঁ হাত ও বাঁ পা ব্যবহার করিতে পারে।

পাগার পার—খেলোয়াড়-সংখ্যা ১০ হইতে ১০০ জন। অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক খেলোয়াড় হইলেই খেলা ভাল হয়।

খেলোয়াড়েরা সমান দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একটি লাইনের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইবে। (লাইনটাকেই একটা পাগার কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।) তারপর বাঁশী বাজিলেই প্রত্যেক দল বিপক্ষের একজন খেলোয়াড়কে হাত, পা বা কোমর—শরীরের যে কোন অংশ হাত বাড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া লাইন পার করিয়া আনিবার চেষ্টা করিতে থাকিবে। যথেচ্ছসংখ্যক খেলোয়াড় সমবেতভাবে এই চেষ্টা করিতে পারে। বিপক্ষদল তখন ইহাতে বাধা প্রদান করিবে। বাধা দিবার উপায় দুইটি; কয়জন নিজ পক্ষের খেলোয়াড়কে ধরিয়া বিপরীত দিকে টানিতে থাকিবে এবং কয়জন বিপক্ষের খেলোয়াড়দের ধরিয়া টানিয়া লাইন ডিঙাইয়া আনিবার প্রয়াস পাইবে। এইভাবে টানাটানিতে যে খেলোয়াড় লাইনের অপর পার্শ্বে চলিয়া যাইবে, সে সেই পার্শ্ববর্ত্তী খেলোয়াড়দের একদলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তখন তাহাকে সেই দলেরই সহায়তা করিতে হইবে। এই পদ্ধতি অনুসারে খেলা চলিতে চলিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে যে পক্ষে অধিক-সংখ্যক খেলোয়াড় থাকিবে সেই পক্ষেরই জয় হইল।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ—অন্ততঃ ১২ ফুট ব্যাসের একটি বৃত্ত আঁকিয়া সমানসংখ্যক ২ দল খেলোয়াড়কে মধ্যরেখার দুই দিকে মুখোমুখি করাইয়া দাঁড় করাইতে হইবে। ২ দলের নেতা মিলিয়া ঠিক করিয়া দিবে কে কাহার সঙ্গে লড়িবে। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ সামনাসামনি এমনভাবে দাঁড়াইবে যাহাতে প্রত্যেকের এক পা বিপক্ষের ঘরের মধ্যে পড়ে। সঙ্কেতমাত্র সামনের পায়ে ভর করিয়া একপায়ে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধাক্কা দিতে থাকিবে। উদ্দেশ্য থাকিবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বৃত্ত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া। যাহার দুই পা মাটিতে লাগিবে অথবা যে বৃত্ত হইতে বাহির হইয়া পড়িবে সে মরিবে। নির্দ্ধারিত সময় পরে যে দলে বেশী লোক জীবিত থাকিবে তাহারা জয়ী হইবে। খেলোয়াড়গণের হস্তদ্বয় সর্ব্বদাই বুকের কাছে বদ্ধ থাকিবে।

ক্রমশঃ

—:০:—

চন্দ্রকুমারী

শ্রী সন্তোষকুমার সরকার

(১)

একদেশে একটি গয়লানী বাস করতো। বেচারী অত্যন্ত গরীব, বড় কষ্টে তার দিন গুজরান হ'ত। রোজই গ্রামে যেত দুধ বিক্রি করবার জন্যে। তার একটি ছোট্ট মেয়ে—তাকে কার কাছেই বা রেখে যাবে, তাই তাকেও কোলে ক'রে নিয়ে যেত। এই রকম ক'রে তার দিন যায়। একদিন সে দুধ বিক্রি ক'রে ঘরে ফিরবার সময় অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে রাস্তার পাশে ব'সে পড়ল। সেদিন তার বড়ই খাটুনি হয়েছিল। দুধের ভাঁড়টিকে রাস্তার পাশে রেখে মেয়েটিকে তার এক পাশে শুইয়ে রাখলে। তারপর আঁচলখানা পেতে মেয়ের পাশে নিজেও শুয়ে পড়ল। পড়বামাত্র ঘুম। এখন হয়েচে কি—আকাশ দিয়ে একটা ঈগল পাখী উড়ে যাচ্ছিল, সে দেখতে পেলে একটা ছোট্ট মেয়ে হাত-পা নেড়ে মাটিতে খেলা কর্চ্ছে। তার ভারি ইচ্ছে হ'ল মেয়েটিকে নেবার জন্যে। মনে করাও যা কাজও তা! সোঁ সোঁ করতে করতে রাস্তার ধারে নেবে প'ড়েই মেয়েটিকে মুখে ক'রে উড়তে লাগ্‌লো। ঈগলের শব্দে গয়লানির ঘুম ভেঙে গেল—দেখলে তার মেয়েকে পাখীতে আকাশে নিয়ে যাচ্ছে! বেচারী কি আর করবে—আছড়ে কাঁদতে লাগল।

এদিকে ঈগল পাখী মেয়েটিকে মুখে ক'রে কত বন, নদ-নদী, কত গ্রাম পার হ'য়ে শেষে তার বাড়ীতে এসে পৌঁছুল। তার বাসা ছিল একটা প্রকাণ্ড গাছের মাথার উপরে। কাঠের একটা ঘর—তাতে দু'ধারে দুটো দরজা—জানালায় লোহার গরাদ দেওয়া। ঈগল তার ঠোঁট দিয়ে দরজার এক জায়গায় চাপ দেওয়ামাত্র দরজা খুলে গেল। আবার মেয়েটিকে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢোকবামাত্র দরজা আপনি বন্ধ হ'য়ে গেল। মেয়েটিকে ঈগল পাখী পালন করতে লাগ্‌ল।

এই রকমে কিছুদিন কেটে গেল। ঈগল মেয়েটির নাম রাখলে—"চন্দ্রকুমারী।" সে পাখী হ'লে কি হয়, মেয়েটিকে সে নিজের শিশুর মত ভালবাসতো। যেখানে যা ভাল খাবার পেত তাই নিয়ে এসে চন্দ্রকুমারীকে খাওয়াত—কত খেল্‌না, কত গয়না, কত ভাল ভাল কাপড় এনে মেয়েটিকে দিত। মেয়েটি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে যেত!

এমনি ক'রে চন্দ্রকুমারী বার' বছরে পড়ল। চন্দ্রকুমারী ত চন্দ্রকুমারী!—রূপের আলোয় ঘরটা যেন ভ'রে যায়। ঈগল পাখী মেয়েটিকে এত ক'রে নাজিয়েও তৃপ্তি পায়নি—সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে যে গোলাপফুলটি ফোটে, সেটি মেয়েটির খোঁপায় না দিতে পেরে সে বড়ই দুঃখিত। একদিন সে ফুল আনবার জন্যে মনস্থ করলে। অনেক খাবার—রাঁধবার জন্যে কাঠ প্রভৃতি দিয়ে সে ফুল আনবার জন্যে চ'লে গেল।

দু'দিন চারদিন ক'রে সাতদিন কেটে গেল—তবু পাখী ফিরল না। মেয়েটি বড়ই অস্থির হ'য়ে পড়লো। এদিকে রাঁধবার কাঠগুলো গেল ফুরিয়ে। কাঠ পায় কোথা?—কে তাকে এনে দেবে!

শেষে সে একদিন কাঠ যোগাড় করবার জন্যে গাছ থেকে নেমে এ বাগানে ও বাগানে খুঁজতে লাগলো;—কিন্তু হায়! কাঠ আর মেলে না। বেচারী কাঁদ কাঁদ হ'য়ে সরু রাস্তা ধ'রে গ্রামের দিকে যেতে লাগলো। রাস্তা আর ফুরায় না। ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে একটি কুঁড়ের উপস্থিত। ঐ কুঁড়েতে একটা বুড়ী বাস করে। সে মানুষ নয়—রাক্ষসী। তার একটা ছেলে ছিল—সে তখন বাড়ী ছিল না। চন্দ্রকুমারী ঘরের ভেতর ঢুকে দেখ্‌তে পেলে একটি বুড়ী রাঁধছে। চন্দ্রকুমারীকে দেখে বুড়ী মনে মনে বল্লে, "কি সুন্দর মেয়েটি—আহা! এখন যদি আমার ছেলে থাকতো! যতক্ষণ না ছেলে আসে ততক্ষণ একে আটকে রাখতে হবে। অনেক দিন এমন কচি মাংস খাইনি।"

বুড়ী যেন অবাক হ'য়ে চন্দ্রকুমারীকে বল্লে, "তুমি কে বাছা! তুমি এখানে কি চাও?" চন্দ্রকুমারী বল্লে, "আমি ঈগল পাখীর মেয়ে—মা আমার জন্য সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে

গোপালকে আনতে গেছে। আমি বাসায় এসে একলা আছি—রান্নার কাঠ ফুরিয়ে গেছে, রাঁধতে পাচ্ছিনে। ছ'খানা কাঠ দিতে পার?" বালকটী এক গাল হেসে বল্লে, "রাঁধবার কাঠ!—এখুনি দিচ্ছি। কিন্তু দেবার আগে একটি কাজ ক'রে দেবে আমার?" চন্দ্রকুমারী বল্লে, "কি কাজ করবো?" বুড়ী মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে বল্লে, "বড় লক্ষ্মী মেয়ে—তুমি আমার ভাতটা একটু রেঁধে দাও না, অনেক বয়স হয়েছে তাই রাঁধতে বড় কষ্ট হয়।"

চন্দ্রকুমারী ভাত রাঁধতে বসলো। ভাত রাঁধা হ'লে বল্লে, "এইবার কাঠ দাও, অনেক দূরে যেতে হবে।" বুড়ী বল্লে, "এই দিচ্ছি তবে আর একটি কাজ কর না লক্ষ্মী! আমার ঘরটা ভাল ক'রে ঝাঁট দিয়ে দাও ত বাছা.—বুড়ো হয়ে গেছি আমি, তাই বড় দেরী লাগে ঝাঁট দিতে!"

চন্দ্রকুমারী কি আর করবে; ঘর পরিষ্কার করতে লাগলো। বুড়ী খানি খানি রাস্তার দিকে চেয়ে দেখে আর মনে মনে বলে,—"হতভাগা ছেলেটা আর আসতে চায়না যে! এত দেরী হ'চ্ছে কেন?"

এদিকে ঘর পরিষ্কার ক'রে চন্দ্রকুমারী বুড়ীকে বল্লে, "এইবার কাঠ দাও, আর থাকতে পাচ্ছিনে।" বুড়ী আবার মেয়েটির পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্লে, "তোমার মত এমন ভাল মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি—এখুনি কাঠ দিচ্ছি। এই আর একটি কাজ করেই তোমার ছুটি। রাঁধবার জলটুকু ফুরিয়ে গেছে—ঐ পুকুর থেকে এক ঘটি জল এনে যদি দাও ত বড় ভাল হয়।"

চন্দ্রকুমারী এবার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে, একটু বিরক্তির স্বরে বল্লে, "না, আর আমি কোন কাজ করতে পারবো না। আমাকে এখুনি যেতে হবে। যদি তুমি কাঠ না দাও—আমি অন্য জায়গা থেকে আনবো।" বুড়ী মেয়েটির কথা শুনে হাসতে হাসতে বল্লে, "ওঃ আর কাজ করতে পারবে না? তা বেশ! যাহোক আমি তোমার কাজে খুব সন্তুষ্ট হ'য়েছি; এই নাও কাঠ।" এই ব'লে সে খানকতক কাঠ চন্দ্রকুমারীকে দিলে।

চন্দ্রকুমারী কাঠ নিয়ে রওনা হবে এমন সময় বুড়ী একখ'লে মটর এনে বল্লে, "লক্ষ্মী মেয়ে, তোমায় আর কি বোব বল, তবে এই মটরের খ'লেটি নিয়ে যাও—ভেজে খেয়ো। খুব ভাল মটর!" চন্দ্রকুমারী খ'লেটি নিয়ে পথে বেরুলো। ঘরে পৌঁছে দরজাগুলি ভাল ক'রে এঁটে দিয়ে রাঁধতে লাগলো।

প্রার্থনা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

এসেছ দেবতা আঁধার হেরিয়া জানি,—
তোমারে আমরা মানি।
ঘোরের দুয়ারে কঠোর আঘাত হানি'
এসেছ,—তোমারে মানি।
এসেছ যদি গো শত বুকে দাও আশা,
সত্যে পূজিতে মুক মুখে দাও ভাষা,
রুদ্র দেবতা সকল-বিঘ্ন-নাশা
দেখাও যদিন পাণি!—
তোমারে আমরা মানি॥

শুনাও দেবতা শুনাও অমৃত-বাণী—
তোমারে আমরা মানি।
অধরে অমিয়-আধার ধরগো আনি—
তোমারে আমরা মানি।
আঁধারে আজিকে করগো আলোকময়,
শিখাও দেবতা গাহিতে তোমার জয়,
ভুলাও শঙ্কা, কর কর নির্ভয়,
ঘুচাও যতেক গ্লানি।—
তোমারে আমরা মানি॥

শিল্পপ্রতিভায় নারী

বঙ্গলক্ষ্মীতে ইতিপূর্ব্বে নারীর শিল্প-প্রতিভা ও শিল্প-চর্চ্চার বিষয় বহুবার আলোচিত হইয়াছে। এবারেও আমরা প্রতিভাশালিনী কয়েকজন নারীশিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম :—

কাষ্ঠখোদাই

মিস ববি কিফহাবর—কাষ্ঠ-কারুশিল্পে ইনি যশস্বিনী। বয়সে এবং চেহারায় ইঁহাকে একটি খুকী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চেরী, ওক, ওয়ালনট প্রভৃতি কাষ্ঠই ইনি সাধারণতঃ ইঁহার শিল্পকার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়া থাকেন। লণ্ডনে ইঁহার কাজের বিশেষ খ্যাতি আছে।

ভাস্কর্য্য

খোকা

মাবাম চ্যানা অপুনক্—২৪ বৎসর মাত্র বয়সেই ইনি ভাস্কর্য্যে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার জন্মস্থান ইউক্রেন হইলেও বিগত ১০ বৎসরাধিক কাল হইতে ইনি

স্থায়ীভাবে করাসী দেশে বসবাস করিতেছেন। সম্প্রতি নিউইয়র্কের Weyhi গ্যালারিতে ইঁহার ভাস্কর্য্য প্রদর্শিত

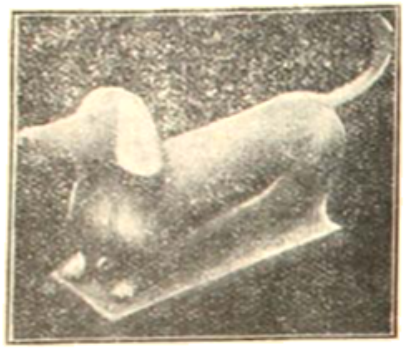

কুকুর ছানা

হইয়া প্রশংসিত হইয়াছে। এখানে আমরা দুইখানির প্রতিলিপি দিলাম।

খাদ্যের মডেল

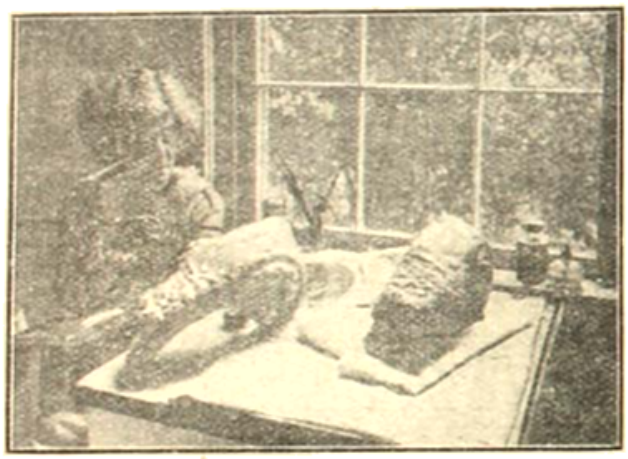

মিসেস্ মার্গারেট রাসেল—যুক্তরাজ্যের "ডিপার্টমেণ্ট অব্ এগ্রিকালচার"-এর জন্য ইনি খাদ্যদ্রব্যের মডেল তৈয়ারী করিয়া থাকেন। চিত্রে কার্য্যরতা শ্রীমতীর প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

ফটোগ্রাফি

মাদাম লরে এন্‌বিন গিলট—ইনি সাধারণতঃ ক্যাটালগ প্রভৃতির জন্য ফটো তুলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এখানে তাঁহার একটি আলোক চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল—দুইটি হাত এবং একটি পাত্রের ফটো কিরূপ নিপুণতার

সহিত তুলিয়াছেন ইনি, সেখিলেই ইঁহার কৃতিত্বের পরিচয়-আভাস বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রতিযোগিতা-বিজয়িনী

মাদামমোয়েল এক্টোনেট ডেনিজো—প্যারিসের একটি মহিলা। তত্রত্য দুইটি পত্রিকা-প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি প্রবন্ধপ্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া পুরস্কারস্বরূপ ইনি

পুরস্কারলাভের আশে সম্প্রতি আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। ইনি একজন সুশিক্ষিতা মহিলা—গণিতশাস্ত্রে ও দর্শনে ইঁহার ডিগ্রোনা আছে, এবং আইন-শাস্ত্রেও ইনি অনভিজ্ঞা নহেন।

মহিলা নাট্যকার

মিসেস ইভেলিন ডাগ্‌নাল মহিলা নাট্যকাররূপে বিলাতে বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহার নিজস্ব কোন থিয়েটার বা ষ্টেজের স্বত্বাধিকার নাই—বাড়ীতে বসিয়াই ইনি ষ্টেজের সম্পূর্ণ অভিনয়-উপযোগী নাটক রচনা করিয়া থাকেন।

ট্রেনিং-শিক্ষার জন্য য়ুরোপ যাত্রা

সম্প্রতি ব্রাহ্ম বালিকা ট্রেনিং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীমতী পূর্ণিমা বসু য়ুরোপ যাত্রা করিয়াছেন—উচ্চতর ট্রেনিং শিক্ষা-দান প্রণালী এবং শিক্ষয়িত্রী-জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতা-লাভের জন্য। শ্রীমতী বাঙালী ঘরের বিধবা বধূ। আমরা শ্রীমতীর সৎসাহসের প্রশংসা করি এবং তাঁহার সফলতা আকাঙ্ক্ষা করি।

মহিলা বন্দর-রক্ষক

মিস্ ষ্টেলা গেলের বয়স মাত্র ২২ বৎসর। এই বালিকা-বয়সেই ইনি Paigntonএর বন্দররক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এ পদে মহিলার নিয়োগ অভূতপূর্ব্ব। ইনি বিখ্যাত নৌ-নির্ম্মাণশালার অধিকারী মিঃ লুইস্ গেলের কন্যা। ইনি বন্দর বন্দর সমুদ্রতীরের আবহাওয়াতেই বাড়িয়া উঠিয়াছেন—নাবিকবিদ্যায়ও ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে।

মহিলা ধর্ম্মঘট-কর্ম্মী

মিস্ জুলিয়া আলির জন্মস্থান ব্রাড্‌ফোর্ডে। ইনি অল্পবয়সেই লণ্ডনে আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। প্রথমে ইনি সাধারণ ধর্ম্মঘট হইতে কার্য্য আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে জেনেভা, কানাডা,—এককথায় বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মঘট, যাহা সর্ব্বনাশকর যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘোষিত হইয়াছে, ইনি তাহার একজন বিশিষ্ট ও বিখ্যাত মহিলা কর্ম্মী।

মহিলা ক্লাবের সভানেত্রী

মিসেস্ হেনরি হোল্ট হিল্টন সম্প্রতি চিকাগো মহিলা-ক্লাবের সভানেত্রী মনোনীতা হইয়াছেন। ইহা একটি সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান। পুরুষের সঙ্গে সমপদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই মহিলা-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নহে—ইহার উদ্দেশ্য সামাজিক সংস্কার-আন্দোলন। শিশুদিগের প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে, আদর্শ বালমন্দির ও শিশুসংশোধনাগার স্থাপনে এই সঙ্ঘের কার্য্য সরণীয় ও প্রশংসনীয়।

আপ্রকাশ

শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস

অন্তরে—তব হৃদয় মাঝারে
যে ফুল ফোটেনি হাসি'
বাহিরে তাহারে প্রকাশ করিয়া
কোরোনা কোরোনা বাসি।
শুধু এতটুকু মুকুল ও তব
বাসনার কণা অস্ফুট নব,
ঢেকে রাখ তারে—এনোনা বাহিরে
মিছে কৌতুক লাগি';
রসভার রসে থাও তারে প্রাণ—
উঠিবে আপনি জাগি'।

নারীর রাজ্য

শ্রী সুখময়ী রায়

আজ কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের ধাক্কা আমায় এমন ভাবে ঘোল দিয়েছে যে আমরা তাল সামলাতে পারছিনে। ধাক্কা যখন বাইরে থেকে আসে তাতে গা ভাসিয়ে দেওয়া মন্দ নয়—তা আপাতসুখকর—বিনা চেষ্টায় এগায় কি ওপায়। কিন্তু সেই শক্তির উপর যেমন নিজের কোনও হাত নেই, তেমনি তার প্রভাবও ক্ষণস্থায়ী—প্রবল বেগের প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য। তাই আজ যুগসমস্যার দিনে নারীজাতিকে স্রোতের বেগে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না—অন্তরে প্রবেশ করতে হবে, প্রত্যেকটি জিনিষকে যাচাই করতে হবে। অন্তররাজ্যই নারীর রাজ্য,—পুরুষের রাজ্য বাইরে।

'নতুন কিছু করো' ব'লে বেরিয়ে পড়ার বিপদ হ'তে আজ আমাদের রক্ষা পেতে হবে। পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতার যে একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা নারীকে আজ পেয়ে বসেছে তার জন্য দায়ী করেন অধিকাংশ লোকে নারীর উচ্চ-শিক্ষাকে—বিশেষ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে। কথাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়, তবু এই অপবাদের জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই। সত্যিই যদি উচ্চশিক্ষা নারীর নারীত্বকে অধিকতর গৌরব দান না করতে পারে তার জন্য দায়ী উচ্চশিক্ষা নয়—দায়ী নারী নিজে। শিক্ষা—যে শিক্ষাই হোক, যা মানুষকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে না তুলতে পারে তা 'শিক্ষা' নামেরই যোগ্য নয়। একই শিক্ষা বিভিন্ন লোকের উপর বিভিন্ন ছাপ দিয়ে যায় কেন? এরূপ স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে দায়ী না ক'রে অন্য একটি গূঢ় কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। বস্তুতঃ ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সকল শিক্ষার উপর পারিবারিক শিক্ষাই জয়যুক্ত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা একটি পালিশ বিশেষ। উৎকৃষ্ট উপাদানের উপর পালিশ যেমন খোলে ভাল, সেই একই পালিশ নিকৃষ্ট উপাদানে নিষ্প্রভ মনে হয়। শিক্ষা আসে বাইরে থেকে, তাকে গ্রহণ করবার শক্তি ভিতরের জিনিষ। এই যে গ্রহণ করবার শক্তি—এই যে বিশিষ্ট উপাদান এ আমরা পাই গৃহে। আমাদের বিস্তারস্থ হয় পিতামাতার কোলে, বিশেষ ভাবে মাতার কোলে। তাই আজ যদি শিক্ষার কোনও ত্রুটি সন্তানের মধ্যে লক্ষিত হয় তবে তার জন্য দায়ী করব আমরা মাতাকে। একজন মাতা তাঁর শিশু সম্বন্ধে একজন শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমার শিশুর বয়স ৪ বৎসর, তার বিদ্যারম্ভ করা উচিত কোন্ বৎসর থেকে?" যে ভদ্রলোকটি উত্তর করেছিলেন, যে, শিশুর বিদ্যারম্ভের ইতিমধ্যেই তিন বৎসর দেরী হ'য়ে গিয়েছে। অতি সার কথা তিনি বলেছিলেন। শিশু জন্মমুহূর্ত্ত হ'তেই মা'র কোলে লালিত-পালিত হয়—আহার, বিহার, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে সে যে শিক্ষালাভ করে তা জল, বায়ু, আলোর মতোই তার শরীর ও মন গঠনে সহায়তা করে। মাতৃদুগ্ধের সহিত যে শিক্ষা শিরায় শিরায় প্রবাহিত করা হয়েছে তার প্রভাব অখণ্ড এবং অপ্রতিহত ভাবে কাজ করতে থাকে চিরকাল। শরীর-গঠনে মাতা যেমনি সহায়তা করেন, চরিত্র-গঠনেও মাতার প্রভাব সেইরূপ।

পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতার যুগে আজ নারীকে একটু থমকে দাঁড়াতে হবে,—ভেবে দেখতে হবে তার কর্ম্ম-ক্ষেত্র কোথায়? নারী ও পুরুষ বিধাতার দুই অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কেউ একা সম্পূর্ণ নয়, তাই নারীকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী বলা হ'য়েছে। বিভিন্ন রূপ দিয়ে বিধাতা পুরুষ ও নারীকে পাঠিয়েছেন জগতে একে অন্যের সহায় হ'য়ে সম্পূর্ণতা লাভ করবে সর্ব্বক্ষেত্রে—উচ্চনীচের কথা দূরে থাক—একে অন্যকে না হ'লে অঙ্গহীন ও সঙ্গহীন। তাই এদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র—বিধিদত্ত বিধানে বিভিন্ন হ'লেও তা পরস্পর-বিরোধী নয়। যাদের জাতের শিক্ষায় যে প্রয়োজন নাই তা নয় বরং অধিক প্রয়োজন—শুধু ভাবতে হবে তার প্রয়োগ কোথায়। একই শিক্ষা যাতে পুরুষ ও নারীর উপর বিভিন্ন

ছাপ দিয়ে যায় এই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। নারীকে তার শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করতে হবে সর্ব্বপ্রথমে ঘরের ভিতর। ঘর বজায় রেখে যে 'মা' অবসর পাবেন তিনি বাইরে কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজতে পারেন। অনেকের ধারণা যে, ঘর-সংসার করতে—অর্থাৎ হাঁড়ি ঠেলতে শিক্ষার প্রয়োজন কি? এবং শিক্ষিতা নারীমাত্রেরই গৃহকর্ম্মে বিমুখ হওয়াটাই স্বাভাবিক। 'হাঁড়িঠেলা'-জাতের অশিক্ষার ফলই আজ আমাদের দেশের এত দুর্গতি—শিশুর অকাল-মৃত্যু মায়ের অসংখ্য রোগ, পরিবার দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আজ আমরা মায়ের জাত শিক্ষিতা হ'চ্ছি—অতিশয় আশার কথা; কিন্তু আমাদের একথা ভাবলে চলবে না যে, এই শিক্ষার প্রয়োগ শুধু বাইরে এবং তা না হ'লেই নিষ্ফল। এই শিক্ষিতা মাতারা প্রতি ঘরে, প্রতি শিশুসন্তানের উপর, ঘরের প্রত্যেকটি মানুষ ও প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির উপর শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করলে আজ দেশ শতপদ অগ্রসর হ'য়ে যাবে। দেশ তো আমাদের বাইরের জিনিষ নয়—পোষাকী জিনিষ নয়—পরিবারের সমষ্টি নিয়েই সমাজ—সমাজের সমষ্টি নিয়েই দেশ। ঘরে আবর্জ্জনারাশি জমতে থাকলে সদর রাস্তা পরিষ্কার করা বৃথা।

একটি বোঝাপড়ার ভাব সর্ব্বত্রই থাকা প্রয়োজন। যে দেশে পুরুষ প্রবল সে দেশে শান্তি নেই,—আবার নারী-প্রধানের দেশেও শান্তি নেই। বর্ম্মা, পার্ব্বত্যদেশ প্রকৃতি কতক স্থানে নারী উপার্জ্জনশীল, তাই পুরুষ—মূর্খ—অলস—অকর্ম্মণ্য। অতিশয্যে আশঙ্কাই আনে, শান্তি আনে না। একের ঘাড়ের বোঝা অন্যের উপর চাপালেই চলবে না, উভয়ে সমান ভাবে ভার বহন করতে হবে। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও আস্থাই একান্ত প্রয়োজন।

গৃহকর্ম্মকে হীন মনে করলে নারীর চলবে না, এখানেই নারী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—এত বড় রাজ্য তার আর কোথাও মিলবে না—এখানে যেমনি তার আধিপত্য তেমনি তার দায়িত্ব। সন্তানপালনের দায়িত্ব প্রজাপালন অপেক্ষা অধিক গুরুতর (এই শিশুই আবার দেশের ভবিষ্যৎ প্রজা) তাই নারীর দায়িত্ব কম নয়। বিধাতা এইভাবে জাতি-গঠনের ভার নারীর উপরই অর্পণ করেছেন। এই কাজ সুসম্পন্ন ক'রে তিনি বাইরের কাজে লাগতে পারেন ভাল,—না পারেন আক্ষেপের কিছুই নেই। তাঁর কর্ম্মশক্তি, তাঁর অধ্যবসায় তাঁর আত্মদান সকলই ভবিষ্যৎ জাতির মধ্যে প্রতিফলিত হ'য়ে উঠবেই একদিন। বিদ্যাসাগরের মা'কে দেখে তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যারিসন সাহেব বলেছিলেন, "এমন মা না হ'লে কি এমন ছেলে হয়!" তখনকার সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্জ্জিতা মাতার প্রভাব বিদ্যাসাগরের মত পুত্রের উপর এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তা বিদেশী ম্যাজিষ্ট্রেটের চক্ষু পর্য্যন্ত এড়ায় নাই। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা এক অতিবড় শিক্ষা চরিত্র এবং জাতিগঠনের জন্য তার প্রয়োজন —এবং তার ভার মায়ের উপর। আমরা দেশকে 'মা' সম্বোধনে আহ্বান করি—সেই মাতৃমূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন দিলে চলবে কেন? সমগ্র নারীজাতির মধ্যে মাতৃভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে। আজ শিক্ষিতা মাতার দায়িত্ব বেড়েছে বই কমেনি। যে মানসিক বল ও সহিষ্ণুতার অধিকারিণী ক'রে বিধাতা বঙ্গনারীকে গড়েছেন তার শক্তির পরিচয় যুগে যুগে কালে কালে সকলেই পেয়েছেন। আজ 'শিক্ষার' ছাপ নারীকে যদি অধিকতর মহিমাময়ী ক'রে তুলতে পারে, আদর্শপত্নী—আদর্শমাতা—আদর্শ গৃহিণী ক'রে তুলতে পারে, তবেই সার্থকতা। নারী তার রাজ্য ছেড়ে গেলে আজ জাতি ক্ষতি-গ্রস্ত হবে। নারীর কাজ প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষ-ভাবে যে জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করছে এবং করবে এ নিঃসন্দেহ—বেশী ব্যক্ত হবার প্রয়োজন নেই, নিজেকে বেশী জাহির করারও প্রয়োজন নেই।

একটা বৃহৎ কাজমাত্রেরই বিভিন্ন বিভাগ আবশ্যক। সকল কাজ সকলের দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। তাই সমগ্র কাজটিকে পরিপূর্ণতা দান করতে হ'লে প্রত্যেকটি বিভাগের আবশ্যকতাকে একান্তভাবে ও অপরিহার্য্যভাবে স্বীকার করতে হবে। তাই নারীজাতির নিজের কর্ম্ম-বিভাগকে—কর্ম্ম-ভিন্নতাকে কর্ম্মহীনতা মনে করলে চলবে না। নারীর কর্ম্ম-বিভাগটিকে বাদ দিলে যে সমগ্র কর্ম্মে-রই একটি অংশ অপূর্ণ থেকে যায়, তা'ই শুধু তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাই একে অন্যকে উপেক্ষা করলেও চলবে না, আবার প্রতি পদে পদে একে অন্যের মুখাপেক্ষী হ'লেও চলবে না—অবিচ্ছিন্নভাবে একে অন্যের সহায় হ'তে হবে।

বিধাতা নারীকে শারীরিক শক্তিতে দুর্ব্বল করেছেন কিন্তু আত্মিক শক্তিতে নারী চিরকাল জয়যুক্ত হ'য়ে এসেছে—বিশেষতঃ বঙ্গনারী। এই দৈবশক্তির অধিকার বিধাতা নারীজাতিকে দিয়েছেন—আমরা শুধু দুবলার ভূলে নিজেদের কর্ম্মকে হীন ক'রে দেখি, নিজেদের গণ্ডী পেরিয়ে গিয়ে কাজ খুঁজে বেড়াই। আত্মা ও শরীর যে যোগে যুক্ত হ'য়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—পুরুষ ও নারীকে সেইরূপ ভাবে যুক্ত হ'য়ে কাজ করতে হবে। প্রেরণা দান করবে নারী—শক্তি প্রয়োগ করবে পুরুষ।

আজ আমাদের আমাকে ধরতে হবে। যে যে বিভাগেই কাজ করি তাকে সম্পূর্ণতা দান করতে হবে। সংহারের দিকটা পুরুষের হাতে দিয়ে সংস্কার করতে হবে নারীকে। অবজ্ঞা বা অবহেলা বর্জ্জন কোন কালেই নারীর অভিপ্রেত নয়; নারী চিরকালই রক্ষণশীলা—দীর্ঘ বা দুঃসিৎ বা নারী তাকে পূর্ণতা ও মাধুর্য্য দান ক'রে এসেছে চিরকাল—পুরুষকে বিনাশের পথ থেকে বাঁচান নারীর কাজ। তাই কবি বলেছেন—

'মুছে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন ছিন্ন,
সুন্দর তব সার্থক কর শূন্য এ ঘোর গেহ;
এস কল্যাণী নারী, ল'য়ে তব স্নেহ-ঝারি।'

পুরুষই আজ নারীকে আহ্বান করছে—ছোড়দোড়ে তার সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য নয়, যেখানে তার অক্ষমতা সেখানে তার অপূর্ণতা তাতে পূর্ণতা দান করার জন্য। নারী যেন আহ্বানের মর্য্যাদা রাখতে পারে।

বিজ্ঞানের সহিত যাঁদের সামান্য পরিচয়ও আছে তাঁরাই জানেন কেন্দ্রাভিগ (centripetal) ও কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) এই দুই বিরুদ্ধ-শক্তির সমাবেশেই জগতের স্থিতি সম্ভব করছে এবং গতি নিয়ন্ত্রিত ক'রে দিচ্ছে। সেরূপ আজ পুরুষকে নিজের পথ ছাড়লে চলবে না, নারীকেও তার রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়লে চলবে না। এই দুই বিভিন্ন শক্তিরই একান্ত প্রয়োজন আজ আমাদের বাঁচবার জন্য। কোনও শক্তির প্রয়োজন যদি আজ ক'মে যায় তবেই বুঝব আজ আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পুরুষের শক্তির যেমনি প্রয়োজন, তেমনি নারীশক্তিরও ঠিক তেমনি প্রয়োজন। এই উভয় শক্তির বিরুদ্ধ-টানে যে গতি, যে চলার পথ আপনি নিয়ন্ত্রিত হবে, সেই প্রকৃত পথ—সেই স্বাভাবিক পথ। আজ যদি পুরুষের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় শিথিলতা দেখা যায়, অথবা নারী নিজ রাজ্যে জলাঞ্জলি দিয়ে পুরুষের রাজ্য আক্রমণে প্রয়াস পায়, তবেই তা জাতির পক্ষে অশুভ হ'য়ে উঠবে যদি নারী পুরুষের উপর প্রভাব বিস্তার করবার আকাঙ্ক্ষা রাখে এবং তদ্দ্বারা নিজের ও দেশের কল্যাণ কামনা করে, সে তা করতে পারে তার মনোরাজ্যে। পুরুষের মনের উপর আধিপত্য করতে পারলেই সে তার ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সহযোগিনী হ'তে পারবে। সহযোগিতাই প্রয়োজন,—প্রতিযোগিতা নয়।

'স্বাধীনতা'র মানে কি, আজ সর্ব্বাগ্রে ভেবে দেখি। আগে 'স্ব' এর অধীন হও। তারপর যা কিছু নিজের ব'লে মনে কর—স্বামী, পুত্র, পরিবার, বন্ধু সকলের উপর স্বত্বের দাবী কর,—দেশের কুপ্রথা, কুসংস্কার, আবর্জ্জনা দূর ক'রে শক্তির পরিচয় দাও,—তারপর দেশের দুর্দ্দশা দূর কর। আজ ঘরের কোণায় যদি আবর্জ্জনা জ'মে থাকে তবে তা চতুর্দ্দিকের বায়ুকে ক্রমে দূষিত ক'রে তুলবে,—তাকে আমরা বাইরের শক্তি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। কুসংস্কার ও দুর্নীতিরূপ বিষবৃক্ষের মূলে আজ কুঠারাঘাত করতে হবে। উপরে প্রলেপ দিলে হবে না—ভিতর থেকে প্রতিষেধক প্রয়োজন হ'য়েছে। নারীজাতির আজ দেশসেবার সঙ্গে সঙ্গেই, অথবা পূর্ব্বেই সমাজসেবার ব্রতী হওয়া প্রয়োজন। নারী তাঁর শক্তির পরিচয় দেবেন প্রথমে গৃহে—তারপর সমাজে—তারপর দেশসেবায়। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, আজ আইন ক'রে বালাবিবাহ নিরোধ করতে হ'ল আমাদের দেশে। নারীর দুর্দ্দশা দূর করতে আজ বিদেশী আইনের প্রয়োজন হয়—কোথায় থাকে তখন নারীকণ্ঠ—কোথায় নারীর কর্ম্মশক্তি, যে শক্তি আজ স্বাধীনতার দাবী করে? আজ 'পারদা বিন' প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে যে 'মায়ের জাতের' কর্ত্তব্য বেড়ে গেছে তা'ই আমরা ভেবে দেখি। এতদিন পুত্রের পালনেই মাতা অধিক যত্নবতী থাকতেন, আজ পুত্রকন্যাকে সমানভাবেই শিক্ষাদান করতে হবে। এই আইন যেমন আশার বাণী বহন ক'রে এনেছে তেমনি

আশঙ্কাও কম আসে নাই। আশঙ্কা ... তে পারে এবং তদ্বিধাতে আদর্শ নারী—আদর্শ ... কেবল মায়েরা—যদি তাঁরা সমস্ত সংসার পরিত্যাগ ক'রে ... —আদর্শ মাতা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।

বেরুই হন। কন্যাকে শিক্ষা ... সামনে বিপদ জেনেও কন্যাকে বিপদের হাতে স'পে দিতে কুণ্ঠিত নন যে কিসের জন্যে? নারী হ'য়ে নারীর দুর্দশা বুঝলে কোনও বাইরের শাসন মাথা পেতে তাদের প্রচণ্ড দুর্দশা দূর করে।

বাংলার মাটি

অই-সি এস্

মোদের বাংলা দেশের মাটি!
তোমার তরে গ্রাম ও বাটী—

তোমার পরিপাটি।
মোরা তোমার পরিপাটি
করব পানার নিস্তারিণী—
কেটে গাছের নিবিড় বন
দেব আলোহাওয়া ওগার
মুক্ত বিচরণ;—

প্রসূতি-মঙ্গল

মা'র চিঠি

শ্রী কমলা সেন

হের শান্তি,

তোমার চিঠিটা কয়েক দিন হোলো পেয়েছি। তোমার শরীরের অবস্থা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হ'লাম। এমনিটি যে হবে তা আমি আগে থেকেই আঁচ করেছি। কারণ সাধারণতঃই মেয়েদের প্রথম সন্তান হবার পর শরীরটা যেন একেবারে ভেঙে পড়ে।

শরীরের রক্ত দিয়ে একটি জীব সৃষ্টি করা—তাকে বুকের রক্ত দিয়ে পালন করতে প্রসূতি প্রথম প্রথম একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। এযে শুধু মানুষেরই হয় তা নয়; পাড়াপাড়া বেড়াল-কুকুরদের ভিতরও এটা দেখি।

তাই প্রথমবার প্রসবের পর প্রসূতির খুব যত্নের দরকার। অনেক সময় সে থাকে ছেলেমানুষ, নিজের ভাল-মন্দ বোঝে না; তখন এজন্য তাকে শাসন ক'রে বা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাধ্য করতে হয়।

এমনিভাবে তার যখন দুই-তিন সন্তান হবার পর সন্তান হওয়া যখন তার একটু অভ্যাসগত হ'য়ে যায় তখন আর তার অত যত্ন না করলেও স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে না—সহ্য হয়ে যায়।

প্রসূতিপরিচর্য্যার ভাল্যের দিক দিয়ে আমরা না রেখেছি প্রাচ্য, না রয়েছি পাশ্চাত্য। ত্রিশঙ্কুর মতন যেন ঠিক মাঝ-আকাশে দাঁড়িয়ে আছি।

এমনিই আমাদের এই মধ্যবিত্তের ঘরে অভাব-অভিযোগের অন্ত নাই। আজকাল সবচেয়ে বিপন্নভাবে কাল কাটাচ্ছে এরা। একটি লোক হয় তো বিশ-পঞ্চাশ টাকা মাইনে পায়, তাই দিয়ে একবাড়ী লোক খাবে। এখনকার বাজারে তাতে শুধু নুন-ভাত ছাড়া আর কিছু জুটবে না। তার উপর আবার প্রসূতির পরিচর্য্যার জন্য ব্যয় হবে কি?

ধাত্রীশিক্ষার বা আলোকচিত্রের সাহায্যে ডাক্তারের মুখে আমরা যে সমস্ত নিয়মানিয়মের কথা শুনি বা পড়ি তা আমাদের কাছে কবির কল্পনা বা রোগীর প্রলাপ ছাড়া আর কিছু তো মনে হয় না। কারণ তার এক-চতুর্থাংশ পালন করার শক্তি তো আমাদের নেই। কেতাবের পড়া বিদ্যে কেতাবের ভিতরেই আটকে রেখে আমরা আমাদের অবস্থানুযায়ী ভাবে প্রসূতিকে চালাই।

ছেলেকে দুধটুকু জুটিয়ে খাওয়াতে আমরা পারি না, আমরা আবার প্রসূতিকে কল দুধ মাছ এসব দেবো কোথা থেকে?

শরছিদ্র না হ'য়ে গেলে কাপড়খানা আমরা ছাড়ি না, আমরা আবার প্রসূতিকে আঁতুড়-ঘরে পাঁচবার পাঁচখানা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবো কোথা থেকে!

এই মধ্যবিত্তের ঘর যে কি বিপন্ন তা তারাই জানে, বড়লোকের কথা ছেড়েই দিলাম। এদের চেয়ে গরীব, যারা কুলি-মজুরী ক'রে খায় তারাও অনেক ভালো আছে। দরকার হ'লে তারা সাপুকরে খাটে। এত পড়া-শুনোর ঝঞ্ঝাটে তারা অর্থব্যয় করে না। অভাব-অভিযোগে পরের দুয়োর থেকে মেগে যেচে আনে;—এমন নিরুপায় ভাবে তারা মরে না।

প্রায় দেশের আধখানা বুক জুড়ে এই যে ভদ্রনামধারী এক মধ্যদরিদ্রের দল বাস করে, এরা না খেয়ে ম'রে যায়, ছেলেমেয়েদের না খাইয়ে মেরেও কুকুরে খায়, তবু মান খুইয়ে কারু দ্বারস্থ হ'তে পারে না। খেতে না দিলেও চাকুরীর খাতিরে ছেলেপিলেদের পড়ার জন্য পীড়ন করতে

হয়। পরনে কাপড় না জোগাতে পারলেও বাহিরের আবহাওয়াকে ঠিক ক'রে এদের রাখতে হয়।

কুলি-মজুররা কায়িক পরিশ্রম ক'রে দেহে অনেকটা শক্তি সঞ্চয় করে,—সুস্থ সবল দেহটিকে জীবনের পথে পাথেয় ক'রে নেয়। এরা যে কোন্ শক্তি সঞ্চয় করে, কি পাথেয় নিয়ে সংসারের বুকে নামে তা তারাই জানে।

যদিও এরা সংখ্যায় কম নয়, তবু সুখ-শান্তি স্বাস্থ্যরক্ষা প্রসূতিরক্ষা প্রভৃতি এরা এদের জন্য কিছু সৃষ্টি হয় নি। এমন কি, আলো, বাতাস—এই যে প্রকৃতির অপক্ষপাত দান তা থেকে পর্য্যন্ত এরা বঞ্চিত। এদের প্রসূতির মরা ছাড়া আর উপায় কি? তাই দিনের পর দিন এরা মৃত্যুর হার বাড়িয়ে চ'লে যাচ্ছে।

প্রসবের পর সাধারণতঃ গায়ের রক্ত ক'মে গিয়ে প্রসূতি দুর্ব্বল থাকে সেজন্য তার হজম করার শক্তিও কমে। কিন্তু তখন তাকে দুটি লোকের খাবার খেতে হবে ব'লে স্বাভাবিক গতিতেই খিদে থাকে ভারী প্রবল। অর্থের অভাবে পুষ্টিকর ভাল জিনিষ ভাগ্যে আর জোটে না, তাই তখন তাদের প্রবল খিদের টানে ছাই-ভস্ম চড়চড়ি ভড়ভড়ি খেয়ে সূতিকাগ্রস্ত হ'য়ে মরণের পথে অভিযান করছে এরা।

তোমার ঠাকুর্মা আমায় মাঝে মাঝে বলেন, তোমাদের যাদু এখন প্রসূতির পরিচর্য্যার কথা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে, আমাদের সময় এত সব ছিল না, তা আমরা তো মরিনি!

তা সত্যি বটে, তখন এটা নিয়ে বাইরে এত চাক বাজতো না! কিন্তু তখন খাল, বিল, পুকুরে মাছের অভাব ছিল না; গোহালে গরু প্রায় প্রত্যেকেরই থাকতো; মাছ না হ'লেও বৌয়ের ভাগ্যে তার ঝোল একটু জুটেই যেতো। গরুর দাঁটি ভ'রে ঘি হোতো, দুধ হোতো—মাঝে মাঝে ঘরকন্নার মতন রন্ধন-সদনেও তা একটু জুটতো। ভেজাল জিনিষের প্রাচুর্য্যে বিশুদ্ধ জিনিষের অভাব ছিলো, তার বদলে খাঁটি জিনিষই পেটে যেতো। প্রসূতির খাওয়ার তত্ত্বাবধানই হোলো সবচেয়ে বড় তত্ত্বাবধান। এর অবহেলাতেই সূতিকা রোগ আক্রমণ করে। তা ছাড়া প্রাচ্য কতকগুলি নিয়মাবলী যা ছিল তাও মেয়েরা মেনে চলতো।

এই যেমন ধরো, আগে প্রসূতি—সন্তান পাঁচ-ছ মাস না হওয়া পর্য্যন্ত, রাত্রে ভাত না খেয়ে সে ভাতটা বিকেলে খেতো। এতে হজমের পক্ষেও যেমন সহায়তা করে শরীর সুস্থ হবারও তেমনি অন্তরায়। তখন তিন-চার মাস পর্য্যন্ত খাবার জল গরম অর্থাৎ ঈষৎ উষ্ণ পান করত। এর ফলও পূর্ব্বোক্ত মতন। এতে হজম, মলমূত্র-শোধনও যেমন করে, শরীরকে শুদ্ধ করবার সহায়তাও তেমনি করে। তোমরা আজকালকার মেয়েরা এখন সে সব পছন্দ কর না। গরম জল খেতে অনেক মেয়েরই বমি আসে।

গরম জল যে কত উপকারী আমার নিজের জীবনে যথেষ্ট অনুভব করেছি। চার-পাঁচ বছরের প্রবল সূতিকা শুধু খাবার পর একটু নুন মুখে দিয়ে এক গ্লাস গরম জল খেয়ে আরাম হ'য়েছে—যা অনেক ওষুধ-বিষুধেও কিছু-মাত্র উপশম হয়নি। খেতে হয়েছিল অবশ্য তিন-চার মাস ধ'রে। এখনো যেদিন হজমের গোলযোগ অনুভব করি সেই দিন খেয়ে অশেষ উপকার পাই। তোমরা এখন চা-টা খুব পছন্দ কর। সন্তান কিছে নষ্ট করতে অমন আর নেই।

সার পি, সি রায় বলেছেন যে চা পান না বিষ-পান। শুধু একটু গরম জল যদি খাও তবে মন্দীভূত ক্ষুধাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে। আর তাতে চায়ের পাতা ভিজিয়ে খেলে উদ্দীপ্ত ক্ষুধাকে মন্দীভূত ক'রে দেবে। ক্ষুধা নষ্ট তো ভাল নয়। তোমাদের যদি কোন খাবার না জোটে দুটি বেশী ক'রে চাল মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ো সেও ভালো তবু চা খেও না।

এ সময় পিত্তি তাতান মোটেই ভাল নয়। সকাল সকাল যা হয় কিছু খাওয়াই চাই।

আগে প্রসবের পর গোলমরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কালাজিরে প্রভৃতি রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে ঘর ক'রে মিশিয়ে রাখত। ভাত খাবার বেলা গরম ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে গরম ভাত দিয়ে দু' চার গ্রাস ভাত তার খানিকটা দিয়ে খেতো। এগুলোও খুব উপকারী। পূর্ব্বোক্ত গুণ এতেও আছে। তা ছাড়া জরায়ুকে শীঘ্রই সুস্থ ক'রে তোলে অথচ খরচা খুব সামান্য। তাই বলছিলাম আমাদের দুর্দ্দশা আরো বেড়েছে এই জন্যে যে প্রাচ্যকেও ছেড়েছি—অর্থাভাবে পাশ্চাত্যকেও ধরতে পারিনি।

আমার কালওঁড়ো খাবার কথা শুনে ডাক্তারদের মধ্যে কেউ রাগ করতে পারেন। কিন্তু তা ব'লে আর কি করা। ধনীদের জন্য ওসব ডাক্তারী মতে প্রসূত-পথ্য চলে; গরীবদের জন্য অন্য কিছু চাই। গোলমরিচ, কালাজিরে ভাঁঠ, পিপুল এসব যে কত রকমে উপকারী তা ভেষজ-বিধানের মধ্যে প'ড়ে দেখো। এতে ডাক্তারী ওষুধের চেয়ে উপকার কিছু কম হয় না।

একটা টোটকা ওষুধ তোমায় লিখিয়ে রাখি। দরকার মতন কাজে লাগিও। সন্তান হবার পর মেয়েরা 'হেন্তালের' ব্যাথায় বড় অসহ্য কষ্ট পায়। সে কষ্ট এমনি প্রবল, যে, অনেক মেয়ে তাতে একেবারে মেতিয়ে পড়ে। সন্তান প্রসব হবার পর মুহূর্তে, 'ফুল' পেটের ভিতরে থাকতেই আধ ছটাক খানেক কি তার চেয়েও কম একটু ঘই প্রসূতিকে খাইয়ে দিলে এ ব্যথা মোটেই হবে না। যদি বিশ্বাস না কর পরীক্ষা ক'রে দেখো। আমার বহুস্থানে পরীক্ষিত—অপকার কিছু হবে না।

আর কি লিখবো। খুব সাবধান হ'য়ে থেকো। মনে রেখো, প্রসবের পর সব চেয়ে ভীতিজনক ব্যাধি হোলো অজীর্ণ। তাকে খুব ভয় ক'রে চোলো। এ সময় আগুনের মত খিদে পাবে। একমুঠো ভাত কম হ'লে উঠতে মন সরবে না। কিন্তু নিশ্চয় জেনো খাওয়া কিছু বেশী হ'লেই অসুখ হবে। একটু কম-পেট রেখেই খেতে চেষ্টা কোরো। এমন যদি প্রসূতিকে খাবার জিনিষ নিজে হাতে না নিতে দিয়ে অপর কেউ সাবধানতার সঙ্গে দেয় তবেই ভালো হয়।

তোমার জন্য আমি শীঘ্রই একটা পোর্ট বা ভাইরোনা পাঠিয়ে দেবো। যাদের প্রসবের পর তেমন ধরা-নিয়ম না চলে তাদের এর একটা খাওয়া ভালো। এগুলি যেমন বলকারক তেমনি পাকস্থলীর শক্তিবর্দ্ধক এবং জরায়ুর উপর ক্রিয়া করে এজন্য সূতিকা রোগ থেকে বাঁচবার একটা ভালো জিনিষ এগুলি। দাম অবিশ্যি বেশী। কিন্তু একেবারে সর্ব্বাপন্ন হ'য়ে পড়লে তো অনেক কিছু খরচই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় করতে হয়। কাজের লোকটি প'ড়ে থাকলে সংসারেও দুঃখ-অসুবিধার অন্ত থাকে না। এজন্য মরি-বাঁচি ক'রে এর একটা প্রসূতিদের কিনে খাওয়ান উচিত। আমাদের বাঙালী-ঘরে মেয়েরা নিজের শরীরের উপর বড় তাচ্ছিল্য করে। নিজের জন্য কোন কিছুতেই যদি তারা যত্ন না নেয় তবে শরীর ভেঙে গেলে তখন তাদের স্বামী-পুত্রের সেবাযত্ন করবে কে? পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হ'লে শরীরটাকে তুচ্ছ করা চলে না। সেটা তার সংসারযাত্রার পথে সবচেয়ে বড় পাথেয়। গরীবের সংসারে কত রমণী—একটা বিকট অতিসম্পাতের মতন দুঃখময়।

মায়ের এই অনুরোধটুকু যেন রোজো, কাঁচা নাড়িতে বা-তা খেয়ো না। তোমরা শিক্ষিতা মেয়েও আঁতুড় থেকে বের হ'য়ে নিজের এবং সন্তানের মঙ্গলের জন্য যে আহারের সম্বন্ধে সংযত হ'য়ে চলতে রাজী হও না, তার অনেকটা কারণ পাশ্চাত্যের আলো। তোমাদের চোখে ধাঁধা ধরিয়ে সে-দিনের যা কিছু সবই ভুল সবই কুসংস্কার ব'লে ধারণা করিয়ে দিয়েছে।

তোমরা ভারতীয় মেয়ে, তোমাদের যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য জলহাওয়ার গুণে প্রকৃতিগত হ'য়ে আছে, তাকে একেবারে ছেঁটে ফেলে দিলে তোমাদের অনেক কিছুই সেই সঙ্গে খোয়া যাবে। অবশ্য, আবার তার সবগুলিকেই বজায় রাখলেও আপাতার প্রাদুর্ভাবে কালের গাছগুলি জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়বে। দেশীয় প্রথা সব বাদ দিয়ে, অন্য প্রথা তোমাদের ধাতে এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে সহ্য হওয়া কঠিন। এখন তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলিত বিধান প্রসূতির পরিচর্য্যায়ও নিয়োগ করতে হবে।

গর্ভাবস্থায় সেক-তাপ মোটে না দেওয়াও যেমন ভাল নয়, আবার অতিরিক্ত আগুন ক'রে প্রসূতির স্বাস্থ্য ভঙ্গ করাও তেমনি উচিত নয়।

আগের দিনে গর্ভাবস্থা থেকে আরম্ভ ক'রে সন্তান তিন-চার মাস না হওয়া পর্য্যন্ত প্রসূতিকে ঝড়-বাতাসে রাত-বিরাতে একলা বাহিরে ঘাটে পথে যেতে দিতো না; আর সেই না যাওয়াকে দৃঢ়তর করার জন্য ভূতেপাওয়া, বাতাস-লাগা প্রভৃতি নানা কুসংস্কার দিয়ে তাকে আবদ্ধ করেছিল। সেসব কুসংস্কার না মানা ভালো, কিন্তু প্রসূতির ভয় পাওয়া যে খুব খারাপ এটি তো অস্বীকার করবার জো নাই। ভয় পেলে গর্ভস্থ সন্তান বিকলাঙ্গ হ'তে পারে। প্রসবের পর তেমনটি হ'লে

প্রসূতির জীবন-সঙ্কট ব্যাধি হ'তে পারে এমন ভয় পাওয়া বড় খারাপ। প্রাণে কোন রকমের ধাক্কা বা আঘাত লাগা ভাল নয়। অনেক সময় সামান্য একটি কোন-কিছুর ছায়া একটা খুব বড় ভয়ের সৃষ্টি করে। তাই প্রসূতিকে এজন্য সাবধানে রাখতে হয়। সেকালের নিয়মাবলীর মধ্যেও অনেক গভীর সত্য লুকিয়ে আছে; তাকে উপলব্ধি ক'রে, আজকালকার অনুযায়ী ক'রে তোমাদের তুলতে হবে। বাহির থেকে শুধু ঢাক বাজালে প্রসূতির মৃত্যু-সংখ্যা কমবে ব'লে মনে হয় না। তাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে তাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। ধাত্রীশিক্ষার নয়া নয়া কথা লেখা থাকলে প্রসূতির তাতে কি উপকার? পুঁথিগত বিদ্যের মতই তা নিষ্ফল। থাক্ এসব কথা।

মেহাশীষ নিও। আজকাল কেমন আছ জানাবে। মেয়ের নতুন খবর জানতে চেয়েছ; নতুন খবর তো কিছু দেখি না! একটা খবর আছে। তোমাদের বালিকা স্কুলটি এবার মাইনর করা হোলো। সেটা গভর্ণমেণ্ট অধিকারভুক্ত হ'য়েছে। তোমাদের সময়ের মত আর বিনা বেতনে পড়ার এখন সুযোগ নাই; মেয়েদের মাইনে দিতে হ'চ্ছে। তা ছাড়া আরো খরচপত্র মেয়েদের জন্য অনেক বেড়ে গেছে। কাগজ, খাতা, সেলাইয়ের কাপড়-চোপড়ের জন্য অভিভাবকদের আগের চেয়ে খরচ অনেক বেড়েছে। একদিক দিয়ে সেটা অবশ্য বেশ সুন্দর চক-চকে ঝকঝকে হয়েছে। পড়াশুনাও ভালই হ'চ্ছে। ফিটফাট নিয়ম কানুন অনেক কিছুই মেয়েদের মেনে চলতে হ'চ্ছে। তা এতে যারা ধনী তাদের ভালোই হয়েছে। তবে গরীবের পক্ষে কতদূর সুবিধা হ'য়েছে তা বলা যায় না। অনেক দুঃখ-কষ্ট ক'রে আমাদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে হয়। ছেলেরা শুধু পড়াশুনা নিয়েই থাকে, মেয়েদের শুধু তা করলে চলে না। মায়ের সাহায্যের জন্য গৃহকর্ম, ছোট ভাই-বোন রাখা ইত্যাকার অনেক খুঁটিনাটি না করলে চলে না। হয় তো মায়ের কোলের খোকাটির অসুখ হ'য়েছে। ঘরে কি-চাকর নাই। খোকা কিছুতেই মাকে ছাড়ছে না। তখন মা বাস্ত হ'য়ে বলেন, নীলি, আজ তোর স্কুলে গিয়ে কাজ নাই' হয় তো খোকাকে নিয়ে একটু বাস, না হয় কিছু কাজ কর।

হয়তো বাড়ীতে একজন অতিথি এসেছেন। তার জন্য ঘরে কিছু রান্নাবান্নার বিশেষ আয়োজন করা হবে। কোলের ছোট ছেলেটি নিয়ে না পেরে উঠার বা বাড়ীতে আর কোন কাজের অসুবিধা থাকার বা বল্লেন, আজ আর তোর স্কুলে যেয়ে কাজ নাই। এর জন্য তাকে দোষ দেওয়া উচিত নয়,—কাকে দোষ দেওয়া উচিত তা অনেক সময় ভেবে পাই না। কাগজপত্রে এজন্যে মা-বাপকে বড় নিন্দে করতে দেখেছি। এমন কি এদেশের মেয়েদের শত্রু না কি মায়েরা একথাও পড়েছি। মায়েদের শত্রুতার মূলে যে মায়েদের অনাটনের সংসারই—সে খোঁজ কে রাখে? তবে জায়গাবিশেষে মায়েদের শিক্ষার অভাবও আছে। মা যে কোনদিন কারুর শত্রু বা অহিতা-কাঙ্ক্ষিণী হ'তে পারে না, তা তুমি এখন মা হ'য়েছ, শীঘ্রই বিশেষ ক'রে ঠিক পাবে। একথা যারা বলে বা লেখে তাদের আর কি বল্‌বো!

যাক একথা। যা বলছিলাম—খাতা, কাগজের ফিটফাটে গরীব মা-বাপের মেয়েদের অনেকখানি অসুবিধা বেড়ে গেছে। ছোট ভাই-বোন নিয়ে মেয়েদের পড়তে হয়। হয় তো তারা কত ঝিজিবিজি খাতায় আঁকল কিংবা দু-এক পাতা কুটুকে ছিঁড়ে নষ্ট করলে। স্কুলে সে খাতা দেখে মাষ্টার মশায় দূর ক'রে ফেলে দিলেন। সেলাইর কাপড়খানা অর্দ্ধভাবে একটু খারাপ ছিল, রিজেক্ট্ করলেন। আবার বাড়ী গিয়ে খাতার কথা বা কাপড়ের কথা পড়ালেই অভাবের সংসারে বার বার কত দেবো ব'লে মা-বাপ ব'কে একসা করলেন। মেয়ে বেচারীর তখন কি যে বিপদ হয় তা তারাই জানে। ভালো ক'রে দেখলে দোষ কাউকে দেওয়া চলে না। মাষ্টার মহাশয়েরা অপরিষ্কার খাতা ইনস্‌পেক্টর দেখলে তাড়া খেতে হবে ব'লে ভয় পান, রিজেক্ট্ও তাই—খারাপ কাপড়ে সেলাই ভাল হয় না। মা-বাপের অর্থের অভাব, চারপাঁচটি ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে,—কাঁহাতক পেরে উঠেন? কাজেই খিটখিট করেন। মেয়ে বেচারীদের হয়—বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।

সেদিন শুনলাম তোমাদের এখানকার স্কুলে পরিদর্শিকা এসে খাতার চারিধারে চার আঙুল ক'রে মার্জিন না রাখার ভারী রেগে খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। মাষ্টারেরা জানিয়েছিলো—স্কুলের প্রায় সব মেয়েরাই গরীব, এত ক'রে অযথা কাগজ অপচয় করতে তারা কিছুতেই চায় না। তাতে তিনি না কি রেগে বলেছেন—যারা গরীব, যারা খাতা জোগাতে পারে না, সেলাইয়ের কাপড় জোটাতে পারে না, তাদের আবার পড়তে আসা কেন?

কথাটা মিথ্যে নয়। গরীবের আবার শিক্ষার ইচ্ছে কেন? মনুষ্যত্বের বা জ্ঞানের উন্মেষের দাবি কি তাদের আছে? না, তার মান তারা জীবনে রাখতে পারবে? দরিদ্রতার কঠোর নিষ্পেষণে পদে পদে মনুষ্যত্বকে পদদলিত ক'রে জীবনপথে তাদের চলতে হবে।

বৈষেশিক খবরে আমরা যেখি সেখানে সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্ত কত-রকমের সুযোগ-সুবিধা ক'রে দেওয়া হয়। কত-রকমের কত প্রেরণা দিয়ে শিক্ষার্থিনীদের উৎসাহ বাড়ান হয়। আর এই হতভাগ্য দেশে শিক্ষার্থিনীদের অবস্থা তো এই।

ছেলেদের, মেয়েদের পড়াশুনো আজকাল দিন দিন যেমন বায়সকুল হ'য়ে উঠছে তাতে শিক্ষাবিষয়ে সাধারণের আর বেশীদিন যেতে হবে না। যাক্, গরীব-দুঃখীর জন্ত আর কে ভাবে? গ্রামে ধাত্রী নিকেতন প্রতিষ্ঠা কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হ'য়েছে। এসব থাক্—আজ তা হ'লে এই পর্য্যন্ত। নতুন লোকদের স্নেহচুম্বন কুড়িয়ে নিতে বোলো। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণী "মা"

চক্রবাকী

শ্রী প্রমথনাথ কুণ্ডার

অকূলে প্রদীপ চাকি' কত রব' জাগি,'—
জাগিবে না?—আশা-পথ চাহি যে কেবল··
ভাঙনের কূলে বসি' আছি তব লাগি'—
বুঝি আর ফেলি শুধু নয়নের জল!
কোন ঘাটে ফের' তুমি? ফিরে' এস ত্বরা,
এখনো হয়নি চিত্ত-কলসী কি ভরা?

(২)

নবীন নাবিক যদি পথ রোধি' থাকে
বাহির-নদীর গান শুনাইতে কানে;
থমকি' থামিও তুমি ব'লো, ব'লো তাকে—
তীরের বাঁশীর টান ভেসে' আসে প্রাণে!···
সঙ্গীহীন অন্ধকারে ফিরে' ফিরে' ডাকি,—
ফিরে' এসো, তীরে এসো মোর চক্রবাকী!

—বিদেশের—
মহিলা-সমিতি

ভোটে নির্ব্বাচন

জাতীয় মহিলা-সংঘের নবনির্ব্বাচিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় ১৭ জন মহিলা সভ্যা মনোনীতা হইয়াছেন। লেডী

লেডী বারউইক্

ডেনহাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছেন। লেডী বারউইক ৮৭৮ ভোট পাইয়া সভ্যা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

মহিলা সংঘের বার্ষিক অধিবেশন

বিলাতের জাতীয় মহিলাসমিতি-সংঘের বার্ষিক অধিবেশনকে মহিলাদের মহাসভা বলা যাইতে পারে। বার্ষিক অধিবেশনে একটি প্রীতি-সম্মিলনেরও ব্যবস্থা হইবে। লেডী ডেনহাম ঐ সম্মিলনের আয়োজন করিবেন। জাতীয় সংঘের সভায় এবং গ্রাম্য সমিতির অধিবেশনে এইরূপ সম্মিলনীর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। এই সভায় যেসকল প্রতিনিধি উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের আমোদপ্রমোদের জন্য ব্লাকপুল সহরের

মহিলাসমিতির শিল্প-বাজার

মিউনিসিপ্যালিটি সর্ব্বপ্রকার সাধারণ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইবার সুব্যবস্থা করিবেন। ট্রাম কোম্পানী বিনা খরচে তাঁহাদিগের গাড়ীতে সহরে যাতায়াতের অনুমতি দিয়াছেন। ব্লাকপুল সহরের মেয়র তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবেন।

স্বর্ণতারকা-ভূষিতা জননী

গত ইউরোপীয় যুদ্ধে যেসকল মাতাদের সন্তান যোগদান করিয়াছিল সেই সকল মাতাদিগকে রৌপ্যতারকা প্রদান করা হইয়াছিল, যে সকল মাতাদের সন্তান যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তাঁহাদিগকে স্বর্ণতারকা প্রদান করা হইয়াছিল। স্বর্ণতারকা-প্রাপ্ত প্রায় ৯ হাজার মাতা যুদ্ধ-

সাম্রাজ্য-সরকারের খরচে ইউরোপে তাঁহাদের মৃত সন্তানদের সমাধিস্থান দর্শন করার জন্য নীত হইবেন।

বিভিন্ন সংঘের সংবাদ

বিভিন্ন জেলা-সংঘে নিম্নলিখিত চিত্তাকর্ষক বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল :—কানাডা রাজ্যে মহিলাদের সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্যকর শয়নপ্রকোষ্ঠ, ইংলণ্ডের রাণীগণ, আর্কটিকে ভ্রমণ কল এবং কেন ভাল। এই সকল বিষয়ে একটি গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনা হয়। নয়কোক মহিলা সংঘের সভানেত্রী প্রকাশ করেন যে ঐ জেলা সংঘের সভ্য-সংখ্যা গত বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। নয়কোকের পরীক্ষিত হিসাব হইতে দেখা যায় যে মহিলা-সমিতির সংরক্ষিণী সমিতির তহবিলে ১৯২৪ সালের তুলনায় ১১৩ পাউণ্ড ৫ শিলিঙ ৬ পেন্স বৃদ্ধি হইয়াছে।

আইল অব্ ম্যানে মহিলাসমিতি

১৩ বৎসর কাল হইতে স্কটল্যাণ্ডের প্রথম মহিলাসমিতি লওনিডারীর সভানেত্রী মিসেস ব্রেয়ার প্যাট্রিক গ্রামে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নূতন সমিতিটিও স্কটল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইহার নামের পূর্ব্বে Rural অর্থাৎ গ্রাম্য এই শব্দটি যোগ করিবেন স্থির করিয়াছেন। ঐ দ্বীপের কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীর স্ত্রী মিসেস হাউই (Mrs. Howie) সমিতির সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। হাউস অব্ কিজের স্পীকার কিন (Mr. Kneen of the House of Keys) এই অনুষ্ঠানকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন এবং ইহার প্রতি শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। নূতন দক্ষিণ ওয়েলস্-এ ছুটির বিশ্রাম-গৃহ সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোক এবং শিশুরা বিশ্রাম-সুখ এবং স্থানপরিবর্ত্তনের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না, তাহারা এই সুযোগে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে। এই সকল বিশ্রাম-গৃহে আসিবার পূর্ব্বে অনেক শিশুরাই সমুদ্র দর্শন করে নাই। অনেক এমন লোক এই সকল বিশ্রাম-গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ স্থানে প্রায় ৪ বৎসর কাল কখন বর্ষা দেখেন নাই।

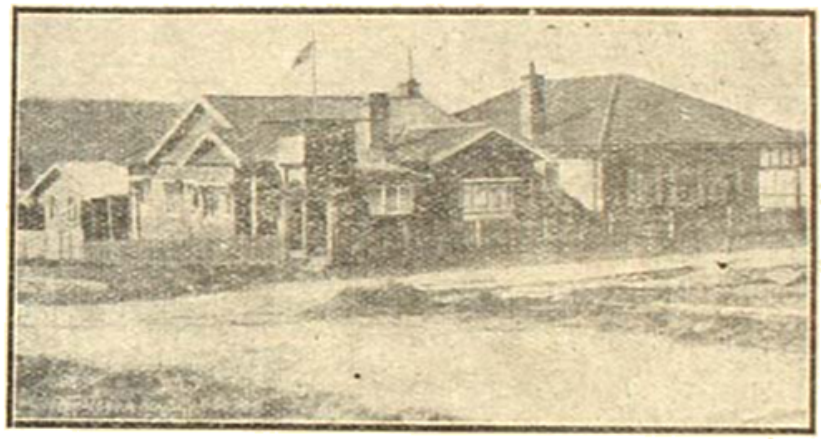

গ্রাম্য মহিলাসংঘের সমুদ্রতীরস্থ বিশ্রাম-ঘর

একটি মহিলাসমিতির সংবাদ

গ্রেট রিসিংটন মহিলাসমিতি গত ১৯২৯ সালে সুন্দর কাজ করিয়াছে। সভ্য-সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। চিঠি, কর্ম্মসূচি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপহার আদান-প্রদান এবং সর্ব্বোপরি নিউজিল্যাণ্ড স্কাউটসদের আগমনে নিউজিল্যাণ্ড-এর গ্রেট ইবলিংটন মহিলাসমিতির সহিত একটি সখ্য-সূত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটি বাগানে মহিলাসমিতির সভ্যাদের একটি সভা হইয়াছিল. তাহাতে কোন সভ্যার একজন অন্ধ বোন ঝুড়ি-বোনা প্রদর্শন করেন। ইহার পর ঐ বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য তিনি দুইটি ক্লাশও পরিচালনা করেন। আরও অনেক শিল্পশিক্ষার ক্লাস এই সমিতি পরিচালনা করেন। ম্যানর-উদ্যানে যে মেলার

উদ্বোধন করা হইয়াছিল তাহা সামাজিক এবং আর্থিক হিসাবেও সার্থক হইয়াছিল ; এখানে ঐক্যতান বাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। একটি ষ্টলে যথেষ্ট বিক্রয় হইয়াছিল। এখানে আনুষঙ্গিক অন্যান্য নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সমিতির সঙ্গীতসংঘ যথেষ্ট উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং গ্রামের সঙ্গীত এবং নৃত্য-সংঘের সকলকেই আনন্দ দান করিতেছেন। ১৭ই জানুয়ারীর অপরাহ্ণকালীন সভা সম্পূর্ণভাবে নূতন ধরণের হইয়াছিল। নূতন বর্ষের অভিনন্দন জ্ঞাপনের পর, সব-কমিটি গঠনের বিবরণী এবং নূতন কর্ম্মবিভাগের কথা জানান হইয়াছিল।

মহিলাসমিতিতে পরিচয়-পরীক্ষা

মহিলাসমিতিতে সভ্যারা পরস্পরকে বিশেষভাবে না জানিলে সৌহৃদ্য এবং সখ্যসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিলাতের এক মহিলাসমিতি অতি কৌশলে এই পরিচয়-কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য একটি চমৎকার খেলা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহা এই—পরিচিত এবং অপরিচিত মহিলাদের গায়ে একখণ্ড কাগজে তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় নাম লিখিয়া লাগাইয়া দেওয়া হয়; সেই কাগজগুলিরই অন্যদিকে একটি নম্বর থাকে ; চা পানের সময়ে ঐ কাগজ-খণ্ডগুলি উল্টাইয়া নম্বরগুলি দেখান হয়; প্রত্যেকের গায়ে তখন ঐ সকল নম্বর দেখাইয়া অপরিচিতা মহিলাদের নাম করিতে বলা হয়। যিনি অধিকসংখ্যক নাম উল্লেখ করিতে পারেন তাঁহাকে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়।

মহিলাসমিতির আন্দোলনে কৃষির স্থান

যে মাসের বিলাতের মহিলাসমিতির মুখপত্র হোম এণ্ড কান্ট্রি পত্রিকায় "মহিলাসমিতির আন্দোলনে কৃষির স্থান" বিষয়ে এম, এইচ, সিবসন একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষের মহিলাসমিতিগুলিরও এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। লেখক বলিয়াছেন যে, কৃষি নাগরিক এবং পল্লীবাসী উভয়ের পক্ষেই অতি প্রয়োজনীয়। কৃষির উপরেই যে আমাদের জীবন নির্ভর করে তাহা অনেকেই জানেন না। বর্ত্তমান যুগের সাধারণের রুচি এবং অভ্যাসের পরিবর্ত্তন হওয়ায় কৃষির অবনতি পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে মহিলাসমিতিগুলির কর্ত্তব্য পল্লী-জীবনে উপদেশ এবং শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া কৃষির উন্নতি বিধানে সাহায্য করা। অন্য যে-কোন ব্যবসায় চেয়ে মহিলারা কৃষি এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে পুরুষদিগকে অধিক সাহায্য করিতে পারেন। সকলেই জানেন যে মেয়েরা কৃষিবিষয়ক সাধারণ তথ্য না জানিলে জোৎদার বা খামারদার বাড়ী হইতে অনুপস্থিত হইলে কত ক্ষতি হয়। কোন দেশে এমন ব্যবস্থাও আছে যে জোৎ গ্রহণ করার সময়ই জোৎদারকে প্রমাণ করিতে হয়, তাহার স্ত্রী অথবা কন্যা কৃষিবিষয়ে কিরূপ অভিজ্ঞা। কৃষি এবং উদ্ভিদ্ বিষয়ে যে-সকল লোক কাজ করেন, তাঁহাদের প্রায় ৩ ভাগের এক ভাগ মহিলা কর্ম্মী। মহিলাসমিতিগুলিকে প্রামে কৃষিবিষয়ক সাধারণ তথ্য এবং জ্ঞানপ্রচারের জন্য উৎসাহিত করা হইতেছে। বিদেশের কৃষিবিষয়ক জ্ঞান পল্লীজীবনের একটি বিশেষ অংশ। বেলজিয়ামে হাতে-কলমে কৃষিবিষয়ক তথ্য এবং কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়; গ্রামের কৃষক এবং কৃষকপত্নীরা এই সকল শিক্ষা গ্রহণ করিবেন আশা করা হয় এবং সভ্যাই তাঁহারা একত্রে এই শিক্ষা লাভ করেন। কোন জেলা মহিলা-সংঘ গোপালন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করায় কোন ক্ষুদ্র জোৎদারের ভগ্নী ঘোল এবং নরম পনীর উৎপাদনে এতই দক্ষা হন যে তাঁহার গ্রাহকদের চাহিদা মিটাইবার জন্য তাঁহাকে একটি অতিরিক্ত গরু পোষণ করিতে হইয়াছিল। কৃষি এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, শিল্প, গানবাদ্য এবং অভিনয়ের মত মহিলাদের যথেষ্ট কর্ম্মের সুযোগ না দিতে পারিলেও, যেসকল মহিলারা ঐ-সকল কাজে বিশেষ উৎসাহী, তাঁহাদের সহযোগিতায় মহিলা-সমিতির ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান এবং উৎপন্ন-দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া যথেষ্ট উপকার ও সাহায্য পাওয়া যায়। ফলরক্ষার ব্যবস্থাও দিন দিন উন্নত হইতেছে ; তবে আরও উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। বোতলে ফলরক্ষার যে ব্যবস্থা মহিলাসমিতির প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা ঐ বিষয়ের বিশেষ শিক্ষকের দ্বারা পরিচালিত লিওন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শিত ব্যবস্থা হইতে যথেষ্ট উন্নত। ফল-রক্ষা, জ্যাম, জেলী, সিরাপ তৈরী ইত্যাদি সুন্দর গৃহশিল্পে পরিণত হইতে পারে। আমাদের দেশের

পক্ষে এই সকল কথা আরও অধিক প্রযোজ্য। নরফোক জেলা মহিলাসঙ্ঘ আমি তৈরী সমবায়-প্রণালীতে পরিচালিত করিয়া বিশেষ লাভজনক করিয়াছেন। পশু এবং পক্ষী-পালন বিষয়েও যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। এই বিষয়েও মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পশু এবং পক্ষীদিগকে উপযুক্ত ভাবে খাওয়ান, তাহাদের জন্য উপযুক্ত গৃহের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিভিন্ন স্থানে এমন অনেক পশু এবং পক্ষী আছে যে তাহাদের জন্য যে খরচ করা হয় তাহাদের মূল্য তাহার চেয়ে কম হইয়া পড়িয়াছে। শাকসব্জি-উৎপাদন বিষয়েও সমিতির সভ্যদের বিশেষ উপদেশ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শাকসব্জি-উৎপাদনে মহিলাদের টাকা করার পথ প্রদর্শন করিতে না পারিলেও টাকা রক্ষার পথ নির্দেশ [illegible]

চাম্পসায়ার মহিলাসঙ্ঘ

চাটলে মহিলাসমিতি দশ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সভ্য-সংখ্যা দুই শত। সকারণে মহিলা-সমিতি ইহাদের সদস্যদিগের জন্য একটি প্রীতিমিলন ও অনুযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চিলিংহাম মহিলাসমিতি কোন হাঁসপাতালের জন্য এক হাজার এক শত ডিম সংগ্রহ করিয়াছিল। মার্চ উড মহিলাসমিতিতে স্বামীর স্ত্রীর চিঠি পুলিশ পড়া উচিত কি না এই বিষয়ে আলোচনা হয়।

চারফোর্ড সায়ার মহিলা সঙ্ঘ

মিস্ উইট কিছু প্রায় ৯টি মহিলাসমিতিতে বক্তৃতা দেন। জিন-সংরক্ষের বিক্রয়িনী কর্মীর স্থান, প্যাকিং এবং ডিম্ব বেওয়া বিষয়ে ক্রেডেন-হিলে বক্তৃতা করেন। ফুটনহোপ মহিলাসমিতি শিক্ষার ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তার জন্য পুরুষদের প্রবেশের সভাগৃহের নিমন্ত্রণ করেন। টাইসিলটন মহিলা-সমিতিতে অল্পবয়স্ক সভ্যা কমসংখ্যক হওয়ার কারণ কি এবং গ্রামের কি কি উন্নতি হওয়া প্রয়োজন এই বিষয়ে ফেব্রুয়ারী মাসের সভায় আলোচনা হয়। মিস্টার ক্লাউ ইংলণ্ডের প্রাণীপ্রবেশ রক্ষার বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মিস্ টাইর বেনিংটন মহিলাসমিতিতে চায়না এবং জাপান সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা-বিধায়িনী সভার উদ্যোগে 'মাছি এবং তাহার বিপদ' বিষয়ে বক্তৃতা হয়। গত নভেম্বর মাসে ব্রিচউড মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্তমানে তাহার সভ্য-সংখ্যা ৭০ জনের উপর। রাগ, দস্তানা, পোষাক এবং গ্রাম পুতি তৈরীর প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। এসেনডন মহিলা-সমিতিতে গ্রাম এবং সহরের সুবিধা ও অসুবিধা বিষয়ে আলোচনা হয়।

হানটিংডন সায়ার মহিলাসঙ্ঘ

হানটিংডনে যে বার্ষিক উৎসব হয় তাহাতে প্রায় ৩০টি মহিলাসমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় যে জেলা-সঙ্ঘের বার্ষিক খরচ প্রত্যেক সমিতি আর্থিক ভাবে বহন করিবেন, তাহা হইলে অনির্দিষ্ট হানটিংডন রেট্যার আয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। হানটিংডন সায়ার মহিলাসঙ্ঘের সাহায্য-কাণ্ড গঠনে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যা মত দিয়াছেন। মিস রেডওয়ে হানটিংডনে চাদরার কাজ করার প্রণালী বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দেন। এই সঙ্ঘে একটি সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে; এই কমিটি বিভিন্ন সমিতির কার্য্য-সূচী প্রস্তুত করিবেন, এবং নূতন বক্তা এবং যাঁহারা আমোদ-প্রমোদ, অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন তাঁহাদের তালিকা, সমিতি-গুলিকে পরিচিত করিয়া দিবেন। ফেব্রুয়ারী মাসের বিভিন্ন সভাগুলি প্রীতিমিলনের আকারে অনুষ্ঠিত হয়। সভ্যারা এই সকল সভায় স্বামী, বন্ধু এবং শিশুদের আপ্যায়িত করেন।

[illegible]

মালয় উপদ্বীপে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

শ্রী অযোধ্যানাথ সেন

ঐজল বাহিরবর্ষণের পর, বর্ষাঋতুর অবসানে চিরপরিচিত পুষ্পসম্ভার-সমৃদ্ধ শরৎ আসিয়া সকলকে আবাহন করে—ওগো উঠো! চিরানন্দময়ী মা যে এলো,—ওগো জাগো,—বর্ষপরে আবার জগজ্জননী তাঁর কাঙাল সন্তানের ভক্তি-অর্ঘ্য লইতে আসিয়াছেন!—তাঁর অর্চ্চনার আয়োজন কর। শরতের আবাহনে সকলে যেন গভীর নিদ্রা হইতে জাগে,—ভক্তি-ভরে মায়ের পূজার আয়োজন করিতে লাগিয়া যায়। চিরানন্দময়ী মা আমাদের বর্ষপরে তাঁর দরিদ্র সন্তানের কাছে ফিরিয়া আসেন,—তাই তো নিরানন্দ প্রাণে আনন্দের বন্যা বহিয়া চলে—বাঙালী সবাই আহ্লাদে আত্মহারা—আনন্দে বিভোর!

ভারতের বাহিরে, রেঙ্গুনে গত কয়েক বৎসর যাবৎ দুর্গোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে সত্য, কিন্তু সুদূর মালয়-উপদ্বীপে দুর্গাপূজা গত বৎসরই প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে কারিগর আনাইয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করা হয়। সিঙ্গাপুর হইতে দুই-জন শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত বাঙালী ব্রাহ্মণ আসিয়া পূজাকার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করেন। পূজান্তে, প্রতিমা যথারীতি সমুদ্রে বিসর্জ্জন করা হয়। পূজার ব্যয় আমাদের দেশের টাকার হিসাবে প্রায় ২৯০ হাজার টাকার মতন হইয়াছিল।

মালয় উপদ্বীপের দুর্গোৎসবে সমবেত মহিলাবৃন্দ

শুধু বাঙলার বাঙালীই যে বৎসরে একবার মাকে অর্চ্চনা করিয়া আনন্দভোগ করে, তাহা নহে। বাঙলার বিশেষত্ব বাঙালী, আর বাঙালীর বিশেষত্ব বাঙালীত্ব। বাঙালী যেখানেই গিয়াছে তাহার বিশেষত্বটুকু বজায় রাখিয়া চলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে, এবং সেই চেষ্টা গৌরবমণ্ডিতই হইয়াছে। বাঙলার মায়ের আগমনীর সুর বাজিয়া উঠে, আনন্দের বন্যা ছুটিয়া চলে,—আর তারই প্রতিধ্বনি তারই প্রবাহ গত বৎসর সুদূর মালয়-উপদ্বীপেও আসিয়া পহুঁছিয়াছিল। বাঙলা-মায়ের যে সকল কাঙাল সন্তান নানা কর্ম্মব্যপদেশে তাঁহার স্নেহ-কোমল ক্রোড় হইতে দূরে, সুদূর মালয়ে প্রবাসে কালযাপন করিতেছেন, তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও একান্ত চেষ্টার ফলে মালয় উপদ্বীপেও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

পূজার জন্য একখানা বড় দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লওয়া হয়। মালয়-প্রবাসী প্রায় সকল বাঙালীই স্ত্রী-পুত্রকন্যাগণ-সহ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। মালয় দেশে এতবড় বাঙালী সম্মিলনীও বোধ হয় এই প্রথম। সমবেত অনেক ভদ্র মহোদয়ই স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ সহ ৩৪ দিন এই পূজাবাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই কয়দিন এমনই আনন্দে কাটিয়াছিল যে আমরা প্রবাসে কি স্বদেশে আছি বুঝিতে পারিয়াছিলাম না।

সমবেত মহিলাবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও একান্ত অনুরাগ অতীব প্রশংসার যোগ্য।

শিশুমঙ্গল

শিশুর স্বাস্থ্য

শ্রী উষা মিত্র

পৃথিবীতে আমাদের কার্য্যক্ষম হ'য়ে থাকতে হ'লে, সর্ব-প্রথম প্রশ্ন ওঠে স্বাস্থ্য নিয়ে। অকালমৃত্যুকে আনতে রোগের তৎপরতা খুব বেশী। শরীরে রোগ থাকলে মাথাও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে—স্ফূর্ত্তি, আগ্রহাদি থাকে না, স্মরণ-শক্তি ক্ষীণ হ'য়ে যায়—এমন কি কোন বিষয়ে ঠিকমত বিচার করবার শক্তি পর্য্যন্ত আমরা হারিয়ে বসি। এই অবস্থায় সন্তান জন্মালে তার স্বাস্থ্য মা-বাপের অনুযায়ী হওয়াই স্বাভাবিক। যা আছে তাতো আছেই;—এখন আমাদের দেখতে হবে,—এখন যাঁরা নূতন মা হবেন সেই মা এবং নবজাত শিশুর স্বাস্থ্য কিসে ভাল রাখা যেতে পারে। আমাদের বাঙলা দেশেই প্রায় ৭৮ শত শিশু রোজ মারা যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে দেখেও দেখি না, শুধু তাই নয়, আবার পরম গম্ভীর মুখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব'লে থাকি,—ছোট লোকদের ছেলেরা মরে, তাতে তোমার আমার কি? আমরা যে বড় লোক—শিক্ষিত, ভদ্র। কিন্তু এটা শুধু গায়ের জোর, মুখের আস্ফালন। যদি বুকে হাত দিয়ে বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখি তা হ'লে নিজেদের দুর্বল, দৈন্য দেখতে পাব। দেখব—আমাদের দেহের অস্থিগুলার পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি না হবার দরুণ আমরা খর্ব্বাকৃতি হ'চ্ছি—রুগ্ন হ'চ্ছি—অর্থাৎ কি না রোগ-প্রতিরোধক শক্তি ক'মে যাচ্ছে, মন ছোট হ'য়ে পড়ছে—চক্ষের দৃষ্টি অভাবে চশমা নিতে হ'চ্ছে। বুদ্ধিমান জাতি ব'লে যে একটা প্রাধান্য ছিল সেটা ধীরে-ধীরে কমছে। তার মানে—আমরা মেধা, কাজের কুশলতা হারাচ্ছি। সেই কারণে আমাদের ছেলেরা অপুষ্ট অবস্থায় জন্মাচ্ছে।

এখন আমাদের দেখতে হবে যে কি উপায়ে গর্ভবতী এবং গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য সুস্থ থেকে পুষ্ট সন্তান জন্মাতে পারে। প্রথম কথা খাদ্য, কিন্তু তার আগে দেখতে হবে সেই খাবার মুখের মধ্যে দিয়ে পেটে যায়। মুখের মধ্যেকার দাঁত পরিষ্কার না থাকলে কতকগুলা খারাপ বীজাণু খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে পেটে যায় এবং পরে অনিষ্ট করে। আমরা কয়লার গুঁড়া কিম্বা পাশ্চাত্যের অনুকরণে জোর বিলাতী দাঁতের মাজন ব্যবহার করতে শিখেছি—কিন্তু এতে প্রথমতঃ কতকগুলা পয়সা নষ্ট, দ্বিতীয়তঃ এসব তেমন উপকারীও নয়। পূর্ব্বকালে নিমের দাঁতন ব্যবহার করা হ'ত। আমরা বইয়ে প'ড়ে দেখতে পাই তখনকার লোকেরা দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন—অবশ্য শুধু এক নিমের দাঁতনের গুণে নয়—তার সঙ্গে তাঁদের জীবনযাপনের অনা-রকম নিয়ম এবং পুকুরের টাটকা মাছ, বাড়ীর দুধ ও শাকসব্জী ইত্যাদিও স্বাস্থ্যের পক্ষে সাহায্য করত। কিন্তু আজ তো আমাদের সেসব কিছু নেই—তবে এরই মধ্যে যা আমাদের আছে তারই ভিতর যেটুক যা সুবিধা ক'রে নেওয়া যায়। অন্য মাজনের পরিবর্ত্তে নিমের দাঁতন সহজেই আমরা ব্যবহার করতে পারি, এবং খাবার সময় শীগ্‌গির না ক'রে খাদ্যদ্রব্য খুব চিবিয়ে ধীরে ধীরে খাওয়া,—এও কষ্ট-কর নয়। তারপর টাট্‌কা ও জীবনীশক্তিপূর্ণ খাবার খাওয়া উচিত। ফলের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জীবনীশক্তি আছে—অন্ততঃ প্রসূতি অথবা গর্ভবতীকে দেওয়া ঠিক—তবে সকলের আর্থিক অবস্থা সমান নয়,—আমরা যারা ফল কিনতে পারব না তারা শাক-সব্জী, তরকারী—যেমন পালং, ঝিঙে, ঢ্যাঁড়স, পটোল, লাউ, শিম, বিলাতী বেগুন, ইত্যাদি দেব। ডাক্তারেরা বলেন এইগুলার মধ্যে জীবনী-শক্তি (ভাইটামীন) আছে। আবার এগুলাকে আধসিদ্ধ ক'রে খেলে বেশী উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু খাদ্যের

উপরই গর্ভবতী অথবা প্রসূতি ও সন্তানের স্বাস্থ্য নির্ভর করে না; তার সঙ্গে রৌদ্র, বায়ু ও জলের দরকার। রং কালো হবার ভয়ে মা এবং ছেলেকে রৌদ্র থেকে আলাদা রাখবার চেষ্টা করব না, বা ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে মাসে একবার স্নান ও ঘরের জানালা-দরজা গুলাও বন্ধ ক'রে রাখব না। বেশ পরম কাপড় পরিয়ে তাদের হাওয়াতে রাখলে উপকার পাওয়া যায়। গর্ভবতীর মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকা প্রয়োজন। তাতে গর্ভস্থ সন্তানের মনও মায়ের অনুকরণে তৈরী হ'তে সহায়তা পায়,—সন্তান দীর্ঘায়ু, সুস্থ, সবল হয়।

এখন হ'চ্ছে আঁতুড়ের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কথা। আমরা অধিকাংশেরা আঁতুড় এমন স্থানে নির্ব্বাচন করি যেখানে না কি রৌদ্র, বায়ু প্রবেশ করবার পথ পায় না। বাড়ীর মধ্যে অন্ধ যে ঘর সেই ঘরে মেয়েরা প্রসব হন,—তার পরিণাম—অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস ক'রে নবজাত শিশু এবং প্রসূতি রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়েন। যদি আমরা ভেবে দেখি তা হ'লে দেখব আঁতুড়ই আমাদের তীর্থ। আমরা ঘর ছেড়ে বাইরে দৌড়াই—কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতির বিগ্রহ দেখতে তীর্থে। কিন্তু তাঁরাও এই মানুষীর গর্ভে আঁতুড়-তীর্থে জন্মেছিলেন। কে বলতে পারে কখন, কোন্ মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রবি ঠাকুর আমাদের ঘরে জন্মাবেন না? না, একথা তো আমরা কেউ বলতে পারি না। যখন দিনের পর দিন এঁরা জন্মেই আসছেন তখন আবার যে এঁদের মত মনীষীরা পৃথিবীতে জন্মাবেন না এমন ধারণা আমরা করতে পারি না। এখন দেখা যাচ্ছে আঁতুড়কে যে আমরা হেয় চক্ষে দেখে শুচিতা রক্ষা ক'রে চলি সেটুকু ঠিক উল্টা করি। উপরকার কথাগুলো ভেবে দেখলে দেখা যাবে, ঐ আঁতুড়ই আমাদের পরম পবিত্র তীর্থ কারণ ওরই মধ্যে থেকে পবিত্র আত্মাদের আমরা পেয়েছি—পাচ্ছি। তখন অন্ততঃ তাঁদের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্যেও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

বাড়ীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রৌদ্র-বায়ুপূর্ণ যে ঘর সেইটাই প্রসূতিকে দিতে হবে—রৌদ্র-বায়ু যে ঘরে প্রবেশ করে না তাতে এমন অনেক খারাপ রোগের বীজাণু থাকে যা আমাদের নিশ্বাস, স্পর্শ-আদির সঙ্গে ভেতরে গিয়ে অনিষ্ট করে। নোংরা মলমূত্র বিছানা কিম্বা একখানা মাদুর মাত্র না দিয়ে ছেঁড়া হোক কিন্তু পরিষ্কার বিছানা দিতে হবে তাতে মা এবং ছেলের স্বাস্থ্য ভাল থাকাই সম্ভব। আমাদেরই অবহেলায় কত ছেলে আঁতুড়েই মারা যাচ্ছে। শিশুর পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী—স্বাস্থ্যবান মায়ের দুধ, রৌদ্র, বায়ু নিয়মিত স্নান এবং পরিষ্কার জল ও কাপড়।

যে মায়ের স্বাস্থ্য খারাপ, রোগে ভুগছেন, এমন মায়ের দুধ সন্তানের পক্ষে অমৃত নয় বরং বিষের কাজ করে। দুধ মায়ের দুধ না দিয়ে নিজের সামর্থ্যানুযায়ী ধাত্রীর দুধ তাকে দেওয়া যায় কিন্তু এই মায়ের যত বড় শিশু সেই ধাত্রীরও তত বড় শিশু থাকাই উচিত, তবেই সে দুধ শিশুর পক্ষে উপকারী হবে। ধাত্রী রাখার সামর্থ্য আমাদের সকলের যদি না থাকে তবে আমরা শিশুর জন্ম হিসাবে গরুর বাছুরের জন্মদিন মিলিয়ে নিয়ে অর্থাৎ কি না যতদিনের শিশু হবে ততদিন না হোক কিছু দিন কম-বেশী ক'রে বাছুরের জন্ম-হিসাব ধ'রে গরুর দুধ এক ভাগ এবং জল তিন ভাগ মিশিয়ে ৩ ঘণ্টা অন্তর শিশুকে দেব। বিলাতী দুধ অপেক্ষা গরুর দুধ যথেষ্ট উপকারী। শিশু কেঁদে উঠলেই আমরা মনে করি তার খিদে পেয়েছে এবং তার কাঁদবার কারণটুকু অনুসন্ধান না ক'রেই অ-খিদের ওপরই দুধ দিই; কিন্তু তাতে তার অনিষ্ট হয়। প্রত্যেক কাজেই একটা নিয়ম থাকলে সে কাজ যেমন শৃঙ্খলিতভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে অনিয়মে তা হ'তে পারে না। সেইজন্য শিশুকে খাওয়ান, তাকে ঘুমপাড়ান, স্নান করান, বেড়াতে পাঠানর প্রথমেই আমাদের একটা নিয়ম অর্থাৎ সময়নিরূপণ ক'রে নেওয়া দরকার।

সন্তানের পালন এবং স্বাস্থ্যরক্ষা এক মস্ত বড় বিষয়, সে দু' কথায় বোঝান যায় না। যে কোনও কাজ, একদিনেই শিক্ষা করা যেতে পারে না, ধীরে ধীরে তাকে শিখতে হয়, করতে হয়। অন্ততঃ বহুখানেক আমরা উপরি-টক বিষয়গুলা কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করব, তারপরে আবার এই বিষয়ের আলোচনা করা যাবে।

তেজপুর (আসাম)

বিগত ১লা বৈশাখ তেজপুর জেলা-সমিতির বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ২১ বৎসর পূর্ব্বে একবার ভয়ানক এবং ভয়াবহ ভূমিকম্পের সংবাদ পাইয়া স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্তা বৃদ্ধা প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী স্বর্ণলতা দত্ত, বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা দেবী এবং স্থানীয় আর একটি স্বর্গীয়া সম্ভ্রান্ত মহিলা চারুবালা দেবী গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ দুই স্থানে প্রেরণ করেন। এমন সময় ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্তা সরলাবালা গুপ্ত মহিলা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন; সেই হইতেই এই সমিতির সৃষ্টি হয়। তখন ইহা হাস্যজনক ও কৌতুককর ছিল। কত লাঞ্ছনা, কত বিদ্রূপ সহ্য করিয়া শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা দেবীর পুত্রগণ চাঁদা সংগ্রহ করিতেন। একবার কোন কোন ব্যক্তি স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বুঝাইয়াছিলেন যে এই মহিলা-সমিতি বঙ্গবাসিনী মহিলাদিগের গুপ্তসমিতি। ইহা লইয়া বহু আন্দোলন হয় এবং সমিতিরও মৃতদশা হইয়াছিল। অবশেষে যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্ট সমিতি হইতে কিছু টাকা ধার করেন। এইরূপে অনেক বাধাবিঘ্নের পর সমিতির ভিত্তি কিছু দৃঢ় হয়,—গবর্ণমেণ্টের ইহার প্রতি সন্দেহ দূর হইয়া সুনজর পড়ে। পূর্ব্বে এক একবার এক এক বাড়ীতে সমিতির অধিবেশন হইত। গবর্ণমেণ্ট যখন হইতে সমিতির বিষয় ভালরূপে জানিতে পারিলেন, তখন হইতে স্থানীয় বঙ্গবাসিকা-বিদ্যালয়গৃহেই সমিতির অধিবেশন করিবার অনুমতি পাওয়া গেল। তাহাতে সমিতির কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে করিবার অত্যন্ত সুবিধা হইল। এখন হইতে নিয়মিতভাবে কার্য্য চলিতে লাগিল। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—(১ম) শক্তিমত সামান্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দীন-দুঃখীর সাহায্য করা, প্রতি বৎসর শীতের সময় ১০।১২খানা কাপড় অথবা কম্বল প্রদান। (২য়) দরিদ্র আশ্রয়হীন বালক ও যুবককে শিক্ষার জন্য সাহায্য করা; স্থানীয় মহিলাগণের একত্রে সদালোচনা।

বিশেষত্ব বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্তা। প্রতিবার সমিতির অধিবেশনের পর প্রত্যেককে সমস্ত কার্য্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব পাঠান হয়। এই সকল কার্য্য হাতে লিখিয়াই করিতে হয়।

বৎসরে তিনবার করিয়া সমিতির বিশেষ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত প্রতি মাসের দ্বিতীয় রবিবারে নানা দেশের মহিলা-সংবাদ পাঠ ও নানা বিষয়ের আলোচনা হয়।

প্রতি ১লা বৈশাখ সমিতির জন্মদিন ও নববর্ষোপলক্ষে একটি শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হয়। উহাতে মহিলাদিগের হস্তনির্ম্মিত সর্ব্বপ্রকার জিনিষ সংগৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত সমিতির আয়বৃদ্ধির জন্য এবং দরিদ্র গৃহস্থরমণীদিগের উপকারের জন্য শিল্পভাণ্ডার খুলিয়া শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ইহা হইতে সমিতিকে সামান্য কমিশন দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য ও শিশুপালন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য বৎসরে অন্ততঃ ২।৩ দিন কোনও অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিত্র সহযোগে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সমিতি হইতে প্রথমতঃ একজনকে নার্সিং শিক্ষা দিয়া আনিবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। পরে আবার কোন দরিদ্র বুদ্ধিমতী বালিকাকে উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল অর্থসাপেক্ষ কার্য্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করা হইতেছে।

বর্ত্তমান চাঁদাদাত্রীর সংখ্যা ১১২ জন; তন্মধ্যে বিশেষ সভ্যা ২৪ জন। সম্পাদিকা স্থানীয় বৃদ্ধ উকিল রাধাবাজারের মনোমোহন লাহিড়ীর পত্নী শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা লাহিড়ী, সহযোগী সম্পাদিকা স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায়, হিসাবপত্র প্রভৃতির কার্য্যকারিণী অন্যতমা শিক্ষয়িত্রী কুমারী বিনোদবালা দাস।

তেঘরিপুর অতি ক্ষুদ্র সহর। এখানকার প্রত্যেক পরিবারের সহিত প্রত্যেক পরিবারের পরিচয় আছে; সুখে-দুঃখে রোগে-শোকে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাহায্য করেন ও খবরাখবর করেন। গৃহস্থমহিলারা প্রায় প্রত্যেকেই সুন্দর গৃহোপযোগী সেলাই জানেন। এই সমিতির প্রধান উদ্যোগী যদিও বাঙ্গালী মহিলা কিন্তু ইহা শুধু বাঙ্গালার নহে, ইহার নাম "ভারত মহিলা সমিতি"—সর্ব্বদেশীয়া এবং সকল শ্রেণীর নারীই ইহার সভ্যা আছেন ও হইতে পারেন। স্থানীয় সিভিল সার্জ্জেনের অষ্ট্রেলিয়াবাসিনী পত্নী মহদয়া মিসেস হীচি এই সমিতির একজন স্থায়ী সভ্যা। তিনি ইহাতে রীতিমত যোগ দেন এবং ইহার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কলিকাতা, ঢাকা, পুরী হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা বহু বৎসর যাবৎ রীতিমত এই সমিতির সভ্যা আছেন ও উন্নতির জন্য যথেষ্ট চিন্তা করেন। ইঁহাদের মধ্যে চন্দননগরের সুযোগ্য জমিদার ৺যোগীন্দ্রনাথ বসুর পত্নী শ্রীযুক্তা সরযূসুনিকাননী বসু এবং পুরীর মাননীয়া শ্রীযুক্তা জগত্তারিণী দেবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রী নগেন্দ্রবালা লাহিড়ী,
সম্পাদিকা।

করকোণা

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী গলসী থানার অধীনে করকোণা একটি ক্ষুদ্র পল্লী। গ্রামে সাড়ে তিনশত লোকের বসতি। তন্মধ্যে প্রায় দুইশত ঘর ব্রাহ্মণ এবং বাকী নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস। এখানে গত ১৩৩৫ সালের ২০শে পৌষ তারিখে মহিলাদের উদ্যমে ও সাধারণ লোকের মত লইয়া "নারীমঙ্গল সমিতি" গঠিত হয়। গত দুই-বৎসর যাবত এই সমিতির পরিচালনার ভার কতক পরি-মাণে গ্রাম্য "বিবেকানন্দ সমিতির" উপর ন্যস্ত ছিল। বর্ত্তমান বৎসরে এই সমিতি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির শাখাসমিতি-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। উক্ত সমিতি হইতে ছায়াচিত্রসাহায্যে বক্তৃতা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী মহাশয়কে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তিনি ২৮ ও ২৯ শে বৈশাখ দুই দিন বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার বক্তৃতার ফলে মহিলাদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে ও জাগরণের যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছে। ছোট মেয়েদের শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা ১টি প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয় খুলিয়াছেন এবং মহিলাদের মধ্যে ১জন শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য চালাইতেছেন। আরও তাঁহারা বিদেশী বস্ত্র বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন এবং গৃহশিল্প যাহাতে উন্নত হয় সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। গ্রামের আর্থিক অবস্থা হীন হইলেও পল্লীমহিলাদের প্রাণ হীন নয়—মন সর্ব্বদা সবল ও নির্ম্মল। এই সমিতিতে ৩০ জন মহিলা সভ্যাশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

বালিকাবিদ্যালয়ের সহায়ার্থ যদি কেহ কিছু দান করেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং দয়া করিয়া সহকারী সম্পাদিকার নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। বর্দ্ধমানের মহারাজকুমার এককালীন ২৫৲ পঁচিশ টাকা দান করিয়া-ছেন ইতি।

শ্রী চারুহাসিনী বন্দ্যোপাধ্যায়,
সহকারী সম্পাদিকা

সালিখা

ভগবৎকৃপায় এই শিশুসমিতি তাহার তৃতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল। সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য—স্থানীয় দুঃস্থা নারীদিগকে বিশেষতঃ বিধবা-

দিগকে গৃহশিল্পের শিক্ষাদান করা এবং তাঁহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা। যাহাতে গৃহিণীগণ তাঁহাদের যোপার্জ্জিত অর্থে আয়বৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যসাধনে সমিতি এ-বৎসর কতটা সমর্থ হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে বোঝা যাইবে।—

সন ১৩৩৮ সালের আয়ব্যয়ের হিসাব

জমা—

জামা ইত্যাদি বিক্রী	৬২৪/৫
চাঁদাবাবদ	৭১১৸০
	১০৩৫৸/৫

খরচ—

সূতা, বোতাম, কাপড় ইত্যাদি—	
খরিদ	১২০৸/১৫
ছাত্রীদের পারিশ্রমিক	২৫৸৵১০
শিক্ষয়িত্রীর বেতন, ট্রাম ইত্যাদি	
মজুত টীক	৮৫৲
নগদ মজুত	২৩৮।৵১০
	১০৩৫৸/৫

সমিতিগৃহে প্রত্যহ শিক্ষার্থিনীগণের নিকট বাঙলা দৈনিক সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাসিক পত্র হইতে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, নারীমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠ ও ধর্ম্মালোচনা হয়। শিক্ষার্থিনীগণের নৈতিক উন্নতির দিকে এবং অন্তঃপুরমহিলাগণ যাহাতে বহির্জগতের সহিত একেবারে বিচ্ছিন্ন না থাকেন সে বিষয়ে সমিতির দৃষ্টি আছে। সমিতির কেন্দ্রস্থল এখনও ২১ নং রাধালাল মুখার্জ্জির লেনেই রহিয়াছে এবং প্রত্যহ বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সমিতির কার্য্য হয়। শিক্ষার্থিনীরা প্রত্যেকের সুবিধামত ঐ সময়ের মধ্যে আসিয়া শিল্পকার্য্য শিক্ষা করেন এবং যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুতের অর্ডার থাকে তাহা অর্ডার-অনুযায়ী প্রস্তুত করেন। আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে এক মূক ও বধির বালক এই সমিতিতে সেলাই শিক্ষা করিত, গত বৎসর তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পরে শিক্ষিতা সীবন-বিদ্যায় নিপুণা শ্রীমতী সুবাসিনী চৌধুরী মহাশয়া সপ্তাহে ২ দিন করিয়া নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিতেছেন। চৌধুরী মহাশয়া সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির ৪৪নং বেনেটোলা স্ট্রীটে শিক্ষা দেন। তাঁহাকে সমিতির আয় হইতে মাসিক ১২৲ টাকা করিয়া পারিশ্রমিক দিতে হয়। গত বৎসর সরোজনলিনী নারীশিল্প প্রদর্শনীতে আমাদের সমিতির শিক্ষয়িত্রীর প্রস্তুত দ্রব্যাদি পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১২৸০ টাকার জিনিষ বিক্রয় হয়।

সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ মহিলাসমিতি স্থাপন—যাহাতে অন্তঃপুরমহিলাগণের মধ্যে পরস্পর দেখাশুনার মেলামেশার সুযোগ হয় এবং যাহাতে তাঁহারা পরস্পর ভাবের আদানপ্রদান দ্বারা নিজ নিজ সংসারের ও সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনে ক্রমশঃ সমর্থ হন। সরোজ-নলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির সহায়তায় গত বৎসর মহিলা-সমিতির প্রথম অধিবেশন এই স্থানেই হয়। তাহাতে প্রায় ১০০ শতের অধিক স্থানীয় ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়া-ছিলেন। সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী প্রতিভা সেন ও শ্রীমতী শান্তিময়ী দাস বর্ত্তমান অবস্থায় নারীগণের কর্ত্তব্য কি এবং তাঁহাদের উন্নতিকল্পে কিরূপ কার্য্য করা যায় এবং কি কি কাজের ভার নারীরা লইতে পারেন, সঙ্ঘবদ্ধভাবে নারীগণের কার্য্য করিবার উপকারিতা কি, এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সকল মহিলাই তাঁহাদের বক্তৃতাতে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রী ভানুমতী দেবী,
সম্পাদিকা।

রেঙ্গুন

প্রায় এক বৎসর হইল আমি রেঙ্গুনে আসিয়াছি। প্রথম যখন এখানে আসিলাম তখন আমার ধারণা ছিল রেঙ্গুনে কেবল ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীপুরুষই দেখিতে পাইব। রাস্তায়, বাজারে বুঝি কেবলই লুঙ্গিপরিহিত স্ত্রীপুরুষ দেখিব। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আমার সে ধারণা চলিয়া গেল। কারণ

রাস্তায় অথবা বাজারে বাহির হইলেই হয় বাঙালী নয় মাদ্রাজী অথবা পাঞ্জাবী দেখিতে পাওয়া যায়। দশজনের মধ্যে একটি ব্রহ্মদেশীয় দেখিতে পাইলেই যথেষ্ট। কিছুদিন পর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে এখানে অন্ততঃ ৩০ হাজার বাঙালীর বাস। তখন আমার মনে হইল, বাঙালা দেশের বাহিরে একটি সহরে এত বাঙালীর বাস অথচ আমরা বিশেষ কাহাকেও চিনি না—কাহারও খবর জানি না। কোন সঙ্ঘ অথবা সমিতির সভ্য হইয়া বাঙালী মহিলাদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম সেরূপ সঙ্ঘ অথবা সমিতি কিছুই এখানে নাই। আমার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইল, রেঙ্গুনে মহিলাদিগের একটি সমিতি গঠন করি। আমার জনৈক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ১৯,২০ ঘর বাঙালী মহিলার সহিত আলাপ করিলাম এবং তাঁহাদের নিকট সমিতি গঠন করিবার কথা বলিলাম। এইস্থানে বলিয়া রাখি যে আমার এই বন্ধুটি ২০ বৎসর রেঙ্গুনে বাস করিতেছেন কাজেই তাঁহার সাহায্যে আমি শীঘ্রই অনেকের সহিত পরিচিতা হইলাম। সকলের সহিত আলাপাদি করিয়া যখন বুঝিতে পারিলাম যে এখানে সমিতি গঠন করা সম্ভব হইবে, তখন আমি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির স্থাপয়িত্রী শ্রীযুক্ত শুকদেব রক্ত মহাশয়কে পত্র লিখি। আমার পত্র পাইয়া তিনি ফেরৎ ডাকে আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া এখানে সরোজনলিনী সমিতির শাখা স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতার কেন্দ্র-সমিতি হইতে নারীমঙ্গল সমিতির কার্য্যবিবরণী, মঙ্গলঘট পত্রিকা ইত্যাদি পাঠাইয়া আমার কার্য্যের উদ্যোগ সহজ করিয়া দেন। সেই সময় কলিকাতার 'সরোজনলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়ের' ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্তা শান্তি মজুমদার রেঙ্গুনে কয়েক মাসের জন্য আসিয়া আমার সহিত এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। আমি ও শ্রীযুক্তা শান্তি মজুমদার পরে ঘরে এই কার্য্যবিবরণী ও পত্রিকা বিতরণ করিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হই এবং সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে একটি মহিলাসভার আয়োজন করি।

গত ৩০শে এপ্রিল বুধবার রেঙ্গুন একাডেমীর গৃহে এই মহিলাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। জষ্টিস এস, এন, সেন মহাশয়ের পত্নী মাননীয়া শ্রীযুক্তা সুজাতা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুক্তা রেণুকা ভট্টাচার্য্য একটি সুমধুর সঙ্গীত করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। তাহার পর শ্রীযুক্তা ললিতা রায় এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু' চারটি কথা বলেন। তৎপর শ্রীযুক্তা প্রীতিলতা বণিক বি-এ শিশুপালন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্তা শান্তি মজুমদার বি-এ সমিতিগঠনে উৎসাহ প্রদান করিয়া উপস্থিত মহিলাগণকে কর্ম্মে ব্রতী হইবার জন্য আহ্বান করিয়া আর একটি প্রবন্ধ পড়েন।

ইহার পর সকলের সম্মতি অনুসারে মহিলাসমিতির নাম রেঙ্গুন সরোজনলিনী সমিতি স্থির করা হইল। শ্রীযুক্তা সুজাতা দেবী সমিতির সভানেত্রী এবং শ্রীযুক্তা ললিতা রায় সমিতির সম্পাদিকা হইয়াছেন।

প্রায় ৫০।৬০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। সমিতির সভ্যাগণ মাসিক ১৲ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দিবেন। প্রতিমাসে ২ শনিবার সমিতির অধিবেশন হইবে। সমিতিতে সভ্যাগণের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নানারূপ শিল্প, সঙ্গীত, পাঠ, আলোচনা ইত্যাদির বন্দোবস্ত হইবে। ক্রমে সমিতিতে শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে প্রতি সপ্তাহে অধিবেশন হইবে প্রস্তাব হইয়াছে।

এই সমিতিগঠনে শ্রীযুক্তা শান্তি মজুমদার বিশেষ ভাবে আমাকে সাহায্য করেন। দুঃখের বিষয়, তিনি প্রথম অধিবেশনের পরই কার্য্যবশতঃ কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই কার্য্যে আমাদের সভানেত্রী মহাশয়া বিশেষ উদ্যোগী, এবং বিশেষভাবে আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাকেও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত শুকদেব রক্ত মহাশয় [illegible] থাকিয়া আমাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতেছেন, এবং সমিতিগঠনের সাহায্যার্থ ৫০৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। সমিতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়া তাঁহার দানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইবে।

[illegible] বাঙলা দেশের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের শাখা এই প্রথম ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন সহরে স্থাপিত হইল। যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানের [illegible] প্রত্যেক সহরে সহরে স্থাপিত হয় তাহার আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীললিতা রায়,
সম্পাদিকা।

স্বাস্থ্য-মঙ্গল

স্বাস্থ্যের পরিচয়

শ্রী সন্তোষ বিহারী বসু

স্বাস্থ্য অর্থে প্রকৃত কি বুঝায়, কিংবা কি কি উপায় অবলম্বন করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় না, তাহার আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে, যে কয়েকটি বিশিষ্ট উপাদানের সমষ্টি লইয়া আমরা গঠিত হই সেই কয়েকটির যৎসামান্য পরিচয় দিতে চাই।

প্রথমেই দেখিতে হইবে আমাদের শরীর কি কি দ্রব্যের দ্বারা গঠিত এবং উহাদের উৎপত্তিই বা কোথায়? কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, চূণ ইত্যাদি আরও কয়েকটি উপাদান লইয়া শরীর গঠিত হয়; এবং এই কয়েকটি উপাদানের মধ্যে কোনও একটি কম-বেশী হইলে শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে একটি উপাদানের অভাব আর একটি দিয়া কোনও প্রকারে পূরণ করা চলে না। ইহা ছাড়া আর একটি জিনিষ আছে, যাহাকে আমরা আজকাল 'ভাইটা-মিন' বা খাদ্যপ্রাণ বলি। এই খাদ্য-প্রাণের অস্তিত্বের জন্যই শরীর নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিশেষতঃ লবণজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। এই লবণজাতীয় দ্রব্য শরীরে ঠিক পরিমাণে না থাকিলে নানাপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

উপরে যে কয়েকটি উপাদানের কথা বলা হইল, উহাদের মধ্যে কতকগুলি বায়ু হইতে ও কতকগুলি মাটি হইতে পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলি প্রকৃতির রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মানবের পক্ষে উহাদিগকে প্রয়োগোপযোগী করিয়া লইতে হইলে ঐ উপাদানগুলিকে নানাপ্রকারে নিজেদের মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল করিয়া, অর্থাৎ একটি আর একটির সহিত নিজেদের মধ্যে মিলিত করিয়া লইতে হয়।

এই পরিবর্ত্তনশীল কার্য্যটি একটি বিশেষ জটিল রাসায়নিক ব্যাপার। শরীরের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের উপাদানের প্রয়োজন হইয়া থাকে; আর এই উপাদানের কোনও প্রকার তারতম্য উপস্থিত হইলে নানাপ্রকার শারীরিক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। তখন উহাদের অভাব মোচন করিবার জন্য নানাপ্রকার কৃত্রিম ঔষধাদি ব্যবহার করিতে হয়। তবে, এটা যেন কেহ মনে না করেন যে, যাবতীয় অভাবই কৃত্রিম খাদ্য বা ঔষধাদির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে মোচন হইতে পারে। প্রকৃতিকে বাদ দিয়া যে-কোনও কাজ করা যাক না কেন, উহার ফল কখনও স্থায়ী হয় না।

প্রকৃতি অর্থে জল, বায়ু, মাটি, গাছ-গাছড়া—এই সবই সাধারণতঃ বুঝায়। আর এই প্রকৃতিই শারীরিক স্বাস্থ্যের মূলে অহরহ বিদ্যমান রহিয়াছে। সমুচিত খাদ্য, জল ও বায়ু এই কয়েকটির সন্ধান করাই প্রকৃতির প্রধান কার্য্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কয়েকটি উপাদান লইয়া মানব-দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। আর ঐ উপাদানগুলির উৎপত্তির আদি স্থান হইতেছে মাটি, জল ও বায়ু। যদিও ঐ উৎপত্তির স্থানগুলি মানবের আয়ত্তের মধ্যে, তথাপি মানব শরীরের গঠনোপযোগী সমস্ত উপাদানগুলিকে সাক্ষাৎ-ভাবে লইয়া নিজ শরীর গঠন করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।

এখন এইখানেই দেখা যাইতেছে যে, ইহার মধ্যে অনেক অন্তরায় রহিয়া গিয়াছে। ঐ উপাদানগুলির উৎপত্তির আদি স্থানের উপর, যথা—মাটি, বায়ু ও জল প্রত্যক্ষভাবে আয়ত্ত করিবার প্রকৃত ক্ষমতা তবে কার আছে? সেটা মানুষের নহে, সেটা গাছ-গাছড়ার বাস্তবিক, প্রকৃতি বলিতে যে কয়েকটা কথা বুঝায়, যথা—

মাটি, বায়ু ও জল, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে এক গাছ-গাছড়াই আছে ; এবং মানবদেহ, এমন কি, এই পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তু, এই এক উদ্ভিদ-জীবনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

এটা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে যে, আমাদের শরীর বা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, প্রটীন (ছানাজাতীয়), চিনি, ফদ্‌ফরাস, চূণ ইত্যাদি কয়েকটি দ্রব্যের বিশেষ দরকার। প্রকৃতির গুটিকতক উপাদান লইয়া এই প্রটীন, চিনি ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। কিন্তু এক উদ্ভিদ ব্যতীত এত সহজে আর কেহ উহাদিগকে তৈয়ারী করিয়া, মানব-দেহের বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারে না। এমন কি খাদ্য-প্রাণ (ভাইটামিন) বেশীর ভাগ উদ্ভিদ হইতে খাদ্যের ভিতর দিয়া আমাদের শরীরে আসে।

এই গাছ-গাছড়া নানাপ্রকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা নিজেদের গ্রহণোপযোগী নানাপ্রকার খাদ্যের সৃষ্টি করিতেছে—যথা চিনি, ময়দা, তেল, প্রটীন (ছানাজাতীয়) ইত্যাদি। শুধু যে খাবার প্রস্তুত করিতেছে তাহা নহে, নিজেদের শরীরকে নীরোগ রাখিবার জন্য নানাপ্রকার ঔষধ তৈয়ারী করিয়া, খুব নিভৃত স্থানে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিতেছে—যথা, মরফিয়া (Morphia) নিকোটিন (Nicotin), কোকেন (Cocain), নাক্সভোমিকা (Nux Vomica), গন্ধক (Sulphur) ইত্যাদি। এইগুলি বিদ্যমান থাকে বলিয়া, গাছ-গাছড়া নানাপ্রকার ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পায়। তাহারা নিজেরাই ডাক্তার। আবার কয়েকটি দ্রব্যের সৃষ্টি করে, যাহার দ্বারা তাহাদের শরীরের অবসাদকে ঘুচাইয়া দেয় ও নূতন করিয়া তেজ আনিয়া দেয়। যথা, পটাসিয়ম (Potasium), সিলিকা (silica) ইত্যাদি। ইহা ছাড়া কয়েকপ্রকার তৈলের সৃষ্টি করে, যাহার দ্বারা তাহাদের চারিপার্শ্বের দূষিত বায়ুকে পরিষ্কার করিয়া দেয়—যথা, ইয়ুকেলিপটাস অয়েল (Eucaliptus oil) ইত্যাদি। যে এন্টিরকেটিক ভাইটামিন (Antirachetic Vitamin), আল্ট্রা ভাওলেট রেজ (Ultra Violet Rays) ইত্যাদির জন্য আজকাল চারিধারে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, সেই ভাইটামিন, সেই আল্ট্রা ভাওলেট রেজ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে গাছ গাছড়ার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। কচি কচি নরম লাউ, কুমড়া ডাঁটার ও নানাপ্রকার শাক-সব্জির মধ্যে এইগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মানব-শরীরের জন্য যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশের উৎপত্তি-স্থানে গাছ-গাছড়ার শিকড়, ডাল ও পাতার ইত্যাদি। যে গ্লুকোজ (Glucose) খাইয়া মুমূর্ষু রোগীর জীবনরক্ষা হয়, সেই গ্লুকোজ তালগাছের রস হইতে বেশী পাওয়া যায়।

তরি-তরকারীর মধ্যে, মানবশরীর-পোষণের উপযোগী নানাপ্রকার খাদ্য সতত বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সময়ে যে শাকসব্জি হয়, সেই সেই সময়ে পরিমিত পরিমাণে উহা ভক্ষণ করিলে মানব-শরীরে ব্যাধির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এই সব ভক্ষণ করিবার আবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। তাহার ব্যতিক্রম করিলে আবার নানাপ্রকার ব্যাধি হয়। এমন কি, দুধেরও গুণ গবাদির খাদ্যের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। মুরগির ডিমেরও গুণ অনেকটা সব্জির উপর নির্ভর করে। এমন কি, যে স্থানে বাস করা যায়, সেই স্থানে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যাদি শরীরের পক্ষে এত বেশী উপকারী হয় যে, অন্য স্থানের উৎপন্ন খাদ্যাদি বিশেষতঃ শাকসব্জি তত বেশী উপকারী হয় না—অর্থাৎ systemএ সহ্য হয় না, পেটে সহ্য হয় না। এটা বোধ হয় অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে বালাম চালের ভাত কলিকাতাবাসীর পক্ষে যত উপাদেয়, রাঢ়দেশের লোকের পক্ষে বালাম চাল অপেক্ষা রামশাল কি অন্যান্য চালের ভাত বেশী উপাদেয়।

বাস্তবিক এই ব্যাপারগুলি অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইগুলির উপেক্ষা করিবার জিনিষ নহে। 'স্বাস্থ্যের পরিচয়' অধ্যায়ের একপ্রস্থ বর্ণনা করা গেল, বাকি দুইপ্রস্থ ভবিষ্যতে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল। উদ্ভিদ-তত্ত্বের ও উহার পরিচর্য্যার সম্বন্ধে সকলেরই বিশেষতঃ যাহাদের উপর অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুতের ভার ন্যস্ত থাকে, কিছু কিছু অভিজ্ঞতা দরকার।

এসিয়ার মহিলাসম্মিলন

সমগ্র এসিয়ার মহিলাদের লইয়া এক সম্মিলনের আয়োজন হইতেছে। লাহোরে এই সভা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আরব, চীন ও জাপানের মহিলারা ভারতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কোন্ তারিখে সম্মিলন আরম্ভ হইবে তাহা স্থির হয় নাই।

বিহার মহিলা সম্মিলন

সম্প্রতি গয়ায় বিহার মহিলা-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সভায় নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়। পর্দ্দাপ্রথার উচ্ছেদ, বালিকাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা-প্রবর্ত্তন এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হাওড়ায় বিধবাবিবাহ সভা

বঙ্গীয় বিধবাবিবাহ সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্প্রতি হাওড়া শাঁকরেল রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী নূলাগোড় গ্রামে শিবতলায় একটি বিধবাবিবাহ সভা হইয়াছিল। বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

যুদ্ধে নারী-সহকারিত্ব

যুদ্ধের সময় নারীরা যাহাতে অস্ত্রাগার ও দেশ রক্ষা করিতে পারে তজ্জন্য সম্প্রতি রুষিয়ার নারী-সৈন্যগণকে রাইফেল্ ও মেশিন-গান পরিচালনা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

কাশী মহিলা-মহাপরিষদ

কাশীধামে আর্য্য মহিলাহিতকারিণী মহাপরিষদ নামে একটি মহিলাসমিতি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এটি নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহিলা-মহাসমিতি। ভারতে অধুনা মহিলাসমিতির অভাব নাই। কিন্তু হিন্দু মহিলাগণের স্বার্থরক্ষার্থ ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনার্থ এরূপ কোনরূপ মহিলাসমিতি ইতিপূর্ব্বে ছিল না। ভারতের বহু হিন্দু রাণী ও মহারাণী এই সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। সমিতি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে সুতরাং ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও চিন্তার কোন কারণ নাই। সম্প্রতি এই সমিতির ১৯১৬, ১৯২৭ ও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের বৈবার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সমিতি কিরূপ মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং এ যাবৎ কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এই সমিতির মঙ্গলকামনা করিতেছি।

শিশুবিবাহ নিবারণার্থ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে রাষ্ট্রীয় পরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছিল :—

যে সকল স্থলে মাতা, পিতা বা অভিভাবকগণকে, বিবেকবশে অথবা বিশেষ পারিবারিক অবস্থাহেতু, পুরুষ হইলে ১৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে অথবা স্ত্রী হইলে চৌদ্দ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, তাঁহাদের সন্তান বা আশ্রিতগণের বিবাহ দিতে হয়, সেই সমস্ত স্থলে যথোচিত বিধান করা বিহিত। অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত বিধান করা হইল :—

১। (১) এই আইনকে শিশুবিবাহ-নিবারক আইন সংশোধনার্থ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আইন বলা যাইতে পারিবে।

(২) ইহা বৃটিশ বেলুচিস্থান ও সাঁওতাল পরগণা সমেত সমগ্র বৃটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে।

২। প্রাথমিক মোকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার-বিশিষ্ট যে প্রধান দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যে বর বা কন্যার পিতা, মাতা, অভিভাবক অথবা বর বা কন্যা বাস করেন, সেই আদালতের নিকট হইতে যদি বর বা কন্যার পিতা, মাতা বা অভিভাবক এমন কোন আদেশ প্রাপ্ত হন, যদ্দ্বারা তাঁহাকে, যে বিবাহে বরকন্যা উভয়েই অথবা বর বা কন্যা তখনও শিশু থাকে, সেই বিবাহ সম্পাদন করিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ বরকন্যার বা যথাবিশেষে বরের বা কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

৩। (২) ধারায় বর্ণিত অবস্থায় যে পিতা, মাতা, অভিভাবক অথবা বর বা কন্যা বিবাহকার্য্য সম্পাদন করেন, শিশুবিবাহ নিবারণার্থ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের আইনে বিহিত দণ্ড হইতে তিনি অব্যাহতি পাইবেন।

উদ্দেশ্য—

যে সকল স্থলে, বিবেকের তাড়নায়, কোন শিশুর পিতা, মাতা বা অভিভাবক, উক্ত শিশু-আইনে নির্দ্দিষ্ট বয়সে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই, উহার বিবাহ সম্পাদন করিতে ব্যগ্র হন, সেই সমস্ত স্থলে শিশু-বিবাহ নিবারণার্থ আইনে কোন প্রকার ব্যবস্থা করা হয় নাই। সে স্থলে কোন বিশেষ অবস্থাহেতু কোন শিশুর বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে, সে স্থলেও আইনে কোন ব্যবস্থা নাই। অতএব বিবাহ সম্পর্কীয় গুরুতর ব্যাপারে এই সকল স্থলে ব্যবস্থা করা ব্যবস্থাপক সভার একান্ত কর্ত্তব্য। নিছক বিবেকপ্রণোদিত অথবা বিশেষ পারিবারিক অবস্থা ঘটিত স্থলগুলিও আইনের অন্তর্নিবিষ্ট করা এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য।

ডি, জি, গৌরের সুগন্ধি

আমরা প্রসিদ্ধ সুগন্ধিব্যবসায়ী ডি, জি, গৌরের দুইটি সুগন্ধিদ্রব্যের নমুনা পাইয়া ইহার সুন্দর গন্ধে মুগ্ধ ও আমোদিত হইয়াছি। ৩১, মঙ্গলদাস রোড, (২)—ইহার কারখানার ঠিকানা।

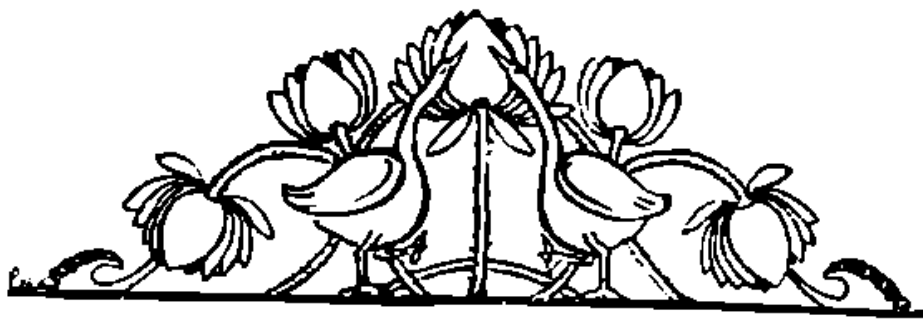

ভাঙা মাটির ভিটে

শ্রী রমেশচন্দ্র দাস, এম এ

ভাঙা মাটির ভিটে,—
রাত-ভিখারীর করুণ গানে
সুরটি যে তার মিঠে।
যুগান্তেরি স্মৃতির দেশে
কে যেন ঐ ডাক্‌ছে এসে,—
নয়নেরি ছাপ লেগেছে
তরুণো ঝুমলীতে!

ভাঙা মাটির ভিটে,—
হাসির কুসুম করুণে ঝরণ
কালের ভীষণ কীটে!
আসর-ভাঙা সভার মাঝে
কার বাঁশরীর সুর সে বাজে,
বেশ্‌টি যে তার ঠিক্‌রে পড়ে
শ্যাওলাপড়া ইটে!

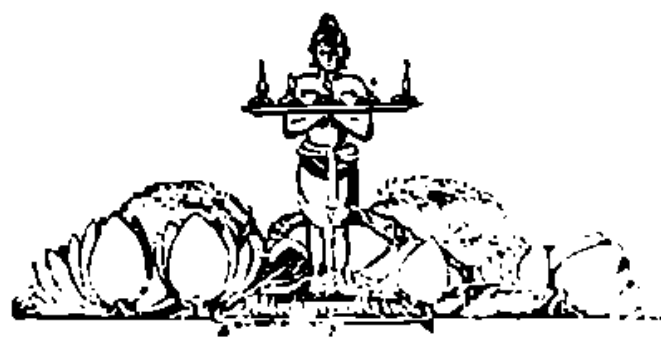

স্বরলিপি

মিশ্রকাফি—কাওয়ালী

কাটিল বৃথা নিশীথিনী,
কমল হাসিল—হ'ল ম্লান কুমুদিনী।
শশী হ'ল পাণ্ডুর, গত হ'ল তারা,
ঝরিল শিথিল হ'য়ে শেফালির ধারা,
চকোরী হারায়ে চাঁদে কাঁদে বিষাদিনী।
উদিল তরুণ ভানু, ফুরাইল আশা,
চাতকিনী গাহিল পিপাসা পিপাসা,
বিফল শয়ন 'পরে মরে বিরহিনী॥

কথা ও সুর—শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বরলিপি—কুমারী ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায়

II পধা র্রা র্সা ণা | ধা পা মগা রগা | মা মা পা | পা I
কা॰ ০ টি ল | বৃ থা নি॰ ০০ | শী থি নী | থি

I পধা র্রা র্সা ণা | ধা পা মগা রগা | মা মা পা |
কা॰ ০ টি ল | বৃ থা নি॰ ০০ | শী থি নী

গ
না না | র্সা র্সা পা পা | পা ধা র্স র্রা | র্সগ র্গা র্রর্সা -া I
ল হা | সি ল হ' ল | ম্লা ন কু মু | দি॰ ০ নী॰ ০

I র্সা র্সা ণা | ধা পা মগা রগা | মা মা পা | I
কা টি ল | বৃ থা নি॰ ০০ | শী থি নী

I র্সা র্সা র্রা র্রা | র্রা র্গা র্মা র্গা | র্রা র্গা র্রা র্সনা | না ধনর্সা র্সা -া I
শ শী হ' ল | পা ন্ ডু র | গ ত হ' ল॰ | তা ০০০ রা ০

ম ধ
I র্সা র্সর্রা র্সা ণা | ধা পা গা মা | পা ধা র্রা র্সা | ণধা পধা পা I
ঝ রি॰ ল শি | থি ল হ' য়ে | শে ফা লি র | ধা॰ ০০ রা

গ
না না | র্সা র্সা পা পা | পা ধা র্সা র্রা | র্সর্রা র্গা রসা -া I
রী হা রা য়ে চাঁ দে কাঁ দে বি মা ঢি০ নী০ ০

র্সা গা | ধা পা মগা রগা | মা মা পা |
টি ল রু ধা নি০ ০০ শী থি নী

গ
মা মা মা মা | গা মা রা গা | মা মা পা পা | পা
উ দি ল ত রু ণ ভা নু ফু রা ই ল আ

ম ধ ণ
I গা মা ধা ধা | ধা ধা ধা | ণা ণা ণা ণা | ধা পা
চা ত কি নী গা কি ল পি পা মা পি পা মা

গ
I পা না না না | র্সা র্সা পা পা | পা ধা র্সা র্রা | র্সর্রা র্গা রর্সা -া I
বি ফ ল শ য় ন 'প রে ম রে বি র ঢি০ নী০

র্সা গা | ধা পা মগা রগা | মা মা পা
টি ল রু ধা নি০ শী থি নী

আমাদের মহিলাকর্ম্মী

শ্রীযুক্তা অমিয়া সরকার

শ্রীযুক্তা অমিয়া সরকার বাঁটরা জনহিতকর মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা। এই মহিলাসমিতি স্থাপনে তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম, আর্থিক ক্ষতি এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হইবার নহে। গত ৩ বৎসর অতি যোগ্যতার সহিত তিনি মহিলাসমিতি পরিচালন করিতেছেন। তাঁহার পরিচালনদক্ষতায় সমিতি কেন্দ্রসমিতি

শ্রী অমিয়া সরকার

হইতে উপর্য্যুপরি তিনবার পুরস্কার পাইয়াছেন। সমিতির আনুকূল্যে বাঁটরায় তিনি যে মহিলা কর্ম্মীসঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন তাঁহারা ঐ স্থানের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার সমাজ-সেবার কার্য্য করিয়া থাকেন। মিসেস্ সরকার এই তিন-বৎসরকাল তাঁহার নিজ বাটীতে একটি অন্তঃপুর-শিল্পবিদ্যালয় পরিচালন করিতেছেন। এই বিদ্যালয়পরিচালনের বহু ব্যয় তিনি নিজেই বহন করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ে যাহাতে দূর হইতেও মহিলারা স্বচ্ছন্দে উপস্থিত হইতে পারেন সেজন্য তিনি তাঁহার স্বীয় সুন্দর একখানা ঘোড়ার গাড়ী বিদ্যালয়ের কাজের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই বিদ্যালয়েসাধারণ লেখা-পড়ার সহিত বস্ত্রবয়ন, সূতা কাটা জামার ছাট-কাট সেলাই, কাপড় এবং কাগজের ফুল তৈরী, বিভিন্ন ধাতুদ্রব্য পরিষ্কার করা, চিকণের কাজ, জ্যাম, জেলী, চাটনী, মোরব্বা, বিভিন্ন প্রকারের পিঠা প্রস্তুত এবং অন্যান্য গৃহ কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মেয়েদের চরিত্রের উৎকর্ষসাধনের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যাহাতে নিয়মনিষ্ঠ, কর্ম্মাসক্ত এবং উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হন সেদিকে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। ছাত্রীরা এই বিদ্যালয়কে অতি প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। কেন্দ্রসমিতি হইতে প্রেরিত একজন শিল্পশিক্ষয়িত্রী নিয়মিত ভাবে এখানে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। বিভিন্ন শিল্প-প্রদর্শনীতে এই সমিতির প্রস্তুত জ্যাম, জেলী প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্য বহু পরিমাণে বিক্রয় হয়।

এই বিদ্যালয় ইহার শিক্ষাপ্রণালী এবং সুব্যবস্থার গুণে সাধারণের যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্তা অমিয়া সরকার শুধু যে এই মহিলাসমিতি পরিচালনেই ঐকান্তিকতা এবং কর্ম্মনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন তাহা নহে, তিনি কেন্দ্রসমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন বিশিষ্ট মহিলা-কর্ম্মী। তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকার এই নারীমঙ্গল কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দান ও সাহায্য করেন।

বিদেশিনীদের কথা

সংগ্রাহক—শ্রী তারা মুখোপাধ্যায়

কুটীর-শিল্প পরিচালন

মিস্ কে, এম, ম্যাক্সলো মোংগ্লাটেডের একখানা গ্রামের কুটীর-শিল্প পরিদর্শন করেন। নানা রকম খেলনা এবং সুন্দর সুন্দর পুতুল এই গ্রামে তৈরী হয়। কিন্তু তৈরী করবার পদ্ধতি অতি চমৎকার। গ্রামের সবাই কৃষিজীবী। তাই সমস্ত সময়টা কেউ খেলনা-তৈরীর কাজে দিতে পারে না। বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন সময়ে খেলনা-তৈরীর কাজ হয়। কারও ঘরে পুতুলের মাথাগুলো তৈরী হয়, কারও বাড়ীতে পুতুলের ধড়টা তৈরী হ'ল, কেউ বা হাতপাগুলো তৈরী করলে। এমনি যে যার সময়মত তৈরী ক'রে একজায়গায় জড়ো ক'রে দেয়। মিস্ ম্যাক্সলো এই সমস্ত কাজ এমন-ভাবে ভাগ ক'রে দেন যে বিভিন্ন লোকের দ্বারা তৈরী হ'লেও মাথা, ধড় এক হাতপাগুলো একত্র করলেই সুন্দর একটি পুতুল তৈরী হ'য়ে যায় এবং সেটা হয় খুবই সুন্দর ও শক্ত। এমনি ভাবে সেখানে এক একটা বাড়ীতে এক একটা খেলনার অংশ তৈরী হ'চ্ছে এবং পরে তার থেকে গোটা তৈরী হ'চ্ছে। এতে ঘরের কাজের কোন অসুবিধা হয় না অথচ অবসর-সময় শিল্পের চর্চা ক'রে বেশ একটু আনন্দ পাওয়া যায় এবং টাঁকেও কিছু পয়সা আসে।

পরিচারিকা-প্রতিষ্ঠান

মিস্ জন রীড মাত্র বছর-দুই পূর্বে এই পরিচারিকা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। যে কোন কাজ সুন্দরভাবে এবং অল্পতার সঙ্গে করতে পারে, এ রকম স্ত্রীলোকের যথেষ্ট অভাব। অথচ গৃহকর্মের জন্য এই রকম পরিচারিকার কদর খুব বেশী। এই দেখেই মিস্ রীড্ তাঁর কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে দেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর কাজের ক্ষেত্র খুব বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে। আজ তিনি এবং তাঁর কাজ দুইই খুব খ্যাতিলাভ করেছে।

প্রথমে পাঁচজন মেয়েকে ডেকে এই কাজের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যপদ্ধতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়, পরে একটা ছোট ঘরে একজনমাত্র সহকর্মী নিয়ে যথাসম্ভব কম খরচের মধ্যে মিস্ রীড্ কাজ আরম্ভ ক'রে দেন। তিনি নিজেই শক্ত ও গঠনমূলক কাজগুলো করতেন। কোন ভদ্রপরিবারে থাকতে হ'লে যে যে কাজ জানা বিশেষ দরকার, খুব কম সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থিনীদের সেইগুলো শিখিয়ে দেওয়া হ'ত। কয়েকদিনের মধ্যেই ৮টি পরিচারিকা বিভিন্ন পরিবারে কাজে নিযুক্ত হ'ল এবং কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করতে লাগল।

এই পরিচারিকা-প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডের এই ধরণের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম। গৃহস্থালীর মোটামুটি কাজগুলো এখানে বেশ ভালভাবে শেখানো হয়; যেমন—ঘর পরিষ্কার করা, জামা জিনিষ গোছান, নানারকমের দরকারী জিনিষ তৈরী বা মেরামত করা, টুপি ছাড়া ইত্যাদির কাজ করা, কাপড়-জামা পরিষ্কার ও ইস্ত্রি করা, জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করা ইত্যাদি। এ ছাড়া নানারকম কারুশিল্পও শেখান হয়।

যারা এই কাজ করতে চায় মিস্ রীড তাদের সবাইকে এই রকম উপদেশ দেন—"যদি কোন কাজ আগে করতে যাবার সাহস আপনার না হয়, যদি আপনার অসীম ধৈর্য, অফুরন্ত ধৈর্য ও বহু ধর্মে মনোনিবেশের শক্তি না থাকে এবং যদি আপনি সব সময়ে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে না পারেন তবে একাজে নামবেন না।"

এই প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ শেখে, পরে তাদের জন্যে কাজ খুঁজে যোগাড় ক'রে দেওয়া হয়। মোট কথা, যে-উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত তা সুচারুরূপে সম্পন্ন হ'চ্ছে। দেশের প্রত্যেক সহরে এই রকম পরিচারিকা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া উচিত।

চিত্রবিদ্যায় নারী

মিস্ জোথী নিউসম্ ও মিস্ কেথোলীন নিক্সন ভারতীয় রেল্‌ওয়েতে ভারতীয় দৃশ্যাবলীর ছবি আঁকবার জন্যে নিযুক্ত হ'য়েছেন। এই সকল ছবি ভারতের সর্ব্বত্রই দেখান হবে। এঁরা দু'জনেই ক্যাডেন্টির মেয়ে এবং সেখানেই ছিল তাঁদের ষ্টুডিও। ক্যাডেন্টি, বার্মিংহাম এবং লণ্ডনে এঁরা চিত্রবিদ্যা শিখেছিলেন। কাজের উৎকর্ষতার জন্য লোকে অল্পদিনেই তাঁদের চিনে ফেলেছে। কোন একটা বইএর ছবি আঁকবার জন্য তাঁরা এদেশে আহূত হন, এবং একটু নূতনত্বের আশায় কাজটা গ্রহণ করেন খুসী-মনেই।

তাঁদের ছবি দেখে একজন সমালোচক ভারতের একটা বিখ্যাত সংবাদপত্রে সেই ছবির সমালোচনা করেন এবং কয়েকখানি ছবি ঐ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত করান। এই থেকেই ভারতীয় রেল্‌ওয়েসের ম্যানেজারের কাছ থেকে তাঁদের কাছে কাজের জন্য প্রস্তাব আসে।

রেশম চাষ

প্রাচ্যদেশের এই একটা প্রশংসনীয় সংবাদ, যা কেউই আশা করতে পারেন না—যে, এর পরিচালিকা একজন নারী।

লেডী হোটাং-এর টাং ইয়াং কোক পো নামক রেশমের বাগান চংকংএ প্রায় তিনশো বিঘে উর্ব্বর জমিতে অবস্থিত। চাষ-আবাদে লেডী হোটাং-এর খুব কৌক, বিশেষ ক'রে রেশমের চাষে। এই রেশমের চাষে তিনি বহুদিন থেকে সবিশেষ মনোযোগ দিয়ে আসছেন, এবং তাঁর ফেক্টরিও আধুনিক সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা পরিপূর্ণ।

প্রতিবৎসর গড়ে সাত বার ক'রে রেশমকীট তোলা হয়। এই কীটদিগকে ক্রমাগত ১৯ দিন ধ'রে টাট্‌কা এবং পরিষ্কার পাতা খাওয়াতে হয় তবে তারা রেশম তৈরী করবার যোগ্য হ'তে পারে। রেশম তৈরী করতে গিয়ে পোকাটি গুটির ভেতর নিজকে বন্দী ক'রে ফেলে। এই পোকাদের স্ত্রীপুরুষ ভেদ বোঝা যায় না, কিন্তু দিন সাতেক পরে যখন গুটি থেকে এরা বেরিয়ে আসে তখন দেখা যায় যে স্ত্রীপোকারা ডিম পেড়েছে। এরাই আবার সংসারে রেশমকীট হয়।

লেডী হোটাং-এর রেশমক্ষেত্রে বিস্তর স্ত্রীমজুর ও বালিকা এই সব রেশমকীটদের যত্ন করবার জন্যে নিযুক্ত আছে।

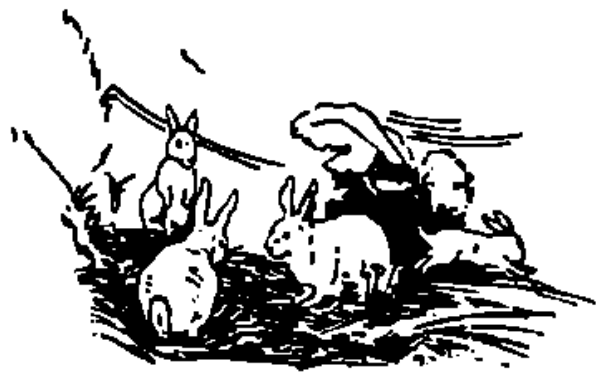

কেন্দ্রসমিতির কথা

লেডী বসন্তকুমারী দেবী

পুরী বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী লেডী বসন্তকুমারী দেবী আর ইহলোকে নাই—গত ১১ই জুন অপরাহ্ণ তিন-ঘটিকার সময় তাঁহার বাঞ্ছিত অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সংসার হইতে দূরে সম্পূর্ণ অনাসক্ত-

স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী

ভাবে জীবনযাপন করিতেছিলেন। হিন্দু বিধবাদের দুঃখ-দুর্দশায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তাহাদের দুর্দশা-মোচনের জন্য তিনি সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলস্বরূপ তিনি পুরীতে একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়া তাহাই পরিচালন করিতেছিলেন। শীঘ্রই তাঁহাকে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে ভাবিয়া বিধবা-শ্রমের কর্তৃত্বভার একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি তাঁহার আরব্ধ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করায় সুখী হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে তিনি পুরী হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। এত শীঘ্র তিনি আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন—তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের অন্তরের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার বৃদ্ধ আত্মা পরলোকে চিরশান্তি লাভ করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম

গত ৫ই জুন কেন্দ্রসমিতির পরিচালক-সভার সহ-সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম বি-এ, বি-টি, সাধারণ সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী, অবসরপ্রাপ্তা এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক-ট্রেস অব স্কুলস্ শ্রীযুক্তা ম্যাবেল সিংহ এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-প্রসাদ সিংহ পুরী বিধবাশ্রম পরিদর্শনের জন্য গমন করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের গমন সম্পর্কে স্থানীয় আশ্রম-কমিটির একটি সভার অধিবেশন হয়। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বিধবাশ্রম এবং তাহার সহিত একটি বালিকাবিদ্যালয় পরিচালন সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়। স্থানীয় কালেক্টর, এস-ডি-ও এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ বিধবাশ্রম ও বালিকাবিদ্যালয় পরিচালনে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাহা ছাড়া বিধবাশ্রমের পার্শ্বে আরও বেড়-

বিদ্যা জমি মিউনিসিপ্যালিটি বিধবাশ্রম বিস্তারের জন্য প্রদান করিবেন। পুরীর কালেক্টর, এস-ডি-ও এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান আরও গৃহনির্ম্মাণের জন্য স্থানীয়-ভাবে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। বালিকা-বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে ২০ জন ছাত্রী হইয়াছে। ছাত্রীগণের যাতায়াতের জন্য একটি মোটর-বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিধবাশ্রম এবং বালিকাবিদ্যালয়ে শ্রীমতী তড়িৎবালা দাস বি-এ, বি-টি, শ্রীমতী সুন্দরী দত্ত এবং শ্রীমতী নলিনী ঘোষ শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন। শ্রীমতী তড়িৎবালা দাস অবৈতনিকভাবে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী স্বয়ং পুরীতে উপস্থিত থাকিয়া বিধবাশ্রমের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। লেডী বসন্তকুমারী দেবী এতদিন স্বয়ং বিধবাশ্রমে উপস্থিত থাকিয়া উহার পরিচালনকার্য্যে নানাভাবে সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিধবাশ্রমের অনেক ক্ষতি হইল।

মাননীয় সম্ভোষের রাজা

আমাদের পরিচালক-সভার সভাপতি মাননীয় রাজা সার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহানাজ সম্রাটের গত জন্মদিনে "নাইট" উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। তাঁহার এই রাজসম্মান-লাভে আমাদের সমিতিরও গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং তাঁহার জন্য আমরা বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। ভগবানের কৃপায় তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেশের মঙ্গলকার্য্যে অকুণ্ঠ সহায়তা করুন।

কেন্দ্র-সমিতির নূতন সভ্য

আজীবন সভ্য :—(১) শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, কলিকাতা ; (২) শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে বিশ্বাস, বজবজ ; (৩) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বর্দ্ধমান।

সাধারণ সভ্য—(১) শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী, নেত্রকোণা ; (২) শ্রীমতী জীবনকৃষ্ণ বালো, জলপাইগুড়ি ; (৩) মিসেস এস, কে, সেন, কলিকাতা ; (৪) শ্রীমতী পাঞ্চালবালা বসু, কলিকাতা ; (৫) মিঃ জে, এন, চ্যাটার্জ্জি, দিনাজপুর ; (৬) শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ বর্দ্ধন, সিঙ্গাপুর। (৭ কর্ণেল এইচ, সুরাবর্দ্দি, কলিকাতা ; (৮) মিসেস এডেলা কটন, কলিকাতা ; (৯) শ্রীমতী হেমবালা সেন, শান্তি-নিকেতন ; ১০) মিস এস্, সেণ্ডার, কলিকাতা ; (১১) মিসেস্ এস, কে, সেন, কলিকাতা ; (১২) শ্রীমতী তমাললতা দত্ত, কলিকাতা ; (১৩) মিঃ এস, সি, চ্যাটার্জ্জি, বার-এট-ল, কলিকাতা ; (১৪) শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এস-সি, কলিকাতা ; (১৫) মিঃ এস, কে, গাঙ্গুলির, কলিকাতা।

পরিচালকসমিতির নূতন সভ্য

গত ২১ মে যে পরিচালকসভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ বি-এল এবং শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এস-সি পরিচালকসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নূতন মহিলাসমিতি

গত মে ও বর্ত্তমান জুন মাসে নিম্নলিখিত নূতন মহিলা-সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে :—(১) কলবা (২৪ পরগণা), (২) কড়কোণা (বর্দ্ধমান), (৩)-পাইকপাড়া (খুলনা), (৪) মৌভোগ (খুলনা), (৫) বালুঘাট (দিনাজপুর), (৬) ঘানসি (খুলনা), (৭) বকাই (বরিশাল), (৮) সিংগোনি (ময়মনসিংহ) এবং (৯) মৌলমিন (বর্ম্মা)

মৌলমিনে মহিলাসমিতি

ইতিপূর্ব্বে রেঙ্গুনে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি মৌলমিনে একটি নূতন মহিলাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমতী শান্তিময়ী দত্ত সমিতির সম্পাদিকা হইয়াছেন। সমিতির বর্ত্তমান সভ্য-সংখ্যা ২১ জন। আমরা এই সমিতির মঙ্গল কামনা করি।

কয়রা মহিলাসমিতি

গত ১২শে মে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত কয়রা গ্রামে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী এম-এ, বি-টি মহোদয়ের গৃহে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। গ্রামের অনেক

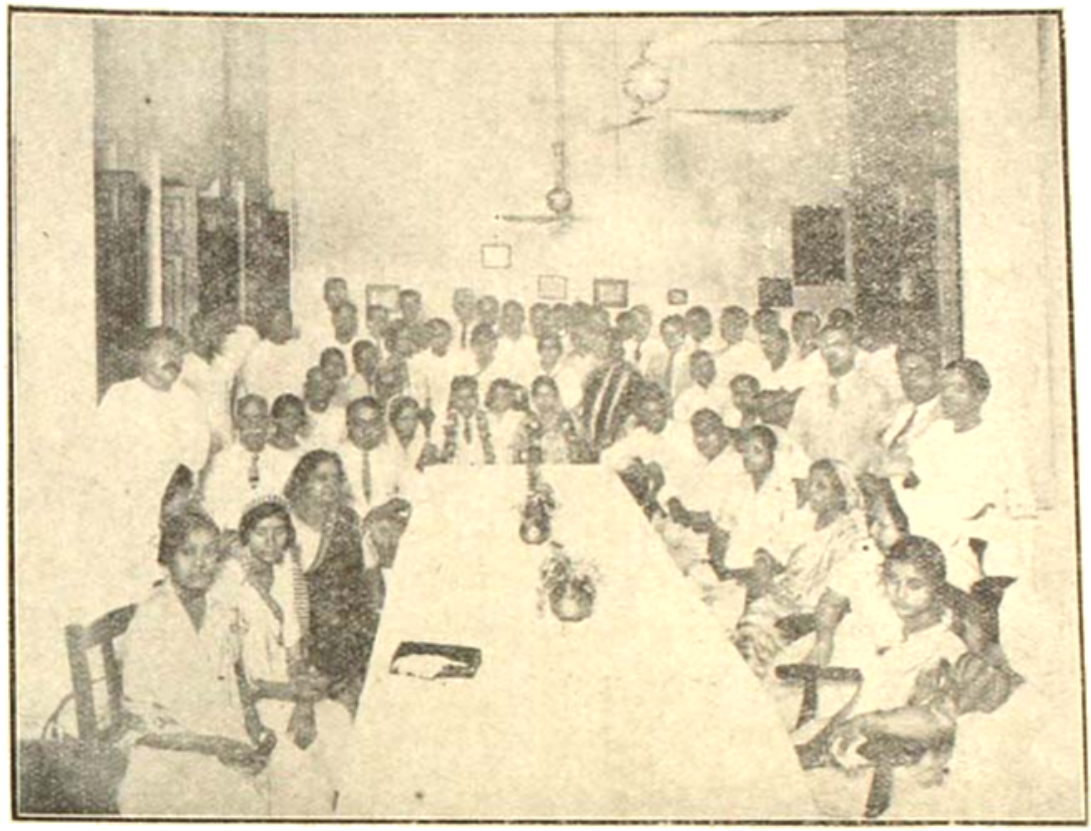

কেন্দ্রসমিতির সভায় মিঃ ও মিসেস চৌধুরীর অভিনন্দন

মহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্তা সুখময়ী রায় এই সভায় উপস্থিত হইয়া মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সেই দিনই এই স্থানে একটি মহিলাসমিতি গঠিত হইয়াছে। মিসেস সিংহ এই সমিতির সম্পাদিকার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই এই সমিতি নির্দ্দিষ্ট চাঁদা দিয়া সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রায় বাহাদুর ব্রহ্মচারী এই সমিতির জন্য আন্তরিক পরিশ্রম ও সাহায্য করিতেছেন।

মিঃ এবং মিসেস চৌধুরীর অভিনন্দন

মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এবং তাঁহার পত্নী গত ২৩শে মে বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সম্মিলনের প্রতিনিধি-রূপে জেনেভা যাত্রা করিয়াছেন। মিঃ এবং মিসেস চৌধুরী সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং সকল সময়েই নানাভাবে সমিতির কার্য্যে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ইউরোপ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে গত ২০শে মে মঙ্গলবার পরিচালকসভার সদস্যগণ তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করেন। সভায় সঙ্গীত এবং জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মিঃ চৌধুরীর গুণপনার উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। মিঃ চৌধুরী উত্তরে সমিতির কার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া বিদেশে ইহার সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

মহিলা-সভা

গত ২০শে মে টালা মহিলাসমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন এই সভায় বিশেষে মহিলা-

দিগের শিক্ষার ধারা এই বিষয়ে আলোকচিত্র-সাহায্যে একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। টাপা মহিলাসমিতি সম্প্রতি মহিলাদিগকে বয়ন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি তাঁত ক্রয় করিয়াছেন। সভ্যারা এখন একজন উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর নিকট বয়ন শিক্ষা করিতেছেন।

সালিখা মহিলাসমিতির চতুর্থ বার্ষিক উৎসব

গত ২৩শে মে শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ২১ নং রাধানাথ মুখার্জির লেনে হাওড়ার সালিখা মহিলাসমিতির চতুর্থ বার্ষিক উৎসবসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্টা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী এবং সহ-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুষমাময়ী রায় ও প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী নারীমঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা ভানুমতী দেবী বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। কার্য্যবিবরণী পাঠে জানা যায়, গত ১৩৩৬ সালের এক বৎসরে সমিতি প্রায় ৭০০ শত টাকার শিল্পকার্য্য করিয়াছেন। এখানে ১৫টি ছাত্রী নিয়মিত ভাবে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। সমিতির সমস্ত আয়ই মহিলাদের শ্রমলব্ধ এবং সাহায্যকৃত। বর্ত্তমান বাংলা দেশের পক্ষে এ সকল আদর্শ অনুকরণের যোগ্য এবং প্রশংসার্হ। তৎপরে শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় "মাতৃত্বের আদর্শ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে সমাজের, জাতির ও দেশের সংরক্ষণের ও পরিপুষ্টিসাধনের একমাত্র সম্বল যে শিশু, তাহার জননী ও পালিনী যদি স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা এবং কর্ম্মকুশলা না হয়েন, তবে সহস্র চেষ্টায়ও বাংলাদেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া পাইবার আশা নাই। দেশের এই জীবন সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, প্রতি পল্লীতে মহিলাসমিতিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং তাহা না হইলে আর কোনও উপায় নাই। তৎপরে শ্রীমতী ইন্দিরা চ্যাটার্জ্জি তাঁত ও চরকা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সঙ্গীতান্তে সন্ধ্যার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

মহিলাসমিতি পরিদর্শন

গত ৩১শে মে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে মহিলাসমিতি পরিদর্শন সমিতির সভ্যা শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তা বর্ণলতা বসু এবং নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী শ্রীরামপুর ও রিষড়া মহিলাসমিতি পরিদর্শন করেন। শ্রীরামপুর এবং রিষড়ায় এই উপলক্ষে দুইটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। শ্রীরামপুর মহিলাসমিতির সভ্যাসংখ্যা এখনও বহুসংখ্যক না হইয়া থাকিলেও এই সমিতির সভ্যারা নিয়মিত ভাবে তাঁহাদের সমিতির অধিবেশন করিয়া থাকেন। অল্প কাল মধ্যে সভ্যারা চাঁদা তুলিয়া সমিতির একটি তহবিল গঠন করিয়াছেন। সম্পাদিকা এবং তাঁহার দুঃখা স্বশ্রূমাতা শোকাতুরা হইলেও অতি উৎসাহের সহিত এই সমিতির কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। রিষড়ায় মহিলাসভায় বহু মহিলা অতি উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া বক্তৃতা দেন।

গত ২রা জুন শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী শ্যামপুকুর সমিতি পরিদর্শন করেন।

মহিলাসমিতির পরিচালনপ্রণালী

অধিবেশন মাসে ১ বারের কম না হয়। সপ্তাহে ১টি করিয়া হইলে উত্তম। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ চারিবার করিয়া হওয়া প্রয়োজন।

প্রতি অধিবেশনে সভ্যাগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত হইবেন তাঁহাদের নাম ও কার্য্যবিবরণ একটি খাতায় লিখিয়া রাখিতে হইবে। পূজা-অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ উপস্থিত সভ্যাগণের সম্মুখে পঠিত হইলে ও তাঁহাদের দ্বারা উহা অনুমোদিত হইলে পর সম্পাদিকা এবং সভানেত্রী উহাতে স্বাক্ষর করিয়া রাখিবেন।

মাসান্তে আয়ব্যয়ের হিসাব সভ্যাগণের সম্মুখে পড়িয়া উহাও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন। আয়ব্যয়ের হিসাব অতি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক—অর্থাৎ চাঁদা দ্বারা কত আয়, শিল্পের দ্বারা কত আয়, বিশেষ কোন দান প্রাপ্ত

হইলে তাহাও পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত থাকা প্রয়োজন। ব্যয় সম্বন্ধেও তাহাই।

সমিতির সভ্যাগণের জ্ঞান লাভ করা ও জ্ঞান দান করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং অবস্থানুযায়ী বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ, পুস্তক পাঠ, অন্তঃপুরশিক্ষার ব্যবস্থা এবং বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বালিকাবিদ্যালয়ে উৎসাহ-প্রদান আবশ্যক। স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় অথবা অন্তঃপুরশিক্ষালয় স্থাপিত হইলে সমিতির যাঁহারা শিক্ষা-দান করিবেন তাঁহাদের সাধারণ শিক্ষা কতদূর, এবং কতজন শিক্ষয়িত্রী, কতজন ছাত্রী ইত্যাদি বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখিয়া সর্ব্বশেষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা কেন্দ্র-সমিতিতে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

সম্ভব হইলে ধাত্রীশিক্ষার ক্লাশ খোলা, ডাক্তারের সাহায্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করা, টোটকা ঔষধ জানা থাকিলে সে সম্বন্ধে অধিবেশনের সময় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সহরে শিশুপ্রদর্শনী হইলে তাহাতে যোগদান করিয়া, সভ্যাদিগের শিশুসন্তান লইয়া শিশুপ্রদর্শনী করিয়া, ডাক্তারের দ্বারা শিশুদিগকে পরীক্ষা করাইয়া, সমিতির ব্যয়ে স্বাস্থ্যবান শিশুদিগকে পুরস্কৃত করিয়া, তাহাদের রোগ সম্বন্ধে ও রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে ডাক্তারের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া সমিতির সভ্যারা অনেক কিছু করিতে ও শিখিতে পারেন। এইরূপ শিশুপ্রদর্শনী, ধাত্রী-ক্লাশ বৎসরে একটি করিয়া হইলেই যথেষ্ট হইবে।

রন্ধনশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। সম্ভব হইলে আকস্মিক বিপদে সাহায্য-দান এবং রোগীর শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে উত্তম। তবে এই সমস্তগুলি একসঙ্গে আরম্ভ করা সম্ভব নয়। যে সমিতি যত বেশী এই সকল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন সেই সমিতি তত অধিকতর পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। যে যে সমিতি যাহা যাহা শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন তাহার ধারাবাহিক বিবরণ প্রতি অধিবেশনে লিপিবদ্ধ করিয়া সম্পাদিকার ও সভানেত্রীর স্বাক্ষর সমেত রাখিয়া দিবেন। এবং বৎসরান্তে কেন্দ্রসমিতিতে যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিবেন।

কি কি শিল্প হইয়াছে, প্রতি মাসের হিসাব অর্থাৎ কয়টি কয়-রকমের কি কি জিনিষ, জিনিষের মূল্য কত এবং বিক্রয়ের মূল্য কত, লাভ কত তাহার পৃথক হিসাব প্রয়োজন।

যাহা দ্বারা গৃহস্থের সংসার-পরিচালনার সুবিধা হয় এইরূপ শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বৎসরে একটি করিয়া নিজেদের শিল্প লইয়া প্রদর্শনী খোলা এবং পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত মহিলাকে পুরস্কৃত করিয়া উৎসাহ প্রদান করা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত সম্ভব হইলে অপরের অনুষ্ঠিত শিল্পপ্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন।

সমিতির সভ্যাসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিও মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। অন্তঃ এমন সভ্যাই প্রয়োজন যাঁহারা নিয়মিত চাঁদা দিবেন এবং সমিতির কার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— যাঁহারা সমিতির তহবিলের টাকা কেবল নারীজাতির উন্নতিকল্পে ব্যয় করিয়া বিশেষ বিশেষ জনহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য অথবা বিশেষ কোন অভাবগ্রস্তকে দান করার জন্য বিশেষ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন তাঁহাদের কার্য্য প্রশংসার্হ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যে সমিতি অবরোধপ্রথা, পণপ্রথা প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণার্থ অগ্রসর হইবেন তাঁহাদের কার্য্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

প্রতি বৎসরের কার্য্য পৃথক করিয়া লিখিতে হইবে। প্রতি বৎসরের কার্য্যের উপর পুরস্কার নির্ভর করিবে। নভেম্বর মাসের ৩০শে তারিখের মধ্যে সকল সমিতির কার্য্য-বিবরণ কেন্দ্রসমিতিতে প্রেরণ করা প্রয়োজন। ৩০শে নভেম্বরের পরে প্রেরিত হইলে সেই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইবে না।

যে সমিতি ইহা ব্যতীত নারীউন্নতি-বিষয়ক (ব্যায়ামাগার, সমিতি-বাগান প্রভৃতি) কার্য্য করিতে পারিবেন সেই সমিতি বিশেষ পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

বাদলরাণী

পীযূষ চক্রবর্ত্তী

গগন-পথে বাদলরাণী ঘটে,—
ও ভাই কাজল-কালো মূরতিখানি বটে!
সঙ্গী সখী চপলা-চলে আজি
মিলন-গীতে ভরে চলে সাজি',
পরাণ-পরীযমুভাগে পুলক বাতি জ্বলে,—
হাসুন যত মেঘের হাতে বিজলী-বাতি জ্বলে।

বরষে হাসি' সহচরীরা হরষে শত সাজে!
শুনিয়া নভ গভীর-রব বাজনা তত বাজে
বরষ-শেষে বিরহ সব চুকে,
হরষী ভাবে বিপুল নব সুখে,
তরুণী সে যে—বারিক-ধারা নীলের বীথি গলে,
উছলি' ভরে জোনাক-জ্বালা দীপের দীপ্তি জলে!

শ্লোনের লিনিমেণ্ট

প্রয়োগ করিয়া বাতের বেদনা দূর করুন

শ্লোনের লিনিমেণ্ট কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাতের বেদনা দূর করে। যে স্থানে বেদনা সেই স্থানে দৈনিক ৩।৪বার শ্লোনের লিনিমেণ্ট প্রয়োগ করুন, তাহা হইলে রক্তস্রোত স্বাভাবিক হইয়া অবিলম্বে আরামপাইবেন।

Sloan's Liniment *kills pain!*

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press, 9-3 Ramnath Majumdar Street Calcutta.
and published by him at 45 Beniatola Lane, Calcutta

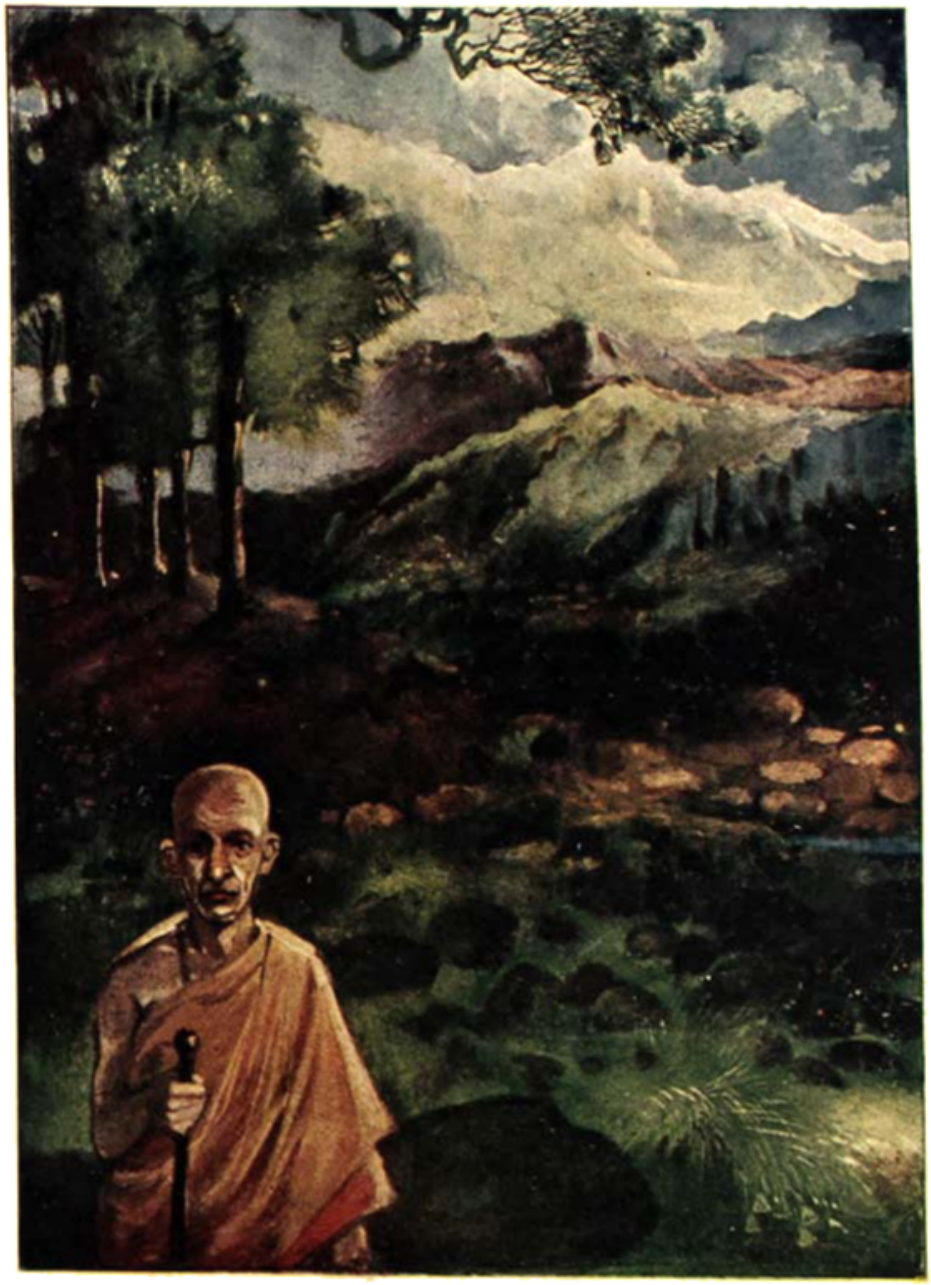

পরিব্রাজক

শিল্পী—শ্রী পূর্ণ চক্রবর্ত্তী

বঙ্গলক্ষ্মী

"আমি তাই আমাদের দেশের মা-বোনদের অনুরোধ করছি, জেগে উঠুন, প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলা-সমিতি স্থাপন করুন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাবে বেশ ভেবে ফেলুন, তা ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন, অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতার আশা করি না কেন, সবই বিফল হবে।"

—সরোজনলিনী

৫ম বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৭ [৯ম সংখ্যা

বর্ত্তমান যুগের নারীসমস্যা

শ্রী নীলেশচন্দ্র সেন ডি-লিট

একপায়ে চলাফেরা ত দূরের কথা, দাঁড়াইয়া থাকাই শক্ত। আহার পা-দুটো ঠিক সমান হওয়া দরকার। এক-চাকার গাড়ী চলে না—আবার দুটি চাকাও ঠিক এক-মাপের হওয়া চাই।

স্ত্রীপুরুষ লইয়া সংসার—উভয়ের সমবেত চেষ্টায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। এ দুইয়ের শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি যদি একরূপ না হয়, তবে সংসার কতকটা অচল হয়, একপায় দুঁড়াইয়া খুঁড়াইয়া কোনরকমে চলিতে পারা যায় বটে কিন্তু তা বেশীক্ষণ নয়। আমাদের ইংরেজীর সংসার আজকাল সেইরূপই অতি অসমভাবে কষ্টেসৃষ্টে চলিতেছে—কিন্তু স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা দীক্ষা একরূপ না হইলে দীর্ঘকাল এইভাবে সংসার চলিতে পারে না।

পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা টোল-পণ্ডিতদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাঁহাদের মেয়েরাও অনেক সময়ে খুব উচ্চশিক্ষা পাইতেন। ফরিদপুরের বৈজয়ন্তী দেবী বিবিধ সংস্কৃত-গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন; নাগা জয়নারায়ণের মাতৃস্থানী নাগা রামগতির কন্যা আনন্দময়ী দেবী রাজবল্লভের অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল কিরূপ হইবে, তাহা শাস্ত্র দেখিয়া স্বয়ং আঁকিয়া দিয়াছিলেন; ষোড়শ শতাব্দীতে বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাদেবী রামায়ণের যে সুললিত বঙ্গানুবাদ করেন তাহা বৈষ্ণব-সাহিত্যের মহিলারা বিবাহ-উৎসবে এখনও গান করিয়া থাকেন। এরূপ বিদুষী মহিলাদের অনেকের নাম আমরা জানি।

কিন্তু সাধারণ ভদ্রসমাজের মহিলারা উচ্চশিক্ষা না পাইলেও তাঁহাদের অনেকেই রামায়ণ, মহাভারত পড়িতে

পারিতেন; পুরাণের উপাখ্যান সকলেই জানিতেন, গৃহস্থ ভদ্রলোকদের বিদ্যার দৌড়ও তাহা হইতে বড় বেশী ছিল না। স্ত্রী, পুরুষ ইঁহাদের উভয়ের আদর্শ ও জ্ঞান অনেকটা এরূপ ছিল। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পুরুষ কৃষি, জমিজমার কাজ, বহুবারে ব্যয়ের লেখাপড়া এবং রাষ্ট্রশাসনের কাজ করিতেন। মেয়েরা ঘরের সমস্ত কাজ অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহারা প্রিয়জনের জন্য রান্নাঘরে নূতন নূতন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিতেন; ক্ষেত্র হইতে ফসল আসিলে তাহা গোলায় তুলিতেন; তাঁড়ার রাখিতেন; কন্যাদীবন ও আলিপনায় বিচিত্র কৌশল দেখাইতেন—তাঁহারা কথকতা, কীর্ত্তন, গীতার ব্যাখ্যা ও পুরাণ-পাঠ শুনিতেন। এখন চাকর ও বামুনেরা যাহা করে তাহার অনেক কাজই তাঁহারা প্রসন্নমনে করিতেন। ইহা তাঁহাদের দাসীবৃত্তি ছিল না, প্রিয়জনের জন্য এই সেবাবৃত্তি ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। পুরুষ ও রমণীর শিক্ষা ও কাজের প্রণালী অনেকটা একরকমের থাকার দরুণ, দুই অসম-চাকায় পরিচালিত গাড়ীর ন্যায় এইরূপ সংসারযাত্রায় বৈষম্যজনিত উৎকট ঘর্ঘর-শব্দ সমুত্থিত হইয়া অনর্থের উৎপত্তি করিত না; স্ত্রীলোকেরা যেরূপ দাসী বৃত্তি করিতেন, পুরুষেরা সেরূপ দাসবৃত্তি করিতে বিমুখ ছিলেন না। আমি নিজেই শৈশবে দেখিয়াছি—বিশিষ্ট-ঘরের গৃহস্থেরা ঘরের চাল ছাইতেছেন, বাজার করিয়া বোঝা বহিয়া আনিতেছেন, গরুকে দানা দিতেছেন এবং খড়ো-ঘরে বাঁশের বেড়া মেরামত করিতেছেন। এই সকল কাজ ভাল কি মন্দ তাহা বলিতে চাহি না—সংসারের পক্ষে এইগুলি নিজেই করুন বা অপরের দ্বারাই করাইয়া লউন অত্যাবশ্যক। পুরুষ না থাকিলে যেমন সংসার আশ্রয়হীন হইত, সেকালে স্ত্রীলোক না হইলেও সেইরূপ সংসার শুধু যে শ্রীহীন হইত তাহা নহে, একেবারে অচল হইত।

এইজন্যই সেকালে বিবাহের একটা অপরিহার্য্য প্রয়োজন ছিল। কন্যা ছিলেন রত্নস্বরূপ, তিনি না হইলে সংসারের হাটে জীবনের বিকিকিনি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। এইজন্য তাঁহাকে পণ দিয়া গ্রহণ করিতে হইত।

এখন মহিলাদের জীবনের প্রয়োজনের অঙ্ক প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। সহরে যাহা দেখি তাহাতে ত মনে হয় তাঁহাদের কোন প্রয়োজনই নাই। পাড়াগাঁয়েও সহরের এই আবহাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। মধ্যবিত্তগণের সংসারে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন ক্রমে হ্রাস পাইয়া যাইতেছে। তিনি রান্নাঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নহেন; শিশুপালনের ভারে তিনি ভার হইয়া পড়েন। সেকালে মেয়েরা ঢেঁকি কুটিতেন, আধক্রোশ দূরের নদী হইতে কলসী করিয়া জল আনিতেন, জাঁতা চালাইতেন, চরকায় সূতা কাটিতেন, অন্ন নবদনে গরুর সেবা, গোবরে দেঁয়া

ডাঃ শ্রী নীলেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্

দেওয়া ও গোময়ে ঘরের মেঝে ও উঠান মার্জ্জনা করিতেন—এই সকল কার্য্যে শরীর সবল ও পুষ্ট হইত—ইহা একরূপ ব্যায়াম ছিল। এখনকার মেয়েরা গোবর এবং ঢেঁকির কথা শুনিলে আতঙ্কিত হইবেন। বাসনকোষণ ঝিয়েরা মার্জ্জনা করিয়া থাকে, লবণসমুদ্রের তীরবাসী উড়ে-বামুন ব্যঞ্জনাদি অতিরিক্ত লবণে অখাদ্য করিয়া গৃহস্বামীর পাতে দিয়া যায়,—অনেক সময়ে গৃহিণী উঁকি মারিয়াও রান্নাঘরের ব্যাপার দেখেন না।

এখন অনেক সময়ে গৃহিণী সংসারের পক্ষে শুধু অপ্রয়োজনীয় নহেন, তিনি গৃহস্থের কাঁধের একটা অতিরিক্ত বোঝা—অষ্টপ্রহর তাঁহার পাঁঠা পাশিয়াই আছে, শিশুসন্তানগুলি ঘর ভর্ত্তি করিয়া গৃহস্থের মাথা দুশ্চিন্তা ও

উদ্বেগে চিন্তিত করিয়া ফেলিতেছে। ইহা ছাড়া তাঁহার সিনেমা, নাটক, সার্কাস, প্রহসন প্রভৃতি দেখার সখ পুরুষটিকে মিটাইতে হয়। শিক্ষিতা ভদ্রলোকের সংসার যে কতখানি দুঃসহ হইয়াছে তাহার চিত্র বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মর্ম্মন্তুদ বেদনায় অঙ্কিত রহিয়াছে।

এখন যদি কোন শিক্ষিত যুবক বিবাহ করিতে রাজী না হন, পূর্ব্বোক্ত কারণে তাঁহাকে তজ্জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। বিবাহ পুরুষের পক্ষে একটা সখের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সখ তাহাকে অনেক কষ্টে, অনেক লাঞ্ছনা ও অনেক অর্থব্যয়ে মিটাইতে হয়—এইজন্য কন্যাপণ বাড়িয়া চলিতেছে এবং কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক চক্ষে সরিষাফুল দেখিতেছেন। সংসারের ভার কোমল স্কন্ধে বহন করিতে মেয়েরা এখন আর রাজী নহেন,—সংসারও যেন আর তাঁহাদের চায় না।

তারপর যে কথা লইয়া সুরু করা গিয়াছিল, শিক্ষিত যুবককে প্রায়ই অশিক্ষিত স্ত্রীকে লইয়া সংসার চালাইতে হয়,—উভয়ে শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে দুই বিভিন্ন মেরুতে দাঁড়াইয়া আছেন। যিনি বর্ত্তমান সভ্যতার সমস্ত তত্ত্ব অবগত আছেন, দেশের নানাদিকের সমস্যাপূরণ করিতে যাঁহাকে ডাকি আহ্বান করিতেছে—তাঁহার জীবনের অংশীদার অশিক্ষিতা অনভিজ্ঞা ললনা—সে যে কত বড় বিপদ তাহা ভুক্তভোগীরা জানেন। স্বামী যে সকল বিষয় চিন্তা করেন স্ত্রী তাহার কোন ধার ধারেন না। যৌন বা দাম্পত্যের যে সুখস্বপ্ন যৌবনের একটা বড় আনন্দ, এইরূপ অসম মিলনে তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন।

অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে পুরুষ ও স্ত্রী কতকটা আপেক্ষিক ভাব বজায় রাখিয়াছে। তাহাদের শিক্ষা একবিধ ও গৃহস্থালীর ব্রত তাহারা উভয়ে চালিবার জন্য কাঁধ পাতিয়া দেয়। এজন্য উচ্চসমাজে যতটা হইয়াছে নিম্নসমাজে ততটা সাংঘাতিক বিরোধ ঘটে নাই। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন যে কত বেশী তাহা এই সকল কারণে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

আমাদের সমাজ জরাজীর্ণ,—কুসংস্কার, কুশিক্ষা, কুরুচি ইহার অস্থিমজ্জায় ঢুকিয়াছে।

আমরা ভারতবাসী। ভারতের যে চিরন্তন আদর্শ তাহাই আমাদের সম্মুখে রাখিতে হইবে। আমরা ইচ্ছা করি না যে আমাদের মেয়েরা শাড়ী ছাড়িয়া গাউন পরেন। আমাদের ইচ্ছা নয় যে আমাদের মেয়েরা কপালের সিন্দুর-ফোঁটা মুছিয়া ফেলেন বা রান্নাঘরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন। সেবাবৃত্তিকে দাসীবৃত্তি মনে করিয়া সংসারের সমস্ত কার্য্যে পরিচারক-পরিচারিকার উপর নির্ভর করার মতন আর বাঙ্গালার কতটা গৃহস্থের আছে? বস্তুতঃ সেবাবৃত্তি যদি ত্যাগ ও প্রীতির দ্বারা প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে তাহা মহিমান্বিত হইয়া উঠে—তাহা আমরা কখনই হেয় বলিয়া মনে করিতে পারি না। মাতৃত্বের এই সেবাবৃত্তির চরম মহিমা উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে।

স্ত্রীস্বাধীনতার কথা উঠিয়াছে। এই স্বাধীনতার অর্থ যদি পুরুষের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ হয় তবে তাহা একটা পাগলামি মাত্র। যৌনসম্বন্ধ অতি পবিত্র। সংসারের স্থিতি ও গতি এই সম্বন্ধের উপরে নির্ভর করিতেছে। যেখানে একনিষ্ঠ প্রেমের উপর এই সম্বন্ধ দাঁড়ায় সেখান পীঠস্থানের মত পবিত্র। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী চিরকালই জগতে আদর্শ থাকিবেন। আজকাল কেহ কেহ সতী কথাটার উপর যেন চটিয়া থাকেন—সতী কথাটাতেই যেন একটা হীন দাসত্বের ভাব আছে তাঁহারা এইরূপ মনে করেন। এমন কি কোন কোন ঔপন্যাসিক অসতীকেই গৌরবান্বিত করিয়া আঁকিতে চেষ্টা পাইয়া সতীসাধ্বীকে একটা নির্ব্বোধ ও কৃপাযোগ্য জীবের পর্য্যায়ে ফেলিয়া উপহাসাস্পদ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু মনস্তত্ত্বের ক্রম দেখাইবার ভার দার্শনিকদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারগণ সত্য শিব ও সুন্দরের মর্য্যাদা-রক্ষায় অধিকতর চেষ্টা করিলে শোভন হয়। নতুবা এই-সব কালোয়াতিতে বুদ্ধির খেলা যতটা দেখান হয়, কালোপযোগীভাবে তাহাতে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও লেখকেরা যীশুখৃষ্টের হস্ত হইতে অমর বর পাওয়ার দাবী করিতে পারেন কিনা সন্দেহ।

এ কার্য্য করিতে যাইয়া সাহিত্যের বড় বড় সংস্কারকও একটু দ্বিধা বোধ না করেন এমন নয়। রবিবাবু তাঁহার বিনোদিনী বা 'মক্ষী'কে একেবারে চরিত্রহীনা করিতে সাহস পান নাই, কতকটা দূরে আনিয়া শেষে মান বাঁচাইয়া

ছাড়িয়া দিয়াছেন। মেটারলিঙ্ক মনাস্তানাকে অতলে ডুবাইতে যাইয়াও রশ্মি টানিয়া লেখনীকে শেষাংকে সংযত করিয়াছেন। এই সতীত্বের সংস্কার জগতের—বিশেষ ভারতের একটা ব্যাপক সংস্কার,—চুড়ি মারিয়া তাহা উড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে।

জীবনের তাতে প্রেম অনুতস্বরূপ, পত্নীর প্রেম, মাতৃত্বের, সখ্য—জীবনের সার সুখ। যাঁহারা এগুলি কিছু নহে বলেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির প্রকৃত সম্পদের শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তির বিদ্রোহী। আমার সঙ্গে শত শত লোক সুর মিলাইয়া অবশ্য বলিবেন যে জীবনে যদি কোন সুখ সর্ব্বাপেক্ষা বেশি কেহ পাইয়া থাকেন—তবে তাহা স্নেহ-মমতা ও প্রীতিজনিত। এই মনোবৃত্তি সদ্‌গুণস্বরূপ। ইহার উচ্ছেদসাধন করিলে মানুষের চিত্ত শুষ্ক রসহীন মরুভূমি হইয়া দাঁড়ায়। বৈষ্ণবেরা বলেন মাতৃস্নেহ, প্রভু-ভক্তি, সখ্য ও দাম্পত্য—একই জিনিষ। ইহাদের প্রভেদ গুণে নয় পরিমাণে। ইহা ভগবানকে পাইবার সাধনার সোপান এবং এই তপস্যার ক্ষেত্র মানবের নিজগৃহ। গৃহ ধর্ম্ম যদি একনিষ্ঠ প্রেমের উপর দাঁড়ায় তবে তাহাই মন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ হয়—তথা হইতে ভগবান্ বেশী দূরে থাকেন না।

আজ যদি সাহিত্যে আমরা শকুন্তলা, সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীকে হারাই,—বৈষ্ণব সাহিত্যাকাশের রাধা-চন্দ্রমা যদি পরিত্যক্ত হন,—আজ যদি জুলিয়েট, ডেসডিমোনা ও মিরেণ্ডা লুপ্ত হয় তবে রসসাহিত্যে যে ক্ষতি হইবে তাহা আনা ক্যারেনিনা, গুইনিভির বা মনাস্তানা পূরণ করিতে পারিবে কি? সাহিত্যে ধর্ম্মে সমাজে একনিষ্ঠ প্রেমের স্থান অনেক উচ্চে।

মেয়েরা কি চান সেই মূর্ত্তি হারাইতে—যে শ্রীমূর্ত্তিতে তাঁহারা বিমুক্ত-হাতে শিশুকে দুধ খাওয়ান,—তাহার নবোদ্ভিন্ন দন্তের হাসি দেখিয়া ক্রোড়ে জড়াইয়া চুম্বন করেন? তাঁহারা কি সেই মূর্ত্তি হারাইতে চান—যে মূর্ত্তিতে সীতা সাম্রাজ্যকে কড়ার মূল্য দিয়া হাসিয়া বনবাসী স্বামীর পথাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, যে মূর্ত্তিতে অশক্ত ভেজে সাবিত্রী বা বেহুলা যমদণ্ডকে হটাইয়া দিয়া মৃত স্বামীকে জীবনদান করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি সেই মূর্ত্তি হারাইতে চান যাহার প্রভায় কণ্বমুনির তপোবন উজ্জ্বল করিয়া বনচারিণী কুমারী শকুন্তলা প্রথম প্রণয়ের প্রেমোন্মেষ অনুভব করিয়াছিলেন? পৃথিবীকে জ্যোৎস্নার রজতপ্রপাতে ধবলিত করিয়া চন্দ্র সমুদিত হন,—বল্লরীরা পুষ্পগন্ধ সান্ধ্য বাতাসে বিলাইয়া জগতকে স্বর্গে পরিণত করে—প্রীতিস্নেহ দ্বারা রমণী জগতকে তেমনি আনন্দপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা কি এই চিত্রে বিমুখ হইতে পারি?

বিবাহপ্রথার দোষ থাকিতে পারে—কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামী-মনোনয়নের সম্পূর্ণ অধিকার স্বীকার করিয়াও একনিষ্ঠ প্রেমের মহিমা কি কেহ অস্বীকার করিবেন? সাহিত্যে আজকাল স্বৈরাচারের যে উদাহরণ দেখা যায় উহার প্রভাব বিষাক্ত বায়ুর ন্যায় আমাদের সমাজের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতেছে। সমাজবিধি পরিবর্ত্তিত হউক কিন্তু মনুষ্যচিত্তের সুকুমার বৃত্তিগুলি পদদলিত করিয়া যদি একটা অশোভন বীরত্ব দেখাইতে চাই—তাহা একটা সামাজিক বিভ্রাটের সূচনা করিবে।

আমাদের জাতিভেদ একসময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এমন একটা বড় সমস্যা পূরণ করিয়াছিল যাহা জগতে অন্য কোন জাতি করিতে পারে নাই। আমাদের আচারনিষ্ঠা বৌদ্ধযুগের শোষাধারের বিশৃঙ্খলার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ছিল। কিন্তু অতিবড় সুন্দরী মহিলেও তাহার শবটা গৃহে রাখা উচিত নয়। পূর্ব্বতন সমাজের রীতিনীতি এখন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় প্রাচীন সংস্কারের মৃতদেহটা মেয়েরাই অতিরিক্ত শ্রদ্ধায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন

তথাকথিত হীন জাতির স্পর্শ ইঁহাদের নিকট বিষতুল্য। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"চলিবার তরে কর উপদেশ পাথর চাপিয়া পিঠে"—আমরাই যাহাদিগকে হীন করিয়া গড়িয়াছি তাহাদের এতটা ঘৃণা করা কি আমাদের সাজে? আপনারা জানেন কি না জানি না, হাড়ি জাতি এককালে বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের পুরোহিতের কাজ করিতেন। গোবিন্দ-চন্দ্রের গুরু হাড়ি সিদ্ধার নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। দুর্গাপূজার প্রধান পুরোহিত এককালে হাড়িরা ছিলেন, এইজন্য দুর্গা হাড়ির মেয়ে বলিয়া উল্লিখিত। এখনও অনেক কালীমন্দিরের পুরোহিত হাড়ি। মেথর 'মহত্তর'

শঙ্খের অপভ্রংশ।- ইঁহারা বৌদ্ধাধিকারে মহাতান্ত্রিক ছিলেন।

ডাড়ি ও মেথরগণ মড়া ও মলমূত্র লইয়া যেরূপ তান্ত্রিক উৎকট ও অযথ অনুষ্ঠান করিতেন, এখনও তান্ত্রিকেরা সেইরূপ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধযুগের পুরোহিত ও ধর্ম্মগুরুদের দশা এরূপ কে করিল তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। শঙ্করবিজয়ে লেখা আছে রাজা সুধন্বা উত্তরদেশে শত শত বৌদ্ধ পণ্ডিতের মস্তিষ্ক দণ্ডদ্বারা চূর্ণ করিয়া দুষ্টমত দমন করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের পাণ্ডারা বৌদ্ধ পুরোহিতগণকে কিরূপ নির্য্যাতন করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আপনারা তমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণেও পাইবেন। যাঁহারা তান্ত্রিকানুষ্ঠানের জন্য মনুষ্য স্পর্শ ও শ্মশান হইতে অর্দ্ধদগ্ধ শবের মাংস আহার করিতেন বিজেতারা তাঁহাই তাঁহাদিগের ব্যবসায়ে পরিণত করিয়া দেলিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা এখন তাঁহাদের প্রাচীন ইতিহাস জানে না। বিজয়ী রাজারা নিজের জাতির লোকদিগের দ্বারা এই জঘন্য কার্য্য করাইতে স্বভাবতঃ দ্বিধা বোধ করিতেন। এক সময়ে চণ্ডালেরা যে কাজ করিত হিন্দুরাজারা বিজয়ী হইয়া তাহাই শত্রুদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন। পরাজিত শ্রমণ প্রতিদ্বন্দ্বীরা ডোম, ডাড়ি এবং মেথরে পরিণত হইলেন।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই সকল অধঃপতিত জাতিদের উপর কৃপা হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের মা-মাসী যে কাজ করিতে ঘৃণা বোধ করেন আমরা ইহাদের দ্বারা তাহাই করাইয়া লই এবং পুরস্কারস্বরূপ অতি ক্রূর ও নিষ্ঠুর ঘৃণা দ্বারা তাহাদিগকে নির্য্যাতিত করি।

একটি মেথরাণী যে পথে যাইবে, সে পথে কলসী-কলসী গোময় ও জল ছড়াইয়াও মেয়েরা তৃপ্ত হন না,—কোন কোন বিধবা একটি পিপীলিকা বা কাক কোন নিম্নশ্রেণীর লোকের বাড়ী হইতে আসিয়া তাঁহার রান্নাঘরের উঠানে বা চালে গতিবিধি করিয়েছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া শতবার স্নান করিয়া দেহ-শোধনপূর্ব্বক আচারনিষ্ঠার চূড়ান্ত অভিনয় করিয়া থাকেন। এই হীন ও অনিষ্টকর জাতিভেদ-প্রথা স্ত্রীলোকেরা যেরূপ উৎকটভাবে পালন করিতেছেন তাহাতে হিন্দুসমাজ একেবারে সর্ব্বনাশের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্তানসমিতির সমস্ত প্রস্তাব, সংস্কারকের সমস্ত চেষ্টা উচ্চচণ্ডী পিসি বা বিধবা মাতুলানীর বিক্রমে একেবারে নিষ্ফল হইয়া পড়িতেছে। মেয়েরা আজ যদি তাঁহাদের কুসংস্কার শিথিল করেন, এবং যে ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত এইরূপ আচারের বাড়াবাড়ি সেই ধর্ম্মের সোপান নহে বরং বিপরীত এই শিক্ষা হৃদয়ে বদ্ধমূল করেন তবেই সমাজের মঙ্গল নতুবা দক্ষিণা ও তৈল-ঘট-লুব্ধ টুলো বামুন-পণ্ডিত ও তাঁহাদের আজ্ঞাবাহী মেয়েরা এই সমাজটি একেবারে নষ্ট না করিয়া ছাড়িবে না।

বিবাহের অতিরিক্ত ব্যয় ও পণপ্রথা মেয়েদের প্রশ্রয়ে বাড়িয়া চলিতেছে। স্বামী কন্যাদায়ে গুপ্তধনে আবদ্ধ,—তথাপি সন্তানের বিবাহ উপলক্ষে মেয়েরা তত্ত্ব ও উৎসবাদির জন্য সেই গুপ্তমুখ নিরাধারগ্রস্ত পুরুষটিকে এরূপ পীড়াপীড়ি করেন, যে তাঁহাকে আরও ঋণে জড়াইয়া পড়িতে হয় "আমার ছেলের বিবাহে এটি হইবে না ওটি হইবে না" এইরূপ আবদার ও হাত পাত করিয়া যদি গৃহিণী মুখভার করেন, তখন ফাঁসিকাষ্ঠের আসামীর মত স্বামী বেচারী হুঁচকে আঁধার দেখেন। পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের সময়ও মহিলাদের বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর অনেক সময়ে গৃহস্থকে বাতিব্যস্ত করিয়া তোলে। অশিক্ষিতা মহিলাসমাজের সকলেরই একসুর। তাঁহাদের ভালবাসা সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান নহি, কিন্তু অজ্ঞতা ও কুসংস্কারবশতঃ তাঁহারা যাহা করেন তাহা তাঁহাদের প্রিয়জনের গলায় কাটারি দেওয়ার মত নির্ম্মম। শিক্ষার অভাবে এইরূপ আবদার উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাচীন পুস্তকে দেখিতে পাই উচ্চবর্ণের লোকেরা অর্থকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেন এবং তাঁহাদের বিবাহোৎসব পুষ্পমালা ও পান-গুবাক-বিতরণে পর্য্যবসিত হইত। পক্ষ-হরিতকী মাত্র দিয়া চৈতন্যদেবের শচীর লক্ষ্মীকে তাঁহার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বণিকসমাজে অবশ্য বিবাহ খুব ঘটা করিয়া নির্ব্বাহিত হইত, তাঁহারা অনেক সময়ে মুখ্যভাবে অর্থের উপাসনা করিতেন এবং বিবাহাদি উপলক্ষে কে বেশী ঘটা করিতে পারে তাহা লইয়া তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত ;—তখন তাঁহাদের বাণিজ্য জগৎব্যাপী ছিল। স্ত্রীলোকেরা যদি বিবাহ প্রভৃতি উৎসবের বাহ-

সংকোচ না করেন তবে ক্রমেই আমাদের সমাজ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

ভদ্রঘরের মেয়েরা পূর্ব্বকালে অর্জ্জন করিতেন, তাঁহারা চরকা কাটিয়া কাপড়ে সূতা বুনিয়া, কাঁথাসি সীবন করিয়া এবং পৈতা তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিতেন। বিধবারা নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থাতেও নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। তাঁহাদের আর একটি প্রধান স্বাবলম্বনের ভিত্তি ছিল কবিরাজী ব্যবসা। বৈদ্যের ঘরের মহিলারা অনেকে নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতেন ও মুষ্টিযোগ জানিতেন; অনেক সময়ে তাঁহাদের খ্যাতি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িত। ঘরে বসিয়া তাঁহারা বেশ অর্জ্জন করিতেন। তাঁহারা একান্ত-ভাবে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন না। এককথায় তাঁহারা শুধু ক্রীতদাসীর মত দাসত্বে গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন এমন নহে, স্বাবলম্বনের অনেক পথ তাঁহাদের নিকটে উন্মুক্ত ছিল আমাদের গৃহস্থালী ন্যূনপক্ষে সাত-আট হাজার বর্ষের প্রাচীন। পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ইঁহাদের এক শ্রেণী কাজ করিবেন, আর এক শ্রেণী পড়ু হইয়া শুইয়া-বসিয়া কবিতা ও গল্পের বই লইয়া সময়াতিপাত করিবেন এবং আলস্য ও কুঅভ্যাসজনিত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দিবারাত্র পরিশ্রমে ক্লান্ত স্বামীকে হায়রাণ করিয়া তুলিবেন এই বিসদৃশ দৃশ্য সেকালে দেখা যাইত না। পল্লী-গ্রামের নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা কিরূপ কর্ম্মঠ তাহা দেখিলেই আমাদের হিন্দুসমাজের মেয়েদের নানাবিধ উদ্যমের চিত্রের এখনও কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

যদি আমাদের মেয়েরা শিক্ষয়িত্রী হইয়া গ্রামের মেয়েদের শিক্ষাদান করেন, যদি ভিষকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘরে বসিয়া মুষ্টিযোগ ও ঔষধ বিক্রয় করেন ও নিজগৃহেই স্ত্রী-রোগীদের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন, নানারূপ জামা, রুমাল প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে পাঠান, যদি তাঁহারা বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করেন তবে তাঁহাদের আর পুরুষের গলগ্রহ হইতে হয় না। বিক্রম-পুরের মেয়েরা এখনও নারিকেল দিয়া এমন চমৎকার মযূর ও পশুপক্ষী তৈয়ারী করিতে পারেন ও তাঁহাদের হাতের নারিকেল-চিরুণী ও জীরা এরূপ কারুকার্য্যের পরিচায়ক হয় যে তাহা সমবেত চেষ্টায় বিক্রয় করা চলে। নতুবা সেই-সব শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়া ত দূরের কথা সেগুলি লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। নানারূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেও তাঁহারা সুদক্ষ ছিলেন। সমবায়ে এইরূপ দ্রব্য-সম্ভারের বিপণী খুব লাভজনক করিয়া তোলা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত। যখন কন্যাদায়ে পিতা আকাশ-পাতাল আঁধার দেখেন ও সেই সন্ধানে প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া-ফিরিয়া দিবাশেষে ম্লানমুখে দৈন্য ও অপমানের চূড়ান্ত কষ্ট সহ্য করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহার সেই কাতর মূর্ত্তি ও মুখের ম্লানিমা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিদ্ধ করে কন্যার হৃদয়কে: তাহার উপর বিদ্রূপিত হতবুদ্ধি পিতা বা ভ্রাতা যদি কন্যার প্রতি কথা-বার্ত্তায় কোনরূপ গঞ্জনার কাজ দেখান তবে সে যে ঘড়ি এবং কলসী লইয়া আঁধারে পুকুরের দিকে ছুটিবে, কি কেরোসিন-তৈলে শাড়ীর আঁচল আর্দ্র করিয়া আগুন ধরাইবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু সে যদি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে নিজে অর্জ্জন করিয়া নিজের সাহায্য করিতে পারিত, কঠোরভাবে বলিতে পারিত, যে পর্য্যন্ত যোগ্যবর লাভ করিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে না তবে কি তাহাদের গৃহ এইরূপ অর্থগৃধ্নুদের অত্যাচারের লীলাভূমি হইতে পারিত? কন্যার যদি স্বাবলম্বনের উপায় থাকে তবে শুধু পিতৃগৃহে তাহার আদর বর্দ্ধিত হয় এমন নহে, ভবিষ্যতে কন্যা যিনি, অর্থের সমস্যাও কতকটা সমাধান করিতে সমর্থ হইয়া সংসারের সর্ব্বকার্য্যে তিনি সহায় হন। তাঁহার যোগ্য বর লাভ করাও সহজ।

'ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি চিত্তবৃত্ত্যানুসারিণীং'—আমার মনকে যিনি রঞ্জন করিতে পারিবেন এবং যাঁহার চিত্তবৃত্তি আমার মনের অনুকূল এমন পত্নী আমাকে দান করুন—পুরুষের এই সদাকার প্রার্থনা। চণ্ডীতে পুরুষ সুন্দরী স্ত্রীর প্রার্থনা করেন, তাঁহার মনের অনুকূল মনোবৃত্তি ও তাঁহার চিত্তের আনন্দদায়িনী পত্নী চাহিয়াছেন।

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা এবং স্বাবলম্বনের আদর্শ উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে লোকনিন্দা ধোঁয়ার মত কোথায় বিলীন হইবে তাহার ঠিকানা নাই। যে যত হীনবল, যে যত পর-মুখাপেক্ষী তাহার দুর্দ্দশা ততবেশী। এই নারীমঙ্গল-সমিতি

শতহস্তে স্ত্রীলোকদের যে পথ আবিষ্কার করিয়া দিতেছেন—তাহা অনুসরণ করিলে তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশার অবসান হইবে।

মোট কথা মনোমত বরলাভের তপস্যা করা দরকার। গৌরী শিবকে স্বামী-রূপে পাইবার জন্য উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। এখনকার দিনে বিবাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে—সভ্যজগতের অনেক মেয়ে ও পুরুষ বিবাহের বিরোধী। আমাদের শাস্ত্রে আছে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র-পিণ্ডপ্রয়োজনম্।" আমরা অতীত যুগের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাইব—শত শত পুরুষের পরে আমি আবির্ভূত হইয়াছি। আদিপূর্ব্ব পুরুষের যে সমস্ত গুণ তাহা আমার সঙ্গে লুপ্ত হইয়া যাইবে সৃষ্টিকর্ত্তার বোধ হয় তাহা অভিপ্রেত নয়। ইহাই আমাদের পিতৃঋণ। পূর্ব্বপুরুষের যে ধারাটি আমাকে অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহা শেষ করিয়া ফেলিবার আমার অধিকার নাই। লেংড়া আমটি খাইয়া আমরা তারিফ করিতেছি কিন্তু তাহার আদি-তরুর বীজ এখনও লুপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক পরবর্ত্তী তরু সেই বীজের custodian—ধরোহিত রক্ষক। মানুষ নিজেকে নিজে সৃষ্টি করে নাই। সে স্বয়ম্ভু নহে সুতরাং সে নিজের ধারাটি লোপ করিলে ক্ষমার্হ হইবে না। তাহার যুগযুগ-ব্যাপী বংশধারা—তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণগরিমা সে রাখিয়া যাইবে—এই ভাবে সে প্রকৃতির ঋণ শোধ করিবে। সমাজে বিবাহের ইহাই প্রধান প্রয়োজন। এই ঋণ ছাড়াও নর-নারী পরস্পরের সাহায্যে পূর্ণতালাভ করে, নতুবা তাহারা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। একনিষ্ঠ যৌনসঙ্ঘে পরস্পরের ঘতটা উন্নতি হয়, উচ্ছৃঙ্খল জীবন দ্বারা তাহা হয় না। এইজন্যই যৌনসঙ্ঘে বিবাহের স্থান উচ্চে এবং ইহাই সর্ব্বাংশে বিধেয়। বিবাহ বাতীত মানুষের বংশধারা রক্ষার জন্য যে উপায় আছে তাহা হীন, কুফলপ্রসূ ও ক্ষণস্থায়ী—এই হেতু নিন্দিত। সেই সকল উপায় সন্তানরক্ষা ও পালনের পক্ষেও সমীচীন বা উপযোগী নহে।

বিবাহ নরনারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় কিন্তু যোগ্যতা-অনুসারে মিলন না হইলে তাহা অনর্থের মূল হইয়া উঠে। এজন্য বর্ত্তমান বিবাহপদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন।

এখন পুরুষ ও স্ত্রী থাকিতে পারেন যাঁহাদের পক্ষে কুমার ও কুমারীর জীবন শ্রেয়। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। মেরি-গার্ণার দেখা যায় বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুণী মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া বিবাহ অপেক্ষা উচ্চতর লক্ষ্য ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। য়ুরোপে খৃষ্টীয় বিহারগুলিতেও এরূপ আদর্শ-কুমারীজীবনের উদাহরণ আছে। পুরুষের মধ্যে আমরা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কৌমার্য্যব্রতকে শ্রদ্ধা করি—এরূপ মহৎ ব্রতে উৎসৃষ্ট জীবনের দৃষ্টান্তও সুলভ নহে। সাধারণ মানুষের পক্ষে বিবাহই প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু যার-তার সঙ্গে পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া দুষ্টীয়—আত্মার পক্ষে অকল্যাণকর। এদিকে আবার নিজের শক্তি-পরীক্ষা না করিয়াও কুমার-কুমারী-জীবনের প্রয়াসী হইলেও পরিণামে অনুতপ্ত হয়। তদ্বিধ জীবন—এক হয় বাতিচার দ্বারা নতুবা বাধবদ্ধ তরুর ন্যায় নিজের নৈরাশ্য ও শুষ্কতাপ্রসূত অনলে নিজে বিনষ্ট হয়।

আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিবাহের প্রয়োজন প্রভৃতি বড় বড় কথার অবতারণা করিতেছি, তাহার কারণ এই যে আজ এই ঘোর পরিবর্ত্তনের যুগে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ লইয়া সমাজে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে—সমাজ-গুরুদের শাসন শিথিল হওয়াতে সর্ব্বত্র যথেচ্ছাচার ঢুকিয়াছে। প্রাচীন বিধিনিয়ম এখন আর কিছুতেই আমাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। এই যুগে আমাদের সর্ব্ববিষয়ে যুক্তিসঙ্গত আলোচনা ও বিচার দ্বারা কালোপযোগী প্রকৃষ্ট সামাজিক পন্থা নির্ণয় করিতে হইবে। সমাজ আবার নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।

এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে সম্মুখে রাখিয়া ভাবী পরিবর্ত্তন ও গঠনের যুগে আমাদের একটি কথা স্মরণ করিতে হইবে। চারিদিকে জড়বাদীদের নীরস শুষ্ক নীতিসূত্র। সভ্যতার লীলা বিপুল আড়ম্বরের সহিত চলিতেছে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে অর্থনীতির আদর্শে প্রতীচ্যে যে বিপুল অনুষ্ঠান চলিতেছে, তাহা তাহার উৎকট বিচার-শক্তিতে চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া মানুষের দুর্ব্বার অসীম শক্তি প্রতিপাদন-পূর্ব্বক সভ্যতার পতাকা যন্ত্রের সহিত আকাশে উড্ডীন করিতেছে। সভ্যতার এই বিরাট মন্দিরে প্রবেশের অত্যাচারে দুর্ব্বল নিষ্পীড়িত হইতেছে। দয়া, ক্ষমা, প্রেম এই সকল গুণ প্রতীচ্য সভ্যতায় হতাদৃত। প্রায়ই বিদেশ-

প্রশ্ন পাই করা যায়, এই সকল কোমলবৃত্তি মহাযুদ্ধের উপযোগী। ইহাদের উপর প্রাচ্য জাতিরাই বেশী জোর দিয়া থাকে। যে সভ্যতা ব্যক্তিগত দয়া-দাক্ষিণ্যকে তুচ্ছ করিয়া বহুআড়ম্বরময় বিজ্ঞান দ্বারা দরিদ্র ও দুর্বলের বুকের উপর দিয়া নিষ্ঠুরভাবে গতিচালনা করিতেছে—সেই সভ্যতার বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া যেন আমাদের চক্ষু অন্ধ না হয়—ইহাই প্রার্থনা। ভারতবর্ষে এখনও শত শত ধর্ম-মন্দিরের চূড়া গগন স্পর্শ করিয়া আছে—এখানে দেবতার পাদপদ্মে অঞ্জলির জন্য শত শত উদ্যানে শত সহস্র সুগন্ধি কুসুম প্রস্ফুটিত হইতেছে। এখনও সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টানাদে দিগন্তর প্রতিধ্বনিত এবং আরতির ধূপধূনার গন্ধে ও পঞ্চপ্রদীপের জ্যোতিতে শত শত গৃহ ধর্মভাবে প্রণোদিত হইয়া থাকে।

আমাদের সোণার বাঙ্গালা ভাবপ্রবণ দেশ। এই দেশের এক সীমায় বুদ্ধদেব ও রামচন্দ্র দুই নরদেব মানব-মঙ্গলের মানদণ্ডের ন্যায়। পশ্চিম সীমায় ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে মহাবীর আদি ২৩ জন সম্মেৎ-শেখরে তপ ও সাধনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং মহাবীর অষ্টাদশ বৎসর রাঢ়দেশে ধর্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। খাস বাঙ্গালায় মহাপ্রভু প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া গিয়াছেন। পরমহংস এই মহাপুরুষদেরই নব সংস্করণ। রাজতুল্য বৈভবশালী রূপসনাতন ও রঘুনাথ ভিক্ষার কুলি কাঁধে করিয়া প্রেমধর্মে স্বীয় স্বীয় জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ লিপি-বর্ণিত বঙ্গের মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র মাতার আদেশে দ্বিতীয় রামচন্দ্রের মত দ্বাদশবর্ষকাল বনবাস করিয়াছিলেন। এখানে রাজপুত্র নরোত্তম স্বীয় রাজ্যত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। এমন কি সেদিনও লালাবাবু রাজভিক্ষুর জীবন্ত উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। আমাদের চিত্তরঞ্জন ইঁহাদেরই একজন—ইঁহাদের সঙ্গে ভাবরাজ্যে জ্ঞাতিত্বসূত্রে আবদ্ধ। এখানে শত শত সতী স্বামীর চিতানলে হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লাট হার্ডিঞ্জ প্রমুখ বিদেশীরাও তাঁহাদের একনিষ্ঠ প্রেমের অদ্ভুতপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। মিশনারীদের মিথ্যাবাদে আমরা এই দেবী-গণের প্রতি যেন শ্রদ্ধা না হারাই। বলপূর্ব্বক সতীদাহরূপ মহাপাপ আমাদের সমাজ হইতে অপসারিত হওয়াতে আমরা নিশ্চয়ই একটা মহাকলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াছি। কিন্তু যে সকল দেবী জলে নিমজ্জমান দুর্গাপ্রতিমার ন্যায় রূপে প্রেমে সিন্দূরফোঁটা ও অলঙ্কারের শোভায় ঝলমল করিতে করিতে হাসিমুখে অগ্নিতে আত্মবলি দিয়াছেন, তাঁহাদের নিষ্ঠা ও তপস্যা যেন চিরকাল আমাদের মধ্যে শ্রেয়সী প্রধান করিয়া প্রেমের জন্য আত্মবলি দিতে প্রণোদিত করে। তাঁহাদের রক্ত আমাদের ধমনীতে এখনও প্রবাহিত হইতেছে। আপনারা পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার রমণীচরিত্রগুলি যদি আলোচনা করেন, তবে তাহাদের অসাধারণ তেজ, অকুণ্ঠোদ্যম প্রেম ও আত্মোৎসর্গ দর্শনে বিস্মিত হইবেন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর রথেনষ্টাইন বলিয়াছেন, ইঁহারা অজন্তা গুহার চিত্রিত নারীগণের ভগিনী—তেমনি জীবন্ত তেমনি সুন্দর, তেমনি কোমলতা ও প্রেমের খনি। ডাঃ সীলভা লেভি এই রমণীগণের দাম্পত্যলীলা দেখিয়া বলিয়াছেন এমন চরিত্রের ছুড়ি দুরোপেও মিলিবে না। ইঁহারা প্রাচ্যদেশের মহিমা উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছেন।

এই ভাবপ্রবণ দেশ ভাবের জন্য কি না করিয়াছে? প্রেমের জন্য কত কৃচ্ছ্র, কত তপস্যা, কত ত্যাগ ইঁহারা করিয়াছেন তাহা অগণন। আমাদের দেশের চন্দ্রসূর্য্য যুগ-যুগ ধরে এই দেশের প্রেমের সাধনার অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছে। আপনারা কি বলোয়ার কেন জন্য শালতরু জন্মায় না বলিয়া সে দেশের গোলাপকে অশ্রাব্য করিবেন? এদেশ জগৎকে প্রেমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখাইয়াছে। সেই প্রেম কোন সময়ে পার্থিব পাত্র আশ্রয় করিয়া দেবদুর্লভ ত্যাগ দ্বারা প্রস্ফুটিত শতদলের মত গৌরবান্বিত হইয়াছে,—কখনও তাহা দেবপূজায় উৎসর্গ হইয়া জলতরঙ্গভঙ্গীকে তারাতারকে সর্ব্বত্র পুঁজিয়া পাইয়া তাঁহারই পাদপদ্মে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে। যদি প্রেম জগতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব দাবী করিতে পারে—তবে বাঙ্গালীর সেই দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই প্রেম ও ত্যাগের মহিমা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। বর্ত্তমান সভ্যতা আমাদিগকে যে দিকে লইবার লইয়া যাউক, প্রাচীন অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাউক, আমরা পুরাতনকে লইয়া বসবাস করিতে চাই না। কিন্তু যদি

আমাদের মাথায় গৌরবের কিরীট পরিতে হয় তবে তাহা প্রেম ও ত্যাগের খাঁটি সোণায় গড়িতে হইবে। একদিকে কীবের দুঃখে বিগলিত-হৃদয় রাজপুত্র বুদ্ধদেব ও বিশ্ব-জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্ট নিজে স্বীকার করিয়া এই প্রেমধর্ম্মের দিকে ইঙ্গিত করিতেছেন,—অপর দিকে পার্থিব জীবনে অপার্থিব সম্ভোগস্বরূপ স্বর্গের প্রেম লইয়া নদীয়ার রাজকুমার দক্ষিণ হস্তের অনামিকা উর্দ্ধে তুলিয়া নিজে যে মুক্ত দেখিয়া ধরবিগলিত চক্ষে আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহাই জগৎকে দেখাইয়াছেন। মহুয়া, মলুয়া, বেহুলা, কমলা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি শত শত মহিমাময়ী মহিলারা প্রেমের আশ্চর্য্য তপশ্চরণ দ্বারা জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। জড়বাদীদের শিক্ষায় আপনারা প্রেমকে অগ্রাহ্য করিবেন না—আপনাদের মনোযোগ ও মেনকার চিত্রপূজা আদর্শ বিকৃত হইবেন না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন পথ—সকলের জন্য এক পথ নহে। একালের সভ্যতা যত বড়ই হউক না কেন, প্রেমের পথ চিরকালই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পথ থাকিবে—ইহা বিশ্বের সনাতন পথ। এই পথ ছাড়াইয়া আপনারা পথহারা হইবেন না। সাধ্বীর ব্রত একালেও সর্ব্বাপেক্ষা বড় থাকিবে কারণ সাধুর সনাতনব্রত ;—বর্ত্তমান সভ্যতা ইহার একটি কণাও মলিন করিতে পারিবে না।

উপসংহারে আমি এই প্রেমের এক জীবন্ত উদাহরণ দেখাইব—যে উদাহরণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ এক-যোগে মিলিয়া গিয়াছে। আমি নারীমঙ্গল সমিতির নেতা গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের কথা বলিতেছি। যে পরদুঃখ-কাতরা মহিলাকুলশিরোমণি তাঁহার দেশের ভগিনীদের একান্ত নিরাশ্রয় ও দুর্দ্দশার চিত্র দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে কাঁদিয়াছিলেন, সেই সাধ্বীর অশ্রু ইঁহার হৃদয় শোণের মত বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইঁহাকে দেখিলে কি মনে হইবে ইনি একক ?—আমার ত তাহা মনে হয় না। ইনি বাহিরে এক, ভিতরে যুগলমূর্ত্তি,—ইঁহার সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বস্তরে সর্ব্বস্থানে সন্তোষনলিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছেন। যিনি দশভুজার ন্যায় স্বামীর মূর্ত্তি স্বীয় কিরীটের উর্দ্ধে রাখিয়া দশহস্তে নারীজাতির অভাবমোচনের উদ্যোগী ছিলেন, সেই সন্তোষ-নলিনী কি মৃত ? মৃত হইলে গুরুসদয় এই জীবন্ত অনু-প্রেরণা কোথা হইতে লাভ করিয়াছেন ? আমি উঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে উনি বলিয়াছিলেন—সন্তোষনলিনী তাঁহার কাছে মৃত নহেন, সর্ব্বাদরের আগ্রহ ও নিদ্রার স্বপ্নে তিনি হাসিমুখে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। তিনি তাঁহারই ইঙ্গিতে কার্য্য করিতেছেন এই অমর যুগল-মূর্ত্তি দাম্পত্যের আদর্শস্বরূপ আপনাদের দেখাইতেছি ইঁহাকে দেখিলে আমার সেই দেবতার কথা মনে পড়ে যিনি প্রেমের মহিমায় বিভোর হইয়া কতযুগ ধরিয়া বীর সাধ্বী পত্নীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া দেশে দেশে করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। প্রতীচী ও প্রাচ্যের যুগল আদর্শে গঠিত এই যে মিলন তাহাই আমি প্রকৃত দাম্পত্য মনে করি,—শতকোটি রোহিণী, বিনোদিনী ও কিরণময়ীকে এই দাম্পত্যের পায় বলি দিয়া আমি ইহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছি।

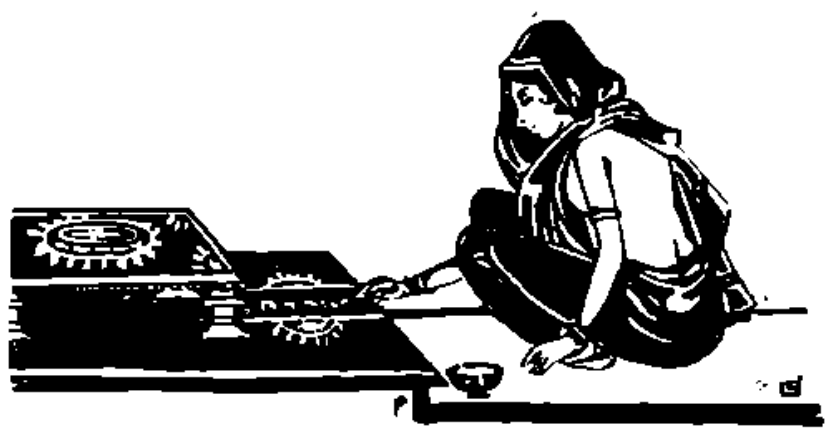

নারী

শ্রী আশাপূর্ণা দেবী

মিথ্যা গর্ব্ব সেবি'
দেশকে তোমরা স্বর্গ করেছ
নারীকে করেছ দেবী।
দেশকে বড় দেশ গ'ড়ে তোল
স্বর্গে নাহিক কাজ,
মিথ্যা গর্ব্বে সম্মান কোথা?
শুধু বেদনার লাজ।
নারী তাই আজ আসিয়াছে নামি'
দেবীর আসন হ'তে,
মানবী যে চায় মানবের সাথে
চলিতে জীবনস্রোতে।
পূজা-উপচার থাক দেবতার—
হেরুন অন্ধকার—
পূজার পাষাণে দেবীর আসনে
চাঁদ ধ'রে গেছে তার।
তোমারও তো আজ শ্রান্তি এসেছে
একাকী চলিতে পথ,
পশুর মতন চলিছ নীরবে
টানিয়া জীবনরথ;
হাতে হাত রেখে চল সাথে সাথে
ঘুচে যাক অবসাদ,
কর্ম্মে আসুক নূতন প্রেরণা
নব আনন্দ-স্বাদ।
তোমার শক্তি বাড়াক নারীর
অনন্ত উৎসাহ,—
সহজ হউক সাধনার সাথে
সিদ্ধির উদাহ।

"চটুল চাহনি", "চকিত দৃষ্টি",
"কালো কাজলের ছায়া",
"বাঁকা কটাক্ষ", "অজানিত
সজল চোখের মায়া,"
ওসবে বড় ভুলনাকো আর
চেয়োনা নারীর কাছে,
দেখো তার মাঝে সৃষ্টি করিতে
অনেক মহিমা আছে।
বুঝি দেখেছ তুমিই কি—শুধু
শয্যাসঙ্গিনী সতী'?
ধর্ম্মে কর্ম্মে সঙ্গী যে নয়,
শুধু কামনার ছবি!
আসলে যে পেল দাসীর আসন
দেবী ব'লে বাড়াওনা,
'সোনা সোনা' ব'লে ফাটালে আকাশ
পিতল কি হবে সোনা?
মিষ্টির চেয়ে খাঁটি লোহা ভাল
আছে তার প্রয়োজন,
ধুলো' ফেলে' যাও নারীজন্মের
রাঙতার আভরণ।
'চির সনাতন প্রথা পুরাতন'—
ছাড় গো অন্ধ মায়া;
নূতন করিয়া গ'ড়ে তোল নিজ
কন্যা, ভগ্নী, জায়া।
"স্বর্গের দেবী" থাকুন স্বর্গে
কাজ কি তাঁদেরে চেয়ে?
আমরা যেন প্রাণ ফিরে পাই
লভিয়া দেশের মেয়ে!

নারীসমিতি

শ্রী উমাশশী দেবী

জীবজগতের এই নিয়ম, প্রত্যেক জাতি একত্রে থাকা। কেহ একা থাকে না। হরিণের দল, বানরের দল, সর্ব্ব-জাতীয় পক্ষীর দল, বন্য কুক্কুরের দল একস্থানে বিহার ও বসবাস করে। মানুষ দেশ-দেশে যে প্রদেশে থাকে, এক-জাতি হইয়া পড়ে। ভিন্নদেশের মানুষের সঙ্গে প্রায় সর্ব্ব-বিভাগে যেন বিভিন্ন—যেমন ইংরাজ জাতি, ফরাসী জাতি, জার্ম্মান জাতি ইত্যাদি। অতিবিস্তৃত ভারতবর্ষে বিভিন্ন-প্রদেশের লোক বিভিন্ন—যথা বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব বোম্বাই ইত্যাদি। ভাষা, আচার, পরি-চ্ছদ, আহারও বিভিন্ন। মনুষ্যজাতি যেন বিভক্ত হইয়া এক এক বিভাগের লোক সমভাবেই জীবনযাত্রা করে। ইহাতে একটা নৈতিক সার্থকতা আছে। পরস্পর সাহায্য দ্বারা জীবনযাত্রার সহায়তা আসে। সকলই আপন আপন গৃহে বসবাস করে,—কিন্তু বহুলোকের মধ্যে একটা সমাজ স্থাপিত হইয়া সকলকে একসূত্রে আবদ্ধ রাখে। ইহা ছাড়া সঙ্ঘ-সমিতি স্থাপন করিয়া সকলে মিলিত হইয়া সাধারণের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিয়া থাকে—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, সমাজ সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে একটা মিলিত নিয়ম বা ব্যবস্থা-দ্বারা সংস্থাপন করে। লোকে উপাসনা-কার্য্যেও সর্ব্বসময়ে একা একা থাকে না:—গির্জ্জা, মসজিদ্, মন্দির প্রভৃতি ক্ষেত্রে সকলে মিলিত হইয়া কার্য্য করে। বিদ্যাশিক্ষা-বিভাগে স্কুলকলেজ স্থাপিত করিয়া বহু ছাত্র একত্রে পাঠ করে। ক্রীড়া, আমোদ প্রভৃতির জন্য বহু-জনের মিলনক্ষেত্র স্থাপন করে—ক্লাব্, এসোসিয়েসান্ ইত্যাদি। সর্ব্ববিষয়ে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ ও অপরের মতামত শ্রবণের উদ্দেশ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হয়। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, এই-রূপ একত্র মিলনে মানবের দৈহিক ও মানসিক উপকার সাধিত হয়।

সর্ব্বদেশেই ঐরূপ কি পুরুষ কি নারী উভয়-জাতির একত্র মিলন-ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষে পুরুষের মিলন-ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে, কেবল নারীদিগের ঐরূপ ব্যব-স্থার অভাব। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল বিদেশি-আক্রমণের অত্যাচারে প্রপীড়িত ছিল; নারীকুল তজ্জন্য অন্তঃপুরেই থাকিত, বাটীর বাহিরে বিশেষ আবশ্যক না হইলে আসিত না। নারীশিক্ষাও অন্তর্মিত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ নারীর অন্তঃপুরই বিধি, এই সংস্কার বদ্ধমূল হয়। কাজেই নারী-সম্মিলন, নারী-সমিতি, নারী-কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয়ে নারীদিগের মধ্যে বিচারপ্রসঙ্গ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনুরূপ ভারতবর্ষে অভাব। এদেশে উপস্থিত বহু শিক্ষিত লোক আছেন সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে সকলে নারী শিক্ষার আবশ্যকতা পুরুষশিক্ষার মত সমতুলাদণ্ডে স্থাপন করেন না। শিক্ষিত পুরুষদিগেরও সম্পূর্ণ বোধ নাই, দেশের অবস্থা অনু-সারে ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন। উপস্থিত এদেশের অল্প স্ত্রীলোকই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা, তাঁহাদের সংখ্যা পুরুষ-সংখ্যার তুলনায় একেবারে অবর্ত্তব্য। বহুকালাবদ্ধ সংস্কার ও সাধারণ লোকের নানা অব্যবস্থা এখন স্ত্রীশিক্ষার প্রতি-বন্ধক।

এখন বিচার্য্য, উপস্থিত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার আবশ্যক কি না, আর যদি আব-শ্যক হয় কি উপায়ে তাহা সাধিত হইবে নির্ণয় করা। দেশ ত পরাধীন, নানা জাতি, ধর্ম্ম ও মতাবলম্বী লোকের বাস। কাল—বিংশতি শতাব্দী, নানা বিপ্লবে আপ্লুত। পাত্র—অন্ত-র্বিচ্ছেদ-জর্জ্জর অন্নসমস্যায় স্থাপিত। দিনে দিনে দেশের অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, বিশেষ এই বাঙলা দেশে, যে, মধ্যবিত্ত সংসারে পুরুষ আপন জীবিকা-উপার্জ্জনেই অক্ষম হইয়া উঠিবে, নারী-প্রতিপালন ত দূরের কথা। দরিদ্র ভদ্র-সংসারে জীবনধারণের কঠোরতা এখনই বেশ প্রতীয়মান। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? নারীর সাহায্য কি সংসারীর একান্ত আবশ্যক নহে? নারী কি কেবল পাক-

কার্য্য লইয়া বসিয়া থাকিবে—যে পর্য্যন্ত না পাকস্থলীর অভাবে নারী ও তাহার শিশুসন্তান অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়? প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের কি ব্যবস্থা?—তথায় বহু নারী আপন কণ্ঠের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় আমাদের দেশের ভদ্রমহিলা নারীরা ত সকল কর্ম্ম করিতে পারিবে না, কারণ তাহাদের জাতিগত সম্মান-ইজ্জৎ জীবনাপেক্ষা গুরুতর। কাজেই তাহাদের এমন কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যে, সম্মান রক্ষাও হয়, জীবিকারও উপায় হয়।

এখন দেশের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে বহুপূর্ব্ব-প্রচলিত ব্যবস্থা চলা অসম্ভব। পূর্ব্বে যাহাদের পল্লীগ্রামে বসবাস ছিল, তখন তথায় স্বাস্থ্য ছিল, "মরাইভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, মাচাভরা লাউ" ছিল, জীবননির্ব্বাহের কোনরূপ কষ্ট ছিল না,—আর নারীর শিক্ষার মধ্যে পাক, অন্যান্য সাংসারিক কার্য্য ছিল; তাহারা নিরীহ পশুকীর মত গৃহাভ্যন্তরেই থাকিত। আর যাঁহারা সহরে বসবাস করিতেন, তাঁহাদের অর্থের অনটন ছিল না, সুখেই জীবনযাপন করিতেন, আর নারীও প্রায় পল্লীগ্রামের মতই থাকিতেন, কেবল "সহুরে মেয়ে" এই পার্থক্য ভাবিয়া অধিকতর সভ্যতার অভিমানে গর্ব্বিতা থাকিতেন; সে সকল দিন গিয়াছে; এখন জীবনধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চতুর্গুণ বা ততোধিক দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, অল্পসময়ের দিন সমাগত এমন সাধারণ সংসারী ব্যক্তির নারী-সাহায্য প্রয়োজন হইতেছে, কারণ একা পুরুষ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া যে সংসার প্রতিপালন করিবে, সে উপার্জ্জনের পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইতেছে, প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। আমাদের দেশের ভদ্রবংশীয় পুরুষরা নীচকর্ম্ম করিতে অক্ষম, অথচ চাকুরির বাজার, ব্যবসার বাজার, অন্যান্য অর্থোপার্জ্জনের বাজার কিরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইতেছে এবং হইবে, কে না বুঝিতেছে? অথচ উপায় কি, সে কথা কেহ ভাবিয়া উঠিতে পারেন না।

নারী-সাহায্য-কথা উত্থাপন করিলেই, অধিকাংশে পূর্ব্ব-সংস্কারাবদ্ধ লোক জ্বলিয়া উঠিবেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা-ব্যবস্থা দেখিয়া, এবং তদনুকরণে এদেশে চটি-পাঁচটির কলাকল। একটু ধৈর্য্য সহকারে তাঁহাদিগকে এই দীনা হিন্দুনারীর আবেদন শুনিতে প্রার্থনা করি। তাঁহারা পাশ্চাত্য দেশে যে স্ত্রীজাতির মধ্যে অল্পবিস্তর শুভাশুভ বার্ত্তা পাইয়া থাকেন, তাহার কারণ ঐ সকল স্ত্রীলোকের প্রকৃত শিক্ষার অভাব এবং অবাধ পরপুরুষ-সঙ্গ। আমরা যদ্যপি আমাদের দেশে নারী-কুলের মধ্যে কুশিক্ষা ও অবাধ পরপুরুষসঙ্গ বর্জ্জন করাইয়া কোন কার্য্য করিতে পারি, তাহাতে বোধ হয় সেকার্য্যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রই কোন আপত্তি করিবেন না। উপস্থিত অবস্থায় আমাদের দেশের মঙ্গলবিধানে স্ত্রীজাতি হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির প্রধান উপায় স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা। স্ত্রীজাতির সুশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন, দেশে এই সুশিক্ষা হইতে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

এই একটা স্বাভাবিক রীতি আছে যে উচ্চতন লোকের আচার নিম্নতন লোকে অনুকরণ করিয়া থাকে। ধনী-ব্যক্তি মস্তকের কেশ পশ্চাৎভাগে ক্ষুদ্র ও সম্মুখভাগে দীর্ঘ করিয়া কাটিল, অমনি সে ব্যবস্থাটা একটা "ফেসান্" হইল,—স্কুলের ছাত্র হইতে পাড়োয়ান-মেথর পর্য্যন্ত "ফেসান" অনুকরণ করিল এইরূপ বেশভূষা-আদি সর্ব্ব বিষয়ে হইয়া থাকে। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারিত করিতে হইলে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র-ঘরের সর্ব্বত্রই করিতে হইবে, এক-শ্রেণীর মধ্যে হইলে চলিবে না; যাহাদের ঘরে অন্ন নাই, তাহারাই ঘরের নারীকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হয়, এই ভাবটা যেন সর্ব্বাগ্রে বিদূরিত করা হয়। ধনী-ব্যক্তি যেন অগ্রে স্ত্রীশিক্ষার পথ প্রদর্শন করেন।

বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষ স্ত্রীসম্মান-জ্ঞান-বর্জ্জিত বিদেশীর আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া, নারীর বাসগৃহ হইতে বহির্গমন নিষেধ ও অবগুণ্ঠনপ্রথা প্রচলন করিতে বাধ্য হয়; পার্শ্বস্থা কর্ম্ম ভিন্ন পাঠাদি বিষয়ে স্ত্রীশিক্ষা উঠিয়া যায়। কালস্রোতে ভারতবর্ষের অবস্থা এখন অন্যরূপ। ভারতে নারীর এখন শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে, সে শিক্ষার অন্তর্গত —সংসাহস, স্বাস্থ্যের উন্নতি, পুস্তকাদিপাঠ ও শিল্পকর্ম্মের উন্নতি। এই সকল সম্পাদন করিতে হইলে, নারী গৃহাভ্যন্তরে একা একা বসিয়া থাকিলে কখনই সম্ভবে না। তাহা যদি

হইত, এত স্কুলকলেজ ছাত্রদিগের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা—ঘরে বসিয়া যদি সম্ভব হইত? বাটীর কোটরে আবদ্ধ থাকিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, এজন্য যথাসম্ভব আর্য্যসভ্যতা-সহকারে নারীকে একটু এবাড়ী-ওবাড়ী চলাফেরা করিয়া মুক্ত বায়ু গ্রহণ বিধি। সৎসাহস আনিতে হইলে, নারী গর্ত্তের মধ্যে ভেকের ন্যায় থাকিলে চলিবে না। সুশিক্ষা পাইতে হইলে সৎপুস্তক পাঠ একান্ত আবশ্যক, এবং শিক্ষার অঙ্গীভূত সহপাঠিকাদিগের সঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ প্রয়োজন। শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা দ্বারা নারী গৃহে থাকিয়াও উপার্জ্জনক্ষমা হইবেন, এ শিক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

এই সকল নারীজীবনের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতে হইলে কি ব্যবস্থা বিধেয়? কেহ কেহ হয় ত মনে করিবেন আমরা করিতেছি,—যে দেশের পুরুষকুল। আপনারা চাঁদা তুলিয়া এরূপ নারীস্কুল স্থাপন করিয়া দিন, যাহাতে শ্রীযুক্ত হলধর গুপ্ত মহাশয় আসিয়া বিনা-বেতনে স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে ব্যায়ামশিক্ষা দান করিবেন; স্বদেশভক্ত পাঞ্জাবী হরকুন্ সিং চরকা-শিক্ষা দান করিবেন; শ্রীযুক্ত ভোলানন্দ আচার্য্য মহাশয় বাঙলা পড়াইবেন; আর ইংরাজী পড়াইবেন ভিন্সুকুলের আলোকপ্রাপ্ত জুতা-জামা-ঘাগরা-পরা, নীলাম্বরী বোসজায়া দেবী, আই-এস্‌সি। স্কুল পরিদর্শনের জন্য প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিগণ নিয়ত স্কুলে যাতায়াত করুন, আর দেশবাসী সকলে স্ত্রী, ভগিনী, কন্যাগণকে পাঠাইয়া দিন। এরূপ অভিযোগ যেন কেহ আমাদের উপর অর্পণ না করেন, এরূপ ইচ্ছা আমাদের আদৌ নাই। আমরা বলিতেছি যে প্রতি পল্লীতে ও সহরের স্থানে স্থানে নারীশিক্ষা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক। স্ত্রীলোকেরা তথায় মিলিত হইয়া সৎপ্রসঙ্গ ও পাঠ করিবে, লেখাপড়া শিখিবে, শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিবে। এখানে কোন পুরুষমানুষের আগমন নিষেধ থাকিবে,—পুরুষের কোনরূপ আবশ্যক হইলে কেবল সমিতির কোন বয়স্থা কর্ত্রীপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন মাত্র। এখানে বালিকা হইতে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত শিক্ষা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আমার অনুরোধ থাকিবে। বালিকা ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার ফলে স্ব স্ব সংসারের অনেক আর্থিক সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে। সৎপুস্তক-পাঠে মানসিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া সুখে-দুঃখে শান্তি পাইতে ও দান করিতে পারিবে। পাঁচ জনা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সঙ্গ ও আলাপ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে বিচার আচার করতঃ মানসিক অবসাদ দূর করিতে পারিবে।

কলিকাতা সহরে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি, বহুবাজার মহিলাসমিতি ও নারীশিল্প-শিক্ষালয় প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম উদ্যমের ক্ষুদ্র ব্যবস্থা নিঃসন্দেহ, কিন্তু শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তি উহা পরিদর্শন করিলে আনন্দিত হইবেন বলিয়া মনে হয়। পল্লীতে নারীসমিতি প্রকাশ্যস্থলে হইয়া থাকে; তথায় ঘাটপুকুরে বা অন্যান্য পুষ্করিণীতে পল্লীবাসিনীরা স্নানাদিকার্য্যে যাইয়া মিলিত হন ও নানারূপ কথোপকথনের দ্বারা আবদ্ধ চিত্তের বিকাশ করেন। এই মিলন অবারিত ও অনিয়মে চলায় বিশেষ শুভ ফলপ্রদ হয় না। নিয়মিতভাবে ঐ সকল পল্লীবাসিনীর মিলন স্থাপিত হইলে, পরচর্চ্চা-পরদুঃখার পরিবর্ত্তে সদালাপ, সৎপ্রসঙ্গ, পাঠ ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার হয়।

এ বিষয়ে পুরুষের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। পুরুষের সাহায্য ব্যতীত নারী কোন কালে কোন কর্ম্ম করিতে সক্ষম নহে। পুরুষ পাষণ্ড,—নারী লতা। যেদিকে পুরুষ ধাবিত হইবে, নারী লতাস্বরূপে সেইদিকেই স্বভাবের নিয়মে আকর্ষিতা হইবে। পুরুষের সাহায্যব্যতিরেকে নারীকুল কোনরূপ শিক্ষাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? পুরুষের অমতে অথবা সহানুভূতির অভাবে কোন স্ত্রীলোক কোন কার্য্য করিতে পারে? আমরা যে ভাবে এই নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি, তদ্বিরুদ্ধে যদি কাহারও কোন আপত্তি, অথবা তৎসংশোধনে কাহারও কোন প্রস্তাব থাকে, আমরা পরমসমাদরে সে বিষয়ে তাঁহাদের সঙ্গে যুক্তি করিতে প্রস্তুত। মোট কথা দেশের পুরুষদিগের নিকটে আমাদের একান্ত বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা তাঁহাদের দেশের নারী-কুলের উন্নতির ব্যবস্থা করুন। কলিকাতা সরোজনলিনী নারীশিক্ষালয়ের কর্ত্রী মহোদয়া শ্রীমতী হেমলতা দেবী এ বিভাগে যথাসাধ্য পরিশ্রম স্বীকার করেন; নারীশিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ পরামর্শ আবশ্যক হইলে তাঁহার সাহায্যের অভাব হইবে না।

ফল্গু

শ্রী বিমলাংশুপ্রকাশ রায়

মোহনবাগানের সঙ্গে ঢাকা-ওয়ারীর লিগ ম্যাচের ফুটবল খেলা। দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বাইশটি বেলোয়াড়ের খেলা দেখতে বাইশ হাজার দর্শক তাদের ঘিরেছে। মাঠের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে ক্ষিপ্র বলের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের ক্ষিপ্ত কণ্ঠকলরোল গড়িয়ে গড়িয়ে বারবার যাচ্ছে-আসছে। বিপুল জনতার অধিকাংশই মোহনবাগানেরই উৎসাহদাতা। ওয়ারীর কুস্তিতে খুব অল্পসংখ্যক দর্শকের কাছেই উৎসাহবাণী ফুটে' উঠ্‌ছে। তুমুল উত্তেজনার মধ্যে হঠাৎ ওয়ারী 'দিলে একখানা গোল চাপিয়ে'। মোহন-বাগানের তরুণগণ ক্ষোভে কিঁকিঁ পোকার ডাকের অনুকরণে একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ করতে লাগলো। পূর্ব্ববঙ্গ-বাসী দর্শকগণ উৎসাহে উন্মত্তপ্রায়। অরুণ গ্যালারির তক্তাখানার উপর উত্তাল তাণ্ডবনৃত্যে মেতে ফেলবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে দেখলো, তার ক্লাশের অচল তখনো একলা ছড়ির ডগায় একটা ফেল্ট্ ক্যাপ্ চড়িয়ে সোঁ-সোঁ ক'রে ঘোরাচ্ছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নাচ্‌ছে। ক্যাপ্‌টাকে এনেছিল মুখের ওপরকার রোদ আড়াল করতে,—যেহেতু ছাতা সোলাটা ফুটবল-দর্শকদের চোখে বে-আইনী এখন মুখের আনন্দ দীপ্তিটাকে সেটাকেই ছড়ির ডগায় ঘুরিয়ে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করবার প্রকৃষ্ট উপকরণ পেয়েছে।

যতক্ষণ খেলা চলছিল দর্শকদের কারু নিজের জায়গাটা হ'তে এক-পা নড়বার উপায় ছিল না। খেলা শেষ হ'তেই উৎফুল্ল অরুণ হিন্দুস্থানীকে দিয়ে অচলের কাঁধে হাত রেখে বল্লে, "তুইও যে 'বাঙাল' তা তো আমি জানতাম না!"

অচল একটু কৌতুকের হাসি হেসে বল্লে, "বাঙাল আমি কে বল্লে?"

"আর কে বল্লে,—বল্লে তোর উন্মাদ নৃত্য, তোর চোখ-মুখের দীপ্তি, তোর এই ছড়িগাছটায় চ'ড়ে ঐ টুপিটার অদ্ভুত কীর্ত্তি। কত লোক যে হেসেছে তোর কাণ্ড দেখে!"।

এই ব'লেই অরুণ অচলকে দুই বাহুর বেষ্টনে জড়িয়ে ধ'রে আনন্দ প্রকাশ করলো। ওয়ারীর বিজয়গর্ব্ব সে তখু নিজের পরিবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারছিল না।

অরুণের এই সরল হৃদ্যভাবের উচ্ছ্বাসে অচল কিন্তু খুসী হয় নি। তারা দুজনে কলেজে এক-ক্লাসে পড়লেও পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল না। আজ যে হঠাৎ অরুণ 'তুই' ব'লে কথা কইতে সুরু ক'রে দিল, সেটা অচল সহজ করলো না। সে একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্লো, "তুমি ভুল করছো, আমি বাঙাল নই, আমার বাড়ী—"

"আর 'বাঙাল নই' বল্লে কে শোনে বল্!" এই ব'লে অরুণ ভদ্রতার সীমা অতিক্রম ক'রে অট্টহাস্যে পার্শ্বস্থ সকলকে চমকে দিল। হাসির বেগটা একটু কমলে বল্লো, "কিন্তু তোর কথাগুলো ঠিক 'কলকাত্তাই' হ'য়ে গেছে তা মানি।"

অচলের মনটাতে দুটো ভিন্নভাব এসে আঘাত করছিল। অরুণের এই সরলতাকে সে যে বিরক্তির চোখেই দেখ্‌ছিল তা ঠিক নয়। সে নিজের অন্তরে একটু শঙ্কিত হ'য়েই উঠ্‌ছিল। সত্যিই সে পূর্ব্ববঙ্গের লোক নয়—পশ্চিমবঙ্গই তার বাসভূমি। তবে ওয়ারী-দলের বিজয়ে সে যে খুসী হ'য়েছিল তা তাদের সেবারকার খেলার চাতুর্য্যে গুণগ্রাহী হ'য়েই—দলাদলির হেলাবেষির ঊর্দ্ধে তার দৃষ্টি ছিল। তার এই গুণগ্রাহিতাকে ভুল ক'রে অরুণ যে দেশপ্রীতি ব'লে মনে করছিল—অরুণের এই দেশনিষ্ঠাটুকুর জন্যে সে মনে-মনে খুসী হ'লেও তার ঘনিষ্ঠ আচরণকে যে শঙ্কার চোখে দেখ্‌ছিল তার একটা ইতিহাস ছিল।

মেট্রিকুলেশন ক্লাশে পড়বার সময় অচলের তরুণ-মনের অনাবিল প্রীতিটুকু সে একটি সতীর্থের প্রতি পূর্ণমাত্রায় ঢেলে দিয়েছিল। প্রথম দিন পরীক্ষার পর সে এসে যখন অচলকে

যায়,—সে আর পরীক্ষা দেবে না, কারণ প্রথম দিনের পরীক্ষাতেই সে ফেল্ করবে, তখন অচলের চিত্ত এতই ব্যথিত হ'য়ে পড়লো যে সে নিজেই আর পরীক্ষা দিল না। দুই বন্ধুতে কতদিন ক্লাশের বেঞ্চিতে ব'সে, মাঠের সবুজ শষ্পশয্যায় শুয়ে, বা গঙ্গার ধারে ধারে বিচরণ করতে করতে ভবিষ্যতের মতো সুখ-কল্পনা করেছে যে দুটিতে একসঙ্গে বরাবর এম-এ পর্য্যন্ত প'ড়ে যাবে। সে কল্পনাসূত্রটি ছিন্ন হ'তে দেবে না যে, তাই অচল তার বন্ধুকে অতিক্রম ক'রে যাওয়ার আশঙ্কায় নিজেও পরীক্ষা দেওয়াই বন্ধ করলো। কিন্তু 'বন্ধু' তার তাকে প্রতারণা ক'রে নিজে পরীক্ষাও দিল এবং স্কুলের প্রথমস্থান অধিকার ক'রে ছেড়েলটাও অধিকার করলো—সেই সুবর্ণপদকের লোভটাই তাকে প্রতারণার পথে নিয়েছিল। কারণ অচল ছিল বয়সেরই 'প্রথম বালক' এবং সে ছিল দ্বিতীয়।

এই ঘটনার পর হ'তে অচল বন্ধুত্ব করা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হ'য়েছে। তাই আজ অরুণের অতিরিক্ত এগিয়ে আসাটাকে দুই হাতে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চায়।

(২)

কিন্তু অচলের সযত্নে জমানো বরফ অরুণের অপূর্ব্ব স্পর্শে ঝর্ণার মতো ক'রে পড়লো। তার অন্তরের নৈসর্গিক প্রীতিকে আর একবার উন্মুক্ত ক'রে ধরতে হ'লো। ক্রমে বন্ধুত্বটা তাদের এতই ছাপিয়ে উঠ্‌লো যে কারু কাছে আর 'ছিপানো' রইলো না। ক্লাশের ছেলেরা তাদের দুজনকে একসঙ্গে কথা কইতে দেখলেই 'অরুণাচলম্' ব'লে একটু সম্ভ্রমের ভাণ ক'রে সেখান হ'তে স'রে যেতো। বন্ধুত্বের প্রতি এই শ্লেষোক্তি শুনে তারা দুজনেই আর কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হ'তো না বরং তাদের বন্ধুত্বের যাত্রা যে দশজনের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছে তাতে তারা গর্ব্বই অনুভব করতো।

কিন্তু বন্ধুত্ব যতই প্রগাঢ় হয়, একজনের বিবাহের সম্ভাবনাতে অপরজনের প্রীতি অলক্ষ্যে শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। বিবাহটা না কি একটা দৃঢ়তর বন্ধন যার কাছে বন্ধুত্বের দাবীর মাথা হেঁট করতেই হয়। তাই অচল যখন বরবেশে বিয়ে করতে চল্‌লো অরুণ মুখে যতই হর্ষ প্রকাশ করতে লাগলো, অন্তর ততই তার কেঁপে কেঁপে উঠ্‌লো। যা-ই হোক, বিয়ের গোলযোগের কথা দুদিন পরেই কেটে গেল। সেই কথাপ্রাবনে দুদিন হাবুডুবু খেয়ে অচল পুনরায় ক্লাশে এসে পিছনের দিকের কোণ ঘেঁষে তার সেই নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চটিতে গিয়ে বসলো। অরুণ তার পাশে।

অনুচরের কাছে বিবাহটা একটা মহা-রহস্য। বাঙালী-যুবকের বিবাহের বয়স হ'চ্ছে কলেজের বয়সের এক-কোঠায়। আর কলেজের যুবকের পক্ষে যেমন সরস্বতীর একত্র সমাবেশ, এমন আর কোথাও নয়। একটি ক'রে যুবক বিবাহ ক'রে ফিরে আসেন আর বন্ধুপরিবৃত হ'য়ে মহা-উৎসাহে বিবাহিত-জীবনের রহস্য-উদ্‌ঘাটনের ভাণ ক'রে আরও প্রহেলিকা সৃষ্টি ক'রে তোলেন। কিন্তু অচল এই বাঁধা নিয়ম ভেঙে দিল। বিবাহ-সংক্রান্ত একটি কথাও সে কইলো না। বধূর রূপ বা গুণ কিছু নিয়েই বন্ধুদের মহলে বিচার করতে বসলো না। এই বেমালুম নীরবতায় সকলে কিছু উপদ্রব সুরু করলো। কিন্তু তাতেও কোন ফল পাওয়া গেল না।

আর যে যা মনে করুক, অচলের এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অরুণ খুবই সন্তুষ্ট হ'লো। বন্ধু যে বিয়ের পরও তার কাছে তেমনটিই র'য়ে গেল, একটি অপরিচিতা তরুণী প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে তার কাছ হ'তে অচলের মনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল না, এতে অরুণ খুবই পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

অচলের আবাল্য প্রকৃতি ছিল বেশভূষার সম্পূর্ণ উদাসীন। বাইরে যেতে হ'লে ঘরের সাজকে সে একটু সজ্জায় পরিণত ক'রে নিতে হয়, কোথায় যেতে কি মানায় এসব ব্যাপার তার মাথায় যোগাতো না। অরুণ অনেকদিন ধ'রে অধ্যবসায় ক'রেও অচলের এবিষয়ে কিছুমাত্র অভ্যাস দেখাতে না পেরে শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

অচলের বিয়ের পর হ'তে একটু ঈর্ষ্যার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অরুণ একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতে লাগলো। অচলের পোষাকের কিছু উন্নতি হ'য়েছে। অরুণের চিত্তে ঈর্ষ্যার ছুরিকার ঈষৎ আঘাত পড়লো। কিন্তু দৃষ্টি তার ঈর্ষ্যায় আচ্ছন্ন ছিল ব'লেই স্বচ্ছ ছিল না। যদি আরও একটু নিরীক্ষণ ক'রে দেখতো, তবে দেখতে পেতো অচলের বেশের পরি-বর্ত্তন কিছু হ'য়েছে বটে কিন্তু তাতে নিপুণ-পারিপাট্যের সামঞ্জস্য নেই। আছে একটা অসংলগ্ন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের উদ্ভাস্য অবস্থিতি। এবং উদ্ভাসতা যেমন চমকা আসে,

উড়ে' যেতেও তেমনি দেরী হয় না। দুদিন যেতেই আবার তার উদাসীন বেশ ফিরে' এল। অরুণ আর-একবার চাঁক ছেড়ে বাঁচল।

(৩)

প্রেমের দাবী রাজত্বের দাবীর মতোই—অন্ধ রাজার আসন-টলান পণ। বন্ধুর প্রীতি কি তাই স্ত্রীর স্বাধ্য দাবীর উপর অনধিকার আঘাতে তাকে শিথিল ক'রে দিল? হায়, অচলের অভাগিনী পত্নী,—বিয়ের বছর ঘুরতেই চোখের জলে ছুটি নিল

অরুণ আজ ব্যথিত হ'লো। দাবী তক্ষণই জোর করতে চায় যতক্ষণ হাতের পড়তায় থাকে। জিত হ'য়ে গেলে নিজের দাবীর অতীত উগ্রতাকে ধিক্কার দিতে হয়। অরুণের তরুণ চিত্ত আজ অচলের স্ত্রীবিয়োগে শোকার্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। প্রকাশ্যে না হ'লেও মনে মনে যে বন্ধুপত্নীর বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধবিগ্রহ তার চল্‌ছিল তা সে অন্তরে অস্বীকার করতে পারলো না। শত্রুকে আজ অকল্যাণের চরম সীমায় সে-ই যেন পাঠিয়েছে, এবং তাই তার সন্তপ্ত চিত্ত প্রীতির অনুভূতিতে বার বার তাকে স্মরণ করছিল।

(৪)

অরুণ বল্লে, "চল অচল, এবার ছুটিতে পশ্চিমে কোথাও বেড়িয়ে আসিগে।" অচল সাগ্রহে সম্মত হ'লো। যাবার দিন অচলের জিনিষপত্র-গোছানোর সাহায্য করতে গিয়ে অরুণ কিছু অবাক হ'লো। বিলাস-পরিচ্ছদ অচলের যা-কিছু ছিল, যা ভুলে ও' একদিন তার অঙ্গে উঠেছে কি আদৌ ওঠে নি, তা সবই অতি যত্নে আজ সঙ্গে নিয়ে চল্‌লো। শুধু তাই নয়, যৌবনতার যৌষ্ঠব যা-কিছু এতকাল অসম্পূর্ণ ছিল এমন অনেক জিনিষ সে নতুন কিনেছে তাও বোঝা গেল। তারপর যাত্রার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তৈরী হ'য়ে যখন গাড়ীতে এসে উঠলো, তখন তার সে চেহারা ও পোষাক দেখে অরুণ একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। বন্ধুর এ বরবেশ তার বরসজ্জার দিনও হ'য়েছিল কি না অরুণ ঠিক স্মরণে আনতে পারছিল না। অরুণের অন্তর বিরক্তিতে ভ'রে উঠলো। দয়াশোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার পাত্র কি ওই! এই কি তার বন্ধু অচল। ট্রেনের খোলা জানালাটা ছুঁয়ে অন্ধকারে নিশীথ-বাতাস হু-হু ক'রে ব'য়ে যাচ্ছিল। অরুণ সেই অন্ধকারের দিকে অন্ধ চোখ মেলে বিবাহিতজীবনের অন্তরতম রহস্য ভেবে কৃপণার হ'য়ে পড়ছিল। যে বন্ধুর ব্যথায় সমব্যথী হ'য়ে তাকে বিদেশে নিয়ে চলেছে, সেই বন্ধুর প্রতি তার মনোভাব যতই বিরক্ত হ'য়ে উঠতে লাগলো, স্বর্গগতা বন্ধুপত্নীর প্রতি ততই করুণায় অন্তর ভ'রে এল। কথায় বলে, "যে যায় সে ভালই যায়,যে থাকে তারই মরণ;" কিন্তু অরুণের আজ মনে হ'লো এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আজ যদি এপারের লোকের পাশে না ব'সে সে ওপর পারে গিয়ে বসতে পারতো, হয় ত প্রকৃত ব্যথিতের ব্যথায় প্রলেপ দিতে পারত সে! শ্মশানঘাটের কথা মনে পড়লো। তখনো সতীর চিতা নেবেনি, কে একটা পাষণ্ড পাশ হ'তে ব'লে উঠলো, "অচলের জন্যে তা হ'লে আবার একটি মেয়ে দেখতে হয়।" কথাটা শুনে অরুণের ইচ্ছা হ'য়েছিল, লোকটার মাথা সেই মুহূর্ত্তে গুঁড়ো ক'রে দেয়। কে বলে কথাটা, তা দেখবার জন্যে ঘৃণায় একবার মুখ ফিরিয়েও তাকালো না। একবার শুধু অচলের দিকে চেয়ে দেখেছিল। সে-মুখে কোন ছবিই সেদিন দেখা যায় নি,—অচলের মতোই স্থির তা ছিল। কিন্তু আজ মনে হ'চ্ছে—হয় ত ছিল—সম্মতির একটা আকাঙ্ক্ষার ছাপ হয় ত সে-মুখে ছিল, অরুণ তা সেদিন হয় ত বুঝতে পারেনি; অরুণ ঘৃণায় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। হঠাৎ অচলের কাছে গিয়ে তার কাঁধটাতে একটু অস্বাভাবিক ভাবে নাড়া দিয়ে তাকে চমকে দিল। অচল কোন কথা বল্লো না, শুধু তার স্থির দৃষ্টি অরুণের মুখের ওপর ফেলে তাকিয়ে রইল। সে-দৃষ্টির নির্ম্মল স্বচ্ছতায় আঘাতে অরুণের আবিল স্নেহের চমক্ ছুটে'-গেল। অরুণ কিছু লজ্জিত হ'য়েই বন্ধুর পাশে ধপ্‌ ক'রে ব'সে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করলো,"কি ভাবছিস্ রে?"

কিন্তু সন্দেহটা পুরোদস্তর ছুটলো না। গন্তব্যস্থানে গিয়ে বেড়াবার বহর দেখে সন্দেহ বরং আরও অরুণকে পেয়ে বসলো। পোষাকের এত 'চটক্' এই সদ্য পত্নী-বিয়োগের পর কিছুতেই শোভন নয়। এ যে অতি অপবিত্র!

অচলের বিরুদ্ধে অরুণের মন যেই এইরকম বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আবার তার পক্ষেও কতক গুলি যুক্তি আপনা হ'তেই খাড়া হলো। বিয়ের পর

দিন হ'তে সমস্ত ঘটনা মনের মধ্যে পর্য্যালোচনা ক'রে দেখতে লাগলো। তার মধ্যে একটি নিদর্শনও এমন পেল না যাতে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায়। স্ত্রীর উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, যা সকল পরিণীত যুবকের পক্ষেই স্বাভাবিক ও শোভন, অচলের মুখে কখনো তা শোনা যায় নি। স্ত্রীর রূপের তুলনা দিতে গিয়ে জগতের সকল সৌন্দর্য্য টেনে এনেও মনে ধরে নি এমনতর দুর্ভাগ্য তার কখনো হয় নি। তবে কি পত্নীকে সে ভালবাসতে পারে নি? অনেক হতভাগা যুবকের তা হয়। তা যদি হ'য়ে থাকে তবে অবিশ্যি অচলকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। মানুষের মনের ওপর তো আর জবরদস্তি চলে না। এই ওলট-পালট চিন্তা অরুণকে একেবারে অসহিষ্ণু ক'রে তুলো। তবে কি সেদিনকার শ্মশানঘাটের পিশাচ-প্রস্তাবে সত্যই অচলের মত আছে!—কৌতূহল প্রায় চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছ্‌লো।

(৫)

অচলের মনের প্রকৃত অবস্থা মীমাংসা করতে যাওয়ায় অরুণের আর একটি তীব্র কারণ ছিল। সে যখন পশ্চিমে বেড়াতে আসবার প্রস্তাব করে, তখন অতি সহজেই অচল প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং সে নিজেই বিন্ধ্যাপুর স্থানটা ঠিক করে। এখানে আসবার দু'দিন পরেই অরুণকে সঙ্গে ক'রে একদিন ষ্টেশনে যায়। ট্রেন হতে নামলেন অচলের পূর্ব্বপরিচিত ভুবনবাবু—তাঁর একটি সপ্তদশবর্ষীয় পুত্র ও একটি সপ্তদশবর্ষীয়া কন্যা। ভুবনবাবু বিপত্নীক। ভুবনবাবুকে অচল প্রণাম করতেই অতি স্নেহের সঙ্গে তিনি তার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। অচল অরুণের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিল। তার পরদিন হ'তে ভুবনবাবুর বাড়ীতে এই দুটি বন্ধুর যাতায়াত অবাধে চলতে লাগলো। নিরুপমার সহজ ও অবগুণ্ঠনহীন সরল ব্যবহার অরুণকে খুবই আকৃষ্ট ক'রে তুল্লো। বস্তুতঃ দুই বন্ধুই এবাড়ীর আপন লোক হ'য়ে উঠ্‌লো। অরুণের মনের বিবিধ জটিলতার মাঝে সব চেয়ে বড় সমস্যা হ'লো এই—অচল কি নিরুপমার প্রতি অনুরক্ত? মানুষ কি এত সহজেই নিজের স্ত্রীকে ভুলে অপর জায়গায় আসক্ত হ'তে পারে! অরুণ যদি আজ স্থিরসিদ্ধান্তে বিশ্বাস করতে পারতো যে, না, অচল নিরুপমার প্রতি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তার নিজেরই একটা মনের ভ্রান্তিতে অচলকে ও-রকম অন্যায় সন্দেহ করছে, তবে বন্ধুর চরিত্রকে কলঙ্কের সন্দেহ হ'তে মুক্তি দিয়ে যতটা আনন্দলাভ করতে পারতো তার চেয়েও বোধ হয় একটা বড় আনন্দের ধাক্কায় উল্লাটন হ'য়ে যেতে পারতো যা তার নিজেরই জীবন-সংক্রান্ত। কিন্তু হায়! সন্দেহ দূর হয় কোথায়? অরুণের মনে অচলের পোষাকের হালপরিপাট্যের একটা অর্থপূর্ণ জবাব মুখর হ'য়ে দেখা দিল।

একদিন বিকালবেলা চা খাবার আগেই সেজেগুজে অচল কোথায় বেরিয়ে গেল। অরুণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে জলখাবার খেয়ে রাস্তার ধারের ফুলবাগানে পায়চারি করতে লাগলো। সন্ধ্যা যখন প্রায় উত্তীর্ণ হয় তখন সে অধৈর্য্য হ'য়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো,—অচল গেল কোথায় আজ! ভুবনবাবুর বাড়ীতে যাবার সময় প্রায়ই অরুণকে সঙ্গে ক'রেই অচল যায়। আজ নিশ্চয়ই অন্য কোথাও গিয়েছে। তাবতে তাবতে অভ্যস্ত চরণদুটি ভুবনবাবুর বাড়ীর ঠিক সামনেই যে তাকে নিয়ে এসেছে তা সে বুঝতেই পারেনি। বারান্দার টেবিলল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো হঠাৎ তার চোখে পড়তেই চমকে উঠ্‌লো—টেবিলের চারদিক বেষ্টন ক'রে যাঁরা বসেছিলেন তার মধ্যে অচলকে আসন অধিকার ক'রে থাকতে দেখে আরও বেশী চমকে উঠ্‌লো। অন্তরের কোন্‌খানটাতে যেন কি-একটু খচ্‌ করে বিঁধলো। সন্দেহ ও অস্বস্তির কণ্টক বহন ক'রে তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরে গেল। পাতা বিছানার ওপর ধপ্‌ ক'রে শুয়ে প'ড়ে কড়িকাঠের মধ্যে কোথাও কিছু লেখা আছে কি না ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তাই নিরীক্ষণ করতে লাগলো। এমন ক'রে কতক্ষণ কেটে গেল, তার খেয়াল ছিল না। ক্রমশঃ রাত্রি বাড়তে লাগলো এবং অচলের ফেরবার দেরীর সঙ্গে সঙ্গে অরুণের ধৈর্য্যশক্তি জবাব দিতে চাইছিল, এমন সময় ভৃত্য একটুকরো লেখা কাগজ এনে দিল। অচল লিখ্‌ছে তার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে অরুণ যেন খেয়ে নেয়—সে ভুবনবাবুর বাড়ীতেই আজ রাত্রে আহার ক'রে ফিরবে। চিঠি প'ড়ে সে বিছানা হ'তে লাফিয়ে উঠ্‌লো এবং ঘরময় সজোরে পায়চারি শুরু ক'রে দিল।

(৬)

পরদিন প্রভাতে উঠেই অরুণ ঠিক ক'রে ফেল্লো—তার বন্ধুকে প্রলোভন হ'তে বাঁচাতেই হবে। সদ্য স্ত্রী-বিয়োগের পর এপ্রকার আচরণ তার পক্ষে অতীব গর্হিত। এ কলঙ্ক হ'তে বন্ধুকে উদ্ধার করা যে তার প্রধান কর্ত্তব্য আজ। অচলের অভাগিনী স্ত্রীর জন্যে আজ অরুণের চিত্ত নতুন করুণায় ভ'রে উঠ্‌লো। কিন্তু কথাটা পাড়া বড় শক্ত হ'য়ে দাঁড়ালো। কোন্ কথাটা নিয়ে যে তোলা যায় তা ঠিক করতে করতে সকাল ও দুপুর দুটি প্রশস্ত সময় কেটে গেল। অরুণের পক্ষে কথাটা পাড়া আরও শক্ত হ'লো এই জন্যে যে সকাল হ'তে অচলকেও বেশ চিন্তান্বিত দেখছে। তাইতে অরুণের অন্তরে সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। বিকাল বেলা আজ বেড়াতে যাবার সময়ের বেশ আগে হ'তেই অচলকে অরুণ পাহারা দিয়ে চোখে-চোখে রাখতে লাগলো। তারপর দু'জনে যখন একসঙ্গেই বেরুলো, অচলের হাতখানি অরুণ নিজের মুঠোর মধ্যে শক্ত ক'রে ধ'রে ভুবনবাবুর বাড়ীর ঠিক উল্টো দিকের রাস্তাটা নিল।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা কইলে না। যখন গঙ্গার সন্ধ্যাশীতল বাতাসটুকু এসে স্পর্শ করলো, সেই বাতাসের খানিকটা দীর্ঘনিশ্বাসে টেনে নিয়ে অরুণ কথা সুরু ক'রে দিল। কিন্তু কথাটা যেভাবে পাড়লো তা গোড়া দিক দিয়ে না হ'য়ে উল্টো হ'য়ে এসে দাঁড়ালো। যে উপদেশটা ভেবে ব'লে প্রভাতে ঠিক করেছিল, সন্ধ্যায় তা ঠিক উল্টে গেল। অরুণ হঠাৎ ব'লে বসলো, "অচল, আমার মনে হয় তোমার আবার বিয়ে করা উচিত।" অচল একটা কৌতুক-কটাক্ষপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলো, "কেন বল তো?"

অরুণ খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লো, "কেন তা ঠিক বলতে পারি নে, তবে কাকে বিয়ে করা উচিত তা বলতে পারি।"

অরুণ একেবারে মরিয়া হ'য়ে কেন্দ্রকথাটার দিকে ঝুঁকে পড়লো। স্নেহ-নেত্তর দেরী যেন আর সহ্য হ'চ্ছিল না। এবার অচল একটু গম্ভীর হ'য়ে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলো, "কাকে?"

"নিরুপমাকে।"

কথাটা ব'লেই অরুণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অচলকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো, এবং সে জবাবে কি বলে তার জন্যে উদ্গ্রীব হ'য়ে রইল। অচল একটু ম্লান হাসি হাসলো। তারপর কৌতুকের হাসি জোর ক'রে এনে বল্লো, "নিরুপমার বিয়ে কাল প্রায় ঠিক ক'রে এসেছি। বয়ের সম্মতি যদিও আমার জানাই আছে তবুও মুখের কথাটা আজ তার কাছ হ'তে নিয়ে যেতে হবে।" এই ব'লে একখানি হাতে অরুণের গলাটা জড়িয়ে ধ'রে মুখখানা খুব কাছে এনে মিষ্টস্বরে বল্লো, "তোর সঙ্গে নিরুপমার বিয়ে দেবো।"

অরুণ মহা ফাঁপরে প'ড়ে গেল। সুপানীর পান করতে অতিরিক্ত আগ্রহে যেমন হঠাৎ "বিষম" খেতে হয়, অরুণ যেন সেই বিপদে প'ড়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগলো। কোন কথাই মুখ দিয়ে বেরুলো না। অচলও কথাটা ব'লেই কোথায় যেন তলিয়ে গেল—কিছুক্ষণ আর সাড়া-শব্দ নেই। খানিক পরে অতিরিক্ত গম্ভীরভাবে বল্লো, "এস অরুণ, এখানে একটু বসি, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

গঙ্গার ধারের একখানি লালাভ পাথরের ওপর ব'সে পড়লো। অরুণ তার পাশেই পাথরের একটু নিম্ন-ধাপে ব'সে বিস্মিতনেত্রে তার দিকে তাকিয়ে রইল। খানিক চুপ ক'রে থেকে অচল বলতে লাগলো,—"নীলিমা ও নিরুপমা বালাপথী আমাদের বিয়ের পর নীলিমা মাতৃহীনা নিরুপমার জন্যে বিশেষভাবে চিন্তিত হ'য়ে পড়লো। ভুবন-বাবু যে রকম সাদাসিধে মানুষ, তাতে তিনি কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারবেন না, এই ভেবে নীলিমার যেন মনে হ'তে লাগলো নিরুপমার বিয়ে ঠিক ক'রে দেওয়া তারই কর্ত্তব্য। আমাকে কতবার যে সে নিরুপমার জন্যে একটি পাত্র দেখতে অনুরোধ করেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি হেসে উড়িয়ে বলেছি ঘটকালি করা আমার দ্বারা হবার নয়। সে বেটাকে কর্ত্তব্য ব'লে মনে ক'রে আমার তাগাদা দিত আমি সেটাকে তার একটা খেয়ালমাত্র ব'লেই উড়িয়ে দিয়ে এসেছি।"

এই পর্য্যন্ত ব'লে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে গঙ্গার স্রোতের পাল্টা দিকে তাকিয়ে ওঠা ছোট ছোট ঢেউগুলোর দিকে

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাসে চিন্তার স্রোতকে ফিরিয়ে এনে আবার বলতে লাগলো, "ছটি অনুরোধ সে আমাকে প্রায়ই করতো। একটি, এই নিরুপধার বিয়ে ঠিক করা; অন্যটি ছিল তার প্রাণের সখ, —আমায় ভাল ক'রে সাজগোজ করাতে তার ভারি আকাঙ্ক্ষা ছিল। এমন কি তার অন্তিমশয্যার শুয়েও এই বিনতি রেখে গেছে যেন আমি বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে থাকি—সে না কি স্বর্গ হ'তে আমায় দেখবে। হায়! সরল-হৃদয়ার আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ হওয়া সম্ভব হয় তবে তাই যেন হয়।"

একটু থেমে আবার বলতে লাগলো, "তার এই দুটো অনুরোধকেই সে থাকতে আমি চূড়ান্ত অবহেলা ক'রে ফিরতাম। আজ সব শেষ! কিন্তু তার ইচ্ছা দুটিকে পূর্ণ, যা তার জীবনে করিনি, তা মরণে করতে সুরু করেছি। নিরুকে তো তোমার হাতে আজ আনন্দের সঙ্গেই সঁপে দিয়ে আমি খালাস হ'লাম। কিন্তু ভাই, জীবনভোর এই দুঃসহ যৌবিনতার বোঝে চলা ঠিক যেন বেহুলার পক্ষে দেবগণকে সন্তুষ্ট করবার নিমিত্ত মৃতস্বামীর শিয়রে নৃত্য-লীলার তীব্র বেদনা। আবার, তার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে এমনও অবহেলা করার বেদনা যে আরও তীব্র ভাই!"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। তাই অচলের চোখের ভরপুর জলবিন্দু অরুণ দেখতে পায় নি, এখন টস্ ক'রে অরুণের হাতে এক ফোঁটা পড়লো। অরুণ নিজ মস্তকটি অচলের হাঁটুর উপর স্থাপন ক'রে স্থির হ'য়ে ব'সে রইল। বোধ হয় প্রেমপথের যাত্রী প্রেমিক গুরুর কাছ হ'তে নীরবে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করলো।

গর্ভাবস্থায় ব্যায়াম অনিষ্টকর কি না

ব্যায়ামাচার্য্য শ্রী শ্যামসুন্দর গোস্বামী

শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ব্যায়াম স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য-রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানে জানিতে পারা গিয়াছে যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সর্ব্ববয়সেই ব্যায়াম করা উচিত। এখন কথা হইতেছে গর্ভাবস্থায় ব্যায়াম অনিষ্ট-জনক কি না। অনেকে বলেন, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে ব্যায়াম অত্যন্ত অহিতকর এবং সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। আমরা এই কথাই সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

মাতার স্বাস্থ্যের উপর যে ভবিষ্যৎ-সন্তানের শারী-রোন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে তাহা আমরা সকলেই জানি। প্রসবকার্য্যে মাতার শারীরিক শক্তির এত অধিক পরিমাণে অপচয় ঘটে যে স্ত্রীলোকের জীবনে এমন কোন কার্য্যই নাই যাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। ইহা স্ত্রীলোকের জীবনের কঠোরতম পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতার অভাবে আজ আমাদের দেশে মাতৃজাতির স্বাস্থ্যের এবং শরীরের এতটা অধোগতি হইয়াছে। স্ত্রীত্বের চরম পরিণতি মাতৃত্বে, ইহাই প্রকৃতির বিধান। কিন্তু এই মাতৃত্বই আজ স্ত্রীলোকের শারীরিক অবনতির একটি বিশেষ কারণ হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। আর তাহার ফলে ভবিষ্যৎ-সন্তানগণ রোগগ্রস্ত, দুর্ব্বল এবং অল্পজীবী হইয়া জন্মাইতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এ অবস্থার পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়। এ অবস্থার প্রতিকার ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত।

মাতৃত্বের জন্য স্ত্রীলোকের শরীর এরূপভাবে গঠিত করিতে হইবে যে গর্ভাবস্থায় তাহা গর্ভস্থ সন্তানের উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিবে এবং প্রসবকালে যে-শক্তির ক্ষয় অনিবার্য্য তাহা গর্ভবতী অনায়াসে সহ্য করিতে সক্ষম হইবেন এবং তাহার ফলে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন না। অবশ্য গর্ভসঞ্চারের অনেক পূর্ব্ব হইতেই

মাতাকে যথাযথভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে। এইভাবে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত বিজ্ঞানসম্মত যে-সকল পদ্ধতির অনুসরণ করা প্রয়োজন ব্যায়াম তাহার একটি অঙ্গ। তাহাতে যথাযোগ্য ব্যায়াম দ্বারা অঙ্গে যথাযথ শরীর গঠিত করিয়া এবং শক্তির যথেষ্ট বৃদ্ধিসাধন করিয়া তাহার পর সন্তান-ধারণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে (Pre-natal preparation)। ইহার ফলে সন্তানও দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত হইবে না এবং মাতারও শরীর এবং স্বাস্থ্য ভগ্ন হইবে না।

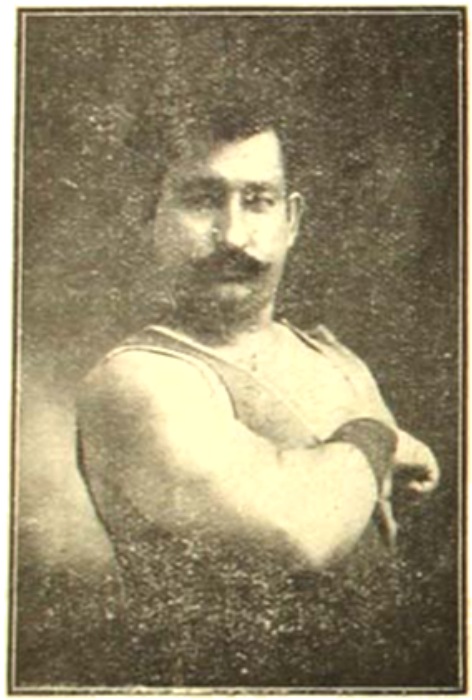

আচার্য্য শ্রীজ্ঞানসুন্দর গোস্বামী

এখন কথা হইতেছে পূর্ব্বাবস্থায় ঐভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকিলেও গর্ভসঞ্চারের পরেও ব্যায়াম করিতে হইবে কি তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে? একথা বলা বাহুল্য যে গর্ভাবস্থায় যাহাতে মাতার স্বাস্থ্য কোনরূপে ভগ্ন না হয় তাহার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। সেজন্য বিহিত খাদ্যগ্রহণ, মুক্তবাতাসে অবস্থান, বিশ্রাম প্রভৃতি স্বাস্থ্যোন্নতিকর উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হইবে। উপযুক্ত আহারগ্রহণ, কোষ্ঠশুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদা রক্ত শুদ্ধ রাখিতে হইবে। আর সমগ্র শরীরে রক্তের যথাযথ পরিবেশন একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা যে কেবল মাতার স্বাস্থ্যরক্ষার্থ প্রয়োজন তাহা নহে, গর্ভস্থ সন্তানের জন্যও তাহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। উপযুক্তভাবে রক্ত-সংবহনার্থ বিজ্ঞানসম্মতভাবে দৈহিক ব্যায়াম ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। আর এতদ্বারা মাতার শরীরে বলের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিবে এবং তাহার ফলে প্রসবের সময় যে-শক্তির ক্ষয় হইবে তাহাতে মাতাকে দুর্ব্বল বা রোগগ্রস্ত করিতে পারিবে না। গর্ভাবস্থায় ব্যায়ামের আর একটি প্রধান ফল এই যে এতদ্বারা গর্ভস্থ সন্তান অধিক 'মোটা' হইতে পারে না এবং তাহার ফলে প্রসবের সময় মাতার যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয় এবং প্রসবকার্য্যও নিরাপদভাবে হওয়ার পক্ষে সহায়তা করে। মনে রাখিতে হইবে অতিরিক্ত 'মোটা' হইলেই গর্ভস্থ সন্তান সুস্থ হয় না। আর এই অবস্থায় বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম দ্বারা যে গর্ভবতী বা গর্ভস্থ সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে:

গর্ভসঞ্চারের কয়েক মাস পূর্ব্বে ব্যায়াম দ্বারা মাতার শরীর বিশেষভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। বিজ্ঞানসম্মত প্রাথমিক ব্যায়াম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমস্ত অঙ্গের পরিচালন করিতে হইবে। ইহার সহিত পেশীর উন্নতিবিধায়ক ব্যায়াম অবস্থানুসারে সংযুক্ত করিতে হইবে। এই ব্যায়াম দ্বারা উদরপেশীসমূহের উন্নতির বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। উদরত্বক্‌, উদরচ্ছদা চর্ম্মা, উদরচ্ছদা মধ্যমা এবং উদরচ্ছদা আদিমার উন্নতির জন্য দণ্ডায়মানভাবে, উপবিষ্টভাবে এবং শায়িতাবস্থায় যে-সমস্ত অঙ্গপরিচালনা আছে তাহা নিয়মিতরূপে সম্পাদন করিতে হইবে। জীবনীশক্তি-বৃদ্ধিকর ব্যায়ামের মধ্যে ভ্রমণ, ধাবন, সন্তরণ দেওয়া এবং পর্ব্বতারোহণ এই কয়টি শ্রেষ্ঠ। শ্বাসিক ব্যায়ামের মধ্যে শ্বাসক্রিয়া, উজ্জীবনযন্ত্র এবং নৌলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাহা হউক এই সমস্ত বিভিন্ন-শ্রেণীর ব্যায়াম বিজ্ঞানসম্মতভাবে অবস্থানুসারে পরস্পরের মধ্যে মিশ্রিত করিয়া নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিতে হইবে।

গর্ভসঞ্চারের পর বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যায়ামের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। জীবনীশক্তিবৃদ্ধিকর ব্যায়ামের মধ্যে গর্ভাবস্থায় ভ্রমণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য অঙ্গ-পরিচালনা, যথা পর্ব্বতারোহণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। ৩।৪ মাইল পর্য্যন্ত প্রত্যহ হাঁটিতে হইবে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তবাতাসে

মধ্যগতিতে হাঁটিতে হইবে। হাঁটা প্রসবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে চলিবে।

গর্ভসঞ্চারের পর প্রথম ৪ কি ৫ মাস প্রাথমিক ব্যায়াম চলিতে পারিবে। তবে অঙ্গ-পরিচালনের সময় অনেকটা সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। আর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু পরিমাণে কমাইতেও হইবে। চারি কি পাঁচ মাস পরে এই ব্যায়াম আরও কমাইতে হইবে ৪ মাস পর্য্যন্ত পেশীর উন্নতিবিধায়ক ব্যায়াম কিছু কম করিয়া করিতে হইবে। তারপর ক্রমে ক্রমে এই ব্যায়াম কমাইয়া ফেলিতে হইবে। ইহার মধ্যে যেগুলি পরিচালনে অত্যধিক শক্তির ক্ষয় হয় তাহা বন্ধ করিতে হইবে। সপ্তম মাস হইতে এই ব্যায়ামের অধিকাংশই বন্ধ করা যাইতে পারে। এই সময় উর্দ্ধপদে অধঃশির অবস্থায় শায়িত থাকা বিশেষ উপকারী। একখানি তক্তা ঢালুভাবে রাখিতে হইবে, তাহা হইলে ইহার একদিক উচ্চে অন্যদিক নিম্নে থাকিবে। এই তক্তার উপর উত্তানভাবে শয়ন করিতে হইবে এবং মস্তক নিম্নদিকে থাকিবে ও পদদ্বয় উর্দ্ধদিকে থাকিবে। ইহা দ্বারা এই অবস্থায় গর্ভাশয়ের নিম্নাভিমুখী প্রবণতা দূরীভূত হয় এবং বস্তি ও উদর-গহ্বর অবস্থিত যন্ত্রসমূহের যথাস্থানে অবস্থানের সহায়তা করে। উদরে ভারবোধ এবং অথথা রক্তের সঞ্চয়ও দূরীভূত হয়। উদরে যখনই নিম্নাভিমুখ চাপ অনুভূত হইবে বা এই চাপ যখন কষ্টকর হইবে তখনই এইপ্রকারে শয়ন করিলে বিশেষ উপকার হইবে। এই অবস্থায় শায়িতভাবে কয়েকটি বিশেষ ব্যায়াম আছে তাহা অবস্থাবিশেষে বিশেষ উপকারী। এইপ্রকারে অবস্থিত তক্তার উপর উত্তানভাবে শয়ন করিয়া গ্রীবা ও মস্তক উর্দ্ধে উত্তোলিত করিতে হইবে। তাহার পর 'উপুড়' হইয়া শয়ন করিয়া মস্তক ও স্কন্ধ উত্তোলনপূর্ব্বক কটীদেশ হইতে শরীর একদিকে "মোচড়াইতে" হইবে। তাহার পর অপরদিকেও এইরূপ করিতে হইবে। এই ব্যায়াম করিবার সময় পাদদেশ হইতে কটীদেশ তক্তার উপরই যথাযথভাবে অবস্থিত থাকিবে। তৃতীয় ব্যায়াম হইতেছে "উপুড়" হইয়া শয়ন করিয়া একপদ উর্দ্ধদিকে উত্তোলিত করা। পা সরলভাবে থাকিবে এক পদের পর অপর পদ এইরূপে উত্তোলিত করিতে হইবে। চতুর্থ ব্যায়াম—উত্তানভাবে শয়ন করিয়া উভয় পদ উর্দ্ধে উত্তোলিত করিতে হইবে। যাহা হউক বিশেষজ্ঞের উপদেশ-ব্যতীত এই ব্যায়ামগুলি অনুষ্ঠিত হওয়া অনুচিত।

এই সময় উদরপেশীসমূহের ব্যায়াম বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক করিতে হইবে। শয়নপূর্ব্বক উদরপেশীর যে ব্যায়াম তাহাতে অধিকতর সাবধানতা আবশ্যক। যান্ত্রিক ব্যায়ামান্তর্গত উড্ডীয়নবন্ধ ও নৌলি গর্ভাবস্থায় বন্ধ করিতে হইবে। গভীর শ্বাসক্রিয়া বরাবর চলিবে। গর্ভাশয়ের বৃদ্ধি-হেতু ঐ সমস্ত স্থানের যন্ত্রসমূহ পরস্পরের দ্বারা পেষিত হয়। হস্ত ও পদদ্বয়ের দ্বারা চলা এই অবস্থায় বিশেষ উপকারী। গর্ভাবস্থায় নিয়মিতরূপে এই ব্যায়াম আচরিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা বমননিবারণেও বিশেষ সহায়তা করে। নিতম্বের পরিচালনা গর্ভাবস্থায় বরাবর নিয়মিতরূপে করিয়া যাইতে হইবে।

ভারোত্তোলন, অশ্বারোহণ, অতিরিক্ত সন্তরণ, কঠিন-ভাবের যাবতীয় ব্যায়াম গর্ভাবস্থায় পরিত্যাজ্য। অত্যধিক গৃহকর্ম্মও পরিত্যাগ করা বিধেয়। তবে সামান্য গৃহকর্ম্ম করা উপকারী। যাহাতে অতিরিক্ত ক্লান্তি আসে এরূপ কর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৈল দ্বারা প্রত্যহ উদরপ্রদেশ মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

নিয়মিত ব্যায়ামের সহিত মুক্ত বাতাসে অবস্থান, অল্পালোকি, উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ, বিশ্রাম, স্বচ্ছন্দ মানসিক অবস্থা প্রভৃতি স্বাস্থ্যলাভের অন্যান্য অঙ্গগুলি যথাযথরূপে সংযুক্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে মাতার স্বাস্থ্য গর্ভাবস্থায় ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, প্রসবকার্য্য অনেক সহজে সম্পন্ন হইবে, প্রসবের পর মাতার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য অল্পায়াসেই ফিরিয়া আসিবে এবং গর্ভস্থ সন্তান সুন্দর, সতেজ এবং স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইবে। সুতরাং আমাদের মতে বিজ্ঞানানুমোদিত ব্যায়াম যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইলে গর্ভাবস্থায় হিতকরই হয়, অনিষ্টকর হয় না।

দোসর

শ্রী সতীশ রায়

(১৮)

ইন্দুলেখা সেদিন বাড়ী ফিরিল যেন হাওয়ায় উড়িতে উড়িতে। এই বাস্তব পৃথিবী তাহার কাছে মনে হইল স্বপ্নপুরী! জগতে তাহার আর কিছুই অপ্রিয় রহিল না। কলিকাতার রাস্তার লোকের ভীড়, ফিরিওয়ালার বিচিত্র ডাক, ধাবমান মোটরে কর্মচঞ্চল জীবনযাত্রার সমস্ত আয়োজন, তাহার কাছে মনে হইল অপূর্ব্ব সুন্দর! আর এই খেলাঘর বাঁধিয়া দিয়া, সূর্য্য-চন্দ্র-তারার প্রণয় হাতে সমস্ত নীলাম্বর ভরিয়া যে একজন অদৃশ্য নিয়ন্তা যে বসিয়া রহিয়াছেন, এ বিষয়ে আর তাহার কোন সন্দেহ রহিল না।

একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিক্ষুক তাহার মুখো হাত বাড়াইয়া বলিল,—"মাঈ, কুছ ভিখ মিলে!" অন্য সময় হইলে হয় ত সে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সন্তর্পণে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইত। আজ সে দাঁড়াইয়া ব্যাগ খুলিল, কিন্তু ভিক্ষুককে দিবার মত কিছু না পাইয়া একটা টাকাই তাহাকে দিয়া বসিল।

একজনের কাছ হইতে এরূপ ভিক্ষা বোধ হয় ভিক্ষুকটি জীবনে পায় নাই। সে সাশ্চর্য্য চোখ তুলিয়া তাহাকে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। ইন্দুলেখা মৃদু হাসিয়া তাহাতে কান না দিয়া আবার অগ্রসর হইল। শরৎ-আকাশের শুভ্র মেঘখণ্ডের মত তাহার মনটি যেন খুসীর হাওয়ায় উড়িয়া চলিতেছিল—ভাল কাজ করিয়া যাওয়ার কি আনন্দ!

ধনীর ধনগৌরব, জ্ঞানীর মান-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান তাহার কাছে আজ একেবারে মিথ্যা, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতেছিল। আনন্দ-আবেগে গুণ গুণ করিয়া সে মনে মনে কি একটা গান গাহিতে গাহিতে পথ চলিতেছিল।

তখন বিকাল বেলা। ঠেলাগাড়ীতে করিয়া ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের কি-চাকরেরা পার্কে হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইতেছে। সে হঠাৎ একটা ঠেলাগাড়ীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বেলফুলের মত শুভ্রসুন্দর একটি খোকাকে চুমু খাইয়া আদর করিল, তার সোনালি চুলভরা মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিল। খোকা তাহার ছোট হাতের মুঠায় ইন্দুর একটি আঙুল ধরিয়া মুখে পুরিতে চায়! সে আঙুলটি নাড়ায় এক নতুন খেলা ভাবিয়া খলখলিয়ে মুখে হাসিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল—এমন একটি খোকা যদি তাহার নিজের হইত! আবার কি ভাবিয়া তাহার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল—অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল। একমুঠা লজেন্স লইয়া সে ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেছিল। তাহারা যে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেছে, ইহা সে পরম আনন্দে উপভোগ করিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া, সে কাপড় জামা না বদলাইয়াই, বেহালাটা বাক্স হইতে খুলিয়া লইয়া হঠাৎ একটা উদ্দাম বড়ের গান বাজানো সুরু করিয়া দিল,—এ যেন তাহার নিজের মনের খানিকটা অভিব্যক্তি। হরমোহন কি-একখানা দর্শনের বই পড়িতেছিলেন, সেখানা নামাইয়া রাখিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন। বাজনা শেষ হইয়া গেলে ইন্দুলেখা হাসিমুখে বলিল, "কি রকম শুনলে দাদা! কেমন লাগল?"

হরমোহন চেয়ার ছাড়িয়া, সস্নেহে ইন্দুর নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "আমার বিনি ছাড়া এমন আর কেউ বাজাতে পারে না, এ ত তোকে আমি কতদিন বলেছি!"

ইন্দু বলিল, "কলেজ আর এই ঘর, এ-ই তুমি জান! বাহিরের খোলা হাওয়ায় মাঝে মাঝে বেড়িয়ে আসলে ত পার। এমন করলে তোমার শরীর টিকবে কি ক'রে?"

হরমোহন তাহার সে অনুযোগে কান না দিয়া, তাহার

আনন্দোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোর আজ ভারি ঘোর-মেজাজ দেখ্‌ছি যে! ব্যাপারখানা কি?"

"কিছু না, বোস। তোমার জন্যে চা-খাবার নিয়ে আসি।" বলিয়া ইন্দু চকিতে চলিয়া গেল। হরমোহনের কাছে বসিতে তাহার মনে ভয় হইতেছিল। তাহার মধ্যে আনন্দ এত বেশীমাত্রায় প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, যে, তাহা অন্যমনস্ক হরমোহনের চক্ষুও এড়ায় নাই।

• • •

বাড়ী ফিরিবার পথে একটা কথা সঞ্জীবের ঘুরিয়া-ফিরিয়া কেবল মনে জাগিতে লাগিল—কাজটা ভাল হয় নাই। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল সে যাহা করিয়াছে, যে কথাগুলি ইন্দুকে বলিয়াছে সমস্তই আবার ফিরাইয়া লয়। সে ইহা ইচ্ছা করে নাই। ইন্দুলেখাকে লইয়া ঘর করিবার ছবি মনের মধ্যে যতবার জাগিতে লাগিল, তাহার মন ততবারই বিমুখ হইয়া উঠিল!

"সে বরং তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু হইতে পারে, কিন্তু—" সে আর ভাবিতে পারিল না। চুলের কাঁটা-বেঁকানো তারের আংটিটি তাহার চোখে পড়িল—তখন কি তাহাকে ভুল পাইয়াছিল? একবার ভাবিল—খুলি; আবার মনে মনে বলিল, "না, তাহা হইলে ইন্দুর কাছে অবিশ্বাসী হইতে হইবে।"

একটা কথা তাহার মনের মধ্যে কেবলি খোঁচড় দিতে লাগিল, স্বাধীন সে—ইন্দুর কাছে যাচিয়া ধরা দিয়াছে, সে আজ স্বেচ্ছা-বন্দী। আর এ পরাজয়ে তাহার বিন্দুমাত্র আনন্দ নাই! তাহার মন ধমধম করার মত অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। ইচ্ছা হইতে লাগিল সে ছুটিয়া গিয়া ইন্দুর সুদৃশ্য স্তব্ধ করিয়া বলিয়া আসে, "মিথ্যা! মিথ্যা! তাহাকে ভালোবাসার যে মিথ্যা অভিনয় করিয়াছে—তাহা যৌবনের ক্ষণিক উত্তেজনার ছলনা!" তাহার মনে হইল, সে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে—যদি সে কথাগুলি একনিশ্বাসে ইন্দুলেখাকে বলিয়া আসিতে পারে। তাহা হইলে তাহার মন হইতে যেন একটা গুরু-ভার পাথর নামিয়া যায়।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সে কেবল এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল—তাহার ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে দিনের সেই সুখ-স্মৃতি জাগিতে লাগিল, সে ভাবিল, ইন্দুর ঐকান্তিক ভালোবাসার কথা সত্য—জগতে আর কাহাকেও সে চায় না, আর কাহারও জন্য সে ভাবে না, তাহার সমস্ত কামনা-ভাবনা অধিকার করিয়া কেবল সে-ই একেশ্বর বসিয়া আছে—তখনি এক সার্থকতায়, পূর্ণতায়, তাহার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। আবার, তখনি মনে হইতে লাগিল ইন্দুলেখার শিক্ষা-দীক্ষা-আবেষ্টন সমস্তই তাহা হইতে কত বিভিন্ন,—তাহার বিমুখ মনকে সে কত ধীরে ধীরে, তাহার অজ্ঞাতে, কি মোহিনী-মায়ায় নিজের অভিমুখ করিয়া লইয়াছে, তখন তাহার কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল—এ নারী মায়াবিনী!

সে উদ্বেগময়ীকে সরাইয়া দিয়া শেফালির স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখ-খানি প্রভাতের শুকতারকার মত তাহার মনে ধীরে ধীরে জাগাইতে লাগিল। বিশ্বেশ্বরী তাহাকে পত্র লিখিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের সহিত মাঝে মাঝে দেখাশুনা করিয়া খোঁজ-খবর লইতে। আর এই যাওয়া-আসা, মেলা-মেশার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বন্ধুর আত্মীয়তাতে পরিণত হয়, মায়ের এই সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সে মনে মনে হাসিত। কিন্তু শেফালি তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আলাপ-আচরণে যেরূপ উদাসীন, তাহাতে সে কিছুমাত্র উৎসাহিত হইতে পারে নাই।

সেদিন অপরাহ্ণবেলায় সে হঠাৎ অন্নপূর্ণার বাড়ী গিয়া হাজির হইল। তিনি তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করি-লেন, বলিলেন, "এস সঞ্জীব, তুমি আর আমাদের এখানে আস না কেন? তোমার মা চিঠি লিখেছেন, তুমি কেমন আছ আমাকে লিখতে।"

সঞ্জীব বলিল, "কাজের গোলমালে আস্‌তে পারিনি সইমা!"

অন্নপূর্ণার মনে হইল তাহার উৎসুক-দৃষ্টি যেন কাহাকে খুঁজিতেছে। তিনি মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "শেফালি ও এখনো কলেজ থেকে ফেরেনি; তার কলেজে আজ মিটিং আছে কিনা, সেইজন্যে আস্‌তে দেরী হ'চ্ছে বোধ হয়।"

সঞ্জীব বলিল, "সেদিনকার সেই ঘটনাটার জন্যে

আমার মনে এত গ্লানিবোধ হয়েছিল যে, আপনাদের আর মুখ দেখাতে ইচ্ছে কর্‌ছে না।"

"কেন, তোমার আর দোষ কি?"

অশোককে সে চিনিত না, সে বলিল, "দুর্গীর না থাকলে আমার একলার পক্ষে তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হ'ত না।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সে সব আমি শুনেছি। তুমিও ভাগ্যিস্ তাকে ট্যাক্সি ক'রে তাড়াতাড়ি বাড়ী নিয়ে এসেছিলে—"

এই সময়ে শেফালির কলেজের গাড়ী আসিয়া থামিল। নামিয়া বৈঠকখানা-ঘরের ভিতর দিয়া বাড়ীর মধ্যে যাইবার সময় সজীবকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আজ তাহার বড় লজ্জা হইল।

অন্নপূর্ণা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শেফালি, তুমি হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এস; আমরা আজ বাইরের ঘরেই চা খাব।"

সে নতমুখে বলিল, "আচ্ছা।" বলিয়া সে চোখের কোণ দিয়া সজীবের মুখের পানে চাহিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। বিশেষরী অন্নপূর্ণাকে শেফালির সহিত সজীবের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, কাজ-পড়ার মায়ের বাক্স খুলিতে গিয়া সেটি শেফালির হাতে পড়ে। চিঠিতে রাঁচির সিল দেখিয়া সে কুমারী-মনের স্বাভাবিক কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারে নাই; অন্নপূর্ণার পড়া চিঠিখানি খাম হইতে বাহির করিয়া সে লুকাইয়া পড়িয়াছিল। আসন্ন স্বামী-সমাগমের একটা মোহ তাহার মিলনোৎসুক কুমারী-মনের সমস্ত সুধাকে কম অভিভূত করে নাই; কিন্তু সজীবের মধ্যে তাহার ভাবপ্রবণ চিত্ত কোন সহানুভূতির সাড়া পায় নাই। তথাপি বেশভূষা এবং প্রসাধন ব্যাপারটা সে অন্যদিন অপেক্ষা আজ একটু বিশেষ মনোযোগের সহিতই করিল। যে কোনো পুরুষের চিত্তজয়ে তরুণীর যে চিরন্তন চেষ্টা তাহা তাহার সংস্কারের ভিতর একেবারে সুপ্ত ছিল না। সঙ্কোচ এবং লজ্জার ভারে একরকম আড়ষ্ট হইয়া সে বাইরের ঘরের দরজার কাছাকাছি আসিয়া প্রায় দু'তিন-বার ফিরিয়া গেল; শেষে আত্মসংবরণ করিয়া সে ঘরে ঢুকিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "শেফালি, তুমি এখানে বস, সজীবের সঙ্গে কথাবার্তা বল; আমি খাবার তৈরী ক'রে নিয়ে আসি।"

শেফালির ইচ্ছা হইল বলে, "আমি কেন যাই না মা! তুমি বস।" কিন্তু কি ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

অন্নপূর্ণা চলিয়া গেলে শেফালি সামনের একখানি চেয়ারে বসিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। একজনের কাছে আর একজনের অস্তিত্ব হয় ত খুব বেশী সুস্পষ্ট ছিল না বলিয়া মনে হইতেছিল,—তাহারা যেন পরস্পর হইতে অনেক দূরে বসিয়া আছে। মনের দূরত্ব তাহাদের দেহের নিকটত্বকে জয় করিতে পারিতে ছিল না। যাহাদের কাছে মন সাড়া পায় না, তাহাদের কাছে গেলে স্বভাবতঃই সে মুক হইয়া পড়ে। সজীবের সাহচর্য্য শেফালির তেমনি অকারণে আঁধার-কোঠায় বন্ধ হইয়া হাঁফলাগার মত অস্বাচ্ছন্দ্যকর মনে হইত!

উভয় পক্ষের নিস্তব্ধতা যখন বড়ই অস্বাভাবিক মনে হইতেছে, তখন সেই ভিন্নমুখ মন তন্ত্রতার পিঠাচোরে মিলিবার একবার ব্যর্থপ্রয়াস পাইল। সজীব নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "তুমি বোধ হয় জান না শেফালি, আমার মা তোমাকে কতখানি স্নেহ করেন। প্রত্যেক চিঠিতে তুমি কেমন আছ, তোমার পড়াশুনা কেমন চল্‌ছে এই সব খবর আমাকে লিখ্‌তে লেখেন তিনি।"

শেফালি বলিল, "সই-মাকে আমার প্রণাম জানাবেন; তিনি যে আমাকে এতখানি স্নেহের চোখে দেখেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

বলিয়া ফেলিয়া শেফালির মনে হইল, কথাটা যেন কেমন শোনাইল—কিন্তু আর কোন উত্তরও ছিল না। আবার উভয়ে নিস্তব্ধ -কেহই কথা খুঁজিয়া পায় না। এমন সময় অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া সামনের একটি তিনপায়ার উপর জল-খাবারের থালাটি রাখিলেন—পরম রুচি-বেগুনভাজা আর খানিকটা মোহনভোগে থালাটি সাজানো। "খেয়ে এসেছি, —কিদে নেই"—বলিয়া সামান্য কিছু খাইয়া অন্নপূর্ণার অনুরোধ বাঁচাইয়া সজীব তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

তাহার মনে হঠাৎ কেমন অস্বস্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাস্তায় আসিয়া সে ইন্দুলেখার কথা ভাবিতে লাগিল! এখানে আসিবার জন্য কেন যে তাহার মনে খেয়াল চাপিয়াছিল, সে বুঝিতে পারিল না। তাহার মনের চঞ্চল পাখীটা যে শাখায় কুলায় বাঁধিয়াছে,—সেই আরামভরা পরিচিত বিশ্রাম-নীড়টি ত এখানে নয়! সে যেন হরমোহনবাবুর বাড়ী যাইবার জন্যই বাহির হইয়াছিল,—পথ চলিয়া যাকে ঠিকানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে দ্রুতগতিতে হরমোহনবাবুর বাড়ীমুখো হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

(১৭)

সেদিন সেখানে বোহেমিয়ান মজলিস্ বসিয়াছে—ছুটির দিনে প্রায় বসিত। কলেজের ছাত্রদের ভিতর তাঁহার যে-কয়টি ভক্ত ছিল, সুধীর তাহাদের অগ্রগণ্য। দিনকতক হইল অশোককেও সে টানিয়া আনিয়াছে।

আপন-ভোলা এই অমায়িক প্রফেসরটিকে তাহারা বন্ধু বলিয়া গণ্য করিত। তিনিও তাহাদের সহিত সমানভাবে মিশিতেন। তিনি চা'র অতিরিক্ত ভক্ত ছিলেন। তাই চা'র অনাহূত আয়োজন তাঁহার বাড়ীতে সকলের জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকিত। এই বোহেমিয়ান মিটিংএ ইন্দুলেখাকে বড় একটা যোগ দিতে দেখা যাইত না। কেবল মাঝে মাঝে যখন তর্ক তুমুল হইয়া উঠিত, সে আসিয়া হাসিয়া বলিত, "তোমাদের সবাইকে কোন্‌দিন পুলিশে ধ'রে নিয়ে যাবে, জনসাধারণের বিশ্রামশান্তি নষ্ট করবার জন্যে!"

ইহাতে যাহার গলা সকলের উপর চড়িত সেই সুধীর সহসা যেন "মন্ত্রশায় ভুজঙ্গের মত" স্তব্ধ হইয়া যাইত—আর কাহারো উপর এই অনুযোগ এত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না।

সঞ্জীব একপাশে গিয়া বসিয়া পড়িল। এ সভায় দর্শনতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য সবই সপ্তমতালে চলিতেছিল।

হরমোহনবাবু বলিতেছিলেন, "এ পৃথিবীটি যেন কোন্ অমর কবির একখানি বিয়োগান্ত নাটক। ভগবান্ যদি এটা রচনা ক'রে থাকেন, তবে এটা তাঁরই ইচ্ছা যে আমরা প্রত্যেকেই এক একটা ভূমিকায় অভিনয় ক'রে যাব! যদি সেই খেয়ালীর ইচ্ছা হয় যে তোমাকে ভিক্ষুক সাজতে হবে—কিংবা রাজপুত্রের ভূমিকায় তোমাকে রঙ্গভূমিতে নামতে হবে,—অপরা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর হ'তে হবে—তাতে তোমার কি এসে যায়? যে ভূমিকা তিনি তোমাকে দিয়েছেন, তারি অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার একান্ত চেষ্টা কর।"

সুধীর বলিল, "যে অবস্থায় তিনি আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ত মানুষের ধর্ম্ম নয়—পশুর হ'তে পারে পরাধীন জাতিরা কি বিজেতাদের সকলরকম সুখ-সুবিধার উপাদান যোগাড় ক'রে দেবার জন্যেই জন্মেছে, বলতে চান? বিজেতাদের অত্যাচারের অস্ত্র যোগাবে পরাধীন জাতি, আর তারা তাদের অভাব-অপমানের খাঁতায় লিষ্ট করবে? এই যদি ভগবানের বিচিত্র বিধান হ'ত, তা হ'লে তিনি বারবার কংসের কারাগার ভেঙে জনক-জননীর বন্ধন-মোচন করতে পৃথিবীতে আস্‌তেন না। অদৃষ্টবাদ-দর্শনই ত আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করেছে!"

বলিয়া সে যেন কার সহানুভূতি ও অনুমোদন পাইবার আশায় জানালা দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের পানে একবার চাহিল। হরমোহনবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতিকামনা যে করবে, জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আধ্যাত্মিকতার ভেতর দিয়ে যদি স্বরাজলাভ করতে হয় তবে বাইরের জগতে তার ক্ষেত্রও প্রস্তুত করতে হবে। অত্যাচারীকে বর্জ্জন ক'রে এই উন্নতির পথে চল্‌বার স্বার্থপর চেষ্টা অন্ধের পাহাড়ের পথে চল্‌বার চেষ্টার মত হাস্যকর।"

এবার সঞ্জীব কথা বলিল, "আমাদের দেশের বিভিন্ন সমাজের ভিতরে এতবড় একটা কাজের ক্ষেত্র প'ড়ে রয়েছে তার দিকে ত কর্ম্মীদের দৃষ্টি নেই। হিন্দুসমাজ ব'লে একটা জিনিষ—সেটা ভালই হোক আর মন্দই হোক, এতদিন বেঁচে ছিল। আজ তা, সহরের কথা বাদ দিন, গ্রামেও খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকৃত মানুষ হ'য়ে উঠবার পক্ষে সমাজবদ্ধ হওয়া যে কত উপকারী, তা সকলেই জানেন।"

সেদিন সেই কাপুরুষের মত তাহার হঠাৎ সরিয়া পড়া, সুধীরের মন সঞ্জীবের প্রতি বিরূপ করিয়া রাখিয়াছিল। সে বলিল,—"ইংরেজ সমাজের অন্ধ অনুকরণস্পৃহা আমাদের সমাজের যুবকদের মাথা খুরিয়ে দিয়েছে। তাদের মনের বর্ত্তমান অবস্থায়, তারা সমাজ-বন্ধনের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে থাকতে রাজী নয়। আবার সেই গণ্ডী থেকে বেরিয়ে ব্রাহ্মসমাজের উদারতার মধ্যে আশ্রয় নেবার মত মনের বলেরও অভাব। এইরূপ "ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবে মাঝামাঝি-পথে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কাব্যহিসাবে যতই সুন্দর হোক্, জীবনে তাতে অনেক পিছিয়ে পড়তে হয়। আর সামাজিক জীবনের দায়িত্বের গুরুত্ব তাদের কাঁধে নিতে হয় না ব'লে তারা জীবনটা তরলভাবে হেসে-খেলে কাটিয়ে দেয়। মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব যেটা তাকে অর্জ্জন ক'রে নিতে হয়, ভগবান-দত্ত বুদ্ধি-বিবেচনার সদ্ব্যবহার ক'রে।"

অশোক বলিল, "সুধীর, তুমি কেবল বুদ্ধি-বিবেচনার বড়াই কর। ভগবানের বিধানের কাছে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ত mere child's play! তার চেয়ে যেটার চর্চ্চা করলে তাঁর কাজ অনেকটা করা হয়, সেই হৃদয়টার সদ্ব্যবহার করলে হয় না?"

"হৃদয়টা মানুষের নিজস্ব ব'লে, অনেক সময়ে, সেটা সে যাকে-তাকে দিয়ে থাকে। তখন আর কোনো বড় কাজ করবার জন্যে তার স্বাধীন ক্ষমতা থাকে না।" বলিয়া সুধীর অশোকের পানে চোখের কোণ দিয়া চাহিয়া মৃদু হাসিল।

অশোক বলিল, "হৃদয় কি কাউকে দিয়ে কেউ ফুরিয়ে ফেলতে পারে? বিদ্যার মত 'এই ধন চোরে নাহি নিতে পারে কেড়ে, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে!' আর আমরা যখন কর্ত্তব্য ভেবে দেশের জন্য আত্মদান করি—তাতে সব সময়ে প্রাণ থাকে না। কিন্তু যখন হৃদয়ের প্রেরণায় দান করি,—সে-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।"

হরমোহনবাবু মনোযোগের সহিত শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যেন আমার মনের কথাটি টেনে বলেছ অশোক! বাস্তবিক হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করা যায় না, হৃদয়ের কাছে চাইলে পাওয়া যায় না, এমন জিনিষ পৃথিবীতে নেই।"

এই সময়ে ইন্দুলেখা আসিয়া সঞ্জীবকে মৃদুস্বরে বলিল, "যাবার সময় আমার পড়বার ঘর হ'য়ে যাবেন,—আপনার সেই কলেজের নোটগুলো ফেরত দেব।"

সঞ্জীব বলিল, "আচ্ছা, আমি আস্‌ছি।"

সুধীর সহসা চঞ্চল হইয়া, অসহায়ভাবে নড়িয়া বসিল।

অশোক বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিল, দেশপ্রেমিক সুধীরের মুখে দেশ-উদ্ধারের সেই উৎসাহ-মাতা অন্তর্হিত হইয়াছে; তার পরিবর্ত্তে এক ঈর্ষ্যা-ক্রূর, অথচ আশাহীন, অবসাদভরা দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নিষ্কৃতি আসিয়া ইন্দুলেখা বলিল, "আপনার এই রুমাল-ক'খানা সেলাই করেছি সঞ্জীববাবু, আর এই মাথার বালিশের ঢাকনাটা—"

সঞ্জীব অনুযোগের সুরে বলিল, "তোমার চশমার আবার power বাড়াতে হবে দেখছি। কেন তুমি এত কষ্ট ক'রে কাপড়ের উপর সূক্ষ্ম রেশমের কাজ করেছ—ফুল তুলেছ? প্রতিদিনকার ব্যবহারের জিনিষ ত প্রয়োজন মেটাবার জন্যে—তাতেও শিল্পের সূক্ষ্ম কাজ চাই? আর এসবের এত দরকার ছিল কি বল ত, ইন্দু? নাঃ, তোমরা মেয়েরা ভারি সেন্টিমেন্টাল!"

ইন্দুলেখা লজ্জায় লাল হইয়া, হাসিতরা মধুর সুরে বলিল, "আপনার জন্যে কিছু কষ্ট করলে যদি আমার আনন্দ হয়, তা থেকে বঞ্চিত করবার ত আপনার কোনো অধিকার নেই!"

সঞ্জীব তাহার সরলতা, স্নিগ্ধতায় চমৎকৃত হইয়া বাড়ী ফিরিল।

সেদিনের মত আজ আর সঞ্জীবের মনে কোনো অনুতাপ বা ক্ষোভ ছিল না। রাত্রে বিছানায় শুইয়া, সঞ্জীব যেন কার নিপুণ হস্তের সেবার সোহাগ কোমল স্পর্শ পাইল—আর তার পশ্চাতে ছিল কার স্নিগ্ধ মধুমাখা হৃদয়খানি! কার মনের ভালোবাসার স্পর্শ তার মনকে সেই সেদিনকার আনন্দময় স্মৃতির মত জড়াইয়া ধরিল—মাদকতায় তাহাকে

উন্মাদ করিল—উত্তেজনায় তাহার মাথার শিরা দপদপ করিতে লাগিল।

ঘুম না আসায় উঠিয়া ল্যাম্প জ্বালাইয়া সে ভাবিল, পড়ি। কিন্তু নীরস শারীরতত্ত্ব, মানবদেহের জঘন্য ব্যাধি, তাহার বিচিত্র লক্ষণ ও সমাধানের মধ্যে সে যেন হাসপাতালের উৎকট গন্ধ পাইতে লাগিল। সে বিরক্ত হইয়া বই বন্ধ করিল। জঘন্য-ব্যাধি তাহার কোনকালে ছিল না,—আজ নিজের হঠাৎ-পরিবর্তনের আভাস পাইয়া সে বিস্মিত হইল।

আয়ুতে তাহার আনন্দ-উন্মাদনার ঢেউ লাগিয়াছিল, তাহার ঘুমাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। ঢাকনাটি বালিশের উপর বিছাইয়া দিয়া সে যেন এসেন্সের দৃঢ় সৌরভের আভাস পাইল। তার উপর মাথা রাখিয়া রেশমীসুতার তোলা ফুলগুলির উপর হাত বুলাইল। তাহার উপর মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িয়া থাকিল। নিজের পাগলামিতে তাহার হাসি আসিল। আর সে খানিক ভাবিয়া একমুহূর্ত্তে ঠিক করিয়া ফেলিল যে সে ইন্দুকেই বিবাহ করিবে। ল্যাম্পের শিখা উস্কাইয়া দিয়া, উঠিয়া বসিয়া সে বিশেশ্বরীকে একখানি পত্র লিখিল,—মন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল।

তখন সে আবার শুইয়া পড়িয়া পকেট হইতে খবরের কাগজে মোড়া রুমালগুলি বাহির করিল। সাদা নয়ানসুকের জমির কোণে রেশমের সূক্ষ্ম একটি লতার উপরে একটি ছোট ফুল —প্রত্যেক রুমালের ফুল এক এক রকমের এবং নানা রংয়ের রেশমের। সেগুলি সে পরম যত্নে ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিল; আর তার বদলে ইন্দুলেখাকে কি একটা উপহার দেওয়া যাইতে পারে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ।

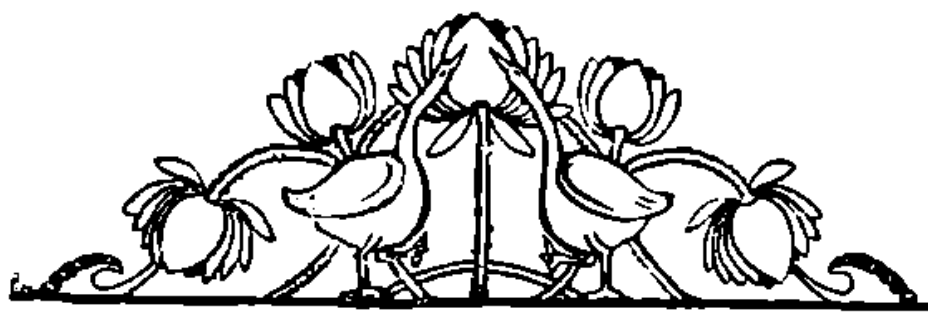

খেলা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

হরিণ-শিকার—খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৮ হইতে ৪০ জন। ক্ষেত্র চক্রাকার কিম্বা চতুষ্কোণ। ক্ষেত্রের পরিমাণ খেলোয়াড়ের সংখ্যাদ্বারা নিরূপিত হইবে। সমান-সংখ্যক দুই দল খেলোয়াড়ের একদল 'হরিণ' আর একদল 'শিকারী।' প্রথমে 'হরিণ' দল ক্ষেত্রের মধ্যে থাকিবে। শিকারীদের মধ্যে দলপতি একটি টেনিস্ 'বল' বা ঐ-জাতীয় অন্য কোন নরম 'বল' লইয়া ক্ষেত্রের বাহিরে থাকিবে। বাঁশী কিম্বা অন্য কোন সঙ্কেতমাত্র শিকারী 'হরিণ'দিগকে বল দ্বারা মারিতে থাকিবে। হরিণেরা চেষ্টা করিবে যাহাতে বল গায়ে না লাগে। যদি কাহারও গায়ে বল লাগে তবে সে মরিবে এবং অন্যান্য শিকারী যাহারা এতক্ষণ বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন আসিয়া শিকারীর সঙ্গে যোগ দিবে এবং দুইজনে মারিতে থাকিবে। এইরূপে যত হরিণ মরিবে শিকারী তত বাড়িতে থাকিবে। নির্দ্ধারিত কাল অতিবাহিত হইলে শিকারীর দল 'হরিণ' হইয়া ভিতরে যাইবে, হরিণের দল 'শিকারী' হইয়া বাহিরে থাকিবে এবং পূর্ব্বের নিয়মে মারিতে থাকিবে। নির্দ্ধারিত সময়ান্তে যে দলে বেশী 'হরিণ' জীবিত থাকিবে, তাহারা জয়ী। ইচ্ছা করিলে সমস্ত শিকারীই একসঙ্গে 'হরিণ' মারিতে পারে; তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র খেলা শেষ হইবে।

রুষ-জাপান—খেলোয়াড়ের সংখ্যা ১০ হইতে ১০০ জন। ক্ষেত্রের পরিমাণ ৬০ ফুট লম্বা, ১৫ ফুট প্রস্থ। ক্ষেত্রের মধ্যস্থানে ৩ ফুট পরিমিত স্থান রেখা দ্বারা আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। দুইদল খেলোয়াড় ক্ষেত্রের দুই দিকের দুই অংশে থাকিবে : তারপর একটি অথবা খেলোয়াড়-সংখ্যা অধিক হইলে একাধিক টেনিস্ 'বল' অথবা ঐ জাতীয় নরম অন্য 'বল' দিয়া একদল অন্য দলকে মারিতে থাকিবে। যাহার গায়ে 'বল' লাগিবে সে মরিবে। 'বল' মাটিতে পড়ার পূর্ব্বে যে ধরিবে সে মরিবে। মাটিতে লাগার পর যদি কাহারও গায়ে 'বল' লাগে তবে সে মরিবে না। এইরূপে নির্দ্ধারিত-কাল খেলার পর যে দলে অধিক লোক জীবিত থাকিবে তাহারা জয়ী।

হুলু-গরু—যে কোনও রকম "বলের" সাহায্যে এই খেলা খেলিতে পারা যায়। খেলোয়াড়-সংখ্যা ১০ হইতে ৩০ জন।

ছেলেরা সকলে বৃত্তাকারে দাঁড়াইবে। প্রতি দুই-জনের মধ্যে অন্ততঃ ১ হাত ব্যবধান থাকা প্রয়োজন। একজন ছেলে "বল"টি হাতে লইয়া বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে থাকিবে। খেলা আরম্ভ হইলে সে তাহার চারিদিকের ছেলেদের কাহারও দিকে বলটি ছুড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ পলাইয়া বৃত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। যাহার দিকে বলটি নিক্ষিপ্ত হইবে সে বলটি ধরিয়া অবিলম্বে কেন্দ্রস্থানে

মাটিতে রাখিয়া পলাতককে ছুঁইবার জন্য পাছে পাছে ছুটিবে। যদি তাহার হাতে ধরা পড়িবার পূর্ব্বে পলাতক আসিয়া "বল"টি ছুঁইয়া ফেলিতে পারে তাহা হইলে তাহার সঙ্গে পলাতকের স্থান-বিনিময় হইবে; নতুবা পলাতককেই আবার বল ছুড়িতে হইবে।

ঘোড়শোয়ার—ঘোড়া এবং শোয়ার দশ-দশ জনে একটি বড় বৃত্ত করিয়া দাঁড়াইবে এবং শোয়ারদের দলপতির নিকট একটি টেনিস্ 'বল্' থাকিবে। সঙ্কেত-মাত্র দলপতি তাহার ডান দিকের শোয়ারের নিকট 'বল' ছুড়িয়া দিবে, সে তাহার ডান দিকের শোয়ারের নিকট দিবে, এই ভাবে চলিতে থাকিবে; কিন্তু যদি কোন শোয়ার 'বল্' ধরিতে না পারে অর্থাৎ 'বল্' মাটিতে পড়িয়া যায়, তবে নিকটবর্ত্তী ঘোড়া সেই 'বল্' তুলিয়া নিয়া যে-কোন শোয়ারের গায়ে ছুড়িয়া দিবে। 'বল্' যদি শোয়ারের গায়ে লাগে তবে শোয়ার-দল ঘোড়া হইবে, আর ঘোড়ার দল শোয়ার হইবে। ঘোড়ার হাতে 'বল' যাওয়া মাত্র শোয়ার-গণ লাফাইয়া নামিয়া দৌড়াইতে পারে—যাহাতে 'বল' গায়ে না লাগে। ঘোড়া 'বল্' ছুড়িলে যদি কোন শোয়ারের গায়ে না লাগে এবং কোন শোয়ার 'বল্' নিতে পারে তবে ঘোড়ার দল ঘোড়াই থাকিবে, শোয়ারেরা আবার পিঠে চড়িয়া বসিবে।

হুঁসিয়ার—খেলোয়াড়-সংখ্যা ৩ হইতে ২০ জন। যতজন খেলা করিবে এক-সারিতে ততগুলি গর্ত্ত করিয়া লইতে হইবে (বৃত্ত আঁকিয়া লইলেও চলিতে পারে); গর্ত্তগুলির ব্যাস অর্দ্ধহস্তের অধিক হইবে না। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য একটি গর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। গর্ত্তের সারি হইতে ১৫ বা ২০ ফুট দূরে খেলোয়াড়েরা শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দাঁড়াইলে তন্মধ্যে একজন একটি বল (ইট, কাঠ বা পাথরের টুকরাতেও হয়) যে-কোন একটি গর্ত্তের মধ্যে ফেলিতে চেষ্টা করিবে। যাহার গর্ত্তে বল পড়িবে সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পলাইবে এবং অন্য সকলে তাহাকে ধরিবার জন্য পাছে পাছে ছুটিবে। যদি কেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সে তাহার গর্ত্তে যাইয়া পৌঁছিতে পারে তাহা হইলে সে নিষ্কৃতি পাইল। কিন্তু তার আগে ধরা পড়িয়া গেলে, নূতনভাবে আবার খেলা আরম্ভ হইবে এবং গর্ত্তে বল ফেলিবার ভার তার উপরে পড়িবে। সে ধরা না পড়িলে যে প্রথম বল ছুড়িয়াছিল, আবারও সে-ই বল ছুড়িবে।

ক্রমশঃ

চন্দ্রকুমারী

শ্রী সন্তোষকুমার সরকার

(　　)

এদিকে চন্দ্রকুমারীর যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে রাক্ষসটা বাড়ী এল। বুড়ী বল্লে, "তোর আজ এত দেরী হ'ল যে হতচ্ছাড়া,—শিকার বুঝি ক'রে গেল! এতক্ষণ একটা মেয়ে এখানে ছিল—কেমন তার নধর চেহারা! আমি তাকে অনেকক্ষণ আট্‌কে রেখেছিলুম। এখন আর কি করবো—কি খাবি, খা!"

রাক্ষসটা মায়ের কথা শুনে বল্লে, "কোন্ পথে সে গেছে—শীগ্‌গির বল্—আমি তাকে খুঁজে বের করবই।"

বুড়ী আঙুল বাড়িয়ে বল্লে, "এই পথ দিয়ে গেছে। তবে আমার সঙ্গে চালাকি নয়, আমি তাকে এক-খ'লে মটর দিয়েছি। সেটা ছেঁড়া খলে—নিশ্চয়ই রাস্তায় পড়তে পড়তে গেছে। মটর দেখে-দেখে যা, নিশ্চয়ই তার সন্ধান পাবি।"

রাক্ষস আর দেরী না ক'রে বেরিয়ে পড়ল। পথে এসে দেখলে রাস্তায় মটর প'ড়ে রয়েছে। সে মটর লক্ষ্য ক'রে যেতে লাগলো। যেতে যেতে সে গাছের কাছেই উপস্থিত। তারপর আর মটর নেই। এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে তার নজর পড়ল গাছের ওপর—দেখতে পেলে একটা ঘর। গাছের ওপর ঘর! সে তাড়-তাড়ি গাছ বেয়ে একবারে ঘরের দরজায় এসে হাজির। দরজা-জানালা বন্ধ। সে দরজা খোল্‌বার জন্য খুব চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই খুলতে পারে না। তখন সরু গলা করে বল্লে, "বাছা, আমি ঈগল পাখী—দরজা খুলে দাও! গোলাপফুল এনেছি।"

কিন্তু চন্দ্রকুমারী তখন ঘরের ভিতর ঘুমুচ্ছে,—রাক্ষসের কথা শুনতেই পেলে না। রাক্ষসটা দরজা ভাঙবার জন্য চেষ্টা করতে লাগ্‌লো—তার হাতের ছুরির মত একটা ধারাল নখ কাঠে বিঁধে গিয়ে ভেঙে গেল। যখন দেখলে দরজা খোলা গেল না—তখন আর কি করবে, হতাশ হ'য়ে সে ফিরে গেল।

তার পরদিন সকালে, চন্দ্রকুমারী যেই না দরজা খুলতে যাবে অমি সেই রাক্ষসের নখটা তার আঙুলে বিঁধে গেল—উঃ! কি বিষাক্ত নখ! সে যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে ঘরের মেঝের 'পরে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেল। এমন সময় ঈগল পাখী গোলাপফুল নিয়ে উপস্থিত। দরজা খুলে দেখলে—চন্দ্রকুমারী মেঝেতে প'ড়ে। ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারে না:—তাকে জাগাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করতে লাগলো:—কিন্তু কিছুতেই জাগাতে পারলে না। কি আর করবে গোলাপফুলগুলো চন্দ্রকুমারীর খোঁপায় গুঁজে দিয়ে সে মনের দুঃখে আকাশে উড়ে গেল।

এই ঘটনার পরদিন এক রাজা মৃগয়া কর্ত্তে এসে ঐ গাছতলায় তাঁবু খাটালেন। সঙ্গে তাঁর লোকজন অনেক। হঠাৎ রাজার ঐ গাছের ওপর নজর পড়ল। দেখতে পেলেন ওপর-ডালে একটা কাঠের ঘর রয়েছে। রাজার ভারি কৌতূহল হ'ল। তিনি একজন পার্শ্বচরকে ডেকে বল্লেন, "দেখ ত, ঐ ঘরের ভিতর কে আছে?"

পার্শ্বচর গাছে উঠ্‌ল—তারপর নেমে এসে বল্লে, "রাজা মশাই! এটা একটা ছোট কাঠের ঘর—অনেকটা খাঁচার মত দেখতে। ঘরের দুটো দরজা—আর দুটো জান্‌লা। একটি খুব সুন্দরী মেয়ে ঘরের মেঝের উপর ম'রে প'ড়ে রয়েছে।"

রাজা এই কথা শুনে খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। পার্শ্বচরকে বল্লেন, "মেয়েটিকে গাছ থেকে নামিয়ে আন।"

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটিকে নামান হ'ল। রাজা তাকে দেখে খুব দুঃখিত হ'লেন। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন—ঠাণ্ডা! তবে দেহটা তখনো তাজা আছে। রাজার লোকেরা মেয়েটিকে ঘিরে দাঁড়াল। তারা অবাক হ'য়ে গেল। রাজা বল্লেন, "না—মেয়েটি এখনও মরেনি, মেয়ের মধ্যে প্রাণ আছে।"

হঠাৎ চোখে পড়লো মেয়েটির আঙুলে কি একটা ছুরির ফলার মত ফুটে রয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি সেটা জোর ক'রে টেনে বের করলেন। অমনি মেয়েটি ন'ড়ে উঠলো—ঘুম থেকে যেন জেগে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বস্‌ল। রাজা আর তাঁর সঙ্গীরা এই ব্যাপার দেখে সবাই অবাক! মেয়েটিও এত লোক দেখে বল্লে, "আমি কোথায়? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! কে আমায় গাছ থেকে নামিয়ে আন্‌লে?

রাজা বল্‌লেন, "সুন্দরী! তুমি স্বপ্ন দেখনি। আমি এই দেশের রাজা। আমার লোকজনেরা তোমায় গাছ থেকে নামিয়ে এনেচে। তুমি তোমার পরিচয় দাও ত?"

চন্দ্রকুমারী ধীরে ধীরে বল্লে, "আমি ঈগলপাখীর মেয়ে।"

রাজা অমি বাধা দিয়ে বল্লেন, "না না তা হ'তেই পারে না—পাখীর আবার মেয়ে হয়? তুমি নিশ্চয়ই কোন রাজার মেয়ে!"

চন্দ্রকুমারী বল্লে, "না মহারাজ! আমি রাজার মেয়ে নই—সত্যি আমি ঈগলপাখীর মেয়ে। এই গাছে অনেক দিন ধ'রে বাস কচ্ছি। আমার নাম চন্দ্রকুমারী।"

রাজা মেয়েটির হাত ধ'রে বল্লেন, "ঈগলপাখীর মেয়ে হ'লেও তুমি রাজকন্যা। আমি তোমায় রাণী করবো। তোমার কি মত?"

চন্দ্রকুমারী লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠলো। কিছুক্ষণ পরে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে—"আচ্ছা!"

যথাসময়ে রাজা চন্দ্রকুমারীকে বিয়ে করলেন। রাজার মা-বোনেরা চন্দ্রকুমারীকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হ'য়ে গেল। এমন সুন্দর মেয়ে তারা দেখেনি। কেবল একটি জনের পিত্তি জ্বলে গেল। চন্দ্রকুমারীকে দেখে পর্য্যন্ত তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো—হিংসের আর তার ঘুম হয় না! কে সে?—রাজার বড় রাণী।

ক্রমশঃ

বৌ কথা কও

শ্রী অক্রূরচন্দ্র ধর

বৌ কথা কও, আজি বৌ কথা কও,
আপনার শক্তিতে জাগ্রত হও।
আছে দেহ-মন-প্রাণ,
বুদ্ধি-বিবেক-জ্ঞান,
তবে কেন গৃহকোণে বন্দিনী রও?

পুরুষের ভোগানলে দিতে ইন্ধন
নহে এত রূপগুণ-যৌবনধন।
তুমি নারী ধরণীর
সম্পদ, জয়শ্রীর
উৎস; এ কথা কেন বিস্মৃত হও?

ভুলে যাও কেন নারী "তুমি বিশ্বের
অর্দ্ধ শকতি?"—গাহে দূর অতীতের
ইতিহাস সেই গান
পঞ্চমে তুলে' তান;
তুমি দেবী,—সংসারে দাসী কভু নও।

ম'রে আছ সোনা, রূপা, মণিমুক্তার
মোহময় বন্ধনে; বক্ষে তোমার
নেই আজ নেই নেই
আশা-ভাষা কিছু সেই,—
পর্দ্দার পিছে তুমি শুম্ হ'য়ে রও।

চির অবরোধ, চির লাঞ্ছনা, আর
গঞ্জনা কেড়ে নিল শক্তি তোমার;
শিক্ষাতে তুমি পিছে—
স্বাস্থ্যেতে তুমি নীচে—
কোনরূপে জীবনের বোঝাপানি বও।

সম্মুখে আসে ঐ মুক্তির দিন—
থাকিবে না কেহ কারো বন্দী অধীন;
নারী তুমি আপনার
শক্তিতে এইবার
নির্ভর কর স্বয়া,—নির্ভয় হও।

ছিঁড়ে ফেলো মোটার বন্ধন-পাশ,
কারা ভেঙে মুক্তির ফেলো নিশ্বাস;
মানুষের অধিকার
কেড়ে নিবে কে তোমার?
কড়া-ক্রান্তিতে আজি ভাগ ক'রে লও—

বিধাতার দত্ত যে আছে তব ধন;
—গ'ড়ে তোল ধরণীতে নব নন্দন।
পাপতাপ জর-লাজ
অপনীত হোক আজ,—
চুপ্ ক'রে থেকো নাকো, কও কথা কও!

শিক্ষয়িত্রীদের সামাজিক জীবন

শ্রীমতী নীরজবাসিনী সোম বি-এ, বি-টি

আমার এখনকার আলোচ্য বিষয় শিক্ষয়িত্রীদের সামাজিক জীবন। আমাদের এদেশে সামাজিক জীবনের উৎকর্ষসাধন বা তাহার পরিপুষ্টির চেষ্টা বড় ছিল না। ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আমরা সজাগ ও সচেষ্ট থাকিলেও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে আমরা কতকটা উদাস হইয়াই ছিলাম। ধর্ম্ম আমাদের এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে জীবনের গতীরতম প্রদেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। সেটা আমাদের আভ্যন্তরীণ, সে বিষয়ে আমরা কোনদিনই উদাস নই। বরং আজকাল এ বিংশশতাব্দীতে বুঝি বা আমরা সেদিকে কিছু শিথিল হইয়া পড়িতেছি। ভগবান সে অধোগতি হইতে আমাদের রক্ষা করুন।

কর্ম্ম লইয়া আজকাল আমরা বড়ই বিব্রত। জীবনটা কর্ম্মময় হউক ইহাই আজকাল যেন আমাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ লক্ষ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার আমার কিছুই নাই। কিন্তু এই কর্ম্মের ধারা বাড়াইতে গিয়া যদি জীবনের অন্য স্তরগুলি কমাইয়া দিই বা সেদিকে ঠিকমত লক্ষ্য না রাখি, তবে ত জীবন অসম্পূর্ণ ও অকেজো হইয়া পড়িবে। জীবনের পূর্ণতা ও সফলতা সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টিতেই ত পরিলক্ষিত হয়, তাই শিক্ষয়িত্রীদের সামাজিক জীবনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহারই বিষয় দু'চারটি কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

শিক্ষয়িত্রী বলিতেই কলিকাতা, ঢাকা বা তার মত বড় বড় সহরগুলি ছাড়াইয়া আমার চিন্তা ও দৃষ্টি সেই সুদূর মফঃস্বলের প্রতি ও তথাকার পল্লীবাসিনীদের প্রতি ধাবিত হয়। সেখানে যাহারা বিরাট জনস্রোত ও কলরবের বাহিরে থাকে তাহাদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা হয়। আমার জীবনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট দীর্ঘ ১০-১২ বৎসর কাল এই পল্লীরাজ্যের আশে-পাশে, মাঝে-মধ্যে কাটিয়াছে বলিয়াই সেখানে যে কত অভাব, কত অসুবিধা, কত বাধা, কত বিঘ্ন, তা আমার খুব ভালমত জানা আছে; তাই সেই সব শিক্ষয়িত্রীদের কথা মনে রাখিয়া আপনাদের কাছে আমার আরজী পেশ করিব।

আমরা কেহ সংসারে একা দাঁড়াইয়া নই। এই সত্যটা যদি উপলব্ধি করি, তবে সমাজের বা আর পাঁচজনের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ তাহা তুলিতে চলিবে কেন? কর্ম্মময় ও ধর্ম্মময় জীবনেও ত অবসর আছে ও চাই। সেই অবসর-কালটা একা না থাকিয়া পাঁচজনের সংস্পর্শে ও পাঁচজনের মঙ্গলের জন্য কি ভাবে ব্যয়িত হইতে পারে তাহাও চিন্তা করিতে হইবে। নতুবা জীবনের একদিকটা অপরিপুষ্ট অথবা অপব্যয়িত হইবে, আর তাহাই এখন হইতেছে এখন কথা হইতেছে, কিপ্রকারে আমরা শিক্ষয়িত্রীদের জীবনের এদিকটা জাগাইয়া তুলিতে পারি?

শিক্ষয়িত্রীদের জীবনের সারাদিনের অধিকাংশ সময় যায় তাদের বিদ্যালয়ের কাজে। এ সময়টায় হাত দিলে আমাদের চলিবে না। কিন্তু—তারপর? কাজের পরে যে সময়টুকু তাদের অবসর সে সময়টুকুর কিপ্রকার সদ্ব্যবহার তারা করে বা করিতে পারে তাহাই চিন্তনীয়।

এবিষয়ে বাধা বিঘ্ন অনেক—বিশেষ ঐ মফঃস্বলে বা গ্রামে। প্রথমতঃ, শিক্ষয়িত্রীর পেশাটা এখনও সেভাবে মর্য্যাদাযুক্ত হয় নাই। মনে রাখিবেন, আমি বড় বড় সহরের কথা বলিতেছি না। কিন্তু গ্রামের মধ্যে এখনও শিক্ষয়িত্রী বা কর্ম্মচারিণীদিগকে "পুঁটানী", "রেন্ড" বা "খেটে খাওয়া জাত" বলিয়াই অভিহিত করা হয়। এই খেটে খাওয়া জাতের সঙ্গে সকলে সেভাবে ওঠাবসা করেন না। তাদের কেমন যেন একটু হেয় ভাবেই দেখেন। গিন্নীদের আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব কোনও প্রকার সামাজিক সখ্যতা-স্থাপনের প্রতিকূল। কর্ত্তাদের মমতা বা বন্ধুতা অনেকস্থলে অকল্যাণকর ও দূষণীয় হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই আমাদের শিক্ষয়িত্রীদের সামাজিক জীবনের দিকটা ক্রমশঃ শূন্য, শুষ্ক ও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। ফলে কেহ কেহ

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির

সহঃ সভানেত্রী

শ্রীমতী নীরজবাসিনী সোম, বি, এ, বি, টি।

একটা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া মনের ও শরীরের স্ফূর্তি হারাইয়া নিতান্ত নীরস ও অপ্রশস্ত জীবন যাপন করে। আবার কেহ বা একটা প্রশস্ত আলোকময় পথ খুঁজিতে গিয়া পথ হারাইয়া অন্ধকার ও বিপদের মধ্যে গিয়া পড়ে। তাদের পরিণাম আরো ভয়াবহ। এ অবস্থায় সামাজিক জীবনের পরিপুষ্টি বা বৃদ্ধি সম্ভবপর সম্ভব নাই। তবে ব্যবস্থা কি?

প্রথমতঃ, শিক্ষয়িত্রীদের উপর ইহার ব্যবস্থা কতকটা নির্ভর করে। তাদের আচারব্যবহার, হাবভাব, চলন-বলন এমন হওয়া চাই যাতে সমাজবাসী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাদের ও তাদের কাজকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন। এ অবস্থা হইতে আর খুব বেশী দেরী নাই। আর একটু ধৈর্য্য, আর একটু অধ্যবসায়, আর একটু চরিত্রবল দেখাইতে পারিলেই আমরা দেশের ও দশের কাছে আর নিন্দার বা অশ্রদ্ধার কারণ হইয়া থাকিব না। সমাজে শিক্ষয়িত্রীদের একটা সম্মানব্যঞ্জক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। এ স্থান অধিকৃত হইলে শিক্ষয়িত্রীদের সামাজিক অবস্থা আপনা হইতেই অনেক উন্নত হইবে। কিন্তু তার আগে আমাদের কিছু করণীয় আছে। এ সম্বন্ধে আমার দু'একটি প্রস্তাব আছে—প্রথম, যে সমস্ত শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যস্থান বড় বড় সহরে তারা প্রত্যেকে যদি একজন মফঃস্বল বা পল্লী-বাসিনী শিক্ষয়িত্রীর সহিত নিয়মিত সম্বন্ধ বা সখ্যতা স্থাপন করে, চিঠিপত্রের আদানপ্রদানে মফঃস্বলবাসীদের সহিত একটা সন্ধিসূত্র গাঁথিয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে, তাহা হইলে ঐ বিদেশী মেয়েগুলিকে এত একা, এত বিচ্ছিন্নভাবে দিনপাত করিতে হয় না। এ ব্যবস্থায় অর্থের প্রয়োজন নাই, শুধু পরস্পরের প্রতি টান বা মমতায় ইহা সহজসাধ্য হইয়া উঠিতে পারে, এবং ইহার ফলে সামাজিক জীবনের প্রথম-ধাপ সহজেই বসান যায়।

দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালাদেশের বহু গ্রামে ও সহরে সরোজনলিনী মহিলা-সমিতির যে সুন্দর শাখা স্থাপিত হইয়াছে সেই সকল শাখা-সমিতির সহিত আমাদের শিক্ষয়িত্রীরা যদি সখ্যতা স্থাপন করে তবে উভয়তঃ উপকৃত হইতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয়, কারণ এই সমিতিগুলির মূল উদ্দেশ্য মহিলাদের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন। কাজেই দেশের মেয়েদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে নিজেদিগকে সংযুক্ত করিতে পারিলে সকল বিষয়ে সুবিধা হইবার সম্ভাবনা আছে।

একটি শিক্ষয়িত্রী-সঙ্ঘ (Women Teachers' Association) স্থাপন করা বড়ই প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের শিক্ষয়িত্রীবর্গের সঙ্ঘবদ্ধভাবে একতা-সূত্রে বদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের শিক্ষয়িত্রীদের সামাজিক জীবন পুষ্ট ও ফলপ্রদ করিতে হইলে সমাজে তাহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান চাই। এ স্থান পাইতে হইলে আমাদের সমষ্টিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাই বলিতেছি, একটি "শিক্ষয়িত্রী-সঙ্ঘ" গঠন করুন। তার প্রধান কেন্দ্র (Central Bureau) কলিকাতায় থাকুক এবং একটা বড় শাখা ঢাকায় স্থাপিত হউক। এই সঙ্ঘের অবৈতনিক কার্য্যকরী-সমিতি গঠিত করিয়া কার্য্যপ্রণালী এমনভাবে নির্দ্ধারিত হউক যাহাতে বাঙ্গালার প্রত্যেক গ্রামের ও সহরের শিক্ষয়িত্রীদের সহিত সংযোগ সংস্থাপিত হয়। সঙ্ঘের একজন বেতনভোগী পরিব্রাজিকা-সম্পাদিকা (Travelling Secretary) থাকা দরকার। বাঙ্গালার প্রত্যেক শিক্ষয়িত্রী সামান্য চাঁদা দিয়া এই সঙ্ঘের সভ্য হইবেন এবং তাঁহার সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের অভাব-অভি-যোগের আলাপালাপ করিবেন।

এখন সঙ্ঘের কার্য্য সম্বন্ধে সামান্য দু'একটি ইঙ্গিত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব—

প্রথমতঃ, আজকাল কতক কতক শিক্ষয়িত্রী লইয়া মাঝে মাঝে অবকাশকালে দেশ ভ্রমণ বাহির হইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, সেই প্রথাটির নিয়মিত প্রচলন হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক জেলার ও মহকুমার শিক্ষয়িত্রীগণ যাহাতে এই ব্যবস্থায় যোগদান করিতে সুবিধা পায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। বৎসরে দুইবার এইরূপ একত্রে কোথাও যাইবার ব্যবস্থা হইলে অনেক শিক্ষয়িত্রী সামান্য খরচে তাঁহাদের অবকাশকালটা যাপন করিবার সুবিধা পাইবেন।

দ্বিতীয়তঃ, সঙ্ঘের মুখপত্রস্বরূপ একটি পত্রিকা থাকা দরকার। এই পত্রিকায় শিক্ষয়িত্রীগণ সময় সময় তাঁহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার

বিষয় অন্তকে জানাইয়া অপরের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিবার সুযোগ পাইবে।

অনেক বলিয়াছি, বলিবার আর আমার কিছু নাই, কিন্তু যোহাই আপনাদের এই "কথায় কথায় বড়াই, কথায় বড়াই" করিয়াই যেন আমাদের কর্ত্তব্য শেষ না করি। এত-দিন বক্তৃতার পরে কিছু স্থায়ী লাভ যেন আমাদের হয় এই আমার আপনাদের নিকট বিনীত শেষ-নিবেদন।

Bengal Women's Educational Conference (বঙ্গীয় নারী-শিক্ষাসম্মিলন)-এর চতুর্থ বার্ষিক অধি-বেশনে পঠিত।—জানুয়ারী, ১৯৩০

সাধুমা'র কথা

শ্রী—

আমার মাতাঠাকুরাণী অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন। তাঁর ধৈর্য্য ও দয়ার বিষয় লেখা আমার ন্যায় অক্ষমা কন্যার অসাধ্য। তবে নারায়ণের কৃপায় যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে দেখব। আমার মা'র প্রথমে একটি কন্যা হয়। সেটি জন্মগ্রহণ ক'রে মাত্র ১০ দিন জীবিত ছিল। পরে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম হয়; তাঁর জন্ম হবার পর আমার পিতা-মহী বড় রকমের আনন্দিত হন। তাঁর জন্ম-উপলক্ষে এক মাস নহবৎ বসে, আর দরিদ্রদের অন্নবস্ত্র দান করা হয়। পরে ঐ পৌত্রটির জন্য একটী ধাত্রী নিযুক্ত করেন। ত্রিতলের উপর সযত্নে রেখে তাঁকে পালন করা হয়। এমন কি, আমার মায়েরও কোলে করবার পর্য্যন্ত সাধ্য ছিল না। অবশ্য পাঠকপাঠিকারা বলতে পারেন যে, সে-বিষয় আমি কিরূপে জানলুম? আমার মা'র মুখে সকলই গল্প শুনেছি, সেজন্য লিখছি। যতটুকু সুখ পেলে মানুষ মনে করে অপরিসীম, তা তিনি পেয়েছিলেন। আবার দুঃখও যাকে বলে অপর্য্যাপ্ত, তাও শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে ভোগ করতে হ'য়েছিল। এ দুটির কোনটিতেই মাতাঠাকুরাণীর ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি। তাঁর সুখের কথার কিছু গল্প শুনেছি। তাঁর পিতা সেকালের হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তাঁর পসার বিলক্ষণ ছিল। উপার্জ্জনও বিস্তর করেন; কিন্তু সঞ্চয়ী ছিলেন না। সমস্তই পরিবারবর্গের ও নিজের ভোজন ও সুখবিলাসেব্যয় করেন। আমার মা'কে অতি সুখে ও যত্নে লালনপালন করেন। মাতাঠাকুরাণীর সাত-বছর বয়সে বিবাহের সম্বন্ধ হয়। পানপত্রও খুব সমারোহের সহিত হয়। আর সেইদিন অবধি নিত্যই দুই পক্ষ হ'তে নানারকম বস্ত্র, অলঙ্কার, বিলাসের বস্তু আর নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রীর আদানপ্রদান চলে। পরে দশ বছর বয়সে সমারোহের সহিত বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হয়। নববধূও খুব আদরের সহিত দিনযাপন করেন। কিন্তু এ সুখ অতি অল্প-দিনই রইল। পরে বারো বছর বয়সেই তাঁর প্রথমা কন্যা হ'ল; পরে আবার তেরো বছর বয়সে একটি পুত্র হয়। পুত্রটি হবার পর হ'তেই তাঁর মনোকষ্ট আরম্ভ হয়, কারণ আমার পিতামহীর মেজাজ নতুন ধরণের ছিল। তিনি ঐ ছেলেটিকে মা'র কোলে আদপে দিতেন না। এর কারণ আর কিছু নয়, মৃদু কর্ম্মফল,—সুখের সংসারে দুঃখ—হরিষে বিষাদ। পিতামহীর মনে এই ভাব যে, এ ছেলে মাই রেখে আমি পালন করব; ও মা'র কাছে থেকে আমার প্রতি বেশী ভালবাসা হবে না; এ ছেলে আমাকে মা ব'লে ডাকবে। ফলে হ'লও তাই, কিন্তু মা'র প্রাণ সর্ব্বদাই এক-বার কোলে নেবার জন্য উৎসুক হ'ত। আমার ঠাকুরমা যেদিন বড় বোনের বাড়ী বেড়াতে যেতেন, মা যেন সেদিন একটু আনন্দ পেতেন। ঘরে বস্ত্র-অলঙ্কার-খাদ্যাখাদ্যের, কোন বিলাসের দ্রব্যের কিছুই অভাব ছিল না। তবে সর্ব্বক্ষণ ঘরে রুদ্ধ অবস্থায় থাকাই তাঁর ব্যবস্থা ছিল। আর তার উপর প্রথম কন্যাটি হ'য়ে ম'রে যাওয়ার পরে ছেলেটি হ'ল, তাকে নিয়ে যে একটু আনন্দ করবেন, কি একটু

কোলে নেবেন, তাঁর অদৃষ্টে সেটিও ঘটেনি। ঠাকুরমা'র অনুপস্থিত হওয়া শুনেই মা অমনি আমার দাদাকে একবার ডেকে কোলে নিতেন। একদিন এইরকমে তাঁর স্তন পান করাবার সাধ হয়। সেদিন একেবারে তুমুল কাণ্ড হয়। পুরানো ঝি মা'র কাছে চুপি-চুপি মনস্কাম ক'রে ডেকে এনে "খোকাকে নাও বৌঠাকরুণ" ব'লে দেয়। আবার ঠাকুরমা সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আস্‌তেই পুরানো ঝি সংবাদ দাখিল করেছেন—মা, আজ বৌঠাকরুণ খোকাকে দুধ খাইয়েছেন। আমার পিতামহী স্বর্গগতা দেবী। আমার তাঁর নিন্দা করা যদিও অন্যায় হয়, এটি যদিও মনে আছে, কিন্তু লিখতে গেলে সত্যই লেখা উচিত। তিনি কিছু খোসামোদপ্রিয় লোক ছিলেন, লাগানো কথাটা খুব শুনতেন। এদিকে তিনি বিদ্যাবতী ও গুণবতী ছিলেন। এমন কি, আমার পিতামহ যখন বায়ুরোগে পীড়িত ছিলেন, তখন তিনি নিজে জমিদারী-সংক্রান্ত কাজ পর্য্যন্ত দেখতেন। কিন্তু ঐদিন ঐ কারণে আমার মা'র বিস্তর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। ছেলে কোলে নেওয়া সেদিন থেকেই বন্ধ হ'য়ে যায়। ঝির প্রতি কড়া হুকুম জারি হয়—খবরদার আর কখনও খোকা দোতলায় না যায়, ও ছেলেকে মেরে' ফেল্‌বে। এখনকার বৌরিরা কেমন গানবাজনা করে, স্বচ্ছন্দে সুখে বেড়ায়; কিন্তু আমার মা ঘরের বারাণ্ডায় বেরুতে পারেন নি, মনের কষ্টেই দিন গত হ'য়েছে। যদি কোনদিন ঠাকুরমা খোকাকেও বেড়াতে যেতেন, তবে একবার উঠান দেখবার সাধ হ'ত, বেরিয়ে দেখতেন, ও মনে কত আনন্দ হ'ত। তবু রাস্তা কি গাড়ীঘোড়া দেখবার সম্পর্কও ছিল না। এ উঠানে কি আছে? আছে একটি বোজানো পাতকুয়া, আর একটি জলযুক্ত কূয়া। বৃহৎ উঠান, তিন দিকে রোয়াক, আর একদিকে চৌতালা-সমান প্রাচীর। এই দৃশ্য দেখতে মা'র বাসনা হ'ত। আমার এ গল্প শুনে বড় আক্ষেপ হয়। পরে আরও শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, একদিন ঠাকুরমা তাঁর দাসীর বাড়ী গেলেন মা অমনি উঠান দেখতে বেরিয়েছেন। একটি দাসীর মেয়ে ছিল, তার সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করছেন; একটু পরে উঠে আবার কূয়া ও উঠান দেখছেন। এমন সময় আবার ঠাকুরমা এসে পড়েছেন। তখন ঘরি হাড়িয়ে ঘরে যান, তা হ'লে নীচে থেকে দেখা যায়। অগত্যা কি করেন, চুপ্ ক'রে ব'সে প'ড়ে, অমনি শুয়ে প'ড়ে গড়াতে গড়াতে ঘরে যান। এইরূপ নানাপ্রকার মানসিক কষ্টে কাল-যাপন করেন। পরে আমার জন্ম হয়, ও খুব আনন্দোৎসব হয়। ঠাকুরমা খুব ভালও বাসতেন, তবে দাদার মত নয়। সেজন্য আমার পালনভার মায়ের উপরেই ছিল। আমার কাজে একটি চাকর ও একটি ঝি ছিল, আর ঠাকুরমা'র ও ঠাকুরদাদার দৃষ্টি অষ্টপ্রহর ছিল।

আমার পিতামহী ত্রিতলের উপর শুতেন। যখন আমার পিতামহের পাওয়া হ'য়ে যেত, পরে তিনিও আহার ক'রে উপরে যেতেন। দোতলার ঘরে ঝি চাবি বন্ধ ক'রে, আমার পিতামাতার সংবাদ এনে দিত। পরে ঠাকুরের প্রণামী বেলফুলের 'গড়ে', মিঠা পানের বোনা, রূপার জলের মালা, গামছা, জলের রূপার ঘটি, আর একজন লণ্ঠন নিত। এই সকল অনুষ্ঠান সমাপন ক'রে, পরে তেতলায় উঠ্‌তেন। আমরা ঠাকুরমা'কে দিদিমা ব'লে ডাকতুম, ঠাকুরদাদাকে কর্ত্তামণি ব'লে ডাকতুম, এখন হ'তে সেই নামেই অভিহিত করব।

ভোরবেলা আমি ভূমিষ্ঠ হই। খুব আনন্দ হ'তে লাগ্‌ল। বাজনার বাড়ী ও'য়ে উঠল। ছেলের কোলে মেয়ে হলুম কিনা! আর লোকে বলে যে, আমার নাকি একটু রূপলাবণ্যও হ'য়েছিল। আমাদের এক কবিরাজ-মহাশয় ছিলেন। তিনি রোজ প্রাতঃকালে ও বৈকালে দুইবার সব বাড়ী একবার একবার ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতেন, কে কেমন আছে। বাবুরা ও মায়েরা শুধু প্রণাম নিয়েই ক্ষান্ত হ'তেন, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলি ও দাসদাসী সকলেই—কেউ কবিরাজদাদা ও ছেলে ব'লে আবদার করত আর হাত দেখাত। আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন দু'বছরের, আমি কবিরাজ ছেলেকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির ক'রে তুলতুম। আর মিছে ক'রে বলতুম—ছেলে, আজ আমার বড় গায়ে ব্যথা। মাথা ধরেছে বল্‌লেই বলতেন—হাত দেখি, হুঁ, নাড়ি চঞ্চল, আজ আর ভাত নয়। আমরা তখন হাস্‌তে লাগতুম। আমি ও আমার দাদা দু'জনেই কবিরাজ-ছেলেকে নিয়ে এইরূপ আনন্দ করতুম। কিন্তু ছেলে এত

ভালমানুষ ছিলেন যে, এতে কোনদিন তাঁর একটু রাগ বা বিরক্তির ভাব দেখতে পাইনি। তিনি থাকতেন আর খেতেন আমাদের বাড়ীর আর এক অংশে, আমার পিতার ছোটকাকিমার কাছে, আমার ছোটদিদিমার বাড়ীতে। বাড়ীটি প্রকাণ্ড সাতমহল ছিল। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, বৃহৎ পরিবার হ'লেই ক্রমে ক্রমে খুঁটিনাটি সামান্য কারণে পৃথক হ'য়ে পড়ে। এঁরাও এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত হন। আমার পিতামহরা তিন ভাই ছিলেন। আমার কর্ত্তামণি বেঁচে ছিলেন। এঁরা দুজনে সম্মুখের অংশ আধা-আধি পান। পশ্চাৎভাগটা ছোট-দাদামহাশয়ের ভাগে পড়ে। কিছু কম অধিক ছিল। ঐখানে চোলের মহল নামে একটা মহল—তাতে ঐ কবিরাজ মহাশয়ের বাসা ছিল। কবিরাজ মহাশয় সব বাড়ী ঘুরে শেষে বাসায় যেয়ে ছোটমা'র সঙ্গে দেখা ক'রে, একটু তত্ত্বাবধান ক'রে, পরে এ-বাড়ী ও-বাড়ীর খবরাখবর দিতেন ও গল্পগুজব করতেন। ছোটদিদিমা'র কথা যখন পেড়েছি, তখন যতটুকু সংক্ষেপে পারা যায় তাঁর দোষগুণ কিছু বলা চাই। তিনি বড়ই চতুরা ছিলেন, এবং একটু বেশীরকম স্পষ্টবক্তা ছিলেন। এজন্য তাঁর সঙ্গে প্রায় সকল লোকের বনিবনাও হ'ত না। আমার দিদিমা'র কাছে যা শুনেছি তাই লিখছি। এতে গুরুজনের নিন্দাজনিত পাপ আপনারা মাপ করবেন। তাঁর জন্যেই বিবাদবিসম্বাদ বাধে, ও বাড়ীটিতে রাতারাতি বিস্তর 'রাজ' লেগে প্রাচীর উঠে যায়। এমন কঠিন পণ যে রাত্রি প্রভাত হ'লে কেউ আর কারোর মুখদর্শন করব না। এই সকল ভাব বহুদিন স্থায়ী হয়। তবে প্রথম প্রথম কি পাঠানো ও খবর নেওয়াটা ছিল। সেজন্য আমার জন্মাবার পরেই ছোটদিদিমা তাঁর একটি পুরানো ঝিকে পাঠান। সে দেখে গিয়ে কি বলে, ভগবান জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যেমন কবিরাজ-ছেলে বলেছেন—ছোটমা, আজ মেজমা'র ওখানে বাবুর একটি চমৎকার খুকি হয়েছে, যেমন রং তেমনি একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আর বাটাপানা মুখ, ঠিক চাঁদের মত মেয়েটি। এ সকল অসহ্য কথা ছোট-দিদিমা'র সহ্য করা সুকঠিন হয়। তিনি একটু আওয়াজটি উচ্চে চড়িয়ে বলেন—হ্যাঁ, এই যে স্বর্গ দেখে এসে বললে যে সর্ষেমাখা কোটরচোখী পেঁচামুখীর মত এক কন্যা হ'য়েছে। শুনেছি বাছা শুনেছি। এখন পাঠক-পাঠিকারা শুনুন, এটা আমার রূপের বর্ণনা বটে। ছুটোর মধ্যে যেটা হয় বিশ্বাস করুন, তবে যদি আমার উপর বিচারের ভার পড়ে, তা হ'লে তাতে দর্পণের আবশ্যক। তাতে আমি দেখেছি আমি কিছুই নয়,—সুরূপা নয় আর কুরূপা নয়, একটা মানবী মূর্ত্তি এই পর্য্যন্ত।

তবে শুনুন। আমার মা আমায় পেয়ে বড়ই সুখী হন। একে ত প্রথম কন্যাটি মারা যায়, আবার ছেলেটিকে নিয়েও আনন্দ করতে পান নি। সেজন্য আমার দিনের মধ্যে চারপ্রকার সাজ-বদল হ'ত। আর দিদিমাও খুব ভাল-বাসতেন। তিনি আপন হাতে রোজ ক্রমটান্ মাখাতেন। এটি একটি আগেকার প্রথা ছিল। তাঁরা বলতেন যে এতে শরীর পোষাই আর সুশ্রী হয়। এর অনেক দরকার ছিল, ও অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করা হ'ত। বাদাম, পেস্তা, পোস্ত, জাফরাণ, মোমদিস্তা, দুধ, সর, কুসুমফুল—এই সকল জিনিষ ঘোলাইয়ে ক'রে বেঁটে, দুধ ও ময়দা দিয়ে গোলা হ'ত। তাই মাখানো হ'ত, তার উপর বেসন, তারপর উত্তম সাবান মাখানো হ'ত। এতে আমার শরীরটি খুব ভাল ছিল, তবে ক্রমে ক্রমে অতিশয় স্থূল হ'ল। তাতে তখনকার দিনে নিন্দনীয় ছিল না, বরং আনন্দই ছিল। তার উপর আবার রংটি সাদার উপর গোলাপী ছিল, সকলের মনোরঞ্জন করেছিল। আমার মাকটা টিকলো ছিল, চোখদুটি বাগামারি ছিল। ভুরু জোড়াটি ত আমার দর্পণে অতি কদর্য্য ঠেকে, কিন্তু যে আমলে আমার জন্ম হয়, তখন এর বড় বেশী সুখ্যাতি ছিল। ঠোঁটদুটো অবশ্য পাতলাই ছিল, এজন্য আর মুখটা বড় খারাপ দেখায় নি। কিন্তু আমার যখন জ্ঞান হ'ল সুরূপ ও কুরূপ বিচার করবার, তখন দেখতুম যে আমি একটি বাঙ্গালী—এই পর্য্যন্ত। তবে আমার একটা শোভা ছিল কি না বটে—চাচর কেশ! আমাদের মেয়েমহলে বলে—কেশেই বেশ। এটা আমার প্রচুর পরিমাণে ছিল। যা'ই হোক, এ বর্ণনা কিছু বিস্তর হ'য়ে পড়ল। মোটের উপর পাঠিকাগণ এই বুঝবেন যে, সে আমলে আমার রূপের খুব নাম ছিল। আমার কর্ত্তামণিও এই রূপে ভুলেছিলেন। তিনমাস বয়স থেকেই ছবি তোলা আরম্ভ হয়। আমাকে তিনমাস

থেকেই ইডেন পার্কের হাওয়া খাওয়া অভ্যাস করানো হয়। আমাদের একটি দাদা ছিলেন, তিনি আমাদের খাজাঞ্চি ছিলেন। তিনি আমাদের বড় ভালবাসতেন। আর আমরাও তাঁকে খুব ভালবাসতুম ও আদর করতুম। তিনি আমাকে কোলে নিয়ে গাড়ীতে বসতেন। আর পরম যত্নে বসানো থাকত দুধের বোতল, সঙ্গে পুজনী ও অরেঞ্জস্ থাকত। এত হাঙ্গামা ক'রেও আমার হাওয়া-খাওয়ানো চাই। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমার আদর দিন দিন বৃদ্ধি হ'তে থাকে। আমার যেটুকু লেখা সাঙ্গ হ'য়ে গেল, এটুকু এইরূপেই আমার শোনা কথা। এইবার আমার পাঁচ-বছর উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। এখন থেকে যতটুকু মনে পড়ে সেটুকু লিখব।

আমার কর্ত্তামণির তিনটি ঘোড়া ও দুখানি গাড়ী ছিল। সকাল ৪টায় আমার বাবা ও আমি গাড়ী চ'ড়ে মাঠে যেতুম। মা নিজে স্পিরিট-ল্যাম্পে চা তৈরী ক'রে দিতেন। আমি ও বাবা দু'জনে চা পান করে, গরম কাপড় প'রে, জুতো-মোজা ও টুপি এঁটে বেড়াতে যেতুম। তখন আকাশে তারা থাকত। যখন মাঠে পৌঁছতুম, তখন বেশ ফরসা হ'য়ে যেত। ছুটাছুটি ও খেলা খুব হ'ত। দু'চার জন ইংরেজ-বালিকার সঙ্গেও ভাব হ'য়েছিল। এইরূপ বেলা আটটা পর্য্যন্ত খেলা ক'রে কোনদিন একেবারে বাড়ী আসা হ'ত, আবার কোনদিন উইলসন হোটেলে গিয়ে চা, বিস্কুট, কেক্ খাওয়া হত, আর মনের মতন খেলনাও কেনা হ'ত। পরে বাড়ী এসে কাপড় ছেড়ে একটু দৌড়াদৌড়ি হ'ত। দাদাকে গল্প বলা হ'ত, তাঁকে খেলনা দেখানো হ'ত। তা ছাড়া বলতুম—আমি আজ এই দেখলুম, ঐ দেখলুম; এটা কিনেছি, কেক্ কিনেছি। হয় ত কোনদিন দাদার জন্যে লুকিয়ে রুমালে কেক্ বেঁধে এনেছি। দাদাকে দিতুম। লজেঞ্জস্ ও চকোলেট্ প্রায়ই আনতুম। কেক্ রোজ আনতুম না, কারণ আমার দাদা পেটরোগা ছিলেন। তাঁর আহারাদির একটু বিশেষ বাঁধাবাঁধি ছিল, কেক্ খাওয়া দিদিমা শুনলে বকবেন। কিন্তু আমার ঠিক তার উল্টো। বললে আপনাদের অবিশ্বাস হবে যে, এত ক'রে খাওয়া বোধ হয় এত অল্প-বয়সে কেউ খায় না। তা ছাড়া এ বয়সে আমি চকলাও খুব বেশী ছিলাম; কেউ কোন বিষয় নিষেধও করত না—এইটি আশ্চর্য্যের বিষয়। বেড়িয়ে এসেই কাপড়গুলি গয়ারাম চাকর ছাড়িয়ে দিলে। কিকে আমি বড়ই ভাল-বাসতুম, কারণ সে ছেলেবেলা থেকেই আমার লালনপালনের ভার নিয়েছিল। সে আমার ইজারটি খুলে সাদা ইজার ও গাউন পরিয়ে দিলে। তখন আর আমার পায় কে?—আমি কাপড় ছেড়েই, দাদার সঙ্গে একটু দুষ্টামি ক'রে, ছুটলুম অমনি পাশের বাড়ী। সেখানে আমার জ্যেঠামহাশয়ের এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। আমার দুই জ্যেঠাইমা ছিলেন—বড়মা ও মেজমা। এঁরা আমায় ঠিক মাতৃস্নেহ দিতেন। আমার বড়মা খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল ঠিক কাঁচা সোনার বর্ণ, আর সৌন্দর্য্যে ঠিক দেবীপ্রতিমার মত ছিলেন। অল্পবয়সেই তিনি বিধবা হন। তিনি পূজা-অর্চ্চনা নিয়েই বহু সময় অতিবাহিত করতেন। এঁর কাছে আমরা আব্দার বা খেলা করবার বড় সুরসুত পেতাম না। বৈকালে একটু বসবার ঘরে বসতেন। কিন্তু আমার রোজ বেড়াতে যাওয়া ছিল ব'লে তাঁর কাছে বসা বা খেলা হ'য়ে উঠত না। তবে কোনদিন যদি বেশী বাদল হ'ত, তা হ'লে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হ'ত। সেদিন বড়মা'র কাছে শুয়ে শুয়ে গল্প শুনতুম। হয় ত তাসখেলা দেখতুম, না হয় রামায়ণ শুনতুম। আর একটু-একটু মুখস্থ করতুম—যোগসিদ্ধ মহাতেজা, জনক নামেতে রাজা, আমি সীতা তাহার নন্দিনী। দশরথসুত রাম, নবদূর্ব্বাদল শ্যাম, বিবাহ করেন পণে তিনি॥ শুভ বিবাহের পর, গেলাম শ্বশুরঘর, কতমত করিলাম সুখ। শ্বশুরের স্নেহ যত, শাশুড়ীগণের তত, নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক॥ হরষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা, আদেশিল দিতে ছত্রদণ্ড। কুব্জি দিল কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ী করিল মানা, মোরে বিধি কৈল লণ্ডভণ্ড॥ আমি কন্যা পৃথিবীর, স্বামী মোর রঘুবীর, মোরে বন্দী কৈল নিশাচর। সুন্দরাকাণ্ডের গীত, কৃত্তিবাস বিরচিত, সুললিত গীত মনোহর॥—এটুকু আমার প্রথম মুখস্থ বিদ্যার নমুনা।

আমার মেজমা ঠিক তাঁর দু'টি মেয়েকে যেমন ভাল-বাসতেন ও আদর করতেন—আমাকে তেমনি করতেন; বরং আমি তাঁর কাছে বেশী আব্দার করতুম। দুষ্টামীর

কন্তু মা'র কাছে ধমক খেতুম কখনো কখনো। সেজন্ত তত আব্দার জানাতে সাহস হ'ত না। মেজদার কৈ-মাছে বড় ডিম বেরলে, আমি যদি তখন ও-বাড়ীতে থাকতুম তা হ'লে সেটা আমার মুখে না দিয়ে তিনি কখনো বড়দিদি কি ছোটদিদিকে দেন নি। আমসত্ত দিয়ে কলা কীর ভাত কি পরমান্ন মাখলে আমরা ব'সে খেতুম। আমরা সবাই মিলে খুব দৌড়াদৌড়ি ও লুকোচুরি খেলতুম। এমন কি, এক এক দিন আমার বাড়ী যেতে ইচ্ছে হ'ত না। জোর ক'রে চাকর এসে ধ'রে নিয়ে যেত।*

(ক্রমশঃ)

গোরক্ষা ও গোপালন

শ্রী বিভূতিভূষণ মিত্র

যে কেহ দেশের ও জাতির মঙ্গল কিসে হয় বা হইতে পারে চিন্তা করেন ও করিতেছেন তাঁহারা সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে গোজাতির অবনতিই দেশ-বাসীর অবনতির প্রধান ও প্রথম কারণ। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মদনমোহন বর্ম্মণ, গুরুসদয় দত্ত, স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি দেশহিতৈষীগণ সকলেই জন-সাধারণকে গোজাতির ধ্বংস নিবারণ করিয়া গোজাতির উন্নতিসাধনের জন্ত উৎসাহিত করিতেছেন ও করিয়াছেন।

কোন সময় কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচার-পতি উডরফ্ সাহেব এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া-ছিলেন যে দেশের গোজাতির অবনতি দেশবাসীর অবনতি সূচনা করে। তাঁহার এই মন্তব্য বঙ্গদেশে বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

বাঙলার গরু পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্ট; তাই আজ বাঙালী জাতি মরণোন্মুখ। যে বাঙালী জাতি, যাহা বেশী-দিনের কথা নয়, স্বাস্থ্যে, সম্পদে, ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে, কৃষিকর্ম্মে, যুদ্ধবিদ্যায়, নৌ-বিদ্যায়, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে মানবজাতির শীর্ষস্থানে আরোপিত ছিল, সেই জাতি আজ অলস, পরমুখাপেক্ষী, স্বাস্থ্যহীন, দুর্ব্বল, মেরু-দণ্ডহীন জাতি বলিয়া ঘৃণিত ও উপেক্ষিত, ইহার কারণ গোজাতির অধঃপতন।

বাঙলার গোজাতির অধঃপতনের কারণ কি? আমাদের মনে হয় প্রথম কারণ দেশের বড় বড় ডাক্তার-গণ। বিলাত হইতে যে-সকল পেটেণ্ট খাদ্য বাহির হইয়াছে তাহার প্রচলনের জন্ত বিলাত প্রভৃতি দেশের লোকেরা অজস্র অর্থব্যয় করিয়া থাকে। এই প্রচলনের সাফল্য নির্ভর করে ডাক্তারদের অভিমতের উপর। ডাক্তার-

---

* এই সুন্দর আত্মজীবনীটির কিয়দংশ অধুনালুপ্ত 'সবুজ পত্রে' বাহির হইবার পর উক্ত পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ইহা ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে প্রকাশ করিতে দিয়া ইহাকে সমৃদ্ধ ও আমাদিগকে প্রীত করিয়াছেন। এই জীবনী সবুজপত্রে প্রকাশ করিবার কারণ সম্বন্ধে সবুজপত্র-সম্পাদক বলিয়াছিলেন—"...লেখিকা অতীতে ছিলেন বিশিষ্ট বংশের কন্যা ও বধূ এবং বর্ত্তমানে গৃহকর্ত্রীরূপিণী সম্রাজ্ঞী। আধুনিক অর্থে শিক্ষিতা মহিলা না হ'লেও, নারীসুলভ সরল রেখাপাতে ও গল্পচ্ছলে নিজের জীবনীসহ সেকালের সম্ভ্রান্ত বাঙালী-ঘরের এমন উজ্জ্বল চিত্র তিনি এঁকেছেন যে, আমাদের পক্ষে তা যেমন হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছে, অপর পাঠকের পক্ষেও তাই হবে...।"

সন্দেহ নাই, আমাদের সহিত বঙ্গলক্ষ্মীর পাঠকপাঠিকাগণও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন।- সম্পাদিকা, বঙ্গলক্ষ্মী

দের মনস্তুষ্টি করিতে পারিলেই তাঁহারা রোগী ও শিশুদিগকে সেই সেই পেটেন্ট খাদ্য ব্যবস্থা দিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে ডাক্তারদের দ্বারা দেশে বিলাতি পেটেন্ট খাদ্যের প্রচলন হওয়াতে অল্পকালের মধ্যে বাঙালী গোপালন ত্যাগ করিয়া অনায়াস-লভ্য পেটেন্ট খাদ্য দ্বারা রোগী ও শিশুদিগকে পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। অপর দিকে গোজাতি উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইল। কেহই প্রায় ভাবিলেন না যে ইহার পরিণাম কি? এখন দেখা যাইতেছে দেশের অনেক বড় বড় ডাক্তার বিলাতী খাদ্য বয়কট করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, ইহা অতি শুভ লক্ষণ। ডাক্তার দ্বারাই দেশে পেটেন্ট খাদ্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আবার ডাক্তার দ্বারাই উহা অতি সহজে বন্ধ হইতে পারে। দেশের ডাক্তারদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি বাস্তবিকই যদি সজাগ হইয়া থাকে, তবে পেটেন্ট খাদ্য প্রচলন হওয়াতে দেশের যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে—তাহা অচিরেই সংশোধিত হইবে। অনেক ডাক্তারই স্বীকার করিবেন ও করিতেছেন উৎকৃষ্ট দুগ্ধের অভাবেই দেশের লোকের vitality বা জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়াছে। তাই বিংশশতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা দ্বারা তাঁহারা লোকের নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধার করিতে সক্ষম হইতেছেন না। দেশের লোক এখন নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই জাতি অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধই প্রধান, এখন ইহা সকলেই প্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, দুগ্ধের অভাব দূর করিতে হইলে দুই, চারি বা দশটি ডায়েরী প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহা হইবে না। ঐ অভাব দূর করিতে হইলে কি শহরে, কি পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থকে যত্নপূর্ব্বক নিজগৃহে গোপালন করিতে হইবে এবং প্রত্যেক গৃহে গবাদি পশুকে পূর্ব্বের মত গোয়ালঘর প্রতিষ্ঠা করিয়া আশ্রয় দিতে হইবে ও গৃহলক্ষ্মীরা যেমন পূর্ব্বে গোয়ালঘরের কাজ করাকে ছোট কাজ বলিয়া মনে করিতেন না সেইরূপ তাঁহাদিগকে গোয়ালঘরের কাজ জীবনধারণের মতই কর্ত্তব্যজ্ঞানে করিতে হইবে।

গুরুদয়ের মত মহাশয় এক বক্তৃতায় অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন যে আমাদের দেশের গরু অধিকাংশস্থলে। কিসে গরু ভাল হয়, কিসে একটা গরু ৮।১০ সের দুগ্ধ দেয়, এ শিক্ষা এ দেশে নাই। এই সব লইয়া ইউরোপ, আমেরিকায় বড় বড় লোকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে; কিন্তু আমাদের দেশের বড় লোকেরা তাহা করেন না। তাঁহাদের প্রতিযোগিতা—কাহার কয়খানা মোটরগাড়ী আছে। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের দেশের ছেলেরা তাহা করিবে না। তাই বলিয়াছেন, প্রথম মেয়েদের সাহস দিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। ছেড়ীর ছেলে সিংহ হয় না, ভেড়াই হয়। আমাদের দেশের ছেলেরা সিংহ হয় না তাহার কারণ তাহারা মায়ের নিকট শিক্ষা পায় না। গৃহিণীই গৃহ, যদি গৃহলক্ষ্মীরা তাঁহাদের গৃহে গোয়ালঘর প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বয়ংসহকারে গোজাতিকে আশ্রয় দেন ও পালন করেন তবেই তাঁহাদের সন্তান স্বাস্থ্যবান হইবে। আমি মা-সকলকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন বিলাতী পেটেন্ট খাদ্য তাঁহাদের সন্তানগণকে না দেন ও দুগ্ধের দ্বারা পালন করেন। মা-সকলের জানা প্রয়োজন যে শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ গোদুগ্ধের অভাব। অন্য কারণ যাহা তাহা গৌণ কারণ হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য কারণ নহে।

গোদুগ্ধ মানবজীবনের প্রথম ও চরম ক্ষুধা নিবৃত্তির উপাদান। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরমুহূর্ত্ত হইতেই গোদুগ্ধ পান করিয়া মানবজীবনের প্রথম ক্ষুধা নিবারণপূর্ব্বক জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। আবার মুমূর্ষু ব্যক্তি গোদুগ্ধ পান করিয়া—তাহার জীবনের শেষ জ্যোতিটুকু রক্ষা করে। গোদুগ্ধ মুখে লইয়া মানবজীবনের আরম্ভ, আবার গোদুগ্ধ মুখে লইয়া মানবলীলার অবসান। এই আরম্ভ ও শেষের মধ্যে আমাদের যে একটা ক্ষুদ্র জীবন, সেই জীবনের সঙ্গেও গোমাতা ও দুগ্ধের যে কতখানি নিকট-সম্বন্ধ তাহা বলিতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড বই লিখিতে হয়। জীবনধারণের উপযোগী যে-সকল পদার্থ তাহা কেবলমাত্র দুগ্ধেই বর্ত্তমান—যথা, শর্করা, জল, লবণ, চর্ব্বি প্রভৃতি। দুগ্ধ ব্যতীত এমন কোন পদার্থই নাই, কেবলমাত্র যাহার ব্যবহারে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি। উপভোগের একমাত্র পদার্থ গোদুগ্ধ যাহা খাইয়া খণ করিয়া ঘি খাইতেও উপদেশ দিয়াছেন।

দেশে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধের সরবরাহ না হইলে,

অকালমৃত্যু, শিশুমৃত্যু বা শিশুর জীর্ণশীর্ণতাও হ্রাস পাইবে না।

পর্য্যাপ্তপরিমাণ দুগ্ধের সরবরাহ করিতে হইলে দেশে গোজাতির দ্বারা যে সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট গরু নষ্ট হইতেছে তাহা নিবারণ করিতে হইবে, উৎকৃষ্টজাতীয় গোবৎস সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া সেইসকল বৎসকে পালন করিয়া ভালজাতীয় ষণ্ডদ্বারা প্রজনন করাইয়া দুগ্ধবতী গাভী তৈয়ার করিতে হইবে

জাতি সমাজ হইলে এখনও পুনরুত্থানের সময় আছে। প্রত্যেক বাঙালীকে চিন্তা করিতে হইবে কিসে গোজাতির উন্নতি করিতে পারা যায়। এই বিষয় লইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা করিতে হইবে, দেশের ধনী সম্প্রদায়কে সাধারণ লোকের সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে, একযোগে Cattle Breeding Farm প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহা বাঙলাদেশে নাই। মুখে হিন্দু গরুকে দেবতা বলেন,—প্রাণে দেবতা জ্ঞান করিতে হইবে। গরু সত্যই দেবতা কারণ গোহুগ্ধেই জীবনের আরম্ভ ও গোহুগ্ধেই জীবনের অবসান।

সখ্যের গান

(বাউল—কাহারবা)

শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই·সি·এস

হবেন সবার ভগবান্।
ক'রে অর্ঘ্য তোদের প্রাণ—
দেশের সেবার কর্ম্মে এবার
কর্‌রে সবাই দান ;
তোরা কর্‌রে সবাই দান।
মুসলমানের সেবায় হিন্দু
কর্‌রে জীবন দান,
হিন্দুর উপকারে যে রে
মুসলমান তোর প্রাণ ;
তাতে নাইরে অপমান ॥
তোদের ধর্ম্ম-গাঙের বালুর চরে
আনরে প্রেমের বান ;
তাতে বাড়্‌বে দেশের মান ॥
মান-অভিমের বিবাদ বেঁধে রইবেনে অজ্ঞান,
ব'চে যিবা প্রেমে-জ্ঞান ॥
সেই ভগবান সেই যে খোদা নাইরে ব্যবধান—
একের নাইরে ব্যবধান ॥

খাদ্য চাই

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বহিতৈষী নেত্তিন্‌সন সাহেব জর্ম্মানির বর্ত্তমান দুর্দ্দিন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে সেখানকার অধিবাসীরা শরীর-মনের সম্পূর্ণ তেজ রক্ষা করিবার উপযুক্ত আহার হইতে কিছুকাল ধরিয়া বঞ্চিত আছে। এই কারণে বিশেষভাবে শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির হ্রাস হওয়াতে সমস্ত জাতির ভাবী উন্নতির পক্ষে যে বিষম ক্ষতির কারণ ঘটিতেছে তাহাই সবচেয়ে উদ্বেগের কথা। শিশু-মৃত্যু-সংখ্যাও সেখানে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেখানকার একজন ডাক্তার বলিয়াছেন, দেশে যে পরিমাণ খাদ্য আছে, তাহা মানুষকে একেবারে প্রাণে মারিবার পক্ষে কিছু বেশী অথচ বাঁচাইয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আলু, রুটি, মাংস ও মাখন উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না। সামরিক শাসনে বাহির হইতে জর্ম্মানিতে আহার-প্রবেশের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই দেশের এই অবস্থা ঘটিয়াছে।

এই বর্ণনা পড়িয়া একটা কথা আমরা না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। সেটা এই যে কোন একটা জাতিকে জ্ঞানে ও কর্ম্মে পুরাদমে উন্নতির পথে চালাইতে হইলে প্রথম হইতেই তাহাকে প্রচুর পরিমাণে আহার জোগাইতে হয়। শুধু কেবল বুদ্ধি থাকিলেই চলে না; উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের জোরে সেই বুদ্ধি ষোলআনা পরিমাণে খাটাইতে হয়। দুইটা দেশের মানুষের সংখ্যার তুলনা করিতে গেলে শুধু মাথা গুণতি করিয়া তাহার সত্য পরিমাণ পাওয়া যায় না। কোন্ দেশে মানুষ খাইতে পায় কত, সেটাকেও সংখ্যার সঙ্গে যোগ করিলে তবে ঠিক ওজন পাওয়া যায়। জর্ম্মানি যে আদর্শের সভ্যতাকে এতদিন বহন করিয়া আসিয়াছে তাহাকে পোষণ করিতে যে পরিমাণ খাদ্য লাগে সেই খাদ্য কমিয়া আসিলে তাহার মনন-শক্তি, তাহার কৃতিত্ব, তাহার স্থাশনাল সফলতা কমিয়া আসিবে। কেননা, বড় সভ্যতাকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃত-পরিমাণে দরকার হয়, এজন্য যথেষ্ট আহার্য্য চাই।

এই উপলক্ষে নিজেদের দেশের কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের দেশে সামরিক অবরোধ নাই, কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই যে বহুকাল ধরিয়া আধ-পেটা খাইয়া আসিতেছে, সে কথা সকলেই জানে। জর্ম্মানির ডাক্তার যাহা বলিয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহা পুরা খাটে। আমরা যতটা খাই তাহাতে না হয় মরণ, না হয় বাঁচন। কেননা, শুধু কেবল নিশ্বাস লওয়াকেই ত বাঁচা বলে না। শিশুর মৃত্যুসংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশী। কিন্তু যে শিশু মরে না সে যে সম্পূর্ণ পরিমাণে বাঁচিয়া থাকিবার মত আহার পায় না সেইটেই দুঃখ। কেবলমাত্র আর্থিক দিক হইতে যদি ইহার ফল দেখি, তবে দেখা যাইবে সর্ব্বসমেত আমাদের দেশে কর্ম্মশক্তি কম

হওয়াতে অধিক মূল্য দিয়া অল্প ফল পাই। অন্য দেশে একজন যে-কাজ করে, আমাদের দেশে সেকাজে অন্ততঃ চারজনের দরকার হয়। ইহাতে কেবল কাজের পরিমাণ নষ্ট হয় তাহা নহে, কাজের গুণও নষ্ট হয়। কেননা, কাজের শক্তি থাকিলে সেই শক্তি খাটাইতে আনন্দ হয়, কাজে ফাঁকি দিতে সহজেই ইচ্ছা হয় না। কর্ম্ম সম্বন্ধে সেই সত্য-পরতাই কাজের নৈতিক গুণ। য়ুরোপীয় মনিব প্রায়ই অভিযোগ করেন যে আমাদের দেশের লোক ফাঁকি দেয়, তাহাদিগকে কেবলি পাহারা এবং শাসনের উপরে রাখিতে হয়। বংশানুক্রমে তাঁহাদের নিজের দেহ সহজেই পুষ্ট বলিয়া একথা তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না যে এদেশে কর্ত্তব্য এড়াইবার জন্য ইচ্ছার উৎপত্তি প্রধানতঃই পরাঙ্গ-পোষণের অভাব হইতে। দেশের লোক ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে এবং জীবন্মৃত হইয়া আছে তাহারও কারণ ঐ, শুধু বেচারা মশাকে দোষ দিলে চলিবে না। কি করিয়া আমরা বাঁচিব একথা ভাবিবার নহে, কেননা, কোনোমতে বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল। কি করিয়া আমরা পুরাপুরি বাঁচিব সেইটেই আমাদের ভাবিবার কথা। ফলতাবলতঃ জীবনধারণে আমাদের সম্পূর্ণ গা নাই বলিয়া জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে আমরা গড়িমসি করিয়া ফাঁকি দিতেছি, এ সম্বন্ধে আমরা সত্যপর হইতেছি না। ইহাতে সমস্ত দেশের বাহিক ও আন্তরিক যে লোকসান হইতেছে, সবসুদ্ধ জড়াইয়া যে কম কাজ হইতেছে, কম ফসল ফলিতেছে, কম বিঘ কাটিতেছে, প্রাণের স্রোত কম করিয়া বহিতেছে, নিজে-দের উপর আস্থা কম পড়িতেছে, অন্ন দিয়া কি তাহার পরিমাণ পাওয়া যায়? শরীর-মনের উপবাসজাত যে অবসাদ, জীর্ণতা, ঔদাসীন্য, জড়ত্ব আমাদিগকে ধূলিসাৎ করিয়া রাখিয়াছে তাহার ভার কি সামান্য?

এইসব বিপত্তি হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য অর্থ কি করিয়া বাড়াইতে পারা যায় সেকথা ভাবিবার শক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহারা ভাবুন, কিন্তু যতটুকু আহার্য্য আমাদের ভাণ্ডারে আছে তাহার পুষ্টিকারিতার বিচার করিয়া আহার সম্বন্ধে অবিলম্বে আমাদের অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিতে যদি পারি তাহা হইলে একদমে অনেকটা ফল পাওয়া যাইবে। —প্রভাতকুমার (শান্তিনিকেতন)

বাংলার দুর্দ্দশা

শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস্

...আমাদের দেশের গরু অদ্বিতীয়। কিসে গরু ভাল হয়, কিসে একটা গরু ৪।৬।১০ সের দুধ দেয়, এ শিক্ষা এদেশে নাই। এসব লইয়া ইয়োরোপ, আমেরিকার বড়-বড় লোকদের ভিতর প্রতিযোগিতা চলিতেছে। কোন্ ফসলে কি সার দিলে ফসল ভাল হয়, তাহাই তাঁহারা শিক্ষা করেন; কিন্তু আমাদের দেশের বড়লোকেরা তাহা করেন না।

একজন জমিদারের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বাড়ীতে গাই আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, তাঁহার কয়েকখানা মোটর আছে, কিন্তু গাই নাই। তাঁহার দুইটি ছেলে কিছু করে না বলিলেন—অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট পাইলে ভাল হয়। ধান উৎপাদন, সব্জী উৎপাদন, ফল উৎপাদন, এসব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা করিবে না। তাহারা কেবল চায় মোকদ্দমা;—একদল নিজে করিবে, আর একদল উকিল হইয়া টাকা লুটিয়া লইবে, আর একদল হাকিম হইয়া বিচার করিবে। এই মোকদ্দমাই আমাদের দেশের প্রধান ব্যাপার। অন্য দেশে আদালতের খোঁজই পাওয়া যায় না। সেখানে দেখিবে বড় বড় স্কুল-কলেজ আর বড় বড় কারখানা।

কৃষিকার্য্য আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা করিবে না। অশিক্ষিতের হাতে এসব কাজ ভাল হয় না। বিলাতে সূত্রধরের কাজ, দর্জ্জির কাজ করিয়া বড় বড় লর্ড হইয়া যায়। আমাদের দেশেরও অনেক মাড়োয়ারী ইংরেজী জানে না অথচ ব্যবসায় করিয়া বড়লোক হইয়াছে।

এক বাড়ীতে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহারা আমাকে সিগারেট খাইতে দিল। কিন্তু আমি সিগারেট খাই না শুনিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল। এই সিগারেট খাইয়া দেশের কত টাকাই যে আমরা উড়াইয়া দিতেছি, তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। আমরা বিদেশের নিকট হইতে অসংখ্য জিনিষ আনি, কিন্তু দিই মাত্র ধান ও পাট। আমাদের দেশের মাটিতে সোনা ফলে, কিন্তু ধান ও পাট জন্মাইয়া চাষীরা ছয় মাস বেশ নাকে তেল দিয়া

গুমায়। ময়মনসিংহে ইতালি হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া আলু আসে, আর তার লাভ দ্বারা বড় বড় জাহাজ চালাইবার খরচ চলে; কিন্তু বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়া এদেশের ছেলেরা কিছুই করিবে না। কেনার ভাগটা বেশী না করিয়া সৃষ্টির ভাগটা বেশী করা চাই। বিলাতে এক এক জায়গায় ৫০।৬০।৭০ বিঘা জমিতে আলু কিম্বা কপির চাষ হইতেছে। এদেশের ছেলেরা ডিগ্রির বোঝা কাঁধে করিয়া ৩০৲ টাকার চাকুরীর জন্য আমার কাছে ঘুরিতেছে।

এখন চাই পল্লী-সংগঠন। প্রথম মেয়েদের সাহস দিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভেড়ীর ছেলে সিংহ হয় না, ভেড়াই হয়। আমাদের দেশের ছেলেরা সিংহ হয় না, তাহার কারণ তাহারা মায়ের নিকট হইতে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। বিলাতে ছেলে উপার্জ্জনক্ষম না হইলে তাহাকে বিবাহ দেওয়া হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে এই গলগ্রহটা ছেলের মুখের দুধের গন্ধ না ছাড়িতে ছেলের কাঁধে চাপিয়া বসে। নিজে উপার্জ্জন করিতে না পারিলে পরের দেওয়া খাইব না, এমন কি বাপের উপরও বসিয়া খাইব না,—এই স্বাবলম্বনের ভাবটুকু থাকা চাই। এই স্বাবলম্বন-জ্ঞান জাপানের একটা ধর্ম্ম। ইংরেজেরা এত বড় হইয়াছে, তাহার কারণ বড় ছেলে সব ধন পায় অন্যান্য ছেলেরা কিছুই পায় না। বাপ তাহাদিগকে কেবল শিক্ষা দেয়; আর তাহারা সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া ব্যবসায় করে, কারখানা করে, ধন উপার্জ্জন করে।

আমরা এখন দেখিতে চাই—সব স্থানে সাক্ষরতা হইতেছে, গ্রামে কৃষিকার্য্য হইতেছে, গো-পালন হইতেছে, শিল্পচর্চ্চা হইতেছে, গ্রামে, নগরে কেবল শিক্ষার ধুম চলিতেছে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, যন্ত্র-উৎপাদন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কেবল জ্ঞানের চর্চ্চায় লোক মাতিয়া আছে। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, হাকিম, জমিদার সব একজোট হইয়া মনে-প্রাণে এক উদ্দেশ্যে কাজ করিবেন। হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মের ভেদজ্ঞান ভুলিয়া যাইয়া সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দিয়া তৈয়ার করুন—দেখিবেন কত ধন, কত শক্তি, কত তেজ দেশের ভিতরে আত্মপ্রকাশ করে।...

—প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ

জেনেভা-যাত্রী বঙ্গনারীর পত্র

শ্রী সুকুমারী রায়চৌধুরী

বম্বে মেল;
২২শে মে, ১৯৩০

স্নেহের সতিকা,

এইমাত্র ট্রেন আসান্‌সোল পৌঁছলো। তোমার জামাইবাবু দু'খানা তার (Telegram) করবার জন্য ষ্টেশনে নামলেন; একখানা মিঃ শ—কে ধন্যবাদ জানিয়ে করা হ'ল, দ্বিতীয়খানা করা হ'ল বাড়ীতে।

আমি এই সময় আমার হাতব্যাগ হ'তে কাগজ-কলম বা'র ক'রে তোমায় লিখতে বসলাম।

আজ আমার স্কুলের জন্য তোমাদের কারো সাথে হাবড়া ষ্টেশনে দেখা হ'ল না।

বাড়ী হ'তে কিছু টার পূর্ব্বে মিঃ শ—র অনুরোধে তাঁর মোটরে ক'রে হাবড়া রওনা হ'য়েছিলাম; তিনি নিজেই মোটর চালিয়ে আস্‌ছিলেন।

হ্যারিসন রোডের কাছে এসে আমার 'ছাড়পত্রে'র (passport) কথা মনে পড়ল, সেটা বাড়ীতে ফেলে এসেছিলাম। তখুনি আবার মোটর ঘুরিয়ে দ্রুত বালিগঞ্জের দিকে চালান হ'ল।

প্রায় পূর্ণ জোরে এসেও, ২০০ শত লোকের মাঝে তোমাদের মুখ দেখ্‌তে পেলাম না।

আমার মনের অবস্থা তখন যে কিরূপ হ'য়েছিল তা আর তোমায় লিখে কি জানাব।

পরে শুনেছিলুম, আমাদের জন্য বম্বে মেল ৮।৯ মিনিট দেরী (late) করা হ'য়েছিল ; তাই আমরা ট্রেন ধরতে পেরেছিলাম। যা হ'ক ভগবানের কৃপায় ঐ সময়ের মধ্যে যে আমরা পৌঁছতে পেরেছিলাম এজন্য তাঁকে প্রণাম করি।

খুঁজি ক'রে তারা তাড়াতাড়ি মাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ল তাই তাঁদের সাথে না আমার দেখা হ'ল! ভগবানকে এজন্যও বার বার আমি প্রণাম করছি

ভয়ানক জোরে চল্‌ছে—ভাল লেখা যাচ্ছে না তাই আজ থাম্‌লাম। এ চিঠি বম্বে হ'তে ছাড়ব।

২৩শে মে

আজ সকালে গাড়ীতে চা, পাঁউরুটি, কেক্, বিস্কুট দিয়ে গেল। আমরা দু'জনে খেলাম।

বাইরে চারদিকে বেশ রোদ উঠেছে—বাংলার মাঠ-ময়দান, গাছ পালা সমস্ত ছেড়ে, ট্রেনখানা দ্রুত অন্যদিকে চললো।

শ্রী সুকুমারী রায়চৌধুরী

যাবার বেলায় মায়ের চরণধূলা গ্রহণ করতে না পারলে সত্যি আমার ভারী দুঃখ হ'ত!

ব্যাণ্ডেলে (Bandel) তাঁরা নেমে যাবার পর আমার মন পুনরায় ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো।

তারার হাতে তোমার জন্য অর্দ্ধেকগুলি ফুলের মালা দিয়েছিলাম—তুমি ফুল খুব ভালবাস কি না, সেইজন্য অত ফুল দেখে তোমায় না দিয়ে থাকতে পারলাম না। ট্রেন

তোমাদের জন্য ভারী মন কেমন করছে। বঙ্গ-ভূমিকে ছাড়্‌তে যে আমার এত কষ্ট হবে তা পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পারিনি।

বাংলার ধূলায় লুটিয়ে প'ড়ে আমার বার বার বল্‌তে ইচ্ছা করছে,—

যবেশ মহান্ তুমি মহীয়ান হে মোর বঙ্গভূমি,
বিদায়ের দিনে তোমার চরণে বার বার আমি নমি।

মূলতান জাহাজ ;
২৪শে মে

আজ বেলা ৯ টার সময় আমরা বম্বে পৌঁছলাম। জাহাজ-ঘাটে মাল রেখে, একটি হোটেলে খাবার জন্য গেলাম। সেখানে নানাবিধ মাছ, মাংস, ফল ইত্যাদি আহার ক'রে পুনরায় জাহাজ-ঘাটে ফিরে এলাম।

বেলা ১ টায় জাহাজ ছাড়বে ব'লে আমার বম্বে সহর দেখা হ'ল না। এই সময় তোমাদের একখানা তার করা হ'ল।

সমুদ্র হইতে এডেনের দৃশ্য

বেলা ১১ টার পর বম্বের মেয়ে-ডাক্তার আমার নাড়ী টিপে ছাড়পত্র দিলেন, আমি তোমার জামাইবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় আধ ঘণ্টার পর তিনি আমার কাছে এলেন। তাঁর কাছে শুনলাম ডাক্তার সাহেব তাঁকে ছাড়পত্র ফেরৎ দিতে বেগ দিয়েছিলেন। তিনি তোমার জামাইবাবুর জ্বর হ'য়েছে বলেছিলেন—কথাটা একেবারেই বাজে, তাঁকে বেগ দেবার কারণ হ'চ্ছে তিনি একজন কনষ্টেবলের অশিষ্টতার জন্য তাকে গাল-মন্দ করেন—খুব সম্ভব সে গিয়ে ডাক্তার সাহেবকে বলে। তিনি জাতিতে ইংরাজ, ভারতবাসীর ধৃষ্টতা সহ্য করতে না পেরে এই জাহাজে আমাদের জেনেভা-যাত্রা ঘুচিয়ে দিচ্ছিলেন।

যা হ'ক ভগবানের কৃপায়, অনেক-কিছু ক'রে তাঁর হাত হ'তে ছাড়ান পাওয়া গেল।

আমরা যে জাহাজে যাচ্ছি তার নাম 'মূলতান' (Mooltan)। জল কম থাকায় জাহাজ ঘাট (landing-station) হ'তে দূরে জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা টীমারে ক'রে এসে জাহাজে উঠলাম। আমাদের কামরায় গিয়ে সমস্ত মাল এসেছে কি না মেপে নিলাম। আমার ব্যবহারি চামড়ার পেটিকাটি (suit-case) মেপ্‌তে পেলাম না—খোঁজ করায় বললে, দুএকদিন পর কামরায় দেওয়া হ'য়েছে, পরে পাওয়া যাবে।

বেলা ১টার সময় আমাদের জাহাজ ছাড়ল। আমি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে লাগলাম—উপরে নীলাকাশ ও নীচে নীল জল; এই নীলের শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। পরে যখন এই বাস্তব জগতে নিজেকে ফিরে পেলাম তখন এই অনন্ত, অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের স্রষ্টাকে করজোড়ে প্রণাম করলাম।

এইবার আমাদের কামরা সম্বন্ধে তোমায় কিছু লেখা যাক্—আমাদের ৪২৪ নং, ৪২৫নং কামরার বাটে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দু'টি বিছানা আছে। একটি আলমারী, একটি আর্শি আছে। ঘরের ভিতর একটু বারান্দার মতন আছে—সেখানে মুখ ধুবার মেজ (washing stand), খাবার জলের কুঁজা, গেলাস, কাপড়-রাখা আলনা, তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে। হাত মুখ ধুবার জন্য একটি জলের কলও আছে।

বিকাল ৩ টার সময় চায়ের ঘণ্টা পড়লো। কাপড় বদ্‌লে খাবার-ঘরে (dinning room) গেলাম। সেখানে চা, পাঁউরুটি, কেক্, বিস্কুট খেয়ে উপরে এলাম। জাহাজের খাবার-ঘর, বসবার ঘর, ধূমপানের ঘর ইত্যাদি সুন্দর সাজান। এখানে স্নানের ব্যবস্থাও বেশ—সমুদ্রজলের কল, গরম জলের কল ও একটি ক'রে প্রকাণ্ড টব্ প্রত্যেক স্নানের ঘরে আছে। মহিলা ও পুরুষদিগের স্নানের ঘর আলাদা।

ডেডলায় সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত ব'সে রইলাম। খাবার ঘণ্টা পড়লে পুনরায় কাপড় বদ্‌লে খাবার-ঘরে গেলাম। সেখানে সুপ, চপ্, কাট্‌লেট্, কারি, ভেট্‌কী মাছ সিদ্ধ, সব্জ আলু ভাজা, পাঁউরুটি, ডিম, আঙ্গুর, বাদাম ইত্যাদি

নানারকম খেয়ে চ'লে এলাম। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ডেকে ব'সে হাওয়া খেলাম। এই সময় রবিবাবুর "যাত্রী আমি ওরে" বার-দুই গুন্ গুন্ ক'রে আওড়াতে লাগলাম। রবীন্দ্রের গীতাঞ্জলি হ'তে দুই পাতা তোমায় উদ্ধৃত ক'রে দিলাম—

"যাত্রী আমি ওরে,
পারবে না কেউ রাখ্‌তে আমায় ধ'রে।
দুঃখ সুখের বাঁধন সবই মিছে,
বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিরহ-বেলা টানে আমায় নীচে,
ছিন্ন হ'য়ে ছড়িয়ে যাবে প'ড়ে।

•

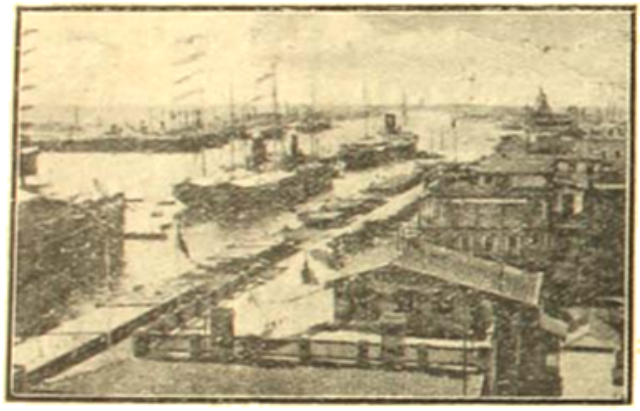

শোট সৈয়দ

যাত্রী আমি ওরে,
যা-কিছু ভার যাবে সকল স'রে।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
তাথাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল-সাঁঝে পরাণ মম টানে
কাহার বাঁশী এমন গভীর স্বরে!"

• •

আরবসাগর-বক্ষে;
২৪ শে মে

আজ সকালে দেখি জাহাজ বেশ দুল্‌ছে—আমার মাথা যেন ভার বোধ হ'ল। ডেকে এসে পায়চারি করতে লাগ্‌লাম—জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখ্‌ছি—ঢেউয়ের সাথে সমুদ্রের সাদা ফেনাগুলি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে! আমি যদি কবি হ'তাম তা হ'লে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন বাগচীর মতন সমুদ্রের ফেনা দেখে একটা কবিতা লিখে ফেল্‌তাম। তাঁর কবিতাটি আমি জানি, তার কিয়দংশ তোমায় লিখ্‌লাম—

সমুদ্দুরের সাদা ফেনা পরাণ পাগল করা—
ঘর ছেড়ে আজ তোরি হাতে দিলাম আমি ধরা;
তোরি সাথে ভেসে ভেসে, যাব রে সেই অচিন দেশে,
যেথা আছে অখিল-শেষে সকল শ্রান্তি-হরা।

• • • •

আমি হব যাত্রী তোমার, তুমি আমার তরী,
ভাব্‌বনা আর নিজের লাগি'—বাঁচি কিংবা মরি;
করব না আর আগে-পিছে, চাইব নাক উপর-নীচে,
নিখিল ত্যজি' আজকে তোমায় লব বরণ করি'।

• • • •

রাত্রি দিবা দুলব দুঁজন তরঙ্গ-দোলাতে—
উর্ম্মিশিরে ঘূর্ণিলোচন ঘূর্ণাপাকের সাথে;
কভু যখন গর্জ্জি আসি,' মারবে ঠেলা অট্টহাসি',
চূর্ণ হ'য়ে পড়ব খসি' সহস্র কণাতে।

২৬শে মে

সকাল ৭টার পর স্নান ক'রে এলাম। কাম্‌রায় ব'সে চা পান করব ব'লে ঘণ্টা টিপ্‌লাম—মেয়ে-ভাঁড়ারী (Stewardess) খাবারের তালিকা (Menu) নিয়ে এসে হাজির হ'ল। অনেক জিনিষই খাওয়া গেল ও পরে বন্ধু-ঘরে গিয়ে মেসের কতকগুলি চিঠি লিখ্‌লাম। তোমার জামাইবাবু একখানা ইংরাজী উপন্যাস পড়তে লাগ্‌লেন।

ঘরের সমস্ত কেদারা ইংরাজ নরনারী দখল ক'রে আছেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, খুব সম্ভব আমরা ছাড়া ভারতবাসী এ জাহাজে নেই।

বেলা ১টার সময় খাবার ঘণ্টা পড়ল। আমার শরীর অসুস্থ বোধ না করাতে খাবার-ঘরে গেলাম। প্রত্যহ খাবারের তালিকা লিখে তোমায় আর বিরক্ত করব না, তার চেয়ে একদিনের ছাপান তালিকা তোমায় পাঠিয়ে দোব।

আজ সন্ধ্যেবেলায় সাহেব-মেমের "বল্‌নাচ" দেখা হ'ল

২৭ শে মে

ভাই, আজ সমুদ্রে ভয়ানক ঢেউ—আমার সমস্ত শরীর দুলছে—কাল রাত্রি ১ টার সময় আমার অসুখ করেছিল, পল্‌সেটিলা খেয়েছিলাম। আজ সমস্ত শরীর যেন পাক খাচ্ছে, মনে হ'চ্ছে নাগর-দোল্‌নায় চড়েছি।

আমার এই প্রথম সমুদ্রযাত্রা—সামুদ্রিক পীড়ার হাত হ'তে ছাড়ান পাবার আশা করি না, তবে বেশী না হ'লেই বাঁচি।

২৮ শে মে

কাল শরীর ভাল না থাকাতে তোমায় লিখ্‌তে পারিনি। আজ একবার বমি করেছি—স্নান ক'রে এখন সুস্থ বোধ করছি। এই জাহাজে বড়লাট বাহাদুরের কন্যা,

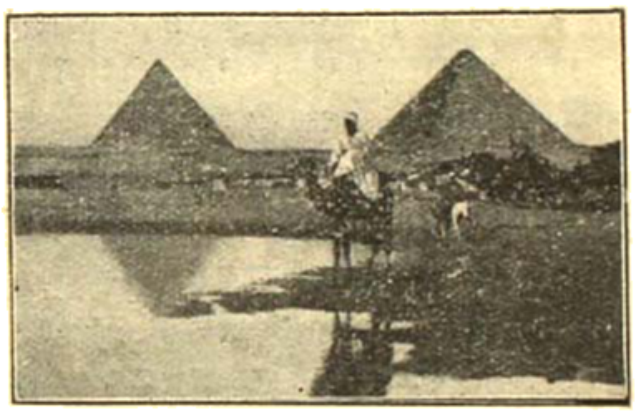

কাইরো—পিরামিড্

জজ্ বাকল্যাণ্ড (Justice Buckland) ইত্যাদি অনেক নামজাদা লোক আছেন। অষ্ট্রেলিয়ার রেজিষ্ট্রারের কন্যা আমায় খুব যত্ন করেন। একজন মিশনারী ইংরাজমহিলা সেতার বাজিয়ে মারাঠী ভাষায় সুন্দর গান করেন।

আজ জাহাজ এডেনে পৌঁছবে—এখন ঘণ্টায় ১৮ মাইল জাহাজ চল্‌ছে।

এডেন হ'তে তোমাদের তার করব। তোমার এ চিঠি সেখান হ'তে ছাড়া হবে।

সন্ধ্যা ৭টার সময় জাহাজ এডেনে পৌঁছল। আমরা সকলে এডেন পৌঁছবার পূর্ব্বেই আহার ক'রে নিয়েছিলাম। আমরা মোটরলাঞ্চে ক'রে এডেন সহর দেখ্‌তে যাচ্ছি। এখানকার কথা পরের চিঠিতে জানাব। এখানকার কার্ড তোমাদের পাঠান হ'চ্ছে।

আমার আশীর্ব্বাদ লও।

লোহিতসাগর-বক্ষে,
২৯ শে মে

আজ আমরা লোহিতসাগরের বুকে ভাস্‌ছি। "লোহিত সাগর" নাম ব'লে, এর জল কিন্তু লালবর্ণ মনে ক'রো না—এর জল নীলবর্ণ।

আজ বেশ রৌদ্র উঠেছে—সাগরের বুকে সূর্য্যকিরণ প'ড়ে অতি সুন্দর দেখাচ্ছে।

হাঁ, এইবার আমার এডেন সহর ভ্রমণের কথা লিখি। কাল সন্ধ্যা ৭৷৷ টার সময় আমরা মোটরলাঞ্চে ক'রে এডেন সহর দেখ্‌তে গিয়েছিলাম—কারণ তীর হ'তে বেশ খানিকটা দূরে আমাদের জাহাজ নোঙ্গর করা হ'য়েছিল। আমাদের সাথে মিঃ র—ছিলেন। ইনি "আন্তর্জাতিক শ্রমিক সভার" একজন প্রতিনিধি হ'য়ে যাচ্ছেন। ইনি অতিশয় ভদ্র ব্যক্তি; এঁর সাথে তোমার জামাইবাবুর ভারী আলাপ হ'য়েছে—হাঁ, বলছিলাম কি, আমরা তিনজনে এডেন সহরে পৌঁছে, একটি সুন্দর হোটেলে ঢুকেছিলাম। সেখানে লেমনেড্-বরফ খেয়ে, আমরা মোটরে ক'রে সহর দেখ্‌তে বা'র হ'লাম।

এডেন সহরটি ভারী সুন্দর লেগেছে! চারিদিকে কেবল পাহাড় আর তারই বুকে সারি-সারি বাড়ী, বাড়ীগুলির আলো দূর হ'তে দেখে আমার কি মনে হ'য়েছিল জান? —মনে হ'য়েছিল যেন পাহাড়ের বুকে কত মণি প'ড়ে র'য়েছে—তাদের সন্ধানে গেলে মন্দ হ'ত না কিন্তু তা আর হয়নি।

ফিরবার পথে একটি সুসজ্জিত প্রকাণ্ড দোকান হ'তে পাখা, ফুল, ব্যাগ ও একশিশি লভেন্ডার্ কিনে রাত্রি ১০ টার সময় জাহাজে ফিরে আসি। সেদিন নাচ্-গান বা অন্য-কিছু আমোদপ্রমোদ না থাকায় একেবারে নিজের কাম্-রায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

আজ জাহাজে "ঘোড়দৌড়" আছে, দেখ্‌তে যাব।

এখানে সকলে দিবারাত্র আমোদ-আহ্লাদ করে। কে বৃদ্ধা, কে যুবা ও কে যুবতী কিছুই বুঝা যায় না—সকলেই দিবারাত্র নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদে সময় কাটায়। আমাদের দেশের নরনারীর সহিত এদের কী তফাৎ আমি তাই ভাবি। আজ রাত্রি ১০টায় আমরা পাঁচতলার ডেকে বসে দু'টি সুন্দর ছেলেমেয়ে সুন্দর নাচ দেখ্‌লাম। তারা গ্রামোফোন্ বাজাতে দিয়ে বেশ সুন্দর নাচ্‌লে। অনল ও বিশুকে এই নাচ্ দেখাবার ভারী ইচ্ছা করছিল—এদের মাঝে থেকে, আমারও এদের সাথে মিশে এইরূপ আমোদ-প্রমোদ করবার ইচ্ছা হচ্ছে···

ভাই, আজ আর লিখ্‌ব না, কাল আবার লেখা যাবে।

৩১ শে মে

জাহাজ লোহিত সাগরে প্রবেশ করবার পর হ'তে ভয়ানক গরম বোধ করছি।

আজ সকালে গরম বোধ করাতে ডেকে এসে পায়চারি করতে লাগ্‌লাম—২।১টি পাল্‌তোলা নৌকা সমুদ্রবক্ষে দেখা যাচ্ছে। বেলা ২৷৷ টার সময় একটি দ্বীপ দেখ্‌তে পেলাম।

আজ রাত্রে জাহাজ সুয়েজে পৌঁছবে। সেখান হ'তে ট্রেনে ক'রে মিশরের প্রধান সহর কাইরোতে আমাদের যাবার কথা হ'চ্ছে। ঐ সহরে প্রাচীন মিশর-রাজাদের অদ্ভুত কীর্ত্তি "পিরামিড্" আছে। পৃথিবীর মধ্যে এ একটি আশ্চর্য্য বস্তু! শোনা যায়, প্রায় ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশের রাজা পাথর কাটিয়ে কাটিয়ে ঐ উচ্চ স্তম্ভগুলি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। দেখা যাক্, কি রকম আশ্চর্য্য জিনিষ!

আজ রাত্রে জাহাজে অভিনয় এবং গান হবে। তোমায় একখানা প্রোগ্রাম্ পাঠিয়ে দোব।

এখন দেখা যাচ্ছে এই জাহাজে ভারতীয় মুসলমান, পাঞ্জাবী ও গুটিকয়েক পারসী নরনারী আছেন। ২।৩ জন মহিলার সাথে আমার আলাপ হ'য়েছে। মিস্ স—আমায় অতিশয় স্নেহ করেন।

১লা জুন

সময় কম থাকাতে কাল সুয়েজ হ'তে আমাদের কাইরো যাওয়া হয়নি। আমি মিশরের পিরামিড্ দেখ্‌বার জন্য ভারী উৎসুক হ'য়েছিলাম কিন্তু জাহাজ চ'লে যাবার ভয়ে আমরা যেতে পারিনি। চিঠির সাথে তোমাদের মিশরের পিরামিডের একখানা কার্ড পাঠাব।

এইমাত্র মিস্ স—কে সেতার বাজিয়ে একখানা গান করবার জন্য অনুরোধ করছিলাম—তিনি তাঁর লেখা চিঠি সমাপ্ত ক'রে পাইবেন। ইনি এমন সুন্দর গান করেন! মাঝে মাঝে এঁর গান শুনে ভারী তৃপ্তি পাই—এঁর গানের মানে অবশ্য আমি বুঝতে পারি না।

আজ রাত্রে ১১৷৷ টার সময় আমরা পোর্ট সৈয়দ বন্দরে পৌঁছলাম। বন্দরের মোড়া-খুল খুলে জাহাজ লাগান হ'ল—আমরা পোর্ট সৈয়দ সহর দেখ্‌বার জন্য নাম-লাম। সহরে গিয়ে দেখা গেল সাইমন্ কোম্পানীর সুসজ্জিত প্রকাণ্ড দোকান খোলা রয়েছে। ইহা কলিকাতার "হোয়াইট্‌এওয়ে লেড্‌ল"র মতন। এখানে সকলপ্রকার জিনিষ পাওয়া যায়। এখান হ'তে আমরা খাঁটী এদেশীয় জিনিষ ২।১টি কিন্‌লাম—এই দোকানে ডাকঘর থাকাতে এইখানে ব'সে তোমায় চিঠি লেখ ক'রে ফেল্‌ব মনে করছি। তার আগে একটি হোটেলে গিয়ে কিছু আহার করবার জন্য যা'ব হ'লাম। সেখান হ'তে দোকানে ফিরে দেখা গেল, বড়লাট বাহাদুরের কন্যা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহিলারা ছবি তোলাচ্ছেন। তোমার জামাইবাবু আমার ছবি তোলাবার জন্য যেতে বলাতে আমি গেলাম। প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে একসাথে আমার ৬ খানা সুন্দর ছোট ছবি উঠে গেল! তোমার জামাইবাবুও পরে তাঁর ছবি তোলাবার জন্য গেলেন। প্রত্যেক ৬ খানার মূল্য ১৷৷ শিলিং ক'রে নিলে।

তোমার চিঠি, ছবি ও কার্ড এখান হ'তে ছাড়া যাবে। "মার্সেলস্" হ'তে পুনরায় তোমায় চিঠি ছাড়বার চেষ্টা করব। পরে একেবারে জেনেভা হ'তে লিখ্‌ব।

জেনেভা পৌঁছে, "আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সভা" (International Labour Conference) সম্বন্ধে কিছু লেখবার ইচ্ছা রইল। International Labour office-এর ছবি যোগাড় ক'রে তোমায় পাঠাব।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ লও।

ক্রমশঃ

প্রসূতি-মঙ্গল

সৃষ্টির বার্ত্তা

শ্রী কমলা সেন

স্নেহের শান্তি,

তোমার চিঠি অনেক দিন পাইনি। তোমার শাশুড়ীর চিঠিতে জানলেম তুমি অন্তঃসত্ত্বা। আমার ইচ্ছে ছিলো যে এ সময় তোমায় এখানে নিয়ে আসি। কিন্তু তোমার শাশুড়ী তাতে নারাজ। তাই দূর থেকে তোমায় এ অবস্থায় প্রতিপালন করার মতন দু-একটা কথা ব'লে দি।

রামপ্রসাদ বলছেন, "মা হওয়া কি মুখের কথা?" সত্যি শান্তি, মা হওয়া মুখের কথা নয়। নারীজীবনে যত কিছু কাজ আছে তার ভিতর সব চেয়ে দায়িত্বপূর্ণ হোলো এই মা হওয়া। প্রতিভাশালী, নির্ভীক, শক্তিমান সন্তান মায়ের গুণেই অনেক সময় হ'য়ে থাকে। আবার দুর্ব্বল, ভীরু, রোগা, অবু-থবু সন্তানও মায়ের দোষেই সময় সময় হয়।

প্রহ্লাদ, অমন হরিবিদ্বেষী পিতার রক্তে এবং ঐরকম দেশকালে জন্মগ্রহণ ক'রেও কেবল মায়ের মনের অবস্থার গুণেই ভক্তকুলের চূড়ামণি হ'য়ে জন্ম নিয়েছিলেন।

দৈত্যরাণী কয়াধূ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নারদগৃহে দীর্ঘকাল ধ'রে হরিমাহাত্ম্য শ্রবণ ক'রে হরিভক্তিতে তাঁর প্রাণ পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, তাই তাঁর গর্ভে দৈত্যবংশেও দেবতাদুর্লভ সত্যসন্ধ নির্ভীক ভক্তশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সন্তানের জন্য মায়ের আত্মনিবেদন, সংযম ও কঠোরতার কথা পৌরাণিক যুগে অনেক দেখা যায়।

মহাভারতের ভিতর কুন্তীদেবীও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছেলে হবার জন্য মহারাজ পাণ্ডুকে নিয়ে সহস্র বৎসর ধ'রে তপস্যা করেছিলেন। তাই তো তাঁর অর্জ্জুনের মতন ছেলে হ'য়ে নারীজন্ম সার্থকতার আনন্দে পূর্ণ ক'রে দিয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণও রুক্মিণীর সঙ্গে বহু বৎসর তপস্যা করেছিলেন প্রদ্যুম্নের জন্য।

ব্যাসদেব কুরুকুলের বংশরক্ষা করতে এসে প্রথমেই জননী সত্যবতীকে বলেছিলেন যে, "তোমার বধূদের বৎসরকাল ধ'রে ব্রতনিরত ক'রে রাখো, তারপর আমি আসবো—সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র কুরুকুলে জন্ম নেবে।"

সে তো বহুযুগ পূর্ব্বকার কথা, এ যুগেও তুমি বড় বড় লোকের জীবনী পড়লেই দেখতে পাবে, কীর্ত্তিমান সন্তানের জীবনের মূলদেশে তাদের মায়ের মহানুভবতা আছে। বিদ্যাসাগর, আশু মুখার্জ্জি শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি এর নিদর্শন। যার মা যেমনি খোরাক মনের ভিতর জাগিয়েছে তার সন্তান তেমনি হ'য়ে সৃষ্টি হ'য়েছে।

নেপোলিয়ানের মা গর্ভাবস্থায় কেবল যুদ্ধের চিন্তাতে দেশের স্বাধীনতার ভাবনাতেই নিমগ্ন ছিলেন। তখন তাঁর স্বামী দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য দিবারাত্র যুদ্ধ ক'রে বেড়িয়েছিলেন। নেপোলিয়ানের জন্মের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁর মা সেই সব যুদ্ধের কথাই ভাবতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর ঘরে সে সময় যেসব ছবি ছিল তাও নাকি যুদ্ধের ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি সেইসব ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে নেপোলিয়ানকে প্রসব করেন, তাই তো নেপোলিয়ান অমন বিশ্বিজয়ী বীর হ'য়ে জন্ম নেবার শক্তি পেয়েছিলেন। তাই তাঁর বীরত্বে সমস্ত ইয়োরোপ কম্পিত হ'য়েছিল।

তুমি লেখাপড়া জান, এ-সব বই তো কতই পড়েছ, এ-সব বইএর কথা আর নাই বল্লাম। আমার নিজের জীবন দিয়ে যা অনুভূত করেছি তাই তোমায় বলি।

তোমরা আজকালকার তরুণী—তোমরাই তো এখন

দেশের ভবিষ্যৎ বংশ গড়বে। দেশে এখন শত শত সুযোগ্য লোকের দরকার। নির্ভীক, শক্তিমান সন্তান জন্মান দেশের পক্ষে খুব প্রয়োজন দেহের শক্তি শতগুণ বেড়ে যায় প্রাণে যার শক্তি আছে; প্রাণে শক্তি সঞ্চার করা কতকটা মায়ের হাতে।

আমি যখন প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হই তখন আমাকেও অনেকে এমনি ধারা অনেক উপদেশ দিয়েছিল। আমি তাদের সেই সব উপদেশ-বত হাতের কাছে একখানা বিদ্যাসাগরের জীবনী পেয়ে খুব মন দিয়ে পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলাম। মাঝে মাঝে তাঁর দয়ার কথা মহানুভবতার কথা নিয়ে মনে মনে বেশ আলোচনা করতাম। তুমি জন্ম নেবার পরেও বোধ হয় কিছুদিন ধ'রে সে বইখানা মাঝেমাঝে পড়তাম।

আমি তোমার বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বভাব-চরিত্রের দিকে মনোনিবেশ ক'রে দেখে আসছি। তুমি হ'য়েছ অনেকটা বিদ্যাসাগরের মতই জেদী, মেধাবী, আর মাতৃভক্ত। আর দয়ালুও হ'য়েছ তাঁরই মত। তোমার অতিরিক্ত দয়া আর দানের জন্য বাড়ীর অনেকের কাছে তুমি বকুনিও খেয়েছ কত। কিন্তু আমি মনে মনে বুঝেছি যে বিদ্যাসাগরের দয়া এবং দান তোমার পেয়ে বসেছে।

তা ছাড়া সে জীবনীতে সাঁওতালদের সরলতার কথা পড়তে আমার খুব ভাল লাগতো। তোমার সরলতাটুকু বোধ হয় তাদেরই কাছ থেকে আমদানী করা। কারণ তোমার সরলতা যেন একটু বেশীরকমে তোমায় সরল ক'রে ফেলেছে।

আমার এর পর আবার যখন সন্তান জন্ম নেবার সময় হোলো, তখন পড়েছিলাম বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণচরিত্র"। পড়া বন্ধ করতে শুধু চোখ বোলান মনে কোরো না। পাঁচমাস থেকে আরম্ভ ক'রে নয়মাস অবধি অবসর পেলেই মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। আর তার ভিতরকার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতিকে মনে মনে যথেষ্ট বিশ্লেষণ করেছি।

তার ফলে বাণিকের খেলায় সকল বৃত্তিগুলিই হ'য়েছে সতেজ। সে বড় হ'য়ে যেমনি হোলো পড়ার ক্লাসে শ্রেষ্ঠ, মাঠে খেলায়ও তেমনি সবার ভালো হোলো। কাজকর্ম—যার ভিতর তাকে দেওয়া যেত সবই সে যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতো। তাকে কাঠ করতে, কোদাল পাড়তে দিয়ে দেখেছি সে তার বয়েসের অনুপাতে কার্য্যকুশলতা অনেক বেশী দেখিয়েছে। সময় সময় ঘরগোছান, আল্‌না-সাজানর ভার দিয়েও দেখেছি যে তার নিপুণতার তুলনা নাই।

সে তোমার ছোট, তাতে পুরুষ ছেলে, হ'লেও গৃহকর্ম্মের নিপুণতাতে সে যে তোমায় অনেক সময় হারিয়ে দিয়েছে তা বোধ হয় তোমার মনে আছে। এমনিধারা সে তার চরিত্রের সমস্ত কার্য্যকরী বৃত্তিগুলিতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলো।

ভগবানের ইচ্ছায় ভালো ক'রে তাকে পর্য্যবেক্ষণ করবার অবসর আর আমার হোলো না। সে বার' বৎসর বয়সেই আমার স্নেহ-যত্ন সব উপেক্ষা ক'রে বিধাতার পায় গিয়ে ঠাঁই নিলো।

তার পর সত্যর কথা বলি। সত্য জন্মাবার কিছু দিন আগে আমি হ'য়েছিলাম বাড়ী-ছাড়া। তাই সেখানে তেমন মনমতন ভাল বই-টই কিছু না পেয়ে বুদ্ধদেবের জীবনের কতগুলি ইতিবৃত্তপূর্ণ একখানি বই পেয়ে সেইখানিই প'ড়ে ফেললাম। তারপর আর একখানা বই পেয়েছিলাম—সেখানা ছিলো বিনয় সরকারের নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর।

আমি যেখানে ছিলাম সেখানে বিকেল হ'লেই অনেক মেয়েরা একজায়গায় মিলে অনেক গল্পগুজোব করতো, তার ভিতর অপরের চরিত্রহীন কুৎসিত ইতিবৃত্তই হোতো বেশী।

আমার নিজের অবস্থা ভেবে আমি তাতে বেশী যোগ না দিলেও বাধ্য হ'য়ে শুনে যেতে হোতো।

তারপর প্রায় পূর্ণমাসে বাড়ী ফিরে এলাম তোমার ঠাকুরমায়ের অসুখের খবর পেয়ে। মা'র তখন খুব বেশী অসুখ হ'য়েছিল। বাঁচবার আর আশা ছিল না। একে বুড়ো মানুষ, তাতে ঐ রকমের অসুখে একেবারে তিনি এলিয়ে পড়েছিলেন।

জলটুকু পর্য্যন্ত মুখের ভিতর ঢেলে না দিলে খেতে পারতেন না। অসুখ সারলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁর সেই জড়-থড় ভাব র'য়ে গেল। ভাতও'টি না খাইয়ে দিলে খেতে পারতেন না। পথ্যের বাটীটি মুখের কাছে তুলে দিতে হোতো। একটা কথা পাঁচবার ক'রে না বোঝালে বুঝতেন

না। কারুর নাম মনেও থাকতো না। কোন কথা ঠিক ক'রে বলতে পারতেন না, বা মনে কোন কথা ঠিক থাকত না। তাঁর কোন সময় কোন সেবার ত্রুটি হ'লেই এসব বিষয়ে অশক্ততার কথা মনে ক'রে শঙ্কিত হ'য়ে উঠতাম, সর্ব্বদাই তাঁর কাছে কাছে থাকতাম। ডাক্তার বা পাড়াপড়শীরা তাঁর খবরাখবর নিলে এসব বিষয়ই সবিস্তার বলতাম। তাঁর অসুখ ভাল ক'রে না সারতেই সন্তা জন্ম নিলো।

এখন সে বড় হ'য়েছে। তার স্বভাবের ভিতর আমি দেখতে পাই—আমি যত কিছু কাজে মনোযোগ করেছিলাম, তার সবগুলিই প্রায় তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে।

সে হ'য়েছে বুদ্ধের মত অহিংসক। একটি পিঁপড়েকেও সে সহজে মারতে চায় না। বুকার ওয়াশিংটনের মতন কষ্টসহিষ্ণু। রোদবৃষ্টি-পরিশ্রমে সে ভীত হয় না। তার শক্তির অতীত পরিশ্রমও সে করতে পিছায় না। তার সাহসও সাধারণের চেয়ে বেশী। কিন্তু আবার দেখ সে পটুতা কোন কাজেই লাভ করেনি। তোমার ঠাকুরমায়ের সে-সময়কার অবস্থার সঙ্গে তার অনেকটা মেলে। সে একমাস জল গড়াতে তিনমাস জল ঢালে, একখানা থালা আনতে পাঁচটা বাটী ছড়িয়ে ফেলে। ভাতক'টি না খাইয়ে দিলে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে সারা বাড়ী করে। জলের গ্লাসটিও মুখে তুলে দিলে যেন আরাম পায়।

সেই বুদ্ধার মতনই তার স্মৃতিশক্তি হ'য়েছে অত্যন্ত ক্ষীণ। বুদ্ধিও যেন তেমনি জড়তাপ্রাপ্ত। পাঁচবার ক'রে একটি কথা না বোঝালে সে বোঝে না। কোন কথা, বা কারু নাম তার সহজে মনে থাকে না।

তার স্বভাবে এসব ত্রুটি দেখে আমি বিস্ময়বিহ্বল হ'য়ে তার পানে চেয়ে থাকি। মনে মনে ব্যথিত হই। পড়া মুখস্থ করতে যে তার কি দেরী লাগে তা আর কি বলবো। আর অবিরাম প'ড়েও যখন পড়া মুখস্থ হয় না, তখন যেন আমার চক্ষে জল আসে। তখন সেও কেঁদে ফেলে।

তোমরা তার এসব ত্রুটি দেখে কত হাসতে, তাকে কত বকতে, তোমরা ত তখন ভিতরের খবর জানতে না। আমার কিন্তু কেবলি তার জন্য চ'খের জল আসে। তার বড় হ'লে কি এসব সারবে?

আমার সে কুৎসিত প্রসঙ্গ করার ফলও সন্তার ভিতর এড়ায় নি। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে, তার বয়সের অনুচিত এসব বিষয়ে মনোযোগ এবং পক্কতা তার হ'য়েছে।

সন্তার হবার পর আবার যখন অন্তঃসত্তা হ'লাম তখন সন্তা যে এমন হবে তা অবশ্য জানতেম না, কিন্তু তখন বয়স নিজের একটু বেড়েছিলো ব'লে নানারকম অসুবিধাকে দূর ক'রে অগ্রাহ্য ক'রে ভালো ভালো বই পড়তে, নিজের মন পবিত্র রাখতে যথাসাধ্য যত্ন নিতে লাগলেম।

তার পর তোমার আরো দুটি বোন হ'য়েছে। তারা যে মেয়ে হবে তা অবশ্য আগে মোটেই আশা করিনি। দেশের কথা কাগজপত্রে প'ড়ে প'ড়ে, দেশকর্ম্মী হবার মতন শক্তি নিয়ে জাতক জন্মগ্রহণ করুক এই ভাবেই অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলাম। মনের খোরাকও যুগিয়েছিলাম সেই অনুরূপ। আবার সবটুকুন শক্তি দিয়ে, দেশের এবং দশের সেবায় লাগবার যোগ্য বীর তেজস্বী শক্তিমান সন্তান দেশমাতৃকার চরণে উপহার দেবো—এই আকাঙ্ক্ষাটাই ছিলো প্রবল। ভগবানের ইচ্ছায় তারা মেয়ে হ'য়ে জন্ম নিলো।

তুমি মীরা আর নীরার দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখ—তাদের শক্তি, সাহস, তেজস্বী স্বভাব হ'য়েছে ঠিক যেন পুরুষের মত।

মা অনেক সময় তাদের এজন্য কত বকেন। লাফঝাঁপ দেওয়ায়, ছুটোছুটি খেলায় মীরা তার বড় পুরুষ ছেলেকেও অনেক সময় হারিয়ে দেয়। তার চতুরতায়, বুদ্ধিকুশলতায় সকলেই হারার সময় তাকে নিজের দিকে নিতে চায়। দেহের এবং মস্তিষ্কের শক্তিও মীরার খুব ভালো হ'য়েছে ব'লেই মনে হয়। পড়াশুনায় সে খুব শীগ্‌গির অগ্রসর হ'য়ে যাচ্ছে।

নীরা এখনো ছোট, তার চরিত্রের কথা তেমন ক'রে কিছু বলা যায় না। গর্ভাবস্থায় নেপোলিয়নের জীবনী পড়েছিলাম। নেপোলিয়নের মতনই বীর ছেলে হ'য়ে দেশে তেমনি ক'রে নবযুগ আনুক, এই কামনাই ছিলো মনে প্রবল, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ।

তবে আমার সাধনা একেবারে ফেলা যাবে না আমার আছে। বীর মায়ের পেটেই তো বী

একটি ভালো মা হ'লে দশটি ভালো সন্তান সৃষ্টি ক'রে দেশের মা'কে উপহার দেবে।

নীরাকে বোধ হয় তুমি শীগ্‌গির দেখনি। নীরা এখন অনেক বড় হ'য়েছে। সে যখন ভাইবোনের সঙ্গে খেলা করে, মারামারি করে, তখন তার নেপোলিয়ানের মতনই অপূর্ব্ব যুদ্ধকৌশল ফুটে উঠে।

নীরা বড় হ'লেও কৌশলে অনেক সময় নীরার কাছে হার মানে, অনেক মার খায়। নীরা ছুটোছুটি করে, মারামারি করার সময় এমনি জায়গাটিতে দাঁড়ায় যে সেখান থেকে আক্রমণ করলে আর বিপক্ষের নিস্তার নাই।

বড় বড় ভাই-বোনদের সে এমনি ক'রে মারে যে তারা নাকাল হ'য়ে যায়। পরক্ষণেই আবার কত দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে তাদের ভোলায়।

তার কাণ্ড যদি তুমি দেখতে, তা হ'লে হেসে লুটিয়ে পড়তে। আর যে হাসি রোগ তোমার আছে!

থাক এসব কথা। আমার নিজের জীবনে অনুষ্ঠিত মাতৃ-জীবনের ইতিবৃত্ত সবই তোমায় লিখলাম। তোমার এখন-কার কর্ত্তব্যের ধারাটা এখন তুমি নিজেই ঠিক ক'রে নিতে পারবে।

কতকগুলি নূতন মানবের ভাল এবং মন্দ হবার ভার তোমাদের উপর রয়েছে। গোড়া থেকেই যত্ন না নিলে, ছেলে মন্দ হ'লে শেষে আপশোষ ক'রে কোন ফল হবে না। এর পর চরিত্রগঠনের সময়েও মায়ের অনেক দায়িত্ব আছে। সে সব কথা পরে বোল্‌বো।

ঘোটের উপর, সন্তান মায়ের হাতের পুতুল—যেমনি ক'রে গ'ড়ে তুলবে, তেমনি উপভোগ করতে হবে। ছেলে মন্দ এবং অবাধ্য হয় শুধু মায়ের দোষে, এইটুকু জেনে রেখো।

গর্ভের দশটি মাস ধ'রে অনন্যব্রত হ'য়ে সন্তান কেমন হ'য়ে সৃষ্টি হবে তার ছবি মনের মাঝে আঁকো একান্তমনে;—মনে করো, ভগবান্ যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানি দূর ক'রে সত্য স্থাপন করতে নেমে এসেছেন, এবারও তিনি আমার কাছেই আসছেন,—শ্রীরামচন্দ্রের মত লোকপ্রিয় হ'য়ে, কংসারির মতন সর্ব্বাঙ্গ-পরিপতি নিয়ে; নরসিংহের মতন বীরসন্তান এবার আমায় আসছে—সে দেশকে রক্ষা করবে, আমায় রক্ষা করবে, ধর্ম্মের গ্লানি দূর ক'রে, দেশময় সত্যের আসন বিছিয়ে দেবে!

যুগে যুগে ভক্তের আহ্বানে তিনি অবতীর্ণ হ'য়ে এসেছেন। তোমরা একান্তমনে তাঁকে ডাকো—তোমাদের ডাকে আসন তাঁর টলবে।

আজ তা হ'লে এই পর্য্যন্ত থাকলো। মেহাশিস নিও, সাবধান মত থেকো। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
তোমার "মা"

নিয়তি

শ্রী হেমাঙ্গিনী সেন

ওই শোন্ ওরে দেবী-অঙ্গনে
বাজে বুঝি শাঁখ আরতি-ভরে,—
জেনে আয় তোরা, দেখেছে কি তারা
আমার মাণিক সেথা কি করে?
সন্ধিপূজার বাজনা যখন
ঘন-গরজনে উঠিল বাজি',
মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে
গেছে কি সে প'রে ফুলের সাজি!
দেখেছে কি কেহ মুখখানি তার
প্রখর কিরণে মলিন কি না?
সহাস আনন শুকায়ে গেছে কি
দীর্ঘখনের আহার বিনা?

পূজার দালানে সুমোহন সাজে
　　কেহ কি দেখেছে পুরিতে তাকে,—
দেখেছে কি তারে খেলিবার মাঠে
　　ছুটে গেছে কি না কাহারো ডাকে ?
বলিয়া দাও গো পথের পথিক,—
　　রেলিং-ঘেরা ও পথটি দিয়ে
কেহ কি যেখনি গিয়াছে সে কি না
　　ঘরের মোছা বা বাইক নিয়ে।
সহসা আমার কাঁদে কেন বুক
　　কি জানি কি ছোল প্রমাদ গণি'
আসেনা ত ফিরে'—বলেনা ত কেহ
　　খুঁজিয়া পেয়েছে হারানমণি।
বন্ধিং-খেলা বাড়াল কি বেলা
　　দেরী আজ তাই হ'য়েছে এত,
কোন ক'রে সেটা জেনে আয় কেহ
　　এতখানি বেলা করে না সে ত !
বাড়া ভাত তার রয়েছে সাজানো—
　　জলের গেলাস রয়েছে ঢাকা,
ঘরে ও বাহিরে প্রিয় যা তাহার
　　সকলি তেমনি হ'য়েছে রাখা।
আলনার দোলে কোঁচান কাপড়
　　এই ত সে রেখে গিয়াছে খুলে',
সাইকেলে কাদা রয়েছে মাখানো,—
　　জুতাও ঘরে সে যায় নি ভুলে'।
এখনো যে তার শুকায়নি ঘাম
　　কচি মুখ 'পরে পড়িছে ঝরে,
এখনো যে তার কথার সুরটি
　　ঘুরিয়া ফিরিছে সারাটি ঘরে !
এখনো যে তার চকলতার
　　প্রতিধ্বনিটি ছুটিয়া আসে—
"মা তুমি কোথায়, দাওনা খাবার"
　　কেবলি যে শুনি কানের পাশে।
ভেসে ওঠে চোখে নিরাশাকাতর
　　কচি মুখখানি নয়ন-কোণে,
প্রিয় 'মধুপুরে' যাইবেনা শুনি'
　　পেয়েছিল ব্যথা বুঝিনু মনে।
মলিন মুখেতে আপনার ঘরে
　　নীরবে যখন গেল সে চ'লে,
জলভরা আঁখি দেখেও বলিনি—
　　যাস্ বাছা পরে সুবিধা হ'লে।

•

কে আছে আমার দরদী বন্ধু
　　বলিয়া দাও গো সত্য ক'রে,
আমার বুকের পাঁজরে পাঁজরে
　　আজিকে কিসের বেদনা ঘরে !
নয়নেতে জল কোথা হ'তে আসে,—
　　কাঁপে কেন সারা হৃদয়খানি ?
আমার জীবনে জানি না কখন
　　কারে বলে দুখ-শোকের বাণী।
সত্য কি কিছু হ'য়েছে আমার
　　মহাষ্টমীর দ্বিপ্রহরে ?
হারায়ে গেল কি খুঁজিকরা ধন,
　　অথবা নিল কি নিঠুর চোরে ?
কি বলিছ সবে—আমারি গোপাল
　　হারাল অতল সলিল-বুকে ?—
থেমে গেছে তার স্পন্দন না কি
　　জীবন-মৃত্যু-সন্ধিমুখে।
খুঁজে দেখ যদি হয় ত মাণিক
　　হইয়া পড়েছে চেতনহারা,
বুকের ভিতর স্পন্দন তার
　　হয় ত নীরবে দিতেছে সাড়া।
আন সবে ছুটে জলভরা ব্যাগ
　　গরমে চেতন মিলিতে পারে,
কম্বলে ঢাকো দেহখানি তার—
　　নাড়াচাড়া বেশী কোর না তারে।
শীতল জলেতে সুকুমার তনু
　　বিবশ বইয়া পড়েছে লুটি',
হয় ত ক্ষুধায় কাতর হ'য়েছে—
　　নিমীলিত তাই নয়নদুটি।

যা ফিরি'
সবারই এই দুয়ার ধরে, —
জননী ফিরে যাও ঘরে—'
বাঁকে যায় তব পথিকদলে
যা কিছু তারে কুমার কিশোর
মধু-আহ্বানে শুনিয়া কানে,
ফেলি' গেল চলিতে চলিয়া
অজানা অহর স্নেহের টানে ?
অনাদরে এক বারেকটি ফেলে'
তাদেরে আমরা একটি দিন,

ফেরায় চলি,'
আমার মাণিক
ফিরায় ধরি'।

যাত্রা যদি এ পুত্র-তারার
নিবিড় বেদনা-করুণ ডাক,
অন্তর-তলে আমলে তবে
তারি মধুস্মৃতি প্রবোধ থাক !
ফিরে যাবে তবে কুমারে আমার
বহু শাশ্বত এমাতীরে,
বিছাই কুন্তল-শয্যাটি তার
তপিনী মায়ের অশ্রুনীরে।
তারার নবীন সন্ধ্যার পথ
কল্যাণশিখে হউক ভরি',
সফল 'সে'-আশা সার্থক হোক
আমার সন্তা হরণ করি'।
শতশত পুত্র-তারার
বেদনা-তপ্ত অশ্রুসাথে,
আমার বেদনা মিশে যাক আজ—
প্রতি ফুটে থাক আঁখির পাতে।
পরমেশ-পদে অভিলাষ মম
সকরুণে আজ জানাই—প্রভু,
কোন জননীর অঞ্চলতলে
ফিরে যদি তারে পাওহে কভু,
নবীন 'সে'-আশা সফল করিতে
অবসরটুকু দানিও তাকে ;
দেখে যেন তার জীবন-রন্ধ্র
কৈশোর-পথে নিয়তি-ডাকে !

কবিতা

শ্রী ভক্তি

সংসারের কাঁটা-পথে চলতে গিয়ে ভাগ্য-বিপর্য্যয় বহুবার ঘটে; ফলে সুখ-দুঃখের অনেক কাহিনী, কালের কোলে আশ্রয় নেওয়া আত্মীয়স্বজনের মুখগুলি, সব-কিছু বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গিয়েছে; কিন্তু—কিন্তু সেই অভিমান-ভরা সন্ধ্যাকোটা গোলাপের মতো মুখখানি পলকের জন্যও তো ভুলতে পারি নি! সেই শান্তোজ্জ্বল চোখদুটি এখনো যেন অপলকে আমার পানে অহর্নিশি চেয়ে আছে—তারা আমার কর্ত্তব্য ভুলায় না, বরং প্রতিপদে ইসারায় আমায় সতর্কতা দেয়। আমি তাতে সাহস পাই এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ধাক্কায় নুয়ে-পড়া দেহখানি নিয়ে অতি-সহজে আমার রোজকার কাজগুলি সেরে ফেলি—জানি, সে তো একদিন আসবেই, এসে যখন দেখবে যে, আমি যাবতীয় কাজগুলি সেরে রেখে কেবল তার আগমনী-গানেই ব্যস্ত, তখন সে যোগ্য পুরস্কার দেবে এবং কক্ষণো আর এমন ক'রে একলা ফেলে পালাতে লজ্জা না পেয়ে পারবে না। কিন্তু হায়, সে এখনো এল না।···

আজ তোমাদের কাছে তার কাহিনী একটু বলবো। তোমরা হয় তো তর্ক ক'রে বলবে যে, এটি আমার তার স্মৃতি রাখবার প্রয়াস ভিন্ন আর কিছু নয় এবং সেটি না কি মনো-মন্দিরেই রাখা ভালো। কিন্তু বলি, অন্তরে ও বাইরে যে-একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে তা তোমরা একনিশ্বাসে উড়িয়ে দেবে? তা যদি দাও, বলবো—তোমরা অনভিজ্ঞ অনুভবের দল! তা হ'লে তাজসম্রাট শাহাজান প্রেমের প্রতীক, দীর্ঘশ্বাসের সম্পদ তাজমহলটি তো আপন মনো-মন্দিরেই প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।

সকলে তাকে নন্দ বা নন্দরাণী ব'লে ডাকতো। আমি কিন্তু তাকে ঐ নাম ধ'রে ডাকতে পারতুম না। আমার মনে হ'তো এমন সুন্দর কোমল চেহারাখানি যার তাকে এ-নামে ডাকলে স্রষ্টার শুধু একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জিনিষকে নয়, তাঁকেও অপমান করা হয়।

সে কি মোহিনী মূর্ত্তি! নুরজাহানের নিখুঁত সৌন্দর্য্যের কথা ইতিহাসে অবগত হই,—শুনি, এমন সুন্দরী রমণী না কি সে যুগে কুত্রাপি দৃষ্ট হয়নি। কিন্তু আমার কথা আজ তোমরা মেনে নেবে কি না জানি না, তবে ইতিহাসের পাতার পর পাতা দিয়ে প্রকাশিত সম্রাট-পত্নীর সৌন্দর্য্য—আর আমার নিজের চোখ দিয়ে দেখা তার রূপরাশি (যখন তার শেলফের পাশের আর্শিখানিতে পড়েছিল তখন) পাশা-পাশি মিলিয়ে দেখলুম, মনে হ'ল—কত যুগ-যুগান্তর ধ'রে নিখিলের সমস্ত মাধুরীরাশি নিঙড়ে যেন সে সারা অঙ্গে প্রলেপ দিয়েছে—স্বর্গ যেন তার শ্রেষ্ঠ উপহারটি মর্ত্ত্যলোকের দ্বারে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভাবলুম, তার তুলনা তাকে দিয়েই সম্ভব। তবে সে সম্রাটের ঘরের গিন্নি নয় ব'লে আমি ছাড়া তার কথা বড় কেউ আর একটা জানে না।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি যখন তার মুখপানে তাকাতুম তখন কল্পনা-লোকের, স্বপ্ন লোকের, বাস্তব-লোকের যতকিছু ভাবধারা সব একসঙ্গে এসে আমার মনখানিকে তোলপাড় ক'রে দিত। আমি যেন সব হারিয়ে তার পাশটিতে ব'সে থাকতুম। সে বোধ করি বুঝতে পারতো, তাই মাঝে-মাঝে গোলাপী মুখখানি ফিরিয়ে নিত, কখনো বা চুপি চুপি আমার মুখপানে চেয়ে থাকতো—বুঝি আমার বিভ্রান্তিটুকু লক্ষ্য করতো। অনেক বাজে কথা ব'লে ফেলেছি,—যাক্, তাকে তাই আমি কবিতা নাম দিয়েছিলুম। তোমাদের সঙ্গে আমিও একমত, এ-নামটি দেওয়া একমাত্র কাব্য-জগতের লোকেরই শোভা পায়। কিন্তু কি জানি, আমি তাকে তা-ই বলেছিলুম আর সে অমনি সলজ্জ হাসি হেসে আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছিল।

আমাদের একটা জায়গায় এমন সুন্দর মিল ছিল, এমন মিল বোধ করি তোমরা আর কোথাও শুনবে না। তার যে মাসে জন্ম আমারো জন্ম সেই মাসে—সে ছিল মা-বাপের একমাত্র মেয়ে আর আমি ছিলুম একমাত্র ছেলে; বাইরের

অল্প আঘাতেই দু'জনের চোখেই অবিরাম জল ঝরতো—উভয়েই সমান আদরে এবং অভিমানী ছিলুম। তবে আমি ছিলুম চার বছরের বড়। তাই আমাদের মনের মিল ছিল এক অভিনব ধরণের—যা তোমাদের মধ্যে অনেকে কল্পনা করতেও পারবে না হয় ত।

আমরা উভয়ে অকপটে আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করতুম—গোপন ব'লে কথাটা আমাদের কাছে যেন ঠাকুরমা'র রূপ-কথা বলে মনে হ'তো। আমরা পরস্পর পরস্পরকে দিনের বাধায় খুব বেশীবার না দেখে থাকতে পারতুম না। যদি কিছু দিনের জন্যে ছাড়াছাড়ির একটি সময় এসে উপস্থিত হ'তো, তার তিন-চার দিন আগে থেকে আমাদের বুকে যেন শেল বিঁধতো। আমাদের ভালোবাসার মধ্যে প্রতাপ-শৈবলিনীর ভালোবাসার ছাপ বিন্দুমাত্র ছিল না। বিদেশী কবি ছট প্রকৃত ভালোবাসার যে সূত্র দিয়ে গেছেন, আমার মনে হয়, আমাদের ভালোবাসা তাকেও যেন অনেকাংশে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অনেক সময় নির্জনে ব'সে যখন আমাদের দু'জনের কথা ভাবতুম, তখন চোখের সামনে দেবদারু এবং পার্বতীর ছবিটি কেবলই ফুটে উঠ্‌তো। তা'রা দুটিতে স্থিরদৃষ্টিতে আমাদের পানে যেন তাকিয়ে থাকতো এবং মৌনের নাকে সমাজের সকলপ্রকার ফাঁকা শাসন-পদ্ধতিকে উপেক্ষা ক'রে চলতে উৎসাহ দিত এবং যাতে তাদের মতো আমাদেরও সর্ব্বনাশ করতে না পারে সে বিষয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে বলতো।

এবার তোমাদের আমাদের ভালোবাসার প্রতি সন্দেহ করবার একটু সুযোগ দেব। আমার প্রবাসকালে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং প্রথম কাজ ছিল, তাকে একখানি ক'রে চিঠি দেওয়া। এবং প্রত্যুত্তরের আশায় প্রতিদিন পথপানে তাকের আশায় সকল কাজ ফেলে-রেখে পাগলের মতো তাকিয়ে থাকতুম। কিন্তু রোজই হতাশ হতুম। তাই একদিন কথা-প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—"তুমি ভয়ানক নিষ্ঠুর, আমার কোনো চিঠির জবাব দাও না কেন বল তো?" সে আমার রাগ এবং অভিমান দেখে ঈষৎ হেসে বললে:—"চিঠি লিখলেই কি প্রাণের টানটুকু বেশী ক'রে জানানো হয় মনে কর? পৃথিবীর অনাদি কাল থেকে সমুদ্রের সঙ্গে নদীর যে একটা গভীর সম্বন্ধ র'য়ে গেছে তা কি তুমি ভুলে যাচ্ছ! সাধারণে কিন্তু এইখানটিতেই ভুল ক'রে বসে; যখন প্রবল বন্যা কিম্বা আবহাওয়া সমুদ্র থেকে জল এনে নদীর দেহ স্ফীত করে তখন সকলে মনে করে—নদীর সঙ্গে সমুদ্রের সম্বন্ধ যেন শুধু ঐ দিনই।" আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বলুম—"আমি ওসব হেঁয়ালী বুঝি না; তুমি পত্রের জবাব দাও না কেন বল তো?" সে একটু গম্ভীর হ'ল এবং বললো, "চিঠি তোমাকে আমি একখানা কেন, প্রতি ঘণ্টায় মনে যে-সব কথার উদ্রেক হয় সমস্ত জানিয়ে অনেকগুলি ক'রে লিখতে পারি। লিখি না কেন জানো? লিখি না—কারণ, যদি কেউ কিছু মনে করে!" আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল। বলুম—"অর্থাৎ?" সে 'লেলাই-শিক্ষা' কেতাব খানি সামনের শেল্‌ফের উপর রেখে বল্ল—"কেন, এ তো সাদা কথা। তুমি কি মনে কর দেশ এখন তেমনি তৈরী হয়েছে? মুখে তো অনেকে অনেক কথা বলে শুনি—স্ত্রীস্বাধীনতা, সাম্যবাদ ইত্যাদি এমনি আরো অনেককিছু যুগ-যোগ্য কথা, কিন্তু তারাই যারা এ-সব কথা এবং ভাবের আমদানী করে, যদি একজন তরুণ ও তরুণীকে নিরিবিলি যায়গায় কথা কইতে দেখে অমনি তাদের মাথায় সন্দেহের পোকাগুলি কিল্‌বিল্ ক'রে ন'ড়ে উঠে এবং বিদ্যুৎগতিতে কানা-কানি আরম্ভ ক'রে দেয়—হ'ক না কেন, তাদের কাছে ওই অপরিচিত এবং অপরিচিতা দুটি ভাই-বোন! তবে একথা স্বীকার করি যে, সত্যিকারের ভালোবাসার পথ কেউই কখনো রুদ্ধ করতে পারে না।" আমি বিস্ময়ে তার আরক্ত মুখখানির পানে অনেকক্ষণ চেয়েছিলুম, তারপর বলুম—"এ-রকম সমাজকে আমি ঘৃণা করি। যে প্রেমকে স্বর্গের সমান ব'লে বুলি আওড়িয়ে বেড়ায়, সেই প্রেমকে কার্য্যক্ষেত্রে যদি সে দু'টি ঢিলে মারতে লজ্জা না পায় তাকে কি আমি পূজো করবো বলতে চাও?" সে ডাগর চোখদুটি দিয়ে একবার তার শোবার ঘরের পশ্চিম দেওয়ালে লম্বিত '—' ছবিখানির প্রতি একটু কটাক্ষ করলো, পরে আমার পানে আড়-চোখে চেয়েই চোখদুটি ঘুরিয়ে নিয়ে বললো—"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

তর্কে তার কাছে আমাকে প্রায়ই পরাজয় স্বীকার করতে

হ'তো। তবু তাতে যথেষ্ট শান্তি পেতুম—কারণ, সে তর্কে এমন যুক্তি দেখিয়ে হারাতো যে তার কথাও আমি ভেবে পেতুম না। তার ব্যবহার ছিল অতি মধুময়, ঝগড়া ব'লে জিনিসটি সে মোটেই জানতো না। তবে একটু দুর্বলতার হাত থেকে নিজেকে সে কোনোমতেই এড়িয়ে আসতে পারে নি। তর্ককালীন সে একটু একটু ব্যক্তিগত আক্রমণ করতো; কিন্তু এমনি মজা যে, সহজে বড় কেউ সেটা ধরতে পারতো না। একথা আমি তাকে বহুশত বার বলেছিলুম। সে তার প্রত্যুত্তরে বলেছিল যে, লোকে তার কথা কেউ ধরে না এবং কেন যে ধরে না সে তা আদৌ জানে না। আমি একটু কৌতুকের ছলে বললুম—"সুন্দর মুখের সম্বন্ধে জন্ম ব'লে যে-কথাটা আছে তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে!" সে একগাল হেসে বললে—"পূর্ণিমার চাঁদের মধ্যেও দরকার হ'লে লোকে কলঙ্কের ছাপ দেখতে ভুলে না।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং কবিতার প্রতি তার একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল; তাই যখনই তাদের বাড়ী বেড়াতে যেতুম, প্রায়ই দেখতুম কবির একখানা না একখানা বই তার হাতে। চয়নিকা'খানি ছিল তার অতি প্রিয় বস্তু। দ্বিতীয় শ্রেণীতে চিত্রাঙ্কণবিদ্যায় বিশেষভাবে পারদর্শিতা লাভ করেছিল ব'লে ঐ বইখানি এবং আরো কতকগুলি দামী বই পারিতোষিক পেয়েছিল। তোমাদের অনেক সময় নষ্ট করলুম; আমার কথা ধরণই দিয়ে শুনে এসেছ ব'লে তোমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। 'চয়নিকা' সম্বন্ধে সামান্য আর একটা কথা ব'লেই আমি তোমাদের কাছ থেকে স'রে দাঁড়াবো।

প্রতি রবিবারে আমি রবীন্দ্রনাথের "চয়নিকা" পড়তুম। তাই, শনিবার বিকেলে তাদের বাড়ী গিয়ে বইখানি নিয়ে আসতুম। তোমরা বোধ করি বুঝতে পারছো যে, ঐ বইখানি আমার ছিল না ব'লেই তার কাছ থেকে আনতুম, তার-ই "চয়নিকা"খানি পড়বো ব'লে নয়। যেদিন যেতে না পারতুম সে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতো। তার অনাবশ্যকতার জন্যে বইখানি কিন্তু কীট-দষ্ট হ'য়েছিল। আমি তাই সোনার জলে তার নাম লিখিয়ে বইখানি বাঁধিয়ে দিলুম একদিন। বইখানি হাতে পেয়েই সে তর্জন-গর্জন ক'রে বললো—"আমার বই তুমি আমার মত না নিয়ে বাঁধাতে গেলে কেন?" আমি তার এ-প্রকার ব্যবহার কোনো দিনই আশা করি নি; তাই, প্রথম একটু 'অপ্রস্তুত' পড়লুম। কোনোমতে সামলে নিয়ে বললুম, "বইখানি তোমার একারই তো কাজে লাগে না, আর তোমার যেখানটি কাজে লাগে আমি সেখানটি না বাঁধিয়ে নিজের দরকারী জায়গাটি বাঁধিয়ে এনেছি।" এ-চিত্র ভালো উত্তর আমি আর দিতে পারলুম না। সে তেমনি রেগেই বললো—"আমার দরকার নেই, তুমি বই নিয়ে যাও; আর যদি আমাকে দিয়ে যাবারই ইচ্ছা থাকে, এই ছুরিটি নিয়ে মলাটখানি কেটে দিয়ে যাও।" এই ব'লে একখানি ছুরি বের ক'রে দিয়ে তার পড়বার ঘরে ঢুকে গেল—আমিও নিঃশব্দে কাটতে আরম্ভ করলুম। মলাটখানি কাটার সঙ্গে-সঙ্গে কি জানি কেন, আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো। সে লক্ষ্য করলো এবং বললে:—"ও, তুমি কাঁদছো? না, না লক্ষ্মীটি, তুমি যে সত্যিই কাটবে তা কি আমি জানতুম? তোমার হাতে ধরি, আমাকে যত পারো, যেমন ক'রে পারো অপমান ক'রে যাও।" দেখলুম আমার চোখে জল যা না পড়েছিল তার অনেকগুণ বেশী জল তার চোখ দিয়ে পড়লো। তাকে অপমান আমাকে করতে হ'লো না, তার মা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে তাকে এমন সব কথা বললেন যাতে আমি নিজের কথা ভুলে গিয়ে তার দিক না নিয়ে পারি নি—আমার মোটেই মনে ছিল না যে, ক্ষণকাল পূর্বে তাকে অপমান করা তো দূরের কথা তার একটি কথারও উত্তর দিতে আমি লজ্জা বোধ করেছিলুম। সে আঁচলে চোখদুটি মুছ্‌তে মুছ্‌তে বললো—"কাল একবার দয়া ক'রে এসো, একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে।" আমি "চেষ্টা করবো"—ব'লে বইখানি তুলে নিয়ে চ'লে এলুম।

পরদিন সকালে উঠে নিত্যকর্মগুলি সারতে একটু বেলা হ'য়ে গিয়েছিল। আমার জন্মতিথি উপলক্ষে 'কবিতা'র মা'র দেওয়া দেয়ালঘড়িটির পানে চেয়ে দেখলুম—তাদের বাড়ী যে সময় যেতুম দু'ঘণ্টা হ'ল তা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচলুম—কারণ, শুধু ঐ সময়টি তাদের বাড়ী একবার যেতে ইচ্ছা করতো। কিছু যেন ভালো লাগছিল না। রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাসখানি যেমন

পুলেছি অমনি তাদের বাড়ীর ঝি সত্যার মা এসে ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললো:—"না, দাদা বাবু, এ তাই আপনার অন্যায়! সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমার আদা-যাওয়া বন্ধ ক'রে দেবা? কাল সকালের চল, দিদিমণিরা কাল পুরী চ'লে যাবেন, হঠাৎ ঠিক হ'য়ে গেল।" আমি সত্যার মা'র কথা অতিমাত্রায় বিশ্বাস করলুম কিন্তু কি জানি কেন, সেদিন, আমার দুর্ভাগ্যই বল আর যা-ই বল, তাকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। গম্ভীর হ'য়ে বল্লুম—"তুমি গিয়ে বলগে যে আমার একটু দরকারী কাজ আছে, ওবেলা যাব'খন।" সত্যার মা বোধ করি সন্তুষ্ট হয়নি, তাই আর কথাটি না ব'লে নিঃশব্দে চ'লে গেল।

কথা বলার রাখা অভ্যাসটা আমার ছোটো বেলা থেকে ছিল। তাই সন্ধ্যার কিছু পরে তাদের বাড়ী গেলুম, দেখলুম, 'কবিতা' কাপড়, বিছানাপত্র ইত্যাদি বেঁধে' ছেঁদে' নিতে অতি ব্যস্ত। আমি অতি সন্তর্পণে সিঁড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু প্রথম তার-ই নজরে পড়ি। সে তাড়াতাড়ি অথচ সঙ্কুচিতভাবে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারি নি। কিন্তু শেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে সে-ই। বললে, "কাল আমরা হঠাৎ পুরী যাচ্ছি," ব'লে আমার মুখের কথাটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো—শেষে আমার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে অতি ক্ষীণ-স্বরে বললো—"কি বলবে, বল।" আমি নিরুত্তর। সে আবার আরম্ভ করলো—"তোমাকে তো যেতে বলতে পারি না, ছ' মাস মাসীমার কাছে যাও নি। কলেজেরও ছুটি শেষ হ'য়ে এলো।" এবারে আমাকে তেমনি নিরুত্তর দেখে ব্যথিতবিস্ময়ে বললো—"ও, কালকের কথা বুঝি এখনো ভুলতে পারোনি তুমি?"

বলার সঙ্গে সঙ্গে তার আঁখিপুটি ছল্ ছল্ ক'রে এলো। অতি বিনয়ের সঙ্গে বললো:—"দেখ তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর, আমি সেখানে গিয়ে শান্তি পাব না, এমন কি যেতে পারব কি না সন্দেহ।" আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। বললুম—'না,না, ও আমি তোমাকে মনোকষ্ট দেবার জন্যে অমনি করেছিলুম।" সে কিন্তু এত সহজে ছাড়ল না। অ রো ব্যস্তভাবে বললো—আমি কোন কথা শুনতে চাই না, বল ক্ষমা করেছো?" আমি বললুম—"হাঁ গো হাঁ!" সে অমনি অভিমানভরে—"হাঁ গো হাঁ" আমার অনুরূপ স্বরে ব'লে একটি কটাক্ষ করলো। তারপর কত কথা: শেষে যখন উঠবো-উঠবো করছি এমন সময় আমার অতি কাছে এসে বললো, "আমার জন্যে তোমার মন কেমন করবে না!" আমাকে উত্তর দেবার অবসর না দিয়েই আবার বললো, "আচ্ছা যদি সমুদ্রে ডুবে ম'রে যাই?" আমার বুকের ভিতরটা যেন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। বললুম —"আমার শুভেচ্ছা মেনে যাও, কিছু ভয় নেই।" বাড়ী চ'লে এলুম।

পরদিন তাদের বাড়ী গিয়ে দেখি তারা চ'লে গেছে। সত্যার মা সন্ধ্যার বাতি জেলে ঘর আগ্‌লে আছে। আমি তাদের সমস্ত ঘরগুলির ভিতর ঢুকে বেশ ক'রে দেখতে লাগ্‌লুম।

সব কথা আর মনে নেই। শুধু—'আচ্ছা যদি সমুদ্রে ডুবে ম'রে যাই'—কথাটি এখনো কানের কাছে অহরহ বাজে। প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন প্রতিপলে, শত কাজের মাঝেও ব'লে উঠে—"আমার কবিতা হারিয়ে গেছে!..."

বিজ্ঞাপন ও প্রচার-বিভাগে

মিসেস রেনা গিবস্ ম্যাডমোর—প্রথম আমেরিকান মহিলা যিনি প্যারিসের একটি বিখ্যাত সংবাদপত্রসমূহের জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রচার-বিভাগের কর্মীরূপে কৃতিত্বের সহিত কার্য্যপরিচালনা করিতেছেন। শ্রীমতী রেনা ইথাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন কর্ণাল বিশ্ববিদ্যালয়ে; এবং কিছুদিন তথায় ভাসার-কলেজের 'ডীন'-এর সেক্রেটারীরূপে কাজ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার সংবাদপত্রে কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়, এবং নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড্ সানডে ম্যাগাজিনে চার-বৎসর কাজ করেন। বর্ত্তমানে প্যারিসের সাংবাদিক মহলে তিনি সুপরিচিত।

মহিলা-ক্লাবের সভ্যাদের নাট্য-অভিনয়

"South Dakota" মহিলা-ক্লাবের কতিপয় সভ্য মিলিয়া সম্প্রতি "ঘাটের দেশে এলিস্" নামক একটি চমৎকার নাটিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রণয়ন, প্রযোজন, অভিনয়—সব তাঁহারাই করিয়াছিলেন। এই "ঘাটের দেশে" নাটিকার একটি দৃশ্যের আলোক-চিত্র এখানে দেওয়া গেল।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব

রাজসাহী, নওগাঁ মহকুমার ডাক্তারখ্যাত ৺ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্রের দুইটি কন্যা—শ্রীমতী অরুন্ধতী ও শ্রীমতী রেণুকা সম্প্রতি পুনা মহিলাবিদ্যাপীঠের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় সকৃতিত্বে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বৈশিষ্ট্য এই, ইঁহারা বাড়ীতে থাকিয়াই শিক্ষালাভ করিয়াছেন, স্কুলে গিয়া নয়।

থিয়েটারের সভ্যতাবিভাগের অধ্যক্ষা

মিস্ হেরিটেজ্ ব্রজ্—ইনি নিউইয়র্কের রঙ্গী থিয়েটারের

সম্ভাবিত্রী গ্রঃ এ বিষয়ে ইহার কৃতিত্ব অসাধারণ

মহিলা এনামেল কারু-শিল্পী

মিস্ নেলা কাভেনা—এনামেল কারুশিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ইনি য়ুরোপীয় শিল্পী-সমাজে প্রতিষ্ঠি-লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতীর শিল্পগৃহ লণ্ডনে। ইনি প্যারিসে ইঁহার একজন ফরাসী বন্ধুর নিকট এই শিল্পের হাতে খড়ি লন—যখন ইনি নিতান্ত বালিকা বলিলেই হয়। তারপর কোন শিল্পবিদ্যালয়ের ট্রেনিং গ্রহণ না করিলেও ইঁহার সহজ ও সহজাত পটুত্বই ইহাকে যশস্বিনী করিয়াছে।

মহিলা চিত্রশিল্পী

শ্রীমতী ভারনন টমাস—চিত্র-শিল্পে বিশেষতঃ তৈল-চিত্রে ইঁহার তুল্য মহিলাশিল্পী বর্ত্তমান আমেরিকায় খুব বেশী নাই। ইঁহার জন্মস্থান—চিকাগো। পরবর্ত্তী শৈশব ইনি প্যারিসে যাপন করেন। পরে দেশে ফিরিয়া ইনি বিশেষ বিশেষ শিল্পাবতনে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ইঁহার 'বুদ্বুদ' নামক একখানি প্রসিদ্ধ তৈল-চিত্রের প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হইল।

আইন উপাধি লাভ

পাটিয়ার সম্প্রদায়ের শ্রীমতী তারামতি বাই পাটেল গুজরাটী মহিলাদের মধ্যে প্রথম এল্-সি-বি উপাধি লাভ করিলেন।

মহিলা সঙ্গীত-ওস্তাদ

শ্রীমতী সেজিন্স্কা—বিশ্ববিখ্যাতা শ্রীমতী সেজিন্স্কার নাম আজ কে না জানে? অনেকেই ইঁহাকে পোলাণ্ড-দেশীয়া বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন; কিন্তু ইনি একজন ইয়র্কসায়ার-বালিকা, এবং ইঁহার প্রকৃত নাম ইথেল

লেজিন্‌স্‌কা। বহুদিনকাল ইনি আমেরিকার সংস্পর্শে আছেন। ইনি তথায় সর্ব্বপ্রথম নিখিল বিশ্ব মহিলা-সঙ্গীত-সম্মিলনের অধিবেশন-আয়োজন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে

তাহার ইচ্ছা—ইংলণ্ডেই ইহার প্রধান করেন।

অধিকার-আন্দোলনের অধিনেত্রী

মিসেস্ ফ্রী. মাথারগ—ইনি ফিন্‌ল্যাণ্ডের নারী-অধিকার-আন্দোলনের প্রধানা ও প্রতিষ্ঠা নেত্রী।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের গায়িকা

শ্রীমতী আয়ীনো আক্‌তে—শ্রেষ্ঠ গায়িকারূপে ফিন্‌ল্যাণ্ডে ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং বহির্জগতেও অপরিচিতা নহেন ইনি।

রান্নাবান্না

চন্দ্রপুলি

শ্রী স্বর্ণলতা বসু

নারিকেল কোরা		সের
পরিষ্কার চিনি		পাঁচ ছটাক
ছানা	৵৹	আধ পোয়া

নারিকেল—কাঁচা হইলেই ভাল হয়। প্রথমে শীল-নোড়ায় খুব মোলায়েম করিয়া পিষিয়া লইবেন।* পরে আধপোয়া আন্দাজ জলের সহিত চিনি উনানে চড়াইতে হইবে। রস খুব গাঢ় হইয়া আসিলে উহাতে ঐ নারিকেল-বাটা ছাড়িয়া খুব নাড়িতে থাকিবেন। যখন নারিকেল-বাটা ও রসে মিশ্রিত পদার্থের জল মরিয়া অনেকটা শুষ্ক হইয়া হাতায় লাগিয়া আসিবে, সেই সময় ছানা শীলে উত্তমরূপে পিষিয়া, কড়া উনান হইতে নামাইয়া উক্ত নারিকেলের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবেন এবং মৃদু আঁচে পুনরায় জাল দিতে থাকিবেন—এইরূপে যখন নারিকেলটা বেশ শক্ত অর্থাৎ প্রায় ময়দার লুচির মত শক্ত হইয়াছে বুঝিবেন এবং গড়াইতে হাতে লাগে না এইরূপ হইবে সেই সময় উনান হইতে নামাইয়া কড়াতেই রাখিয়া দিবেন যেন তৈয়ারী করিবার পূর্ব্বে ঠাণ্ডা হইয়া না যায়। যাঁহাদের ছাঁচ আছে অথবা যাঁহারা ছাঁচে তুলিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পূর্ব্বেই ছাঁচ ধুইয়া রৌদ্রে শুখাইয়া উহাতে সামান্য একটু ঘি মাখাইয়া ঐ প্রস্তুত নারিকেল

* যদি জলখাবারের জন্য ভিন্ন শীল-নোড়া না থাকে তাহা হইলে নিত্যব্যবহার্য্য শীল-নোড়া ছোবড়া দ্বারা ঘষিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিয়া উহাতে লেবু অথবা তেঁতুল মাখাইয়া দুই ঘণ্টা রাখিয়া দিবেন; পরে আবার ছোবড়া ও সোডা অথবা সাবান-সংযোগে উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবেন; কারণ চন্দ্রপুলির নারিকেল খুব সাদা হওয়া আবশ্যক।

দ্বারা ছাঁচ তুলিয়া লইবেন। আর যাঁহারা ভোজ পাঠাইবার জন্য অথবা ঘরের জন্য আরও সুন্দর নক্সাযুক্ত চন্দ্রপুলি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কিছু কচি কলাপাতা সংগ্রহ করিবেন। এবং বড় এলাচ, পেস্তা-বাদাম, কিস্-মিস্ সবই সামান্য পরিমাণে সংগ্রহ করিবেন এবং একটু ছোট এলাচ-চূর্ণও রাখিবেন। বাদাম বড় ও ছোট দুই-

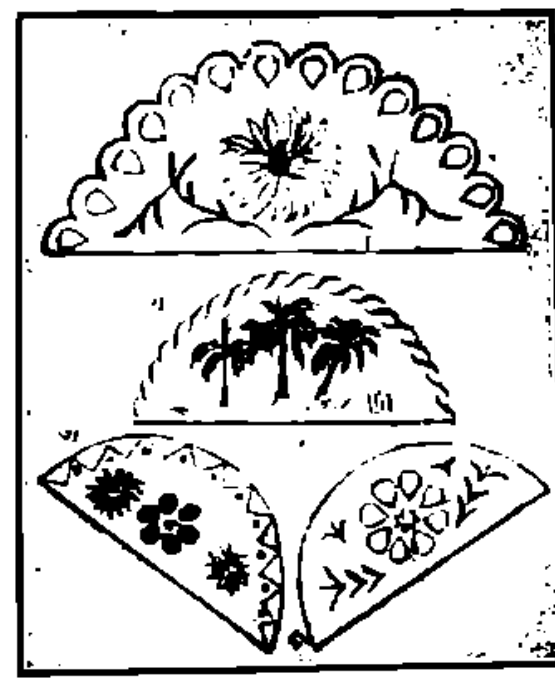

প্রকার হইলেই ভাল হয়। বাদাম ও পেস্তা খোসা ছাড়াইয়া ও বাদাম কিছু গোটা ও কিছু সরু লম্বা কুচি করিয়া রাখিবেন ও পেস্তা সরু লম্বা লম্বা কুচি করিয়া রাখিবেন। তারপর সামান্য একটু ঘোয়াক্ষীর (আধ ছটাক আন্দাজ) লইয়া তাহাতে কিছু কিসমিস্, বাদাম ও পেস্তা ছোট ছোট খণ্ড করিয়া মিশাইয়া ছোট এলাচ-

চূর্ণ দিয়া 'পুর' প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন ; তারপর একটুকরা কলাপাতা লইয়া তাহার সোজা দিকে খানিকটা উক্ত প্রস্তুত নারিকেল লইয়া হাতের চাপে একটি পুরু লুচির মত প্রস্তুত করিবেন। পরে উহার মধ্যে পূর্ব্বের প্রস্তুত পুর খানিকটা দিবেন। পরে দুই পাশের কলাপাতা ধরিয়া দুই ধার সমানভাবে লাগাইয়া হাতের সামান্য চাপে চাপিয়া দুই মুখ মুড়িয়া দিবেন এবং আস্তে আস্তে কলাপাতা তুলিয়া লইবেন এবং অসমান কিনারা-সকল সমান করিয়া লইবেন। এইরূপেই উৎকৃষ্ট চন্দ্রপুলি প্রস্তুত হইল। ইহা বাঙলা দেশের অতি প্রাচীন পৌরাণিক ও উৎকৃষ্ট মিষ্ট ; রামায়ণে পর্য্যন্ত এই মিষ্টান্নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) পূর্ব্বোল্লিখিত মত কলাপাতায় উহা প্রস্তুত করিয়া নারিকেল নরম থাকিতে উহার কিনারা ছবির মত প্রস্তুত করিয়া খোলাছাড়ান ছোট বাদাম ঐরূপে একটি একটি করিয়া সমস্ত কিনারায় চাপিয়া বসাইয়া দিবেন। একটি কিস্‌নিস্ হাতের চাপে গোল চেপ্টামত করিয়া ফুলের মধ্যস্থলে বসাইয়া দিবেন এবং তার চারিপাশে বড় বাদাম লম্বা করিয়া কুচাইয়া ফুলের আকারে ঐ ভাবে চাপিয়া বসাইয়া দিবেন। পরে পেস্তার লম্বা কুচি লইয়া এইরূপ ডালের আকারে ছবির মত বসাইয়া দিলেই ঠিক ফুল ও ডালের মত সুন্দর নক্সা প্রস্তুত হইবে।

(২) কলাপাতায় উহা পূর্ব্বোল্লিখিতভাবে প্রস্তুত করিয়া উহার ধার ছবির ন্যায় দুই অঙ্গুলির চাপে মুড়ি ভাঙিয়া দিবেন পরে পেস্তার কুচি দ্বারা খেজুর গাছের ন্যায় সাজাইয়া লইবেন।

(৩) ধারে-পেস্তার লম্বা কুচি দ্বারা ঐভাবে বসাইয়া লইবেন এবং মধ্যে একটি করিয়া বড় এলাচের দানা দিবেন। মধ্যস্থলের ফুলটির পাপ্‌ড়ি কিস্‌নিস্ দ্বারা গড়িয়া তাহার ভিতরে বড় এলাচের দানা বসাইতে হইবে। দুই-পাশের ফুলের মধ্যে এলাচের দানা ও চারিপাশে ছোট বাদামের কুচি বসাইয়া চাপিয়া দিবেন।

(৪) পূর্ব্বোল্লিখিত কলাপাতায় উহা প্রস্তুত করিয়া মধ্যস্থলের ফুলটির পাপ্‌ড়ি-সকল ছোট বাদামের দ্বারা গড়িয়া উহার ভিতরে বড় এলাচদানা বসাইবেন। দুই পাশের পাতাসকল পেস্তার কুচি বসাইয়া ছবির মত প্রস্তুত করিয়া লইলেই সুন্দর একটি ছবির মত দেখাইবে।

নিবেদন

সমিতির কোন সভ্য বা গ্রাহক ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে প্রত্যেক বাঙলা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করার আদেশ দিয়া বাধিত করিবেন। উক্ত তারিখের পর কেহ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করার দরুন যদি বঙ্গলক্ষ্মী না পান সেজন্য আমরা দায়ী হইব না। অনেকে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া ২।৩ মাস কোন সংবাদ দেন না—হঠাৎ এক সঙ্গে ২।৩ মাসের বঙ্গলক্ষ্মী চাহিয়া পাঠান ; সেজন্য আমাদিগকে বড় অসুবিধায় পড়িতে হয়। বঙ্গলক্ষ্মী প্রত্যেক বাঙলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। যদি কেহ ২০ তারিখের ভিতর বঙ্গলক্ষ্মী না পান তাহা হইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া জেনারেল পোষ্ট-আফিসে অভিযোগ করিয়া তাহার উত্তরসহ যে মাসের বঙ্গলক্ষ্মী পান নাই, সে মাসের শেষ তারিখের মধ্যে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে জানাইলে অপ্রাপ্ত সংখ্যা বিনামূল্যে পাঠাইব। ঐ তারিখের পর হইলে ।/১০ আনা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ, বঙ্গলক্ষ্মী

সনাতন

শ্রী চামেলী বসু

এস সনাতন !
নিত্য তুমি সত্য তুমি,
নিখিলের চিত্তভূমি
জুড়ি' তব অদ্বৈত আসন,—
হে শাশ্বত ! ওগো চিরন্তন !
তোমার বাঁধাটি লেখা এলায়িত ঘূর্ণ্ণী-ঘটায় ;
রুদ্রের বিষাণ-ঘোষে ; প্রলয়ের ভীম ঝঞ্ঝায় ;
জীবন-স্পন্দন-চিহ্নহীন
বিশ্ব যবে একাকার একার্ণবে লীন,
তুমি শুধু একা জেগে থাক,
অকূল আড়ালে ঢেকে রাখ
নিদ্রাহীনা বস্ত্রাহীনা জননীর মত,
অগণিত কত শত শত
ভবিষ্য সৃষ্টির বীজ বট-কণিকায়—
যাহা হ'তে ফোটে গো ভুবনে
নব সৃষ্টি নবীন রভসে,
শাখা-পুষ্প-কিশলয়ে নবপল্লবিত
সুবিশাল অভ্রভেদী মহীরুহ প্রায় ।

(২)

সে কোন্ অনাদি কাল হ'তে
অবিরাম জয়-যাত্রা তব—
নিত্য নব উৎসব-রব-
মুখরিত অনন্তের পথে
—কল্যাণকেতন শুভ্র রথে ।
প্রভাতের অরুণিমা-মাখা কুসুমিত বন-বীথিকায়,
মধ্যাহ্নের রক্ত-মেঘে ঢাকা গগনের ঘন নীলিমায়
সে পথের বারতাটি লেখা—
তোমার সে সীমাহীন রথচক্র-রেখা
রেখা দিয়ে, তার অন্তরালে
পুনঃ কোন্ রহস্যের জালে
চকিতে ঢাকিয়া যেন ফেলে আপনারে
অন্তহীন সাগরের পারে ;
ভরল সুটায় যবে বিজন বেলায়,
অদূরির সেই কেনোচ্ছ্বাসে
উৎসবের রব ভেসে আসে,
বিহগের কলকণ্ঠে সায়াহ্নে উষায়
যোগশ্রোতপ-তলে কানন-সভায় ...

কৃষি-মঙ্গল

সাময়িক কৃষিকথা

শ্রী সন্তোষবিহারী বসু

কুলকপি :—অন্যান্য-কুলকপির বীজ শ্রাবণ মাসে ফেলিতে হয়। ছোট একটি কাঠের বাক্সতে কিংবা একটি মাটির টবে কিংবা কোন পুরাতন মাটির গামলায় বা লোহার কড়াইয়ে বীজ ফেলিতে হয়। দুই-একশত চারা যেখানে দরকার, সেখানে এইরূপ করিলে চলিবে। বীজ ফেলিবার জায়গায় মাটি কি করিয়া তৈয়ারী করিতে হয়, তাহার বিষয় বলা যাইতেছে। বীজ ফেলিবার টবে, কিংবা যে কোনও জায়গায়, প্রথমে, প্রায় দশআনা পরিমাণ কিছু ঝুরা মাটি, অর্থাৎ, যে মাটি ভিজা থাকিলেও দুসকুসে থাকে, কাদা বা খুব বালি-মাটি নহে—তাহা দিয়া ভরিয়া দিতে হয়। উহার উপরে ছাই-মাটি—কুঁয়েটের ছাই মিশ্রিত মাটি কিংবা পাতা-পচা মাটি চারআনা পরিমাণ মিশাইতে হয়। বাকি দুই আনা, কেবলমাত্র গুঁড়া পাতা-পচা দিতে হয়। পাতা পচা না হইলেও চলিতে পারে। সেইসব জায়গায়, ছয় আনা পরিমাণ পাতা-পচা মাটি দিলে চলিবে।

এই তিন প্রকার মাটিকে উপরি উপরি মিশাইয়া, অর্থাৎ, প্রথমকার ঝুরা মাটিকে পাতা-পচা মাটির সহিত উপরি উপরি মিশাইয়া, পরে ঐ মিশান মাটির সহিত পচা পাতা উপরি উপরি মিশাইয়া রাখিতে হয়। মাটি মিশাইবার সময় দুই হাত দিয়া মাটিকে ঘষিয়া মাটি তৈয়ারী করিতে পারিলে ভাল হয়। মাটি তৈয়ারী করিয়া দুই-একদিন পরে বীজ ফেলিলে ভাল হয়। ইহাকে মাটি-জিয়ান-দেওয়া বলে। মাটি তৈয়ার করিতে করিতে যদি টবের মাটি শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে, ঝাঁঝরি বা ঐরূপ কিছু দিয়া কিংবা হাতের চেটোর উপর জল দিয়া আঙুলে নাড়িয়া ঐ টবের মাটিকে অল্পপরিমাণে ভিজা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া লইতে হইবে। ইহাকে মাটির 'বাত' তৈয়ারী করা বলে। এইরূপে মাটির 'বাত' তৈয়ারী করিলে, বীজগুলি হইতে, যদি ভাল হয় সব একসঙ্গে চারা বাহির হয়, তাহা না হইলে আগে-পিছু হইয়া চারা বাহির হয়। আগে-পিছু চারা বাহির হইলে অনেক গাছ নষ্ট হইয়া যায়; এক জমিতে এক সঙ্গে লাগাইতে না পারিলে পরে অনেক ক্ষতি হয়।

মাটি তৈয়ার হইলে মাটিকে বেশ ভাল করিয়া হাতের দ্বারা সমতল করিয়া লইতে হয়। পরে কপির বীজগুলিকে, দুইটি আঙুলের মধ্যে রাখিয়া একটি বুড়া ও আর একটি যে-কোনও আঙুল—ঐ আঙুল দুইটি নাড়িয়া বা ঘষিয়া টব বা বাক্সের উপরিভাবে বীজ ফেলিয়া যাইতে হয়; পরে আবার বীজ লইয়া ঐ টব বা বাক্সের আড়াআড়ি বা চওড়া দিকে, এক রকম করিয়া বীজ ফেলিতে হয়। এইরূপ করিয়া বীজ ফেলিবার পর একটি ছুরির ডগা দিয়া কিংবা কোনরূপ খুব সরু মুখওয়ালা কাঠির ডগা দিয়া আস্তে আস্তে পাতলা-ভাবে অর্থাৎ গভীরভাবে নহে—ঐ বীজগুলিকে লম্বালম্বি ও পরে আড়াআড়ি নাড়িয়া দিতে হয়। ইহাতে বীজগুলি এক-জায়গায় না পড়িয়া ঠিক সমানভাবে পড়িতে পায়। এক-জায়গায় বীজ পড়িলে, চারাগুলি দল সরু হয়। সরু সরু চারা ভাল নহে। এইরূপে ছুরি বা কাঠি দিয়া বীজগুলি নাড়িবার পর, কিছু পাতা-পচা মাটি খুব গুঁড়া করিয়া উহার উপরে পাতলা করিয়া ও সমানভাবে টবময় ছড়াইয়া দিয়া, পরে হাত দিয়া মাটিকে সমান করিয়া দিতে হয়।

বীজ ফেলিবার পর মাটি যতদিন না কিছু শুকাইয়া যায়, ততদিন উহার উপর জল না দিলেই ভাল। যদি দরকার হয়, তবে ঝাঁঝরির দ্বারা খুব শীঘ্র শীঘ্র হাত নাড়িয়া লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে সামান্য পরিমাণে জল দিতে হয়। বেশী জল পড়িলে মাটির উপরে একটি চটা বাঁধিয়া

গাছ, ও উহাতে বীজ হইতে চারা বাহির হইতে সহজে পারে না। আর উহাতে অনেক চারা নষ্ট হইয়া যায়।

যতদিন না বীজ হইতে চারা বাহির হয়, ততদিন ঐ মাটি একটু ভিজা থাকা দরকার; তবে বেশী ভিজা থাকিলে বীজ নষ্ট হইয়া যায়। বীজ ভাল হইলে, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই গাছ বাহির হইয়া পড়ে। বীজ ফেলিবার পর হইতে রোজ রোজ সকালে ও বিকালে কিছুক্ষণ ধরিয়া রোদ খাওয়াইতে হয়: আর চারা যতই বড় হইতে থাকিবে ততই রোদ-খাওয়ানোটা কিছু কিছু করিয়া বাড়াইয়া দিতে হইবে। কোনরূপে চারার টবে বৃষ্টির জল বেশী খাওয়াইতে দেওয়া উচিত নহে। একটু আধটু গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি খাইলে ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ ভালই হয়। রাত্রে চারাগুলিকে শিশির খাওয়াইতে হয়। দুপুর বেলায় ঘরে রাখিলে হয়, কিংবা কিছু চাওয়া-যায়গায় রাখিয়া দিলে হয়। অন্ধকার ঘরে না রাখিয়া যে ঘরে চারিধারে আলো আসে সেই ঘরে রাখিতে হয়; তাহা না হইলে একধারে আলো থাকিলে, চারাগুলি ঐ ধারে হেলিয়া যায়। চারাগুলি যাহাতে কোনরূপে বেশী লম্বা না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। বেশীক্ষণ অন্ধকারে রাখিলে লম্বা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

চারাগুলি চার-পাঁচ পাতা ছাড়িলে, উহাদিগকে হাপরে উঠাইয়া লাগাইতে হয়। চার-পাঁচ পাতা ছাড়িতে প্রায় ২০।২৫ দিন লাগে। হাপরের মাটি ঠিক টবের মাটির মতন তৈয়ারী করিতে হয়। আর হাপরের উপরে একটি চালা করিয়া দিতে হয়। তবে এই চালাটি যাহাতে সহজে তোলা যায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রতি একশত চারার জন্য, দুইহাত লম্বা ও একহাত চওড়া এই হিসাবে হাপর লম্বা-চওড়া করিতে হয়। আর চালাটি একধারে একহাত ও আর একধারে আধহাত তিন-পোয়া আন্দাজ উঁচু হওয়া দরকার। অর্থাৎ, চালাটি হাপর হইতে একদিকে একহাত উঁচু ও অপর দিকে তিন পোয়া উঁচু হইবে। চারাগুলিকে উত্তর-দক্ষিণে লাইনবন্দী করিয়া চার আঙুল অন্তর একটি কাঠির দ্বারা গর্ত করিয়া বসাইতে হইবে। চারা বসাইবার পর, রোজ রাত্রে হাপর হইতে চালাটি তুলিয়া রাখিয়া চারাগুলিকে শিশির খাওয়াইতে হয়। কিন্তু বৃষ্টি হইবার ভয় থাকিলে, চালা দ্বারা চারাগুলিকে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। রোজ সকালে রোদ উঠিবার আগে চারার উপরকার শিশির অতি সামান্য জল দিয়া ধুইয়া দিতে হয়। আর রোজ রোজ চারাগুলিকে উহাদের অবস্থা-অনুসারে, কিছুক্ষণ ধরিয়া সকালে ও বৈকালে রোদ খাওয়াইতে হইবে। চারা যতই বড় হইবে ততই রোদ বেশীক্ষণ ধরিয়া খাওয়াইতে হইবে। জমির রস রাখবার, হয় রোজ বৈকালে, কিংবা দুই-চার দিন অন্তর ঝাঁঝরির দ্বারা জল দিতে হইবে। এইরূপ করিলে ২০।২৫ দিনের মধ্যে চারা গুলি ৬।৭ পাতা ছাড়িবে ও তখন তুলিয়া জমিতে লাগাইতে হইবে।

টমেটো বা বিলাতী বেগুন:—জমির টমেটোর বীজ ঠিক মূলকপির মতন ফেলিতে হয় ও চারা তৈয়ারীর প্রণালীও ঠিক ঐ একই রকম।

—বিদেশের— মহিলা-সমিতি

জাতীয় মহিলাসমিতি-সংঘের বার্ষিক উৎসব

এবার জাতীয় মহিলাসমিতি-সংঘের চতুর্দ্দশ বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্লাকপুল সহরে ঐ উৎসবে যোগদান করিতে এবার মহিলা-প্রতিনিধিদের সুবিধার জন্য একখানা বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৩ বৎসর

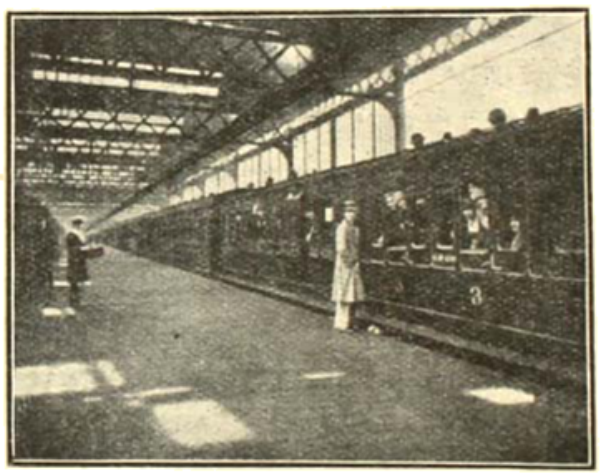

বার্ষিক সাধারণসভায় যোগদান করার জন্য প্রতিনিধিগণ লণ্ডনের ইষ্টন ষ্টেশন হইতে রওনা হইতেছেন

পূর্ব্বে কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই যে ১৯০০ সালে মহিলা-প্রতিনিধিদের জন্য রেলের কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ সুব্যবস্থা করিবেন। হাতে মালপত্র নিয়া হাসিমুখে প্রতিনিধিরা এই উৎসবে যোগদান করার জন্য রওনা হইয়াছিলেন। ট্রেনে আহার,নব নব প্রতিনিধি-দলকে রাগবী, ষ্ট্যাফোর্ড, ক্রু এবং প্রেষ্টন ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করার আনন্দ এবং উৎসাহ এবং সাধারণসভার কর্ম্মতালিকার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে মতামত-দানে এই সুখময় ভ্রমণ আরও সজীব হইয়া উঠিয়াছিল।

মহিলাসমিতিগুলিতে নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যথা :—জাতিগতভাবে আমরা আমাদের শিশুদের প্রশ্রয় দিয়া নষ্ট করি কি না? বয়স্করা যুবকদের সহিত সংশ্রব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে কি না? হাঃ প্রেক্ত এবং প্রিলসম মহিলাসমিতিতে ব্যয় করার

জাতীয় মহিলাসমিতি-সঙ্ঘের সভানেত্রীরা ব্লাকপুল রওনা হইতেছেন

চেয়ে রক্ষা করা ভাল, শিশুর কল্পনা এবং শিশুর দাবী, দাঁতের স্বাস্থ্য-রক্ষা, এই কয়টি বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এই বক্তৃতা শ্রবণের জন্য বিদ্যালয়ের শিশুদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে ঘোষণা না করিয়া যে শিশুর হাত সর্ব্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন তাহাকে একটি পুরস্কার

দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের দেশে আজকাল বহুলোক দাঁতের রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পায়। নরম দাঁত, পানখা দাঁত, দাঁতের রক্ত পড়া, পুঁজ হওয়া এবং নড়া অতি যন্ত্রণা-দায়ক ব্যাধি। এই সব রোগ হইলে হজমক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় এবং পরিণামে রোগীর সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যহানি হয়। অতি শিশু-কাল হইতে দন্তোদ্গমের পূর্ব্বে শিশুর মাড়ীর প্রতি এবং দাঁত উঠিলে শিশুর দাঁতের প্রতি বিশেষ যত্ন লইলে দাঁতের রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্য প্রত্যেক মহিলা-সমিতিতে দাঁতের স্বাস্থ্য-বিষয়ে বক্তৃতা হওয়া প্রয়োজন। শিশুরা প্রায়ই হাত-মুখ অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; সেই ময়লা হাতে খাদ্য খাইবার জন্য বহু রোগের সূত্রপাত হয়; অথচ আমাদের দেশের বহু বাপ-মা এবিষয়ে অবহিত হন না. এর ফলে অনেক সময় শিশুর অকালমৃত্যু অবধি ঘটে।

বার্ষিক সাধারণ-সভায় মহিলাসমিতির প্রতিনিধি

মাইসোরের সাম্রাজ্যে ফল এবং শাকসব্জি রক্ষা-বিষয়ে একটি বিশেষ সংক্ষিপ্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মহিলাসমিতির বার্ষিক সাধারণ-সভায় সমিতির প্রতিনিধিগণ

আগামী ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ৪ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে; শুধু মহিলাসমিতির সভ্যারাই এই মাসে যোগদান করিতে পারিবেন। থাকা, খাওয়া এবং অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যস্বরূপ প্রত্যেক ছাত্রীকে জনপ্রতি দুই পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩০ টাকা দিতে হইবে। ছাত্রীরাই তাঁহাদের পরিধেয় পরিচ্ছদ এবং গামোছা প্রভৃতি আনিবে।

বিলাতের মহিলাসমিতির মুখপত্র

বিলাতের মহিলাসমিতিসমূহের মুখপত্র Home and Country পত্রিকার প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আর প্রত্যেক জেলায়ই গ্রাহক-সংখ্যা বাড়িতেছে। কোন কোন জেলায় গ্রাহক-সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশী। সে দেশে প্রত্যেক মহিলাসমিতির সভ্যারাই গ্রাহকসংগ্রহার্থ বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের মহিলারা এবং সমিতির সভ্যারা মহিলাসমিতির পত্রিকা-পাঠে এইরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিলে অশেষ উপকার হয়।

জেলা-সমিতি সংঘ

কোন কোন জেলা-সমিতিসঙ্ঘ, যেখানে যে সকল শিক্ষয়িত্রীরা বিভিন্ন শিল্পের কার্য্য প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের জন্য যেরূপ ব্যয় হয়, তাহা বহন করেন।

পেমব্রোক সাম্রাজ্য জেলা-সংঘ, মহিলাসমিতির প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য একটি গুদাম ভাড়া করিয়াছেন। মহিলাসমিতির প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ এখানে প্রেরণ করা যাইতে পারে। জেলা-সংঘ এক সিলিং এক পেন্স কমিশন লইয়া থাকেন, বিভিন্ন শিল্পের নমুনা এইখানে রক্ষিত হয়। আমাদের মহিলাসমিতিগুলি এইরূপ শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়ার্থ দোকান খুলিলে খুব ভাল হয়। পোকস্ মহিলাসমিতি সমিতির তহবিলে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া প্রায় ৬০ পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়াছে। অল্পদামের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সহজেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। এলেনবারী মহিলাসমিতিতে ভ্রম-সাম্রাজ্যের পুরাতন ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। এই সমিতিতে একটি মজার আলোচনা হয় যে পুরুষদের দাড়ী রাখা ভাল কি দাড়ী ফেলিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া ভাল।

সোমারসেট সাম্রাজ্য মহিলাসংঘ

এই জেলা-সংঘের অধীনে ব্যাজওয়ার্থ এবং বিডিগাম নামে দুইটি মহিলাসমিতি গঠিত হইয়াছে। এই জেলা-সংঘের পক্ষে ইহা বড়ই সুখের কথা যে এইবারে এই সংঘের একজন প্রতিনিধি জাতীয় মহিলাসমিতি-সংঘের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; যে সকল জেলাসংঘে এবিষয়ে

সাহায্য করিয়াছেন, এই সংঘ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই সংঘের বার্ষিক অধিবেশন-উৎসবে প্রায় ১০১ জন প্রতিনিধি কার্যানির্ব্বাহক সমিতির নির্ব্বাচনে ভোট দিয়াছিলেন। লেডী ডেনহাম গ্রামমহিলাদের শিক্ষা বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন তাহা অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। মিস্ হারষ্ট সিমসন সভ্য-সভায় যে বক্তৃতা দেন তাহা অত্যন্ত উদ্দীপনাময়ী হইয়াছিল। ক্যাসেল-ব্রেকেরী মহিলাসমিতিতে কম্বল-প্রস্তুতপ্রণালী এবং কেনাডায় মহিলা ও বালিকা বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এলম মহিলাসমিতিতে ভারতবর্ষ এবং অন্ধদের মধ্যে কাজ বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

ষ্ট্যাফোর্ড সায়ার

গত ১৮ই মার্চ্চ এই সঙ্ঘের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার বার্ষিক উৎসবে প্রায় ৯০টি সমিতি হইতে প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত হয়।

সভানেত্রী তাঁহার কার্য্যবিবরণীতে উল্লেখ করেন যে গত ১৯২৯ সালে এই জেলা-সঙ্ঘ স্বাস্থ্য-বিষয়ক উন্নতি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেন। তিনি আরও ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে অন্ততঃ প্রত্যেক মহিলাসমিতিতে বৎসরে একবার করিয়া স্বাস্থ্য-বিষয়ক আলোচনার জন্য সভা হইবে। এই বৎসরে কৃষি এবং উদ্ভিদবিদ্যার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয়।

জাতীয় মহিলাসমিতিসঙ্ঘ হইতে বার্ষিক অধিবেশনের দিন প্রাতে মিস আরমিজ কুটীর-শিল্প বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সার জোসেফ ল্যাথ অপরাহ্নে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সার জোসেফ বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে ঐ জেলার ৩৫৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১১টিতে উদ্যান-রচনা শিক্ষা দিবার ক্লাশ আছে। প্রায় তিন হাজারের অধিক ছেলেরা এই ক্লাশে যোগদান করেন। কিন্তু মাত্র তিনশত একত্রিশ জন বালিকা এই সকল ক্লাশে উপস্থিত হন। তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন যে মহিলারা যেন গৃহ-বিজ্ঞান শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হন এবং রোডটন মহিলা কৃষি-সমিতির নবনিযুক্ত মহিলা বক্তার কার্য্যের বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেন। ২৫শে জুন মিলফোর্ড-এ একটি পুরাতন ইংরাজী মেলার অনুষ্ঠান হয়। ষ্ট্যাফোর্ড সায়ার সঙ্ঘের এই প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায়। একটি চিত্তাকর্ষক কর্ম্মতালিকার ক্রীড়া, গ্রাম্যনৃত্য, একতা ও ঐকতান সঙ্গীত, অন্যান্য আনুষঙ্গিক আমোদপ্রমোদ, মহিলাসমিতির উৎপন্ন দ্রব্য এবং শিল্পদ্রব্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক সভ্যা সামান্য হইলেও কিছু না কিছু দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট মূল্যের যোগ্য ৬ পেন্স মূল্যের দ্রব্যও ২ শিলিং ৬ পেন্স মূল্যের দ্রব্যেরই মত সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল। লেডী ডেনহাম এই মেলার উদ্বোধন করেন। বার্কস্-উইস মহিলাসমিতিতে সঙ্ঘ এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। এপ্রিল মাসের সভায় মক্ষিকাপালন বিষয়ে বক্তৃতা হয় এবং তখন হানটিংডন হইতে প্রায় ২০ জন সভ্যাকে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। স্বামীর হাসপাতালের জন্য একশত আট-চল্লিশটা ডিম সংগ্রহ করা হইয়াছিল। নূতন এবং পুরাতন গোশালা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হয়। বাগানের বন্ধু এবং শত্রু এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা হয়। সভ্যারা জাম-প্রস্তুত ক্লাসে যে সকল জাম প্রস্তুত করেন তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ইষ্ট সাফোক মহিলাসং

প্রায় ৭০টি মহিলাসমিতি হইতে প্রতিনিধিরা গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই জেলার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সাধারণ-অধিবেশনে যোগদান করেন। ৫ই এবং ৬ই জুন সাফোক-প্রদর্শনীতে শিল্প-বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৩০শে জুন হইতে ৯ই জুলাই পর্য্যন্ত ফলরক্ষণপ্রণালী এবং ফল প্যাক করা বিষয়ে ৫টি কেন্দ্রে শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রিধাবার্থ মহিলাসমিতি একটি শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের জন্য কতকগুলি ফুলট জামা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ইষ্ট সাসেক্স মহিলাসংঘ

টাউনব্রিজে জেলা মহিলা-সঙ্ঘের অর্দ্ধবার্ষিক পরিষদ-সভায় বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভায় আদি-অন্ত বিশেষ উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রুটী পরিষ্কার রাখার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। মিষ্টার মেটকাফ কৃষিকার্য্যে সহযোগিতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ওয়ার্থ মহিলাসমিতি স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা

সম্পর্কে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই অনুষ্ঠানে একটি শিশুকে কি ভাবে জলে স্নান এবং পরিষ্কার করা হয় তাহা দেখান হইয়াছিল। ফুল, মুদিখানার দ্রব্যাদি এবং বহু পরিমাণে ডিম বিভিন্ন হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল।

ওয়েষ্ট সাসেক্স মহিলাসংঘ

এসমারিং মহিলাসমিতি সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। ষ্লিনডন মহিলাসমিতির কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বক্তাদের শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা সামাজিক, আর্থিক এবং সাধারণ শিক্ষা—সকলবিষয়েই পূর্ণ-সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

আমাদের দেশের মহিলাসমিতিগুলিতে বক্তৃতার ব্যবস্থা করার জন্য এইরূপ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যাঁহারা শিল্পশিক্ষার ভার নেন তাঁহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হন এবং বক্তৃতাদান বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেন তবে তাঁহাদের দ্বারা সমিতির যথেষ্ট উপকার হয়।

ওয়ারউইক সায়ার মহিলাসংঘ

ইহা শিক্ষাসমিতি এবং ব্রিটিশ রেডক্রশের দ্বারা এবং পরিচ্ছন্নতা-পরিষদের বক্তাদের জন্য বক্তৃতা সফরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জেলা মহিলাসঙ্ঘ-নির্দ্দিষ্ট সমিতিতে ঐ বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে। ল্যাপটন মহিলাসমিতিতে মাতৃত্ব এবং শিশুমঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

ওয়েষ্ট মুরল্যাণ্ড ফেডা.

কোওলে জেলাপরিষদের যে সভা হয় তাহাতে ঐ জেলার কৃষিগোলার কর্ত্তা মিষ্টার ফলডার কি ভাবে মহিলা-সমিতিগুলি এই জেলার কৃষিকার্য্যে সাহায্য করিতে পারে, এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মিস কুপারকে জেলাসঙ্ঘের সভানেত্রী নির্ব্বাচন করা হয় এবং ঐ জেলাসঙ্ঘের মুখপত্র পরিচালনা করা স্থির হয়। নূতন পরিষদে পুরাতন পরিষদের বহু সভ্য রহিয়াছেন; জেলাসঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা মোটের উপর ১৮ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে এই জেলাসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ৫৭টি মহিলাসমিতিতে তিন হাজার একশত আটষট্টি সভ্যা। গ্রাসমিয়ার মহিলাসমিতির ১৫ জন সভ্যার মধ্যে ১৩ জন গার্হস্থ্য-চিকিৎসা বিষয়ে পরীক্ষায় পাশ করেন।

আমার শতদল

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

আমার শতদল,—
এখনো যে মেলতে বাকী
অনেক ক'টাই দল।
এখনো দুই কোরক কাঁচা,
নীহার-ভেজা, নতুন তাজা;
কোটার হর্ষ-আভাস জাগে—
প্রথম পরিমল!

আমার শতদল,—
রাঙা নয়ন মেলছে কেবল
প্রভাত-নভ-তল।
মধ্যদিনের রুদ্র চাওয়ায়
চড়াবি কোন্ পরাগ হাওয়ায়,
মর্ম্মকোষের সেই বাণীটি
আমার শুধু বল্

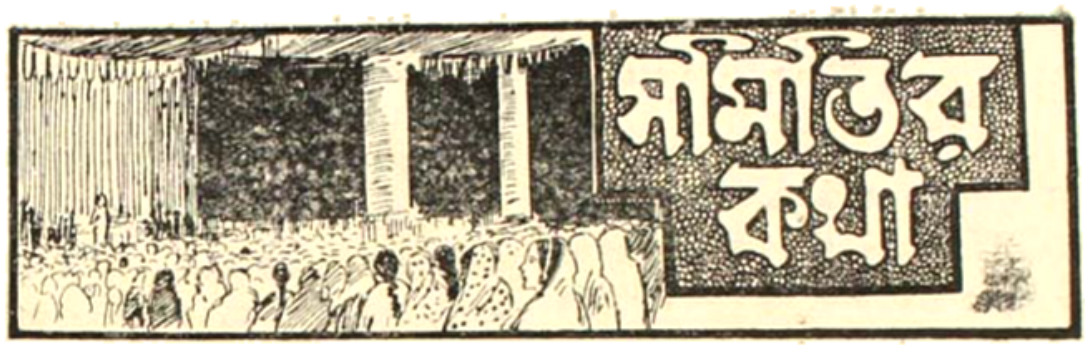

নাগপাড়া (নোয়াখালী)

বহুদিন নোয়াখালী সহরে শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সমিতির সভ্যাগণ এই অভাব-দূরীকরণের জন্য আলোচনা করিতেছিলেন। কেন্দ্র-সমিতির সাহায্যে গত ১লা এপ্রিল হইতে এখানে একটি ধাত্রীশিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাঃ শ্রীযুক্ত কিংগমর ঘোষ এম-বি শিক্ষাকার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। ৪ জন গ্রাম্য ধাত্রী এবং ১০ জন ভদ্রমহিলা আমাদের ধাত্রীশিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থিনীরূপে যোগদান করেন। তাঁহারা সকলেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে নিজ নিজ পাড়ার প্রসূতিগণের প্রসবকালে উপস্থিত হইয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ডাক্তার বাবু নানারূপ ব্যবহারিক পরীক্ষার সহিত ১২টি বক্তৃতা দিয়া কেন্দ্রের কার্য্য শেষ করিয়াছেন। আমাদের শিক্ষার্থিনীগণের কেহ কেহ তাঁহার কাছে থাকিয়া প্রকৃত প্রসবকালীন কার্য্য করিবারও সুযোগ পাইয়াছেন। সুতরাং আমাদের শিক্ষার পুষ্টি-সাধনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে।

স্থানীয় বৃদ্ধা পাঁচআনি কাছারীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার বাসা বাড়ীতে আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ দিয়া আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা পাইয়াছেন।

নোয়াখালী—ধাত্রীশিক্ষা-কেন্দ্র

সুখের বিষয়, আমাদের এ কেন্দ্রে শিক্ষিতা ধাত্রীগণ ইতিমধ্যেই সহরে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং সুনাম অর্জ্জন করিতেছেন। আমরা আশা করি এ জেলার বিভিন্ন স্থানে এরূপ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সমাজের কল্যাণ-সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রী সুশীলাবালা মিত্র,
সম্পাদিকা

ঠাকুরগাঁ

ভগবানের পরমেশ্বরের করুণায় আজ আমাদের মহিলা-সমিতি ৩য় বৎসর পূর্ণ হইয়া ৪র্থ বৎসরে পদার্পণ করিল। অনেক কড়পথ বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া চলিয়া সমিতি এখন স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইয়াছে। সমিতির প্রারম্ভে যখন দুর্দ্দিনের ঘনঘটা ইহার ভাগ্যাকাশে ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তখন কেহ ভাবিতে পারে নাই যে এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু পর্ব্বতগাত্রনিঃসৃত ক্ষীণ অথচ বেগশালী জলধারা যেমন অসংখ্য বাধা অতিক্রম করিয়া নিজের পথ প্রস্তুত করিয়া লয় এবং অপরাপর জল-রাশির সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্রমে বিশাল নদীতে পরিণত হয়, আমাদের তখনকার ক্ষীণ উদ্যমও তদ্রূপ ফলবতী হইয়া এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে গর্ব্বের বিষয়। বিরুদ্ধবাদী দলের ভ্রূকুটির মেঘ যে একেবারে কাটিয়া গিয়াছে তাহা নহে এবং সেরূপ আশা করাও বাতুলতা; কিন্তু এখন আমাদের সমিতির যতটুকু ক্ষমতা জন্মিয়াছে ও চারিদিক হইতে যেমন সহানুভূতির আভাস পাওয়া যাইতেছে তাহাতে সমিতির ক্রমোন্নতির আশা করি। যাঁহাদিগের চেষ্টা ও সহানুভূতির ফলে এই সমিতির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে, ২য় বৎসরের প্রারম্ভে আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বাৎসরিক কার্য্যাবলী প্রকাশ করিতেছি।

গত বৎসর কেন্দ্রসমিতি হইতে শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত শৈলেশ সেন মহাশয় এখানে আসিয়া-ছিলেন। শ্রীযুক্তা চক্রবর্ত্তী মহাশয়া মহিলাদের উন্নতি-পন্থা সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অমূল্য উপদেশাবলীতে কর্ম্মপন্থা আরও সুস্পষ্টভাবে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।

কেন্দ্রসমিতির প্রেরিত শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী অমলা সেন সমিতির ক্লাসে সুচারুরূপে শিল্পশিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার নৈপুণ্যে মেয়েরা উৎসাহের সহিত ছাঁটকাট, সেলাই, মোজা, সোয়েটার, মাফ্‌লার বোনা, এম্‌ব্রয়ডারী ইত্যাদি শিল্পশিক্ষার উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতেছে। গত বৎসর কেন্দ্র-সমিতির বার্ষিক উৎসবের সময়ে এখানকার ছাত্রীদের প্রস্তুত কমাল ব্লাউজ ড্রক্ টেবিলক্লথ ইত্যাদি কলিকাতার এক-জিবিশনে পাঠান হইয়াছিল। ঐ সমস্ত জিনিস বিক্রয়ের জন্য সমিতির হস্তে রহিয়াছে। সমিতির নিজস্ব কোন ঘর না থাকায় শিল্পক্লাস পূর্ব্বে ছাত্রসমিতির ঘরে হইত, গত বৈশাখ মাস হইতে সেই ঘর উঠিয়া যাওয়ায় এখন স্থানীয় সিনেটারি-হলে ক্লাস হইতেছে। একখানা স্থায়ী ঘরের জন্য স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের নিকট আবেদন করা হইয়া-ছিল। সম্প্রতি তাঁহাদের নিকট হইতে, বিশেষ করিয়া উকিলসম্প্রদায়ের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আশার বাণী পাওয়া গিয়াছে। এখন প্রায় বাড়ীতে চরকা কাটার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সমিতির নিজস্ব একখানা ঘর হইলে চরকার ক্লাসে পুনিবার ও বাগান করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। ঘর করিবার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টায় আছি। কেন্দ্র-সমিতি হইতে আমরা শিল্প-শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী অমলা সেনের দ্বারা পূর্ব্বে ১০ মাস সাহায্য পাইয়াছি। পুনরায় পূজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহায্য পাইয়া আমরা বড়ই উপকৃতা ও সেইজন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যাহাতে নারীগণ অর্থাৎ নিঃসহায়া দরিদ্রা বিধবারা নিজের সংস্থান করিতে সক্ষম হয় তাহাই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

সমিতির সভ্যাসংখ্যা ৪৬জন; শিল্পক্লাসের ছাত্রী সভ্যা সমেত ১৯ জন। ১টি গরীব ছাত্রীকে বিনা-বেতনে ক্লাসে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কয়েকজন গরীব মেয়েকে সমিতিতে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য একটা পড়ার ক্লাস খোলা হইয়াছে এবং চরকা কাটা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সমিতির সংগৃহীত মুষ্টিভিক্ষার একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ হইতে একটি দরিদ্র বিধবাকে সাহায্য করা হয়; তাহাতে তাঁহার মাসিক ৪৲ টাকা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সমিতির সভ্যাগণ প্রায় সকলেই ছাঁট-কাটের কাজ, উলের ও সুতার জামা প্রস্তুত, কাঁথা তৈয়ারী, নানা-রূপ নারিকেলের ও ছানার খাবার প্রস্তুত, আলপনা ও নানারূপ আচার তৈয়ারী করেন। বিক্রয় করিলে প্রত্যেক সভ্যার ৭।৮ টাকা হইতে পারে। প্রত্যেক সভ্যার বাড়ীতে নানারূপ তরি-তরকারী, শাকসব্জীর বাগান আছে। এক সভ্যার বাগান গত বৎসর ৭মণ আলু উৎপন্ন হইয়া-

ছিল। সম্পাদিকার বাসায় নানারূপ তরিতরকারী শাক-সব্জী ফুলফল ইত্যাদি বার' মাস হয়। গত বৎসরসম্পাদিকা নিজ হস্তে ছানার সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া ছিলেন এবং প্রায় ১৫০৲টাকার বিক্রয় হইয়াছিল। তাতে খরচ বাদে ৫০৲ লাভ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া সম্পাদিকা নানারূপ আচার, মোরব্বা, জেলী প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। সম্পাদিকার বাসায় প্রত্যহ অন্যূন এক হাজার গন্ধ চরকার সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের সমিতির গরীব বিধবা একটি শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রী স্থানীয় লোকের নিকট হইতে অর্ডার পাইয়া সাট, পাঞ্জাবী ইত্যাদি সেলাই করিয়া মাসে ১০৲ হইতে ১৫৲ উপার্জ্জন করে।

আমরা ৩ মাস হইল ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিতেছি। ৮জন সভ্যা ও ২ জন দেশীয় দাই এই শিক্ষার ফলে বেশ উপকার পাইতেছে। পাড়ায় প্রসূতির বেদনা উপস্থিত হইলে আমরা খবর পাইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি। কারণ এখানে ১ জন হাঁসপাতালের মিডওয়াইফ ছাড়া অন্য শিক্ষিত ধাত্রী নাই।

সমিতির অধিবেশন মাসে ২ বার হয়। অধিবেশনে ভাল ভাল প্রবন্ধ পাঠ, স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর জীবনী, বঙ্গলক্ষ্মী ও খবরের কাগজ পড়া হইয়া থাকে। স্থানীয় বালিকা-স্কুলে, সম্পাদিকার গৃহে ও কখন কখন স্থানীয় থিয়েটার-হলে সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। অধিবেশনে সকল সময় সকল সভ্যা উপস্থিত হন না। সম্প্রতি আমরা একটি একজিকিউটিভ কমিটি গঠন করিয়াছি, তাহাতে কার্য্যের সুবিধা হইবে আশা করি। গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ আমাদের সমিতির বাৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সেই উৎসবে কবিতা, গান ট্যাব্লো, কমিক ইত্যাদি উপস্থিত মহিলাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। আমরা সামান্য কয়েকজন নারী মিলিয়া এই মহিলাসমিতি গড়িয়া তুলিয়াছি। সকলপ্রকার উন্নতির মূলে প্রধান প্রতিবন্ধক যতদূর দেখা যায়, আমাদের শিক্ষাহীনতা। আমাদের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচারকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সকল-প্রকার বাধা সত্ত্বেও সমিতির কাজ যেভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে করা যায়।

গত ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সমিতির তহবিলে ৩৪৭৶১৫ জমা এবং ২৩৪৸৶১০ খরচ হইয়াছে। হস্তে মজুত তহবিল ১১৲৫ আছে।

শ্রীমতী দেবী,
সম্পাদিকা।

শীতলাই

গত ১৩৩১ সালের ৩রা চৈত্র তারিখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে সরোজনলিনীদত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রচারকার্য্যের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। শীতলাই জমিদারবাবুর কেশিয়ার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ-গোবিন্দদাস বৈষ্ণব ও অনেক জন ছাত্রীর বিশেষ উদ্যোগে ৫ই চৈত্র মঙ্গলবার (১৩৩৬) সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণজীর এই পবিত্র আভিনায় শীতলাই ও সিঙ্কি-নগরের মহিলাবৃন্দের এক সভার অনুষ্ঠান করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় আলোক-চিত্র সাহায্যে "নারীমঙ্গল সমিতির" উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজে নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ দান করিলে সমবেত মহিলাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহের সঞ্চার হয়।

তখন সমবেত মহিলাবৃন্দের সম্মতিক্রমে শীতলাইয়ে একটি "মহিলাসমিতি" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ৭ জন মাত্র সভ্যা লইয়া সেদিন একটি ক্ষুদ্র সমিতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহিলাবৃন্দের মধ্যে এই সভার প্রধান উদ্যোগকর্ত্রী শ্রীযুক্তা সুধাংশুবালা দেবী ও শ্রীযুক্তা সুরবালা দেবী।

সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্তা সুধাংশুবালা দেবীকে সম্পাদিকা নির্ব্বাচন করা হয়।

ইহার পর ১৩ই চৈত্র তারিখে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার হেড্‌মাষ্টার মহাশয় মহিলাসমিতির আবশ্যকতা ও সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তারপর এই সমিতির কার্য্য-পরিচালনের জন্য কয়েকটি সাধারণ নিয়ম প্রণয়ন করা হয়। এই সভায় মোট ২৭ জন সভ্যা-তালিকায় নাম লেখান।

তারপর ২৪শে চৈত্রের সভায় আরো ৭ জন সভ্যা-তালিকার নাম লিখান। এই সভায় মাসিক চাঁদা ধার্য্য করা হয় ও ১০ জন সভ্যা লইয়া একটি "কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি" গঠন করা হয়।

এই সমিতি হইতে মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত একটি "মহিলা-স্কুল" খোলা হইয়াছে। প্রত্যহ বেলা ২টার সময় স্কুল বসে; সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুধাংশুবালা দেবী বর্ত্তমানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছেন। সম্পাদিকার গৃহেই আপাততঃ স্কুল হইতেছে। বর্ত্তমান ছাত্রীসংখ্যা ১৩ জন। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে মাসিক ৪৲ টাকা করিয়া এই স্কুলের জন্য সাহায্য পাওয়া যাইতেছে।

প্রতিমাসে একটি করিয়া সমিতির সাধারণ সভা বা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আহ্বান করা হয়।

নানা প্রকার সূচি ও উলের কাজ, চরকাকাটা ও সৈতাকাটার কাজ কয়েকজন সভ্যা করিতেছেন। তাঁহাদের যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাইতেছে।

কয়েকজন সভ্যা যেরকম আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে মনে হইতেছে আর্থিক স্বচ্ছলতা কিছু হইলে কাজের আরো সুবিধা ও প্রসার বাড়িবে। সেলাই জামা (হাতে তৈয়ারী), সেমিজ, রিপুকর্ম্ম, সূচিশিল্প, লেপ, আসন, কাঁথা, সূতা, ও সৈতা কাটা, নানাপ্রকার উলের কাজ, কাপড়ের উপর ফুল তোলা, নাম লেখা, মনিব্যাগ তৈরী, সাবান প্রস্তুত, নানাপ্রকার সিকা তৈরী, নানাপ্রকার রন্ধন প্রভৃতি কাজ অনেক সভ্যাই করিয়া থাকেন। একটি সেলাইয়ের কল না থাকায় খুব অসুবিধা হইতেছে। মুষ্টির চাউল সংগ্রহ হইতেছে। উহা দ্বারা একটি কাণ্ড করিয়া একটি সেলাইয়ের কল আনিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সভ্যাদের মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের চেষ্টা বেশ চলিতেছে। অনেকটা সুফলও ফলিয়াছে। কয়েকজন সভ্যা সঙ্গীতাগান ও উদ্যান রচনা করিয়াছেন। নানাশ্রেণীর হিন্দুমহিলাগণ সভ্যা হইয়াছেন। এতদ্দেশের নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের উদ্যোক্তা, দেশের একনিষ্ঠ সেবক বর্দ্ধমান জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় আমাদের সমিতির ২টি সভায় উপস্থিত হইয়া নারীজাগরণ ও বর্ত্তমানযুগে নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সরল ও সুললিত ভাষায় সুন্দর সারগর্ভ উপদেশ দান করেন। তিনি এবং তাঁহার উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী আমাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন। আমরা আশা করি, তাঁহাদের স্নেহে আমাদের এই সমিতি সত্বরই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে। শ্রীভগবান্ আমাদের শুভকার্য্যে সহায় হউন।

বঙ্গলক্ষ্মী মাসিকপত্রিকা সমিতি হইতে লওয়া হইতেছে। অনেক সভ্যা উহা পড়িয়া থাকেন। অনেক সভ্যা স্থানীয় সিরীশচন্দ্র পাবলিক্ লাইব্রেরী হইতে নানা পুস্তকাদি লইয়া পাঠ করেন। সমিতির কোন স্থায়ী গৃহ নাই। সম্পাদিকা মহাশয়ার গৃহেই সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। প্রায় সময় সভ্যাই পদব্রজে আসেন, কেহ কেহ গাড়ীতে আসেন। বর্ষাকালে সকলকেই নৌকায় আসিতে হয়। ইতনাইয়ের জমিদার মহাশয় সমিতিতে একটি চরকা দান করিয়াছেন; সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বর্ত্তমান সমিতির মোট সভ্যার সংখ্যা ৩৪ জন।

আমাদের এই সমিতির উৎসাহদাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী আমাদের শিল্পকার্য্যের জন্য ৩টি রৌপ্যপদক পারিতোষিক দিবেন; সেজন্য আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতেছি।

শ্রী সুধাংশুবালা দেবী,
সম্পাদিকা

সমন্বয়-সূত্র

শ্রী সুধীরচন্দ্র সেন

মানুষের সীমা-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মানব-মন এখন এমন-এক স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যখন সে বলিতে পারে, আমাতে আর আমি নাই,—আমার নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই,—আমার যা ইচ্ছা, যা-কিছু ভাবনা, যা-কিছু কার্য্য সমস্তই সেই বিশ্ব-আত্মা পরম-দেবতা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত,—আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। সব অভিমান নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কেবল এই মাত্র অনুভূতি আছে, আমি যন্ত্র আর তিনি যন্ত্রী। এইরূপে সেই বিশ্বপতির ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে লয় করিয়া দিলে যে অবস্থা হয় তাকেই বলে ভগবানের সহিত একাত্মগত হওয়া বা ভগবৎপ্রাপ্তি। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হন। জীব এই অবস্থা লাভ করিতে পারে এবং যাঁহারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হন তাঁহাদিগকে চলিত ভাষায় ভগবান বলে। যেমন ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য, ভগবান বশিষ্ঠ, ভগবান রামকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধদেব, ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ—যুক্তিবাদীর নিকট এই ধরণেরই কথা। ভগবান জীবের প্রার্থনা, কামনা পূরণজন্য জীবদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, যুক্তিবাদী এই অবতারতত্ত্ব না বুঝিলেও যুক্তি দ্বারা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন—মানুষ ভগবানে পূর্ণসমর্পণ করিতে পারিলে, ভগবানে পূর্ব্বোক্তভাবে একাত্মগত হইতে পারিলে তাঁহাকে এই অর্থে ভগবান বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের "সীমার মধ্যে অসীমকে পাওয়া" এই অবস্থায়ই পূর্ব্বাভাষ। সান্তচিত্ত মানবদেহ এই ভাবেই সান্তে অনন্তের এবং অনন্তে সান্তের লীলা অনুভব করিয়া সচ্চিদানন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান যুগে এই অমৃতচক্ষু লাভ করাই সর্ব্বস্ব, সর্ব্বসমস্যা সমন্বয় করিবার একমাত্র উপায়। একই মূল বস্তু যিনি অনন্ত, তিনি অনন্তভাবে নিত্যকাল সান্তে প্রকাশিত হইতেছেন।—বিরোধের স্থান কোথায়?

একই বস্তুর অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত লীলা, অনন্ত বৈচিত্র্য। বিরোধ তো থাকিবেই, ভেদ তো থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া কি এই বিরোধ, এই ভেদ একই বস্তুর দুই বিপরীত দিক, এই জ্ঞান লোপ পাইবে? ভেদও বটে আবার তাহা একই বস্তুর ভেদ। এই ভেদ ও অভেদ, এই দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় যুগপৎ অনুভব হইলে যে অবস্থা হয় তাহাই অমৃত-অবস্থা, পূর্ণজ্ঞানের অবস্থা—যে জ্ঞানের দ্বারা অপূর্ণও পূর্ণ হইয়া যায়। একটা কথা আছে—

"তিথি-ভেদে হয় যথা চন্দ্রের প্রকাশ।
চন্দ্র কিন্তু একই বস্তু থাকে বারমাস।

সেইরূপ অভিব্যক্তির তারতম্যেই ভেদ-বোধ, একই চন্দ্রকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন। ইহাই অমৃতচক্ষু।

এই অমৃতচক্ষু পাইলে সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বে সেই অমৃত দর্শন হয়। ঘৃণাকে ঘৃণা বলিয়া বোধ আছে অথচ তাহা যে সেই অমৃতময়েরই অমৃতময় এ আনন্দও আছে এই যুগপৎ অনুভূতিই অমৃত-অবস্থা। জ্ঞানের প্রসারে বর্ত্তমান "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এ অনুভূতি আনা আদৌ অসম্ভব বোধ হয় না। তখন,

"কোথা থাকে ভেদাভেদ সার্থ খুঁটিনাটি।
কোথা থাকে ছোট-বড় জ্ঞান পরিপাটি।
এক প্রাণ এক আত্মা প্রতি ঘটে পটে।
জীবে অনুভবি' তাহা জগতে প্রকটে।
যাকড়ের ভিন্ন বলি' ব্রহ্মাণ্ড ভাবিবে।
তিন কালে এক কাল করিয়া বসিবে।
দেশ-কাল ব্যবধান দিবে ঘুচাইয়া।
চেতনে জড়েতে ভেদ ফেলিবে মুছিয়া।
ইহলোক-পরলোক ভেদ হবে দূর।
পাপ-পুণ্য সর্ব্বদ্বন্দ্ব অমৃতেতে পূর।
সংস্কারবিমুক্ত আত্মা সর্ব্বত্র প্রকাশ।
ঘটাকাশ পটাকাশ একেরই বিলাস॥

সর্ব্বত্ব সমন্বিত বৈচিত্র্য গৌরবে।
এদের মহিমা যবে ফুটিয়া উঠিবে।"

সেইকালই আসিতেছে। জগতে যখন বৈষম্যজনিত অশান্তি পূর্ণশক্তিতে প্রবল তখনই সমন্বয়ের কাল অনুভবতী। তাই সমন্বয়ের ভাব ফুটিতেছে—যাহাতে সাকারবাদী নিরাকারবাদীকে, নিরাকারবাদী সাকারবাদীকে, হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে, সাধু অসাধুকে, অসাধু সাধুকে, একই বস্তুর বৈচিত্র্যবোধে—পরও বোধ করিবেন না, অপরও বোধ করিবেন না, ভেদের মধ্যেও অভেদ দেখিবেন, আবার অভেদের মধ্যেও ভেদ দেখিবেন। হিন্দুতে ব্রাহ্মতে কি বিষম রেষারেষি গিয়াছে সরস্বতীপূজা লইয়া,তাহা ভুলি নাই। কিন্তু সে পার্থক্য,সে বিরোধ মিলিয়া যাইতেছে। সীমার মধ্যে অসীমের অনুভূতি এবং অসীমের মধ্যে সীমার অনুভূতি ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বংশধর রবীন্দ্রনাথেরই আজ সাধনলভ্য। হিন্দু ও ব্রাহ্মে তো তত্ত্ববিচারে গোল বাধিবার কথা নহে। রবীন্দ্রনাথের "সীমা ও অসীমতা" নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে কবি বলিয়াছেন, "অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেখানে তা শূন্য, সীমা যেখানে অসীমকে নির্দ্দেশ করে না সেখানে তা নিরর্থক।" কবির এই বাক্য বিবাদমান ব্রাহ্ম ও হিন্দু উভয়ই প্রণিধান করিয়া দেখিলে দুইজনেই নিজ নিজ ত্রুটি বুঝিয়া প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইবেন।

যে সমন্বয়ের যুগ আসিতেছে তাহাতে ঘৃণাতেও ঘৃণা থাকিবে না, শত্রুতাতেও শত্রুতা থাকিবে না। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাজ্ঞানই সমন্বয়-যুগের প্রাথমিক শিক্ষা; সৎ অসৎ, আলো আঁধার, সাকার নিরাকার, পাপ পুণ্য ইত্যাদি যাবতীয় দ্বন্দ্ব যেন সেই একই বস্তুর দুই বিরুদ্ধ দিক—বিরোধ থাকিলেও তত্ত্বতঃ অবিরোধ, এই অমৃত-জ্ঞানই এই যুগের সাধন-লক্ষ্য। একটির আস্বাদনের জন্য অন্যটির অস্তিত্বের সার্থকতা। একটি আর একটির অনুপূরক। সমন্বয়ের সার্থকতার জন্যই বিরোধ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

মূলতত্ত্বেও দেখিতে পাই এই সমন্বয়ের জীবন্ত আদর্শ আমাদের দেহযন্ত্রেই বিদ্যমান। কি ভাবে দেহযন্ত্রটি চলিতেছে, দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পরস্পর ভিন্ন থাকিয়াও কিরূপে অবিরোধে কার্য্য করে এবং দেহটিকে সুস্থ ও কার্য্যক্ষম রাখে ইহা দেখিলেই সমন্বয়ের সূত্রটি অতি সহজেই আয়ত্ত হয়। আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রাষ্ট্র-জীবনে যতপ্রকার বিরোধ আছে সব বিরোধের সমাধান হয় এই দেহযন্ত্রটিকে আদর্শ গ্রহণ করিলে। সৌরজগৎও আর একটি বিরাট আদর্শ এই সমন্বয়ের। প্রত্যেকে স্বাধীন আবার প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না, এমনই চমৎকার ব্যবস্থা। মানবসমাজও এই সমন্বয়নীতি অনুসরণ করিতে চলিয়াছে। তার সিদ্ধিকাল আসন্ন।

ভগবান এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, তাঁহার সহিত প্রত্যেক জীবের সাক্ষাৎসম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন, এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস যখন না থাকে তখনি মানুষ ভাবে জগৎ হইতে বুঝি এ অশান্তি আর যাইবেনা, যুদ্ধ বুঝি পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে না, পৃথিবী যেমন চলিতেছে তেমনি বুঝি চলিবে, মানুষের মনের বুঝি আর পরিবর্ত্তন হইবে না, মানুষই বুঝি এই দুনিয়ার মালিক—তার উপরে আর কোন কর্ত্তা নাই।

জগতে কি বিরাট পরিবর্ত্তন আসিয়াছে ও আসিতেছে এবং তাহার লক্ষ্য কোন্ দিকে এতটুকু চিন্তা করিলেই মন আনন্দে নাচিয়া উঠে। যাহা হয় নাই, তাহা হইবে না ও হইতে পারে না—এ ধারণা তার যায় ভগবানে বিশ্বাস নাই। কিন্তু ভগবান মানুষকে আজ অবস্থায় ফেলাইয়া রাখা করিতেছেন বিশ্বাস করিতে, যে,এ দুনিয়ার মালিক সে নহে —এ দুনিয়ার মালিক ভগবান। এই দেহযন্ত্রটিকে, সৌর-জগৎকে তিনি যেভাবে চালাইতেছেন, সমগ্র মানব-সমাজকেও তিনি সেই সমন্বয়ের পথে আনিতেছেন। এই সমন্বয়ই প্রকৃত স্বাধীনতা।

কন্যার প্রতি

শ্রী প্রতিভাসুন্দরী ঘোষ

সিদ্ধি আমার এসেছ বীনার গেহে,
ফলেছে এবার— হৃদি উথলিত স্নেহে।
কোন্ অমরার অমৃত-পরশে
তুমি এত অপরূপ?
অনেক পুণ্যে হেরিনু তোমার
দেব-বাঞ্ছিত রূপ।

তুমি বুঝি মোর পারিজাত-হার
কিবা কৌস্তুভমণি,
তুমি শরতের আকাশের চাঁদ
অমল জ্যোৎস্না-খনি।
কি যে পবিত্র কমনীয় রূপ—
অপলক মোর আঁখি—
সারা হৃদি-মন- জুড়ান আমার
তোমায় ওরূপ দেখি!

কেন্দ্রসমিতির কথা

পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর অক্লান্ত চেষ্টা ও উদ্যমে পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের কার্য্য অতি অল্পসময়ের মধ্যে আশাতীত উন্নতিলাভ করিয়াছে। বিধবাশ্রমের সহিত একটি মধ্যশ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় আশ্রমের গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পুরীতে ভাল বালিকাবিদ্যালয় ছিল না। স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ এই অভাবের বিষয় শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর নিকট জ্ঞাপন করিলে তিনি বিধবাশ্রমের সহিত একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করেন। গত তিনমাস কাল অমণকর্ম্মা হইয়া পুরীতে অবস্থান করিবার ফলে অতি অল্পসময়ের মধ্যে বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। স্থানীয় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ ব্যাডানি আই-সি-এস, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় সাহেব শ্রীশচন্দ্র বসু সকলেই উদ্যোগী হইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য একখানি মোটর-বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিধবাশ্রমের গৃহে যথেষ্ট স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বিদ্যালয়ের জন্য আর-একখানি গৃহনির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইতিমধ্যেই গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে কিছু চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। একজন স্থানীয় সহৃদয় ব্যক্তি ২৭৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমাদের সমিতির প্রধান সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা মৃগনয়না দেবী বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া তাহাতে ২০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতা, বহুবাজারের শ্রীমতী প্রভাতী দেবী বিধবাশ্রমের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য মাসিক ২৲ টাকা সাহায্য করিতেছেন। বালিকাবিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে শিল্পকার্য্য ও সঙ্গীত শিখিবার ব্যবস্থাও আছে। বিধবাশ্রমে নানাপ্রকার শিল্প-কার্য্য ও লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হয়। আশ্রমের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেক বিধবা ছাত্রীর আহারাদির জন্য মাসিক ১০৲ টাকা লওয়া হয়। ৪৫ নং বেনিয়াটোলা

লেন, সরোজনলিনী নারীমঙ্গলসমিতির কার্য্যালয়ে আবেদন করিলে আশ্রমসম্পর্কীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী প্রেরণ করা হয়।

সরোজনলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়

গত ৫ বৎসরকাল সরোজনলিনী নারীশিল্প-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিল্পশিক্ষা বিষয়ে নারী-সমাজের মধ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫ শত মহিলা এই স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গলসমিতি শুধু কলিকাতায় এইরূপ একটি শিল্পশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন নাই। কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলে—সমগ্র বঙ্গদেশের জেলায় জেলায়, নগরে নগরে অসংখ্য মহিলাসমিতি স্থাপন করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক মহিলাসমিতিতেই নানাপ্রকার শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের সমিতি কেবলমাত্র কলিকাতাবাসিনী মহিলাগণের জন্য শিল্পশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেন নাই, সমস্ত সমস্ত বাংলা দেশে মহিলাসমিতির ভিতর দিয়া বেসরকারে, বিশেষভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিধবাদের শিল্প-শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মহিলাসমিতিতে শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য কেন্দ্রসমিতি হইতে শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ করা হয়। বর্ত্তমানে সরোজনলিনী নারীশিল্প-শিক্ষালয়ে প্রায় দুই শত মহিলা শিক্ষালাভ করিতেছেন। স্থানাভাববশতঃ বহু ছাত্রীকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। কেন্দ্রসমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ স্কুলের জন্য আরও সুপ্রশস্ত গৃহনির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা গৃহনির্ম্মাণকল্পে সমিতির অর্থভাণ্ডারে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত নারী-সমাজের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিন।

মহিলাসমিতি পরিদর্শন

গত ২০শে জুন শনিবার সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতির বিশিষ্ট মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী হাওড়ার ঝাঁটরা ও জয়দেব কুণ্ড লেন মহিলাসমিতি পরিদর্শন করেন। ২নং হেম চক্রবর্ত্তী লেনে ঝাঁটরা মহিলাসমিতির অধিবেশন হয়। মহিলাসমিতির বিশিষ্ট সভ্যারা এবং সমিতির পরিচালিত বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ এই বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। একজন শিল্প-শিক্ষয়িত্রী এই সমিতিতে মহিলাদিগকে শিল্পশিক্ষা দিতেছেন এবং একজন বালিকাবিদ্যালয় পরিচালন করেন। সভ্যারা সাধারণ ছাঁট-কাট এবং জামা সেলাই শিক্ষা করিয়াছেন। বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সঙ্গীত, আবৃত্তি, ভাবসঙ্গীত, ড্রিল এবং ছোরা খেলা প্রভৃতিতে বিশেষ উৎসাহ এবং নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্তা নন্দরাণী ঘোষ এই সমিতির সম্পাদিকা; তিনি এই সমিতি-পরিচালনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। ঐ দিন ২১নং জয়দেব কুণ্ড লেনে জয়দেব কুণ্ড মহিলা-সমিতিও পরিদর্শন করা হয়। এখানেও সভ্যারা শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে সেলাই, ছাঁটকাট ইত্যাদি শিক্ষা করিতেছেন। সমিতির সভ্যাদের প্রস্তুত জামাগুলি এবং অন্যান্য বিষয়ের কাজ ভালই হইয়াছে। এই সমিতির সভ্যারা খুব উৎসাহের সহিত সূতা কাটিতেছেন। শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী উভয় সমিতিতেই বক্তৃতা করেন এবং মেয়ে ও মহিলাদিগকে উৎসাহিত করিয়া উপদেশ দেন।

বেহালায় মহিলাসভা

গত ২৭শে জুন সন্ধ্যা ৬টার সময় বেহালা 'তারা-কুটীরে' শ্রীযুক্ত বরদীশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে একটি বিরাট মহিলাসভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গলসমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, সহঃ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুখময়ী রায়, শিল্পবিদ্যালয়ের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কুমারী শ্রীমতী প্রতিভা সেন বি-এ ও শ্রীমতী হেমনলিনী মল্লিক এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ সেই সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী এবং অন্যান্য মহিলা-কর্ম্মীগণ উপস্থিত স্থানীয় মহিলাদের সহিত নারীমঙ্গল-সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং তাহার উদ্দেশ্য বিষয়ে সবিস্তর আলোচনা করেন। তাঁহাদের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া মহিলারা

ঐ দিনই একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী অতি উদ্দীপনাময়ী ভাষায় পুরুষদিগকে এই নারীপ্রগতি-আন্দোলনে মহিলাদের সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করেন। তৎপরে নারীমঙ্গলসমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ মাজিক লণ্ঠন সহযোগে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গলসমিতির উৎপত্তি এবং বাংলা-দেশে এবং বাংলার বাহিরে ইহার তিনশতাধিক শাখা-সমিতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও শিল্পবিষয়ক বহুমুখী কর্ম্মধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় পুরুষ এবং মহিলারা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যেও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া তাঁহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং উৎসাহের পরিচয় দান করেন। শ্রীযুক্ত ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অদম্য উৎসাহে এই সমিতি-প্রতিষ্ঠার কার্য্য সফল হইয়াছে।

হুগলি মহিলাসমিতি

গত ৩০শে জুন সোমবার হুগলি মহিলাসমিতির উদ্যোগে হুগলি কলেজিয়েট স্কুল-হলে একটি বিশেষ মহিলাসভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গলসমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী এই সভায় উপস্থিত হইয়া কিরূপে মহিলাসমিতির কার্য্য সুষ্ঠুরূপ সুপরিচালিত করা যায়, সে বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। তৎপরে মহিলা-সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ ইউরোপে মেয়েদিগকে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে কিরূপে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে আলোক-চিত্র সাহায্যে বক্তৃতা করেন। মহিলাসমিতির সভ্যাগণ, সমিতির সভানেত্রী মিসেস নাগ এবং সম্পাদিকা মিসেস রায় অতি দুর্য্যোগের ভিতরেও যোগদান করিয়াছিলেন।

মেমারিতে নূতন মহিলাসমিতি

গত ১৩ই জুলাই বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মেমারি গ্রামে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়, সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গলসমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী পাটি এই সভায় সভানেত্রীর কার্য্য করেন, এবং অতি ওজস্বিনী ভাষায় নারীমঙ্গল এবং মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপরে নারীমঙ্গলসমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রণালী এবং দেশ-বিদেশের মহিলাসমিতি-সমূহের কার্য্যাবলী বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় দুই-শত মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। সভাস্থলেই শ্রীমতী কিরণময়ী বিশ্বাসকে সম্পাদিকা করিয়া "মেমারী মাতৃমন্দির মহিলাসমিতি" নাম দিয়া একটি মহিলাসমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি কেন্দ্রসমিতির সহিত কি দিয়া যুক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রীর সমিতিপরিদর্শন

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি ও শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় খানবাহাদুর কে, জি, এম, ফারোকি গত ১২ই জুলাই শনিবার সরোজনলিনী নারীমঙ্গলসমিতি এবং তাহার অন্তর্গত নারীশিল্প-শিক্ষালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সমিতির সভাপতি মাননীয় সন্তোষের রাজা সাহেব, প্রধান সম্পাদক রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, সহঃ সভানেত্রী শ্রীমতী নীরজবাসিনী সোম, রায় বাহাদুর গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সমিতির কর্তৃপক্ষগণ উপস্থিত থাকিয়া মাননীয় মন্ত্রীর অভ্যর্থনা করেন। মন্ত্রী-মহোদয় শিক্ষালয়ের নানা বিভাগ পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করেন। পরিদর্শন-শেষে শিক্ষালয়ের ছাত্রীগণ তাঁহাদের স্বহস্তে প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি ভোজন করান।

সরোজনলিনী নারীশিক্ষালয়ে দান

বরাহনগর আলমবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র সরোজনলিনী নারীশিক্ষালয়ের লাইব্রেরীতে সুনির্ব্বা-চিত ২৯২খানি বাংলা এবং ২২০খানি ইংরাজী পুস্তক দান করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পুস্তকগুলির মূল্য অন্যূন পাঁচ শত টাকা হইবে। তাঁহার এই দানে স্কুলের লাইব্রেরীটি বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিল।

কাজরী

(গান)

শ্রী পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাদল মেঘের আসে গগনে,
বেদনা ফেলার ছিল না আগরে,—
কাজল মাখিয়া যায় নয়নে,
ছলকি' ছিপায় বারি পাগরে।
বাতাস কাঁপিয়া যায় নিশাসে,
ঘরের প্রদীপ আজি নিভা দে,
উদাসী কাঁদিয়া চায় কি আশে,—
বিরহী। ছয়ারে একা জাগ'রে!

শ্লোনের লিনিমেণ্ট

যন্ত্রণাদায়ক বাতবেদনা দূর করে

যাহারা নানাপ্রকার দুঃসাধ্য খেলা করেন প্রায়ই তাঁহাদের নানাস্থান কাটিয়া এবং ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। শ্লোনের লিনিমেণ্ট যন্ত্রণাদায়ক পেশী সমূহে অচিরে আরাম প্রদান করে। যন্ত্রণাদায়ক স্থানে সামান্য পরিমাণ শ্লোনের লিনিমেণ্ট প্রয়োগ করিলেই আপনি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইতে পারিবেন।

Sloan's Liniment *kills pain!*

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him at 45 Benintola Lane, Calcutta.

শিল্পী—শ্রীদুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য

গির্জ্জার ভিতর পাথরের বেদীতে ও বেওয়ালের গায়ে অতি সুন্দর ইন্‌লেভের কাজ করা। আমরা ডোমের উপরে উঠিলাম—ইহা অনেক উঁচু, উপর হইতে প্যারিস সহর একটি ছবির মতন মনে হইল। সৌভাগ্যক্রমে আজ দিনটি খুব পরিষ্কার ছিল। এই গির্জ্জা মার্কেল-পাথরের তৈরী, অতি সুন্দর। তুপুরে মোমের পুতুলের একজিবিশান্ দেখিতে গিয়াছিলাম; একটি মস্ত বাড়ী মোমের পুতুলে সাজান আছে। মস্ত হলের চারিদিকে মোমের পুতুল নানা ভঙ্গীতে সাজান, মাঝখানে দর্শকদের বসিয়া দেখিবার জন্য কয়েকখানা বেঞ্চি পাতা। বেঞ্চিতে মাঝে মাঝে দু' এক জায়গায় মোমের পুতুল বসান আছে, ইহা এত স্বাভাবিক যে আমি সত্যকার মানুষ বসিয়া আছে মনে করিয়াছিলাম। উপরের তলায় আমাদের একটি ঘরে লইয়া গেল, এখানে চারিদিকে এমন আরসী লাগান আছে যে অসংখ্য ঘর দেখা-ইতেছিল। অনেক রকম আলোকে নানারকম দৃশ্য দেখা হইল। মাটির নীচের তলায় বিপ্লবের সময়কার অনেক ভয়াবহ দৃশ্য আছে। এসব দেখার পর একজন নানা-রকম ম্যাজিক দেখাইলেন—কয়েকটা বেশ আশ্চর্য্য এবং নূতন মনে হইল।

ক্রমশঃ

ধর্ম্ম গেল

শ্রী পরিমল গোস্বামী এম-এ

দেশে সবেমাত্র নারীজাগরণ সুরু হইয়াছে, কিন্তু দেখা যাইতেছে পুরুষেরও ঘুম ভাঙিয়া আসিল। চতুর্দ্দিক হইতে যেরূপ কুৎসিৎ চীৎকার উঠিতেছে তাহাতে নারী-প্রগতি-সমর্থনকারীদিগের ত বটেই, নারীদিগেরও মান-বাঁচানো দায় হইয়া পড়িয়াছে।

এই চীৎকারের মূলে রহিয়াছে অন্ধ ভয়। সকলেরই ভয়—ধর্ম্ম গেল। সতীদাহ-নিবারণের সময় চীৎকার উঠিয়াছিল ধর্ম্ম গেল, বিধবাবিবাহ প্রচলনের সময় চীৎকার উঠিয়াছিল ধর্ম্ম গেল—তারপর কত বৎসর অতীত হইল আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও শিশুবিবাহ-নিবারণের উপলক্ষে সেই একই চীৎকার শুনা যাইতেছে—ধর্ম্ম গেল।

সতীদাহ-নিবারণে, বহুবিবাহ-নিবারণে, বিধবাবিবাহ-প্রচলনে অথবা শিশুবিবাহ-উচ্ছেদে ধর্ম্ম যায় কেন এবং ইহার বিপরীত হইলেই ধর্ম্ম থাকে কেন তাহা বুঝিয়া দেখা দরকার।

যাঁহাদিগকে আমরা মহাত্মা বলিয়া পূজা করি অথবা যাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া মান্য করি তাঁহাদের মতে যাহা স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধায়ক দেখা যাইতেছে তাহাই আমাদের ধর্ম্মনাশক।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহের আবশ্যকতা দেশবাসীকে বুঝাইতেছিলেন, তখন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত যে-যুক্তি দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তি খণ্ডন করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা এখানে উদ্ধৃত করিতে হইল :—

"নব্য পুরুষেরা অনেকেই বলেন, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই মনুষ্য, সমান পদার্থ। তন্মধ্যে পুরুষেরা স্ত্রী-বিয়োগ হইলেই বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু স্ত্রীরা স্বামী-বিয়োগ হইলে পারিবে না ইহা অত্যন্ত অন্যায় ব্যবস্থা, নিতান্তই স্বার্থ-পরতা। একথার সিদ্ধান্ত এই যে শৃগাল-কুকুর প্রভৃতি যাবদীয় জগন্মণ্ডলে সমদর্শনের জনক যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাই যে যাঁহার পরিণত হইয়াছে ৷ ৷ সেই মহাত্মাই স্ত্রীপুরুষে, স্ত্রীপুরুষে কেন শৃগাল-কুকুর-সাধারণে সমদর্শনে সমব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সংসারী তাঁহারা জাতিভেদে ব্যবহারবিশেষ না রাখিলে কদাচই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না। ৷৷ ব্রহ্মজ্ঞানী-মনে ঠাকুর-কুকুর সমান

বলিয়া, গৃহীব্যক্তি কেহ যদি দুইদিন কি তিনদিন কোন কুকুরকে আপনার আহারের নিকটে আহার করিতে দেয় তাহা হইলে সেই কুকুর ঐ গৃহীর ভোজনপাত্রে আসিয়াও আহার করে, ক্রমশঃ যখন হইতেও লইবার চেষ্টা করে। এই নিমিত্ত কুকুরকে জাতি স্বতন্ত্র জানিয়া তাহার স্বভাব স্বতন্ত্র জানিতে হইবে এবং তাহার সহিত স্বতন্ত্র করিতে হইবে।"

ইহা অষ্টশতাব্দী পূর্ব্বেকার মনোভাব। এতকাল পরে সঙ্গ-বিল লইয়া ইহা অপেক্ষা অধম এবং হীন মনোভাব ব্যক্ত হইতে দেখা গেল। ধর্ম্ম-লোপ হইবার ভয় হইতে বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম্ম আছে। কাজেই মনে হয়, সতীদাহ-নিবারণে ধর্ম্ম যায় নাই, বিধবাবিবাহে ধর্ম্ম যায় নাই, সঙ্গ আইনের সময়েও ধর্ম্ম যায় নাই। ধর্ম্ম পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া থাকিলে ধর্ম্ম গেল বলিয়া চীৎকারের কোন অর্থ থাকে না, আর ধর্ম্মপ্রাণেরা যে নিরর্থক চীৎকার করিবেন, ইহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ঋষিবাক্যে দেখা যায়—সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে। অর্থাৎ সত্য যুগে যত ধর্ম্ম হইয়াছিল, কলিযুগে তাহা সব নষ্ট হইয়াছে। আবার ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ, কলিযুগে সত্য-যুগের ধর্ম্ম লোপ পাইবে জানিয়া কলিযুগের জন্য পৃথক ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কলিযুগ এখনও গত হয় নাই—সুতরাং কলিযুগের জন্য ঋষিগণ-ব্যবস্থিত ধর্ম্ম আজও বজায় আছে। যদি বলা যায় সেই ধর্ম্মই নষ্ট হইতেছে বলিয়া এত গণ্ডগোল, তাহা হইলে সে কথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কেননা কলিযুগের ধর্ম্ম কলিযুগে নষ্ট হইবে এমন কথা যদি ঋষিগণ গণনা করিয়া বলিয়া থাকেন, তবে ঋষিদের গণনা মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য সে-ধর্ম্ম রক্ষা করিলে পাতক হইতে পারে, এবং যদি সেরূপ কোন কথার উল্লেখ না করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে কলিযুগের ধর্ম্ম কলিযুগে নষ্ট হইবে না। ইহার পরেও যদি ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে ঋষিদিগকে ত্রিকালদর্শী না বলিয়া অকালদর্শী বলিতে হয় এবং তাহা হইলে সমস্ত শাস্ত্রকেই অগ্রাহ্য করিতে হয়। ইহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু নানারূপ অনাচারে ধর্ম্ম যদি সত্যই লোপ পাইয়া থাকে তাহা হইলে কোন্ ধর্ম্ম এখনো আছে যাহা স্ত্রীজাতির উন্নতি-সম্ভাবনা মাত্রেই পাইতে চায়, এবং সেই মুহূর্ত্তে ধর্ম্ম গেল বলিয়া বিষম গণ্ডগোল বাধাই?

তৎপূর্ব্বে দেখা যাউক, ধর্ম্ম বলিতে আমরা কি বুঝি। শিশুবিবাহ ধর্ম্ম, এবং তাহার বিপরীত অধর্ম্ম। আমাদের কাছে ধর্ম্মপালন মুখ্যতঃ ভগবান-প্রাপ্তির উপায়। অর্থাৎ ধর্ম্ম মানেই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। পূর্ব্বে যে বাক্সাধর্ম্ম সমাজধর্ম্ম গৃহধর্ম্ম প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ ছিল, আমাদের মনে এখন আর সে শ্রেণীবিভাগ নাই। শাস্ত্রে যে বলিয়াছিল

অন্যে কৃত যুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥

অর্থাৎ যুগোপযোগী ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন, ইহা এখন আর আমরা মানি না। একথা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিত হয় নাই—আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম যাহা হৃদয়কে পবিত্র করে, মনকে উন্নত করে তাহা যুগে-যুগে পরিবর্ত্তিত হইবে এমন কথা কোন জ্ঞানী লোকে বলেন নাই। যাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম নহে অন্যান্য ধর্ম্ম। হিন্দুর যাহা গৌরবের জিনিষ, যাহা হিন্দুর তপস্যালব্ধ, ধ্যানলব্ধ ধন তাহা কোন ব্যবস্থা নহে, সংহিতা নহে, তাহা দর্শন। সমাজধর্ম্ম, বাক্সাধর্ম্ম বুদ্ধির সৃষ্টি—আধ্যা-ত্মিক ধর্ম্ম অনুভূতির সৃষ্টি। যে-দেশ বারোমাস জলে ডুবিয়া থাকে সেখানে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে উঁচুতে ঘর বাঁধিতে হইবে, ইহা যেকোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্যবস্থা দিতে পারেন। জলে-ডোবা দেশে উঁচুতে ঘর বাঁধাই ধর্ম্ম। কিন্তু ইহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম নহে—সুতরাং সুযোগ বুঝিয়া অর্থাৎ জল স্থায়ীভাবে সরিয়া গেলে নীচে আসিয়া বাস করিলে ধর্ম্ম গেল বলিয়া চীৎকার করা শোভা পায় না। বিবাহও আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম নহে, ইহা গৃহধর্ম্ম। ইহার পশ্চাতে মানুষের বুদ্ধি রহিয়াছে। ইহাকে যুগোপযোগী করিয়া পরিবর্ত্তিত করা চলে। এক যুগের আদর্শ এবং মনোবৃত্তি অনুযায়ী সেই যুগের ব্যক্তি যে ব্যবস্থার করেন—অন্যযুগে সে আদর্শ এবং মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইলে সেই অন্যযুগের জ্ঞানী লোক সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করেন। অতীতে ইহাই হইয়াছে। অনেক সময় বিচার এবং

বুদ্ধির সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র খেয়ালের উপর হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ;—এ-যুগে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করিবার প্রবৃত্তি সকলেরই মনে-প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছে। এ যুগে মানুষের হৃদয়কে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্বেকার কোন সমাজ-ব্যবস্থার হৃদয়বৃত্তিকে স্থান দেওয়া হয় নাই। অতীতে স্ত্রীকে সন্তানোৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে দেখা হইত—ইহা ছাড়া তাহার অন্য কোন সত্তা স্বীকার করা হয় নাই। প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হইলে দ্বিতীয় স্ত্রীর ব্যবস্থা, দ্বিতীয় স্ত্রী মৃতবৎসা হইলে তৃতীয় স্ত্রীর ব্যবস্থা, সে কন্যাপ্রসবিনী হইলে চতুর্থ স্ত্রীর ব্যবস্থা করা হইত। স্ত্রী তাহার সুখ দুঃখের অনুভূতিপূর্ণ হৃদয় লইয়া যদি বিদ্রোহ করে তবে পুত্রলাভ হয় না—কাজেই তাহার কত হৃদয়ের উপর কত প্রলেপের ব্যবস্থা—সে অর্দ্ধাঙ্গিনী—সে সহধর্ম্মিণী—এমন কি সে দেবী। তারপর স্বামীর সঙ্গে তাহাকে স্বর্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা—তাহারও কত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। সতীদাহের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় জগৎকে চমৎকৃত করিতে চাহিয়াছিলাম—সেদিন প্রমাণ হইল একটি নারীর জীবনের চেয়ে তাহা বড় নয়, সেই দিন এদেশে নবযুগের সূচনা। ক্রমে আমাদের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইল। বর্ত্তমানে স্বামী যেমন স্ত্রীর একনিষ্ঠত্বের দাবী করিতেছেন, স্ত্রীও তেমনি স্বামীর একনিষ্ঠত্বের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। এখনকার দাম্পত্য, সতীত্ব, পাতিব্রত্য সংস্কৃতবচনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, উদ্বেগদিদ্ধির বাঁধা ঘরে নয়—ইহা বিশুদ্ধ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আসল কথা, কোনরূপ মিথ্যা সংস্কারের গণ্ডীতে এখন কেহ বাঁধা থাকিতে চাহে না। জাতীয়তার বেড়া দিয়া এতকাল যাহাদিগকে হীন এবং ছোট বলিয়া প্রচার করা হইতেছিল—তাহারা সে বেড়া ভাঙিয়া দিয়াছে। শূদ্র যদি শিক্ষিত এবং মার্জ্জিতরুচি হয় তবে সে কেবল শূদ্র বলিয়াই নিজেকে ব্রাহ্মণ হইতে হীন মনে করে না। ব্রাহ্মণও এখন কেবলমাত্র জাতিহিসাবে নিজেকে অন্যান্য জাতি হইতে উচ্চ মনে করিতেছে না। কোন একটা বিশেষ সংজ্ঞা বা সংস্কারের গণ্ডীতে প্রত্যেকটি লোকের বৈচিত্র্যকে নষ্ট করিয়া একাকার করিয়া দেওয়া এযুগে কল্পনার অতীত হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক এই কারণেই স্ত্রীকে তাহার সমস্ত স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া পুরুষের উদ্বেগসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে আহ্বান করা চলিতেছে না। পুরুষ কোন-এক নরক হইতে ত্রাণ পাইবে—এই অর্থহীন শাস্ত্রবাক্যকে মান্য করিয়া শুদ্ধমাত্র পুত্র-লাভের জন্য বিবাহ করিবে—এমন মনোভাব এযুগে নাই। যাহারা বর্ত্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা তাহাদের মনের উদারতা আশ্চর্য্য রকম বাড়িয়া গিয়াছে. যেকোন রকম সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আর তাহাদিগকে ধরিয়া রাখা চলিতেছে না। এই উদারতা তাহাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে শিখাইয়াছে—দীনহীন অস্পৃশ্যের মধ্যেও তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের সন্ধান দিয়াছে—নিজের ক্ষুদ্র লাভ এবং হীন স্বার্থকে অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া বৃহৎ কাজে আত্মত্যাগ করিতে শিখাইয়াছে। এই কারণে বর্ত্তমান শিক্ষিত স্বামীর কাছে স্ত্রী কোন পুণ্যলাভের হেতু নয়, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, সে শুদ্ধমাত্র স্ত্রী বলিয়াই সম্মানিত এবং আদৃত। স্ত্রীকে মিথ্যা দেবীর সম্মান দিয়া পূজার ভাণ না করিয়া তাহাকে মানবী হিসাবে দেখিবার যে শিক্ষা তাহাই এযুগের শিক্ষা। এখন মনুষ্যত্বের আদর্শ বৃহত্তর এবং মহত্তর হইয়াছে, এবং এই কারণেই স্ত্রীকে অযথা দেবীত্বে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সাধারণ সুখদুঃখের অতীত রূপে গণ্য করিয়া তাহার প্রতি সৌখীন উদাসীনতা দেখান আর চলিতেছে না।

এদেশে এমন দিনও ছিল যখন স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারিতা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত। তারপর কোন না কোন ঋষির ইহাতে মন খারাপ হওয়ায় কিংবা বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় তাঁহারা নিয়ম করিলেন যে যে-স্ত্রী একনিষ্ঠ হইবে সে স্বর্গে যাইবে এবং যে না হইবে সে নরকে যাইবে। উপরোক্ত দুই প্রকার অবস্থার কোনটাই উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। কিংবা তখন হয়ত এমন কোন আদর্শ ছিল যাহা তখনকার কালের পক্ষেই সত্য ছিল। অতীতের জ্ঞানী লোকে অতীতের শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। সে-সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, লোকের মনোভাব প্রভৃতি ইহার জন্য দায়ী কিন্তু বর্ত্তমানে যখন লোকের মনোভাব এবং আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তখন পুরাতন ব্যবস্থা আর চলে না। অতীতের অনেক ব্যবস্থা শুধু অতীতের

পক্ষেই শুভ ছিল বর্ত্তমানে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

বাংলা দেশ বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ায় প্রপীড়িত। এখনকার কালের ধর্ম্ম—শরৎকালে সকলেই কুইনিন খাইবেন। এ অবস্থায় যদি সংস্কৃতে লিখিয়া এইরূপে প্রচার করা যায় যে যিনি শরৎকালের সকালে দৈনিক পাঁচগ্রেন কুইনিন না খাইবেন তিনি এবং তাঁহার অধস্তন তিনপুরুষ নরকে যাইবেন, তাহা হইলে অতীত-পন্থী লোকের তাহাই বিশ্বাস হইবে। এবং ফলে এই হইবে যে, দেশে যখন ম্যালেরিয়ার চিহ্নও থাকিবে না—এবং আশা করা যায় দেশে এমন একদিন আসিবেই—তখনও লোকে শাস্ত্রকে অবহেলা করিয়া কুইনিন খাওয়া বন্ধ করিবে না। যদি কেহ তখন প্রচার করেন কুইনিন খাইবার অনুকূল অবস্থা আর নাই, তখন সমস্বরে চীৎকার উঠিবে ধর্ম্ম গেল, এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পাঁচের জায়গায় দশ গ্রেন করিয়া খাইবে।

ধর্ম্ম গেল ত বটেই, এদেশে চিরদিনই ধর্ম্ম গিয়াছে। একযুগের লোক অন্যযুগের ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া নূতন ধর্ম্ম চিরদিনই প্রচার করিয়াছেন।

একটা দেশ যখন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত হয় তখন সে-দেশের আপামর জনসাধারণ সে-জ্ঞানের অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। জ্ঞানের বিজয়রথ ঘর্ঘর শব্দে রাজপথ দিয়া চলিয়া যায়,—অজ্ঞান গলি-ঘুঁজিতে লুকাইয়া থাকে। আমাদের দেশেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এদেশে যখন জ্ঞানের সচল রথখানা প্রথম যাত্রাপথে বাহির হইয়াছিল—তখন হইতে অজ্ঞান-অন্ধকার জমা হইয়া আসিতেছে। আজ তাহারি বিরাট বাধায় সচল রথটা অচল হইয়া পড়িল, সে যে কখনো চলিত আজ তাহা বুঝিবারও উপায় নাই। আজ মনে করিতেছি জ্ঞান অচল বলিয়াই তাহার গৌরব। অতীতে যে জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল তাহা চিরদিনের জন্য শুদ্ধ হইয়া আছে—আমরা কেবলমাত্র তাহার জয়গান করিতে পারিলেই উদ্ধার হইয়া যাইব।

আমাদের দেশের মুনিঋষিরা জ্ঞানকে অতীতেই নিঃশেষ করিয়া দিয়াছেন, এতবড় মিথ্যা কথা অন্ততঃ তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে প্রচার করেন নাই। অসীম অনন্ত কোটী গ্রহউপগ্রহ লইয়া যে বিশ্বজগৎ, তাহার সম্বন্ধে মানুষ সমস্ত জ্ঞান নিঃশেষ করিয়াছে,—এ কল্পনা করিতে যতই সুখ হউক,—তাহাতে কিছুমাত্র লাভ নাই। আমাদের দেশের মুনিঋষিদের বুদ্ধি ছিল, জ্ঞান ছিল, তাহা পৃথিবীর সকলেই স্বীকার করিবে। তাহা লইয়া আমরা চিরদিনই গর্ব্ব করিব। গর্ব্ব করিবার বিশেষ কারণ এই যে, যে য়ুরোপ বর্ত্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বিশ্ব জয় করিল—তাহার বহু পূর্ব্বে আমাদের দেশে জ্ঞানী লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু দুঃখ এই যে এই গর্ব্বকে অতিরিক্ত মদে পান করিতে গিয়া আমরা সত্যের প্রতি অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি। সেকালের লোকে জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া একালের কেহ জ্ঞানী হইতে পারেন না, এই সঙ্কীর্ণতা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

বর্ত্তমানের লোকেরও যে বর্ত্তমানকালের কল্যাণবিষয়ক জ্ঞান থাকিতে পারে এ কথা জানিবার এত উদারতা হারাইলাম কেন? প্রতিভার প্রচণ্ড শক্তির উন্মেষ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বলোকের মধ্যেই প্রকাশ পাইতে পারে। গাছের বাকল না পরিলে কিম্বা ফলমূল না খাইলে জ্ঞান হয় না এই অন্ধতা আমাদের কেমন করিয়া হইল তাহাই ভাবি।

আমাদের খাদ্যবস্তু বিধাতার নিকট হইতে পাইয়াছি, কিন্তু তাহা কেমন করিয়া খাইতে হইবে—সে রীতি আমরা বাহির করিয়াছি। তারপর বস্ত্র-পরিধান। ইহাও মানুষের আবিষ্কৃত। কোন লোক বিধাতার দোহাই দিয়াও দিগম্বর হইয়া সমাজে বাহির হইতে পারে না। কাজেই দেখা যাইতেছে জীবনযাপনের রীতিনীতি মানুষের রচনা, বস্ত্ররচনা বিধাতার। কিন্তু যেহেতু মানুষের জ্ঞান কোনদিনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, সেইহেতু তাহার রীতিনীতিরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের জীবন স্থির সত্যকেই লইয়াই চলে না। আপেক্ষিক সত্য সমাজ-জীবনের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজন। আজ বৃষ্টি আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে সত্য, কিন্তু কাল যদি সর্দ্দি-জ্বরে শয্যাগত হই, তখন তাহাকে সত্য বলিয়া মানিব না। আজ রোগশীর্ণ দেহে বার্লি-জল

সত্য, কিন্তু কাল যখন আমি নীরোগ, তখন উহাকে বিনা-অনুতাপেই পরিত্যাগ করিব। ইহাই ত বুদ্ধির পথে চলা।

জীবে দয়া করিবে, প্রাণ দিয়া সত্যকে রক্ষা করিবে, শঠতা করিও না, হিংসা করিও না,—এই ধর্ম্ম অল্প-পরিবর্ত্তনে অথবা কাল-পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয় না,—কিন্তু সমাজধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল, দেহধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল, রাষ্ট্রধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল। সর্ব্বজীবে দয়া করিবে এবং শিশুবিবাহ করিবে—এই দুইটি ধর্ম্মকে এক-পর্য্যায়ভুক্ত করা সম্ভব নহে। বিবাহ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম নহে বলিয়াই সম্ভব নহে। কিন্তু অতীতকালের সমস্ত ধর্ম্মই বর্ত্তমানে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া গণ্ডগোল বাধিয়াছে। উপরন্তু, প্রকৃত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মই লোপ পাইয়াছে। সেই জন্য মুর্গী খাইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, সমুদ্র যাত্রা করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, বিশেষ জাতির লোকের হাতে জল খাইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, কিন্তু মিথ্যা ব্যবহারে, শঠতায়, ব্যভিচারে, দুর্ব্বলের ভিটামাটি উচ্ছন্ন করায় অথবা নরহত্যায় ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। যে দেশ অন্যান্য সকল ধর্ম্মের উপর আধ্যাত্মিক ধর্ম্মকে স্থান দিয়াছে—সেই দেশের লোক উহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া মনে-প্রাণে জড়কে পূজা করিতেছে, এবং সহস্রবিধ অর্থহীন অনুষ্ঠান এবং দেহমনের অবসাদ আর অক্ষমতাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় মণ্ডিত করিয়া মহাসুখে কাল কাটাইতেছে। অভ্যাসের বাঁধাপথে চলিতে বুদ্ধির প্রয়োজন নাই, এমন কি বুদ্ধি যে মানুষের পরম শত্রু এমন ভাব আমাদের বাক্যে এবং ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছে। যদি কোন মহাত্মা জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা কোন ব্যবস্থা করিতে যান, আমরা ভয়ে মরিয়া যাই। তখন দোষ দিই—ইংরেজী শিক্ষার। এবং একথা বলিতে সঙ্কোচ করি না যে, সমাজের নেতা হইলেন ইংরেজীশিক্ষিত লোকেরা—তাঁহারা ত হিন্দুশাস্ত্রকে অবহেলা করিবেনই।

কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যে যুগের জন্য যে শাস্ত্র তাহা সেই যুগের জ্ঞানী লোকে রচনা করিয়াছেন। অন্যের মত পুরাতন শাস্ত্র ত কোনযুগের হিন্দুই মানেন নাই—সুতরাং অবহেলার প্রশ্ন এখানে উঠিতেই পারে না। এ যুগের হিন্দু এ যুগের শাস্ত্র রচনা করিতেছেন—তাহা এ যুগে মানিতেই হইবে। অন্ধভাবে মানিবার আবশ্যকতা নাই, বিচার করিয়াই মানিতে চাই। কিন্তু আমাদের ধারণা, একালে শুধু শাস্ত্ররচনা করিবার বুদ্ধি নয়, বিচারের বুদ্ধিও নাই। বিচার করিতে গেলেই আগে দেখি জিনিষটি পুরাতন কি না—অর্থাৎ জীর্ণতার সঙ্গে তাহার কতখানি মিল। যদি দেখি তাহা মলিন নয়—উজ্জ্বল, তৎক্ষণাৎ বলি উহা অগ্রাহ্য।

এমনি করিয়া চিন্তা করিবার, এবং চিন্তা করিয়া কিছু বুঝিবার ক্ষমতা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছি। কেননা পুণ্যের লোভ হইতে অথবা নরকের ভয় হইতে আমরা প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির প্রেরণা লাভ করিয়াছি। সর্ব্ব-সাধারণের বিচারবুদ্ধির অভাব অনুমান করিয়া তাহাদের আদর্শকে খাটো করিতে গিয়াই এই অনর্থ হইয়াছে। শিশুবিবাহ সমর্থনে করিয়া এখন যেসব মনগড়া যুক্তির উল্লেখ করা হয়—তাহাই যদি শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। তাহা হইলে লোকে বুঝিতে পারিত, ইহার পিছনে বুদ্ধি রহিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রকার যুক্তির ধার দিয়াও গেলেন না। তিনি বলিলেন—বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা রজস্বলা হইলে পিতামাতা সেই রজঃশোণিত পান করেন। কোন সুবুদ্ধি শিক্ষিত লোক এই কথা কখনো বিশ্বাস করিতে পারেন? নির্ব্বোধকে এতখানি ভয় দেখাইলে সে যে প্রাণপণে ব্যবস্থা পালন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধিকে উড়াইয়া দিয়া ব্যবস্থা মান্য করিতে করিতে এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে এখন আর মনেই নাই কোন্‌টা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম আর কোন্‌টা দেহধর্ম্ম। সকালে দাঁতন করিলে স্বর্গে স্থান হইবে—এবং দীনকে দান করিলেও স্বর্গে স্থান হইবে, সুতরাং যে লোক সকালে দাঁতন করেন তাঁহাকেও আমরা পুণ্যাত্মা বলি, যিনি দান করেন তাঁহাকেও বলি। কিন্তু আজ এই অন্ধতার পালা শেষ করিবার দিন আসিয়াছে।

বর্ত্তমানে যাঁহারা দেশকে ভালবাসিয়াছেন—দেশের কল্যাণে চিন্তা করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানের আলো জ্বালাইয়া শুধু এদেশকে নয়, জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন, যাঁহাদের প্রতিভা নানাদিকে নব নব সৃষ্টি দ্বারা মানব-

সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ করিয়াছে—যাঁহাদের বাণী দেশদেশান্তরের লোক মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করিতেছে,—তাঁহাদের কথা শুনিবার উদারতা যেন আজ না হারাই। অতীতের কথার সঙ্গে সেকথার অমিল যদি হয় তাহাতে কি আসিয়া যায়? অতীতকে ত শুধু আমরা অন্ধভাবেই অনুসরণ করিব না। আমাদের সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ পড়িয়া রহিয়াছে—বর্ত্তমানের জ্ঞানের আলোকে আমরা সে পথ চিনিয়া লইব।

যাহারা তিন-বৎসরের বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত কি না শাস্ত্র খুলিয়া প্রমাণ করিতে যায়, তাহাদের কথা আমরা যেন না মানি। আমাদের যেকালে জন্ম, সেকালকে শ্রদ্ধা করিব; আমার কেবলমাত্র অতীতকে অশ্রদ্ধা করিলেই বর্ত্তমানকে শ্রদ্ধা করা যায় না। অতীতকে অতীত হিসাবেই শ্রদ্ধা করিব,—বর্ত্তমানের মনস্বীদের সঙ্গে অতীতের যে বিষয়ে ঐক্য আছে, তাহা অতীত হইলেও বর্ত্তমানের ধর্ম্ম বলিয়া আনন্দের সঙ্গে মানিয়া লইব। আমাদের শ্রদ্ধা অন্ধতার উপরে নয়, জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে,—যেহেতু এই হিন্দুজাতি যুগে-যুগে জ্ঞানের পথে চলিয়াই বাঁচিয়া আছে। অতীতের জ্ঞানে অতীতের হিন্দু বাঁচিয়াছে—বর্ত্তমানের হিন্দু বর্ত্তমানের জ্ঞানেই বাঁচিবে।

বিবেকানন্দ

শ্রী অবনীনাথ রায়

তা-থৈ তা-থৈ থৈ নাচে কাল করাল ভৈরব—
নৃত্যভরে কাঁপে বিশ্ব, মূর্চ্ছি' আছে দেবতা-দানব;
ত্রিনিত তৃতীয়নেত্র শুভ্র ভালে জ্বলে ধক্ ধক্,
কটীবেশে অহিফুল ফণা তুলে' দোলে লক্ লক্;

সারা অঙ্গে ভীম তেজ বিচ্ছুরিয়া বাহিরায় ছুটে'—
শূন্যে দোলে গ্রহতারা, চন্দ্রসূর্য্য পদযুগে লুটে;
ঝিনি-ঝিনি ঝিমি-ঝিমি ঝরঝরে চরাচর ব্যোম—
বায়ুস্তর আলোড়িয়া ধ্বনি উঠে 'তৎসৎ ওঁ'।

মন্ত্রপূত জপস্তব্ধ হোমধূম-কুহেলিতে ঘেরা
সপ্তর্ষিমণ্ডল নভে—ধ্যান-মগ্ন ঋষি জ্যোতিষেরা;
ঈথারের আস্তরণ ভেদি' ধ্বনি ফুকারিয়া উঠে—
মৌনী এক ঋত্বিকের যুগান্তের তপ যায় টুটে'।

সহসা স্মরণে আসে ধরণীর স্মৃতিপথ বাহি'—
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ নরনারী ঊর্দ্ধে আছে চাহি';
নির্ব্বিকল্প সমাধির গিরিবাস ধীরে মুক্তি নিল,—
নৃত্যপর মহেশের আশীর্ব্বাণী করিয়া পড়িল।

ধ্যানমূর্ত্ত জ্যোতিষ্মান্ ভারতের সাধন প্রতীক্,
দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত বিত্ত উজলিয়া ভুলেছে চৌদিক!
জন্ম নিয়েছিলে তুমি ভাগ্যহত বাঙালীর ঘরে,
জগৎ তোমারে তবু বরেছিল সম্মানে সাদরে।

পাশ্চাত্যের নিরীশ্বর-আলেয়ার ধাঁধায় পড়িয়া,
তারি লাগি' পরিম্লান ভারতের তপস্যা-গরিমা;
সনাতন তপশ্চর্য্যা—সুপ্তাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করি',
'রামকৃষ্ণ জয়' মন্ত্রে চতুর্দ্দিক তুলিয়াছ ভরি'।

গৌরাঙ্গের ভক্তিবাদ বাসনার শেষ যবে ভেসে',
শুষ্কজ্ঞান নিয়ে তুমি জীবপাশে দাঁড়াইলে এসে।
বিবেক তোমার নাম—ব্রহ্মচারী—দ্বিতীয় শঙ্কর,
আঁখিতে সুতীব্র তেজ, হৃদি পর-দুঃখেতে কাতর।

মাগি শৌর্য্য, মাগি বীর্য্য, মাগি প্রাণে অমৃতের আশা,
শক্তি মাগি, ভক্তি মাগি, মাগি বুকে নিত্য ভালবাসা;
মৃত্যুস্তর কর দূর, কণ্ঠে দাও সত্যসিংহনাদ,
অন্তরে স্বাধীন হই—সন্তানেরে কর আশীর্ব্বাদ!

দোসর

শ্রী সতীশ রায়

(১৭)

অশোক বড় অভিমানী। রাঁচি হইতে কলিকাতায় আসিয়া একদিনের তরেও সে শেফালিদের বাসায় যায় নাই। কৈশোরে যখন সে নবজাগ্রত মনোভাবের প্রেরণায় শেফালিকে ভালবাসিয়াছিল তাহা অহৈতুকী। তখন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাহার মধ্যে ছিল না সে তখন তাহার টুকি-টাকি কাজ করিয়া দিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিত। সেই ছলে তাহাদের বাড়ী সে কতদিন গিয়াছে। শেফালি একদিন বলিল,—"আমার এই বইগুলো আপনাকে কিনে এনে দিতে হবে অশোক-দা!"

অশোক মনে মনে খুসী হইয়া উঠিল। বাহিরে গম্ভীর হইয়া বলিল, "আচ্ছা একটা কাগজে লিষ্ট্ লিখে দাও, কালকে এনে দেব'খন।"

বইগুলি সে সেইদিনই কলিকাতার সব দোকান খুঁজিয়া সংগ্রহ করিল।

তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, এই বইগুলির উপরে সে স্বহস্তে শেফালির নামটি লিখিয়া দেয়, কিন্তু শেফালির সামান্য স্মৃতিচিহ্নগুলি তাহার কাছে যত মূল্যবান, তাহার হাতের লেখাটির শেফালির কাছে হয়ত কোনো মূল্যই নাই। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আর কিছু লিখিল না।

তাহার পর রাঁচিতে যখন তাহার সহিত দেখা হইল, তখন আর মনে মনে গোপনে ভালবাসিয়া তৃপ্তি হইত না। কৈশোরের কল্পনা-বিলাসের প্রেমের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, তখন সে তাহার প্রতিদান চায়। মূলহীন আকাশ-কুসুমে তখন আর মন ভোলে না—তখন তার মনে যুবকের আগুন-ভরা ক্ষুধা জাগিয়াছে—ভালবাসার সুধার জন্য। কিন্তু সে হতাশ হইয়া দেখিল যে পাত্রভরা সুধায় একবিন্দুতেও তাহার অধিকার নাই;—শেফালি তাহাকে ভালবাসে না!

তবুও সে মাঝে মাঝে ভাবিত, "যাই শেফালিদের ওখানে—'যার সঙ্গে যার ভাব, তার মুখ দেখলেও লাভ!' দিনের ভেতর তাকে একবার শুধু দেখতে পেলেও মনে কত আনন্দ হয়।"

কিন্তু শেফালি হয়ত তাহাতে বিরক্তই হইবে। আর মনে মনে হয়ত সে বিমুখ হউক না কেন, সামনাসামনি যখন অবহেলা করিবে, তখন সে তাহা কেমন করিয়া সহিবে? এ তবু এখনও সে কল্পনায় ভাবিয়া সুখী—শেফালি হয়ত তাহাকে ভালবাসে! কিন্তু দিনের মধ্যে একবার তাহাকে না দেখিলেও ত সে মনে শান্তি পায় না। কোনো কাজে মন বসে না। জগৎসংসার বড় শূন্য বলিয়া বোধ হয়। সে শুধু তাহাকে দিনান্তে একটিবারমাত্র দেখিতে চায়!—কোনো একটা উপায় বাহির করিতে না পারিলে সে ত আর বাঁচে না!

সে একটি টাইপরাইটিং স্কুলে ভর্ত্তি হইল, বিকালে চারিটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ক্লাশ। সেই সময়ে তাহারি সামনে দিয়া শেফালিদের কলেজের গাড়ী যায়। শেফালি হয়ত তাহাকে দেখিতে পাইত না—কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য রোজ তাহাকে একবার দেখিতে পায়। এই সৌভাগ্যটি একটি বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ক্ষণকালস্থায়ী। তাহাতেই মনের কত সুখ!

উৎসুক-দৃষ্টি মেলিয়া এক-একদিন সে তাহাকে দেখিতে পাইত না, সেদিন তাহার কাছে দিনটি একেবারে ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইত। সে উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিত, হয়ত শেফালির অসুখ করিয়াছে, হয়ত তাহার বিবাহের কথা হইতেছে বলিয়া সে কলেজ ছাড়িয়া দিল। আর হয়ত অশোক তাহাকে দেখিতে পাইবে না। সে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিত। কিন্তু তার পরদিন যখন সে শেফালিকে আবার দেখিল তখন তাহার মন একটু আশ্বস্ত হইল।

আচ্ছা! ঐ একঝাঁক মেয়েদের মধ্যে কেমন করিয়া সে শেফালিকে চকিতে চিনিয়া ফেলে? তাদের মধ্যে

অনেকে তার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী, কিন্তু তাহাদের দিকে অশোকের মোটে তাকাইবার অবসরই হয় না। শেফালির কি আশ্চর্য্য-সুন্দর চোখদুটি! অশোকের মনে হইত, ও-রকম মায়াভরা চোখ সে জীবনে আর দেখে নাই! তাহাকে একবার দেখিয়াই অশোকের মনে হয়, তার সঙ্গে যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয়!

একদিন সে মহাখুসী হইয়া উঠিল যেদিন দেখিল ঠিক তাহাদের কমার্স-কলেজের সামনের বড় বাড়ীটার দরজায় শেফালিদের কলেজের গাড়ীটি আসিয়া খানিকক্ষণ থামিল, এবং একটি গোলাপফুলের মত কিশোরী বই-খাতা-হাতে নামিল। সেই সুযোগে অতৃপ্তদৃষ্টি মেলিয়া শেফালিকে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া লইল!

তাহার মনে শেফালি যেন আগের চেয়ে অনেক রোগা হইয়া গিয়াছে!—মুখের সে কিশলয়-লালিমা নাই, যেন ফ্যাকাসে সাদা। দর্পণের মত স্বচ্ছ, কপালে চিন্তা ছায়াপাত করিয়াছে—কপোল তেমন হাস্যপ্রফুল্ল নয়। চকলা কিশোরী যেন এই কয়মাসে, নারীত্বের স্থির-গম্ভীর সৌন্দর্য্যে উপনীত হইয়াছে! সেদিন শেফালির চোখ হঠাৎ তাহার উপর পড়িয়া যাওয়ায় সে দেখিল যে, ঘরের খোলা জানালা দিয়া অশোক তাহার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

প্রথমে তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিল—একটা বিস্ময়। শেষে সেও তার দিকে চাহিয়া ম্লানভাবে মৃদু হাসিল। এতগুলি মেয়ের সামনে এবং অতটা দূরত্বনিবন্ধন যদিও সে কোনো কথা বলিতে পারিল না, তবুও তার চাহনির ভাষায় অশোক বুঝিল যে শেফালি তাহাকে একেবারে ভোলে নাই। সেও তার হাসির প্রত্যুত্তর দিল।

কয়েক মিনিট ধরিয়া দুজনের চোখে চোখে আশ্চর্য্য বিনিময় হইল, যাহা কেবল জগতের তরুণ-তরুণীরাই বুঝিতে পারে।

বাস চলিয়া গেল—অশোক যেন একটা স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল।

"কই আপনি ত আর টাইপ করছেন না?"

"না, বড় ব্যথা ধরেছে—"

"তাহ'লে আজ থাক,—বরং বাহিরের খোলা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে আসুন।" শিক্ষকটি সহানুভূতির সহিত তাহার মুখের পানে চাহিল। অশোক উঠিয়া চলিয়া গেল। এসব ভাবুক লোক সে যেন কমার্স পড়িতে আসে, শিক্ষকটি বুঝিতে পারিল না।

তার পরদিন সে একটু তাড়াতাড়ি আসিল। তাহার ভয় হইতেছিল যদি গাড়ীখানি তাহার আসিবার আগেই চলিয়া যায়!—সে কথা সে ভাবিতে পারিল না।

বসিয়া বসিয়া সে অনেকবার পথের পানে আকুল অন্তরে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিল—গাড়ীর দেখা নাই! সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

—দেখুন, আপনার ও lessonটা হ'য়ে গেলে এইটা অভ্যাস করবেন।

—আচ্ছা ঐ টেবলের উপর রেখে দিন, দরকার হ'লে চেয়ে নেব।

ঘর-ঘর শব্দে গাড়ী আসিতেছে—শব্দটির জন্যে সে উৎকর্ণ হইয়া ছিল। এই শব্দটি তাহার কত পরিচিত! হাজার গাড়ীর শব্দের সহিত এই গাড়ীটির শব্দ সে কোনো-দিন ভুল করে নাই। কই শেফালি? ওঃ···ঐত বসিয়া আছে—তাহার দৃষ্টির সহিত মিলনের জন্য সে দৃষ্টির মধ্যেও ত আকুলতা রহিয়াছে! অশোক পুলকিত হইয়া উঠিল।

শেফালির হাতে একটা কাগজ ভাঁজ-করা চিঠির মত। শেফালি সেটা তাহাকে তুলিয়া দেখাইয়া, মৃদু হাসিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল,—গাড়ী চলিয়া গেল। অশোক তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া গিয়া কাগজটি তুলিয়া লইল। সন্ধ্যার স্বল্প আলোকে কাগজটির ভাঁজ খুলিয়া পড়িল—পেন্সিল দিয়া তাড়াতাড়ি লেখা।

অশোকদা! আমি তোমার উপর বড় রাগ করেছি। রাঁচি থেকে এসে তুমি একদিনও আমাদের বাড়ী যাও নি,—আমার সঙ্গে দেখা কর নি। কবিদের হৃদয় ব'লে একটা জিনিষ নেই,—কারণ তারা তাদের রচনার ভিতর দিয়ে সেটা অপব্যয় ক'রে ফেলে। আর তারা চঞ্চল ব'লে তাদের ক্ষমা পাবার শক্তিও অসাধারণ। আশা করি, এতগুলো অপরাধ তুমি গায়ে পেতে নেবে না। প্রতিবাদে তোমার কি বলবার কথা আছে কাল শুনব। ইতি

শেফালি

পুঃ—বায়স্কোপে একটা নূতন ছবি দিয়েছে। এখন বড় ভীড়। কাল সমীরকে, আমাকে ও পাতুকে তোমার নিয়ে যেতে হবে। হুপুরে টিকিট কিনে রাখবে—যেন ভাল সিট পাই—ভুলে যাবে না কিন্তু! মাকে আমি ব'লে রেখেছি।

অশোক আনন্দে নাচিয়া উঠিল। পরদিন সে আর কলেজে গেল না। হুপুরবেলায় বায়োস্কোপে গিয়া, কোণের দিকে পাশাপাশি কয়েকখানি সিট মনোনীত করিয়া টিকিট কিনিয়া আনিল। আর, কখন বিকাল হয় তাহারই সুখস্বপ্নে বারবার ঘড়ি দেখিয়া বেলা কাটাইয়া দিল।

সে যখন শেফালিদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল তখন পৌনে-পাঁচটা বাজিয়াছে। সে ইতিপূর্ব্বে আরো দু'বার বাড়ীর কাছে আসিয়া, বেলা আছে বলিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। তখন নীচের ঘরে পাতু পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে বসিয়া খেলা করিতেছিল। সেও ভুলে যায়; বয়সে বড় মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া, আজকাল অনেক কথা শিখিয়াছে। অশোককে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "Here comes the hero!...অশোকদা' আপনি সেদিন দিদিকে রক্ষা করবার জন্ত গোরাদের সঙ্গে কি রকম লড়াই করেছিলেন, সে আমরা দিদির কাছে সব শুনেছি। আমি আপনাকে congratulate করছি।" বলিয়া সে খেলা ফেলিয়া দৌড়াইয়া গিয়া অশোকের হাত ধরিল আর উপর উপায় টানিয়া লইয়া চলিল।

"ভারি অন্যায় আপনার! আপনি এতবড় একটা কাণ্ড করলেন, তার পরদিন এসে দিদির একটা খোঁজ নিয়ে যাওয়াও আপনার উচিত ছিল।"

এই সময়ে অন্নপূর্ণা আসিলেন।

অশোক দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। সে পাতুকে বলিল, "আমি এমন কিছু লড়াই করি নি পাতু! তোমার ছোট-দি'-ভাই তোমায় বাড়িয়ে বলেছে। মুখীর-ই ত লড়াই করতে করলে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তোমরা যা সেদিন করেছ, তাতে তোমাদের সাহস ও মহৎ মন হইতেরই পরিচয় পেলাম। আশীর্ব্বাদ করি, এই রকম বিপন্নাকে হুর্ব্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করবার আরো শক্তি ও সাহস তোমরা দিন-দিন অর্জ্জন কর।"

অশোক তাঁহাকে প্রণাম করিল; তিনি মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অশোককে তাঁহার আজ বড় আপনার,—ঘরের ছেলে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বড় ছেলে সুকুমারের উপরেই তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা ন্যস্ত ছিল। সে ত তাঁহার বুক আঁধার করিয়া, এত বড়টি হইয়া কোথায় চলিয়া গেল! তাকণ্যমণ্ডিত অশোকের মুখশ্রী দেখিয়া মৃত পুত্রশোক তাঁহার আঁখিকে অশ্রুসজল করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করিতে জানিতেন; সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত অন্তরে আঘাতের বেদনার তরল অগ্নিস্রোত বহিলেও বাহিরে পদ্মপুষ্পের শ্যামল সজীবতা বিরাজ করিত। তিনি চকিতে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিলেন, "শেফালি সমীর-পাতুকে নিয়ে বায়স্কোপে যাবে ব'লে ক্ষেপে উঠেছে। কার সঙ্গে যাবে জিজ্ঞাসা করলে—ও বল্লে তুমি নাকি নিয়ে যেতে রাজী হ'য়েছ। সত্য?"

অশোকও হাসিয়া বলিল, "হাঁ, আপনি যদি বলেন—"

"তা যাক না, আমার কোনো আপত্তি নেই।"

সেদিন শেফালির কলেজের ছুটি ছিল। তাই সে বিকালবেলার অশোকের আসা-পথ চাহিয়া জানালায় বসিয়া ছিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া আসিতেছিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"কিছু খেয়ে না ও অশোক, কিন্তুতে তোমাদের রাত হ'তে পারে।"

"আমি বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি।"

"তা হোক, এখানে আরো কিছু খেলে দোষ নেই।"

অন্নপূর্ণার মনের মধ্যে কোনো গোলযোগ ছিল না। মনখানি যেমন শরতের আকাশের মত নির্ম্মল! তিনি যাহা ভাবিতেন, তাহাই বলিতেন; আত্মভাব গোপন করিতে তিনি পারিতেন না। অশোকের মা নাই জানিয়া তিনি যাচিয়া তাহার মায়ের অভাব পূরণে চেষ্টা পাইতেন।

পাতুর শরীরটা খারাপ থাকায় অন্নপূর্ণা তাহাকে বায়স্কোপে যাইতে দিলেন না। সমীর, শেফালি, অশোক তিনজনে হাসে করিয়া গেল। পথে শেফালি একটি কথাও

বলিল না, তাহার পাশে সমীরকে বসাইয়া সে জানালার উপর মুখ রাখিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিল।

অশোক বলিল, "তুমি স'রে এসে এ বেঞ্চে বসতে পারতে—"

শেফালি তাহার পানে না চাহিয়াই উত্তর দিল, "না থাক, এখানে বেশ আছি।"

সে তাহাকে বুঝিতে পারে না,—তাহার কাছে শেফালি চিরন্তন রহস্যময়ী! তাহার অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

কোণের দিকে নিরিবিলি জায়গায় তাহাদের সিট পড়িয়াছিল। কিন্তু সেদিন ভীড় হইয়াছিল খুব।—চারিদিক যেন গমগম করিতেছিল।

শেফালি বলিল, "ভাগ্যিস আপনি দুপুরবেলায় টিকিট কিনেছিলেন—এখন এলে সিট পাওয়া যেত না। উঃ! কি ভীড় হ'য়েছে দেখেছেন!"

"হুঁ!, ছবিটি ভাল। আর, এটা প্রথম সপ্তাহ কিনা? এই রকম ভীড় যদি বরাবর থাকে, তাহ'লে আরো দু'তিন সপ্তাহ চলবে মনে হ'চ্ছে।"

"আপনি কি বইটা পড়েছেন?" সে সিটের হাতলের উপর ভর দিয়া তাহার দিকে একটু ঝুঁকিয়া আসিল।

"না পড়িনি। তাহ'লেও কিছু বোঝবার অসুবিধা হবে না। না বুঝতে পারলে আমাকে জিজ্ঞাসা কোর', আমি তোমায় বুঝবার সাহায্য করব'খন।"

চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। সমীর দিদির হাতটি নিজের হাতের মধ্যে জড়াইয়া বসিয়া রহিল। আঁধার পটে আলোর অক্ষরে, মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেমলীলা সেই সৃষ্টি-প্রত্যূষের আদিম যুগ হইতে নানা জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া, কেমন করিয়া, আজিকার বর্ত্তমানজগতের জীবন পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে,ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। প্রতিজন্মে দুইজন পরস্পরকে নানা বাধাবিপত্তি, নানা প্রলোভন, উৎপীড়নের মধ্যে অবিচলিতচিত্তে ভালবাসিয়া আসিয়াছে—তাহার জন্য হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। জানে, মৃত্যু তাহাদের জীবন ও প্রেমের অবসান নয়। প্রেম জীবনের চেয়েও দীর্ঘ এবং মৃত্যুর চেয়েও শক্তিমান।

We two-র কবিতাটা পড়িয়া অশোকের মনে জাগিল আমাদের দেশের কবির "অনন্ত প্রেমের" সেই আশ্চর্য্য-সুন্দর কবিতাটি—

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

সে ভাবিল এ ত আমাদের দেশেরই কথা—হিন্দু-দার্শনিকের সেই আত্মার অমরত্বের আইডিয়া। সেই জন্যেই ছবিটা তাহার কাছে এত ভাল লাগিতেছে।

সে শেফালির মুখপানে তাকাইল,—দেখিল, তাহার চোখেও পলক নাই। তাহার বামহাতখানি সমীরের হাতের মধ্যে এবং ডানহাতখানি অশোকের চেয়ারের পিঠ বেড়িয়া তাহার বাম কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে তাহা সে নিজেই জানে না।

অশোক আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, সিনেমা এত অল্পদিনে কেমন করিয়া আমাদের চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছে। ওই যে চারিদিক অন্ধকার হইয়া যায়, আঁধার-পটে ধীরে ধীরে আলোর ছবি ফুটিয়া উঠিতে থাকে, ইহার মধ্যে কতখানি রহস্য আছে—রজনীর নিবিড় অন্ধকারের বুকে রহস্যময় তারা ফুটিয়া ওঠার মত। দীপ-নির্ব্বাণ ঘরে ঠাকুরমার গল্প শোনার মত কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করিয়া, আমাদের সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যার দেশে বেজমা-বেজমীর পাখায় চড়াইয়া উড়াইয়া লইয়া যায়। তখন আর জগতে সম্ভব-অসম্ভবের কথা মনে থাকে না। কেহ কোনো শব্দ করে না, কেবল ইঙ্গিত করিয়া আমাদের কল্পনায় খোরাক জোগাইয়া দেয়। আমাদের আশার আকাশ-কুসুম যাহা বাস্তব-জীবনে ফুটিলে ভাল হইত, তাহা চোখের সামনে গল্পের নায়ক-নায়িকার জীবনে আমরা মনের পরম আনন্দে উপভোগ করি।

"অশোকদা।"—শেফালির ডাকে তাহার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। "পিছনে ওই কিরিঙ্গি সাহেব-মেম দুটো বড় গোল-মাল করছে,—ওদের একটু চুপ করতে বলুন না।"

"বলছি,—'Dear Sir, will you please keep quiet'?"

"Please excuse us"—তাহারা চুপ করিল।

Intervalএর ঘণ্টা পড়িল। স্থির নরনারী উৎসুক-

চঞ্চল হইয়া যাওয়া-আসা সুরু করিয়াছে। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখার পর বাস্তব পৃথিবীতে হঠাৎ জাগরণ—শেফালির কাছে মনে হইতেছিল।

অশোক বলিল, "বাইরে যাবে তুমি?"

"না।"

"তাহ'লে কিছু খাও—কি খাবে? লিমনেড?"

"কিছু দরকার নেই, আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

সমীর লিমনেডের নাম শুনিয়া উৎফুল্ল করিতে লাগিল ও দিদির হাতে চিমটি কাটিয়া বলিল, "চল না দিদি খেয়ে আসি।"

অশোক বলিল, "দরকার আছে বৈকি, ভীড়ের জন্যে ভয়ানক গরম হ'য়েছে, তোমাদের দুই ভাই-বোনের মুখ শুকিয়ে গেছে যে! লিমনেড না খাও আমি আইসক্রিম আনিয়ে দিচ্ছি।"

শেফালি উৎসুকভাবে এধার-ওধারে চাহিয়া দেখিতেছিল, তাহার পরিচিত কেহ আসিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য। একটি সাহেব-বেশধারী বাঙালী যুবক পিছনে দু'টাকার সিটে বসিয়া সিগারেট ধরাইতেছিল।

"দেখুন অশোকদা, সঞ্জীববাবু এসেছেন—রাঁচির ডাক্তারবাবুর ছেলে।"

উজ্জ্বল আলোয় অশোক দেখিল, শেফালির মুখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে ঈর্ষাকুটিল দৃষ্টি মেলিয়া সেইদিকে একবার তাকাইল—দেখিল তাহার পাশে যে মহিলাটি বসিয়া আছেন তিনি প্রফেসর মনমোহনবাবুর ভগ্নী ইন্দুলেখা।

শেফালি চকিতে তাহার সেই হতাশ-দৃষ্টিভরা মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিল—নিষ্ঠুর আনন্দ।

চারিদিক আবার অন্ধকার হইয়া গেল—এবার অশোকের মনের ভিতরও খানিকটা। তাহাদের এই আনন্দের মধ্যে সঞ্জীবের উপস্থিতি তার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। তবুও সে সহজ হইবার চেষ্টা করিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগছে শেফালি?"

শেফালি বলিল, "বেশ! মনে হ'চ্ছে, আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে এমনি একটি মিলন-লীলা যুগ যুগ ধ'রে চলেছে—জানি না কোন্ এক শ্রেষ্ঠতর পরিণতির দিকে।"

বলিয়া ফেলিয়া তাহার মুখটি যে হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল, অন্ধকারের জন্য অশোক তাহা বুঝিতে পারিল না; সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তোমার জীবনের প্লানের ভিতর আমার একটু জায়গা নেই কি শেফালি?" তেমনি রহস্য-অর্থভরা চুপি চুপি কণ্ঠস্বর!

শেফালি হঠাৎ অনুযোগের সুরে তাড়াতাড়ি বলিল, "চুপ ক'রে এখন দেখুন বেশি ছবিটা।"

অশোক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। দৃশ্যের পর দৃশ্য বদল হইতে লাগিল। সমীর সেখানে মাঝে মাঝে তাহার বাহুটি স্পর্শ করিতেছিল। অশোক ইতিপূর্বে অনেকদিন সিনেমায় গিয়াছে, কিন্তু বায়স্কোপ দেখিয়া এত আনন্দ সে জীবনে কখন পায় নাই। কোন চিত্রের সুষমা, কিংবা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দুইটি-প্রাণে মিলিয়া যখন উপভোগ করা যায় তখন সেই উপভোগ সম্যক এবং সার্থক হয়।

বায়স্কোপ শেষ হইল। অশোক শেফালি ও সমীরকে লইয়া বাহিরে আসিল এবং রাস্তায় ট্রাম ধরিয়া উহাদিগকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার পথে নিজে হাঁটিয়া আসিতে লাগিল—হাওয়া খাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মেসে ফিরিবে বলিয়া।

পথে সুধীরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সুধীর বলিল, "কি খবর হে অশোক! অনেক দিন ধ'রে তোমার দেখাই মেলে না। দুমুরের ফুলের মত হঠাৎ দুর্লভ হ'য়ে পড়লে কেন? বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় যেদিন তোমায় খোঁজ করি সেদিনই শুনি—বাড়ী নেই।"

অশোক সুধীরের কাছে কিছুই গোপন করে না, কিন্তু এ আনন্দের ভাগ তাহাকে দিতে পারিল না; উপহাসের ছলে সে ইহাকে নির্ভয়রূপে মৃদুভাবে আঘাত করিল; বলিল, "আজকাল আর বিকেলে বেড়াবারও সময় পাইনে। এগ্‌জামিন নিকট হ'য়ে এল, অথচ কিছুই তৈরী হয় নি; পড়াশুনায় একটু ব্যস্ত ছিলুম ভাই! কিছু মনে কোর' না।"

কথাটা যে কতদূর অসম্ভব, সুধীর তাহা জানিত। অশোক বরাবরই ভালো ছেলে। পরীক্ষার আগে বিশ্রাম বন্ধ করিয়া তাহাকে কোনো কালেই পড়িতে হয় না। কিন্তু

সে তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া বলিল, "আচ্ছা! বি-এ পাশ ক'রে তুমি কি করবে ঠিক করেছ?"

"আগেই পাশ-ই করি!—কিছুই করতে চাই না, জমিদারীর যে আয় আছে মোটামুটিভাবে তাতেই একরকম চ'লে যাবে।"

"এতবড় জীবনটা কি করে কাটাবে যে!"

"ওই লেখাপড়া নিয়ে একরকম ক'রে কাটাব। কিরকম তৈরী হ'ল তোমার?"

"ঐ একরকম—এখন মনে হ'চ্ছে ফিলসফিটা না নিলেই ভাল করতুম। ওতে আমার মোটেই মন বসে না।"

তাদের পরীক্ষা হইয়া গেলে দিন-দুই পরে সুধীর মেসে আসিয়া দেখিল অশোকের জ্বর হইয়াছে,—গায়ে, হাতে, পায়ে অসহ্য বেদনা।

সুধীর বলিল, "আমাকে একটা খবর দাওনি কেন?

অশোক কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। তখন পাড়ায় খুব বসন্ত হইতেছিল। অশোকের চোখমুখের ভাব দেখিয়া সুধীরের ভয় হইতে লাগিল, বোধ হয় তা-ই। দিন দুই পরে যখন গুটি ফুটিয়া উঠিল, তখন আর সন্দেহ থাকিল না। অশোককে যে সুধীর কতখানি ভালবাসিত, এই বিপদের মধ্যে তাহার নিজের কাছে সেই ভালবাসার মূর্ত্তি যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দিনরাত্তের কোনো বিভাগ আর তাহার কাছে থাকিল না। এই সেবার সংস্পর্শের ভিতরে, কত সহজে যে এই সংক্রামক ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে তাহা সে জানিত; কিন্তু বিচার-বিবেচনার তুলাদণ্ডে তাহার অপরিমিত বন্ধুপ্রীতির পরিমাপ করিবার হীনতা সে স্বীকার করিতে পারিল না। সে অশোকের জন্য ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থা করিয়াছিল। দিনকতক আধোর অচৈতন্যের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। সমস্ত রাত অজ্ঞান অভিভূতের মত পড়িয়া থাকিয়া, বেলা দশটার সময় সেদিন অশোকের জ্ঞান হইয়াছিল। যন্ত্রণা-কাতর মুখ তুলিয়া রক্তবর্ণচোখে অশোক সুধীরকে চিনিতে চেষ্টা করিল—প্রথমে পারিল না। শেষে করুণ হাসিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "ও সুধীর তুমি? সমস্ত রাত কাল তুমি এখানে ছিলে মনে পড়ছে। এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাহার ক'রে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলে ভাল হ'ত। আমার কাছে ব'সে থাকলে কি আমার রোগ সারবে ভাই!"

"তুমি চুপ কর, বেশী কথা বলতে ডাক্তারবাবু বারণ ক'রে গেলেন; জল খাবে?"

"দাও একটু"—অশোক জলপান করিল।

অশোকের রোগশীর্ণ মলিন হাতখানা সুধীর হাতে তুলিয়া লইল। সে সান্ত্বনার সস্নেহ-স্পর্শে অশোকের চোখে জল আসিল। সুধীর তাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "ভয় কি ভাই। তুমি সেরে উঠছ।"

অশোক বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ভাই! তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি। কিন্তু না চেয়ে আমি এতদিন যা পেয়েছি তার তুলনা হয় না। তুমি বোধ হয় আর-জন্মে আমার সহোদর ভাই ছিলে!"

সুধীর বলিল, "রক্তের সম্বন্ধের একটা টান আছে মানি, কিন্তু তোমার কাছে ত আমি কতদিন শুনেছি হৃদয়ের সম্বন্ধই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সম্বন্ধ! তোমাকে যে আমি সামান্য সেবা-শুশ্রূষা করছি সে তোমাকে আমি ভালবাসি বলেই ত।"

অশোক কি বলিতে যাইতেছিল। সুধীর হাসিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "আর বেশী কথা বোল' না তুমি, এখন চুপ ক'রে ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি, রোগমনের পূর্ণ বিশ্রাম তোমার পক্ষে এখন একান্ত দরকার।

"আচ্ছা"—খানিক চোখ বুজিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া হঠাৎ অশোক বলিল, "আয়নাটা একবার আন ত ভাই। মুখটা দেখি।"

সুধীর ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। কথাটা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল, "আয়না এখানে নেই, চুপ ক'রে শুয়ে থাক। আমি চান ক'রে খেয়ে-দেয়ে আসি। টেবিলের উপর ওষুধ থাকল, ৪ ঘণ্টা পরে একদাগ খেয়ো। জলতেষ্টা পেলে—কমলানেবু ঐ টেবিলের উপর রাখলুম। আসছি এখন তাহ'লে।" বলিয়া সুধীর বাড়ী গেল, অশোক তাহার দিকে চাহিয়া ম্লানভাবে করুণ হাসিল।

ক্রমশঃ

অভিভাষণ

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস

আজ এখানে কলেজের ছেলেদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আমার পরিচয় হ'লো। এতদিন নানা গোলমালে এরূপ পরিচয়ের সুযোগ করতে পারিনি। অবশ্য প্রিন্সিপাল ও দু'একজন প্রফেসরের সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছে এর আগে কিন্তু এই সরস্বতীপূজা উপলক্ষে ছেলেদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় হ'লো। এতে আমি যথার্থ আনন্দ পেয়েছি। জীবনে শিক্ষালাভের একটা প্রধান উপায় হ'চ্ছে (contact) সংস্পর্শ। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা বড় বড় আত্মার স্পর্শ লাভ করি। বাস্তবিক, আত্মাতে আত্মাতে যখন এই রকমের স্পর্শ হয় তখনই প্রকৃত শিক্ষা হয়। এই জন্যই আজকে আমার এখানে আসাটাকে আমি খুব সাধারণভাবে দেখ্‌ছি না। আজকে আপনাদের প্রাণের স্পর্শ পেলাম। এক আত্মার সঙ্গে অন্য আত্মার স্পর্শ—শিক্ষার একটি সোপান। সুতরাং এই তিন-চারিদিন থেকে আপনাদের সঙ্গে যে পরিচয়ের সূত্রপাত হ'য়েছে তা আমি আমার সৌভাগ্য ব'লে মনে করি। এ পরিচয়ে এঁদের কোন উপকার না হ'তে পারে, কিন্তু এই তরুণদের নবীন প্রাণের স্পর্শ পেয়ে অন্ততঃ আমার তো উপকার হ'লো। আমি তো আমার যৌবনকে ফিরিয়ে নিতে পারব। সেই জন্যই আমি আজ খুব আনন্দ লাভ করেছি। আশা করি, এখানে যাঁরা বয়সে তরুণ আছেন, যাঁরা নিজেদের তরুণ ব'লে মনে করেন, তাঁরা আমার সঙ্গে এই স্পর্শের ক্রমবিকাশের একটি ধারা বজায় রাখা অপ্রীতিকর ব'লে ভাববেন না। আশা করি, এই পরিচয়টি চল্‌তে থাকবে।

একটা কথা ছাত্রদের সঙ্গে এর আগেই আমার হ'য়েছিল। সেটা এখানে আবার বলি। আমি যা বল্‌ব তার সঙ্গে সাহিত্যের বোধ হয় একটু সম্পর্ক থাক্‌বে, কেননা সভা তো আসলে এক, জীবনও এক। এই সরস্বতীপূজা উপলক্ষে ছেলেরা আমার কাছে গিয়েছিলেন। প্রসেশন ক'রে যে প্রতিমা আনা হবে তাতে একটা গোলমাল হ'তে পারে এমন একটা বিভীষিকা সবার মনে ছায়া বিস্তার করেছিল। আমার কিন্তু তত ভয় হয়নি, আমি প্রেমের শক্তিতে বিশ্বাসস্থাপন করেছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমার সেই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ হ'য়েছে। আমি ছাত্রদের বলেছিলাম, "এই যে আপনারা প্রসেশনের ব্যবস্থা করেছেন এটা একটা আনন্দের ব্যাপার, কিন্তু আনন্দের সঙ্গে যদি গোলমাল সৃষ্টি হয় তাহ'লে বড় অশোভন হবে। জীবনে দুটো জিনিষ বিশেষ ক'রে মনে রাখতে হবে—কোনো কাজ করতে গিয়ে আমার অধিকার কতটুকু তা আমি ভাব্‌ব না, আমার কর্তব্য কি শুধু তাই দেখব। জীবনের বহুত্ব অধিকারের চিন্তা দ্বারা প্রস্ফুটিত হয় না। আসল জিনিষ হ'চ্ছে প্রেম। রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ, পরিবার—সর্বত্র স্বাধীনতা দরকার, মানবাত্মার মুক্তি অবশ্য আমাদের কাম্য, কিন্তু প্রেম হবে তার ভিত্তি। বৈষ্ণব-ধর্মে একটা কথা বলেছে, 'মারলে মাথায় করলে ভাল, চাঁদবদনে হরি বল।' এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। যদি কেউ তোমাকে মারতে আসে তখনও তুমি তোমার অধিকারের কথা ভাববে না, বরং ভেবে দেখবে তুমি শোধ নিতে গেলে তাতে অন্য লোকের কতটুকু ক্ষতি হবে। আর প্রেম দ্বারা কি ফল পাওয়া যায় তা ভাববে। যদি কেউ ভুল ক'রে তোমার প্রতি অন্যায় করে তাহ'লে তুমি প্রেমের দ্বারা তাকে জয় ক'রে নাও।" আমার কথার উত্তরে ছেলেরা কেউ কেউ বল্‌লো যে প্রেম দিতে গেলে অন্য পক্ষে অনেক সময় বোঝে না ও তাতে সুফল হয় না। আমি তখন বল্‌লাম, সেটা একদিনে বুঝা যায় না। এখন হয়তো সে আস্ফালন করতে পারে, কিন্তু যদি শেষ-পরিণতির কথা ভাবা যায় তাহ'লে কার জয়-পরাজয় হ'লো তা শুধু বর্তমান দিয়ে বিচার করা যায় না। আমার কথায় কতদূর কাজ হবে তা আমি জানতাম না। রাত্রে নাকি

একটা গোলমালের সম্ভাবনা হ'য়েছিল, কিন্তু আমি শুনে গৌরবান্বিত হ'য়েছি যে ছাত্রেরা এমন ব্যবহার করেছেন যে কোন গোলমাল হ'তে পারেনি। তরুণেরা শুধু অধিকার-বোধ ও ভেদ থেকে কিছু করেন নাই, প্রেম ও কর্ত্তব্যবোধ দ্বারা তাঁরা উদ্বুদ্ধ হ'য়েছিলেন, এবং সমস্ত ব্যাপারটি সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হ'য়েছে।

সাহিত্য জিনিষটি কি? আনাতোল ফ্রাঁস (Anatole France) খুব একজন বড় সাহিত্যিক। ফরাসী দেশে তাঁর স্থান অনেকটা আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোই। "প্রকিউরেটার অব জুডিয়া" (Procurator of Judea) নামে তাঁর একটা ছোট চার-পাঁচ পাতার গল্প আছে। আমি সাহিত্য সম্বন্ধে যা বলব এই গল্পটি তার উদাহরণ। আর আমার জীবনে এই গল্পটি অনেক কাজ দিয়েছে,—এ যেন জীবনের একটা আলোক-স্তম্ভ (light-house)। গল্পটা এই—পনটীয়াস্ পাইলেট (Pontius Pilate) দেশে ফিরে এসেছেন, যীশুর ক্রুশ-বিধানের (Crucifixion) অনেক বছর পরে। তখন তাঁর খুব সমৃদ্ধি, প্রকাণ্ড প্রাসাদে তিনি বাস করেন। এমন সময় একদিন একজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। পাইলেট যখন প্যালেষ্টাইনে গভর্ণর (Procurator) ছিলেন তখনও তাঁর সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল, ইনি সেখানে পাইলেট-এর অতিথিস্বরূপে গিয়েছিলেন। পাইলেটকে তিনি তখনকার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন; তখনকার অনেক পুরানো কথা উভয়ের মনে হোলো। একথা-ওকথার পর বললেন, "আচ্ছা, আপনার কি সেই (Nazarene) নেজারীনের কথা মনে আছে—যার নাম ছিল (Jesus) যীশু, যাঁকে আপনি ক্রুশে বধ করবার হুকুম দিয়েছিলেন?" পাইলেট (Pilate) বললেন, "না।" বন্ধু তাঁকে মনে করিয়ে দেবার জন্য অনেক কথাই বল্লেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর যীশুর কথা মনে পড়লো না। তিনি শুধু বল্লেন, (I remember him not) "না, তাকে আমার মনে নাই।" এইখানেই গল্পটির শেষ, কিন্তু এতেই গল্পটির মূলতত্ত্বটি পরিস্ফুট হ'য়েছে। যীশুকে পাইলেট (Pilate) ভুলে গেছেন, কিন্তু জগৎ তাঁকে ভুলতে পারে-নি। যিনি জিহ্ব দ্বারা চালিত হন না, নিজের অধিকারের কথা ভাবেন না, প্রেম যাঁকে চালনা করেন, শেষজয় তাঁরই হবে।

আমি সাহিত্যিক নই, এজন্য সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলতে আমার ভয় হয়। আর আমরা কথার জাতি, সে জন্যেও কিছু ভয় হয় বিশেষ কিছু বলতে। আমার এমন অধিকার নেই যাতে সাহিত্য সম্বন্ধে নতুন-কিছু বলতে পারব। এই যে আনাতোল ফ্রাঁস-এর গল্পটির কথা আমি বলনুম ইহা অনন্তকালের সাহিত্য। এতে আছে সংযম (Economy) ও সত্য—এমন একটা প্রকাণ্ড সত্য এতে সহজ-সুন্দর ভাবে প্রকটিত হ'য়েছে যে তা মনটাকে একেবারে প্রোজ্জ্বল ক'রে দেয়। এর সত্যটি গল্পের ভিতর থেকে একেবারে ঠেলে বেরিয়ে আসে—এমন একটি সরলতা আছে এর মধ্যে যাতে ভাবকে অতি সহজে ফুটিয়ে তুলেছে। গল্পটির মধ্যে যদি শুধু পাণ্ডিত্যই থাকতো তাহ'লে এতদিন তা বেঁচে থাকত না। চার-পাঁচ পাতার গল্পটি পড়ামাত্রই অর্থটা মনের মধ্যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে। যথার্থ সাহিত্য রচনা করতে হ'লে একটা বড় সত্য তার মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। আর সেই বিশেষ সত্যটি প্রকাশ করতে হবে খুব অল্প কথার সংযমের সহিত, যাতে কথার আড়ম্বরে তা ঢাকা না পড়ে। আজকাল আমাদের দেশে ভাবের সঙ্গে ভাষার যে একটা গোলমাল হ'য়ে পড়েছে তার কথাই আমি আজ বলতে চাই। আসল জিনিষ হ'চ্ছে ভাব, সেই ভাবকে ভাষার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই সাহিত্য হয়। নকুবা কেবল পাণ্ডিত্য থাকলেই সাহিত্য হয় না। ভাবে আর ভাষায় যে কতটা তফাৎ হ'তে পারে তা আমি অন্য একটা জিনিষের মধ্যে দেখাব। সরস্বতী পূজার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তা হ'চ্ছে এই পূজার ভাব, আর প্রসেশন, সাজানোগোছান হ'চ্ছে তার ভাষা। কিন্তু যাঁরা পূজা করেছেন তাঁরা ভাষার দিকে এত আড়ম্বর করেন যে ভাবটা ভুলেই যান। সাজানোতে আর্ট আছে বটে, কিন্তু সেইটেই হ'য়ে যাচ্ছে চের বেশী। ম্যাজিক, রায়স্কোপ, ব্যায়কৌতুক, প্রসেশন, এসব খুবই আছে, কিন্তু সরস্বতী-পূজার ভাব কোথায়,—প্রাণ কোথায়? বাইরের এসব ভাষা যদি ভাবকে পরিস্ফুট ক'রে না তুলে তবে এ আড়ম্বর একেবারেই বৃথা। সরস্বতী নারীরূপে কল্পিতা হ'য়েছেন,

তিনি বিদ্যা, পবিত্রতা, প্রসন্নতা, কোমলতার আধার। তাঁর কাছ থেকেই আমরা পাই জ্ঞান, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা। সরস্বতীপূজার এই দু'তিন দিনের উৎসবের মধ্যে আমাদের এই উদ্দেশ্য থাকা উচিত যে আমাদের দেশের প্রত্যেক নারীকেই যেন সরস্বতী ক'রে গড়ে তুলতে পারি। দেবী সরস্বতী জ্ঞানে উজ্জ্বল, তাই তিনি শ্বেতবর্ণা। মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা তিনি, তাঁর মুখ সেইজন্যে কোন আবরণ দিয়ে ঢাকা নয়। কি শান্ত, সংযত, কমনীয় তাঁর মুখশ্রী। এই চিত্র যেন আমাদের দেশের প্রত্যেক নারীতে প্রতিফলিত করতে পারি। এ যদি আমরা করতে পারি, তবেই বাস্তবিক আমাদের সরস্বতী পূজা করা হবে। এই সরস্বতীপূজার কয়েকদিন নারী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে প্রচেষ্টা ক'রে যদি আমাদের ঘরে ঘরে সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজন করতে পারি, তাহ'লেই সরস্বতীপূজা সার্থক নতুবা সরস্বতীপূজা একটা অর্থহীন আচার হ'য়ে থাকবে। তাহ'লেই সরস্বতীপূজাটা কেবল ভাষায় পর্য্যবসিত না থেকে ভাবের গৌরবে সমাজের প্রকৃত কল্যাণপ্রসূ হবে এবং তাহ'লেই পূজার সার্থকতাসাধন হবে। সেই চেষ্টা আপনারা করুন। এই সভা "সারস্বত সাহিত্য-সভা", সুতরাং এখানে বোধ হয় একথা বলার বিশেষ সমীচীনতা আছে।

আর ভাষা ও ভাবের সম্পর্কের দিক দিয়েও এরূপ কথা বলা যায়। আমরা শুধু ভাষা চাই না, ভাব ও প্রাণই বেশী ক'রে চাই। অনেক আলো পাহাড়, লেক্ ইত্যাদি সাজানোর মধ্যে নাই বা থাকলো, মূর্ত্তি ছোট হ'লেও ক্ষতি নেই, আসল কথা—ভাবটা যেন গভীর ও নিবিড় হয়। সাহিত্যেও তা'ই চাই। আজকাল সাহিত্যে দেখি শুধু ভাষা, শুধু পাণ্ডিত্য, ভাব কোথায়? সেদিন এই সরস্বতীপূজার একটা নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলাম, তার মধ্যে শুধু শব্দের বক্সার, অনেক কথার মানেই বুঝি না। অনেকে যেন ভাবেন যে শুধু ভাষাটা 'কটমট' করতে পারলেই সাহিত্য হ'লো। ভাষা বাহন মাত্র, তার নিজের কোন মূল্য নেই। বাহন যদি তার নৃত্যের তাণ্ডবটা জাহির করার আগ্রহে আরোহীর জীবনটাকে সঙ্কটাপন্ন ক'রে তোলে, অথবা সোজা পথে না গিয়ে নিজের বাহাদুরী জাহির করায় ব্যস্ততায় অনেক দূর ঘুরেফিরে চলে তবে সে বাহন যতই ভাল হোক, যোগ্যতার দিক দিয়ে তার মূল্য কম। প্রকৃতপক্ষে ভাষার এই তাণ্ডব হ'চ্ছে সাহিত্যের যথেষ্ট লক্ষণ। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ইংলণ্ডে আজকাল কোন বড় (great) কবি নেই তার কারণ (they have no great truth to impart) জগতে কোন বড় নূতন সত্য দিবার মত অনুভূতি তাদের নেই। সাহিত্য সৃষ্টি করতে হ'লে একটা বড় সত্যের অনুভূতি চাই আর সেই সত্যপ্রকাশের ভাষা হওয়া চাই সরল। অলঙ্কার ও বক্রার অবশ্য চাই কিন্তু তা যেন অতিরিক্ত হ'য়ে ভাবকে ঢেকে না ফেলে,—যেমন নারীর মধ্যে আমরা শুধু অলঙ্কার চাইনা, তাকে এমন আভরণ দিতে হবে যাতে তার স্বভাব ও আত্মার সৌন্দর্য্য আবৃত না হ'য়ে বরং আরও প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে। আজকাল বাংলাভাষার নূতন-লেখকদের মধ্যে ঐপ্রকার সাহিত্য খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হ'য়ে পড়েছে। অধিকাংশে কবিতা বা প্রবন্ধই এ-রকম ধরণের যে তার শেষ পর্য্যন্ত পড়লেও তার অর্থ বুঝতে পারি না, তার ভিতরকার সত্যটিকে খুঁজে পাই না। দু'একজন ছাড়া যথার্থ সাহিত্যিক আজকাল দেখা যায় না, এজন্যে যাঁরা বয়সে তরুণ তাঁদের আমি বলি যে যদি শক্তিশালক হ'তে চান তাহ'লে সরল, সরল ও সত্য হোন, নৈলে শক্তি পাবেন না। এই ময়মনসিংহ জেলায় আদর্শ-সাহিত্য আছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র (Mymensingh Ballads) মধ্যে প্রকাণ্ড সত্য সহজ-সরলভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে। এগুলি পড়লে কখনো প্রাণ কাঁদিয়ে দেয়, আবার কখনো শরীরকে নৃত্যে মাতিয়ে দেয়। নৃত্য আসে প্রাণের আনন্দ থেকে। কয়েকদিন আগে সুনামগঞ্জ গিয়েছিলাম; সেখানকার হাজং-ছেলেরা নৃত্যের সঙ্গে গোয়ং-গাগানোর গান করলে—চমৎকার গান, সহজ সরল ভাষা আর এমন আনন্দ তার মধ্যে অথচ তাতে কোন দুর্নীতির ভাব মোটেই মনে আসে না। যাতে আনন্দ আছে সেটা যদি নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল হয় তাতে দোষ কি? Mymensingh Ballads গুলি সহজ, সরল, প্রাণস্পর্শী, আর এগুলির মধ্যে যথার্থ সত্য নিহিত আছে। কেবল আজকালকার কলিকাতার সাহিত্যে আপনারা আদর্শ খুঁজবেন না। ময়মনসিংহের ছাত্র ব'লে আপনারা সৌভাগ্যবান। এখানকার বাউল ও জারী গান খুব সুন্দর।

এগুলি জাতির পুরাতন সাহিত্য। মুসলমানেরা জারী গান ক'রে থাকেন, এতে সত্য আছে, প্রেম আছে, আর সহজ-সরল কথার লেখা। শুনেছি রবিবাবু আঠার-বাড়ীতে এইসব গান শুনে কেঁদেছিলেন, বলেছিলেন, অশিক্ষিতদের মধ্যে এমন সত্য ও প্রেমপূর্ণ সাহিত্য আছে, আর আমরা আজ সেই সত্য ও প্রেমের আদর্শ হারিয়ে মিছে ঝগড়া করছি। সত্য, প্রেম, সহজভাব এইগুলি হ'চ্ছে জাতীয় সাহিত্যের উপাদান। তুলসীদাসের রামায়ণ সমগ্র উত্তরভারতকে ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করেছে ও একটা সহজ সরল আধ্যাত্মিকতার কালচার্ (culture) উত্তরভারতের লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমি সেই তুলসীদাসের রামায়ণ পড়বার সৌভাগ্য পেয়েছি, আমি যখন বিহারে ছিলুম তখন হিন্দী শিখেছিলুম। বাংলাসাহিত্য এই আদর্শেই গঠিত হওয়া উচিত, যেন সকলেই বুঝতে পারে। বাংলা-ভাষা সংস্কৃতানুগামী হবার অতিরিক্ত ঝোঁক ছেড়ে দিয়ে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমস্ত জাতির জীবনের সুখদুঃখের আশাআনন্দের একটা সহজ-সরল স্বাভাবিক দর্পণস্বরূপ হ'য়ে গড়ে উঠুক্ এই আমি চাই। আপনারা দেখেছেন যে আমাদের দেশে যেসব পণ্ডিতা দারোয়ান ইত্যাদি আছে তারা সবাই তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে। সাহিত্যে ঐক্য-গঠন হয় যদি তা সবাই বুঝতে পারে, অপেক্ষাকৃত অল্প-সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত লোকের বোধগম্য মাসিকপত্রিকার "কটনট" প্রবন্ধ প'ড়ে সেই ঐক্য-গঠন হবে না। হোমারের ইলিয়ড, ওডেসী, রামায়ণ, মহাভারত, এগুলি জাতীয় সাহিত্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত আমাদের জাতির গৌরব। বিলাতে আমি জোর-গলায় বলেছি যে আমাদের দেশের লোকেরা বিশেষতঃ নারীরা নিরক্ষর হ'তে পারে, কিন্তু তারা অশিক্ষিতা নয়। কিসের জোরে আমি এরকম বলতে পেরেছি? কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতের জোরে। এগুলিতে আমাদের দেশের প্রাচীন কাল চার্ (Culture)-এর কয়েকটি বড় বড় সত্যগুলিকে দেশের ছোট-বড় শিক্ষিত-অশিক্ষিত আমির-বুদ্ধিজীবীর মধ্যে এমনিভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে যে আমাদের চাষাভূষোরা ও গ্রামের অনেক সময় দিনমজুর বড় বড় তথ্য জীবনে উপলব্ধি করে ও কথাবার্তায় প্রকাশ করে। এই যে দেশব্যাপী জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে মানান কালচারের সজীব ধারা আমাদের দেশে এখনও প্রবাহিত হ'চ্ছে, ইউরোপ-আমেরিকার প্রচণ্ড প্রভাবান্বিত ধনবৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষার দিনেও সেখানে এই অতুল সম্পদ খুঁজে পাবেন না। কটনট ভাষায়ও সাহিত্য হ'তে পারে বটে, কিন্তু সে সাহিত্য কখনো জাতীয় জীবনে ব্যাপকভাবে ফলপ্রদ হ'তে পারে না। আমি আজকাল কোন কোন ধর্মমন্দিরে এরকম প্রার্থনাও শুনেছি যে-গুলি খুব সংস্কৃতবহুল; এরকম ভাষায় প্রার্থনার ভিতর দিয়ে বাঙালী জাতি তার জীবনের অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারবে না। আমার মনে হয়, প্রার্থনা এমন ভাষায় হওয়া চাই যেন সবাই বুঝতে পারে। অন্য কোন দেশে সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে জাতির চলিত ভাষার এত তফাৎ নেই। আবার বলি সাহিত্য স্থায়ী হ'তে হ'লে ব্যাপক হওয়া চাই। আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিরা খুব বড়, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন ব'লে আমার বিশ্বাস, সেসব কাব্যে যথার্থ সাহিত্য আছে। তাঁদের ভাষা সহজ-সরল ব'লেই তাঁদের ভাব এত প্রাণস্পর্শী, এত প্রাণমাতানো। মোটা কথা, ভাবকে ভাষা যেন কখনো পরাভূত না করে, এইটে আজকাল আমাদের বিশেষ ক'রে দেখতে হবে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য হবে—সত্যকে সুন্দরভাবে প্রকাশিত করা। অলঙ্কার তাতে থাকবে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত নয়। সেক্সপিয়ার-এর চেয়েও (Biblo) বাইবেল ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের বেশী সহায়তা করেছে। বাইবেলের ভাষা সহজ, সরল, নিখুঁৎ, তার মধ্যে Anglo-Saxon কথাই বেশী, Latin, Greek এত কম যে নেই বললেই চলে। এই বাইবেল সমস্ত ইংরেজজাতির চরিত্রগঠনে এমন একটা সহজ-সরল শক্তির ভাব এনে দিয়েছে, যার তুলনা নেই। পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুর্বোধ্য ভাষায় জাতির মধ্যে এমন শক্তি সঞ্চারিত হয় না। আমাদের জাতির হৃদয় আমরা এমনি সরল, সত্য, শক্তিমান্, সাধারণের-বোধগম্য সাহিত্য চাই।

আমি আজকে যা কিছু বললাম সেটা আমাদের দেশের সাধুসিদ্ধে ভাষায়। সাহিত্যসভার সভাপতির অভি-

ভাবণে আমাদের মধ্যে অনেকেই আজকাল পাণ্ডিত্যের, ভাষার আড়ম্বর ও অলঙ্কারের যে আদর্শ পাবার আশা ক'রে থাকেন তা এতে নেই। তবে যদি আমার মনের ভাবটির কোন মূল্য বা বৈশিষ্ট্য থাকে, তাকে যদি বোধগম্য ভাষার প্রচলিত আকার দিয়ে প্রত্যেক শ্রোতার মনের সামনে সোজাসুজি পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকতে পারি ও তার স্পর্শে আপনাদের মনে যদি অনুভূতির অনুরাগের সঞ্চার হ'য়ে থাকে, তাহ'লেই সভাপতিত্বের কতকটা সার্থকতা সাধন ক'রতে পেরেছি ব'লে মনে করব।*

* আনন্দমোহন কলেজের 'সারস্বত সাহিত্যসভা'র প্রদত্ত বক্তৃতা।

জননী *

শ্রী ফণীন্দ্র পাল

ভাইরলোনে পনেরো বছর যেতে পারিনি। হঠাৎ এক বসন্তের দিনে সেখানে এসে পড়লাম। আমার সঙ্গে আছে আমার বন্ধু সারস্তান, যে অনেকদিন পরে প্রুশিয়ান-দের দ্বারা বিধ্বস্ত তার ক্ষুদ্র পল্লীনিবাসটি আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে সক্ষম হ'য়েছে।—এসেছি শিকার করতে।

এই দেশটি আমার ভাল লাগত! পৃথিবীর এক-একটি জায়গা এমন সুন্দর, এমন মোহময় যে তারা রমণীর মত আমাদের প্রিয় হ'য়ে ওঠে। প্রকৃতির স্নিগ্ধ মাধুর্য্য আমাদের মনে যখন কখনও একটি অস্থায়ী রেখাপাত করে—এক-স্থানের বসন্ত-উৎসব, কোথাও বা একটি নিবিড় বন, একটি ঘুরঘুরে নদী, টুকরো পাহাড়, এদের যতবার দেখি ততবার তারা আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু একদিনের চকিত-দেখা বনের ভিতর একটি ছোট ঝরণা, নদীর তীর আর পুষ্পিত ঝোপের উপর যখন দিনান্তের রাঙা আকাশ ঘুরে পড়ে তখন তারা আমাদের স্মৃতিতে চিরউজ্জ্বল থাকে। যেন এক বসন্তের রাঙা সন্ধ্যাকাশের তলায় পথের জনতার মাঝে এক রহস্যময়ী সুন্দরীর দেখা পাই—হাল্‌কা রঙের পরিচ্ছদে সুস-জ্জিতা। তাকে আর ভুলি না, দেহে ও মনে সে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। তেমনি আমার কাছে এই-দেশের প্রকৃতি-রূপ—চিরজাগ্রত পিপাসার মত।

ভাইরলোনের সমস্তই আমার কাছে সুন্দর। কি সুন্দর এর ছোট ঝোপগুলি! এর ছোট স্রোতস্বিনীরা যেন মাটির শিরার মত চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, তার ভেতর দিয়ে মাটির জীবন-রক্ত—জল চলাচল করে।

চিন্তাহীন পাখীর মত আমি চলেছি। আমার কুকুর দু'টি আগে-আগে, সারস্তান আমার পাশে প্রায় কুড়ি পজ দূরে, হঠাৎ একটি ঝোপের আড়াল হ'তে বেরিয়ে এসে একটি বিধ্বস্ত গৃহ দেখলাম।

অকস্মাৎ আমার ১৮৭৯ সালে এই বাড়ীটির চেহারার কথা মনে প'ড়ে গেল। তরুণকে বাড়ীটির সামনে ছিল সবুজ মাঠ, সেখানে মোরগের দল ছোটাছুটি করত। কিন্তু সন্দেহ হ'ল এ কি পরিত্যক্ত গৃহের চেয়েও কোন করুণ ইতিহাসযুক্ত না শুধু বৃদ্ধত্বের বীভৎস বিধ্বস্ত কঙ্কালটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আমার আরও মনে প'ড়ে গেল ক্লান্তির জন্য এ-বাড়ীর মহিলাটি আমায় একরাশ মদ দিয়েছিলেন। সারস্তান সেদিন আমাকে এর অধিকারীদের পরিচয় শুনিয়েছিল—বাড়ীর কর্ত্তা ছিল একটি বৃদ্ধ জুয়াচোর, সেই-জন্যে পুলিশের গুপ্তচরের হাতে তাকে প্রাণ হারাতে হ'য়েছে: তার ছেলে, লম্বা কুঁজো মত—তরুণের দুর্দ্দান্ত হিসাবে খ্যাতিও আছে কিছু—তাকে আমি দেখেছি। তারা জার্ত্তেজ ব'লেই পরিচিত ছিল। জার্ত্তেজ তাদের সত্যিকার উপাধি না জানলাম তা' আমি সেদিন ঠিক বুঝিনি।

* মোপাসার অনুসরণে।

সারজাণ্টকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এ-বাড়ীর বাসিন্দারা কোথায় গেল?

তখন সে এই কাহিনীটি বললে—

যেদিন যুদ্ধ আরম্ভ করা হোল সেদিন ছোট ভাতেজ, তার বয়স তখন তেত্রিশ, মাকে একলা বাড়ীতে রেখে সৈনিকদলে যোগ দিলে। তার বৃদ্ধা মাকে বাইরের লোকের সহানুভূতি জানানো বা কিছু সাহায্য করবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন হয়নি কারণ অর্থের অনটন তার ছিল না।

গ্রাম হ'তে দূরে বনের কিনারে সে তার নিরালা গৃহে র'য়ে গেল। নিরীহ তো সে ছিলইনা বরং তার স্বামী, ছেলের মত সেও ছিল ডাকাত। লম্বা সুদৃঢ় বৃদ্ধাটি!—হাসি-পরিহাস সে পছন্দ করে না আর তার সঙ্গে রসিকতা করবার প্রয়াসও কেউ কখনোও করেনি।

ভাতেজ-মা দৈনন্দিন জীবন কাটাতে লাগল। বরফ তখন কুটীরের চারিপাশ ছেয়ে ফেলেছে। দরজার ভেতর একবার ক'রে গ্রামে গিয়ে নিজের জন্যে রুটি আর কিছু মাংস কিনে নিয়ত। বাঘ বেরিয়েছে—এইরকম জনরব মাঝে শোনা গেল। সেদিন হ'তে সে তার ছেলের বহুচে-পড়া বন্দুকটি ব্যবহার করত। লম্বা, একটু কুঁজো, মাথার শুভ্র কেশগুলি একটি কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা, কাঁধের পাশে সেই বন্দুকটি—এই বেশে বরফের ভেতর দিয়ে তার ধীর পদক্ষেপের দিকে চাইলে দুঃখ হয়।

একদিন এল প্রুশিয়ানরা। গ্রামবাসীদের অবস্থানুযায়ী কমবেশী সংখ্যার সৈনিক-অতিথি প্রত্যেকের ভাগে এল, বৃদ্ধার দিকে পড়ল চারটি জোয়ান—তাদের রং সাদা, তামাটে দাড়ি আর নীল চোখ। অত্যধিক পরিশ্রম সত্ত্বেও তারা বেশ মানুষ, তাদের ব্যবহার সাদাসিধা, ভদ্র—বিজেতার অহঙ্কার তাদের একটুও নেই, তারা ভাতেজ-মা'র ক্লান্তি আর খরচ যতদূর সম্ভব কমিয়ে রেখেছিল। চারটি জোয়ান ছেলে বৃদ্ধা-মা'র জন্যে যতখানি করতে পারে তেমনি ক'রেই তারা প্রতিদিন কাঠ কাটে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে, কাপড় ধোয়।

কিন্তু বৃদ্ধা ভাবত, তার ছেলের কথা, তার দীর্ঘদেহী ছেলে—তার উঁচু নাক, কটা চোখ আর ঠোঁটের ওপর এক-গোছা কালো গোঁফ। এরা সে সৈনিক-অতিথিদের এক-জন না একজনকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি জান ভেইশ করাসী রেজিমেণ্ট এখন কোথায়? আমার ছেলে সেই রেজিমেণ্টের একজন।

তারা বলে, জানি না মা, আমরা কিছু জানি না।

যাদের যা আছে তারা এই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধাটির প্রতি তাদের করুণা-দৃষ্টি আরও সজাগ ক'রে তোলে। শত্রুদেশ হ'য়েও তারা বৃদ্ধার প্রিয় হ'য়ে উঠল। সাধারণ লোকদের দেশপ্রেমের বিলাসিতা নেই। গরীব নিম্নশ্রেণীর জীবন নিয়ে যারা সবচেয়ে বেশী নাড়া করে, প্রতি কপর্দকটি যারা সামান্য অর্থের প্রয়োজনে ধনীর নিকট বিক্রয় ক'রে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়, অপরিসীম অনটনে যারা ব্যতিব্যস্ত, যুদ্ধে গোলার মুখে প্রাণবিসর্জন দেওয়ার দুর্ভাগ্যও তাদেরই। সেখান-কার লোকেরা ভাতেজ-মা আর তার চারটি জার্মান অতিথি সম্বন্ধে বলে, ওরা চারজন সত্যিই বৃদ্ধার স্নেহে বিকিয়ে গেছে।

হঠাৎ একটি মধুর প্রভাতে যখন বৃদ্ধা একলাই ঘরে ছিল তখন সে দেখতে পেল—দূরে মাঠ ভেঙে তারই কুঞ্জের অভিমুখে কে একজন এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পরে তাকে গ্রামের ডাকপিওন ব'লে চেনা গেল, সে এসে বৃদ্ধার হাতে একটা ভাঁজকরা কাগজ দিল। সেলাইয়ের কাজের সময় যে চশমাটি তাকে সাহায্য করত সেটিকে খাপ থেকে বের করে চোখে দিয়ে সে পড়লে—

দিদেস ভাতেজ,

আপনাকে একটি দুঃখের সংবাদ আমাকেই জানাতে হ'চ্ছে। আপনার ছেলে ভিক্টর পরশুদিন কামানের গোলায় নিহত হ'য়েছে: ভিক্টরের দেহ দুই খণ্ডে ছিন্ন হ'য়ে গেছে, এতই ভীষণ আঘাত সে পেয়েছিল। আমাদের এক-বিভাগে পাশাপাশি নাম থাকার দরুণ আমি তার পাশেই ছিলাম, তার যদি কিছু মন্দ ঘটে তাহ'লে সে আপনাকে সংবাদ দেওয়ার জন্যে নিদর্শনস্বরূপ তার ঘড়িটি পাঠাতে আমাকে বলেছিল সুতরাং আমি তার মৃত্যুসংবাদ ও ঘড়িটি যুদ্ধের শেষে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে পাঠালাম।

সম্রদ্ধ

সিজার রাইভট

২৩নং পদাতিক সৈন্যবিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর সৈন্য।

চিঠিতে তিন সপ্তাহ আগেকার তারিখ দেওয়া ছিল।

সে কাঁদল না, কেবল স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতবড় আঘাতে সে এতখানি স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল যে তার কোন কষ্ট বোধ হ'চ্ছিল না। সে ভাবতে লাগল, তার ভিক্টর এখন আর বেঁচে নেই, তাকে মেরে ফেলেছে। ধীরে ধীরে তার চোখ সজল হ'য়ে এল, তার অন্তরে এল বেদনার বন্যা। একটি একটি ক'রে ভিক্টরের সংশ্লিষ্ট কত কথা স্মৃতির দুয়ারে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল—বেদনার সুতীব্র চিন্তার স্রোত!

ভিক্টরকে আর কোনদিন সে স্নেহের বাহুর ডোরে জড়িয়ে ধরতে পাবেনা—তার সেই বলিষ্ঠ হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটিকে কোনদিনও নয়! পুলিশের গুপ্তচরেরা স্বামীকে মেরে ফেলেছিল, প্রুশিয়ানরা ছেলেটিকে হত্যা করেছে—কামানের গোলায় সে একেবারে দু'খানা হ'য়ে গেছে! তার মনে হয় সে যেন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে—তার (ভিক্টরের) মাথা চ'লে পড়েছে, চোখদুটি মৃত্যুভয়ে বিস্ফারিত, রাগ করলে সে যেমন দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াত অসহ্য যন্ত্রণায় তেমনি ক'রে সে ঠোঁটদুটিকে টিপে ধরেছে।

কিন্তু তার মৃতদেহ নিয়ে তারা কি করল? স্বামীকে সে ফেরৎ পেয়েছিল—তখন তার শবদেহের কপালের ঠিক মাঝখানে গুলির আঘাত-চিহ্ন। তেমনি যদি সে তার ছেলেটিকে ফিরিয়ে পেত—কামানের গোলায় দ্বিখণ্ড।

হঠাৎ সে গলার আওয়াজ শুনতে পেল, অতিথি-প্রুশিয়ানরা গ্রাম হ'তে ফিরে আসছে। তাড়াতাড়ি সে চিঠিটা পকেটের ভেতর লুকিয়ে ফেলে। তারপর চোখের জল মুছে সে অবিচলিতভাবে তাদের সামনে বার হ'ল।

তারা চারজনেই স্ফূর্তির ঝোঁকে খুব হাসছে। চমৎকার একটা খরগোস তারা ধ'রে এনেছে, যদিও সেটা চোরাই সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আকারে-ইঙ্গিতে ভাবে-ভাষায় তারা জানালে, আজকের আহারটা হবে খুব মুখরোচক! বুড়ী তখনই মধ্যাহ্ন-ভোজের ব্যবস্থা করতে লেগে গেল, কিন্তু হঠাৎ, খরগোসটি মারবার সময় তার সাহস হ'ল না—এ যে তার কিছু অনভ্যস্ত কাজ তা' নয়, তবু।

অগত্যা সৈন্যদের ভেতর একজন এক আছাড়ে খরগোসটির জীবন শেষ ক'রে দিলে।

সেই মৃত খরগোসের চামড়া ছাড়াতে গিয়ে তার পা থেকে মাথা অবধি সমস্ত শরীর শিউরে উঠ ল। রক্তে তার হাতদুটি লাল—দগ্ধনিহত জীবটির উষ্ণ রক্ত ধীরে ধীরে হিমশীতল হ'য়ে জমাট বেঁধে যাওয়া সে যেন অনুভব করতে লাগল। যেন সে দেখল, যুদ্ধক্ষেত্রে তার ছেলের, তার জোয়ান ছেলের বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত দেহ মৃত্যুর শেষনিশ্বাসের মৃদু স্পন্দনে একটি অস্পষ্ট চেতনায় তখনও কেঁপে উঠছে।

প্রুশিয়ানদের সঙ্গে একত্রে আহারে ব'সে সে খরগোসের মাংসের একটি টুকরাও মুখে তুলতে পারল না। তারা চার-জন স্ফূর্তির ঝোঁকে মাংসের সদ্ব্যবহার করতে করতে বুড়ীর দিকে নজর রাখবার জন্যে একেবারে ব্যস্ত ছিল না। আপনমনে কি যেন একটা চক্রান্ত সাজাতে সাজাতে সে যে নিঃশব্দে তাদের আড়চোখে দেখছিল তা' তারা জানল না।

হঠাৎ সে ব'লে উঠল, একমাস হ'তে চলল আমরা এক-সঙ্গে আছি অথচ কি আশ্চর্য্য আমি তোমাদের কারো নাম পর্য্যন্ত জানিনি।

তারা তার এই কথায় নিজেদের নাম বললে, কিন্তু বুড়ীর প্রয়োজনের পক্ষে এ যথেষ্ট নয়, একটি কাগজে সকলের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লিখে দেবার জন্যে সে জেদ ধরলে। তারপর সে উঁচু নাকটির ওপর চশমা চড়িয়ে দুর্বোধ্য লেখাগুলো বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল, দেখা শেষ হ'লে কাগজটি ভাঁজ ক'রে তার ছেলের মৃত্যুসংবাদের চিঠিখানির উপর সেখানি পকেটে রেখে দিলে।

খাওয়া হ'য়ে গেলে সে তাদের বললে, তোমাদের আরামের জন্যে একটা কাজ করতে যাচ্ছি।—ব'লে গোলা-বাড়ীতে যেখানে তারা রাত্রে শোয় সেখানি বোঝা বোঝা খড় ব'য়ে আনতে লাগল।

প্রুশিয়ানরা একটু আশ্চর্য্য হ'য়েই তার শুধু শুধু এরকম কষ্ট করবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিলে যে রাত্রের শীতে তাদের একটু উষ্ণ আরাম দেওয়ার জন্যেই তার এই পরিশ্রম। তাই শুনে সেই চারটি সৈন্যও তার সঙ্গে কাজে লেগে গেল। ঘরের চারপাশ ঘিরে চাল অবধি উঁচু খড়ের আঁটি সাজিয়ে তারা যেন আর-একটি ঘর তৈরী করলে—সেই খোড়ো ঘরের ভেতরটা হ'ল বেশ গরম আর

কেমন একটা সুমিষ্ট গন্ধে ভরপুর। সেখানে যে তারা খুব আরামে ঘুমোবে তা' আর আশ্চর্য্য কি!

রাত্রে আহারের সময় তাদের মধ্যে একজন তাকে বিশেষ কিছু খেতে না দেখে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করল। সে বললে যে ধাতের ধরণের তার খাবার ইচ্ছা চ'লে গেছে। শরীরটাকে গরম রাখবার জন্যে সে তারপর আগুন জেলে তার পাশে বসল।

গোলাবাড়ীর উপরে ওঠবার জন্যে সিঁড়ির পরিবর্ত্তে ছিল একটা মই। সেটি বেয়ে বৃদ্ধার চারটি জার্ম্মান অতিথি তাদের শোবার ঘরে উঠল।

তারা ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিতেই সে মইটা দরজার মুখ হ'তে সরিয়ে নিলে, তারপর নিঃশব্দে বাইরের দরজা খুলে আরো খড় এনে বাড়ীর চারপাশে জড়ো করলে। যাতে কোন শব্দ না হয় সেইজন্যে সে বরফের ওপর শুধু-পায়ে চলাফেরা করছিল আর মাঝে মাঝে সেই ঘুমন্ত সৈন্য-দের শ্বাস-প্রশ্বাসের অস্ফুট শব্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল।

সমস্ত আয়োজন শেষ হ'লে সে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিলে।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘরের ভিতর আগুন জ্ব'লে উঠল। আরও কিছুক্ষণ পরে মনে হ'ল যেন একটি প্রকাণ্ড উনুন থেকে লেলিহান বহ্নিশিখা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে চারপাশে কড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়েছে—তার রক্তাক্ত তীক্ষ্ণোজ্জ্বল-রশ্মি, স্রোতের মত বরফের উপর এনেছে প্লাবন। ঘরের ভেতর হ'তে ভীত-শঙ্কিত আর্ত্তনাদ উঠতে লাগলো।

হঠাৎ ঘরের চালটি ধ্ব'সে পড়ল আর সেই সঙ্গে আগুনের উন্মত্ত শিখা উন্মুক্ত আকাশের দিকে মশালের আলোর মত উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। ঘরে জনপ্রাণীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না; শুধু ক্রুদ্ধ অগ্নি-সমারোহের সোঁ-সোঁ গর্জ্জন, দেওয়াল ভেঙে পড়ার শব্দ আর কড়ি-বরগা ধ'সে পড়ার গম্ভীর বিকট আওয়াজ,—আর সেই বিরাট ঘরের জলন্ত আভা আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কুয়াশার আবরণটি যেন লাল রঙে ছোপানো। তুষারাচ্ছন্ন ভূমি যেন একটি রূপালি অলঙ্কারের মত আলোয় ঝক্ ঝক্ করতে লাগলো।

দূরের একটি ঘড়ি হ'তে ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজার শব্দ ভেসে আসছে, আর সেই ভাঙা কুঁড়ের ধ্বংসের সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা ম্যাডেজ-জননী—হাতে তার বন্দুক, তার ছেলের সেই খরচে-ধরা অস্ত্রটি। তবুও তার আশঙ্কা, যদি-বা সৈন্যদের ভেতর কেউ বেঁচে যায় তা'হ'লে বন্দুকের গুলিতে তার জীবন শেষ ক'রে দেবে।

তখন সেখানে লোক জমা হ'তে সুরু হ'য়েছে। গ্রামবাসী-। আর প্রুশিয়ানরা। তারা দেখলে প্রতি-হিংসায় চরিতার্থ হ'য়ে সে প্রশান্তভাবে একটি গাছের গুঁড়ির ওপর ব'সে আছে।

ফরাসী ভাষাভিজ্ঞ একটি জার্ম্মান সৈন্যাধ্যক্ষ তাকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ঘরে যে চারজন প্রুশিয়ান ছিল তারা কোথায়?

আগুনের তেজ তখন নিভে এসেছে, সেই বিকৃত ধ্বংসের দিকে শীর্ণ একটি হাত তুলে সে চেঁচিয়ে বলল—ঐখানে।

প্রত্যেকেই তাকে ঘিরে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। প্রুশিয়ান আবার জিজ্ঞাসা করলে—আগুন লাগল কি ক'রে?

সে বলল—আমি নিজেই জ্বালিয়েছি।

তার কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না, সকলে ভাবলে, এই ভীষণ দুর্ঘটনায় সে বুঝি পাগল হ'য়ে গেছে। তখন সে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার সমবেত উৎসুক জনতার কাছে ব'লে যেতে লাগলো—ভিক্টরের মৃত্যুসংবাদের চিঠি আসা থেকে তার ঘরের লোক মানুষ-গুলির শেষ আর্ত্তনাদ পর্য্যন্ত, তার বিবৃতিতে খুঁটিনাটি কিছুই বাদ পড়ল না—তার অনুকূল ভাবের প্রকাশে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না।

যখন তার বলা শেষ হ'ল তখন পকেট হ'তে সে দুটি ভাঁজকরা কাগজ বের করল। আগুনের দীপ্তি তখন ম্লান হ'য়ে এসেছে তাই কাগজ দুটোর পার্থক্য ঠিক করবার জন্যে সে চোখে লাগালো চশমা, তারপর সেই কাগজের একটিকে আলাদা ক'রে নিয়ে বললে—এটা হ'চ্ছে ভিক্টরের মৃত্যুর খবর।

প্রজ্বলিত ধ্বংসের দিকে চেয়ে একটু মাথা নেড়ে অন্য কাগজটি দেখিয়ে বলল—আর এটাতে লেখা আছে

ওদের নাম আর ঠিকানা যাতে তোমরা ওদের বাড়ীতে মৃত্যুসংবাদ জানাতে পারবে।

যে সৈন্যাধ্যক্ষটি তার গলা ধ'রে ছিল তার দিকে অত্যন্ত শান্তভাবে সাদা কাগজটি এগিয়ে ধ'রে বলতে লাগলো সে, ওদের মায়েদের জানিয়ো, কি রকম ভাবে ওদের মৃত্যু ঘটেছে। আরো জানিয়ো আমিই এসব করেছি—আমি ভিক্টোরিয়া সাইমন, লোকে যাকে ডাকে ন্যাজেভ ব'লে; দেখো, ভুলো না যেন।

সেনাপতিটি জার্মান ভাষায় কি আদেশ করলেন অমনি তারা তাকে ধ'রে কূপের উত্তপ্ত রাঙা দেওয়ালের গায়ে নিক্ষেপ করল। বারোজন সৈন্য তৎক্ষণাৎ কুড়ি হাত দূরে সার বেঁধে দাঁড়াল। তার কিন্তু একটুও চাঞ্চল্য নেই; এইবার কি হবে সে জানে, জেনে সে শুধু অপেক্ষা করছিল।

গম্ভীর স্বরে আদেশ ধ্বনিত হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বারোটি বন্দুকের আওয়াজ যেন একটি শব্দের ভেতর মিলিয়ে গেল।

বৃদ্ধা তবু প'ড়ে গেল না। মনে হ'ল, সে যেন ঝুঁকড়ে পড়েছে, পাখিটি জখম হ'লে যে রকম হয় সেই রকম।

জার্মান সেনাপতিটি তার কাছে গিয়ে দেখলে যে প্রায় দুখানা হ'য়ে ছিন্ন হ'য়ে গেছে তবু তার শক্ত মুঠির ভেতর তখনও সে তার ছেলের মৃত্যুসংবাদের চিঠিখানি আঁকড়ে ধ'রে আছে—চিঠিখানা রক্তে মাখা।

আমার বন্ধুটি আরও বললে, এই চারজন সৈন্যের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে খ্রীষ্টিয়ানরা আমার পল্লী-নিবাসটি জ্বালিয়ে দিয়েছিল

কিন্তু আমি তখন ভাবছিলাম, ওইখানে বিদ্ধ চারটি নিরীহ মানুষের চারজন বিয়োগশোকাতুরা জননীর কথা—আর এখানকার নিহতা মাতার প্রতিহিংসার এই নিষ্ঠুর বীরত্ব।

খেলা

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাতনলা—খেলোয়াড়-সংখ্যা প্রত্যেক দলে ৭ জন। সামগ্রী ১টি ৪নং ফুটবল অথবা ঐ জাতীয় একটি কৃত্রিম 'বল'। ক্ষেত্র ৬টি গোলক-বা রেখা, তাহার দুই দিকে ৩টি করিয়া বৃত্ত—প্রত্যেক বৃত্তের ব্যাস ১গজ মাত্র। 'গোল' হইতে এক দিকের অপর ২টি বৃত্তের দূরত্ব ১৫ ফুট হইতে ২০ ফুট। "ক" দলের ৭জন খেলোয়াড়ের ৩জন এক-দিকের ৩টি বৃত্তের মধ্যে থাকিবে; ৩জন থাকিবে অপর-দিকের ৩টি বৃত্তের বাহিরে রক্ষী স্বরূপ, আর একজন থাকিবে মধ্যস্থানে সীমারেখার নিজেদের দিকে। অপর দলের খেলোয়াড়েরাও ঠিক ঐভাবে থাকিবে। দুই পক্ষের যে দুইজন খেলোয়াড় সীমারেখার মধ্যস্থানে আছে, তাহারা ক্ষেত্রের মধ্যে যে-কোন স্থানে যাইতে পারিবে বৃত্তের ভিতর ছাড়া। অন্যান্য খেলোয়াড়গণ সীমারেখার যে-দিকে যে আছে তাহার অন্য দিকে যাইতে পারিবে না। যেসব খেলোয়াড় বৃত্তের মধ্যে আছে তাহারা 'বল' ধরিতে কি 'বল' ছুড়িতে বৃত্তের মধ্যে সর্ব্বদাই অন্ততঃ একখানা পা রাখিবে। মধ্যস্থ বলটি নিয়া সীমারেখার মধ্যস্থলে জোরে নিক্ষেপ করিবে, 'বল' লাফাইয়া উঠিলে মধ্যস্থিত ক, বা খ সেই 'বল' ধরিয়া তাহাদের মূলস্থিত খেলোয়াড়কে ছুড়িয়া দিবে। বিপক্ষের রক্ষী চেষ্টা করিবে "বল" যাহাতে মূলস্থিত খেলোয়াড় না পায়। মূলস্থিত খেলোয়াড় যদি "বল" পায় তবে সে নিজেদের গোলে নিক্ষেপ করিবে। 'গোল'স্থিত খেলোয়াড় যদি সেই 'বল' ধরিতে পারে তবে সেই পক্ষে একটি 'পয়েন্ট' হইবে। মূলস্থিত খেলোয়াড় ভিন্ন অন্য কোন খেলোয়াড় 'গোলে' 'বল' নিক্ষেপ করিলে তাহাতে পয়েন্ট হইবে না। কাজেই অন্য খেলোয়াড়গণ সর্ব্বদা মূলে 'বল' দিবে, মূলস্থিত খেলোয়াড় 'গোলে' 'বল' নিক্ষেপ করিবে। রক্ষীগণ সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে যাহাতে বিপক্ষের মূলের বা গোলের খেলোয়াড় যাহাতে 'বল' না পায়। 'বল' কেহ ধরিতে না পারায় যদি মাটিতে পড়ে তবে মধ্যস্থ আরম্ভের মত আবার 'বল' মধ্যস্থানে নিক্ষেপ করিবে। কেহ 'বল' নিয়া চলিতে পারিবে না, "বলে" পা লাগাইতে পারিবে না, "বল" ধাক্কাইয়া নিতে পারিবে না, "বল" ধরিয়া ৩ সেকেণ্ডের অধিক রাখিতে পারিবে না, "বলে" ঘুসি দিতে পারিবে না, অন্য কোন খেলোয়াড়কে ধাক্কা দিতে পারিবে না, অথবা অন্য কোন খেলোয়াড় উঁচু হাতে "বল" ধরিলে তাহা লইতে চেষ্টা করিতে পারিবে না। কেহ আইন-ভঙ্গ করিলে বিপক্ষ মূল হইতে গোলে একবার 'বল' নিক্ষেপ করিবে তাহাতে মাত্র গোলরক্ষী বাধা দিতে পারিবে।

আত্মরক্ষা—খেলোয়াড়-সংখ্যা এক এক দলে ১০ হইতে ১৫ জন। ২০ গজ ব্যাসের একটি বৃত্ত আঁকিয়া তাহার মধ্যস্থানে ২ ফুট ব্যাসের একটি ছোট বৃত্ত আঁকিতে হইবে। এক পক্ষের খেলোয়াড়গণ বড় বৃত্তটি বেষ্টন করিয়া সমান দূরে দাঁড়াইবে। অপর পক্ষের একজন কেন্দ্রস্থলে একখানি টেনিস্-ব্যাট্ বা ঐ-জাতীয় কিছু লইয়া দাঁড়াইবে। বৃত্তের বাহিরের খেলোয়াড়গণ একটি টেনিস্-'বল' বা ঐ জাতীয় অন্য কোন 'বল' লইয়া কেন্দ্রস্থ খেলোয়াড়ের পায়ে আঘাত করিতে থাকিবে। কেন্দ্রস্থ খেলোয়াড় টেনিস্-ব্যাট্ দ্বারা 'বল'গুলি ফিরাইতে চেষ্টা করিবে। সে যতগুলি 'বল' ফিরাইবে তাহার পক্ষে তত 'পয়েণ্ট' হইবে। 'বল' ফিরাইতে সে তাহার পায়ের গোড়ালী, স্থান হইতে সরাইতে পারিবে না। শরীর ঘুরাইতে ফিরাইতে পারিবে কিন্তু পা ঠিক থাকা চাই। যদি তাহার পায়ে 'বল' লাগে তবে সে মরিবে। তাহার পক্ষের অন্য খেলোয়াড় ব্যাট্ ধরিবে; যাহারা 'বল' মারিবে তাহারা বৃত্তের মধ্যে পা দিতে পারিবে না। এক পক্ষের সমস্ত মরিলে অপর পক্ষ ব্যাট্ ধরিবে। দুই পক্ষের সকলের ব্যাট্ ধরা শেষ হইলে যে পক্ষের 'পয়েণ্ট্' বেশী তাহারা জয়ী। 'বল'কারী কেন্দ্রস্থ খেলোয়াড়ের পা ভিন্ন অন্য অঙ্গ লক্ষ্য করিতে পারিবে না, করিলে অন্য পক্ষ এক 'পয়েণ্ট্' পাইবে।

লক্ষ্য-ভেদ—৯ হইতে ১৫ ফুট ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্ত আঁকিয়া তাহার মধ্যস্থানে একটি পাথর অথবা ইট্ রাখিয়া তাহার উপরে ছোট্ট একটুকরা পাথর রাখিতে হইবে। খেলোয়াড়গণ বৃত্তের বাহিরে থাকিবে। একটি টেনিস্-'বল' বা অন্য কোন 'বল' অথবা লাঠি দ্বারা এক-এক জন খেলোয়াড় সেই ছোট্ট পাথরের টুকরা ফেলিতে চেষ্টা করিবে। প্রত্যেক খেলোয়াড় ৩বার করিয়া মারিতে পারিবে। ৩ বারেও যে কৃতকার্য্য না হইবে শাস্তিস্বরূপ তাহাকে একপায়ে লাফাইতে লাফাইতে সেই বৃত্তটি একবার ঘুরিয়া আসিতে হইবে।

ক্রমশঃ

চন্দ্রকুমারী

শ্রী সন্তোষকুমার সরকার

(৬)

রাজা চন্দ্রকুমারীকে ভালবাসেন খুবই! যাতে তার কোন রকম না কষ্ট হয় সেজন্যে একজন বিশ্বাসী চাকরাণী তার সেবা করে। সে চাকরাণীর স্বভাবটি খুব ভাল। একদিন সে চন্দ্রকুমারীকে গোপনে ডেকে বল্লে, "ছোট রাণীমা! যদি অভয় দেন ত' একটা কথা বলি।" চন্দ্রকুমারী বল্লে, "অভয় দিচ্ছি—বল্।" চাকরাণী বল্লে, "সাবধান! বড় রাণীমাকে বিশ্বাস করবেন না। তিনি আপনাকে মনে মনে দেখ্তে পারেন না। আমার ভয় হয় পাছে আপনার কোনদিন অনিষ্ট করেন।" চন্দ্রকুমারী হেসে বল্লে, "দূর পাগলী! দিদি আমার অনিষ্ট করবেন কেন? তিনি আমায় কত ভালবাসেন, ঠিক বোনের মত।" চাকরাণী আর কোন কথা না ব'লে সেখান থেকে চ'লে গেল।

ছোটরাণীর আর বড়রাণীর ঘর দুটো একটু তফাতে তফাতে। তবু প্রায়ই চন্দ্রকুমারী বড়রাণীর ঘরে যান—আর বড়রাণীও চন্দ্রকুমারীর ঘরে আসেন। এই রকম ক'রে কতদিন কেটে গেল।

রাজার বাগানে একটি সুন্দর পুকুর ছিল। তার জল ছিল কাচের মত। একদিন চন্দ্রকুমারী ও বড়রাণী গল্প করতে করতে পুকুরের কাছে এল। বড়রাণী চন্দ্রকুমারীকে বল্লেন "বাঃ বোন! তোমার গলার হারটি কি সুন্দর দেখতে—এর হীরেগুলো কেমন জ্বলছে। জলে ওর ছায়া পড়লে জলশুদ্ধ ঝল্‌মল্ ক'রে উঠবে। পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে চেয়ে ছাখোতো—কেমন মজা হবে!" তারপর তিনি চন্দ্রকুমারীর হাত ধ'রে একেবারে পুকুরের কিনারার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। চন্দ্রকুমারী হেঁট হ'য়ে পুকুরের জলের দিকে চেয়ে দেখ্তে লাগলো। এমন সময় বড়রাণী তাকে পিছন থেকে মেরে দিলেন এক ধাক্কা! ধাক্কাও মারা, অমনি ঝপাং একটা শব্দ। চন্দ্রকুমারী পুকুরের অগাধ জলে গিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ হাঁকপাক ক'রে কোথায় তলিয়ে

গেল কে জানে! আর বড়রাণী তাড়াতাড়ি দৌড়ে নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

তার পরদিন সকালে তিনি পুকুরধারে গিয়ে দেখলেন যেখানে চন্দ্রকুমারী ডুবে গেছ ল—সেখানে একটি সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। ফুলটি দেখে তিনি খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন।

ওদিকে তার পরদিন—রাজা চন্দ্রকুমারীর ঘরে এসে তাকে দেখতে পান না। তিনি বড় ব্যস্ত হ'য়ে এঘর-ওঘর এ বাগান সে বাগান খুঁজতে লাগলেন। খুঁজলে কি আর মেলে। তিনি তাড়াতাড়ি বড়রাণীর কাছে ছুটে গেলেন। বড়রাণী তখন চুল বাঁধছিলেন। রাজা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বড়রাণী। ছোটরাণী কোথায়? নিশ্চয়ই তুমি তাকে মেরে ফেলেছ! শীঘ্রি বল।" বড়রাণী ও' গালে হাত দিয়ে বল্লেন, "ওমা, সেকি কথা গো! আমি মারবো কেন! আমি তাকে ছোট বোনের মত দেখি যে। নিশ্চয়ই সেই চাকরাণীটার কাজ, সেই বেটীই গয়নার লোভে তাকে মেরে ফেলেছে!" কি জানি হঠাৎ রাজারও রোষের মাথায় বিষাদ হ'য়ে গেল—কথাটা। তখুনি তিনি লোক-জনদের বললেন, "এখুনি ছোটরাণীর চাকরাণীকে কয়েদ কর।" এই ব'লে তিনি পাগলের মত ছুটলেন।

তারপর রাজা সর্ব্বদাই ভাবতেন। আহারনিদ্রা ত্যাগ হ'য়ে গেল। চন্দ্রকুমারীর শোকে তাঁর শরীর কালি মেরে গেল—সর্ব্বদাই উদাস ভাবে ভাবতেন। লোকজনেরা বলাবলি করতে লাগলো—হায়! হায়! রাজা আমাদের ছোটরাণীর শোকে ম'র্ত্তে বসেছেন।

কিছুদিন পরে একদিন রাজা ছোটরাণীর কথা ভাবতে ভাবতে পুকুরের ধারে এসে উপস্থিত। দেখতে পেলেন, একটি সুন্দর ফুল জলের মধ্যে ফুটে রয়েছে। ফুলটি রাজাকে দেখেই খুব দুলতে লাগলো। রাজা কাতর-স্বরে বল্লেন, "ফুল! তুমি আমার ছোটরাণীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ—সে দেখতে তোমারি মত সুন্দর ছিল!"

তারপর রাজা প্রায়ই সেই ফুলটির কাছে যান। পাগলের মত ফুলকে কত-কি বলেন। একদিন বড়রাণীর কানে এ কথা পৌঁছুল, তিনি ত খুব রেগে গেলেন। মালীকে ডেকে বল্লেন, "ঐ ফুলটাকে উপড়ে রাস্তার ধারে ছাইগাদায় পুঁতে ফেল্।" মালী রাণীর আজ্ঞা প্রতিপালন করলে। তার পরদিন আর রাজা ফুলটিকে না দেখতে পেয়ে খুবই দুঃখিত হ'য়ে ফিরে এলেন।

এখন হ'য়েছে কি—সেই ছাইগাদা থেকে একটা আমগাছ বেরুল, এবং দেখতে দেখতে দু'একদিনের মধ্যে ঐ গাছ খুব বড় হ'য়ে গেল। গাছে উঁচু ডালে একটি আম দুলতে লাগল। কি সুন্দর! এমন আম কেউ কখনও দেখেনি। দূর-দূরান্তর হোতে লোকজন সব আম দেখতে আসতে লাগল কিন্তু কেউ পাড়তে সাহস করলে না, এ যে রাজার গাছের আম!

(ক্রমশঃ)

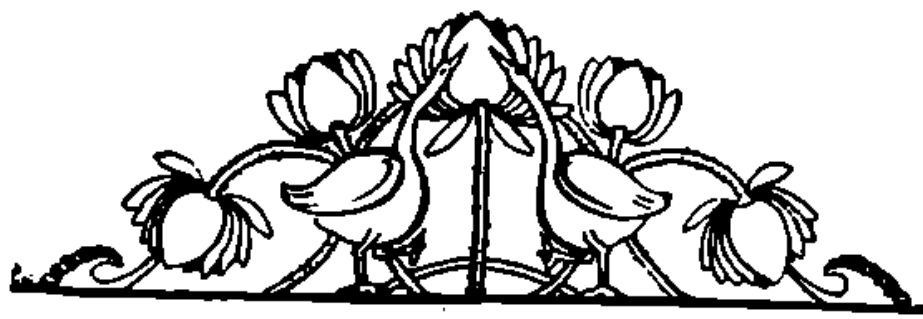

বঙ্গলক্ষ্মী

"আমি তাই আমাদের দেশের মা-বোনদের অনুরোধ করছি, জেগে উঠুন, প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলা-সমিতি স্থাপন করুন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচারে দেশ ছেয়ে ফেলুন, তা ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন, মনুষ্যত্ব ফুটুক আধীনতার আশা করি না কেন, সবই বিফল হবে।"

—সরোজনলিনী

৪র্থ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৭ [দশম সংখ্যা

স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার

ডাঃ শ্রী পঞ্চানন নিয়োগী পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস

গত কয়েক মাসের মধ্যে আমি ৩ই স্থানে দুইটি তর্কসভায় (Debating Society) 'স্ত্রীজাতি পুরুষের সমান অধিকার পাইবার অধিকারী' (Women should have equal rights with men) এই বিষয়ে তর্ক শুনিবার সুযোগ পাইয়াছি। উভয় সভাতেই যুবক ও বৃদ্ধ এই দুই শ্রেণীর লোকই উপস্থিত ছিলেন এবং দুই সভাতেই স্ত্রীজাতির সমান-অধিকারের পক্ষপাতী দলেরই ভোটে জিত হইয়াছিল। সমাজসংস্কারকগণ এবং মাতৃজাতি এখন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন যে আজকালকার হাওয়া পুরুষ-মহলে তাঁহাদের স্বপক্ষেই ফিরিয়াছে। দুই সভাতেই আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই জন্য আমাকে ভোট দিতে হয় নাই। তবে সভাপতির অভিভাষণে আমি দুই পক্ষের কথা বুঝাইয়া দিবার সময় (Summing up) যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহাতে যে দল হারিলেন সে দল সভান্তে আমাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে আমি স্ত্রীজাতির সমান-অধিকারের পক্ষপাতী দলের অন্যতম—এটা তাঁহারা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকা সেরূপ চতুর বা আবিষ্কারক কি না জানি না—তবে এখানে দুই পক্ষের কথাই নিরপেক্ষভাবে আমি বলিবার চেষ্টা করিতেছি। এখন তাঁহারা মিলাইয়া দেখিবেন যে তাঁহারা প্রত্যেকে কোন্ পক্ষীয়। স্বপক্ষ ও বিপক্ষ এই দুই দলের মতামতের মধ্য দিয়া বক্তব্যটি বুঝাইতেছি। এখানে জানাইয়া রাখিতেছি যে 'স্বপক্ষ' অর্থে স্ত্রীজাতির সমান-অধিকারের পক্ষপাতী দল, এবং 'বিপক্ষ' মানে তাহার বিরোধী।

কথাটা একটু বিশদভাবে বুঝিতে হইলে অধিকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়া তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর

অধিকার লইয়া আলোচনা করিলে সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার সুবিধা হইবে। সেইজন্য আমি অধিকারগুলির নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করিলাম।

(১) শিক্ষা, বিশেষতঃ উচ্চ ও উচ্চতম শিক্ষালাভের অধিকার।

(২) বাহিরে গমনাগমনের অধিকার।

(৩) স্বাধীন জীবিকা-অর্জ্জনের অধিকার।

(৪) বিবাহগত অধিকার

(৫) বিষয়-সম্পত্তি লাভের অধিকার।

(৬) রাজকীয় অধিকার।

(৭) সামাজিক ও নৈতিক অধিকার।

এখন এক-একটি করিয়া বিচার করা যাউক যে এই প্রত্যেক শ্রেণীর অধিকার সম্বন্ধে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সমতা থাকা উচিত কি না।

শিক্ষা, বিশেষতঃ উচ্চ ও উচ্চতম শিক্ষালাভের অধিকার

মেয়েদিগকে যে কিছু প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া উচিত এ সম্বন্ধে শিক্ষিতসমাজে মতভেদ এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। স্বপক্ষ ও বিপক্ষ এই দুই দলই এ বিষয়ে একমত। অর্থাৎ মেয়েরা চিঠিটা-পত্রটা লিখিতে পারেন, দুই একখানা বইও পড়িতে পারেন—এইরূপ শিক্ষা মেয়েদের হইলেই যথেষ্ট হইল—বিপক্ষ-পক্ষীয়েরা এতটা দূর যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু তাহার বেশী যাইতে মোটেই রাজী নহেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কোনও প্রয়োজন আছে তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের ধারণা যে উচ্চশিক্ষিতা, বিশেষতঃ ইংরাজি-শিক্ষিতা নারী বিলাসিনী, স্বাধীনতা-বিহীনা, গৃহকর্ম্মে বিমুখী এবং আত্মীয়স্বজনের সেবা ও শুশ্রূষাকার্য্যে অনাস্থাহীনা; উচ্চশিক্ষায় স্ত্রীজাতির স্ত্রীসুলভ গুণরাশির লোপ অবশ্যম্ভাবী; নবেল-নাটক পাঠেই তাঁহাদের দিন যায়, বেসুরাই তাঁহাদের জীবনের চরম-লক্ষ্য, গৃহকার্য্য কি-চাকরেরই উপযুক্ত বলিয়া তাঁহারা তাহাতে অনাস্থাহীনা।

স্ত্রীজাতির সমানাধিকারের পক্ষীয়েরা বলিলেন যে উচ্চ-শিক্ষা যদি পুরুষের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়, তবে স্ত্রীজাতির পক্ষে উহা অমঙ্গলদায়ক হইবে কেন? উচ্চশিক্ষা মেয়েদের মধ্যে সমধিক প্রচলিত না হওয়াতে যে স্বল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রীলোক আছেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি স্ত্রীসুলভ গুণের অধিকারিণী না হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাতে উচ্চশিক্ষার দোষ সপ্রমাণিত হয় না। উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের সহিত মেলামেশার সুযোগের অভাবে অনেকেই তাঁহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে আদর্শ গৃহিণী বহু মিলে। বাহিরে বাহির হইতে হইলে পোষাকের পারিপাট্য স্বতঃই আসিয়া পড়ে। তাহাতে তাঁহাদের অন্তরের হীনতা কোনও ক্রমেই সূচিত হয় না। বহু শিক্ষিতা নারী নিজ-হস্তেই রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম ও পুত্রকন্যা পালন করিয়া থাকেন এবং এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান যথেষ্ট থাকাতে তাঁহারা ঐরূপ গৃহকার্য্য অধিকতর নৈপুণ্য ও শৃঙ্খলার সহিত করিতে সমর্থ। শিক্ষিত পুরুষের অশিক্ষিতা স্ত্রী অনেকস্থলে একটা ভয়ানক বিড়ম্বনা। এরূপ বিবাহে কোনও ক্রমে সংসার চলে বটে, কিন্তু সেই দম্পতির মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির সমতা (Intellectual partnership) থাকিতে পারে না। এইরূপ স্থলে স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী হইতে পারেন, সহকর্ম্মিণী হইতে পারেন না। পুরাকালে এই ভারতবর্ষেই মৈত্রেয়ী, গার্গী, খনা প্রভৃতি বিদুষী রমণীর পরিচয় পাওয়া যায়। এখন উচ্চশিক্ষা-লাভের পথ সহজ হওয়াতে উহাদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিবে ও চলা উচিত।

উচ্চতম শিক্ষা সম্বন্ধে মতভেদ আরও প্রবলতর। বি-এ, এম-এ পাশ করা প্রধানতঃ অর্থোপার্জ্জনের জন্য। মেয়েরা যখন জীবিকার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষের মুখাপেক্ষী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীতে তাঁহাদের প্রয়োজন কি? স্বপক্ষীয়েরা বলিলেন যে মেয়েরা উপার্জ্জন করিতেই বা পারিবেন না কেন? তাহাতে পুরুষদের আয়ের পথা কিছু কমিতে পারে কিন্তু পুরুষকে এই একচেটে অধিকার কে দিয়াছে? তাহার উপর আরও কথা এই যে উচ্চতম শিক্ষা শুধু অর্থোপার্জ্জনের সেতুমাত্র নহে—জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানবৃদ্ধির উপায়ও বটে। মেয়ে-ডাক্তার মেয়েদের চিকিৎসার জন্য

নহিলে তাঁহাদের স্বাধীনতা পূর্ণভাবে বজায় থাকে। মেয়ে-উকীলের কাছে মেয়ে-মক্কেল বিনাদ্বিধায় যাতায়াত করিতে পারেন। কত মহিলা-লেখক কত গ্রন্থই না লিখিয়া তাঁহার সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন। জগদ্বিখ্যাত করাসী নারী-বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরী রেডিয়ম আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান-

ডাঃ শ্রী পঞ্চানন নিয়োগী পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস

জগতে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। উচ্চতম বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের অধিকার হইতে স্ত্রীজাতি বঞ্চিত থাকিলে মাদাম কুরী প্রভৃতির সাধনার ফল হইতে জগৎ বঞ্চিত হইত। ইঁহাদের মতে উচ্চশিক্ষা, এমন কি উচ্চতম শিক্ষালাভের অধিকার স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সমভাবে সকলেরই থাকা উচিত এবং উহা সকল দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক।

বিপক্ষীয়রা বলিলেন, দেখুন, স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চশিক্ষা না দিয়া তাহাদিগকে শিল্প, গৃহকর্ম্ম ও ধর্ম্মশিক্ষা দিন। স্বপক্ষীয়েরা বলিলেন, বেশ ত, তা দিন না কেন? তা বলিয়া উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিবেন কেন? শিল্পশিক্ষা ছেলে-মেয়ে নির্ব্বিশেষে সকলকেই দেওয়া উচিত। ধর্ম্ম জিনিষটা কি মেয়েদেরই একচেটে? পুরুষের কি ধর্ম্ম নাই? স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন। আবার এ-সব শিক্ষা পাইতে হইলে উচ্চশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

কথায় মারপ্যাঁচের গোলে হরিবোল দিলে চলিবে না,—শিল্প ও ধর্মশিক্ষার অজুহাত লইয়া স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ-শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিলে চলিবে না।

সভাগুলিতে এ সম্বন্ধে একটা কথা উঠিয়াছিল এই যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই উচ্চশিক্ষিত হইলে তাহাদের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসার অভাব হইবে। স্ত্রী বিদ্যায় স্বামী সমকক্ষ হইলে স্বামীকে ভক্তি বা সেবা করিবে না। আমাদের অনেকেরই সহধর্মিণীর বিদ্যা 'কথামালা' পর্য্যন্ত। সেইজন্য নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে এ বিষয়ে মতামত দেওয়া অসম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে (বিপক্ষীয়গণের মতে—দুর্ভাগ্যক্রমে) যাঁহাদের উচ্চশিক্ষিতা গৃহিণী আছেন তাঁহারা অকপটে জানাইবেন তাঁহারা সুখী কি না, এবং তাঁহাদের সহধর্মিণীরা তাঁহাদিগকে ভক্তি বা সেবা করেন কি না। তাঁহাদের মুখে যাহা শুনা যায় তাহাতে এরূপ আশঙ্কা যে অনেক পরিমাণে কাল্পনিক তাহা ত মনে হয়। ব্যাপারটা যাহাই হউক—আমরা অনেকেই আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখি না। তবে সুশিক্ষিত পুরুষের পক্ষে অশিক্ষিতা স্ত্রীকে ভালবাসা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সুশিক্ষিতা স্ত্রীর পক্ষে সুশিক্ষিত স্বামীর প্রতি ভালবাসা অসম্ভব কেন হইবে? কোনও শিক্ষাই ত স্বামীকে অশ্রদ্ধা করিতে শিখায় না। পাশ্চাত্য দেশেও স্ত্রী বিবাহকালে স্বামীকে love and obey করিবে বলিয়া মন্ত্র পাঠ করে।

সবরকম মত কিছু-কিছু শুনিলেন। পাঠক-পাঠিকা কোন্ দলে?

বাহিরে গমনাগমনের অধিকার

ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বাহিরে গমনাগমনের অধিকার স্ত্রীজাতির আছে; আরব, মিশর, পারস্য, তুর্ক, আফগানিস্থান প্রভৃতি মুসলমানরাজ্য ও ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির মধ্যে অবরোধের প্রচলন। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে অবরোধপ্রথা মুসলমানের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং মুসলমান অধিকারকাল হইতে উহা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উত্তরভারতে এই প্রথার সমধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালা, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে উহার প্রচলন হিন্দুসমাজে নাই। ইহার কারণ এই যে উত্তরভারতেই মুসলমানপ্রাধান্য সমধিক প্রসারলাভ করিয়াছিল, দক্ষিণভারতে তাহা তদ্রূপ করে নাই।

সে যাহা হউক এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত থাকা উচিত, না স্ত্রীজাতির বাহিরে গমনাগমনের অধিকার থাকা উচিত। বিপক্ষপক্ষীয়েরা বলিলেন যে অবরোধপ্রথা খুবই ভাল—উহা ভারতের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের একটি নিদর্শন—উহা স্ত্রীজাতির সতীত্বরক্ষার প্রধান উপায়। পাশ্চাত্য দেশে উহা প্রচলিত না থাকাতে সেখানে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সতীত্বের আদর্শ খুব। স্ত্রীপুরুষের অবাধমিলনের অবশ্যম্ভাবী ফল অনাচার ও ব্যভিচার। যখন জীবিকার্জ্জনের জন্য পুরুষকে বাহিরে গমনাগমনের অধিকার দিতেই হইবে, তখন স্ত্রীজাতিকে পর্দ্দার অন্তরালে রাখিতেই হইবে। তা ছাড়া স্ত্রীজাতি অবলা, আক্রমণ হইতে আত্মদেহ রক্ষা করিতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম—এ অবস্থায় তাহাকে বাটীর বাহির হইতে দেওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে।

স্বপক্ষীয়েরা বলিলেন—তা কেন? স্ত্রীজাতি দৈহিক সামর্থ্যে যে দুর্ব্বল তাহা কে বলিল? বহু স্ত্রীলোক বহু পুরুষ অপেক্ষা বহুগুণ পরিমাণে বলিষ্ঠ। তাহারা যেকোন পুরুষকে বাহুবলে পরাস্ত করিতে সমর্থ। স্ত্রীজাতিকে অবরোধের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অবরুদ্ধ রাখার ফলে তাহারা স্বীয় হস্তপদসঞ্চালনের ক্ষমতার কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। পুরুষ দেখিয়া অন্দরে পলায়ন করাই স্ত্রীজাতির শালীনতার সম্যক পরিচয়—এই শিক্ষা পুরুষ স্ত্রীজাতিকে বহুকাল ধরিয়া শিখাইয়া আসিতেছে। তাহাতেই স্ত্রীজাতি অবলা। এইরূপ শিক্ষাসত্ত্বেও আমাদের দেশে বহু রমণী পূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে ও বর্ত্তমানে ক্রীড়াক্ষেত্রে বলশালিনী হইয়া গিয়াছেন। স্ত্রীজাতির দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক পদার্থ, উহা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সম্পূর্ণ অধীনে রাখিবার জন্য পুরুষের মিথ্যা রচনা মাত্র। পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা সর্ব্বত্র অবাধে যাইতেছে আসিতেছে, নানা ক্রীড়াকৌশলে তাহারা পারদর্শী। কোনও কোনও স্ত্রীলোক ইংলিশচ্যানেল সন্তরণ করিয়া পার হইতেছে, কেহ বা উড়োজাহাজে বিলাত হইতে ভারতবর্ষ বা আফ্রিকা মহাদেশের অপর-

প্রাণে পুরুষ অপেক্ষা দ্রুতগতিতে যাতায়াত করিতেছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যাঁহারা স্ত্রীজাতিকে অর্থাৎ জাতির অর্দ্ধেক অংশকে অবরুদ্ধ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা দেশের ও জাতির শত্রু।

অবরুদ্ধ স্ত্রীজাতির সতীত্বরক্ষার সামর্থ্য বেশী, সেটা স্বীকার্য্য। কিন্তু সে ক্ষমতা অর্জ্জিত নহে, সুযোগের অভাবই এরূপ দেহশুদ্ধিরক্ষার একটা প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য জাতির মতে শারীরিক শুদ্ধতা রক্ষা করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিবার প্রধান উপায়—মিলন। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যৌন-আকর্ষণ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই আকর্ষণ অতিক্রম করিবার উপায় যাহা পাশ্চাত্য জগতে স্থিরীকৃত হইয়াছে—তাহা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মিলন। শিশু-কাল হইতে স্ত্রীপুরুষ একত্র পালিত ও শিক্ষিত হইলে এবং পরে সমাজে তাহাদের নিয়ত দেখাশুনা হইতে থাকিলে ক্রমে তাহাদের মধ্যে যৌন-আকর্ষণ হইতে মুক্তি (immunity) জন্মে। আমাদের দেশে অবরোধপ্রথার প্রচলনের জন্য কোনও স্ত্রীলোককে ট্রাম, রেলগাড়ী বা অন্যত্র যাইতে দেখিলে অধিকাংশ পুরুষই হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকেন। সাহেবেরা কিন্তু রাস্তায় মেমসাহেব দেখিলে হাঁ করিয়া দেখিতে থাকেন না। তাহার কারণ এই যে ঐরূপ দৃশ্য বাল্যকাল হইতে তাঁহারা দেখিতে অভ্যস্ত।

বিপক্ষপক্ষীয়েরা বলিলেন, দেখুন, আমরা মেয়েদের অবস্থা পুঁটুলি অপেক্ষা হীন করিয়া ফেলিয়াছি। একটা পুঁটুলিতে টিকিট বাঁধিয়া রেলষ্টেশনে দিয়া আসিলে উহা পার্শেল-যোগে যথাস্থানে পৌঁছিবে, রাস্তায় নষ্ট হইবে না, খোওয়াও যাইবে না। কিন্তু একজন স্ত্রীলোককে যদি কাশীর টিকিট কিনিয়া হাবড়া ষ্টেশনে দিয়া আসেন তাহা হইলে তিনি রাস্তায় হয়ত নষ্ট হইয়া যাইবেন, খোওয়াও যাইতে পারেন। আর যদিই বা তিনি কাশী পৌঁছেন, তাহা হইলেও আত্মীয়-স্বজন অনেকস্থলে সন্দেহ করিবেন যে তিনি রাস্তায় হয় ত অপবিত্র হইয়া গিয়া থাকিবেন। আমরা মুখে বলি "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা" কিন্তু কাজে করি "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" তাহার ফল ভীষণ। যেমন পক্ষী পিঞ্জরে বসিয়া বসিয়া উড়িবার ক্ষমতা একেবারে হারাইয়া ফেলে, সেইরূপ স্ত্রীলোকও অবরুদ্ধ মহলে বসিয়া থাকিতে থাকিতে পায়ের ক্ষমতা ও ব্যবহার ভুলিয়া যায়। রাস্তায়, রেলপথে, ঘাটে-মাঠে তিনি আত্ম-রক্ষায় সমর্থ নহেন, এমন কি বিপদ হইলে দৌড়াইয়া পলাইতেও অক্ষম। রাস্তাঘাটে মেয়েরা "সজীব নগেন্দ্র।" বাটীতে ছেলে মরে, তবুও বাহির হইতে ডাক্তার ডাকিয়া আনিবার অধিকার মেয়েদের নাই। এমন কি ডাকাত পড়িলে রাস্তা দিয়া দৌড়াইয়া গিয়া পাড়া হইতে লোক ডাকিয়া জড় করিবার অধিকারও নাই। লোকে বলে, পল্লীগ্রামে মেয়েরা স্বাধীন। সব ভুল। সেখানে মেয়েদের ঘোমটার বহর সাধারণ একহস্ত পরিমাণ। বাটীতে জলের কল না থাকাতে পল্লীগ্রামে মেয়েদের দূর হইতে জল আনিতে হয়—উপায়ান্তর নাই বলিয়াই। সেখানেও কিন্তু মেয়েরা দলবদ্ধ হইয়া যায় না হয় ছোট ছেলেপিলে সঙ্গে যায়। আর রাস্তায় যদি দৈবাৎ কোনও পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে মেয়েরা বহু-দূর হইতে দেখা ঘোমটা দিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত সসঙ্কোচে রাস্তার একপাশে দাঁড়াইয়া পুরুষকে রাস্তা ছাড়িয়া দেয়।

বিপক্ষপক্ষীয় কাহারও কাহারও মত—মেয়েরা শিক্ষিতা না হইলে তাহাদিগকে বাহিরে গমনাগমনের অধিকার দেওয়া অনুচিত। স্বপক্ষীয়েরা দেখাইলেন, তা কেন হইবে। কয়েকটি মুসলমান রাজ্য ও উত্তরকারত ভিন্ন পৃথিবীর সর্ব্বত্র মেয়েদের যথেচ্ছা গমনাগমনের অধিকার আছে। তাহারা কি সকলে বি-এ, এম-এ পাশ? ওসব বাজে কথা। লোকাচার, দেশাচারই শাস্ত্র। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র যাহা প্রচলিত আমাদের দেশে তাহা নাই ইহাই লোকাচার। মুসলমান রাজ্যসমূহে স্ত্রীলোকে বাহিরে গমনা-গমনের ক্ষমতা পাইতেছে। ভারতেও তাহাদের সে ক্ষমতা পাওয়া উচিত।

বিপক্ষপক্ষীয়েরা বলিলেন, মশাই বেশ ত আছেন। আফিসে গেলেন, নিশ্চিন্ত রহিলেন বাটীতে গৃহিণী রান্না-বান্না করিতেছেন, আপনার জন্য জলখাবারের আয়োজন করিতেছেন। হারাইবার ভয় নাই, কাহারও দুষ্ট নজরের ভয় নাই। মেয়েদের স্বাধীনতা দিয়া ঝঞ্ঝাট বাড়ান কেন? স্বপক্ষীয়েরা স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন—তাহা

হইলে বলুন মেয়েরা সংসারের খাট-খাটির সামিল, গৃহের তৈজস মাত্র; মেয়েরা স্বাধীন সম্পত্তি, জঙ্গম জীব নহে; তাহাদের মনুষ্যত্ব বলিয়া কোনও জিনিষ নাই, পুরুষের দাসীত্বই অস্তিত্বের একমাত্র কারণ। দেশ-দেশান্তর, স্বভাবের শোভা, আনন্দ ও শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, এমন কি দেশসেবার কর্ম্মক্ষেত্রও পুরুষের একচেটিয়া সামগ্রী, মেয়েদের সে-সকলে কোনও অধিকার নাই। মেয়েরা কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে যাইলে আপনি ঈর্ষ্যায় (Jealousy) পুড়িয়া মরিবেন, আর আপনি রোজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে বাটীতে আসিলে আপনার স্ত্রী বিনিদ্র অবস্থায় আপনার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবেন এরূপ অবিচার "Man the Master" এই ভ্রান্ত ধারণাতেই সম্ভবপর হইয়াছে। সেবা-শুশ্রূষা মেয়েদের ধর্ম্ম সন্দেহ নাই,—পুরুষের ধর্ম্ম নহে কি? কার্য্যবিভাগের দরুন পুরুষ অর্থোপার্জ্জন উপলক্ষে বেশীক্ষণ বাহিরে থাকিতে বাধ্য, স্ত্রীজাতি গৃহকর্ম্ম ও পরিজনবর্গের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত, তাই বলিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবার অধিকার আপনাকে কে দিল, সমস্ত পৃথিবী তাহার কাছে নিষিদ্ধপদার্থ কেন হইবে? চক্ষু থাকিতে তাহার অন্ধত্বপ্রাপ্তি কেন হইবে? তাহাকে স্বভাবের এই অফুরন্ত শোভাদর্শনের তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত রাখিবার অসাধু ইচ্ছা আমাদের যেন কাহারও না হয়। জাতির অর্দ্ধেককে অসাড়, নিষ্পন্দ ও নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিলে দেশের যে সমূহ অমঙ্গল।

সভায় একজন মধ্যপন্থী দেখা গেল, যাঁহারা পাশ্চাত্য জাতিদের মত স্ত্রীজাতিকে অতটা স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু অবরোধপ্রথারও সমর্থক নহেন। তাঁহাদের মতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অবাধমিলনে যৌন-আকর্ষণ হইতে মুক্তিলাভ হয় না, উহাতে ভোগের আতিশয্য হেতু বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। অপর দিকে স্ত্রীজাতিকে অবরুদ্ধ রাখিয়া তাহাদিগের দেহ ও মনকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিতেও তাঁহারা আদৌ প্রস্তুত নহেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে অবরোধপ্রথার প্রচলন নাই, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অবাধমিলনও নাই। এইরূপ মাঝামাঝি বয়সের স্ত্রীস্বাধীনতায় পক্ষপাতী এই মধ্যপন্থীর দল। আপনি স্বপক্ষীয়, বিপক্ষীয়, না মধ্যপন্থী?

(ক্রমশঃ)

গীতা

শ্রী আশুতোষ সান্যাল

গীতার দীপকরাগ কে গাহিবে আর,
মর্ম্ম তায়তে? জীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার,
উৎসাহ-উদ্যম-আশা-কর্ম্মশক্তিহীন,
যারা মরণেরি লাগি' শুধু গোণে দিন,
দুর্ব্বহ—দুঃসহ তার যাদের জীবন,—
আশৈশব করে যারা মৃত্যু অনুক্ষণ
উদরান্ন-তরে,—হায়! তাহাদের মুখে
পাঞ্চজন্য প্রতিধ্বনি হবে কোন্ যুগে!
যাহাদের মুখে শুধু প্রাকৃতের বুলি,
কে দিবে তাদেরে আজি জাগাইয়া তুলি',
আগাইয়া জগতের পথে?—দিবে গতি,
দিবে প্রাণ, দিবে জ্ঞান, দিবে নব জ্যোতি?
এস তুমি হৃষীকেশ! এস এই দেশে
গীতামন্ত্র উচ্চারিয়া পার্থসখির বেশে।

যুগ-স্বপ্ন

শ্রী জ্যোতীন্দ্র দাসগুপ্ত

১

বহুকালের পুরাতন গ্রাম, তার বুকের ওপর নানা যুগের নানা তাঙাগড়ার স্মৃতি এখনও সুস্পষ্ট বিদ্যমান। গ্রামের অধিকাংশে অধিবাসীরাই সহরের বুকে আশ্রয় লইয়াছে; অবশিষ্ট বর্ত্তমানে যা আছে তা শুধু কতগুলো পুরান বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, আর লোকের মধ্যে বাস করে সামান্য কয়েক ঘর হিন্দু-মুসলমান।

হিন্দুদের প্রায় বাড়ীতেই পুরুষমানুষের বড় একটা সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, বিধবার সমষ্টিতেই সেসব বাড়ী পরিপূর্ণ।

গ্রামের জমিদার-বাড়ীটী বেশ দেখিবার মতই একদিন ছিল, কিন্তু এখন তারও অবস্থা সংস্কারঅভাবে জরাজীর্ণ। কিন্তু নব্য জমিদার তার আশা একেবারে ত্যাগ করেন নাই, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি গোমস্তা আর একজন ভৃত্যকে কর্ম্মচারীরূপে সেখানে রাখিয়াছেন। বৎসরান্তে পূজার সময় বাবুরা মাত্র একবার বাড়ী আসেন, এবং সেই-জন্যই ঐ ভৃত্য আর গোমস্তার পেছনে যা খরচ।

বাড়ীটি সাহেবী ধরণে তৈরী। সম্মুখে সুবৃহৎ পুষ্পোদ্যান নানাজাতীয় ফলফুলের গাছে ছায়াচ্ছন্ন। একটু দূরে একটা পুকুর, এবং ঠিক তার অপর পারেই খোলামাঠ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

মাঠের মাঝখানে একটা বহুপুরাতন প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-বৃক্ষ—চোখে পড়িলেই মনে জাগে বহুকালের বহুরকম কথা। পুকুরপাড় হইতে তার দূরত্ব দুই-তিন শত গজের বেশী নয়।

বহুদিন হইতেই একটা প্রবাদ চলিয়া আসে—ঐ মাঠের অশ্বত্থগাছটায় নাকি ভূতরাজ্যের ভূতের আড্ডা। সংবাদটার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত করিবার সাহস যাহাদের ছিল না, তাহারা ঘোষেদের বাড়ীর জ্যোঠিমার কাছে ঐ অশ্বত্থবৃক্ষের ভূতজাতীয় ইতিবৃত্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে শ্রবণ করিত। জ্যোঠিমা বলিতেন অনেক কথা—"কেমন করিয়া ভূতের প্রণয় হয়, কত রকমের ভূত ঐ গাছে আড্ডা গাড়িয়াছে, ভূতে ভূতে কলহ বাধিলে কি-রকম ব্যাপার দাঁড়ায়, যে মানুষের ওপর তাহাদের আক্রোশ হয় তাকে তারা কেমন করিয়া হত্যা করে, কোন্ ভূতের পাল্লায় পড়িলে আর বাঁচিবার আশা থাকে না" ইত্যাদি। ভূতগোষ্ঠির বাড়ী-নক্ষত্র তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া ফেলিতেন, "আমি তো অনেকদিনই অন্ধকারে ঐ গাছটার তলায় যাই—"

ভূতগোষ্ঠির অনেকের সঙ্গেই নাকি জ্যোঠিমার আলাপ আছে। ছেলেদের কথা বরং ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু জ্যোঠিমার ব্যাখ্যার বাঁধুনীতে ওসব শুনিয়া অভিবৃদ্ধদের মনেও এক-আধটুকু খট্‌কা লাগিত।

পূজার অনেক পূর্ব্বেই এবার জমিদারপুত্র লালমোহন বি-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে আসিয়া আড্ডা গাড়িল। বোধ হয় গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার মানসেই অকস্মাৎ তার এ আগমন।

জমিদার-বাড়ীর দক্ষিণপূর্ব্ব কোণের অনতিদূরের বাড়ীটা ছিল রায়েদের, সে বাড়ীর একটি মেয়েও আবার বেথুন কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষা শেষ করিয়া ভাইদের সঙ্গে বাড়ী আসিয়াছে। লালমোহন তাহার বাল্যসাথী।

ইহাদের এইরূপ আগমনে গ্রামে যেন একটা নূতন-রকমের আকর্ষণ দেখা দিল, কিন্তু জ্যোঠিমার ইহাতে বিশেষ সুবিধা বলিয়া বোধ হইল না। তার প্রধান কারণ, শিক্ষিত অথচ সহরে লোক-জনের সমাগম তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তর্কে তাঁকে গ্রামের লোকে পরাস্ত করিতে পারে না, কিন্তু সহরে ছেলেছোকরাদের কাছে জ্যোঠিমা অনেকবার আধাঘোক বনিয়া আসিয়াছেন, এবং সেই জন্যই এইসব লোককে তিনি দুই-চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কাজেই তাঁহার জমিদার-

পাড়ায় পা-বাড়ানই যেন বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাও তিনি বাহির হইতেন বিশেষ সাবধানে, যেন সাপের সঙ্গে বেজের দেখা হইবার মত ভয়ে ভয়ে পথ বাঁচাইয়া।

জমিদার-বাটীর পুকুর ব্যতীত গ্রামের অন্য কোথাও বিশুদ্ধ পানীয় পাইবার ব্যবস্থা ছিল না। জ্যোতিষার বিধবা কিশোরী পুত্রবধূ প্রত্যহ এই ঘাট হইতে জল লইয়া যাইত। একদিন কি একটা কারণ বশতঃ সে ঘাটে আসিতে না পারায়, জ্যোতিষাই সন্ধ্যার অন্ধকারে পুকুর-ঘাট হইতে জল লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

জল লইয়া বাড়ী ফিরিয়াই সেদিন হঠাৎ জ্যোতিষার মাথায় কুত সম্বন্ধে এক নূতন তত্ত্ব গজাইল, তাই জলের কলসীটি বারান্দায় নামাইয়াই তিনি পাড়ায় চলিলেন—আবিষ্কৃত বিষয়টির বহুল প্রচার করিতে।

পরদিন ছোট ছেলেমেয়েদের দলে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। জ্যোতিষা নাকি দেখিয়াছেন, অশ্বত্থগাছের একটা কুত আর একটা পেত্নী জমিদারদের বাগানের আমগাছে ধারা বাঁধিয়াছে। ইহারা নাকি শিক্ষিত এবং উচ্চশ্রেণীর কুত, অশ্বত্থগাছের অশিক্ষিত কুতপেত্নীর সঙ্গে ইহাদের বনিবনাও না হওয়াতেই জমিদারদের আমগাছে ইহাদের আকস্মিক আগমন। কথাটা লালমোহনের কানে পৌঁছিতেই সে উচ্চহাস্য করিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

২

দূরে বহুবিস্তীর্ণ মাঠের বৃক্ষশাখার অন্তরালে দিনের সূর্য্য অস্ত গিয়াছে—সন্ধ্যা রাত্রির দিকে পা বাড়াইল।

বৈশাখের জ্যোৎস্নাহসিত রজনীর প্রথম প্রহর। গরমের অসহ্য তাড়নায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া লালমোহন ও সুলেখা গৃহ-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া একটা বেঞ্চিতে পাশাপাশি উপবেশন করিল।

বসিয়াই একটু ব্যস্ত ব্যগ্রভাবে সুলেখা কহিল, "আচ্ছা এ সব কি অন্যায় দেখ দেখি?" লালমোহন মুচ্‌কি হাসিয়া উত্তরে বলিল, "কি অন্যায়?"—"বোঝ্‌ছি যে গ্রামের লোক-গুলোর কি কোনকালেই আক্কেল-বিবেচনা কিছু হবে না নাকি? কাল কয়েকজনার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম, এমন মোরো যে দেখলেই গা শিউরে ওঠে। তাব্‌লাম কয়েকটা কথা বলি। কিন্তু কথা বোল্‌বো কাকে? আমায় দেখেই তো সব বার-বার মতন ঘরের দোর আগ্‌লাবার ব্যবস্থা কোর্ত্তে লাগলো, যেন বিদেশে বিশেষতঃ স্কুলকলেজে প'ড়েই আমরা কি একটা ঘোরতর অপরাধ ক'রে বসেছি, জাতিতে যেন ম্লেচ্ছ অপেক্ষাও হীন অথচ ভয়াবহ! এমন সব—কেন বল তো?"

লালমোহন খানিকটা উচ্চহাস্য করিয়া উত্তরে বলিল—"নিতান্ত স্বাভাবিক। এবং এ আমি বহুদিন পূর্ব্ব থেকেই জানি ব'লে ওসব দিকেই যাড়াই না। তোমার মত সব বাবে পাগলামি, তাই ওদের সঙ্গে যাও মৈত্রী স্থাপন কর্ত্তে! তবু ভাগ যে অক্ষতশরীরে ফিরে এসেছ। ভালই ক'রেছে,—আর যেন দিকে পা দিও না।"

"তার মানে?"

"মানে আবার কি? মেলামেশা করবার মত যদি একটি মহিলাও তুমি পাও, তখন বোলো; হয় ত মনে ভাবছো, ওদের সঙ্গে মিশে ওদের গতিবিধি বদ্‌লে দিবে, মহা শিক্ষিতা, সুহসিকা, স্ব-তন্ত্রা এক-একটি তোমার মত ক'রে গ'ড়ে তুলবে; কিন্তু সেটা তোমার ভ্রান্তি। শিক্ষা ব্যাপারটাকেই যারা সর্ব্বত্র ভয় করে তাদের মস্তিষ্কে শিক্ষার প্রভাব জাগান কি সহজ কথা?"

কথাগুলি শুনিয়া সুলেখা হাসিল। লালমোহন যেন বিরক্ত হইয়াই সুলেখাকে বলিল—"নিতান্ত ছেলেমানুষ তুমি তাই এই ক্ষুদ্র ব্যাপারের জন্য মাথা ঘামাচ্ছ, আর ভাবছো 'একটু চেষ্টা কোর্লেই শিক্ষার প্রভাবে এদের কুসংস্কার দূর হ'য়ে যাবে'। কিন্তু তা যে কিছুতেই হবে না, এবং ওদের মাথায় যে তুমি শিক্ষার উপকরিণ কোনমতেই ঢোকাতে পারবে না তা না বুঝেই খানিকটা হেসে বেমালুম আমার কথাগুলিকে উড়িয়ে দিচ্ছ?"

উত্তরে সুলেখা সহজ-কণ্ঠে বলিল—"আচ্ছা, তা হ'লে কি তুমি বল, এরা আজীবন এমনি থাকবে? এদের কুসংস্কার দূর করবার উপায় কি তোমরাও একটা কিছু কর্ত্তে পার না? আমিও তোমার সঙ্গে থাকবে, করোই না এই ব্যাপার-নিষ্পত্তির একটা উপায়?" বলিয়া সে লালমোহনের মুখের দিকে তাকাইল।

লালমোহন হঠাৎ এ কথাটার উত্তর দিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া শেষে সে বলিল—"দেখ, চেষ্টাটা হয় তো অনেকেরই সাধ্যাতীত নয়; আসল কথাটা হ'চ্ছে কি জানো, এরা হ'য়েছে সব যেমনি মূর্খ তেমনি নির্দ্দোষ। সব চাইতে এদের দোষ জ'মে উঠেছে সঙ্কীর্ণতা, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এদের অজ্ঞানতাও বেড়ে আসছে বহুকাল থেকে। তারপর আরও একটা ব্যাপার হ'চ্ছে, এই সব মাতোব্বর-শ্রেণীর লোকগুলোকে নিয়ে। কারণ এরাই হোচ্ছে অধম, এবং বয়ঃকনিষ্ঠদের কর্ত্তা-কর্ত্তা। কাজেই এদের কথা মেনে চলতে হয় গ্রামের প্রায় অধিকাংশদেরই। আর তার ওপরে রয়েছে, ব্রাহ্মণদের জাত-মানার ভীষণ শাসন। কাজেই এদের মানুষ করা খুব সহজ নয়। তবে খুব শারীরিক পরিশ্রম এবং অনেক অর্থ ব্যয় কর্লে শেষে কি রকম দাঁড়াবে তা বোলতে পারি না, কিন্তু ততটা পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় ক'রে এমনি একটা বাজে কাজ করবার মত স্পৃহা আমার আদৌ নেই।"

কথাগুলি সুলেখার কানে হয় তো ভাল লাগে নাই কিন্তু সেজন্য সে ইহার কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়াই সেদিন চলিয়া গেল।

সুলেখা চলিয়া গেলেও লালমোহন সেদিন অনেকক্ষণ বাগানে রহিল এবং মনে মনে সুলেখার কথাটা আলোচনা করিতে লাগিল। সে জানিত, এই সুলেখার স্বদেশসেবার প্রতি কি উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা কতদিন হইতে তিলে তিলে বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রতি কাহারও ঔদাসীন্য দেখিলে সুলেখা সহ্য করিতে পারিত না, অথচ লালমোহন সে সব জানা সত্ত্বেও সুলেখার কাছে অম্লানবদনে দেশের প্রতি ভিন্নভাব প্রকাশ করিয়াছে; লালমোহন দুঃখিত হইল।

ক্রমশঃ চিন্তার পর তাহার বন্ধিকের চিন্তা ক্রমশঃই বাড়াইয়া যাইতেছিল। সে ভাবিতেছিল,—গ্রামের কুসংস্কার দূর করা কেমনই বা যাইবে না? আজ দেশে প্রাচীনের স্থান কোথায়? যুবক বিশেষতঃ জমিদারপুত্র সে, সৎভাবে, সৎযুক্তি দ্বারা গ্রামের যুবকদের হাত করিতে তাহার এমন কি পরিশ্রম? না—যা ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, ব্যবস্থা একটা যা-হোক করিতেই হইবে…।

একটা দিন একটা রাত্রি লালমোহনের গভীর চিন্তায় কাটিয়া গেল। উদ্দেশ্য—গ্রাম সম্বন্ধে একটা কিছু সুশৃঙ্খল সমাধান প্রচেষ্টা। কারণ সে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে, সুলেখার ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া কিছুতেই সে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না।

কয়েকদিন অতিবাহিত হইবার পর একদিন একটা মতলব ঠিক করিয়া সে গ্রামের বন্ধুস্থানীয়দিগকে ডাকাইয়া, বাহিরের ঘরে বসিয়া, গ্রামের উন্নতিকল্পে একটা মন্তব্য পেশ করিতেছিল; এমন সময়ে রমেশ আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিয়াই সকলে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"আরে,—তুমি এলে কবে?"

"আজ ভোরে"—বলিয়াই রমেশ করাসে গিয়া বসিল।

লালমোহন বলিল—"কৈ সমস্ত দিনটায় তো একবারও দেখা দিলে না?" বলিয়াই শেষে সে বলিল, "ভাল ত সব?"

—"আমরা আবার মানুষ, তার আবার ভাল আর মন্দ!—যাক্ তোমরা নাকি এদিকে থিয়েটারের ক্লাব কর্চ্ছ, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা কর্চ্ছ? এ সব কুবুদ্ধি তোমাদের মাথায় জোকালে কে?"

লালমোহন একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—"এসব কুবুদ্ধি মানে?"

—"আরে না হয় সুবুদ্ধিই হোলো, কিন্তু সহরে মানুষ তোমরা, হঠাৎ এই জীর্ণ ভাঙা সরাইখানার প্রতি তোমাদের নজর পড়ল কি ক'রে?"

সুধীর বলিল—"নজর পড়াটা কি অন্যায়?"

—"আরে সব পাগল নাকি। অন্যায় কে বলে? আমি ভাবছি যে শুধু হুজুগ পর্য্যন্তই না সব শেষ হ'য়ে যায়। নইলে গ্রামের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করাটা তো অধর্ম্ম পিতামাতাকে লালন-পালন করবার মতই একটা প্রয়োজনীয় কাজ তা সকলেই জানে।" এই বলিয়া সে পকেট হইতে নস্যির ডিবা বাহির করিল।

কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রমেশের পূর্ব্বজীবন-স্মৃতি লালমোহনের মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। এই রমেশ একবার এই গ্রামেরই সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে গিয়া গুরুজনের বিরাগভাজন হইয়াছে,—সহানুভূতির পরিবর্ত্তে দেশের লোক তাহাকে শুধু ঘৃণাই করি-

আছে। অবশেষে তার স্বদেশচেতা প্রাণ গ্রামের গণ্ডীতে আবদ্ধ না থাকিয়া দেশের কাজে কলকাতায় আসিতে গিয়া দুই-দুই বার জেল খাটিয়া আসিয়াছে, অথচ সংসারের চাপে এবং দরিদ্রতায় আজ সে পঙ্গু, তবুও তার উৎসাহ আজও মন্দ হয় নাই। ইহারাই মানুষ! ভাবিতে ভাবিতে লালমোহনের মন রমেশের প্রতি সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিতেছিল। তাই সে আজ রমেশকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিল—"আচ্ছা ভাই, তুমি এর একটা মতলব বাতলে দাও না? তোমার তো এদিকে বেশ উৎসাহ আছে—"

উত্তরে রমেশ বলিল—"উৎসাহ থেকেই বা কি কর্ত্তে পেরেছি আর না থেকেই বা কি কর্চ্ছি বল? তোমরা যদি কিছু কর্ত্তে চাও কর, আমি তোমাদের সঙ্গে থেকে, ক্ষুদ্র শক্তিতে আমার যা কুলোয় তা কোরবো।"

কথাটা শুনিয়া লালমোহন অত্যন্ত খুশী হইল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না।

সুধীর বলিল—"তা হ'লে আমাদের কার্য্যতালিকাটা একবার প'ড়ে দেখ, যদি তোমার কিছু বলবার থাকে বল।" বলিয়া সেখানা একটা হাল-ফুলস্কেপ কাগজের সিট তাহার হাতের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

রমেশ তাহা তুলিয়া লইতেই সভার সকলে তার মুখের দিকে উৎসুকনয়নে চাহিয়া রহিল।

কার্য্যতালিকাখানা পড়া হইলে রমেশ প্রায় আধ ঘণ্টা খানেক ভাবিল, তারপর বলিল—"মতলবগুলো সমর্থন কোরবার যোগ্য বটে; কিন্তু প্রধান কথা হোচ্ছে

[illegible] লালমোহনের প্রশ্নই হইয়াই ছিল, তাই কথাটা [illegible] পৌঁছিয়াই সে বলিল,—"আমি সে ভার নিচ্ছি, রমেশকে তোমাদের কোন চিন্তা নেই।"

কথাটা লালমোহনের পক্ষে অসঙ্গত নয়। জানিয়াও, রমেশের কিছু হইলে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ তাহার মনে হইতেছিল, লালমোহনের এটা তার জীবনের একটা সময়ের সহানুভূতির কথা। তাই সে একটু গম্ভীর-ভাবে ধীরে ধীরে বলিল—"টাকা কি তুমি দিতে [illegible] তা হ'লে তোমার ছেলের [illegible] বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু কথাটা হোচ্ছে কি জানো,—" বলিয়াই সে ডিবা হইতে নস্য তুলিয়া নাকে গুঁজিল। ততক্ষণ সকলে তাহার প্রতি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে কম্পিতপ্রাণে চাহিয়াছিল।

রমেশ বলিয়া চলিল—"কথাটা হোচ্ছে এই যে, এর ভেতরে তোমার বাস্তবিকই প্রাণ আছে, না হুজুগের নেশায় মেতে উঠে তুমি এটা কর্চ্ছ?"

হয় তো এই ভয়টাই লালমোহনের মনে উঁকি দিতেছিল, তাই রমেশের কথা শেষ হইতেই সে যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ধীরে ধীরে সে তখন বলিল,—"তুমি যে এমন একটা সন্দেহ আমার প্রতি কোরবে তা পূর্ব্বে না ভাবা থাকলেও ভাবিয়ে দিয়ে ভালই করেছে। কিন্তু যদি আমাকে আজ তোমাদের বিশ্বাস করবার সাহস না থাকে, তবে আমি বোলতে চাই, এ কাজটায় মন দেওয়া আমার পক্ষে আজ হুজুগ নয়, এবং আমার দ্বারা এতে তোমাদের—"

কথাগুলি রমেশের মনে কাটিয়া বসিতেছিল। সে স্পষ্টই বুঝিতেছিল, সে লালমোহন এ নয়, প্রকৃতই ইহার মর্ম্মে আজ গ্রামের ব্যথা বাজিয়াছে। বুঝিয়া কথাটি শেষ না হইতে দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "কথা কর ভাই, আমি ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু এখন আমার বক্তব্য হ'চ্ছে, তবু তুমিই একা এতটা ভার স্বীকার কর্ত্তে যাবে কেন? বরং এইটা টাদার ব্যবস্থা কর; আমি অন্নবস্ত্রী হ'য়ে তোমাদের টাকা তুলে দেবার ব্যবস্থা কোরবো। তারপর যা লাগে তাই আমরা তুলি দিতে?" তারপর সে সুধীরের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তোমরাও কথাটা বুঝে দেখ না? কেন, আজ যদি গ্রামের লাইব্রেরীর জন্য, থিয়েটার-রাবের জন্য, [illegible] সমস্ত যায় যখন [illegible] তখন তোমাদের পক্ষে সেটা কি খুব গৌরবের কথা হবে? বরং তোমরা [illegible] যদি [illegible] কাজে [illegible] তোমাদের কাজ [illegible] একটা [illegible] তা একটা আমাদের আপনা থেকে [illegible] সকলে [illegible] করিয়া সকলে [illegible] চাঁদা তুলিবার [illegible] একটা [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] তার [illegible] হইল।

৩

জ্যোঠিমা ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন আমগাছের আগত ভূত ও পেত্নী লালমোহন আর বুলেশাকে পাইয়া বসিয়াছে। কথাটা তিনি তখনকার মত প্রচার করিতেও ক্ষুণ্ণ করেন নাই। কিন্তু যেদিন তিনি লক্ষ্য করিলেন যে গ্রামের প্রত্যেকটা ছোঁড়ার ঘাড় গ্রামের সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার উনক পড়িয়াছে তখন তিনি স্পষ্টই বুঝিয়া লইলেন, এ সবই সেই আমগেছো ভূতের কাণ্ড! জ্যোঠিমা গ্রামের ভেতরে একটা নামডাকা লোক। তাঁহাকে ভয় করে না এমন লোকই সে অঞ্চলে নাই, অথচ এই ছোঁড়াগুলা তাঁহাকে ভয় করা তো দূরের কথা, দেখিলেই হাসিয়া অস্থির হয়। ইহা ভাবিতেই জ্যোঠিমা অস্থির হইয়া উঠেন।

শূন্য ঘরে দুপুর রাতে সেদিনও ফেলির মা মৃত স্বামীকে লইয়া কতই না মুস্কিলে পড়িয়াছিল, জ্যোঠিমা যদি সে-দিন তাহার বিপদে গিয়া না বসাইয়া পড়িতেন, তবে তাহার সেদিন কি অবস্থা হইত? সম্পদে-বিপদে জ্যোঠিমা কাহার না উপকার করেন? কে না জ্যোঠিমার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া থতমত না খাইয়া যায়? আর সেই লোককে আজ এই ছোঁড়াগুলা ভয় করে না! দেখিয়া জ্যোঠিমার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। শেষকালে আমগেছো ভূতে এই ছোঁড়াগুলোর মাথা খারাপ করিল? ভূতকে শিক্ষা দিবার আক্রোশটাই জ্যোঠিমার প্রাণে বেশী করিয়া জাগে আর রাগে ফুলিয়া উঠেন। কিন্তু হাতের কাছে ভূতকে কোনদিনই পাওয়া যায় না বলিয়া, নিজের গালেই দুই চড় মারিয়া মাটিতে বসিয়া পড়েন।

সন্ধ্যা তখন নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। জ্যোঠিমা গরু-গুলোকে গোয়ালে তুলিয়া কেবল বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে ভাসানীর মা জ্যোঠিমাকে সংবাদ দিয়া গেল, গ্রামের ছেলেরা তাঁহার নিকট চাঁদা আদায় করিতে আসিতেছে। শুনিয়া জ্যোঠিমা তাহাকে কোন একটা প্রশ্ন করিতে যাই-বেন, এমন সময়ে দেখিলেন, অদূরে ঘোষ মশায়ের বাড়ীর মোড় ঘুরিয়া সত্য সত্যই গ্রামের একদল ছেলে তাঁহার বাড়ীর দিকেই আসিতেছে। জ্যোঠিমার যেন কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তিনি ছোঁড়াদের কাণ্ড দেখিবার জন্য, স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া তেমনই সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রমেশ এদলের পাণ্ডা ছিল, সর্ব্বাগ্রে সে-ই জ্যোঠিমার কাছে আসিয়া তাহাদের চাঁদার লিষ্ট দেখাইল। কে কত দিয়াছে তাহাও জানাইল। অবশেষে তাঁহার নামে পাঁচ-টাকা চাঁদা ধরা হইয়াছে বলিয়া চাঁদা আদায় করিবার জন্য সঙ্কল্পে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে জ্যোঠিমার বাহিরের বারান্দা গুলজার করিয়া তাহারা বসিয়া পড়িল। দেখিয়া শুনিয়া জ্যোঠিমার তখন মাথার আগুন জ্বলিয়া উঠিলেও, ভূতুড়ে কাণ্ড ভাবিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন। জ্যোঠিমার পতি-পুত্রহ-সঞ্চিত যথেষ্ট অর্থ সিন্দুকে থাকা সত্ত্বেও প্রাণান্তে তিনি তাহা খরচ করিতেন না। ক্ষেতের ধান দেবার অসময়ে ফুরাইয়া যাইত দেবার তিনি ফুন-চুড়ো খাইয়াই কোনমতে বাঁচিয়া থাকিতেন। বিধবা কিশোরী পুত্রবধূ, কোনও অভাব-অভিযোগে মাথা কুটিয়া মরিলেও তিনি এক-পয়সা বাহির করেন না। কিন্তু ইহাদের কাণ্ড দেখিয়া, সেই জ্যোঠিমার মনে আজ ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

ভূতে-পাওয়া লোকের যে মাথা খারাপ হইয়া যায়, ইহা জ্যোঠিমা পূর্ব্বেই ভাবিয়াছেন। কাজেই ইহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া কি করিবেন? অনেকক্ষণ ভাবিয়া তবুও জ্যোঠিমা একবারমাত্র অসম্মতি জানাইলেন। কিন্তু তার উত্তরে তিনি যখন শুনিলেন, চাঁদা না দিলে চলিবে না, এবং কম দিলেও চলিবে না, কারণ তাহারা অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা করিয়াছে; ইহা সত্ত্বেও না দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহারা রাতারাতি সিন্দুক ভাঙিয়া টাকা বাহির করিয়া লইতেও দ্বিধা বোধ করিবে না, তখন জ্যোঠিমার মনে প্রকৃতই ভয়ের উদ্রেক হইল।

ভূতে-পাওয়া ছোঁড়াদের দ্বারা ইহা অসম্ভব নয় ভাবিয়াই তিনি ঘরে গিয়া সিন্দুক খুলিয়া, টাকার থলি ঘাঁটিয়া বহু-কষ্টে পাঁচটি অর্দ্ধ-সংখ্যক টাকা আনিয়া ইহাদিগকে দিয়া বিদায় করিলেন।

কিন্তু ইহারা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই, ঐ পাঁচ-টাকার শোকে জ্যোঠিমা গ্রামের অভিভাবকদের প্রতি রীতিমত ক্ষেপিয়া উঠিলেন। এদের কেমন মা-বাপ? শাসন করিতে পারে না? ইহারা বুঝি বাড়ী বাড়ী

ডাকাতি করিয়া গ্রামের উন্নতিসাধন করিবে? এ আবার কোনদেশী উন্নতি? ঘরে ঢৌকাই জ্যোতিষার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল! তাই তিনি কোমর বাঁধিয়া পাড়ায় চলিলেন—ছোঁড়াদের অভিভাবকদের খুব খানিকটা শাসাইয়া আসিতে।

৪

যখন লালমোহনের চেষ্টায় দলবদ্ধ গ্রাম্যযুবকগণ গ্রামে-গ্রামে চাঁদা আদায় করিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল, তখন সুলেখাও একলাই নিজ বুদ্ধিবলে গ্রামের অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে একটা নূতন সাড়া জাগাইয়া দিতে কম চেষ্টা করে নাই।

প্রথমতঃ অনেকেই তাহাকে ভয় করিত, মিশিতে চাহিত না; অল্পবয়স্ক নববধূরা তো কেউ তার ছায়াই মাড়াইত না; স্নেহ ভাবিয়া কেউ কেউ আত্মরক্ষার জন্য তার পাশ কাটাইয়া চলিত; কিন্তু এরূপ অবস্থা খুব বেশী-দিন টিকিতে পারিল না।

প্রথমতঃ কথায়, শেষে অর্থে প্রলুব্ধ করিয়া, সর্ব্বোপরি আত্মীয়তা জানাইয়া যখন সুলেখা তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইল যে, তাহারা নিতান্ত মূর্খ এবং অপদার্থ বলিয়াই তাহাদের স্বামীরা তাহাদের প্রতি অত্যধিক অত্যাচার করে, এবং বনের পশু অপেক্ষাও তাহাদিগকে হীন বলিয়া মনে করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চক্ষে আঙুল দিয়া যখন কতক-গুলি ঐ রকমের ঘটনা তাহাদের সম্মুখে স্পষ্ট দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল, তখন অনেকের মনেই একটা কি-রকম যেন ঘাঁ ঘাঁ লাগিয়া গেল। এমনি ভাবে ধীরে ধীরে দুই-চার জনাকে সে যখন নিজের সঙ্গিনীরূপে পাইল, তখন তাহার কাজও জোরে চলিতে লাগিল। অবশেষে দেখা গেল, সুলেখা প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই প্রত্যেক বাড়ীতে-বাড়ীতে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করিয়া, কোন মেয়েকে গান, কোন বৌকিকে সেলাইয়ের কাজ, কোন বালক-বালিকাকে লেখাপড়া ইত্যাদি শিখাইবার কাজে ডুবিয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে গ্রামময় একটা নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। শিক্ষার প্রতি বিনীত নিবেদনে লালমোহন পৈত্রিক জায়গা-জমিতে প্রচুর শিক্ষিত এবং ভদ্র প্রজা আনিয়া বসতি করাইবার অনুমতি পাইল। ক্রমে ক্রমে শেষে লাইব্রেরী, থিয়েটারের ষ্টেজ, ভাইকল, খেলার মাঠের সরঞ্জাম ইত্যাদি কথা লইয়া গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল।

যাহারা ইতিপূর্ব্বে যুবকদিগকে তাচ্ছিল্য করিতেছিল তাহারাও ধীরে ধীরে আসিয়া ইহাদের দলে যোগ দিতে লাগিল।

বৃদ্ধ তর্কচঞ্চু মহাশয় রাগে দুঃখে ওঁহার আজন্ম-সঞ্চিত শাস্ত্র-পুরাণগুলিকে ছিঁড়িয়া টুকরা-টুকরা করিয়া আগুনে পুড়াইয়া দিলেন। যত সব ম্লেচ্ছের দল আসিয়া দলবদ্ধ হইয়াছে!—হিন্দুশাস্ত্রের চিরকালের সুনাম ইহারা নষ্ট না করিয়া ছাড়িবে না—ধর্ম্ম রসাতলে গেল—জাতের কোন বাছ-বিচারই আর ইহারা রাখিতে দিল না...

মতি ঠাকুর সবে পাড়াগ্রাম হইতে শ্রাদ্ধ সারিয়া ঘরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গৃহিণী তাঁহাকে দেখিয়াই চেঁচাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বলি, শ্রাদ্ধের দানের জিনিষ-পত্তরগুলো কি আগে পাঠিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরতে পারো না?"

ঠাকুর মহাশয় গৃহিণীর কথায় মনে মনে চটিলেন কিন্তু মুখে তবুও নরমগলায় বিমর্ষভাবে বলিলেন—"আর বোলো না গৃহিণী, কোন ব্যাটা যজমান আর ব্রাহ্মণকে মানতে চায় না, কি যে হোলো সব গ্রামে তা বুঝতেই পারি না। যদিও একটা কলসী আর একটা বকনা বাছুর পাবার কথা ছিল, তাও আর পেলাম না।"

গৃহিণী ইহা শুনিয়া মোটেই সন্তুষ্ট হইলেন না বরং হস্তের সম্মার্জ্জনী দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "মিন্‌সে কি পাগল হোলো নাকি? পাবার কথা ছিল তা দেবে না কি?—সব জাকামী হোচ্ছে যেন! শ্রাদ্ধে গিয়ে বামুনের ছেলে আবার শূন্যহাতে ঘরে ফিরে আসে, এমন কথা তো কোথাও শুনিনি; অন্ত কাউকে দান-খয়রাত ক'রে আসা হয় নি তো?

—"না গো—না! কেন বোকচো? সে যা ব্যাপার হোয়েচে তা আমিই জানি,—তুমি কী বুঝবে?"

শেষের কথাটায় মতি ঠাকুর বেশ জোর দিলেন বলিয়া গৃহিণী নরম হইলেন, এবং বলিলেন,—"কি ব্যাপার শুনি?"

মতি ঠাকুর বলিলেন—"সে আর বোলোনা, কি যেন

একটা মন্তর উচ্চারণ কর্ত্তে সুরু হ'য়েছিল, পারে তো সে বাড়ীর তিনতিনটে তিন্‌সেঁদে ছোঁড়া আমার মরে আর কি! কোনমতে ফিরে আসা গেছে। এখন পাখাটা দাও দেখি...”

গৃহিণী গম্ গম্ করিতে করিতে একখানা তালের পাখা পতি ঠাকুরের দিকে ছুড়িয়া দিয়া রন্ধনশালায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

• • •

কতক যুবকদের ভয়ে, কতক জমিদারের প্রতাপে কথিত কার্য্যপ্রণালী মানিয়া লইলেও, বদ্‌রাগী গগন মুখুজ্যে তাঁহার অষ্টবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ দিয়া গৌরীদানের পুণ্যফল অর্জ্জন না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে,—সম্মুখের সপ্তাহেই বিবাহ। বাড়ীতে বালিকা-বধূর মহা ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। সুলেখা সংবাদটা লালমোহনের কানে পৌঁছাইয়া দিল, এবং বলিল, এই বিবাহ পণ্ড করিবার জন্য যদি ভয়ানক একটা কিছু কাণ্ডও করিতে হয়, তবে তাহাই করিতে হইবে, পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না।

লালমোহন যেন আজকাল প্রস্তুত হইয়াই থাকে; সুলেখার খবরটা কানে পৌঁছিতেই সে গিয়া রমেশকে জানাইল। শুনিয়া রমেশ উত্তর দিল—“এতো একটা তুচ্ছ কাজ। বেশী কিছু নয়,—কি কোরবো জানো? ঠিক বিয়ের দিনে আমায় জানিও—আর কিছু নয়; বিয়ের আসনে বরকে বসিয়ে মন্তর পড়ান হ'চ্ছে এমনি সময়ে দলবদ্ধ হ'য়ে কয়েকজন মিলে বরকে গিয়ে বোল্‌বো যে, মশায় উঠে যান, এ বিয়ে কোরবেন না—ব্যস্! এর পরে যদি তাঁরা কথা না শোনেন বা একটা কিছু গোলযোগ করবারই তাঁদের ইচ্ছে থাকে তবে আমরাও ছেড়ে কথা কইব না, এবং তেমনভাবে আমরা আগে থাকেই প্রস্তুত হ'য়ে থাকবো। তবে এটা তুমি মনে ক'রো না যে সহজে আমরা কোন পক্ষের ক্ষতি কোরবো!”

কথা শুনিয়া লালমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া প্রস্থান করিল।

বিবাহের দিনে বিভ্রাট কিছুই ঘটিল না। বরকে রমেশ কথাটা বুঝাইয়া বলিতেই বরপক্ষ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, শুধু গগন মুখুজ্যে খানিকটা নিষ্ফল চীৎকার করিয়া গগন ফাটাইবার চেষ্টা করিলেন।

জ্যোতিষ এ সভায় উপস্থিত ছিলে।। তিনি শুধু এই কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। ইহাদের অসাধ্য তো কিছুই নাই! তাঁহার একমাত্র বিধবা পুত্রবধূকেও যদি ইহারা পুনরায় বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে? হায় হায়! ভূতে পাওয়া লোকের এতটা সাহস হয় না, নিশ্চয়ই ব্রহ্মদত্যি ইহাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে! কি সর্ব্বনাশ!

•

দুই বৎসর পরের কথা। গ্রাম এখন ছোট একটি সহরের আকার ধারণ করিয়াছে। মেয়েরা আজকাল দলবদ্ধ হইয়া স্কুলে যায়; বৌঝিরা আজকাল কড়ি-খেলার পরিবর্ত্তে নিভৃত দ্বিপ্রহরে শিল্পকলায় মনোনিবেশ করে; বৃদ্ধেরা আর তাস-পাশা খেলায় সময় নষ্ট না করিয়া পাঠাগারের মূল্যবান পুস্তকাদি লইয়া অবসর-সময় কাটায়।

যুবকের দলেও প্রচুর কাজ জুটিয়াছে,—অনেককেই আর পেটের তাড়ায় বিদেশে গিয়া পরের দাসত্ব করিতে হয় না। রমেশ আজকাল এ গ্রামের সমস্ত বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। বিদেশের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া তাহার দিন আজকাল কাটিতেছে সুখেই।

এখন বক্তব্যের বিষয় রহিয়াছে লালমোহন আর সুলেখাকে লইয়া।

গত দুই বৎসর ইহাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং চেষ্টায় গ্রামে আজ এই সমৃদ্ধি বিরাজমান, কিন্তু এই-খানেই কি জীবনের আকাঙ্ক্ষার শেষ? তা তো নয়! লালমোহনের মন তিলে তিলে ঔদাসীন্যে অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সুলেখার জন্য সে কি না করিয়াছে? অথচ সে কি তাহার দিকে একবারও দৃষ্টি ফিরাইবে না? তাহার দেখা পাওয়া কি এতই দুর্লভ? আজ লালমোহন গত-কালের পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিল,—“উঃ। এত পরিশ্রমের শেষ এই পুরস্কার!”

বন্ধুবান্ধবের ডাকে লালমোহন আর পূর্ব্বের ন্যায় সাড়া দেয় না। আহারে রুচি নাই। সমস্ত জগৎটাই যেন

কেমন একটা নৈরাশ্যের ঝাঁঝার মতন চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়।

তাহার এই ভাবান্তর অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বন্ধুবান্ধবেরা ইহার প্রতিকারের চিন্তাও করিতে লাগিল; শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা সুলেখার কানে গিয়াও পৌঁছিল।

• • • •

সেদিন কৃষ্ণপক্ষ কি শুক্লপক্ষ তা ঠিক মনে নাই। লালমোহন তাহাদের পুষ্পোদ্যানে বসিয়া আছে। উদ্যানের অবস্থাও আজকাল ফিরিয়া গিয়াছে। সুসজ্জিত বৈদ্যুতিক আলোর সজ্জায় সুবাসিত নানাবর্ণের পুষ্পরাজি যেন নাচিয়া নাচিয়া হাসিতেছে। এমন সময়ে সুলেখা সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং লালমোহনকে এক নিভৃত কোণ হইতে খুঁজিয়া লইয়া তাহার পাশে গিয়া উপবেশন করিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিল—"কি হয়েছে তোমার?"

লালমোহন একটু বিরক্ত ভাবে বলিল,—"কিছুই না।"

"তবে মেয়েদের স্কুলের প্রাইজ-ডিষ্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে এবার মন দিচ্ছ না কেন?

"ওসবে আর আমার এখন বিশেষ মন লাগে না। কি কোর্ত্তে চল না হয় তা তোমরাও যে না জানো কেউ, তাও নয়; কাজেই ওসব বাজে কথায় আমাকে আর জড়িয়ো না।"

কথাগুলি শুনিয়া সুলেখা মর্ম্মাহত হইল এবং বুঝিল গুরুতর কারণ কিছু ঘটিয়াছে। তাই সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে আবদারের সুরে বলিল,—"বল না কি হোয়েছে তোমার?"

প্রশ্নটা কানে পৌঁছিতেই উত্তরের পরিবর্ত্তে একফোঁটা তপ্ত অশ্রু লালমোহনের নয়ন হইতে নির্গত হইয়া সুলেখার বাহুর উপর নিপতিত হইল।

এই ব্যাপারে সুলেখার চরণতল হইতে যেন ভূমিও অপসারিত হইয়া চক্ষের সম্মুখে একটা কালো গহ্বর অকস্মাৎ প্রকাশিত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দুই-তিন দিন পূর্ব্বের লেখা, লালমোহনের চিঠিখানার কয়েকটা লাইন সুলেখার হৃদয়পটে ফুটিয়া উঠিল—

"আমি তোমায় যতটা ভালবাসি ততটা হয় তো তুমি কোনদিনই ভেবে দেখবার অবকাশ পাও নি। যদি আমাকে বঞ্চিত করাই তোমার উদ্দেশ্য তবে সেটা পূর্ব্বে থেকে আমাকে বুঝতে দেওয়া উচিত ছিল। কয়েকটা কথা তোমায় বোলবো ব'লে বহুদিন আমি একান্তে অপেক্ষা করেছি, অনেকবার খবরও পাঠিয়েছি; কিন্তু তুমি তা গ্রাহ্য কর নাই। আজ তবুও তোমায় এই শেষ চিঠিখানা দেবার লোভ সম্বরণ কর্ত্তে পারলুম না; যদি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবার অবসর না পাকে তবে এই চিঠিখানা হস্তগত হবার পরই দেখা করো। সব কিছুরই একটা সীমা আছে……"

কথাগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া সুলেখার অন্তরে একটা তীব্র অনুভূতির স্পর্শ মাখাইয়া দিতেছিল। চিন্তিতভাবে সে একবারমাত্র লালমোহনের মুখের দিকে চাহিতেই দেখিল,—তাহার মুখচ্ছবি ক্রমশঃই ম্লান অথচ কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

উপবেশনের আসন হইতে লালমোহন গাত্রোত্থান করিল, সুলেখা ডাকিয়া বসাইল না, ধীরে ধীরে সে উদ্যানের পথ অতিক্রম করিয়া চলিল, তবুও সুলেখা কিছু ডাকিল না, লালমোহন অদৃশ্য হইয়া গেল।

চিত্রার্পিতের মত সুলেখা শুধু সেই দিকে চাহিয়াই রহিল। সে যেন কি বলিতে চাহিতেছিল কিন্তু তাহার কণ্ঠ তখন বেদনায় অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে—ভাষা ফুটিল না।

বিদেশ-বিহার

শ্রী কনকলতা বসু

১লা জুলাই—সকালে মিঃ মেয়ার সঙ্গে দেখা হইল, ইনি এই হোটেলে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এখানকার ঘরগুলি খুব সাজান, ঘরে ঘরে টেলিফোন, কিছু দরকার হইলে টেলিফোন করিলেই তাহা পাওয়া যায়। এখানে সব জায়গায় স্নান করিবার আলাদা পয়সা দিতে হয়। স্নানের ঘর চাবিবন্ধ, স্নান করিতে চাই বলিলে, সে সমস্ত ঠিক করিয়া খবর দিবে। আমাদের মার্সেলস্ থেকেই এই কথাটি ফ্রেঞ্চে বলিতে শিখিতে হইয়াছিল।

এফেল টাওয়ার

সেক্রে কোয়ার গির্জা

নৌকা ভাসাইয়া খেলা করিতেছে, এগুলি এখানেই ভাড়া পাওয়া যায়।

পার্কের ধারে একটি পাথরের মস্ত ফলক আছে, ইহাতে পেঁচা, হাঁস, মানুষ ইত্যাদি যারা কিসব লেখা আছে। ইহা দুই-তিন হাজার বৎসরের পুরান, মিশরের গভর্ণরের দান।

২রা জুলাই—সারাদিন আজ অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে; আমরা বাহির না হইয়া জিনিষপত্র কতক গুছাইয়া লই-

রাত্রে ৯টার পর মাটির নীচের রেলে আমরা এখানকার কারনিভ্যাল দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা থিয়েটার বায়স্কোপের মত প্রত্যেক রাত্রে ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। সমস্ত পাকা তৈরী। আলোর বাহার খুব, নানা-রকম খেলা ইত্যাদি আছে। ভূগর্ভের ভিতর দিয়া যে রেলে আমরা এখানে গেলাম তার নাম মেট্রোপোলিটান, ইহাকে টুকে চলে, ইহা হইতে নামিয়া চলন্ত সিঁড়ি দিয়া আমরা আবার রাস্তার উপর উঠিলাম। এই সিঁড়ি একটি আশ্চর্য্য জিনিষ, ইহাকে সর্ব্বদা নড়িতেছে, তার প্রথম ধাপে পা দিয়া দাঁড়াইলে চক্ষের নিমেষে উপরে পৌঁছাইয়া দেয়। আমার কিন্তু উঠিয়াই মাথা ঘুরিতে সুরু হইল, তার যে বমিটা করে নাই তা বলিতে পারি না কিন্তু একটা নতুন জিনিষ দেখা হইল।

৩রা জুলাই—মিঃ মেয়া আমাদের মহাবীর নেপোলিয়ানের সমাধি দেখাইতে লইয়া গেলেন। এই প্রকাণ্ড সৌধের মাঝখানের বিশাল গম্বুজটি একসময়ে সোনার গিল্‌টি করা ছিল এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান ভিতরে অতি সুন্দর কাজ ও পেন্‌টিং করা। উপরের তলায় নেপোলিয়ানের দুই ভ্রাতার এবং আরও কয়েকজন বিখ্যাত জেনারেলের সমাধি আছে; সামনে গির্জ্জা। মাটির নীচে নেপোলিয়ানের লাল পাথরের অতি সুন্দর সমাধি,—ইহার চারিদিকে ইনি যেসব যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত নিশান রহিয়াছে। ইহার সামনে একটি ঘরে নেপোলিয়ানের টুপি, তলোয়ার, মেডেল ইত্যাদি অনেক নিজের ব্যবহৃত জিনিষ রহিয়াছে। এই সমাধিমন্দির-সংলগ্ন এক প্রকাণ্ড মিউজিয়ামে নেপোলি-য়ানের নিজের এবং সেই সময়ে ব্যবহৃত নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র নিশান ইত্যাদি অনেক জিনিষ আছে।

৪ঠা জুলাই—সকালে আমরা এখানকার একটি বড় দোকান দেখিয়া আসিলাম। এখানকার এক-একটি বড় দোকান ৬।৭ তলা, এক-একটি গ্রাম বিশেষ, অতি সুন্দর সাজান। আমাদের দেশের সাহেবী দোকানের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। কাপড়-চোপড় দেখিয়া এদের সুরুচির ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। অবশ্য এক-এক জায়গায় অশ্লীলও মনে হয়।

রাত্রে আহারের পর একটু বেড়াইয়া আসা গেল। দু'-হাত অন্তর থিয়েটার ও বায়স্কোপ কিন্তু কোথাও ভিড়ের কমতি নাই। কাল কাগজে দেখিতেছিলাম, প্রত্যহ পঞ্চাশ-লক্ষ বিদেশী প্যারিসে যাওয়া-আসা করে, রাস্তায় ভিড়ের অপরাধ কি?

৫ই জুলাই—সকালে খানিক বেড়ান হইল। দুপুরে আবার মেট্রোপোলিটানে একটি মিউজিয়াম দেখিতে গেলাম। সেখানে নানা দেশের মাটির মূর্ত্তি আছে। গ্রীস ও ইতালী হইতে আনীত অনেক দেবদেবীর মন্দিরের অংশ রহিয়াছে, এক-একটির কাজ অতি সুন্দর। ইহার পর আমরা এফেল্ টাওয়ার দেখিতে গেলাম, ইহা লৌহ-নির্ম্মিত পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে উচ্চ মনুমেন্ট, ১৮৮৯ সালের একজিবিশানের জন্য প্রস্তুত হয়। এটি তিন ভাগে বিভক্ত, সর্ব্বসমেত ৯৮৪ ফুট উচ্চ, একেবারে উপরে উঠিতে তিন-বার লিফ্‌ট বদল করিতে হইল। উপর হইতে সমস্ত প্যারিস সহর, এবং চারিদিকে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত দেখা যায়। প্যারিস সহরের অসংখ্য সৌধগুলি খেলনার ন্যায় মনে হইতে লাগিল। এই বিশাল সৌধের সর্ব্বত্র ইলেকট্রিক আলো লাগান রহিয়াছে এবং নানারংয়ের আলো দ্বারা প্রত্যহ বিজ্ঞাপন বাহির করা হয়। উপরে উঠিয়া মনে হইল, ধন্য ইঞ্জিনিয়ার, যাঁর মাথা থেকে ইহার নক্সা বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে উঠিয়া দেখিলাম সেখানে হোটেল রহিয়াছে, এখানে নানারকম পানীয় পাওয়া যায়, বিশ্রাম করিবার জন্য অনেক বেঞ্চি পাতা আছে। এখানে আর একটি ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীত চা পান করিতেছেন দেখিলাম, দেখিয়া মনে হইল ইঁহারা উড়িষ্যা-বাসী। এফেল টাওয়ার একটি সুন্দর বাগানের উপর অব-স্থিত, ইহা একদিকে হেলিয়া পড়ায় মোটা মোটা তার দ্বারা মাটিতে আট্‌কাইয়া রাখা হইয়াছে।

৬ই জুলাই—সকালে 'মন্টিমার্ট্র' নামক এখানকার একটি বড় গির্জ্জা দেখিয়া আসা গেল। ইহা একটি বেশ উঁচু পাহাড়ের উপর। আমরা লিফ্‌টে করিয়া উপরে উঠিলাম। এই লিফ্‌ট এমনভাবে তৈরী যে একটি উপরে উঠিলে অন্যটি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসে। পাহাড়ের গায়ে চারিটি লাইন পাতা, ইহার উপর লিফ্‌ট চলে, ইহার নাম ফিউনিকুলার রেলওয়ে।

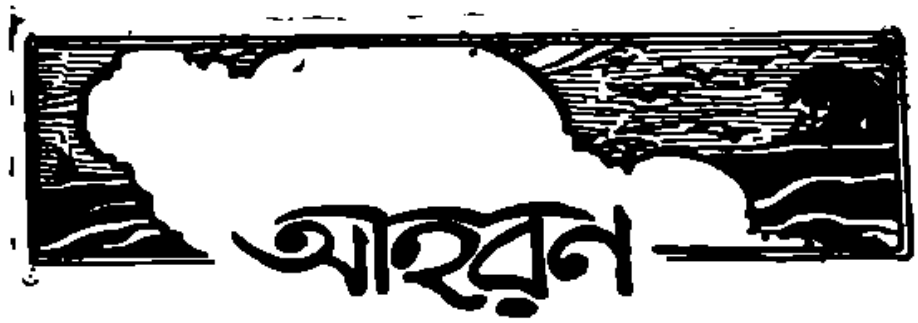

স্ত্রী-স্বাধীনতা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...স্ত্রী-স্বাধীনতা শব্দ অবলম্বন ক'রে বিস্তর তর্ক চলচে, কিন্তু মনের মধ্যে স্পষ্ট ক'রে এই শব্দের সংজ্ঞা কেউ নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন তার পরিচয় পাইনি।

আমরা যখন বালক ছিলুম, তখন স্ত্রী-স্বাধীনতা বলতে বুঝতুম বাহিরে বিচরণের স্বাধীনতা। এখনো বাংলাদেশে মেয়েদের বাহিরে বিচরণ যে সম্পূর্ণ অবাধ হ'য়েচে, তা নয়। কিন্তু তবু এ সম্বন্ধে তর্কের জোর আজকাল অনেকটা ক'মে গেছে। অন্ততঃ যে দলের মধ্যে লেখালেখি বকাবকি চলচে, এ কথাটুকু নিয়ে তাঁরা খুব বেশি উত্তেজিত হবেন না। সেকালের স্ত্রী-স্বাধীনতার তর্কটা সমস্তই দেশজ, আমাদেরই তাৎকালিক অবস্থার মধ্যেই সেটা অবরুদ্ধ। সম্প্রতি যে তর্কটা উঠে পড়েচে সেটাতে দেশী রং নেই, সেটা যুদ্ধের পরবর্ত্তী ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের মতো বিদেশ থেকে এসে পড়েচে।

য়ুরোপে সমাজ-বিপ্লব দেখা দিয়েচে। সেখানকার সমাজের মধ্যেই তার স্বাভাবিক কারণ বর্ত্তমান। সেখানকার স্বভাবের নিয়মেই তার একটা নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু আমাদের ভাষাটার সঙ্গে আমাদের কণ্ঠের প্রাণগত যোগ নেই, প্রতিধ্বনির উপর এর আশ্রয়।

য়ুরোপে যে তর্ক অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে জেগে উঠেচে, সে হ'চ্ছে স্ত্রী-পুরুষের চিরপ্রচলিত সামাজিক সম্বন্ধ-বন্ধনের প্রবন্ধ নিয়ে। প্রাকৃতিক সম্বন্ধের বিচ্ছেদ ঘটাবার সাধ্য কারো নেই। বিবাহ দ্বারা সেই প্রাকৃতিক সম্বন্ধকে সমাজস্থিতির অনুকূল ক'রে নিয়মিত করা হ'য়েচে। বিশেষ কারণবশতঃ পুরুষের উদ্দামতা সমাজস্থিতির পক্ষে তত পীড়াজনক নয়, মেয়েদের স্বেচ্ছাচারিতা ঘরটা। এই জন্যেই স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক বন্ধনে পুরুষের দিকে সকল দেশেই যথেষ্ট শৈথিল্য ও মেয়েদের দিকেই যথেষ্ট কঠিনতা চ'লে আসচে। যুদ্ধের পূর্ব্বেই য়ুরোপে স্ত্রীলোকেরা যে বিদ্রোহ করেছিলেন, তার বুলি ছিল এই যে, পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা মেয়েদের কাছে থেকে যে সংযম দাবী করি, তা একতরফা হওয়া উচিত নয়, পুরুষের কাছ থেকেও সেই সংযম দাবী করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যুদ্ধের পরে যে কথাটা উঠেছে তার তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষের যে স্বাতন্ত্র্য চিরদিন ছিল, মেয়েদেরও সেই স্বাতন্ত্র্যই থাকবে। বলা বাহুল্য এই স্বাতন্ত্র্য যদি দুই পক্ষেই সমান বাধামুক্ত হয় তবে তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থার মূলগত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হবে, অর্থাৎ সন্তানসন্ততি ও বিষয়সম্পত্তিঘটিত অধিকারের একটা সম্পূর্ণ নূতন বিধানের প্রয়োজন ঘটবে। কবিরাজ এই রকম একটা সামাজিক ব্যবস্থা-বিপর্য্যয় দেখা দিয়েচে—পরীক্ষা চলচে। যে সব দেশের সমাজ প্রবলভাবে সজীব, জিজ্ঞাসা-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সেখানকার মানুষ জাগ্রতচিত্ত নিয়ে নিজের ভাগ্যকে নিজে চালনা করচে, তাদের জন্যে আমাদের চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আমাদের দেশে য়ুরোপের সামাজিক কক্ষের যে লাফের বাসটা লাগচে, এটাতে কচু-পরিবর্ত্তনের আভ্যন্তরিক সংবাদ নেই—এটাতে কেবল ধুলো উড়িয়ে অবরবাহির ঢেকে দিচ্চে। বাইরে থেকে এসে এ আমাদের দুর্ব্বল প্রকৃতিকেই বিকৃত করচে, আমরা যে স্বাতন্ত্র্য কামনা করচি, সে হ'লো দুর্ব্বল লালসার অসংযম, সে বীর্য্যবানের বন্ধন-অসহিষ্ণুতা নয়। আমাদের দেশে ঘরে ঘরে বিবাহ-সম্বন্ধ নিয়ে স্ত্রীলোকের দুঃসহ অবমাননার অন্ত নেই, প্রতিদিন কত আত্মহত্যা ও তদ্বোধিক দুর্গতির ইতিহাস এখানকার মানুষ অবিচলিত ঔদাসীন্যের সঙ্গে শুনে আসচে। আজ সাহিত্য ও কর্ম্মক্ষেত্রে যে আলোচনা উঠলো, সে এইসব অত্যাচারের বেদনা থেকে নয়, সে অপথ্যের প্রতি রুগ্নচিত্তের লোলুপতা থেকে। গঙ্গাপ্রবাহে যে পদ্ম ভেসে চ'লে যায় এই তর্ক-প্রবাহে সে নয়, কর্দ্দমে যে পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে এ সেই পদ্ম।

দেবতা যে প্রলয় ঘটান তার মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব আছে, কিন্তু অপদেবতা যে কাণ্ড করতে বসেন তার মধ্যে বিনাশ ছাড়া আর কিছু নেই। অপদেবতারা সকল দেবতা, আমাদের সমাজে সেই সকল দেবতার উপসর্গ দেখা দিয়েচে।

—বিচিত্রা

প্রাচীন ভারতের সূতা-কাটায় স্ত্রী-সহায়তা

শ্রী—

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ চরকা-কাটা লইয়া ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত নানাপ্রকার আন্দোলন চলিতেছে। ভারতবর্ষের যে সকল প্রধান প্রধান মহাত্মারা আজকাল এই আন্দোলন চালাইতেছেন, তাঁহাদের মতবাদ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোকদ্বারাই সূতাকাটার কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করেন। ইহা সত্য যে, বর্ত্তমান সময়ে ভারতে দুইটি অতি কঠিন সমস্যা জনসমাজের নিকট উপস্থিত। কেমন করিয়া ভারতবাসীর দারিদ্র্য-দুঃখ দূরীভূত হইবে এবং কেমন করিয়া ভারতবাসী স্বাধুনিক কার্য্যে অনিপুণ না থাকে—এই দুইটি প্রশ্নের সমাধান-জন্য অর্থনীতিবিদ্ মনীষীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।...

প্রাচীন ভারতে অনেকগুলি শিল্প-বাণিজ্য রাজসরকারের আয়ত্ত ছিল। নৌ-নির্ম্মাণ, খনি, দ্যূত প্রভৃতির ধন, হস্তিধন ও আরও নানাবিধ বিভাগের কেবল যে রক্ষণা-বেক্ষণ-ভার রাজসরকারের অধীন ছিল তাহা নহে, সেই-সমস্ত বিভাগে উৎপন্ন দ্রব্যাদি দ্বারা প্রস্তুত পণ্যবস্তুর কারবারও রাজসরকারের আয়ত্ত ছিল। তন্মধ্যে কতক-গুলি কারবার কেবল রাজারই একমুখ (একচেটে) ছিল। রাজকোষে ন্যস্ত এইরূপ একমুখ ব্যবসায় দ্বারা প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেরই বহুমুখ উপকার সাধিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজকীয় কারখানায় শ্রমজীবী অনেক লোক কর্ম্মকররূপে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা-অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইত। বস্ত্রবয়ন ও সূত্রকর্ত্তন এই উভয়বিধ শিল্প যে কেবল গৃহস্থগণ সর্ব্বদা নিজ তত্ত্বাবধানে স্বাধীন-ভাবেই সম্পাদন করিত তাহা নহে। রাজকীয় সূত্র-বিভাগেও অনেকে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে কার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া লইতে পারিত। চরকা-কাটায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের নিপুণতা অধিক, তাহা বিশ্বাস-যোগ্য কথা। পুরুষ স্বভাবতঃই একটু অস্থির-চিত্ত, স্ত্রীলোকের মনোনিবেশ, দক্ষতা ও শান্ত-চিত্ততাই সূতাকাটা-শিল্পে তাহাদের কৌশলের কারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই নিমিত্তই এই কার্য্যে রাজকীয় সূত্রবিভাগের সূত্রাধ্যক্ষকে স্ত্রীলোকের সহায়তা লইতে হইত।

মৌর্য্যযুগের মহামন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ কৌটিল্য তদীয় অর্থশাস্ত্রেও অধ্যক্ষ-প্রচার-অধিকরণে সূত্রাধ্যক্ষের ব্যাপার সম্বন্ধে এক-স্থানে লিখিয়াছেন :—

"ঊর্ণা-বল্ক-কার্পাস-তূলা-শণ-ক্ষৌমাণি চ বিধবা-রুদ্ধা-কন্যা-প্রব্রজিতা দণ্ডপ্রতিকারিণীভি রূপাজীবামাতৃকাভি-র্ভরুরাজধানীভির্ভূয়স্তোপস্থান-দেবদাসীভিশ্চ কর্ত্তয়েৎ।"

ঊর্ণা (মেষলোমজাত সূত্র), বল্ক (বল্কজাত সূত্র),

কার্পাস সূত্র, তুলার সূত্র, শণসূত্র ও ক্ষৌম (রেশমসূত্র) নিয়ে (রাজকীয় সূত্রাধ্যক্ষ) নিম্নলিখিত স্ত্রীলোকগণ দ্বারা কাটাইবে বলিতেন—যথা (১) বিধবা, (২) কন্যা (বিবাহার্থী স্ত্রীলোক), (৩) অবিবাহিতা কন্যা, (৪) প্রব্রজিতা, (৫) দণ্ডপ্রতিকারিণী (অর্থাৎ যে স্ত্রীলোক দৈহিক কার্য্য দ্বারা নিজের উপর বিহিত রাজদণ্ডের নিষ্ফল চেষ্টা করেন তিনি), (৬) গণিকাদিগের (বেশ্যাগণের) যাহারা মাতা বা ধাত্রী, (৭) বৃদ্ধা রাজদাসীরা ও (৮) স্বকার্য্যে অনুপযুক্ত হওয়ায় যে সমস্ত দেবদাসী দেবালয়ের পরিচারিকার কার্য্য আর চালাইতে পারে না তাহারা। এই উদ্ধৃত বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে যে, রাজকীয় সূত্রবিভাগে গৃহস্থঘরের বিধবা ও অবিবাহিত কন্যাও যেমন কাজ করিতে পারিত, তেমনি আবার সংসার ত্যাগ করিয়া যে স্ত্রীলোক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও নিযুক্ত হইতে পারিতেন। অন্যদিকে আবার যেমন রাজদণ্ডে দণ্ডিতা যে কোন স্ত্রীলোক অর্থদণ্ডের মূল্য দিতে অসমর্থ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নানারূপ সূতা কাটিয়া তাহা শোধ দিতে পারিত, তেমনি আবার বেশ্যা-মাতৃকা, রাজদাসী ও দেবদাসীরাও এই কার্য্যে রাজ-নিয়োগে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে পারিত। সমাজের প্রত্যেক স্তরের প্রতি এইরূপ ভাবে রাজদৃষ্টি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিলে দেশের কল্যাণ না হইয়া পারে না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বিহিত ছিল যে, সূত্রকর্ত্তন-শিল্পে এই নানা শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কে কেমন সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম), স্থূল বা মধ্যম রকমের সূতা কাটিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া সূত্রাধ্যক্ষকে তাহাদের বেতন নির্দ্দেশ করিতে হইত। সূত্রকর্ত্তন-কারিণীদের চক্ষু ও মস্তিষ্ক শীতল থাকিলে সূত্রের 'মান' উৎকৃষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় সরকার হইতে তাহাদের ব্যবহারের জন্য তৈল ও আমলকী বিতরণ ব্যবস্থিত ছিল। তিথিবিশেষে অর্থাৎ পর্ব্বদিনে অতিরিক্ত অশন ও পানাদির আয়োজন করিয়া তাহাদিগের দ্বারা সূত্র কাটাইয়া লওয়া হইত। সূত্রের ভার প্রমাণের হ্রাস হইলে তাহার মূল্যানুসারে স্ত্রীলোকদের বেতনের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইত।

এই স্থানে অতি প্রাচীনকালের অন্য একটি ব্যবস্থার কথা উদ্ধৃত হইতেছে। উপরি-উল্লিখিত স্ত্রীলোকগণ রাজকীয় সূত্রবিভাগের সূত্রশালায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কাজ করিতে পারিত। কিন্তু যাহারা বাড়ীর বাহিরে যাইতে চাহিতেন না —অথচ নিজ পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহিতেন, তাঁহাদের জন্য অন্যপ্রকার রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল, তাঁহারা নিজ নিজ দাসী দ্বারা অধ্যক্ষের সহিত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন। তাই কৌটিল্য আরও লিখিয়াছেন —

"স্বদাসীভিরনিষ্ক্রান্তাঃ প্রেষিতবিধবা কন্যাঃ কল্পকা বাপয়েয়ুঃ বিস্তৃষ্টাঃ স্বদাসীভিরনুদার্য্য সোপস্করং কর্ম্ম কারয়িতব্যাঃ।"

যে রমণীগণ বাড়ীর বাহিরে নিষ্কাসিত হন না, যাঁহারা ভর্ত্তার প্রবাসজন্য বিযুক্তস্বামিকা, যাঁহারা বিধবা অথবা যাঁহারা অবিবাহিতা কন্যা, তাঁহারা যদি নিজ পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জন করিতে চাহেন, তাহা হইলে সূত্রাধ্যক্ষ তাঁহার দাসী-জন দ্বারা বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে স-বহুমান সূত্রকর্ত্তন ব্যাপারে নিয়োজিত করিতেন। আর যে সকল কুলনারী রাজসূত্রশালায় স্বয়ং আসিতে আপত্তি করেন না, তাঁহারা অতি প্রত্যূষে (সাধারণ লোকের কার্য্যার্থ বহির্গমনের পূর্ব্বে) সূত্রশালায় আসিয়া স্বগৃহে নির্ম্মিত সূত্র (তাঁত) জমা দিয়া তাহার বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সূত্রশালার অধ্যক্ষ কেবল "সূত্রপরীক্ষামাত্র" প্রদীপ অর্থাৎ প্রদীপ যতখানি প্রকাশযুক্ত হইলে সূত্রের তন্তু পরীক্ষা সুসাধিত হইতে পারে ততখানি প্রকাশযুক্ত প্রদীপ তথায় রাখিতে পারিতেন। আর তিনি যদি সেই সূত্রশালায় স্বয়ং আগত কুলরমণীগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অথবা তাঁহাদের সহিত প্রকৃত কার্য্যের অতিরিক্ত অন্যবিষয়ক সম্ভাষণাদিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সেই অপরাধে তাঁহার প্রথম সাহস-দণ্ড অর্থাৎ ২৫০ পণ অর্থদণ্ড বিহিত ছিল; এবং সেই রমণী দলের সূত্রকর্ত্তন নিবিষ্ট প্রাপ্য বেতনধানের কাল অতিবাহিত হইলে অথবা অকৃতকর্ম্মা স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে উৎকোচাদি লোভে সরকারী কোষ হইতে তাহাদিগকে কোন অর্থ প্রদান করিলে, তাঁহাকে মধ্যম সাহস-দণ্ড অর্থাৎ ৫০০ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। আবার অগ্রিম লইয়া যাহারা কার্য্য না করিত, তাহাদিগের উপর

"অঙ্গুষ্ঠ-সন্দংশ" অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ ছেদের দণ্ড বিহিত ছিল। সূত্র বিক্রয় করিয়া তন্তুলা ভক্ষণ, সূত্রাপহরণ ও সরকারী সূত্র লইয়া পলায়ন, এই তিন অপরাধে কোন স্ত্রীলোক ধরা পড়িলে তাহাদের "অঙ্গুষ্ঠ-সন্দংশ" নামক দণ্ড সহ্য করিতে হইত। বেতন সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার গোলমাল উপস্থিত হইলে অপরাধানুসারে অর্থদণ্ডেরও বিধান করা হইত। সে যাহা হউক, অতি প্রাচীন কালের নিয়মাবলী কঠোর কি মৃদু ছিল তদ্বিষয় আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। সেকালে ভারতবর্ষে যে নানাশ্রেণীর রমণীগণ সূতা-কাটার রাজকারখানায় ব্যাপৃত থাকিয়া নিজের ও দুঃস্থ পরিবারের ভরণপোষণে সহায়তা করিত, সে কথা আধুনিক রমণীকুলকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। অন্ততঃ এই বিষয়টিতে প্রাচীনের সহিত নবীনের সম্পর্কটা রক্ষিত হইতে পারিলেও ভারতের অর্থকৃচ্ছ্রতা অনেক পরিমাণে লঘু হইতে পারে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি-দিনে বাঙলা দেশে আগে ইন্দ্রাণীপূজা হইত, কালধর্মে উহা উঠিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রাণী-পূজার অপর নাম—চরকা-পূজা। চরকাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পূজা হইত। ইহার কথা বা কথকতা আছে। নারীরাই ইহার পূজা করিতেন। নারীরাই কথকতা করিতেন। ইহার কথকতার বিশেষত্ব—চরকার বিশিষ্টতা লইয়া; কেমন করিয়া দরিদ্রা ব্রাহ্মণী চরকার দৌলতে ধন ধান্যে গ্রামপূজ্যা হইয়াছিলেন, সেই সকল কথাই বলা হইয়া থাকে।...

এখন বাঙলায় চরকা নাই, চরকার পূজাও নাই, চরকার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাণী দেবীর পূজাও লুপ্ত হইয়াছে। নবাবধরণে কোন কোন ঘরে চরকা দেখা যায়, কিন্তু ইন্দ্রাণীপূজা আর হয় না। ইন্দ্রাণী দেবীর বরে কেমন করিয়া দরিদ্র ধনী হয় তাহাও আর বলা হয় না। চরকা বাঙলার একটি সম্পদ ছিল, সে সম্পদ লুপ্ত হইয়াছে। চরকায় যে-সকল রমণী সূতা কাটিতেন, সূতা-কাটা হয় না বলিয়া সেই-সকল মহিলা এখন সূচ-সূতার কাজ করেন, নাটক-নভেল পড়িয়া অবসর-সময় কাটাইতেছেন। আমাদের ধন-দৌলত আর কেমন করিয়া হইবে? আমাদের স্বভাবে ইন্দ্রাণী দেবী আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। দিদিমারা ইন্দ্রাণী পূজা করিতেন, ইন্দ্রাণী দেবীর কৃপায় তাঁহারা সুখী ছিলেন। এই পূজায় একখানা তাঁতে-তৈরী কাপড়, চরকায়-কাটা সূতা, ফল-মূল-কলা দিয়া ভোগ দেওয়া হইত। বাড়ীর সকলে পরমানন্দে সে প্রসাদ গ্রহণ করিত। রাজা হইতে ভিখারীর বাড়ীতে অবস্থাভেদে এই পূজা দেওয়া হইত।

গান

বাউলের সুর

শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস

আজিকার সাঁঝের আকাশ,
ভিজে বাতাস—
পাগল করে।
কোন্ সে ফেলে-আসা দিনের ছবি
মনে পড়ে।
এমন ভরা-জলে আলো-ছায়ায়—
তরী বেয়ে কারা যায়,
ও তারা কোথায় চলে কিসের টানে
কোন্ সায়রে।

কোথা কোন্ ধানের ক্ষেতে
'কোড়া' ডাকে কি দুঃখেতে,
বাদুড় আসে মেলে' পাখা
আলস-ভরে।
আজি আমার মনে কি সুখ বাথা
জাগায় এমন আকুলতা;
জানিনা—কি, চেয়ে থাকি
সমুখ 'পরে!

সাধুমা'র কথা

শ্রী——

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমি দিদিমা কি কর্ত্তামণির কাছে কখনো ধমক পর্য্যন্ত শুনিনি বাবা বড় দুষ্টামি করলে ধম্‌কাতেন। যার কাছে ৯ বছরের মধ্যে তিন-চারবার মার খ'য়েছিল বেশ মনে আছে। আমার স্বল্প আহারের কথাটা লেখা উচিত। এটা পেটে রেখে গেলে আমার জীবনের ঘটনা লেখা অপূর্ণ থেকে যায়। এমন আশ্চর্য্য খাওয়া আমি যে কেমন ক'রে হজম করতুম জানিনে। আমার যখন ছেলেমেয়ে হ'ল ও তাদের খাবার বন্দোবস্ত ক'রে দিলুম, তখন আমার খাওয়ার সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখলুম, তাদের তিন ভাগ কম। আমায় যে কেন এত খাওয়াতেন, তা এখনো আমি স্থির করতে পারিনি। তবে ভোর থেকে রাত ৯টা পর্য্যন্ত আহারের তালিকা পাঠক-পাঠিকাগণ শুনুন।

আমার মা ভোরবেলায় আমাকে ও বাবাকে চা ক'রে দিতেন, সে চা মনে করবেন মা যে চায়ে দু' চামচ দুধ, আর বাকি চা। মা'র মনে হ'ত, সে চা খেলে আমার গরম হবে। সেজন্য এক পোয়া দুধে এক ছটাক চায়ের জল, আর তার সঙ্গে এক ছটাক মিছরির গুঁড়া, ৪ খানা বিস্কুট —এই খেয়ে মর্ণিংওয়াক করতে যাওয়া হ'ত। পরে সেখানে ছুটাছুটি ক'রে উইলসন হোটেলে বাবা প্রায় রোজ যেতেন, আমিও যেতুম। বাবা কি খেতেন না খেতেন, আমার কম মন সেদিকে বড় যেত না। আমার কেক্, লজেন্স এই সব চলত। গরমিকাল হ'লে আইস্‌ক্রিম খেতুম। আমার বাবা কোনদিন ধর্ম্মতলার বাজার থেকে বাজার ক'রে যেতেন—ভাল ছাগমাংস, কপি, কড়াইশুঁটি, কমলালেবু, আপেল, আঙ্গুর ইত্যাদি। বাড়ী গিয়ে কাপড় ছেড়েই আবার বড় দুধ মিছরি দিয়ে জাল দেওয়া প্রায় দেড় সোয়া। তখন বেলা ৯-৩০ হবে। পরে ঠাকুরের বাল্যভোগের মাখন, মিছরি, বাসি লুচি ৪ খানা, ক্ষীরের

লাড়ু ও সুপারি-পরিমাণ ৪টি। কিন্তু আমার রসনার এতেও বিশ্রাম নেই। মা'দের বাজারের গরম গরম কচুরি কিনালি এলো, তা থেকেও দুখানা খাওয়া হ'য়ে গেল। পরে দিদিমার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—একবার বসছি, একবার শুয়ে পড়ছি। দিদিমার আদের জোড় এলে। তিনি একটা হাতে দিলেন। আমার স্বভাব ছিল 'চুষে' আম পেলেই তাতে একটি ফুটা ক'রে টিপে টিপে রেস বেড়ানো। আবার বাইরে গেলুম, সেখানে খাজাঞ্চি দাদা 'মদন' আমওয়ালার কাছে বাবার আম দর করছেন। আমি চালাকিটা আমওয়ালা বদলে—এই আমটা রেখে দেখ'তে মা—ব'লে ঘুরে বাড়িয়ে দিলে, অমনি রেখে দেখা হ'ল। আবার বাড়ীর ভিতর গেলুম, তখন স্নানের জন্য কলটান-গোলা স্নানের সরঞ্জাম গোছানো হ'চ্ছে, কি ধরব নিলে, বিন্নি গোলা আরম্ভ ক'রে দিলে। একরূপ তোরজবরদস্তি ক'রে স্নানজাগাটা সম্পন্ন হ'ল। তখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ হ'য়েছে। একটু বই নিয়ে বসবার পর বিছানায় শুয়ে পড়লুম। মা ডাকতে লাগলেন—এস, মাথায় তেল দিয়ে দিই। আমার কর্ত্তামদির হুকুম, নাবার পর মা'কে-সা' অবশ্য মাখতে হবে। মাথা মুছে, তারপর তেল দিয়ে চুল আঁচড়ানো হ'ল। ভাত এসে পড়ল, বাবার ও আমার। বাবা খেয়ে স্কুলে চ'লে গেলেন। আমি বাবার সঙ্গেই খেতুম। ভাতের সঙ্গে আমার প্রণয় খুব কম। দুই-চারটি নাড়াচাড়া ক'রে উঠতুম। কৈ মাছের ঝিমটা, কি ইলিশ-মাছের ভাজাটা, কিম্বা দল্‌দা'র বুতাটি। আমাদের বাড়ী মাংসটা রাত্রেই হ'ত। দিনে মাছের কালিয়া, ঝোল, মাছ-ভাজা, ঘন্ট, এই পর্য্যন্ত; কারণ আমার দিদিমা রোজ কালী-ঘাটে পূজা দিতেন ও প্রসাদী কচি মাংস আনাতেন। এই-জন্য রাত্রেই রান্না হ'ত। কিন্তু এখন যেমন পিঁয়াজ না দিলে মাংস রাঁধা হয় না, আমাদের বাড়ীতে সেটি হবার জো ছিল না। পিঁয়াজ কি হাঁসের ডিম আমার বাল্যজীবনে কখনো খাওয়া হয় নি।

পরে আমাদের খাওয়া হ'য়ে গেল। একটু বই শ্লেট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। মনোযোগ দিয়ে যদি পড়তুম তাহ'লে যে কিছু শিখতে পারতুম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা যে গান, কি যে শ্লোকটি শুনতুম, অমনি কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলতুম। কিন্তু মা-সরস্বতীর দয়া বড়ই কম। সেজন্য পড়ায় মন মোটেই বসত না। খাওয়ার পর বাবা মা, আমি ও আমার ছোট ছোট ভাইবোনগুলি সকলেই শুয়ে পড়তাম, বেলার পাখা টানতে লাগত। দরজা বন্ধ ক'রে টানা পাখার দড়িটা দরজার গায়ে একটা ছেঁদা ক'রে বার ক'রে দিয়েছে। বেলারা বাহিরে বারান্দায় ব'সে টানছে। মা ও বাবার সেবন একটু তন্দ্রা এসেছে, আমি অমনি উঠেছি। আমার দিনে ঘুম কখন আসে না। আর একটা মতলব কি মাথায় এসে জুটল, অমনি উঠে দুম্‌দোড়ে' চৌতলার ছাতে। মস্ত উঁচু কাঠের সিঁড়ি—চড়বার সময় নড়ে, কিন্তু আমার ভয় ছিল না, বেশ উঠে যেতুম। আমার তেতালার ছাতে এসে, এত রকম বুনো ঘাসে হল্‌দে হল্‌দে ফুল হ'ত, তাই তুলে' আমার পিতলের রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর ছিলেন তাঁকে আর অন্যান্য পুতুলদের মালা গেঁথে পরাতুম। আমার ফুল নিয়ে খেলাটা বড় ভাল লাগত। দিদিমার পূজার প্রচুর প্রসাদী-ফুল সিঁড়ির একটা কোণে ঢালা থাকত।

আমি এইরকমে চপুরবেলা ঘুরতুম। পরে দুটো বাজলে গুরুমহাশয় আমাকে পড়াতে আসতেন। গুরুমহাশয়রা চার ভাই ছিলেন, আমাদের বড় বাড়ী সব ভাগ ক'রে নিয়েছিলেন। আমার গুরুমহাশয়ের বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান। তিনি বড় ভালমানুষ ছিলেন।

কিছুদিন পরে আমার বিবাহের কথা আরম্ভ হ'ল। তখন আমার দিদিমা একদিন আমাকে বলেন যে—তুমি কেবল দুষ্টামি ও খেলা ক'রে বেড়াও, পড়ায় মন দেওনা, পড়া না করলে বর আসবে না, বলবে, দুষ্টু মূর্খ মেয়ে আমরা কেউ বিয়ে করব না। সেইদিন থেকে আমার মনটা কেমন একটু পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল, মনে হ'ল, আমার মা'রা সবাই পড়তে জানেন, আমারও পড়া শেখা উচিত—শিখতেই হবে। আমার যেদিন দিদিমা এই শিক্ষাটি দিয়েছেন, সেদিন আমার মনে হ'তে লাগল, কতক্ষণে গুরু-মহাশয় আসবেন? আমার এমন উৎকণ্ঠা হ'তে লাগল যেন সেইদিনই সব দ্বিতীয়ভাগটা শেষ করি। আমি বাইরে আমার পড়ার আয়োজন ক'রে দিচ্ছি। মাদুর পাতলুম। বই, শ্লেট, পেন্সিল, জলের বাটি, শ্লেট সব ঠিক ক'রে ব'সে

লিখ্‌ছি—নইলে কোথায় চাকরদের বল্‌বেন, তখন চাকর খোঁজ ক'রে ধ'রে আন্‌বে, মাদুর পাত্‌বে, বই-শ্লেট সব দেবে। তবুও দুষ্টুমি হ'ত। আবার যেদিন ও-বাড়ীতে বড়দি-ছোড়দির কাছে দুপুরবেলা বেড়ে খেলার যেতে যেতুম, সেদিন কিছুতেই আর আস্‌বার মন হ'ত না। কিন্তু কি-জানি দিদিমা কিরকম ক'রে মানুষকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেন, সবাই তাঁর কথা শুনতে ভালবাস্‌ত। আমার ৯ বছরে বিবাহ হয়। দিদিমা সন্ধ্যাবেলায় বেড়িয়ে আস্‌বার পর কি তিনি যাবার পর যখন দুপুরবেলায় বিশ্রাম করতেন, তখন আমাকে ডেকে উপদেশ দিতেন। শুরুমহাশয় সেদিন আমার পড়া দেখে খুব খুশী। বল্‌লেন, বাঃ! আজতো বেশ, এ-রকম রোজ কর না কেন, তাহ'লে খুব শীগ্‌গির শীগগির বই শেষ হয়।

তখনি একবাটি গরম দুধ ও তার সঙ্গে একটা মিহিদানা এসে পড়ল, একটু খুঁৎখুৎ ক'রে সেগুলি উদরসাৎ করা হ'ল। আমার ২—৩টা পর্য্যন্ত দু'ঘণ্টার লেখাপড়া শেষ হ'য়ে গেল। সেদিনকার মত ছুটি। পরে আমার কর্ত্তামণি ঠিক ৪টার সময় ফল ও বড়বাজারের জলপান, ছানামাখন, বেদানা প্রভৃতি খেতেন। সেগুলি সাজান হ'ত, কিন্তু তিনি অতি অল্পাহারী ছিলেন। আমার উদরেই বেশী যেত। আমার দাদা যেদিন স্কুল থেকে সকাল সকাল আসতেন, সেদিন দুই জনে মিলে খাওয়া যেত। দিদিমা রোজ কর্ত্তামণির ভাত খাবার ও বিকেলে জলখাবার সময় বল্‌তেন।

আমার যে কি আনন্দময় প্রাণ, সে কথা আমার লিখে জানাবার ক্ষমতা নেই, মনে প্রাণে বেশ অনুভব করতে পারি, আর লোকের কাজগুলিও দুষ্টু করি। দয়াময় আমার উপর বড়ই দয়া প্রকাশ করেছেন। এজন্য এ কথা লিখ্‌লাম। আমার এখন ৪৪ বছর বয়স, কিন্তু এখনও মন সদাই আনন্দে ভাস্‌ছে। আমার পাঁচ বছর পূর্ণ হ'য়ে যাবার পর আমার মা'র সঙ্গে তাঁর পিতার বাগানবাড়ীতে গিয়ে ছ'মাস থাকি। আমরা কলকাতা থেকে যেদিন যাই, বাড়ীর গাড়ীতে গেলুম আমরা তিন বোন, বাবা, আর কোচবাক্সে রামুদাদা, বাবার পুরানো খানসামা। আর আমার মা গেলেন একটি ঘেরাটোপ-দেওয়া পাল্কিতে। সি তিনজন ও দারোয়ান বোটে গেল। আমরা গৃহদেবতাকে প্রণাম ক'রে, কর্ত্তামণি ও দিদিমা'র চরণধূলি নিয়ে সিঁড়িতে নাম্‌তে যাব, অমনি কর্ত্তামণি ডাক্‌লেন, ডেকে আমায় আদর ক'রে বুকে চেপে চক্ষের জলে স্নান করালেন। তাঁর প্রাণ এত কোমল ছিল যে, কোন কোন সামান্য কারণে চক্ষু জলে পূর্ণ হ'য়ে যেত, আর ছোট ছেলের মত ঠোঁট ফুলিয়ে-ফুলিয়ে কাঁদ্‌তেন। আর এখন আমি যাচ্ছি, তাতে তাঁর কাঁদ্‌বারই কথা। আমাকে আর দাদাকে প্রাণের মত দেখতেন। আমিও কেঁদে ফেল্‌লুম। এদিকে কর্ত্তামণিকে ছাড়তেও ইচ্ছা হয় না, আবার বাগানে যাবারও খুব ইচ্ছা। কি করি, তখন যাবার সব ঠিক। মা'র পাল্কি পর্য্যন্ত চলেছে। তখন নেমে গাড়ীতে উঠ্‌লুম। কর্ত্তামণি সাদনের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তখনও আমায় ডেকে বল্‌ছেন—দেখ, বেশী দেরী ক'র না; ওরা না আসে, তুমি চ'লে এস। আমিও কর্ত্তামণিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাস্তাটা পার হ'য়ে গেলুম। পরে বোটে গিয়ে সেই মা-গঙ্গার শোভা, পান্‌সি নৌকা, ডিঙ্গী দেখে মন ভুলে গেল। মনের কথা যদি সব ঠিক লিখ্‌তে হয়, তবে মন পূর্ণানন্দ পাচ্ছে না। কারণ আজ দাদা, কর্ত্তামণি ও খাজাঞ্চি-দাদার সঙ্গ ছেড়ে আস্‌তে হ'ল। ও-বাড়ীর দিদিদের জন্যেও মন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল।

কিছুক্ষণ এইরকম হ'তে লাগ্‌ল, কিন্তু নতুন নতুন প্রকৃতির দৃশ্য পেতে লাগলুম; তখনি মন আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠ্‌ল। আর মনের যে মলিন ভাব ছিল, সেটি দূর হ'য়ে গেল। প্রথম দিন আমরা ধরানগরে গিয়ে পৌঁছলুম, অল্প বেলা ব'লে মাঝিরা নোঙর ফেলে দিলে। রামুদাদা ও একজন মাঝি নেমে গিয়ে দুধ নিয়ে এল। এর জেতর লুচিভাজা ও ছোকা হ'ল, খেতে বেশ লাগল। আবার রাত্রে দুধ ও সন্দেশ খাওয়া হ'ল। তবে সন্ধ্যার খবর আমি কিছুই জানি নে। বিশেষ সেদিন শরীরটা বড় ক্লান্ত হয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েছি; পরদিন আবার ভোরে ঘুম ভাঙতেই জলের ধারা শুন্‌ছি। পরে মুখ ধুয়ে ব'সে ব'সে ঝাঁঝাবাড়া, মাছ কেনা ইত্যাদি দেখ্‌ছি। পরদিন কোন্নগরে পৌঁছলাম। আমার মাতামহ দেখতে

ঠিক মহাদেবের মত ছিলেন, আর স্বভাবও ঠিক শিবের অনুরূপ ছিল। মাতামহী কিন্তু তার ঠিক বিপরীত—দেখতেও বটে, স্বভাবেও বটে। তা যাই হোক্, মাতামহী লোককে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। খাওয়ার উদ্যোগেই তিনি ব্যস্ত থাকতেন, আর খাওয়ার তদ্বিরটাও ভালবাসতেন। কিন্তু মেজাজ বড় কড়া ছিল। সত্য কথা বলতে কি, আমার সঙ্গে তাঁর বাল্যকালে বড় বনিবনাও ছিল না। অবশ্য সেদিন আমি প্রথম গিয়েছি, আমায় আদর করলেন। তাঁর যখন আমাকে আদর করবার ইচ্ছা হ'ত, তখন বলতেন 'আয়'—নইলে কথা কইতেন না। শুধু যে তাঁর দোষ, তা নয়। আমারও বিবেচনাশক্তি ছিল না। অবশ্য এটা এতদিনে বুঝেছি। তিনি আমায় ভাল ক'রে চুল বেঁধে দিতেন; আমি তারী চঞ্চলা মেয়ে, সব নষ্ট ক'রে ফেলতুম। আমায় বলতেন—আমার কাছে ব'সে ফুলের মালা গাঁথ্। আমার যেদিন ইচ্ছে হ'ত গিয়ে বসতুম; না-হয়ত কেবল একবার বৈঠকখানা, একবার অন্দর—এই কচ্ছি। আমার মাতামহীর কথাটি আগে এসে পড়েছে। বাগান, বাড়ী, পুকুর কি বৈঠকখানা সম্বন্ধে কিছুই লেখা হয়নি। বাগানটি বেশ বড়। তার ভেতর তিনটে পুকুর ছিল, অন্দরে দুটো। একটা বিঘে-চুই জমি নিয়ে, সেটির নাম ছিল ছোটপুকুর। সেটায় বাসন মাজা, কাপড় কাচা, মালিদের গাছে জল দেওয়া এই সব হ'ত। আর বকুল ব'লে যে পুকুরটি ছিল, সেটি বড় সুন্দর। সেটি প্রায় ৪ বিঘে জমির উপর ছিল। তার জল ছিল খুব পরিষ্কার। দুপাশে দুটি বাঁধা ঘাট, ও চারপাশে মেদির ছাঁটা বেড়া ছিল। তার পাড়গুলি বন জমাইবাঁধা ঘাসে ভরা, ও ঘাটের দুপাশে মস্ত মস্ত বকুল গাছ ছিল। গাছে খুব ফুল হ'ত। ফুলগুলি খুব বড় বড় আর সাদা হ'ত। ঘাটের সামনে বসবার জন্যে মস্ত চত্বরারা ছিল। তার চারদিকে আবার বেতের মত গাঁথা ছিল, আর মধ্যে মধ্যে থাম। থামেতে সব বড় বড় পুতুল ছিল—কেউ কাপড় নিংড়ে দিচ্ছে, কেউ প্রার্থনা করছে, কেউ বা আবার ছেলে কোলে ক'রে আদর করছে। এদের মাঝখানে আলো-দেবার এক থাম ছিল। তা ছাড়া অনেক ফুলের গাছও ছিল। তবে গোলাপ যুঁই চাবেলি চাঁপা,—এই সব সুগন্ধি ফুলের গাছই বেশির ভাগ ছিল।

এখনকার ছেলেদের পছন্দ অন্যপ্রকার। তাদের একটা গাছঘর চাইই। নানারকম পাতার গাছ কি জানি আমার মনে তত ভাল লাগে না। ফুলটার প্রাণে বড় দেবভাব আছে। আর গন্ধেও বড় ভালবাসতুম। দিদিমা খুব সৌখীন লোক ছিলেন। তিনি খাওয়ার পর দু-এক ঘণ্টা বিশ্রাম ক'রে, অমনি বাগানে চত্বরারায় গিয়ে বসতেন। তাঁর সঙ্গে অনেক লোক যেত। তাঁর মেজ ননদ ছিল, তাঁকে আমরা মেজদিদিমা বলতুম। তাঁর একটি ছেলে ছিল, তিনি খুব দেবভক্ত ছিলেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুবাদ করেছেন, পূজাপাঠ খুব জানতেন। আবার সুন্দর দুর্গা-মূর্ত্তি গড়েছিলেন। নিজের হাতে গ'ড়ে দুর্গোৎসব করেন। এই মামার একটি বোন ছিলেন। তাঁর কাছে সন্ধ্যাবেলায় নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তুম।

আমি এক কথা লিখতে লিখতে আর এক পথে এসেছি। দিদিমা ফুলের মালা গাঁথবার জন্য গিয়ে বসলেন। মালী মস্ত সাজি ভ'রে যুঁই, বেল, বকুল এনে দিলে দিদিমা নানারকম বাহারী ক'রে গাঁথতে লাগলেন। দাদামহাশয়ের জন্যে ফুলদল, আমার জন্য মাথার জাল, মালা বিস্তর গাঁথতেন। আবার ঐখানে কথা শোনা হ'ত, রামায়ণ কি প্রভাসযজ্ঞ। কোনদিন বা কেউ গানওয়ালী এসে পড়ত, তার গান শোনা হ'ত। তারপর দিদিমা খুব আমুদে ছিলেন, তাসখেলা চলতে লাগল। দিদিমার অভ্যাস ছিল দুবেলা সাঁতার দেওয়া। আমরা সকলে ঘাটে ব'সে দেখতাম। তিনি খুব মোটা ছিলেন, কিন্তু এত জোরে যেতেন যে সকলে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেত। আমার মামারাও বাইরের মস্ত পুকুরে সাঁতার দিতেন। আমার কিন্তু জলে নামতে বড় ভয় করত। বড় জোর ঘাটের উপর। আমার নিয়ম ছিল জোরে উঠে বাগানে ফুল কুড়ানো। তারপর হাতে উঠে উঠানের বেলগাছ থেকে বেল পাড়া হ'ত। বেলগুলি চমৎকার ছিল, যেমন মিষ্টি তেম'ন আবার বীচিও নেই। আকারেও বেশ বড় ছিল। আমি সেখানে যাবার পর থেকে আর কেউ বেল

কুড়োতে পেত না, আমি কুড়িয়ে এনে মা কিম্বা দিদিমাকে দিতুম। তারপর দুধ খেয়ে বৈঠকখানায় বেড়াতে যেতুম। বৈঠকখানায় যেতে হ'লে খানিকটা রাস্তা হেঁটে তবে উঠতে হ'ত। পথে কত গরীব লোকের বাস ছিল। তারা আমাদের দেখে খুব প্রশংসা করত। আমরা তিনটি বোনেই যেতুম। আমার চেয়ে তারা আরও সুশ্রী ছিল। তাদের গঠন আমার মত এত স্থূল ছিল না; তারা আমার মত এত চঞ্চলও ছিল না।

ভগবানের রাজ্যে কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এখানে যখন যা চাই তাই পাই। জল, বায়ু, ফল, ফুল, অন্ন, বস্ত্র, আনন্দ, গীত, বাদ্য, আদর ও স্নেহ—সকলই পাই। তবে অভাব ও কষ্ট যে কি, সেটি পরম পিতা আমায় এ পর্য্যন্ত জানতে দেন নি। তবে লোকের কেন যেন সব জিনিষেরই অপ্রতুল। কত লোকের অন্নবস্ত্রের কিছুরই অভাব নেই, অথচ একদণ্ডও মনে শান্তি বা সুখ নেই। এই বুঝি কর্ম্মফল! আমারও ঠিক এই ধারণা। ক্রমশঃ

আহোম বীরাঙ্গনা মূলা গাভরু

শ্রী নলিনীকুমার ভদ্র

আগেকার দিনে আসামে স্বাধীন আহোম রাজারা রাজত্ব করিতেন। সে-কালে আসামে যে সমস্ত বীর-নারীর আবির্ভাব হইয়াছিল, আহোম সেনানায়ক চাও-ফ্রাচেঙ-মুঙ-এর পত্নী মূলা গাভরু তাঁহাদের একজন। আজ আমরা সংক্ষেপে সেই মহীয়সী বীরাঙ্গনার বীরত্ব-কাহিনী বর্ণনা করিব।

আহোমদের আমলে মুসলমানরা বারে বারে আসিয়া আসাম আক্রমণ করিত। ১৪৩২ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে তুর্ব্বক নামে একজন পাঠান সেনাপতি তিনটি হস্তী, এক-হাজার অশ্ব এবং অগণিত সৈন্যসহ রাজধানীর উপর আসিয়া চড়াও হইলেন। প্রবল প্রতাপশালী আহোমরাজা চুহুঙ্গ্ মুঙ্গদেব তৎকালে আসামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেনাপতি খুন্লুঙ্ খাপ্লেঙ্ বুড়াগোহাইকে পাঠান-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাইলেন। প্রথমে, কলীয়াবর নামক স্থানে আহোম এবং পাঠানদের এক যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে বুড়াগোহাই এবং অপর ছয়জন আহোম সৈন্যাধ্যক্ষ প্রাণপণে লড়িতে লাগিলেন। কিন্তু, হায়, এক-একজন করিয়া সাতজনই তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন।

অতঃপর গৌহাটির সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয়-পক্ষের আর একটি যুদ্ধ হইল। এবার তৎকালীন আসামের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বীর চাও-ফ্রাচেঙ্-মুঙ্ বরগোহাইন সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বিক্রম শত্রুসেনার হৃদয়ে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিল। তাহারা যখন বুঝিল যে, সম্মুখযুদ্ধে কোনোমতেই আর তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিবার যো নাই, যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল।

চাও-ফ্রাচেঙ্-মুঙ-এর পত্নীর নিকট যখন এই নিদারুণ দুঃসংবাদ পৌঁছিল তখন প্রথমে তিনি শোকে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু, ক্ষণকাল পরেই এই সম্ভ্রান্তবংশীয়া বীরাঙ্গনার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত উদ্বেলিত করিয়া ফুটিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়াই হোক, মুসলমানদের এই ঘৃণিত বিশ্বাস-ঘাতকতার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতেই হইবে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে তৎক্ষণাৎ তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

মুহূর্ত্তকালের মধ্যে হৃদয়ের সকল দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া বীর-নারী রণসাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে প্রায় সমস্ত সেনার পতনে আহোম সৈন্যেরা হতাশ হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবার উপক্রম করিতে-

ছিল। উদ্দীপনাময় কণ্ঠে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া মূলা গাভরু গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"সৈন্যগণ! সত্যই কি আজ তোমরা তোমাদের জন্মভূমিকে শত্রুহস্তে সঁপিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছ? তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ আট-জন বীর আজ মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন। ভুলিয়া গিয়াছ কি, আসামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর আজ শত্রুপক্ষের চক্রান্তে নিহত? কিন্তু ভয় নাই, আমি নিজে আজ হতে তোমা-দের নেতৃত্ব গ্রহণ করিব। সমরক্ষেত্রে প্রাণদান করিবার গৌরব হইতে আজ আমাদিগকে বঞ্চিত করে, কার সাধ্য!"

মূলা গাভরুর এই অগ্নি-গর্ভ কথা শুনিয়া এবং তাঁহার তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আহোম সৈন্যদের নিরাশহৃদয়ে অদম্য উৎসাহের সঞ্চার হইল। সমস্ত বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত করিয়া আবার তাহারা মুসলমানদের আক্রমণ করিল। মুসলমানরা সেই আক্রমণের তোড় সাম্‌লাইতে না পারিয়া পিছু হটিতে লাগিল।

বীর-নারী মূলা গাভরু আজ দুইমণিশিলার যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য শত্রুসেনা সংহার করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। মনে হইল, স্বয়ং বিজয়-লক্ষ্মী যেন আজ আহোম সৈন্যদের চালনা করিতেছেন। অবশেষে, নিজহস্তে বঙ্গাল এবং তৌজি নামে দুইজন পাঠান সেনাপতিকে বধ করিয়া তিনি পতিহত্যার কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইলেন। তাঁহার এই অতুলনীয় পরাক্রম দেখিয়া মুসলমানরা মনে-মনে প্রমাদ গণিল। তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, এই বীর-নারী জীবিত থাকিতে তাহাদের জয়ের আশা তিলমাত্রও নাই। তাই, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য 'মরিয়া' হইয়া উঠিল। শত্রুপক্ষের মতলব টের পাইয়া জনকতক বাছা বাছা আহোম সৈন্য উন্মুক্ত অসি-হস্তে মূলা গাভরুর চারিপাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দলে দলে মুসলমানগণ "দীন" "দীন" রবে রণস্থল মুখরিত করিয়া সেদিকে অগ্রসর হইল। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও আহোমরা তাহাদের প্রিয় সেনাপতি-পত্নীকে শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। অকস্মাৎ পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ করিয়া একজন পাঠান সেনা তাঁহাকে নিহত করিল।

কিন্তু বীরাঙ্গনার এই আত্মদান ব্যর্থ হইল না। তাঁহার পতনের পর বীর যোদ্ধা কক্কে বরপাত্র গোহাইন সৈন্য-দিগকে চালিত করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার উৎসাহ-বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া আহোমরা পুনরায় পূর্ণশক্তিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখিয়া দাঁড়াইল। এইবার আহোমদের হস্তে মুসলমানদের ভীষণ পরাজয় হইল। আহোমরা পিছু পিছু তাড়া করিয়া তাহাদিগকে ভরণী নদীর ওপারে হঠাইয়া দিল।

মূলা গাভরুর আত্মোৎসর্গের কাহিনী আসামের ইতি-হাসের একটি গৌরবময় পৃষ্ঠা। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যে, সেই মহীয়সী বীরনারীর স্মৃতি-পূজার কোনো আয়োজন আসামে আজও পর্য্যন্ত হয় নাই। আসামের নারী-সমাজে আজ এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাদের উদ্যোগে প্রতিবৎসর শিবসাগরে সতী-শিরো-মণি জয়মতীর স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই নবজাগরণের দিনে, একদা যে বীর্য্যবতী আহোম বীরাঙ্গনা দেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়া জগতের সমক্ষে দেশাত্ম-বোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার বরণীয় স্মৃতির উপাসনা করিবার নিমিত্ত আজ আসামীয়া নারী-জাতিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে।

প্রদীপকুমার

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

প্রদীপের শিখা বেয়ে নেমে এল
প্রদীপকুমার আলো,—
কনকাঞ্চনে কমনীয় করি'
এ গৃহ-নিকষ কালো।
দুঃখদীনতামরণের ছায়া
আড়াল করেছে আপনারো কায়া,
গাহিয়াছি—"বীণা, প্রেমের শিখায়
প্রাণের প্রদীপ আলো…"
আজি দীপ-শিখা বেয়ে নেমে এল
প্রদীপকুমার আলো।

প্রদীপকুমার—ত্রিদিবের শিশু—
অমৃত-বার্ত্তাবহ,
নগ্নপ্রকাশ সত্যজ্যোতিঃ,—
নিত্যআসন লহ।
জীবনের যেই মহাকুবলয়—
পঙ্কমলিন-কণ্টকময়-
মৃত্যু-মৃণালে ফুটে কালে কালে,
তারি শুভবাণী কহ।
প্রদীপকুমার—ত্রিদিবের শিশু—
অমৃত-আত্মাবহ।

শিশুমঙ্গল

সন্তান-পালন

শ্রী অমিয়া দেবী

আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হ'চ্ছে সন্তান-গঠন করা; দেশের কাছে, জাতির কাছে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে যতখানি দায়িত্ব ও ঋণ আছে তা' পরিশোধ করবার উপায় হ'চ্ছে সুসন্তান গঠন ক'রে জাতিকে উন্নতির পথে সাহায্য করা—বিশ্ববিধাতাও যে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যেই নারীকে সংসারে পাঠিয়েছেন তা' তাঁর বিধিনির্দ্দেশ থেকেই উপলব্ধি করা যায়। নারী ইতিহাস বিজ্ঞান অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি যতকিছু জটিল বিষয় আয়ত্ত করুন না কেন সন্তানের দেহ ও মনকে যদি মানুষের মত ক'রে গ'ড়ে তুলতে না পারেন তবে তাঁর সে শিক্ষা ও জ্ঞানের কোন মর্য্যাদা থাকে না।

আজ আমি আপনাদের উপদেশ দিতে আসিনি, আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশের হাজার হাজার সন্তানহীনা মায়ের বুকের ব্যথাকে সমবেদনা জানাতে এসেছি। আপনারা আমার আবেদন মন দিয়ে শুনবেন আশা করি। পাশ্চাত্য দেশ-সকলের তুলনায় আমাদের এদেশের শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা কিরূপ ভয়াবহ-পরিমাণে বেশী তা' আপনারা শুনেছেন। তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে শিশুপালন সম্বন্ধে আমাদের নিদারুণ অনভিজ্ঞতা—প্রসবঘর থেকে আরম্ভ ক'রে শিশুর বাল্যজীবনের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত—যে পর্য্যন্ত তারা একান্তভাবে মায়ের উপরে নির্ভর করতে বাধ্য হয় ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের যে তাদের সম্বন্ধে কত বড় দায়িত্ব

থাকে তা আমরা সর্ব্বদাই ভুলে ব'সে থাকি, মায়েদের প্রতি এ অভিযোগের গুরুত্ব নেহাৎ কম নয়।

কি উপায়ে শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা হয় এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান দেবার জন্যে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা আজকাল অনেক-রকম উপায় অবলম্বন করছেন, তাঁরা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখছেন, সরল ভাষায় মেয়েদের বোঝাবার উপযোগী ক'রে বই লিখছেন, সভাসমিতি ক'রে বক্তৃতা ও চায়াচিত্র প্রভৃতির সাহায্যেও আমাদিগকে শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তবু যে আমরা জাগতে পারছিনে, এই গুরুতর জীবনসমস্যাকে মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারছিনে এ আমাদের অবহেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আপনারা সকলেই জানেন একটি ভয়ানক কুপ্রথা আমাদের দেশে, বিশেষ ক'রে পল্লীগ্রামে বর্ত্তমান আছে যে প্রসবগৃহকে অশুচি স্থান এবং প্রসূতি ও নবজাত শিশুকে অস্পৃশ্য ব'লে ধরা হ'য়ে থাকে। এই অন্ধবিশ্বাসের ফলে আমাদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রত্ন আলোক-বায়ুহীন ক্ষুদ্রপরিসর ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে, নোংরামির জীবন্ত মূর্ত্তি নীচ-জাতীয়া স্ত্রীলোকের শুশ্রূষার অধীনে মলিন ও দুর্গন্ধ শয্যার শুয়ে জীবনের প্রথম কয়েকটি দিন কাটাতে বাধ্য হয়। জন্ম গ্রহণের পরপরই শিশুর জীবনীশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে এবং প্রসূতিও অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকেন। এই সময়টাতে তাদের উভয়ের জীবনই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকে সুতরাং এ সময়ে পরিচ্ছন্নতা ও সাবধানতার অত্যন্ত প্রয়োজন; অথচ জ্ঞানের অভাবে আমরা এই সময়ে শিশু ও প্রসূতির প্রতি যে ব্যবহার করি তাহা অদ্ভুত, অধিকাংশ স্থলেই এই সকল দুর্নীতি প্রসবগৃহে শিশু ও প্রসূতির জীবনহানি ঘটায়।

এখানে প্রশ্ন উঠবে, এ সবের প্রতিকার করা কি সহজ? অনেকেই বলবেন, দেশের দারিদ্র্যই এসব কুপ্রথার মূল, কিন্তু আমি বলি দারিদ্র্য এর জন্য তত দায়ী নয়, যত দায়ী অজ্ঞানতা। আমাদের দেশের মেয়েরা শিশুদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে চেষ্টা করলেই মোটামুটি জ্ঞানলাভ করতে পারেন এবং সেই জ্ঞানটুকুকে যদি কাজের বেলায় খাটাতে চেষ্টা করেন তা হ'লেই এসব কুপ্রথা অনেকখানি সংশোধিত হ'য়ে ওঠে এই আমার বিশ্বাস। মেয়েরা নিজে তত্ত্বাবধান ক'রে প্রসবগৃহকে এমনভাবে তৈরী করাবেন যাতে ঘরে অবাধে আলোক প্রবেশ এবং বাতাস চলাচল করতে পারে। অবাধ আলোক এবং বাতাসই হ'চ্ছে মানুষের প্রাণশক্তি, তা' থেকে সদ্যোজাত শিশুকে বঞ্চিত করা অর্থে তাকে নিঃশ্বাস-রোধ ক'রে হত্যা করা,—এ যে কতবড় ভুল তা' ব'লে বোঝাবার নয়। আলো-বায়ুহীন অন্ধকূপে জন্মগ্রহণ ক'রে প্রাণশক্তির অভাবে আমাদের জীবনধন-নব প্রাণ দিচ্ছে আর মায়েরা দিনের পর দিন তাই চোখে দেখে আসছেন অথচ কোনরকম প্রতিকারের চেষ্টা করছেন না, একথা চিন্তা ক'রলে চোখে জল আসে। আর এক কথা,—পল্লী-গ্রামে যখন শিক্ষিতা নার্সের অভাব তখন প্রসূতি যতদিন নিজের ও শিশুসন্তানের ভারগ্রহণে অসমর্থ থাকেন ততদিন কোন নিকটআত্মীয়ার তাঁর ভার নেওয়া উচিত, তবে এটা যদি কোনস্থলে নিতান্তই সম্ভব না হয় তা হ'লে যে অজ্ঞান স্ত্রীলোকের প্রতি শিশু ও প্রসূতির শুশ্রূষার ভার দেওয়া হয় তার শরীর এবং কাপড়-চোপড় ডাক্তারি নিয়মানুসারে নির্দ্দোষ ক'রে নেওয়া উচিত। যত রকম রোগের জীবাণু অপরিচ্ছন্নতা ও অসাবধানতার সুযোগ পেয়েই শরীরকে আক্রমণ করবার সুবিধা পায়, বিশেষ ক'রে দুর্ব্বল অবস্থায় আক্রমণ করা আরও সহজ, সেই কারণে প্রসবগৃহে ব্যবহার্য্য কাপড়-চোপড় বিছানা প্রভৃতি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই এবং শুশ্রূষা-কারিণীরও যথোপযুক্ত পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা চাই। এতে বিশেষ রকম কিছু ব্যয়ও নেই, বিশেষ কোন পরিশ্রম বা অসুবিধাও হয় না অথচ এই চেষ্টার দ্বারা যদি আমরা শিশু ও প্রসূতির জীবনকে অনেকখানি নিরাপদ করতে পারি তবে এ চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত নয়? প্রসবাগারের দুর্নীতির ফলে আমাদের দেশের কত সদ্যোজাত শিশু ও তার অভাগিনী জননী অকালে জীবনলীলা সংবরণ করছে। আধুনিকালকার সভ্যযুগে এযে কত বড় লজ্জা ও দুঃখের বিষয় এটা আপনারা না বুঝলে তো চলবে না।

অনেক কথা বলবার এবং শুনবার সময় এবং সুবিধা হয়তো হ'য়ে উঠবে না, তবু আমি আর দু' একটি কথা ব'লে আপনাদের কাছে বিদায় নেব। আপনারা লক্ষ্য

ক'রে থাকবেন এদেশে বেশির ইংরেজ শিশু দেখা যায় আমাদের বাঙালী শিশুদের চেয়ে তাদের স্বাস্থ্য কত উন্নত! কাগজপত্রে সংবাদ জানা যায়, এদেশে এমন এক-একটি স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিশু এসপ্রহণ করে যারা দর্শকদের দৃষ্টিতে একটি পরম বিস্ময়ের বিষয়,কাগজে কাগজে তাদের স্বাস্থ্যের খ্যাতি ও ফটোচিত্র প্রকাশিত হয়; আমরা তাই দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে থাকি। আমাদের দেশে কি এমন শিশু হ'তে পারে না যার স্বাস্থ্যকে আমরা লোকের চোখের সাম্নে তুলে ধ'রে গৌরব অনুভব করতে পারি? হয়তো পারে, কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা কোথায়।

পরিচ্ছন্নতাই যে স্বাস্থ্যরক্ষার মূল এ আমরা সকলেই জানি কিন্তু মানিনে। আপনারা অনেকেই হয়তো শুনেছেন যে ধূলা থেকে 'হুক্ ওয়ারম্' বা বক্রকীট নামে এক-রকম জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ ক'রে তাকে অসুস্থ ক'রে তোলে। এই রক্তশোষক কীট শিশুর দেহে প্রবেশ ক'রে দিনে দিনে তার জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করতে থাকে এবং পরিণামে জীবন নাশ করে। যে পরিচ্ছন্নতা আমরা অল্প আয়াস-স্বীকার করলেই পেতে পারি তাতে অবহেলা ক'রে প্রকারান্তরে যে আমরাই আমাদের প্রাণাধিক সন্তানের প্রাণনাশের কারণ হই, এর চেয়ে বড় আক্ষেপের কথা আর কি হ'তে পারে?

শিশুদের খাদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণের প্রতিও আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন-কোন মা মনে করেন জোর-জবরদস্তি ক'রে বেশী বেশী খাওয়ালেই ছেলের শরীর ভাল হয়—বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সেটা ভুল। শিশুদের অনিচ্ছাতে জোর ক'রে বেশী পরিমাণ খাওয়ালে শৈশব থেকেই তাদের পাকস্থলী বিকল হ'য়ে যায়, ভবিষ্যতে জীর্ণ করবার শক্তি আর তাদের থাকে না, সুতরাং তাদের খাদ্যের প্রতি রুচি ও প্রবৃত্তি বুঝে শিশুদের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও এই কথা, অযথা কতকগুলো কাপড়ে ভারাক্রান্ত হ'য়ে শিশুরা হাঁপিয়ে না ওঠে অথবা অভাবে ঠাণ্ডালাগ না করে এ দুটোই লক্ষ্য করবার বিষয় কারণ এ দু'য়েতেই স্বাস্থ্যহানি হবার সম্ভাবনা। ছেলেদের পোষাক কখন আঁটসাঁট ক'রে পরাতে নেই তাতে তাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বাধা পায় এবং ইচ্ছামত অঙ্গসঞ্চালনেরও ব্যাঘাত ঘটে; এতেও বিশেষরকম স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

ছেলেরা স্বভাবতঃ চঞ্চল, সেটা তাদের দোষ নয় সেটা তাদের স্বভাব। ছুটোছুটি হুটোহুটি ছেলেদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর, এতে হজমক্রিয়া বেশ ভালভাবে হয় সুতরাং এতে বাধা দেওয়া বা অস্থির প্রকৃতির জন্য মার-ধোর করা মায়েদের কখনও উচিত নয়। ছেলেরা যদি সুস্থির হ'য়ে ব'সে থাকে বা শুয়ে থাকে সেইটেই তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক অর্থাৎ অসুস্থতার লক্ষণ ব'লে ধ'রে নিতে হবে। স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ছেলেরা কখনও স্থিরভাবে থাকতে পারে না, আশা করি মায়েরা একথা কখনই ভুলে যাবেন না।

স্বাস্থ্যরক্ষার সকলপ্রকার নিয়ম পালন করবার ফলে বিলাত, আমেরিকা, জার্ম্মানী ও জাপানের শিশুরা সবল ও কর্ম্মী হ'য়ে বেড়ে ওঠে, দীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকে, আর অজ্ঞানকৃত অযত্ন ও অবহেলার ফলে আমাদের দেশের ছেলের ধন-সব শীর্ণ দুর্ব্বল রোগগ্রস্ত হ'য়ে কোন-ক্রমে টিকে থাকে—আবার শেষ পর্য্যন্ত না-ও থাকে। পাশ্চাত্য দেশের অতি সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাও ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে থাকে আর আমরা অনেকেই সাধ্যসত্ত্বেও ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার করি। দেশের দুর্ভাগ্য, জাতির দুর্ভাগ্য, যে, জাতির মায়েরা আজও সন্তানপালন করা শিখে ওঠেনি, এর চেয়ে বড় লজ্জা মাতৃজাতির পক্ষে আর কি হ'তে পারে আমি জানি না।

মায়েদের কাছে আমার আর একটি আবেদন এই, সন্তানের দেহকে সর্ব্বপ্রকার অধঃপতি থেকে রক্ষা করা যেমন মায়ের অবশ্যকর্ত্তব্য, সন্তানের মনকেও তেমনি সকল-প্রকার দুর্নীতি থেকে রক্ষা করা মায়ের একান্ত উচিত। অনেকে মনে করেন প্রহার ক'রে এবং অশ্লীল ভয় দেখিয়ে শিশুকে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করাই ঠিক উপায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এর চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছুই হ'তে পারে না। প্রহার করলে ছেলেদের কোমল অস্থি ও গ্রন্থিসকল আহত হ'য়ে তাদের স্বাস্থ্যের হানি তো করেই,তারপর মায়ের ভয়ে ছেলেরা মিথ্যা বলতে অভ্যাস ক'রে ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মায়েদের অবিবেচনা ও ভুলশাসনের ফলেই

ছেলেরা দুষ্ট হ'য়ে ওঠে। যখন তারা বুঝতে বাধ্য হয় যে মায়েরা নিষ্ঠুর হ'য়ে তাদের শরীরে ব্যথা দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না তখন তাদের মনও ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। নির্দ্দয়ভাবে মার খেলে সে মায়ের সম্বন্ধে বাধ্যতা কতক্ষণ থাকতে পারে?

আর একটি অন্যায় মায়েরা অনেকেই ক'রে থাকেন, অবুঝ শিশুদের ক্ষুদ্র ত্রুটির জন্য দেখিয়ে তাদের অন্যায় কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করা হয়। এর কুফল যে তাদের জীবনের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে তা' তাঁরা কখনো চিন্তা করে দেখেন না। যে জিনিষ কখনো চোখে দেখিয়ে তাদের ক্ষুদ্রত্বকে ভাঙা যাবে না সেই সব জিনিষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকে তাদের মনে এমন একটা অন্যায় আতঙ্ক জ'মে যায় যাতে তাদের সদা-উৎসাহশীল প্রসারিত সাহসী চিত্ত দুর্ব্বল ও সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে, সেই দুর্ব্বল মন নিয়ে তারা ভবিষ্যতে কোন বড়কাজ করবার সাহস সংগ্রহ করতে পারে না। মায়েরা ছেলেদের যেন কখনই অলীক ভয় না দেখান অথবা তাঁদের প্রাণগত সন্তানের অঙ্গে আঘাত না করেন এই আমার বিশেষ অনুরোধ। শিশুকে শিশুর ভাষায় সরলভাবে অন্যায় বুঝিয়ে দিয়ে স্নেহের অনুযোগে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করাই উচিত, প্রহার ক'রে অথবা ভয় দেখিয়ে তাদের শারীরিক ও নৈতিক অবনতি করা কত-বড় অসঙ্গত কাজ তা' আপনারা ভেবে দেখবেন।

পাশ্চাত্য দেশে ছেলেদের মনস্তত্ত্ব অনুধাবন ক'রে তাদের মনের অভিযোগের প্রতিকার করবার ব্যবস্থা আছে। সে-দেশের মনীষীরা বড় বড় সংশোধনাগার স্থাপিত ক'রে অবাধ্য দুর্দ্ধর্ষ ছেলেমেয়েদের জন্যে প্রাণের দরদ দিয়ে অকৃত্রিম স্নেহ দিয়ে তাদের সৎ হবার পক্ষে সাহায্য করছেন, তাঁরা অসৎ বালকবালিকাদের সংশোধন ক'রে ভাল ক'রে তুলতে সক্ষম হ'চ্ছেন। এই যে সৃষ্টির চেষ্টা, এর মূলে আছে জাতির উন্নতির জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা, তাই আজ তাঁরা উন্নতি বিষয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে গেছেন।

সন্তানগঠন করা কুদ্র ব্যাপার নয়, সহজ নয়, এ এক নারীজীবনের সুকঠিন সাধনা। ইতিহাস বলছে, যে-দেশের মায়েরা সন্তানকে গ'ড়ে তোলবার মহাকর্ত্তব্য সাধন করেছেন, সেই দেশের মাটিতে গ'ড়ে উঠেছে মহান্ বীর-জাতি, যারা জীবনযুদ্ধে জয়ী হ'য়ে অন্যকে পদানত করতে পেরেছে, যারা জ্ঞানগরিমায় দীপ্ত হ'য়ে পৃথিবীর সমাজে বরণীয় হ'য়েছে। বিজ্ঞান দেখিয়ে দিচ্ছে মানুষের প্রাণপাত চেষ্টার ফলে মানুষ রোগকে জরাকে জয় করছে, দীর্ঘায়ু হ'চ্ছে, স্বাস্থ্যকে অটুট করতে সক্ষম হ'চ্ছে। আমাদের গ'ড়ে তুলতে হবে সেই মানুষের জাতিকে যারা অন্তরে বাহিরে শক্তিমান হ'য়ে সভ্যযুগের সকল শক্তির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারবে।

আজ নারীসমস্যার দিনে আমরা নিজেদের হারানো সম্মানকে ফিরে পাবার জন্য কাগজে-কলমে আন্দোলন আরম্ভ করেছি, কিন্তু একথা আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, দুর্ব্বল হীনচিত্ত সন্তানদের কাছে শ্রদ্ধা পাবার আশা মায়েরা কখনো করতে পারেন না। যাদের কাছে আমরা শ্রদ্ধার দাবী করছি আগে মায়ের জাতিকে শ্রদ্ধা করবার উপযুক্ত শিক্ষা তাদের দিতে হবে। স্বাস্থ্যে ও নৈতিক চরিত্রে আমাদের সন্তানদের যেদিন আমরা প্রকৃত মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারব সেইদিনই মাতৃজাতির সুকঠোর সাধনা সার্থক হবে। বিশ্বজগতের মূলস্বরূপা মাতৃ-জাতির সন্তানগড়ার বিপুল ভারকে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি ক'রে বিশ্বের সন্তানরা সেদিন এই অবমানিতা মায়েদের বিরাট মাতৃত্ব-মহিমার চরণতলে নিশ্চয়ই এসে মাথা নত ক'রে দাঁড়াবে।

—বিদেশের— মহিলা-সমিতি

জাতীয় মহিলাসমিতি-সংঘের বার্ষিক উৎসব

এবার বিলাতের জাতীয় মহিলাসমিতি-সংঘের বার্ষিক উৎসব ব্ল্যাকপুল সহরে সুসম্পন্ন হয়। এই মহাসভার সাফল্যের কারণ বিশেষভাবে জাতীয় মহিলাসংঘের সভানেত্রী মিসেস ডেনম্যানের অদম্য উৎসাহ এবং অপরিসীম কর্ম্মশক্তি। তাঁহার কর্ম্মশক্তির কথা শুধু মহিলাসমিতিতেই নহে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও সুপরিচিত। পর্য্যায়ক্রমে মিস গ্যাসকেল ও মিসেস অরব্যাক্ অপরাহ্ণকালীন অধিবেশনে সভানেত্রীর কার্য্য করিতেন। আদি অন্ত সভায় বক্তৃতা অতি সুন্দরই হইয়াছিল। আর কখনও গ্রাম্য মহিলাদিগকে নির্ব্বাক নারীসমাজ বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে না। সভায় প্রত্যেক বক্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া প্রত্যেকটি মন্তব্য পাশ করা হয়। গ্রামে পর্য্যাপ্ত জল সরবরাহ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনাকালে পর পর মহিলারা অতি সরলভাবে এবং দৃঢ়তার সহিত অপর্য্যাপ্ত জলের অসুবিধা, বিপদ এবং বিষময় পরিণাম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ধৌত কার্য্যের জন্য যাহাতে জল ঐ উদ্দেশ্যে অন্য প্রতিবেশীকে দেওয়া, অনেক স্থানে প্রসবকালে পর্য্যাপ্ত জলের অভাবে ব্রাউন কাগজ ব্যবহার করা, অনেক গ্রামে বাল্‌তি হিসাবে জল বিক্রয়, গৃহিণীর স্বাস্থ্য যতই খারাপ হউক না কেন জল আনিবার জন্য প্রাকৃতিক সূর্য্যোদয়ের ভিতরে বহুদূর গমন, একজন ডাক্তারের ছয় মাইল দূরে গিয়া শিশুকে ধৌত করার জন্য জল-আনয়ন ইত্যাদি কথা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এতই ধৈর্য্য এবং বিচারবুদ্ধির সহিত শ্রবণ করিয়াছিল যে তাহা হইতে বোঝা গিয়াছিল অনেকে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে এইরূপ আরও অনেক কথা বলিতে পারিতেন। এই সকল গূঢ় আলোচনার মধ্যে একজন মহিলা কৌতুক করার জন্য বলিয়া উঠিলেন যে তাঁহার পিতা জলের অভাবে 'ও' রূপের ছবি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। 'টাওয়ার বল রুম'—যেখানে এই বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সে স্থানে এই শ্রোতৃমণ্ডলীর সকল আশাই পূরণ হইয়া গিয়াছিল, দুই হাজার প্রতিনিধি এবং দর্শক অতি স্বচ্ছন্দেই এখানে উপবেশন করিতে পারিয়াছিলেন। ব্ল্যাকপুল সহর দুই দিন কার্য্য এবং

ব্ল্যাকপুল সহরের মেয়র ও মেয়রেস্ (বসিয়া);
লেডী ডেনম্যান ও মিঃ রিচার্ডস্ (পশ্চাতে)

আমোদপ্রমোদে মুখরিত হইয়াছিল। এই সহর নারী-আন্দোলনের কর্ম্মীদের বিশেষ ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য। এই সহরের মেয়র, পরিষদের সভ্য গস্ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী উদার নাগরিক আতিথেয়তার প্রতিনিধিস্বরূপ। মেয়র জাতীয় মহিলাসমিতি-সংঘের প্রতিনিধি এবং জেলাসংঘের প্রতিনিধিগণকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মহাসভার পূর্ব্বদিন এই ভোজের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহিলা-সমিতিগুলির পক্ষ হইতে লেডী ডেনম্যান মেয়রকে এই

ভোজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মহিলাসমিতিগুলি সর্ব্বদাই সুব্যবস্থা এবং সুখদায় প্রশংসা করিয়া থাকে, তাই ভোজের আয়োজন ব্যাপারে মেয়রের সেক্রেটারী মিষ্টার হাইট বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ব্ল্যাকপুল সহরের আশ্চর্য্য আতিথেয়তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। টাওয়ার বলরুম এবং এই স্থানের অন্যান্য আসবাবপত্রের ব্যবহারের জন্য জাতীয় সংঘের কর্ত্রীদের কোনই খরচ বহন করিতে হয় নাই। ব্ল্যাকপুল সহরের প্রচার-বিভাগের পরিচালক মিষ্টার ফরেষ্টারও বিশেষ প্রশংসার পাত্র, সভার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা তাঁহার সহিতই করা হইত। টাওয়ার বলরুমে লেডী চেনম্যানও একটি সামাজিক মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই ভোজের ঘোষণা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রীতি-জলযোগের ব্যবস্থা না থাকিলে মহিলাসমিতির কোন অনুষ্ঠানই পূর্ণাঙ্গ হয় না। লেডী চেনম্যানের এই সামাজিক মিলনোৎসব এতই সুন্দর হইয়াছিল যে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। প্রত্যেকটি বিষয়ই অতি মনোরম হইয়াছিল; গান-বাদ্য অতিশয় আনন্দদায়ক ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

• • •

কানাডায় কোঅপেরেটের মহিলাসমিতিগুলি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সাধারণের উৎসাহ উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করিতেছে। ইতিমধ্যে এই প্রদেশের সতেরটি জেলায় স্বাস্থ্যবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এইরূপ আইনের ব্যবস্থা হইয়াছে, যে, যেখানে অন্যূন যে সকল মিউনিসিপ্যালিটি-সংঘে একজন স্বাস্থ্যপরিদর্শক, একজন অথবা ততোধিক শুশ্রূষাকারিণী, সর্ব্বসময়ের জন্য নিযুক্ত একজন ডাক্তার এবং একজন সম্পাদক লইয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, সরকার হইতে তাহার অর্দ্ধ ব্যয়ভার বহন করা হইবে। আমাদের দেশেও হেল্‌থ-অফিসার এবং স্বাস্থ্য-পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। মহিলাসমিতিগুলি এই কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

ইয়র্কসায়ার মহিলাসংঘে 'ইয়র্কসায়ার বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ সংঘ' বিনা পারিশ্রমিকে বৈদ্যুতিক শক্তি বিষয়ে বক্তৃতা দান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বার্ষিক উৎসবে জেলাসংঘের প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে ঐ সংঘের সভ্যা-সংখ্যা বর্ত্তমানে চৌদ্দহাজার পাঁচ শত। গত বর্ষে সভ্যা-সংখ্যা প্রায় এক হাজার আট শত বৃদ্ধি হয়।

ষ্টকটনের মহিলাসমিতি-সংঘের মুখপত্র হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উইগ্‌টনসায়ার মহিলাসংঘ পোষাক প্রস্তুত করার ক্লাস পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়াছে; প্রায় ২৪টি সমিতির জন্য একটি সপ্তাহস্থায়ী পোষাক প্রস্তুতের ক্লাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এই প্রণালী তাঁহাদের মতে সকলতর এবং অল্পব্যয়সাপেক্ষ।

ক্যাম্বেল আপ্স মহিলাসমিতি কয়েক ঘর বিভিন্ন পরিবারের মহিলাদের নিয়াই প্রতিষ্ঠিত। সভ্যা-সংখ্যা খুব কম, কিন্তু তাহাতে সভ্যাদের উৎসাহ বা কর্ম্মের অভাব নাই। একটি পোলাবাড়ীতে সভার অধিবেশন হয়। এই ঘরখানি অতি মনোরম, পূর্ব্ব এবং পশ্চিমে ইহার জানালা রহিয়াছে। সেই জানালা হইতে ফল এবং পুষ্পে সুশোভিত সুন্দর বাগান দেখা যায়। ফলের চাষই এই স্থানের প্রধান ব্যবসা। চিকণের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য এই স্থানে একটি ক্লাস হয়। শিক্ষয়িত্রী সমিতিরই একজন সভ্যা। চেল্‌টেনহামে যে অভিনয়-উৎসব হয় এই সমিতি তাহাতে একটি প্রশংসাপত্র লাভ করেন। সমিতিতে বহু বন্ধুরাই উপস্থিত হন। মাসিক সভায় ভাবের আদান-প্রদান এবং আলোচনা তাঁহারা সব চেয়ে বেশী উপভোগ করিয়া থাকেন। যে সব মহিলা এই ভাবে আলোচনা পরিচালনা করেন তাঁহাদের নিকট সমিতি কতই ঋণী। ক্যাম্বেল আপ্স মহিলাসংঘ দিন দিন উন্নতি করিবে এবং অধিকতর সুখী সমিতি হইয়া উঠিবে। এই মাসের নীতিস্বরূপ নিম্নলিখিত কথাটি গ্রহণ করা হইয়াছে:—মানুষ শুধু অর্থের দ্বারাই জীবনধারণ করে না, কিন্তু সমাজের প্রত্যেকটি ভ্রাতৃভাব এবং সাহচর্য্যের অমূল্য দানের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে।

জাতীয় মহিলা-সংঘের সংবাদ

গত বার্ষিক সভায় যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটির নিম্নলিখিত ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:—

(১) এই সভা পারিবারিক বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন, এবং সেই-জন্য কৃষিশিক্ষাসহ গ্রাম্য পারিবারিক অর্থনীতি বিজ্ঞানকেও মহিলাদের শিক্ষার অন্তর্গত করায়, কৃষিমন্ত্রী এই কার্য্যের সবিশেষ সমর্থন এবং প্রশংসা করেন।

(২) এই সভা শিক্ষাবিভাগকে বিশেষ অনুরোধ করেন যে তাঁহারা যেন মেয়েদের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করার বয়স বৃদ্ধি করায় যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইবে তাহাতে যে প্রকারে মেয়েদের এবং মহিলাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে তদনুরূপ আয়োজন করেন।

(৩) এই সভা মহিলাসমিতিগুলিকে স্থানীয় শিক্ষা-বিভাগের সহিত এই শিক্ষাবিষয়ক প্রয়োজনীয়-তার সমাধানে একযোগে কাজ করিতে অনুরোধ করেন।

বিশ্রাম-আবাস

মহিলাসমিতির সভ্যারা এবং মজুর মহিলারা 'মেরী ম্যাক আর্থার বিশ্রাম-আবাসে' বিশ্রামলাভ এবং বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য উপস্থিত হইতে পারেন। যদি কোন বিশ্রামপ্রার্থী নির্দ্ধারিত সাপ্তাহিক খরচ ২০ শিলিং না দিতে পারেন তবে তিনি পূর্ব্বাহ্নে তাহা জানাইলে তদনুযায়ী নির্দ্ধারিত খরচ কিছু কমান যাইতে পারে। আবেদনকারিণীর সততার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে বলিতে দেওয়া হয় তিনি কত দিতে পারিবেন।

লেডী ডেনম্যানের বক্তৃতা

সর্ব্বপ্রথমে সভানেত্রী জাতীয় মহিলা-সংঘের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা মিস কার্ত্তসনের কর্ম্মপরিত্যাগের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতিশয় মনোমুগ্ধকর ব্যবহার, অদম্য উৎসাহ এবং প্রত্যেক কাজে তাঁহার পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তির কথা বলেন। সভানেত্রী বলেন যে, মিস কার্ত্তসন বিবাহিত হইয়া বর্ত্তমানে মিসেস জেনকিন্স হইয়া থাকিলেও তিনি মিস কার্ত্তসন বলিয়াই তাঁহাকে স্মরণ করিতে চান। মিস কার্ত্তসন কত দশ বৎসর এই জাতীয়সংঘের সম্পাদিকার কার্য্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন সভ্যা। তৎপরে তিনি মিসেস অরব্যাক এবং লেডী ডোরোথি মেনেল-এর কর্ম্ম-দক্ষতার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, মিসেস অরব্যাক সমিতির জটিল আর্থিক সমস্যা সমাধান করিতে গিয়াও কোনদিন একটু বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। তৎপরে তিনি বলেন যে, তিনি গ্রাম্যজীবনের উপযোগী মহিলাদের শিক্ষা বিষয়ে কিছু বলিতে চান। যদি মহিলা-সমিতি মহিলাদের শিক্ষা বিষয়ে সত্যই কিছু সাহায্য করিতে চান তবে এই বিষয়ে কি করা হইয়াছে এবং কি করা বাকী আছে তাহা জানা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহিলাসঙ্ঘের কর্ম্মনির্ব্বাহক সভা দুইটি প্রস্তাব লইয়া কৃষিবিভাগের নিকট উপস্থিত হন। প্রথম প্রস্তাব এই যে, কৃষি বিভাগ হইতে মহিলাদিগকে গোলাবাড়ী-রক্ষা বিষয়ে শিক্ষা দান করা হউক। কৃষি-বিভাগ অতি সজ্জনতার সহিত এবং সহানুভূতির সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং সরকারের নিকট হইতে কোন একটি কৃষিকলেজকে বদ্ধ করিয়া পরিবার-পরিচালন এবং গ্রাম্য পারিবারিক অর্থনীতি শিক্ষা দিবার মত শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারী করার জন্য অর্থসাহায্য আশা করা যাইতেছে। আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, কৃষি-বিভাগের পক্ষ হইতে অধিকসংখ্যক পরিদর্শনকারিণী নিযুক্ত হইবেন—যাঁহারা মেলা-সঙ্ঘগুলিকে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। ইহা অতীব সমীচীন প্রস্তাব বলিয়া মনে হয়, কারণ অনেক স্থানে কৃষিবিভাগের সহানুভূতি সত্ত্বেও চেষ্টা এবং উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে কোন কোন সমিতিতে কৃষি, গো-পালন, পক্ষী-পালন ইত্যাদি শিক্ষা অতি সুন্দর হয়, কোন কোন স্থানে ইহা একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তৎপরে লেডী ডেনম্যান বলেন যে জাতীয় মহিলাসঙ্ঘের পক্ষ হইতে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ানের নিকট আমরা উপস্থিত হইয়াছিলাম। দুইটি বিষয়ে প্রধানতঃ আমরা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। প্রথম কথা এই যে, একটা জাতি সুখী এবং উন্নতিশীল পল্লীজীবনের উপর নির্ভর করে। গ্রাম্যজীবনে সুখী এবং সফল হইতে হইলে স্ত্রী এবং পুরুষকে গ্রাম্যবিষয়ে উৎসাহী হইতে হইবে। গ্রাম্য-

জীবনে এবং গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহী হওয়া বিদ্যালয়ে দত্ত বিশেষ শিক্ষার উপর নির্ভর করে এবং এই শিক্ষাদান কার্য্যেও শিক্ষকের বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। সেইজন্য আমরা চাই, শিক্ষকদের জন্য যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহাতে তাঁহাদিগকে এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হউক যে তাঁহারা শিশুশিক্ষায়ও যেন সমর্থ হন। দুই-একটি ট্রেনিং কলেজে গ্রাম্য শিক্ষকদের জন্য বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হউক। আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে, বিদ্যালয় পরিত্যাগের বয়স বৃদ্ধি হওয়ায় যে নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করা হইবে তাহাতে যেন স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয় যে তাঁহারা বালিকাদের শিক্ষায় পারিবারিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। গ্রাম্য মহিলাদের শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা-পরিষদের যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া গিয়া থাকিলেও অতি অল্পসংখ্যক সমিতিতে তাঁহারা শিক্ষা-শ্রেণীর ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যদি শিক্ষা-পরিষদের নির্দ্দেশমত এই শিক্ষাদান কার্য্যে উৎসাহী হন তবে অতি অল্পকালের মধ্যেই অনেক কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, কোন কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গ্রাম্য মহিলাদিগকে শিক্ষা দান করা তাঁহাদের কার্য্য বলিয়াই মনে করেন না। পারিবারিক বিজ্ঞান এবং রন্ধনকার্য্য আমরা এই জন্যই অতি প্রয়োজনীয় মনে করি যে, ভাল খাদ্যের উপরই শিশুর স্বাস্থ্য এবং জাতির শক্তি নির্ভর করে। অল্প আয়ে সংসার চালান অতি দক্ষতাসাপেক্ষ কাজ, এবং জাতির পক্ষে এই নিপুণতা অতি আবশ্যক। গ্রাম্য মহিলাসমিতিগুলি গ্রাম্য-জীবনকে অধিকতর স্বাস্থ্য, সুখ এবং সম্পদশালী করিতে চায় এবং তাহা করার জন্য মহিলাদের নিপুণা গৃহিণী হইতে হইবে। অনেক স্থানে এইরূপ শিক্ষাদানে কর্তৃপক্ষের অনেক অন্তরায় থাকিলেও ইহা স্বীকার্য্য যে গ্রাম্য মহিলাদিগকে অল্প আয়ে অধিক কার্য্য করিতে সক্ষম করা এবং শিশুদিগকে স্বাস্থ্যবান করিতে সাহায্য করা সরকারের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

ভাদ্র

শ্রী শম্ভু মুখোপাধ্যায়

'ভাদর এসে গেছে শাওন ঘুরে',
লাজুক কেয়াফুল মরেছে ঝুরে'।
সুনীল নভতলে তুলায় রাশ চলে,
জগৎ মেতে গেছে আলোর সুরে।

উটজ ভরেছিল কুটজ ফুলে,
ময়ূর মেতেছিল নীপের মূলে।
আবেগ-ভাঙা বুকে, ছকূল-ভাঙা সুখে
তটিনী ছুটেছিল নদের কূলে'।

খসিত পূবে বায় আকুল-করা,
ঝরিত ঝরঝর অঝোর ঝরা।
বনের পাতাগুলি কাঁপনে ধীরে দুলি'
শিহরি' উঠেছিল আবেশে ভরা।

ধূধিকা হেসেছিল সলাজ হাসি,
আঙনে করেছিল শেফালি রাশি।
তেমন দিনে হায়, কেমনে ভোলা যায়?
দাওনি দেখা প্রিয় বারেক আসি'!

বরষা গেছে চলি' শরতে আজি,
ধরণী বধূবেশে উঠেছে সাজি'।
যূথকো লতাগুলি প্রাচীরে মাথা তুলি'
দেবাকে বুকে ধরে কুসুমরাজি।

গগনে নাহি আর মেঘের জটা,
থেমেছে বাদলের অশনি-ঘটা।
না দেখি আঁকাবাঁকা রূপালি জ্যোতিরেখা,
কালোর বুক চিরে' আলোর ছটা।

উষায় উঠি' আজ কুসুমবনে
বুঝি বা চেয়েছিনু আপন মনে—
কাহার চুমু পেয়ে সেকালি প'ল মুখে
গাছের তলদেশে এহেন ক্ষণে!

অশোক-কলিগুলি উঠিছে ফুটি',
পাতার আড়ে আড়ে সোহাগে লুটি'।
সেই সে প'ড়ো ঘরে বকুল আলো করে,
যেখানে জুটিতাম আমরা দুটি!

সবুজ থরথর পাতার বুকে,
একের পাশে সব হারানো মুখে—
অতসী গেছে মেতে শ্রিয়ের পরশেতে,
মরণজয়ী প্রাণ ফুটেছে মুখে!

বুঝি বা চুপে চুপে নিশুতি রাতে,
ধরণী মিলেছিল প্রাবৃট সাথে।
তাই সে বুকে তার ধানের কলতান,
সকল হালিতরা আজিকে প্রাতে।

চাঁদিনী রাতে আজ জোছনা-হাসি
ভাসায়ে দেছে সব সাঁঝেতে আসি'।
এহেন শুভ'ক্ষণে, আমার গৃহকোণে
এ মোর বুকভরা আঁধাররাশি!

তখনো তাড়া মোর হৃদয়পুরে
বাদল মেতে ছিল উদাস সুরে।
ব্যথিত! এলে নাকি? বাহিরে চেয়ে দেখি,
"ভাদর এসে গেছে শাঙন ঘুরে'!"

বুকের ভাষা

শ্রী সরোজনাথ ঘোষ

সাহিত্য বুকের ভাষারই মূর্ত্ত প্রকাশ। চিন্তার সূক্ষ্মতম ধারাকে, কল্পনার বিচিত্র অনুভূতিকে মানুষ শব্দের সাহায্যে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। অবশ্য কল্পনায় যাহা-কিছু অনুভব করা যায়, বুকের মধ্যে যতপ্রকার অনুভূতির স্পন্দন দ্রুততালে অথবা মৃদুগতিতে নৃত্য করিতে থাকে, ভাষায় এমন কোনও শব্দ নাই যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্তই প্রকাশ করিতে সমর্থ। মানবের অনুভূতিতে এমন অনেক অবস্থার উদয় হয়, যাহা চিরদিনই, সর্ব্বজনের পক্ষেই 'অবাঙ্মনসোগোচরঃ' হইয়াই থাকিবে। কোন কবি, কোন সাহিত্যিক, কোনও দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক অপূর্ব্ব প্রতিভা বলেও মানবমনের চিন্তাধারার সকল কথা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। তাই "বুকের ভাষা"র ধরণী কবি ললিত ছন্দে বলিয়াছেন—

"যে কথাটি যায়নি বলা
মুখের সহজ কথায়,
সেই কথাটি জানাতে চাই ইঙ্গিতে;
যে বিরহী বাজায় বীণা
গোপন বুকের ব্যথায়—
সুর হ'য়ে এ বাজে তাহার সঙ্গীতে!"

বুকের ভাষা বুঝিতে হইলে দরদী হৃদয়ের প্রয়োজন। সে হৃদয় উন্মুখ হইয়া অপরের মনোমন্দিরের দ্বারে কাণ পাতিয়া থাকে, তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে অপরের বুকের ভাষা শব্দময় হইয়া ধ্বনিত হইতে থাকে।

কবি শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী—দরদী কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মানবমনের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে তিনি ঝঙ্কার তুলিতে সিদ্ধহস্ত। কথাসাহিত্যেও যে

তাঁহার সমান অধিকার আছে, ইহা "বুকের ভাষা" পড়িবার আগে বুঝিতে পারি নাই। "বুকের ভাষা"র তিনি চতুর্দ্দশটি গল্পকাব্য কথাসাহিত্যের পরিচ্ছদে পাঠক-সমাজে বাহির করিয়াছেন। কথাসাহিত্যের ছোটগল্প-পর্য্যায়ে সকলগুলিকে ফেলিতে না পারিলেও গীতি-কবিতার শ্রেণীতে অনেকগুলিকে শ্রেষ্ঠ স্থান অবশ্যই প্রদান করা চলে।

কাব্য-সাহিত্য শুধু ছন্দের অবয়বে আবদ্ধ নহে। যাহার মধ্যে রসের প্রকাশ আছে, ছন্দোবন্ধে গ্রথিত না হইলেও তাহা কাব্য—মধুর কাব্য।

রাধাচরণ বাবুর এই নূতন সংগ্রহে "বুকের ভাষা", "পূর্ব্বরাগ", "রাঙা গোলাপ", "স্বপন", "প্রেম", "ঘরের সন্ধ্যা", "ঝরা ফুল" প্রভৃতি এক-একটি অপূর্ব্ব গীতি-কবিতার মত সুন্দর, অনবদ্য এবং ছন্দা।

"বুকের ভাষা" শীর্ষক কবিকাটি রাধাচরণ বাবুকে যশস্বী কথাসাহিত্যিক বলিয়া অভিনন্দন-দানে কৃপণতা করিবে না। তাঁহার "ঘরের সন্ধ্যা" শুধু অনবদ্য নহে, চমৎকার! একস্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বন্ধু বল্‌লেন,—বন্ধু! শুধু বাইরের সন্ধ্যা দেখে' ফিরে' গেলে আজ তোমার সন্ধ্যা দেখাটাই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। ঐ দেখ ঐ ঘরের সন্ধ্যার দিকে একবার চেয়ে—কেমন সুন্দর! মা শিশুর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাচ্ছেন,—শিশুর কলহাসি হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে আস্‌ছে! —মায়ের কালো এলোচুলের অন্ধকারে নিদ-জড়া ঐ শিশু-সন্ধ্যা—কী সুন্দর!

"আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লাম।

"বন্ধু বল্‌লেন—'হায় বন্ধু! তোমার যে মা নেই'!"...

পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে উজ্জ্বল, নধুর, পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি সন্ধ্যার অন্ধকার পটের উপর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতে বাধ্য। রাধাচরণের লেখনী জয়যুক্ত হউক!

"নারীর অভিমান" ও "বিদ্যুতের শেষ ও শুক্রের সকাল" দীর্ঘক গল্পে কথাসাহিত্যের রসটুকু ঘনায়িত হইয়া উঠিয়াছে। লেখক যে কবি, তাহা তাঁহার রচিত প্রত্যেক গল্পে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "ভিখারী" গল্পে তাঁহার উদার মানবপ্রেমের অভিব্যক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

বর্ত্তমান যুগে অনেক তরুণলেখকের রচনায় যে উৎকট বীভৎস রসের কেণপুঞ্জ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবাহধারায় ভাসিয়া চলিয়াছে, কবি ও কথাসাহিত্যিক রাধাচরণের রচনায় তাহার একান্ত অভাব। বয়সে ও মনে তরুণ হইয়াও পঙ্কিল প্রবাহধারায় তিনি অবগাহন করেন নাই, প্রতীচ্যের মোহে আত্মস্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হন নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে শ্লাঘার কথা। তিনি কবির দৃষ্টিতে, বাঙ্গালী কথা-সাহিত্যিকের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে চিরন্তন মানবমনের কয়েকটি জটিলতম বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং কবির ছন্দে দিয়া তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তরুণ সাহিত্যি-কের পক্ষে ইহা বিশেষ গৌরবের কথা।

আশা করা যায়, উত্তরকালে তিনি কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারে উজ্জ্বল রত্নসমূহ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিবেন। তবে একটা কথা, "বুকের ভাষা"র তিনি বিভিন্ন গীতি-অনুপাতে ভাবের বাহনের পরিণাপন্ন হইয়াছেন; ইহা পরিহার করিয়া তাঁহার নিজস্ব ও নির্দ্দিষ্ট বাহনের ব্যবস্থা করিলে ভবিষ্যতে আরও খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

---

* শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত—বুকের ভাষা। মূল্য—১৲ একটাকা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শিল্প-জগতে নারী

শিল্প-জগতের প্রত্যেকটি দিকেই বিচিত্র নারীপ্রতিভা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে অত্যাশ্চর্যরূপে—অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের বীর্যশক্তিকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়া।—বঙ্গলক্ষ্মীর পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা প্রতি মাসেই ইহার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি। এ মাসের পরিচয়—

লিথোগ্রাফ

লোমাবাড়ীর ঘোড়া

এই লিথোগ্রাফ-চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন—কুমারী এল্‌জি হেণ্ডারসন্। লণ্ডন, রেডফার্ণ গ্যালারিতে এই চিত্রটি সংরক্ষিত আছে।

ধাতব চিত্র

এই ধাতব বাস-চিত্রটির পরিকল্পনা করিয়াছেন—শ্রীমতী লুইজ ক্রস্। ইহা নিউইয়র্ক নগরীর ধান-জনতা বাজের সহিত সূচিত করিতেছে।

নিউইয়র্কের রাস্তার ধান-জনতা (বাস চিত্র)

বার্ণিস চিত্র

কুমারী মারটুড্ ব্রিস্‌টেন্ এই বার্ণিস-চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন একটি 'ট্রে'-র উপর। চিত্রটি প্রাচীন

"ওট্‌ল্যাণ্ডস্ পার্ক" স্থাপিত করিতেছে—যখন ইহা রাজকীয় উদ্যানরূপে রক্ষিত ছিল।

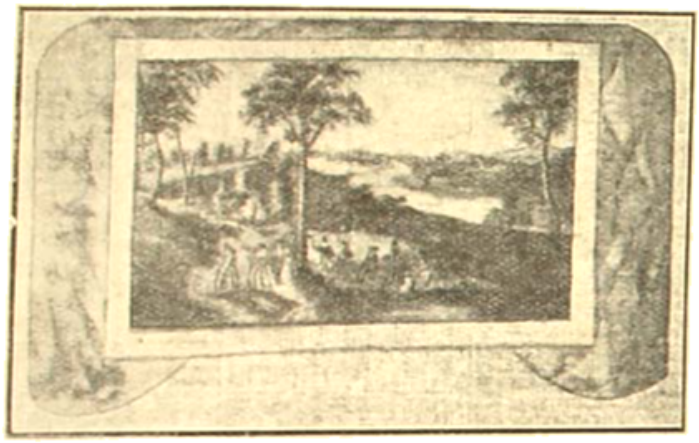

ওট্‌ল্যাণ্ড্‌স্ পার্ক

ক্লাবের সভানেত্রী

মিসেস্ মার্থা বেন্‌সন্ লুয়ব

শ্রীযুক্তা মার্থা বেন্‌সন্ লুয়ব—নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ 'নগর মহিলা সঙ্ঘের' (Women's City Club) সভানেত্রীরূপে বিবিধ নারী তথা জন-হিতকর কার্য্য করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

ষ্টেট-একাউণ্টাণ্ট (সরকারী হিসাবরক্ষক)

ইনি—মিসেস্ সি, ডাব্লিউ উইলাটন—'ক্যানাস্' ষ্টেটের সরকারী হিসাবরক্ষক এবং সহকারী বাজেট-ডিরেক্টররূপে বিশ্ব-মহিলাসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 'টোপেকা'—ইঁহার জন্মস্থান। উক্ত ষ্টেটের গত

মিসেস্ উইলাটন

বৎসরের আয়ব্যয়ের যে রিপোর্ট সম্প্রতি ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 'ক্যানাস'সরকার ইঁহার পাণ্ডিত্য ও সম্পাদন-কৃতিত্বে চমৎকৃত হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী মেয়ে

এ বৎসর (১৯৩০) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীযুক্তা উমা বসু বি-এস-সি (একস্‌পেরিমেণ্টল সাইকলজি) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪১ জন বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১২টি অনার্স বিভাগে ও ৬টি 'প্রতিষ্ঠের সহিত' উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ হইতে শ্রীযুক্তা বিভা সেন গুপ্ত অঙ্কশাস্ত্রের অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সুস্মিতা লাহিড়ী (ডাইয়সিসন), কমলা দত্ত, সুরভি সিংহ, বীণাপাণি রায়, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ (বেথুন) ইংরাজি ভাষায়; বসনা সেন (বেথুন), শোভনা গুহ (বরিশাল) সংস্কৃত ভাষায়; সত্যবতী চক্রবর্ত্তী, কমলকুমারী নাগ (বেথুন) দর্শন শাস্ত্রে, লাবণ্যলতা সেন গুপ্ত (বেথুন) অঙ্ক শাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আই-এ পরীক্ষায় প্রায় ৫৯টি ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দুইটি মুসলমান ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আই এস-সি পরীক্ষায় ১১টি ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে বেথুন কলেজ হইতে ৬টি উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আর্য্যনারী সমিতি (সিমলা)

১৯২৩ সালে ১৮ই জুন ব্রহ্মের আচার্য্য প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র ৭জন সভ্যা লইয়া এই সমিতি গঠিত হয়, ক্রমে ৩২ জন সভ্যা হন, বর্ত্তমান বৎসরে ১১ জন সভ্যা আছেন।

উদ্দেশ্য —সকলে একত্রে মেলামেশা করিয়া পরস্পর প্রীতি বৃদ্ধি করা, পরস্পর মিলনের ফলে নানা বিষয়ে শিক্ষার আদানপ্রদানের সুযোগ, সদ্‌গ্রন্থপাঠ, সদালোচনা, শিল্পশিক্ষা এবং সমিতির আয় হইতে সম্ভবমত অনাথ-আতুরকে অর্থসাহায্য, দুর্ভিক্ষে অর্থসাহায্য, জামা-কাপড় ইত্যাদি সেলাই করিয়া দরিদ্রকে সাহায্য করা ইত্যাদি।

সমিতির অধিবেশন প্রতি সোমবার বেলা ১টা হইতে ২৷৷০ টা পর্য্যন্ত হয়। সমিতির চাঁদা ৷৷০ আনা। এক পরিবার হইতে দুই বা তিনজন সভ্যাশ্রেণীভুক্তা হইলে প্রথম জনকে ৷৷০ আনা, অন্যজনকে ।০ আনা দিতে হয়।

সমিতিতে "বঙ্গলক্ষ্মী" ও "মাতৃমন্দির" দুখানি পত্রিকা লওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত নানারূপ জীবনী, শিশুপালন, স্বাস্থ্য ও খাদ্যবিষয়ক পুস্তক পাঠ হইয়া থাকে। সমিতির সভ্যাগণ অল্প চরকা কাটিয়া থাকেন। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে তাল জানা নাই। খদ্দরের জামা সেমিজ পায়জামা প্রভৃতি বানাইয়া দান করা হয়। শীতকালে কিছু পশমের জামা বুনিয়া দান করা হয়। বৎসরে ৩০ হইতে ৪০টি জামা-কাপড় স্যার পি, সি, রায়ের কাছে পাঠান হয়, তিনি উপযুক্ত স্থানে দান করেন। নগদ দান যেখানে যেখানে দেওয়া হইয়াছে তাহা মোটা-মুটি এই—(১) ১টাকা অনাথআশ্রম, (২) কলিকাতা অনাথ-আশ্রম, (৩) স্থানীয় অনাথআশ্রম, (৪) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যাকে সাহায্য করা, (৫) বিদ্যাসাগর বাণীভবনে বিধবাদের জন্য, (৬) চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-ফণ্ডে, (৭) উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবন, (৮)মেদিনীপুর দুর্ভিক্ষ, (৯) একটি বালিকাবিদ্যালয়-স্থাপনে সাহায্য, (১০) পুনায় গৃহদাহে সাহায্য, (১১) স্থানীয় দরিদ্রা মহিলাকে প্রসব-সময়ে দান, (১২) একটি দরিদ্র বালককে স্কুলের বেতন দেওয়া ইত্যাদি। এই সমিতির চেষ্টায় স্থানীয় বালকবালিকা লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহাদিগকে নানা বিষয়ে পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, সেলাই এবং কিছু ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকাদের প্রস্তুত জামা ইত্যাদি দান করা হয়। ইহাদের চাঁদা মাসে ।০ আনা হইতে ৵০ আনা। এতদ্ব্যতীত সমিতির জন্মোৎসব উপলক্ষে আমোদপ্রমোদে কিছু টাকা ব্যয় হয়। সে সময় বালকবালিকারা সঙ্গীত, অভিনয় এবং আবৃত্তি দ্বারা উৎসবকে সুন্দর করিয়া তোলে।

সমিতি হইতে প্রতিবৎসর পূজার সময় নানারূপ এম্‌ব্রয়ডারী-যুক্ত ব্লাউজ, ফ্রক ইত্যাদি বিক্রয় হয়। তাহার লভ্যাংশের চার ভাগের এক ভাগ সমিতির ফণ্ডে জমা হয়, —বাকী তিন ভাগ প্রস্তুতকারিণী পাইয়া থাকেন।

মাননীয়া মযূরভঞ্জের মহারাণী সমিতির কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়া সুখী হইয়াছেন এবং ৫০৲ টাকা দান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মাননীয়া লেডী বি, এন, মিত্র, মাননীয়া মিসেস্ পি,কে, রায় সমিতির

কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সমিতিকে নানারূপ উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, এবং ইহা করিয়া সমিতির পুস্তকাগারে "সরোজনলিনী" পুস্তকখানি দান করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানে সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী নলিনীবালা সেন এবং সহকারী সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলিমা দাস গুপ্তা সমিতির অর্থ-ভাণ্ডারে প্রায় ১৩০৲ টাকা জমা আছে।

শ্রী নলিনীবালা সেন
সম্পাদিকা

রাজবালা মহিলাসমিতি (ভবানীপুর)

স্থানীয় মহিলাসমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক উন্নতিবিধানের জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা রাজবালা মিত্র মহাশয়ার অক্লান্ত চেষ্টায় এবং সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির আনুকূল্যে ভবানীপুর গিরিশ মুখার্জ্জি রোডে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৺গিরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমিতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম হইতে ইহার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া সমিতির কর্ম্মীগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। স্বর্গীয় গিরিশ-বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার ৩৯নং গিরিশ মুখার্জ্জি রোড ভবনের যাবতীয় আসবাবপত্রসহ কয়েকটি ঘর মহিলাসমিতির অধিবেশন এবং শিল্পশিক্ষা-ক্লাসের জন্য দান করিয়া স্থানীয় মহিলাগণকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই মহিলাসমিতিতে পরিণতবয়স্কা মহিলাগণের জন্যে নানাপ্রকার শিল্প এবং লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি হইতে একজন শিল্প-শিক্ষয়িত্রী সমিতিতে নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শ্রী রাজবালা মিত্র
সম্পাদিকা

জোঙ্গাঘাটা

আমাদের গ্রামটি ঘশোহর হইতে কুড়ি মাইল দূরে—পল্লীর নিকৃষ্টতম একটি কোটর। এই কোটরেও আলো ঢুকিল। বিগত ২রা আষাঢ় তারিখে মহিলাদের সভা হইল। আমরা অধম ও পঙ্গু জীবন লইয়া সংসারের ভার হইয়া থাকিব না—ক্ষুদ্র শক্তি সমবেত করিয়া নারী-সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিব, সেই উদ্দেশ্যে সমিতি গড়িলাম। কয়েকটি অনুন্নত শ্রেণীর মহিলা গোড়া হইতে আমাদের সঙ্গে আছেন। আশা করিতেছি, শীঘ্রই তাঁহাদের সমাজতন্ত্র টানিতে পারিব। সভাস্থলে আট জন মহিলা গায়ের গহনা খুলিয়া সমিতির ভাণ্ডারে দান করিলেন। ঐ গহনা আজিও বিক্রয় করা হয় নাই। স্থির হইয়াছে, উহার মূল্য সমিতির স্থায়ী ধনভাণ্ডারে জমা থাকিবে।

প্রথম অধিবেশনের পাঁচদিন পরেই সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। উহাতে স্থিরীকৃত হইল প্রতি রবিবারে আলোচনা-সভা হইবে। এখন সেই নিয়মে কা চলিতেছে। বর্ষাকালে পল্লীর পথঘাট অগম্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রতি অধিবেশনে প্রায় সমস্ত সভ্যা উপস্থিত থাকেন। গ্রামস্থ বালিকাবিদ্যালয়ের প্রশস্ত ঘরে সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহাতে সাপ্তাহিক কার্য্যবিবরণী ও নূতন প্রস্তাব বিচারিত হয়, সাময়িক পত্রাদি হইতে নানারূপ বক্তৃতা পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। প্রায় প্রতি সভাতে কোন না কোন মহিলা লিখিত বা মৌখিক বক্তৃতা করেন। ঐ সকল বক্তৃতা সাহিত্য কিম্বা নারীর নীতি শিক্ষা বিষয়ক হইয়া থাকে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই, গ্রামের প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাগণ সমিতির কাজে আশ্চর্য্যরূপ সাড়া দিতেছেন। এই কারণে সমিতি মহিলাগণের মধ্যে চরকা ও তকলী প্রচারে বিশেষ মনোযোগ করিয়াছেন। যাঁহারা চরকা কিনিয়া লইতে অসমর্থ তাঁহাদিগকে সমিতি আপাততঃ বিনামূল্যে দিতেছেন। সূতা কাটাইয়া লইয়া ঐ সূতার মূল্য হইতে ধীরে ধীরে চরকার দাম শোধ করিয়া লওয়া হইবে। এইরূপে সমিতির তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি তিনটি চরকা ও সতাধিক তকলী চলিতেছে। সমিতি তুলা সরবরাহ করেন—আবার সূতা খরিদ করেন। এখন যে সূতা তৈয়ারী হইতেছে, তাহার অধিকাংশই অকেজো। তবুও উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সমিতি ঐ সূতাই কিনিতেছেন। সমিতির তরফ হইতে শ্রীমতী সরলাবালা বসু (বসু) সপ্তাহে

কয়েকদিন মহিলাদিগকে সূতা কাটিবার প্রণালী শিখাইবার ভার লইয়াছেন। এই চরকার কাজ দ্রুত অগ্রসর করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা বর্ত্তমানে সমিতির নাই। সেজন্য কাজে কিছু বাধা ঘটিতেছে। যাহা হউক সমিতি গ্রামের বস্ত্রসমস্যা মহিলাগণকে দিয়া সমাধান করিবেনই। আমরা এই বিষয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্প। সমিতির উদ্যোগে গ্রামে প্রচুর কার্পাস গাছ রোপণ করা হইয়াছে। চরকার কাজ আরও অগ্রসর হইলে তাঁত বসানো হইবে।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিতেছি, চরকার যে আর দর উহা সন্তোষজনক নহে। ভবিষ্যতে সূতা কাটা অভ্যস্ত হইয়া আসিলে হয়ত আয় বাড়িবে কিন্তু এখনই অন্যান্য উপায়ে মহিলাদের আয় বাড়াইতে চাই। তজ্জন্য সেলাই-এর কল আনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। সমিতির অফিসগৃহে ঐ কল থাকিবে। মহিলারা কিছু দক্ষিণা দিয়া ঐখান হইতে জামা-সেমিজ প্রভৃতি সেলাই করিয়া লইবেন। সমিতি বিনামূল্যে কাট-ছাঁট শিখাইবেন। সমিতির স্বেচ্ছাসেবিকা হইয়া শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্তা সরলাবালা বসু (বড়) মেয়েদের কাটিং ও সেলাই শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিছুকাল আগেও আমাদের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মেয়েরা অতি উৎকৃষ্ট কাঁথা, আসন প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেন; আধুনিকাদের কাছে সূচিশিল্পের তেমন অত্যাশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখিতে পাই না। সুন্দর মনোহর শিল্প-গুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। সমিতি এদিকেও নজর দিয়াছেন। সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা রাজবালা বসু কুমারীগণকে সূচিশিল্প শিখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সপ্তাহে দুইদিন সমিতির অফিসে ছাত্রীগণকে সমবেত করিয়া সমস্ত দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মেয়েরা উৎসাহের সহিত কাঁথা, আসন, ব্যাগ, খঞ্জিপোষ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। খেজুরপাতা দিয়া এক-প্রকার পাটি তৈয়ারী হইতেছে। বাহের মাঁইসের শিল্প-কার্য্যও দেখানো হয়।

সমিতি প্রতিষ্ঠার পরে ইহার অধিবেশন-গৃহের ঠিক সম্মুখের বাড়ীতে ইতিমধ্যে একটি নিদারুণ ঘটনা ঘটিয়াছে। আমাদেরই একজন সভ্যা প্রসবকালে মারা গিয়াছেন। এই অঞ্চলে শিক্ষিতা ধাত্রী নাই। আমরা যে এইদিক দিয়া কত অসহায়, গভীর পরিতাপের সহিত সমিতি তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। ঐ শোকাবহ ব্যাপারের পর হইতে আমাদের অনেকে ধাত্রীবিদ্যা শিখিতে বিশেষ আগ্রহান্বিতা। একদিন হিসাব করিয়া দেখা গেল, গত বৎসর এই গ্রামে যত শিশু জন্মিয়াছিল, তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ছয়মাস বয়সের পূর্ব্বেই মারা গিয়াছে। শ্রীমতী রামতনুমণি বসু ও শ্রীমতী সরযূবালা রায়কে ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে তৎপর হইতে সমিতি বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত মহিলাটির ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রচুর আছে—কিন্তু শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান নাই। ডাক্তার অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয় উক্ত মহিলাদ্বয়কে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ভাল নহে। নারীদের স্বাস্থ্য পুরুষদের অপেক্ষাও হীন। সমিতি হইতে স্বাস্থ্য বিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বসু ও শ্রীমতী সরলাবালা বসু (ছোট)। প্রত্যহ বৈকালে ছোট-ছোট মেয়েরা নিয়মিত ব্যায়াম ও দৌড়ঝাঁপ করিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত বয়স্কাদের মধ্যে ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা হইয়াছে। সন্তরণের ক্লাব গঠিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহাতে প্রতিযোগিতা হয়। ব্যায়াম ও ক্রীড়াদির প্রতিযোগিতায় সমিতি পুরস্কারের ব্যবস্থা করিবেন।

গ্রামে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড-চালিত বালিকাবিদ্যালয় আছে। অনেক বধূ ঐ বিদ্যালয়ে আসিতে পারেন না। তাঁহাদিগের শিক্ষার জন্য সমিতি ঐ বিদ্যালয়েরই শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সরলাবালা দত্তকে ভার দিয়াছেন। তিনি বাড়ীতে গিয়া অবসর-সময়ে পড়াইয়া আসেন। তা ছাড়া শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত নামক গ্রামের একটি বালবিধবাকে শিক্ষা-দানের জন্য হিরণ্ময়ী বিধবাশ্রমে পাঠানো হইয়াছে। তিনি উপযুক্তা হইয়া আসিলে তাঁহাকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইবে। মেয়েটির জন্য যাহা খরচপত্র হইয়া থাকে তাহা সমিতি বহন করিয়া থাকেন।

সমিতিতে আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থাও আছে। ইহাতে

সমিতির সহিত প্রত্যেক মেয়ের অন্তরের যোগাযোগ সুনিবিড় হইয়া উঠে। সমিতির পক্ষে শ্রীমতী উর্বশী বসু মেয়েদের নিয়মিত সঙ্গীত শিখাইয়া থাকেন।

অনুন্নত শ্রেণীর মহিলাদিগকে চালনা করিবার ভার লইয়াছেন শ্রীমতী হেমলতা নাথ। বারোটি মেয়ে সমিতির স্বেচ্ছাসেবিকা। উহাদের অধিনায়িকা শ্রীমতী বিনোদিনী হালদার ও তাঁহার সহকারী শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী পাল। গ্রামের অধিবাসীরা ধনী নহেন। নগদ টাকা দিয়া সাহায্য করা অনেকের পক্ষেই কষ্টকর। অথচ আমাদের কাজে অনেক টাকাকড়ির আবশ্যক। তাই ব্যবস্থা হইয়াছে, গ্রামের প্রতি বাড়ীতে প্রত্যেক বেলা মহিলারা আহার্য্য বন্ধাইয়া অন্ততঃ একমুষ্টি চাউল রাখিয়া দিবেন প্রতি রবিবারে স্বেচ্ছাসেবিকাগণ নায়িকার নেতৃত্বে ঐ চাউল (এবং সম্ভবমত পয়সা) সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রভাসিনী বসু, সম্পাদিকা শ্রীমতী নলিনীবালা বসু, সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী সরযূবালা বসু এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রীমতী ইন্দুবালা বসু। ইঁহাদিগকে এবং পূর্ব্বোক্ত বিভাগীয় কর্ম্মীগণকে লইয়া সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে।

তিনমাস পরে চরকা ও রান্নার প্রতিযোগিতা হইবে। যিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও উৎকৃষ্ট সূতা কাটিতে পারিবেন শ্রীযুক্ত মনোজ বসু তাঁহাকে একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন। রান্নার প্রতিযোগিতায় কেন না মেয়েদের তাত রাঁধিতে হইবে। যাঁহার তাত নির্দ্দোষ ও সুস্বাদু হইবে শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস বসু তাঁহাকে রৌপ্যপদক দিবেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত রঞ্জনবাবু আরও একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। বিনা-সংবাদে যে-কোন দিন সমিতির তরফ হইতে মহিলাদের রান্নাঘর ও তৈজসাদি পরীক্ষা করা হইবে। যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইবে তিনি শেষোক্ত পুরস্কারের অধিকারিণী হইবেন। শীতকালে এই গ্রামের ও কাছাকাছি গ্রামসমূহ হইতে মহিলাগণের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী খুলিবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

পার্শ্ববর্ত্তী গড়ভাঙা গ্রামে আমাদের সমিতির কর্ম্মীরা মহিলাসমিতি স্থাপিত করিয়া আসিয়াছেন। প্রচার-কার্য্যের জন্য সমিতির কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মন্মথলাল বসু ম্যাজিক লণ্ঠন ও কতকগুলি স্লাইড সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মনোজ বসু ঐ আলোকচিত্রের সহযোগে এখানে বক্তৃতা করেন। আমাদের নিকটবর্ত্তী বৃহদ্গ্রাম ভদ্রপল্লী পাঁজিয়ার মহিলাসমিতি হইতে আমাদের কাছে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ আসে। আমরা সেখানে মনোজবাবুর বক্তৃতার ব্যবস্থা করি। তথাকার মহিলাসমাজেও বিপুল উৎসাহ দেখিলাম। দূর পল্লী হইতে পর্য্যন্ত নৌকাযোগে বহু মহিলা বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সম্বন্ধে এই অঞ্চলে প্রচুর অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণা ছিল। আমাদের সমিতি এদিককার মধ্যে বোধহয় সর্ব্বপ্রথম সরোজনলিনী সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। আলোকচিত্রসম্বলিত ঐ বক্তৃতার প্রসঙ্গতঃ আমরা সরোজনলিনী সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত নলিনীবালা বসু,
সম্পাদিকা।

আরারিয়া

চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে এই বিহার প্রদেশে, পূর্ণিয়া জেলার নিভৃত প্রান্তে এই আরারিয়া নামক ক্ষুদ্র সহরে প্রবাসী কয়েকটি বাঙালী মহিলার মধ্যে এই সমিতির সৃষ্টি হয়। তখন সেই প্রীতিসম্মিলন শুধু গল্প-গুজবেই পর্য্যবসিত হইত না, তাহার মধ্যে সাহিত্যালোচনা, শিল্প-শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি, ধর্ম্মালোচনা সমস্ত বিষয়েরই চর্চ্চা হইত। তখন এখানে স্কুল ছিল না, সে অভাব তাঁহারাই পূরণ করিতেছিলেন। কিন্তু তখনকার দেশ ও কাল অনুসারে নূতন কিছু দেখিলেই লোকের চোখে ভাল লাগিত না; তাঁহারা ভালর মধ্যে মন্দেরই আভাস পাইতেন। কাজেই এই প্রতিষ্ঠানটি উন্নতির পথে বাধা পায়। কিন্তু বাধা পাইলেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। সময়ের পরিবর্ত্তনে, লোকের মনের ভাবের পরিবর্ত্তনে এ সমিতি নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, এখন প্রায় এখানকার অধিবাসিনী সমস্ত মহিলাই ইহাতে

যোগদান করিয়া নানাবিষয়ে শিক্ষা পাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। এখন কি প্রণালীর শিক্ষা আমাদিগের কন্যা ও বধূদের উপযুক্ত তাহা নির্দ্ধারিত করা ও উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর যোগাড় করা ইহাই হইয়াছে এই সমিতির প্রধান সমস্যা।

প্রতি পরিবারেই ১২ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮।১৯ বৎসরের বালিকাগণ আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের জননী। এই জননীরা কোন বিষয়েই ভাল করিয়া কিছু শিক্ষা পায় নাই—কি বাহিরের বিষয়ে জ্ঞান, কি সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা, কি স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কি সন্তান-পালন, সকল বিষয়েই তাহারা একেবারে অজ্ঞ। ধীরে ধীরে এসব বিষয়ে শিক্ষা দিয়া শিক্ষিতা মাতা গড়িতে হইবে, মাতা শিক্ষিতা না হইলে সুসন্তানের আশা করা বৃথা।

আবার এই সব শিক্ষার সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যাও কি কন্যা কি বধূ সকলকে শিক্ষা দিতে হইবে। কলিকাতায় কেন্দ্রসমিতিতে এই সকল বিষয়ের ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়; আমাদের এই সমিতিকে কেন্দ্রসমিতির সহিত যুক্ত করিয়াছি এবং সুযোগ্যা শিক্ষয়িত্রী চাহিয়া পাঠাইয়াছি।

বর্ত্তমানে এই সমিতির সভ্যা-সংখ্যা প্রায় ২৫।৩০ জন। তা ছাড়া প্রতি পরিবারের সকল মহিলাই ইহাতে যোগদান করিয়া থাকেন। যে চাঁদা আদায় হয় তাহা দ্বারা, সমিতির অধিবেশনের দিনের গাড়ীভাড়া, মাসিক পত্রিকা ও খবরের কাগজের বার্ষিক মূল্য দেওয়া হয়। তা ছাড়া স্থানীয় কোন অভাবগ্রস্তের সাহায্য করিতে হইলে, এবং দূরে কোথাও বন্যাপীড়িত, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীর সাহায্যের প্রয়োজন হইলে যথাশক্তি এই অর্থ দ্বারা সাহায্য করা হয়। সমিতির অধিবেশন মাসে একবার করিয়া হয়; তাহাতে নানাবিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য ভাল প্রবন্ধাদি পাঠ করা হয়, স্বাস্থ্যতত্ত্বের ও ধাত্রীবিদ্যার আলোচনা করা হয়, সভ্যারা নিজেরা স্বরচিত প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। এ বছর সমিতি হইতে জামা তৈয়ারী করিয়া দুইবার বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল, দুইবারই কিছু কিছু লাভ হইয়াছে। শিল্প-বিদ্যায় উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে তেমন উন্নতি করিতে পারা যায় নাই, তবে তাহার চেষ্টায় আছি।

শ্রী সুবর্ণলতা দাসগুপ্তা
সহকারী সম্পাদিকা

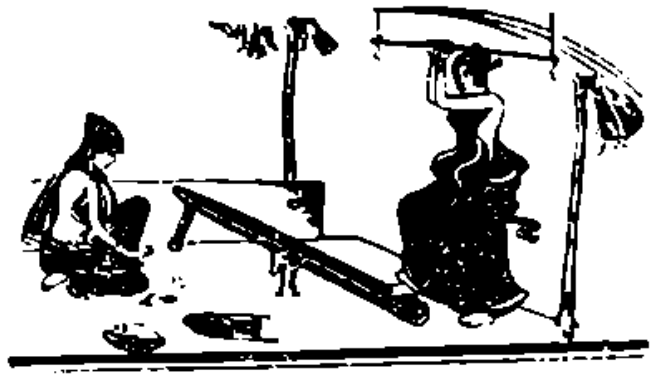

পরলোকে রসায়নাচার্য্য চুণীলাল বসু

শ্রী শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ

পরলোকগত চুণীলাল বসু মহাশয়কে গত ১০ বৎসর ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। চুণীবাবু গত ১০ বৎসর বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর (Bengal Social Service League) সহঃসভাপতি ছিলেন—আমাকে মণ্ডলীর নানা কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সহিত দেখা করিতে ও তাঁর পরামর্শ লইতে হইয়াছে। সকলেই জানেন যে চুণীবাবু উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, মোটা বেতন ও পরে অবসর লইয়া মোটা পেন্সন পাইতেন, সরকারী খেতাবও তাঁর ছিল একাধিক; তাঁর মোটর, ব্যাঙ্কে টাকা এবং কলিকাতায় বাড়ী আছে; এক কথায় চুণীবাবু ধনী, শিক্ষিত ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের একজন ছিলেন। কিন্তু 'এলো বাহ্'—ইহা বাহিরের কথা, নগণ্য কথা। চুণীবাবু একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন। আমরা তাঁর সেই মনুষ্যত্বের কথা আজ আলোচনা করিব।

কলিকাতার বড় ডাক্তার, মোটা টাকা রোজগার করেন এমন ব্যবসায়ী, অথবা বিরাট অট্টালিকাবাসী অনেক জমিদারকে অহরহ দেখিয়া দূর হইতে নমস্কার করি, তবে কাছে যাই না;—card চাই, দারোয়ানের অনুমতি চাই, আরো কত কি চাই! কিন্তু চুণীবাবুর গৃহ ছিল অবারিত-দ্বার। তিনি কলিকাতার ১৭।১৮টি প্রতিষ্ঠানের কোনটির সভাপতি, কোনটির সহঃ সভাপতি, কোনটির বা সম্পাদক, কাহারও বা কার্য্যকরী সভার সদস্য ছিলেন। এই সব কাজকে বিষয়ী লোক বলেন "ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়ানো।" চুণীবাবু এই সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য যে একনিষ্ঠ সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা জানি। কোন দিন বিরক্ত হইতেন না, ধীরস্থির ভাবে সভার কাজ করিতেন, বিপদকালে সুপরামর্শ দিতেন এবং কাহাকেও অনর্থক রূঢ় কথা বলিতেন না। আমি গত দশবৎসরে তাঁহাকে খুব কমই সভাসমিতিতে অনুপস্থিত দেখিয়াছি। তিনি আড়ম্বর ভালবাসিতেন না, ব্যস্ততা তাঁর মধ্যে ছিল না। সকল ক্ষেত্রেই ধীরস্থির ভাবে কাজ করিতেন। তাঁহার গৃহেও দেখিয়াছি অতি-ব্যস্ততা নাই, ধীর ও সংযত-ভাবে গৃহস্থালী যেন চলিয়া যাইতেছে।

চুণীবাবু কলিকাতা অনাথাশ্রম (Calcutta Orphanage) ও অন্ধবিদ্যালয়ের (Blind School) প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আমরা মুখে মুখে নরনারায়ণের সেবার কথা প্রায়ই বলি; চুণীবাবু অবসর লইয়া এই 'অনাথ ও অন্ধ নারায়ণের' যে অতুলনীয় সেবা করিয়া গিয়াছেন, এই বাক্‌সর্ব্বস্ব জাতিকে তাহা স্মরণ করিতে বলি। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"শুনহে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

চুণীবাবু মনে-প্রাণে এই নরব্রূপী ভগবানের সেবা করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁর আত্মার কল্যাণ হউক।

দেশসেবা করিবার উপকরণ ও পদ্ধতি নানা ব্যক্তির নানারূপ থাকে। কেহ অর্থ দিয়া, কেহ দেহ দিয়া, কেহ বা বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভা দ্বারা দেশমাতৃকার সেবা করিয়া থাকেন। চুণীবাবু অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া দেশবাসীর যে অপূর্ব্ব সেবা করিয়া গিয়াছেন আমি সে কথা আজ আপনাদিগকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

চুণীবাবু সুলেখক ছিলেন—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতিও হইয়াছিলেন। "স্বাস্থ্যে"র উন্নতিকল্পে তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বাস্থ্য-বিষয়ে বহু গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বহু পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়া দেশ-বাসীকে স্বাস্থ্যরক্ষার মূলনীতিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

ছাত্রসমাজের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য লইয়া তিনি বহু গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে ছাত্র-সমাজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সমৃদ্ধ না হইলে এই জাতি বাঁচিবে না। কলিকাতার ছাত্রাবাসসমূহে ঘুরিয়া তিনি ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও তাহাদের খাদ্য পরীক্ষা করিতেন—তাঁহার লিখিত সুবৃহৎ গ্রন্থ "খাদ্য" এই গবেষণার ফল। চুণীবাবু আরো বহু গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন; সকল গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য বাঙালীর স্বাস্থ্যোন্নতি। আজ দেশে স্বাস্থ্য বিষয়ে একটা জাগরণ আসিয়াছে,—যুবক, বালক অথবা বৃদ্ধ সকলেই "ব্যায়াম, খাদ্য, ম্যালেরিয়া, ভাইটামিন" প্রভৃতি কথা আওড়াইয়া থাকেন, কিন্তু ১৫ বৎসর পূর্ব্বেও এই নীরস অথচ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকথা বাঙালী আলোচনা করিত না। যাঁহাদের একনিষ্ঠ সেবার ফলে বাঙলাদেশে এই এই স্বাস্থ্যতত্ত্বানুরাগ জাগিয়াছে, ৺চুণীলাল বসু মহাশয় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। তিনি আলোকবর্ত্তিকা লইয়া স্বাস্থ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন—সেই শোভাযাত্রার পরে বহু মনীষী ও কৃতী যোগদান করিয়া উহাকে সফল ও জয়যুক্ত করিয়াছেন। স্বাস্থ্যান্দোলনপ্রবর্ত্তক চুণীলালের আত্মার তৃপ্তি হৌক—বাঙালী মানুষ হৌক—শারীরিক বলে জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিয়া চুণীলালের স্বপ্নকে সফল করুক এই প্রার্থনা করি।

চুণীবাবু কৃতী স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। মেডিকেল কলেজে পঠদ্দশায় তিনি বহু সুবর্ণপদক ও প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন। কলেজের পাঠ-সমাপ্তির পর তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সরকারী কার্য্যে ব্রহ্মদেশে যান। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মেডিক্যাল কংগ্রেসের তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন প্রতিপত্তিশালী ফেলো ছিলেন এবং বাঙলা সরকারের Chemical Examiner প্রভৃতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। চুণীবাবু নারীজাতির উন্নতিমূলক বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতিরও তিনি একজন দরদী কর্ম্মী, উপদেষ্টা ও বন্ধু ছিলেন। অনেকের ধারণা চুণীবাবু প্রাচীনপন্থী লোক—কথাটি মোটেই সত্য নহে। তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না ইহাও যেমন সত্য পাশ্চাত্যের যাহা কিছু শ্রেয় ও প্রেয় তাহার প্রতিও তিনি সবিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন ইহাও তেমনি সত্য। আমার ২।৩টি ঘটনার কথা বেশ স্মরণ আছে। তিনি একাধিক বার বলিয়াছেন যে সরোজনলিনী স্মৃতিসমিতি ও নারীশিক্ষা-সমিতি বাঙলার একটি বিশেষ অভাবকে দূরীভূত করিয়াছে।

আমার একটি ঘটনার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে—কলিকাতার অনতিদূরে একটি 'পতিতাআশ্রমে'র কথা। এই আশ্রমটিতে পতিতাগৃহে পালিত অথবা পতিতাদিগের গর্ভজাত বালিকাদিগকে স্থান দেওয়া হয় এবং কর্ম্ম ও কার্য্যকরী শিক্ষার দ্বারা দিয়া ভদ্রজীবন-যাপনে তাহাদিগকে অভ্যস্ত করা হইয়া থাকে। তিনি প্রতি শিশুটিকে এমন স্নেহের সহিত গ্রহণ করিলেন, এমন সরল উপদেশ দিলেন যে সে দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে হইল, চুণীবাবুর নরনারায়ণের সেবা সার্থক হইয়াছে।

চুণীবাবু ৭০ বৎসর বয়সে রাঁচিতে গত শ্রাবণ মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার জন্ম হয় ১৮৮১ সালে। ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যুকে অকালমৃত্যু এই অজ্ঞাবুর দেশে অন্ততঃ বলা চলে না। মানুষ বাঁচে কর্ম্মের মধ্য দিয়া; চুণীবাবুর জীবনের গত ২৫।৩০ বৎসরের প্রতি মুহূর্ত্তকে তিনি কোন না কোন জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত করিয়া গিয়াছেন। এদেশে লোকে অবসর লইয়া কাশীবাস করে—চেঞ্জে ঘুরিয়া বেড়ায়। চুণীবাবু তাঁহার শেষ জীবনটি নরনারীর কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার আত্মার শান্তি হউক এই প্রার্থনা করি।

চুণীলাল একাধারে জনসাধারণের ও সরকারের প্রীতির পাত্র ছিলেন। তাঁহার জনসেবার কার্য্যে সাধারণে মুগ্ধ, সরকারও তাঁহাকে সম্মান করিতে কার্পণ্য করেন নাই।

১৮৯৮ খৃঃ তিনি রায় বাহাদুর খেতাব পান এবং ১৯২১ খৃঃ তিনি কলিকাতার 'সেরিফ' (Sheriff) হন। পরে সরকার তাঁহাকে সি-আই-ই পদবী দেন। এই সকল রাজকীয় সম্মানলাভের তিনি যোগ্য অধিকারী ছিলেন। স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে ও সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি এযুগে

যথেষ্ট কাজ করিয়া গিয়াছেন একথা দেশবাসী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

চুণীবাবু ছাত্রসমাজের প্রকৃত বন্ধু ও উপদেষ্টা ছিলেন। কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায়, কি সাধারণ সভায় তিনি সর্ব্বত্রই ছাত্রসমাজকে লক্ষ্য করিয়া বহু সারগর্ভ কথা বলিতেন। তাঁহার সরল ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা, সৌম্যমূর্ত্তি এবং সহাস্য বদন আর আমরা দেখিতে পাইব না সত্য, কিন্তু তিনি দেশবাসীর জন্য যে অমূল্য গ্রন্থরাজি রাখিয়া গিয়াছেন উহার মধ্য দিয়া দেশবাসী চিরদিন তাঁহার সাহায্য পাইবেন—তাঁর আত্মার স্পর্শ অনুভব করিবেন। মানুষ জন্মে এবং মরে কিন্তু যাঁর কীর্ত্তি থাকে তিনি মরিয়াও অমর। কীর্ত্তিমান্ চুণীলাল বাঙালীর নিকট চিরজীবন্ত থাকিবেন।

সুন্দর

শ্রী কুমুদিনী পাণ্ডি

সুন্দর, হর অন্তর, তব
গিরি-কন্দর মাঝে,—
নীরদের নীলে, শ্যাম প্রান্তরে
শষ্প-শস্য-সাজে।
কিবা মৃদু কম্পনে আমলকী-বনে,
তরু-বীথি-মর্ম্মরে,
পিক শেফালি-পুঞ্জে, মধুপ-গুঞ্জে,
মত্ত আম্র-ধরে।
স্থির সরসী-বিম্বে, স্ফুট কদম্বে,
কদলীর শিশু-ক্রোড়ে,
কুমুদ-কমলে, যূথিকা-বকুলে,
নির্ঝর-কলতলে।
গোধূলি, প্রভাতে, সুনীল শরতে,
জ্যোৎস্না-রজত রাতে,
ঘোর নিদাঘ-গগনে, কোকিল-কূজনে,
মৃদুল মলয়-বাতে।
কভু বরষা-প্লাবনে, বজ্র-বহনে,
নিবিড় অমা-আঁধারে,
সাঁঝে আঁচল উড়ায়ে হীরক ছড়ায়ে,
দূর—সুদূরাম্বরে!

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী

সম্প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রাবলী ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে প্রদর্শিত হইয়া উচ্চপ্রশংসিত হইতেছে। আমাদের বিশেষ গৌরব ও গর্বের বিষয় এই যে, এই "বঙ্গলক্ষ্মী" পত্রিকার ১৩৩৫, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন অনেকে ঐ চিত্র উপলক্ষ করিয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন। সাধারণের সমালোচনার মূল্য অনেক ক্ষেত্রে এইরূপই হইয়া থাকে। কথিত সমালোচকরা এখন কি বলিবেন?

গোলটেবিল-বৈঠক নারী-প্রতিনিধি

প্রস্তাবিত গোলটেবিল-বৈঠকে নারী-প্রতিনিধি গ্রহণ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের নারীস্বাধীনতা-সঙ্ঘ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে এক পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, বর্তমানে উভয় দেশের ভিতর যে অপ্রীতিকর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সেই গোলযোগের মীমাংসা করিবার পক্ষে উক্ত বৈঠকে ইংলণ্ড ও ভারত হইতে নারী-প্রতিনিধি গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। উক্ত পত্রে আরও বিশেষভাবে লেখা হইয়াছে যে, এক্ষণে ইংলণ্ডের রমণীগণ ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতীব আগ্রহান্বিত। সাইমন কমিশনের রিপোর্টেও লিখিত হইয়াছে যে ভারতের বর্তমান নারী-জাগরণের হস্তেই ভারতের ভাবী উন্নতির মূল অর্পিত আছে। ইংলণ্ডের অন্যান্য নারীসমিতিও উল্লিখিত পত্রে লিখিত বিষয়ের সমর্থন করিয়াছেন।

সর্দ্দা-বিলের বিরোধী বিল

'সর্দ্দা বিল'-বিরোধী একটি বিশেষ দল সম্প্রতি আংশিক ভাবে বাল্যবিবাহের সুবিধার জন্য একটি বিলের খসড়া কৌন্সিলে পেশ করিয়াছেন। মাদ্রাজের নারীসঙ্ঘ ইহার প্রতিবাদকল্পে সভা করিয়াছেন এবং সরকারকে জানাইয়াছেন—যাহাতে ঐ বিল পাশ হইতে না পারে। আমরাও উহার প্রতিবাদ জানাইতেছি।

আর্ট না উচ্ছৃঙ্খলতা

মার্কিণের নিউইয়র্ক সহরে দৃশ্যনাট্যকার আর্ল ক্যারোল ও সাতটি নর্ত্তকীকে অশ্লীল অভিনয় প্রদর্শন করার অপরাধে পুলিস বিচারার্থ চালান দিয়াছিল। নর্ত্তকীরা প্রায় নগ্নাবস্থায় নামের পুতুল সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু বিচারকালে জুরীরা তাহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ধৃত অপরাধীরা মুক্তি পাইয়াছে। আমেরিকা প্রতীচ্য সভ্যতার শীর্ষস্থান

অধিষ্ঠিত করিয়া আছেন। মার্কিন সভ্যতার পরিমাপের বিচার যদি এই বিচার-সিদ্ধান্ত দেখিয়া করিতে হয়, তাহা হইলে আফ্রিকার নগ্ন কাফ্রী নরনারীর সহিত মার্কিন নর্ত্তকীদের তুলনা করিলে কে বড় কে ছোট, নির্ণয় করা বেশী কঠিন কি ?

য়ুরোপপ্রত্যাগত আফগান বালিকা

১৯২৮ সালে কৃতপূর্ব্ব আমীর আমানুল্লা যে ১৫ জন আফগান বালিকাকে শিক্ষালাভের জন্য তুরস্কে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ১০ জন সম্প্রতি কাবুল যাইবার পথে ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। দুইটি বালিকার য়ুরোপেই মৃত্যু হয়।

গোগৃহ

আমরা দিন দিন স্বাস্থ্যহীন হইতেছি। আমাদের শিশুর দীর্ণতা, কৃশতা এবং মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে—ইহার কারণ কি ? অন্যান্য যত কারণই থাকুক, ইহার প্রধান কারণ গোদুগ্ধের অভাব। আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে গোদুগ্ধের অভাব মোচন করিতে হইবে।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, এই গোদুগ্ধের অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ১০এ, কলিক বঙ্গ লেনে "বিয়াট গোগৃহ এণ্ড ফার্ম্মিং কোম্পানী" নামে একটি লিমিটেড কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত ও স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য দেশে সুস্থ ও সবল গাভী সৃষ্টি দ্বারা দুগ্ধের অপ্রাচুর্য্য দূর করা। অন্যতম উদ্দেশ্য গোবৎস এবং উৎকৃষ্ট দুগ্ধহীন গাভীকে কসাইয়ের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি নিবারণ করা।

সাধারণের দুগ্ধহীন গাভী এখানে নামমাত্র খরচে পালন করা হয় এবং তাহার প্রজননের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হয়।

এই ধরণের প্রতিষ্ঠান বাঙলাদেশে ইহাই প্রথম। দেশে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। আশা করি দেশহিতৈষী বাঙালীমাত্রেই গো-জাতির উন্নতির জন্য কার্য্যতঃ এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করিবেন। কারণ গোজাতির উন্নতি-সাধন করিতে পারিলে, আবার আমরা দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য ও সম্পদ ফিরিয়া পাইব।

সম্প্রতি নদীয়া জেলার কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী উক্ত কোম্পানীর গোপালনের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমি পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে এই জমি গোপালনের পক্ষে স্বভাবতঃই অনুকূল।

আমরা ইহার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ভাবলিনে বঙ্গলক্ষ্মী-কথা

সম্প্রতি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, ভাবলিন, আন্তর্জাতিক নারীস্বাধীনতা ও শান্তিসঙ্ঘ-অনুষ্ঠিত একটি সভায় এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন নারীর শুভবুদ্ধির স্বাভাবিক শক্তিতে সম্ভব হইবে, এবং বঙ্গলক্ষ্মী এই কাজে কত বড় চেতনা ও পরিণতির সম্ভাবনা আনিয়াছেন।"

অধ্যাপক মহাশয় এই সভায় সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির কথা তুলিয়া বিশেষভাবে বলেন যে বাঙলা দেশে এই সমিতির কাজ কত গভীর এবং ব্যাপক।

অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী আমাদিগকে লিখিয়াছেন, ভারতের বাহিরের মেয়েরা বঙ্গলক্ষ্মীর দিকে তাকাইয়া আছেন, তাঁর বাণী বিশ্বের মন্দিরে ধ্বনিত হোক।

কেন্দ্রসমিতির কথা

রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু

গত ১৭ই শ্রাবণ শনিবার রায় বাহাদুর চুণীলাল বসুর মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন কৃতী সন্তান হারাইল। সরোজ-নলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তিনি ইহার পরিচালক-সভার সদস্য ছিলেন। কলিকাতায় উপস্থিত থাকিলে তিনি সমিতির প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকিতেন এবং ইহার নানা কঠিন সমস্যার সমাধানে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণের পর তিনি সমস্ত সময় জনসমাজের মঙ্গলকার্য্যে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম

ভাগলপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সিংহ বি-এ মহাশয় শ্রীমতী লাবণ্যকুমারী সিংহের নামে পুরী বসন্ত-কুমারী বিধবাশ্রমে বর্ত্তমানে তিন বৎসরের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে তিন বৎসরের পরেও তিনি এই টাকা প্রদান করিবেন। এই সাহায্য হইতে দুইজন বিধবা ছাত্রীকে আশ্রমে বৃত্তি প্রদান করিয়া বিনাব্যয়ে রাখা হইবে।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা সিংহ তাঁহার স্বর্গীয় স্বামী ৺রমণীমোহন সিংহের স্মৃতি-উদ্দেশে আশ্রমের শিল্পবিভাগের একটি গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য একালীন ৫৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। সুধীন্দ্রবাবু এবং তাঁহার মাতা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীকে এই দানের জন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিদ্যাসাগরের তৈলচিত্র দান

আলমবাজার বরাহনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মিত্র মহাশয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র উপহার প্রদান করিয়াছেন। মিত্র মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আটশত টাকা মূল্যের সুনির্ব্বাচিত ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক স্কুল লাইব্রেরীতে দান করিয়া-ছিলেন। তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির প্রচারকার্য্য

গত ২৬শে জুলাই শনিবার সন্ধ্যার সময়ে রাণাঘাটে স্থানীয় মহিলাদের উদ্যোগে একটি মহিলাসভা হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিকলণ্ঠন সহযোগে মহিলা-সমিতির উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, গঠনপ্রণালী এবং অর্থ-নৈতিক ভীষণ সমস্যার দিনে কুটীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সেখানে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিল্পচর্চ্চা করার জন্য খুব চেষ্টা হইতেছে।

কল্যা মহিলাসমিতি

কল্যা মহিলাসমিতির উদ্যোগে বালিগঞ্জে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী মহোদয়ের গৃহে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সুখময়ী রায় বি-এ এবং শ্রীযুক্তা সুমুদিনী গাঙ্গুলি এই সভায় যোগদান করেন এবং মহিলাদের সহিত 'সমিতির ভিতর দিয়া কি ভাবে মহিলাদের উন্নতি সম্ভব' এ বিষয়ে আলোচনা করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-চরণ শাস্ত্রী প্রচারক মহাশয় আলোকচিত্র সাহায্যে 'নারীর শিক্ষা' এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।"

হাজরাবালা মহিলাসমিতি

গত ১লা আগষ্ট শুক্রবার ভবানীপুরে ৩৯ নং সিরীশ মুখার্জ্জি রোডে হাজরাবালা মহিলাসমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশেষ মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী সভানেত্রীর কার্য্য করেন। শ্রীযুক্তা কুসুমিনী গাঙ্গুলি এবং শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী অতি সুন্দরিনী ভাষায় মহিলাদের কর্ত্তব্য এবং কি ভাবে তাঁহারা মহিলাসমিতির ভিতর দিয়া গৃহের এবং দেশের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন সে বিষয়ে বক্তৃতা দেন। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী নারী-প্রগতি এবং বয়স্কের শিক্ষাবিষয়ে বক্তৃতা করেন।

রাণাঘাটে মহিলাসমিতি

গত ১০ই আগষ্ট রবিবার রাণাঘাটে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের গৃহে একটি মহিলাসভার আয়োজন হয়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর ভবেশচন্দ্র রায় মহোদয়ের পত্নী সভানেত্রীর কার্য্য করেন। সরোজ-নলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির একজন সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী মহিলাসমিতির ভিতর দিয়া নারীর উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং উপস্থিত মহিলাদিগকে একটি সমিতি গঠন করার জন্য আহ্বান করেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীকে সভানেত্রী এবং স্থানীয় প্রধান মুন্সিফ মহোদয়ের পত্নীকে সহ-সভানেত্রী করিয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত হরিপদ বিশ্বাস মহোদয়ের চেষ্টায় এই কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ল্যান্সডাউন রোড মহিলাসমিতি

গত ১৬ই আগষ্ট শনিবার ভবানীপুরে ল্যান্সডাউন-রোড মহিলাসমিতির সভ্যাদের সেলাইশিক্ষার পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রায় ১০ জন মহিলা এই পরীক্ষায় উপস্থিত হন। তন্মধ্যে সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীও উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে পর ৪৮৩ নং ল্যান্সডাউন রোডে একটি মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা সুষমা রায় বি-এ, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি এ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী এই সভায় যোগদান করেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশ-চন্দ্র সেন আলোকচিত্র সাহায্যে বেলজিয়মে মহিলাদের শিক্ষা বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা সুষমা রায় বি-এ মহিলাদিগকে ধন্যবাদ দান করিলে পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

মাননীয় রাজা সাহেবের সম্বর্দ্ধনা

গত ২রা আগষ্ট শনিবার আমাদের সভাপতি মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী সাহেবের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে চৌরঙ্গীর ওয়াই এম-সি-এ হলে একটি প্রীতি-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কেন্দ্র সমিতির কলিকাতা-নিবাসী মহিলা ও পুরুষ সভ্যগণ এবং কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য অধিবাসী ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য প্রচুরপরিমাণে জলযোগ, সঙ্গীত এবং ম্যাজিকের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মিসেস্ বসু, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত মণিকলাল দে সুমধুর সঙ্গীতের দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মাননীয় রাজা সাহেবের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার নাইট উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করেন। মিঃ দত্ত তাঁহার নবরচিত "সে যে দেশের বন্দনীয়" নামক সঙ্গীতটি সমস্বরে গান করিয়া সকলের চিত্ত মুগ্ধ করেন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ তাঁহার ম্যাজিক প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমকৃত করেন।

স্কুলকমিটির নূতন সদস্য

গত ৭ই আগষ্ট পরিচালক সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্তা কামিনী রায় সরোজ-নলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়ের পরিচালক-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

'বঙ্গলক্ষ্মী' সুপরিচালনের জন্য নূতন কমিটি

গত ৭ই আগষ্ট পরিচালক সভার অধিবেশনে 'বঙ্গলক্ষ্মী' সুপরিচালনের জন্য একটি নূতন সব-কমিটি গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—(১) শ্রীযুক্ত শুকদেব দত্ত আই-সি-এস, (২) ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী পি-এইচ-ডি, (৩) শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম বি-এ, বি-টি, (৪) শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, (৫) শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এবং (৬) শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি এল।

অর্থ-সংক্রান্ত কমিটি

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম পরিচালক-সমিতির গত অধিবেশনে অর্থ-সংক্রান্ত কমিটির (Finance Committee) সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শিক্ষা-সংক্রান্ত কমিটি

পরিণত-বয়স্কা মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের উপায়-নির্দ্ধারণের জন্য একটি সব-কমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত সব-কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—(১) শ্রীযুক্তা কামিনী বসু, (২) রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) ডাঃ পি, নিয়োগী, (৪) মিস এন, বি, সোম, (৫) মিঃ জি, এস, দত্ত, (৬) শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী।

নিবেদন

সমিতির কোন সভ্য বা গ্রাহক ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে প্রত্যেক বাঙলা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করার আদেশ দিয়া বাধিত করিবেন। উক্ত তারিখের পর কেহ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করার দরুণ যদি বঙ্গলক্ষ্মী না পান সেজন্য আমরা দায়ী হইব না। অনেকে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া ২০ মাস কোন সংবাদ দেন না—হঠাৎ একসঙ্গে ২৩ মাসের বঙ্গলক্ষ্মী চাহিয়া পাঠান; সেজন্য আমাদিগকে বড় অসুবিধায় পড়িতে হয়। বঙ্গলক্ষ্মী প্রত্যেক বাঙলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। যদি কেহ ২০ তারিখের ভিতর বঙ্গলক্ষ্মী না পান তাহা হইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া জেনারেল পোষ্ট-অফিসে অভিযোগ করিয়া তাহার উত্তরসহ যে মাসের বঙ্গলক্ষ্মী পান নাই, সে মাসের শেষ তারিখের মধ্যে গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে জানাইলে অপ্রাপ্ত সংখ্যা বিনামূল্যে পাঠাইব। ঐ তারিখের পর হইলে ।/১০ আনা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ, বঙ্গলক্ষ্মী

একরাত্রি

শ্রী নীতীশচন্দ্র রায়

দেবব্রত কহিল, "তবে আমি আসি।"

বৃদ্ধ মহম্মদ খাঁ মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা এস বেটা! কিন্তু তোমাকে যা শিখিয়েছি, যেন তা নষ্ট কোরো না। সঙ্গীত সকল করার জিনিস নয়, সম্ভোগ করাতেই তার সার্থকতা। কিন্তু গান বেচে পাবার জিনিষ নয়—হৃদয়ের জিনিষ।"

অবনত মস্তকে দেবব্রত বলিল, "হাঁ ওস্তাদজী!"

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে; আকাশে তারার খেলা ভাল করিয়া বসে নাই। দিবসের জাগ্রত চেতনা রাত্রির সমাধির মধ্যে বিশ্রাম খুঁজিতেছে মাত্র।

পথে বাহির হইয়া দেবব্রতের কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। কোন সুদূর অতীতের অখ্যাত দিবসে অপরিচয়ের পরিচয় লইয়া সে ঐ মুসলমান ওস্তাদজীর দ্বারে অতিথি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর আজ বন্ধু লইয়া সেখান হইতে বিদায় লইতেছে।

পৃথিবীতে তাহাকে ভালবাসিবার ও তাহার ভালবাসা লইবার সেদিন কেহই ছিল না, আজি প্রবাসে ভিন্ন-ধর্ম্মীর গৃহেও তাহারই জন্য পরমাত্মীয়ের আসন পাতা রহিয়াছে। পুষ্পিত জীবনের সমস্ত মধু তাহারই পানপাত্রে ভরিয়া দিবার জন্য এক তরুণী উন্মুখ-যৌবন লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার চক্ষু জলে টলমল্ করিতে লাগিল। সদর রাস্তা ছাড়াইয়া, বাঁকাচোরা পথ পার হইয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ সে তানসেনের সমাধিস্থানে আসিয়া পড়িল। সুর-দেবতাকে সন্ধান করিয়া যাত্রা করিবার পথে সে এই সুরস্রাজকে প্রণাম করিল। চক্ষের সম্মুখে তাহার তানসেনের অপরূপ রূপ ভাসিয়া উঠিল।—হিন্দু-মুসলমান-জৈন বলিয়া তাঁহার কোনও ধর্ম্ম নাই, ধনী-নির্ধন-মধ্যবিত্ত বলিয়া তাঁহার কোনও আখ্যা নাই, বাঙলা বলিয়া, মারাঠা বলিয়া, গুজরাট বলিয়া তাঁহার কোনও দেশ নাই। এই বিশ্বমানবকে বার-বার প্রণাম করিতে করিতে তাহার মনে সুর জাগিয়া উঠিল;—সুরবাহারে তার চড়াইয়া কখন যে সে আলাপ সুরু করিয়াছিল, তাহা তাহারই মনে ছিল না।

অরণ্যস্থলীর চাপা ক্রন্দনে নিস্তব্ধ গগন ভরিয়া উঠিল। মনে হইল শুকনো ফুল, ঝরা পাতা, জীর্ণ ধরিত্রী যেন গুমরাইয়া উঠিতেছে; মাটির বুকের তলে অগণ্য কোটী-কোটী ভ্রূণ যেন প্রকাশ-বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। তারাদের চাপা আওয়াজ হাওয়ায় ভাসিতেছে···সে কী সুর...সুরের মূর্চ্ছনায় মনে হইল, ক্ষুধিত কাষ্ঠ যেন প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছে,—এই জড়পদার্থও বুঝিবা বেদনার ভারে ভাঙিয়া পড়ে!

যখন সুরের কান্না থামিল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ কে যেন ডাকিল, "দেবব্রত—"

মুখ না তুলিয়াই দেবব্রত কহিল, "হাঁ, শুনিলে?"

—শুনিলাম। আর শুনিলাম বলিয়াই ত আসিয়াছি।

—কেন?

—আবার শুনিব বলিয়া।

চোখ তুলিতেই দেবব্রত দেখিল, উচ্ছল-যৌবনদৃপ্তা সুন্দরী তরুণী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাহার তনু-দেহ ঘিরিয়া সবুজ রেশমের পাঞ্জাবী, বক্ষে সূক্ষ্ম ওড়না, তাহার চোখে সুরমা টানা, পায়ে শিঞ্জিনী বাজিতেছে।

দেবব্রতের মনে হইল, যেন ইহাকে চিনি; কোথায় যেন ইহাকে দেখিয়াছি, সে কবে, কোন্ অতীত যুগের জন্মজন্মান্তরের কোন বসন্ত প্রভাতে, অথবা বর্ষারাতে তাহার সহিত পরিচয় ছিল; যেন কোন্ শুভ অতীতের মাধবীসন্ধ্যায় ইহারই সহিত জীবনের পথে যাত্রা করিয়াছিলাম—পথে তাহাকে হারাইয়াছি। আজ আবার বিদায়-রাতে তাহার সন্ধান মিলিল।

হয়ত তখন তাহার চক্ষুদুটি কাজলের মত কালো ছিল, হয়ত তাহার কীণ দেহ আরও সুষমায় ছিল। আজিকার মত তাহার অধর-ওষ্ঠ এমনই রক্তিম, ভ্রাক্ষারসিক্ত ছিল কিনা

তাহাও মনে পড়ে না, শুধু জানি, যেন জন্ম জন্ম ধরিয়া এই নারী আমাকে সাথে করিয়া লইয়া বেড়াইয়াছে, এই রমণীই আমার জন্য স্বর্গ-রচনা করিয়াছে, ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই আমার ভালবাসা জন্মলাভ করিয়াছে ও পুষ্ট হইয়াছে। কত পূর্ণিমা রাতে তাহাকে ঘেরিয়া কত কাব্য রচনা করিয়াছি, কত গান গাহিয়াছি,—কত মধুচক্র সৃজন করিয়াছি।

আজ ইহাকে অস্বীকার করিলে চলিবে না, এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই, শুধু ইহার কথা শুনিতেই হইবে

রমণী কহিল, "কি ভাবো দেবদত্ত?"

—তোমার কথা।

—আমায় তুমি চেন?

—চোখের চেনা না থাকলেও, অপরিচিতা তুমি নও।

—তবে এস।

দেবদত্তের মনের পুরুষ নারীর আহ্বানে সাড়া দিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। রমণীর হাত ধরিয়া কহিল,—"তুমি আসিয়াছ, চল।"

নারীর সঙ্গে আবার তাহার যাত্রা সুরু হইল। কত গলিপথ ছাড়াইয়া, কত রাজপথ বাহিয়া, কত কবরখানা সরাইখানার পাশ দিয়া রমণী এক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। দেবদত্ত নীরব হইয়া চলিল। সে যেন সম্বিৎ হারাইয়াছে; কিন্তু করিবার, কিছু বলিবার শক্তি যেন তার নাই। শুধু তার বিস্মিত নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল সিঁড়ির উপর গালিচা পাতা, ফুলের টব দু'ধারে সারানো···রঙীন পর্দ্দা সরাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই দেবদত্তের চমক্ ভাঙিল।

ঘরের মেজের রক্তবর্ণ প্রস্তর, দেওয়ালে সুদৃশ্য চিত্রাবলী, গবাক্ষে কিংখাপের পর্দ্দা দুলিতেছে, সারি সারি ঝাড়-লণ্ঠনের আলো রাত্রিকে দিবস করিয়া তুলিয়াছে; দামী পুষ্পসারের তীব্র গন্ধে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। গালিচার উপরে বহু সুবেশ সুসজ্জিত নরনারী উৎসবের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বসিয়া ছিল। চারিদিক হইতে শব্দ হইল, "দেবদত্ত! দেবদত্ত!—এসেছ! বেশ!"

দেবদত্ত বলিল, "হাঁ।"

দেবদত্তের মনে হইল সে যেন বিবাহসভার বর; সকলেই তাহাকে চেনে, সকলেই তাহার নাম জানে, অথচ তাহাকেও সে ঠিক চেনে না। মুখটা চেনা চেনা বোধ হয়, সুরটা পরিচিত লাগে, ঐ পর্য্যন্তই···

বাঁশী আসির বাজন করিতে বসিল; সাজী নীল পেয়ালা লাল সরাবে ভরিয়া দিল। একনিশ্বাসে দেবদত্ত পান করিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল, আজি যেন পরিচিত পৃথিবী তাহাকে অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতেছে। এই সুন্দরী তরুণীবৃন্দের সঙ্গে এ জনমের চেনা নাই বা থাকিল; ইহারা যেন তাহার আপনার, একান্তই আপনার! রক্তে রক্তে, শিরায় শিরায়, অণু-পরমাণুতে তাহার পুলক নাচিয়া উঠিল; আবার সে হাত বাড়াইয়া পেয়ালা তুলিয়া লইল।

এক তরুণীর হাত তাহার হাতে আসিয়া ঠেকিল। স্নিগ্ধ শরীরে শিহরণ আনিল না—সে চম্‌কাইয়া উঠিল। এরা কি সত্যই রক্তমাংসের জীব? ইহাদের দেহে সত্যই কি প্রাণলীলার স্পন্দন চলিতেছে? জীবন্ত মানুষের হাত এত শীতল হয়? আবার তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইল, যে রমণী তাহাকে সাথে করিয়া আনিয়াছিল সে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তার দেশোয়ালে মণি মুক্তা যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে, মুখে-চোখে আবেশের আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছে।

সে কহিল, "দেবদত্ত, কি গাহিবে?"

দেবদত্ত বলিল, "যে বেদনা সুরবাগানে বাজাইয়াছি, কণ্ঠে তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিব।" রমণী কহিল, "বহুৎ আচ্ছা। বেদনাই তো জীবনের গান; কঁটার বুকেই তো কুঁড়ি ফোটে। তুমি তবে মালকোষই সুরু কর, দেবদত্ত।"

'মালকোষ'—দেবদত্তের মনে পড়িয়া গেল ওস্তাদ-জীর কথা, "মালকোষ্ জীবনের প্রিয়তম সঙ্গীত।" দেবদত্ত কাঁপিয়া উঠিল; একবার সে সুমুখের ঐ তৃষিত নয়নারীর মেলার দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর পাশের তরুণীর দিকে সুধাতুর দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল। তাহার মনে হইল, তারায় তারায় অনির্ব্বাণ আগুন জ্বলিতেছে, চন্দ্রসূর্য্য সৃষ্টির উল্লাসে জলে স্থলে আলোক বিচ্ছুরিত করিতেছে, মাটির বুকে পৃথিবীর স্পন্দন শুনা যাইতেছে, জীবনের তারে মৃত্যুর সঙ্গীত রণিত হইতেছে। তাহার মনে হইল,

আশেপাশে অভিশপ্ত আত্মার দল উল্লাস করিয়া বেড়াইতেছে, নটীর নূপুরনিক্কণ শুনা যাইতেছে, পাত্রে মদ্য ঢালিয়া ঢলিয়া উঠিতেছে, কতজন যাদুরা ঘুমিতেছে, অলক্ষ্যে খিলখিলি বাজিয়া উঠিতেছে।

কত উৎসবে, কত কলরবে, ইহারা পুষ্পিত যৌবন বিলাইয়া দিয়াছে; কত ভোগের রাত্রে, কত সুখবাসরে তাহারা বিলাসরজনী পাখিয়া কাটাইয়াছে তখনই আবার মনে হইল, এতো হাসি নয়—কান্না। তৃষিত পাষাণ পর্যন্ত অন্তর্গূঢ় বেদনায় গুমরাইয়া মরিতেছে। এই অভিশপ্ত নগরীর আত্মার দল আজি ব্যাথার মেলা বসাইয়াছে—জীবনে তাহাদের তৃষ্ণা মিটে নাই, আকাঙ্ক্ষার অগ্নিদাহ কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুকাইয়া লইয়াছে, অন্তরের বেদনাদগ্ধ বাহিরের হাসি ছাপাইয়া ছিটকাইয়া পড়িতেছে। দীর্ঘশ্বাস, আর্ত্তকন্দন তাহার কানে লাগিতেছে; আজ তাহার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় সজাগ সচেতন হইয়া তাহাকে চেতনার উৎসমুখে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছে।

কণ্ঠ ভরিয়া সে আর একবার ঐ তৃষিত হলাহল পান করিল। তাহার গান সুরু করিল। সে কী গান··· কত আগত—অনাগত যুগের লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী প্রাণীর হাহাকার; অভিশপ্তের কণ্ঠস্বর সে গানে উদাত্ত হইয়া উঠিল; ছন্দে ছন্দে, রাগিণীতে রাগিণীতে বেদনার নর্ত্তন চলিতে লাগিল। মীড়ের পর মীড়, সমকের পর সমক্ উচ্ছল হইয়া উঠিল; মনে হইল এ যেন গান নয়, হাসি নয়, কান্না নয়, কোন নামে ইহাকে চেনা যায় না, কোন রূপে ইহাকে বাঁধা চলে না, এ সুর ও সুরের সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয় আছে, রক্তের সম্বন্ধ আছে, নাড়ীর যোগ আছে।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দেবদত্ত উন্মত্ত হইয়া গাহিয়া চলিল। কণ্ঠ শুষ্ক হয়, আর সে পাত্র ভরিয়া সুরা পান করে। ঐ ক্ষুব্ধ, উন্নমিত, তৃষিত নরনারীর মুখের দিকে চাহে, আর সুরের তুফানী বহিয়া চলে। গলা আর চলে না, কিন্তু থামিতেও চাহে না; দেবদত্তের আর কোন কথা মনে ছিল না। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, পৃথিবী সমস্ত সৌরজগৎ আজি যেন মালার মত গ্রথিত হইয়া সৃষ্টিসরোবরে ভাসিয়া চলিয়াছে...আনন্দ—বেদনার রক্তকমল ফুটিয়া উঠিয়াছে; শুধু তাহার মনে ছিল, আজিকার রাত্রিটুকুর তপস্যা তাহার সিদ্ধিতে ভরিয়া উঠিবেই, আজ তাহাকে পাইতে হইবেই। তারপর যদি এই মুখরকণ্ঠ চিরদিনের মূক হইয়া যায় তবুও ক্ষতি নাই।

রাত্র, পল, যাম, রাত্রি সব শেষ হইয়া আসিল,—ধীরে ধীরে তাহার চেতনাও হারাইয়া গেল।

প্রভাতে এক তরুণী, যে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া এই পথিকের পায়ের শব্দের জন্য কান পাতিয়া ছিল, গত রাত্রিতে এই মৃত্যুপথযাত্রীকে লইয়া যাহার সমস্ত স্বপ্ন রচিত হইতেছিল, তাহারই খোঁজে আসিয়া দেখিল, দেবদত্ত তানসেনের পবিত্র সমাধির পাশে,—আবর্জ্জনাস্তূপে পড়িয়া রহিয়াছে। আকুল কণ্ঠে সে ডাকিল, "দেবদত্ত! দেবদত্ত!"

গতরাত্রিতে এক নারী তাহাকে লইয়া জীবনের পাশা ফেলিয়াছে, প্রভাতে আবার এই তরুণী তাহাকে লইয়া মৃত্যুর দান ফেলিল। বৃদ্ধ মহম্মদ খাঁ কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া, দেবদত্তের মাথা কোলে তুলিয়া ডাকিলেন, "দেবদত্ত—বেটা!" এবারও দেবদত্ত কোন সাড় দিল না, শুধু চোখ মেলিয়া চাহিল। ভাষা তাহার মূক হইয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে ওষ্ঠের হাসিও মিলাইয়া গেল। মহম্মদ খাঁ তরুণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "কাঁদিস্ না বেটি!—দেবদত্ত! সাবাস্ বেটা! তোর সুরবাহার সুরদেবতার সন্ধান পেয়েছে তাই তাতে আর সুর জমবে না! তোর গলায় সুরের সরস্বতী অসেছেন, তাই সেখানে আর সুরও ফুটবেনা!"

চিঠি

শ্রী অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

'অলোকনন্দা'
শুক্লাপ্রতিপদ
শ্রাবণ, '৭

প্রিয়বরেষু—

বহুদিন তোমার চিঠি আসে নি। হয়ত' বাস্ত আছ ব'লেই লিখ্‌তে সময় পাও না; তবু মাঝে মাঝে দু'চারটি পংক্তিও লিখো। সাত-সমুদ্দুর তের-নদীর পারে যে প্রিয়জনটি র'য়েচে, তা'র এতটুকু হ'তের আঁচড়ও পরম রম্য। প্রতিটি রবিবার যেন নতুন ক'রে অনুভব করি; তোমার চিঠি আসে-আসে—সময় যায়, সকালের আকাশে নেমে আসে সন্ধ্যা, তোমার চিঠি আসে না। কিছু নয়, অতি তুচ্ছ—তবু, তবু সারাটি বুক কেমন ক'রে ওঠে! ভাবি—ভাগ্যিস্ ওর চিঠি এল না, তাই ত অনুভব ক'রতে পারচি এই অনবদ্য ব্যথার রেশটুকু। এই ও' ভালো.....

না, না, লিখো। তুমি লিখ্‌বে,—"তোমার চিঠি পেলুম, আকাশ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো, বাতাস যেন মাধবতার ভরা, তোমার লিপি ব'য়ে নিয়ে এল আমার সুন্দরের স্পর্শ.....।"—লিখ্‌বে কি? ভুল ক'রেও লিখো,—"তোমার পত্রের জন্যে উন্মুখ হ'য়েছিলুম, তোমার চিঠি পেয়ে আমার সারাটি চিত্ত খুশীতে ভ'রে উঠ্‌লো। মনে হ'ল যেন তুমি পেছন থেকে লুকিয়ে এসে দু'টি কোমল করতল দিয়ে আমার চোখদু'টিকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ ক'রলে; আমি ইচ্ছে ক'রেই ভুল ক'রে বললুম— ছাড়ো, ছাড়ো; তুমি শিল্পা, তুমি রেবা, না, না তুমি চিত্রলেখা...!' আমি ভুলে নিলুম তোমার হাত দু'খানি আমার চোখের ওপর থেকে। তুমি চিত্রলেখা নও, তুমি পত্রলেখা, আর আমি চন্দ্রাপীড়, তেমনি নিষ্ঠুর, তেমনিই নির্মম।....."

লিখ্‌বে কি? আমি জানি তুমি লিখ্‌বে না তা', তুমি সত্যিই নিষ্ঠুর!

আচ্ছা, তুমিই ব'লে দাও না—কোন্‌টা রমণীয়,—চিঠি পাওয়াটা না চিঠি পাওয়ার প্রতীক্ষা?

কাল সন্ধ্যায় একটি কবিতা পড়্‌লুম কপার্ট-ব্রুকের। তা'র একটি পংক্তি ভুলে গিয়েছিলুম—"The kiss dies with the lips, the love with the lover." কী চমৎকার বলো ত'? আমি যে-দিন তোমার কোলটিতে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ফেল্‌বো, হয়ত' তোমার চোখদু'টি ভ'রে উঠ্‌বে জলে, কিন্তু তা' কতটুকুর জন্যে! তুমি ভুলে যাবে আমাকে, তুমি ভুলে যাবে আমার চুম্বনের উন্মাদনাকে। উঃ, ভাব্‌তেও ভয় করে, এমন একটিদিন আস্‌বে যখন ভালবাসা হ'য়ে গিয়ে থাক্‌বে শুধু তা'র কঙ্কাল।

বলো, তুমি আমায় ভালোবাসো না। প্রেমের অপমান সহ্য করবার মত শক্তি আমার নেই। আমি ভাববো, তোমাকে আমি জানি না, শুধু চিনি।

জানা আর চেনার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ—এটা নিশ্চয়ই তোমাকে বুঝিয়ে দেবার দরকার নেই। যা'কে জানি, তা'কে মনে হয় অন্তরের মধ্যে পেয়েচি, যা'কে চিনি, সে যেন সরাইখানার বন্ধু, আজ আছে, কাল নেই;—অন্তরের মণিকোঠায় তার আসন পাতা হয় নি।.....

ক্ষমা কোরো, আজ একটি কথা তোমার কাছে ব'লে বিদায় নেবো। আমি কি তোমায় ভালোবাস্‌তে পেরেছি? এটা যেন আমার কাছে আজও একটা সংশয় হ'য়ে রইল। যদি তোমার মনে হয়, আমি তোমায় ভালোবাস্‌তে পেরেছি—তুমি জেনো আমি তোমায় ভালোবাসি নি। সত্যিকারের ভালোবাসা যে কী তা' যদি বুঝ্‌তে!

ক্ষমা...ক্ষমা...ক্ষমা!

তোমার—রেখা

কেন ?

শ্রী শান্তিলতা দেবী

চির তার এ জগৎ হ'তে
ভেসে গেছে সমতের স্রোতে।
কেন এসেছিল হেথা ? না জানিয়া কোনও প্রয়োজন
অদৃষ্টেই ক'রে গেছে,—না জানি সে কিসের কারণ
শুধু ক্ষীণ দু'টুকুরু হায়,
তাও আজ নাহি এ ধরায়!
ছিল নয়নের মণি, আজ শুধু শ্মশানের ছাই—
তাও কোথা গেছে ভাসি', সারাবিশ্ব খুঁজিয়া না পাই।
নাই নাই কোন চিহ্ন তার,
ধ্বনিতেছে শুধু হাহাকার!
বার-মাস-দশক এক বয়সের তরুণ উষায়
অনিচ্ছু-দুষ্টুও চিতে না জানি সে গিয়াছে কোথায়!
কোন্ সেই সুদূর-লোকে ? কে বলিবে কোথা যায় প্রাণী,
অদৃষ্ট কর্ণেও নহে কি করিয়া এরা জীবে টানি'!
কঠোর করাল-কাল মহাভয় জাগাইয়া বুকে,
জননীর নগ্নতনু অট্টহাসে চিঁড়ি' সকৌতুকে,
নিষ্পাপ সন্তানে তার, কে বলিবে, কেন করে গ্রাস—
কার কুট-কর্মফলে ফেলে শিশু অস্তিত্বের শ্বাস।
সেও শুধু জননীর পাপ ?
তাই কি সে পায় মনস্তাপ !
তাই যদি হয়, তবে, ক্ষুদ্র সেই মরণ-সম্ভব,
সে কেন অস্তিমকালে এত কষ্ট করে অনুভব ?
তরুণ ব্যাধির গ্রাসে জর্জ্জরিত সুকুমার দেহ,
বহুবার বাতাসেও করে নাই অনল প্রদাহ,
তৃষ্ণায় আকুল চিত্ত, কাছে সুশীতল জলপাত্র ;
কণ্ঠ-রুদ্ধ, সকাতরে তাকাইয়া ছিল শুধু মাত্র।
লইতে একটি বার প্রশ্বাস পাইয়া বহুক্ষণ,
নিরাশ হইয়া শেষে বড় কষ্টে মুদিল নয়ন।
ক্ষুদ্র শিশু—কি জানে সে, কেন তার এত বিড়ম্বনা,
কার দোষে পাইল সে মৃত্যুর এ কঠোর যাতনা ?
হয় যদি তা'রই ইহা পাপ
জননীর কেন তবে তাপ ?
একের কর্ম্মের সাথে অপরের কেন এ বন্ধন ?
জন্ম-জন্মান্তর কেন জীবের এ কাতর ক্রন্দন ?
বিশ্বপতি আনিয়া কেন সকলেরে দেন দুলাইয়া ?
আশামায়া-মরীচিকা জ্ঞান-দৃষ্টি রাখে আবরিয়া—
ভবিষ্যতে প্রতি কেন মানবের নাহিক কর্তৃত্ব,
অবোধ শিশুর কেন এত দুষ্কৃতের প্রায়শ্চিত্ত !

স্লোনস্ ব্যবহার করিয়া
বুকের সর্দ্দি নিরাময় করুন

কাশির সঙ্গে সঙ্গে বুকের বেদনা অনুভব করা মাত্রই স্লোনস্ প্রয়োগ করিবেন।

স্লোনস্ লিনিমেণ্ট আক্রান্তস্থানে প্রয়োগ করিলে, রক্ত চলাচলের সহায়তা করিয়া আপনাকে শীঘ্র আরাম প্রদান করিবে। স্লোনস্ ব্যবহার করিয়া শীঘ্র আপনার সর্দ্দি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করুন।

Sloan's Liniment kills pain!

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

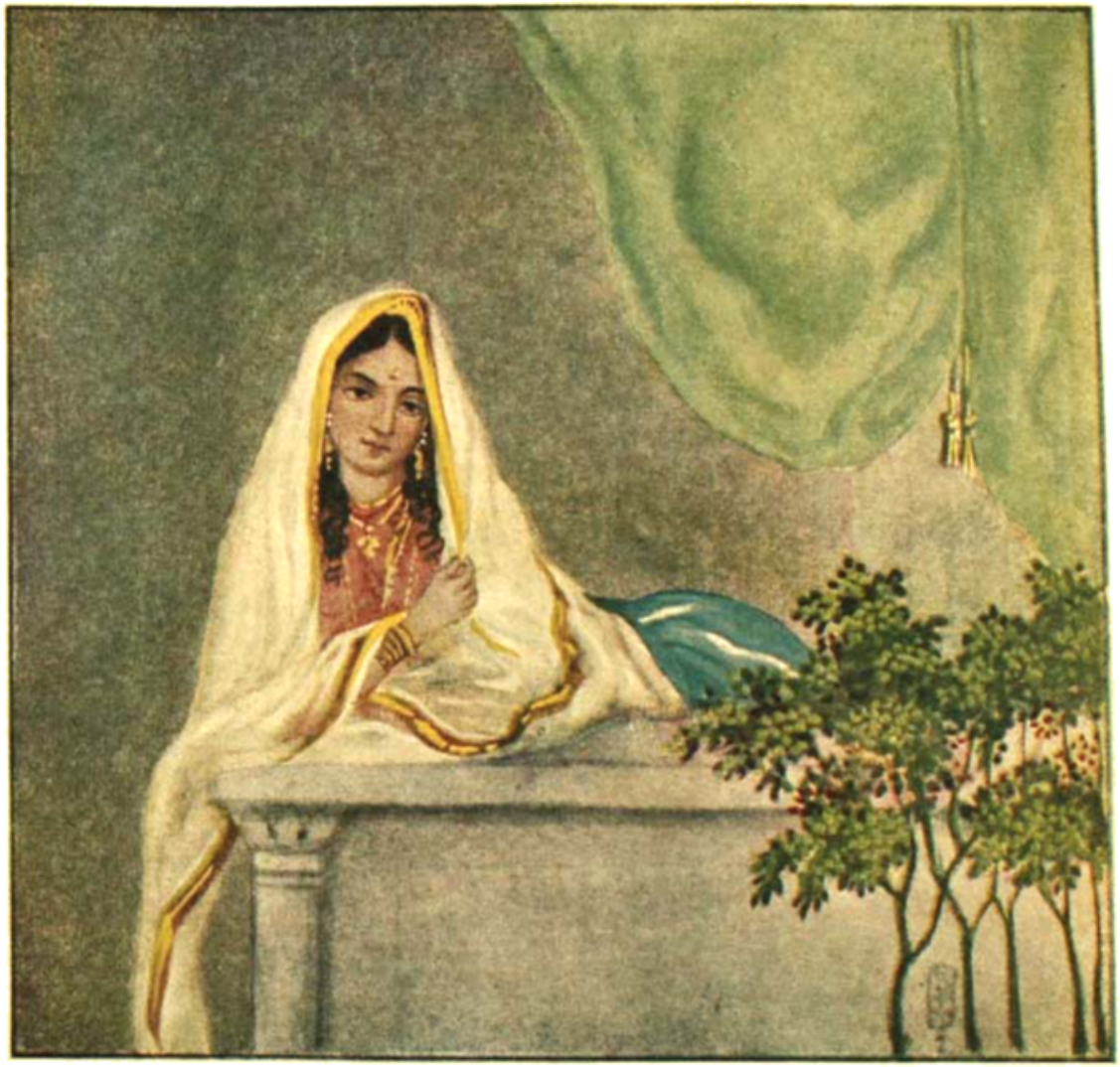

পদ্মিনী

কহিয়া যায় আঁখি হেন রূপরাশি
অনলে ঝাঁপিলে সতী ফুলজ্ঞানে হাসি'।
পবিত্র পাবক আসি' পরশিল কায়,
প্রেমের সুরভিশ্বাস নিশ্বাসে বিলায়।

শিল্পী—শ্রী শ্যামসুন্দর প্রসাদ বর্মা

PRINTED BY C. H. ARAN & CO.

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচলে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত যাচি।
'করি সবার উপকার',—
এই কথাটি উচ্চারিলে
পরস্পরে বারেবার।"

৫ম বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩৭ [১২শ সংখ্যা

নূতন 'সর্ত্ত'

আমরা মানুষ, আমরা মানুষ,
দেবতা কেহ নই,
মানুষ হওয়ার ভাগ্য পেলেই
তুষ্ট হ'য়ে রই।
পরের ভাগ্য কাড়তে যাওয়া
মানুষ হওয়া নয়,
সবার ভাগ্য বাড়তে দিলে
মানুষ—মানুষ হয়।
সকল ভাগ্যে আনন্দ, আর
সকল ভাগ্যে সুখ,
বিধির দত্ত সাধনগুণে
আনবে সত্যযুগ।
নূতনতর এই প্রেরণা
নামছে ধরায় আজ,
স্বর্গে মর্ত্যে সমান 'সর্ত্তে'
বাঁচবে সবার কাজ!

প্রাচীন শিল্প-কলার রেখা-ছন্দ

শ্রী অসিতকুমার হালদার

আমাদের দেশের বহু-প্রাচীন সুকুমারকলার রেখা-ছন্দের বিষয় আলোচনা করবার পূর্ব্বে রেখা-ছন্দের বিষয় দু'-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। Clive Bellএর significant form ও আমাদের রেখা-ছন্দ প্রায় একই জিনিষ কেবল ভাবগত বা ভাবাগত বৎসামান্য তারতম্য থাকতে পারে। চিত্র বা ভাস্কর্য্যের মধ্যে এই রেখা-ছাঁদ কি ভাবে শিল্পী ধ'রে থাকেন তার দৃষ্টান্ত অঙ্ক ক'ষে দেখানো সম্ভব নয়,তবে ছবি বা ভাস্কর্য্যটি দেখ্‌লে তার মধ্যে শৃঙ্খলা বা উচ্ছৃঙ্খলার ভাবটি দেখলে সাধারণ লোকেরও বুঝতে দেরী হয় না। যেমন কোনো Futurist Schoolএর চিত্রে বা অতি-আধুনিক ইউরোপীয় মূর্ত্তি-কলায় আমরা দেখি ছাঁদ-বাঁধটি বেশ আছে,—নেই কেবল তার ভিতর সাধারণ চোখে-দেখা কানে-শোনা দুনিয়ার সাধারণ জিনিষের রূপ। সে এক অতিমাত্রায় অতি-মানুষিক বা বেশীমাত্রায় যে-বস্তুর চেহারা। সেখানে শিল্পী abstract ভাবে দেখাতে চেয়েছেন রেখা-ছন্দের গতি (dynamic motion)—খুব ভীষণ বেগে তখন তুলি-কলম চালিয়ে গেছেন শিল্পী। এই গতি (dynamic) ও স্থিতি (static) এই দু'য়ের খেলাই হ'ল শিল্পীর খেলা। রেখা-ছন্দ এই স্থিতি ও ছন্দের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। তাই দেখা যায় ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার বিষয়-প্রণালীটি একটি কোনো শিল্পীর একচেটে হ'য়ে যায় নি। যদিও একেত্রে কাব্যকলার দেখা গেছে যে কোনোকালে কোনোদেশে কবি এমন একটা শিখরদেশে সহসা গিয়ে উঠেছেন যে তখন তাঁকে নাগাল পেতে আরো কত যুগ যে লেগে যায় তার আর ইয়ত্তা নেই। ভারতে কবি কালিদাসের পরে আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। বিলাতের সেক্‌স্‌পিয়ারের পরে মাত্র ২।১ জনের নাম করা যায়, যদিও একাসনে তাঁদের বসানো অসম্ভব। চিত্র ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে য়্যাঞ্জেল বা মাইকেল এঞ্জিলোর নাম আমরা বেশী জানলেও নাম জানি না এমন বহু শিল্পীদের শিল্পকলার কদর পৃথিবীতে আছে ; এবং ক্রমাগত যুগে যুগে তার নানারূপ প্রকাশ হ'য়ে চলবে। এইখানে কাব্যকলার চেয়ে শিল্পকলা মুক্ত। কাব্যের ছন্দ এমন ছাঁদে বাঁধা যে তার শব্দ অর্থ যোজনা ছাড়া কেবল অর্থশূন্য ধ্বনির সঙ্গে ছন্দ জুড়ে' চালালে তা' একেবারে অচল হ'য়ে যায়। কিন্তু শিল্পকলায় একটি যদি ছন্দ-লতা (arabesque) বিনা তাৎপর্য্যে ও বিনা ভাব-ব্যঞ্জনায় আঁকা যায়,—কেবল তার abstract ছন্দ-রেখার সুকুমার সমন্বয়েই অতি অপূর্ব্ব হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। তবে এরূপ ছন্দ-লতাটি চিত্রকলা বা ভাস্কর্য্যের অলঙ্কারস্বরূপই হয়, যদিও তাকে বড় একটা উঁচু স্থান দেওয়া হয় না। এইরূপ pattern বা ছন্দলতার সঙ্গে এবং উচ্চঅঙ্গের চিত্র বা ভাস্কর্য্যকলার তফাৎ এই যে, উপরোক্ত টিকে যে-কোনো ভাবে যে-কোনো দিক থেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা যায়, তার উল্টো-সিধে নেই ; আর কোনো চিত্রকে বা ভাস্কর্য্যকে ডিগ্‌বাজি খাওয়ালে ভাঙ্গ-মূর্ত্তির খেলা দেখানো যেতে পারে বটে কিন্তু তা ছাড়া আর কিছু তার পরিচয় পাওয়া যায় না। ছন্দ-লতা ও ছন্দ রেখা এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে একটি হ'ল আরটির বাহন। ছন্দ-রেখা যোজনা দ্বারাই ছন্দ-লতাটি রচনা করা হয় গালিচার উপর, পর্দ্দার উপর। নানান গৃহসজ্জায়, আসবাব-পত্রে ছন্দ-লতার স্থান ব্যবহারিক শিল্পকলায় এবং কখনো কখনো চিত্র ও ভাস্কর্য্যের শোভাবর্দ্ধনের জন্য, কখনো ফ্রেমের উপর কখনো বা তার pedestalএর গায়ে এবং স্থাপত্য-কলায় শোভনতায়। ছন্দ-লতাকে সাধারণতঃ মঞ্জরলতা বা কারিকরের ভাষায় "মঞ্জুরী" বলা হয়।

ইউরোপে আজ সাড়া প'ড়ে গেছে রেখা-ছন্দের খোঁজের, এমন কি তার ভিত্তি পর্য্যন্ত ওঁরা নাড়াচাড়া করছেন। এপ্‌ষ্টাইনের ভাস্কর্য্য এবং কয়েকজন অতি-আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্করের ভাস্কর্য্যকলা দেখ্‌লে দেখা যায় ওঁরা

এখন প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের অসভ্যদের বাসন-কোসনের গায়ে আঁকা, গুহা-গহ্বরের গায়ে আঁকা চিত্র ও কারুকলার

শ্রী অসিতকুমার হালদার

দ্বারা অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁরা অন্ততঃ এটা তাদের কাছ থেকে শিখেছেন যে রেখাঙ্কনের বাজেখরচ রেখা-ছন্দের অন্তরায়। তাই তাঁরা সামনে মডেল রেখে মূর্ত্তিচিত্র আঁকলেও প্রাচীন অসভ্যদের অতিসহজে গড়া মূর্ত্তির কাঠামোর ঠাটে প্রতিমূর্ত্তি গড়বার চেষ্টা করছেন এবং নানান দার্শনিক ও ভাবুকের ভাবে প'ড়ে দেশবিদেশে সুখ্যাতি অর্জ্জন করছেন। এই অসভ্যদের অঙ্কনের ভিতর একটা অনাবিল সরলতা এবং সহজে চরিত্র-চিত্রণ দেখানোর বাহাদুরি যা' কিছু আছে সেইটিকে হৃদবোধের দ্বারা ধরাই হ'ল এই সকল গুণী শিল্পীদের কাজ। এঁরা গতানুগতিক পন্থায় প্রকৃতির হুবহু নকল ক'রে সুখ পান না, এঁরা সেই চিরন্তন সত্যের সন্ধান করছেন,—যার সন্ধান আমাদের দেশের অতি প্রাচীন শিল্পীরা খৃষ্টপূর্ব্ব পাঁচশত বৎসর থেকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ক'রে গেছেন; এবং তার পরবর্ত্তীকালেও কিছু রাজপুত ও মোগলের মধ্যে গতিশীল ছিল, এবং পরে একেবারে কদমদারার মত আপাততঃ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। সেই ধারাটির সন্ধান হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ গোড়ায় আবিষ্কার করেন এবং এখন তাঁদের শত শত শিষ্য আছেন যাঁরা তার রসপান ক'রে জীবন ধন্য জ্ঞান করছেন। প্রকৃত রেখা-ছন্দের যে শিক্ষা ও সংযমের উপর ভারতের শিল্পকলা দাঁড়িয়ে আছে তার কথা ভারতের শিল্পীরা জানলেও দেখেছেন এবং বুঝেছেন এমন শিল্পী খুবই বিরল।

ইউরোপ আজ যে ছন্দ-রেখার জ্ঞান অতি প্রাচীন প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের শিল্পের ভিতর পেয়েছেন, আমাদের দেশের গুণি-শিল্পীরা বহুযুগ পূর্ব্বে যে তার খনি আবিষ্কার ক'রে গিয়েছিলেন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হ'চ্ছে প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি। তাঁরা যখন এই মূর্ত্তিটি গড়েছেন তখন ইউরোপের শিল্পকলার শৈশব অবস্থা; তখন তাঁরা মানুষের শরীরের পেশীর হুবহু নকল এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে মূর্ত্তিগুলির মধ্যে খুঁটিনাটি রেখার ভঙ্গী দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এদিকে আমাদের গুণি-শিল্পীরা রেখার সংযম এবং রেখা-ছন্দের (significant form এর) গতিশীলতার ভিতর এই মূর্ত্তিটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। তাঁরা Anatomy র গোড়ার কথা proportion, মাপ বা প্রমাণটি ঠিক বজায় রেখে খুঁটিনাটি পেশী-সংস্থানের বাহার না দেখিয়ে সহজ রেখার ছন্দ-গতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন একটি সিংহের মত বীর্য্য ও নিষ্পন্দনিষ্কম্প দীপের শিখাটির মত স্থির গৌতমের সৌম্য-মূর্ত্তি। কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে এই বুদ্ধের মূর্ত্তিতে যে পেশী-সংস্থানের ভুল হয়েছে সেটিকে সংশোধন ক'রে যদি একটি নতুন বুদ্ধ গড়া যায় তাহ'লে সেটি কেন সুন্দর হবে না? তার উত্তরে আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ কারু ও চারু-শিল্প বিদ্যালয়ের কারিকরদের মাটিতে একটি সারনাথের আবিষ্কৃত বুদ্ধমূর্ত্তির নকল করতে দেওয়া হয়। এই সব কারিকরেরা পূর্ব্বতন ইংরাজ অধ্যক্ষের অধীনে বিলাতী ধরণে Anatomy শিক্ষা করেছেন। সুতরাং তাঁরা সারনাথের বুদ্ধটির photo র মধ্যে যে অমানুষিক বা অতি-মানুষিক পেশী-সংস্থানের অভাব বোধ করেছিলেন সেগুলি পূরণ ক'রে গ'ড়ে তুললেন।

যখন গড়া শেষ হ'ল তখন তাঁদের যখন জিজ্ঞাসা করা গেল যে আপনাদের গড়া নতুন মূর্ত্তিটি ভাল, না photoর প্রাচীন মূর্ত্তিটিই ভাল? তখন তাঁরা অধোবদন হ'য়ে রইলেন এবং পুনরায় ভেঙে যথাসম্ভব প্রাচীন মূর্ত্তিটির অনুরূপ একটি মূর্ত্তি গড়তে চেষ্টা করলেন। পাশ্চাত্যের শিল্প-কলার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলার উল্লিখিত প্রকারের তফাৎ দেখা যায়।

আধুনিক ভারতের শিল্পীরা ইউরোপীয় সভ্যতার এবং ইউরোপীয় শিল্পরসিকদের মাপকাঠিতে দেশের শিল্পের বিচার করায় দেশের শিল্পকে বুঝতে আমাদের এত বেগ পেতে হ'চ্ছে। বুদ্ধমূর্ত্তিটির পেশী-সংস্থান হুবহু ঠিক না হ'লেও যে প্রমাণ বা proportionএর ভিত্তির উপর মূর্ত্তিটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটির প্রতি কারুই লক্ষ্য নেই। আধুনিক শিল্পীরা যাঁরা দেশের আর্টের চর্চ্চা করেন তাঁরা এই সত্যটি একেবারে লক্ষ্য করেন না ব'লেই দেখা যায় যে তাঁদের কারো বা চিত্রে হাত-পাগুলি হাড়গোড়ভাঙা হ'য়ে পরিণত হ'চ্ছে—কারু বা লতানে scrollএর মত জড়িয়ে যাচ্ছে—কারু বা ধোঁয়াকালীতে ঢাকা একটা ফাঁকা ফানুসের মত উড়ে চলেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁদের ঘাড়ে একরকম বলা যায় হংসবাহনা ভর দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও তাঁদের কৃপাদৃষ্টিপাত করছেন। লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদের কথায় এক্ষেত্রে বেশ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংযত রেখা-সঞ্চালন-প্রচেষ্টা প্রাচীন ভারত-শিল্পের এক প্রধান প্রতীক। অজন্তার প্রাচীন চিত্রকলায়, সাঁচী, ভরহুৎ, অমরাবতীর প্রস্তরচিত্রের ভিতর এই রেখা-সংযম ও ঠিক প্রয়োজনমত ভাবব্যঞ্জনা অতি অবহেলায় শিল্পীরা যা' ক'রে গেছেন তা' এখনো পর্য্যন্ত কোনো দেশে কোনো শিল্পী করতে পারেন নি। তবে কোনো শিল্পকলার নকল হ'লেই সেটা নকলই থেকে যায়, তার আর প্রাণ বা গতিশীলতা থাকে না। তাই ভারতবর্ষে কোনো একটি ধরণের শিল্প একভাবে ধারাবাহিক চ'লে আসেনি এবং চলাটাও বোধ হয় বাঞ্ছনীয় নয়। ভাবব্যঞ্জনার আতিশয্য ভারত-শিল্পে দেখা যায় না। ঠিক যতখানি (expression) ভাব ফোটানোর প্রয়োজন শিল্পীরা বুঝেছেন ঠিক ততটাই ফুটিয়েছেন। দর্শকের কল্পনার উপর আস্থা তখনকার শিল্পীদের ছিল। এখনকার কলে-চলা-বলা ছবির ছলনা তখন ত ছিল না?—তাই তখন শিল্পীর গড়া ছবিটির ভিতর প্রবেশ করবার শিক্ষা সহজ ছিল। এখন আর খোকা-খুকুদের মুড়কীপুতুলের কদর নেই—এখন তারা বিলাতী জ্যান্ত-শিশুর মত দেখতে খেলনা দেখে দেখে সেই মুড়কীপুতুলের ভিতর স্নেহময়তার খোঁজ আর পায় না।

সে আজ বহুদিনের কথা, ছবি মূক, ছবি স্থির, কবিতা আর গান অনন্তকে ছোঁয়—এই কথা নিয়ে এই লেখকের সঙ্গে জগৎপূজ্য কবির একদিন গবেষণা হয়েছিল। কবির কাছে ছবির সত্তা তখন কাব্য ও গানের নীচু-স্তরে; তখন তিনি এই লেখককে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে গানের রেশ মনের ভিতর গানটি গাওয়া শেষ হ'লেও মিলিয়ে যায় না—স্পন্দিত হ'তে থাকে। কবির কাব্যও তাঁর ছন্দবদ্ধ ও ভাষাকে ছাড়িয়ে চলে; কিন্তু ছবি দাঁড়িয়ে আছে একভাবে—নড়েও না চড়েও না। কিন্তু আজ বড়ই আনন্দের বিষয়, কবি কাব্যেরও উপর চিত্রকলাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করচেন এবং এই ৭০ বৎসর বয়সেও তাঁর জীবনকে রঙাতে পেরেচে এই ছবি আঁকার শক্তিতে। লেখকের মনে আছে লেখক তাঁকে লেখকের একটি সরলরেখায় (straight line) আঁকা কবির একটি প্রতিমূর্ত্তিতে নাম-সই করতে বলেন। কবি আশ্চর্য্য ছন্দ মিলিয়ে সেই সরলরেখায় আঁকা প্রতিমূর্ত্তিটির অনুরূপভাবে তাঁর নিজের নামটি লিখে দিলেন। সকলে সেটি দেখে ভাবলেন যে সেটি বুঝি লেখক নিজেই লিখেছেন। এত রেখা-ছন্দ জ্ঞান যে তাঁর আছে তার পরিচয় লেখক তার পূর্ব্বেই পেয়েছেন যখন তাঁর নিকট ব'সে ব'সে ছবি আঁকতেন। কবি লেখকের রেখাঙ্কনের উপর এত বেশী জোর দিতেন যে কখন কখন আমায় রঙ করতে ইচ্ছা হ'লেও তাঁর অনুরোধে রঙ দেওয়া হ'ত না। তিনি নিজের কাছে লেখকের রেখাঙ্কন-চিত্রগুলি অনেক সময় রাখতেন এবং বয়সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করতেন। ছন্দ-সরস্বতীর যিনি বরপুত্র তাঁর কাছে চিত্র-কলার রেখা-ছন্দ যে সহজবোধ্য ও অনায়াসলভ্য হবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

রেখার অপব্যয় না ক'রে রেখাঙ্কন করার অভ্যাসটায় করা যে কত বড় কথা তার পরিচয় প্রাচীন ভারতের ছবি-

গুলি, অশোক-প্রতিষ্ঠিত পাথরের রেলিং প্রভৃতিতে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে কোনো কোনো ইউরোপীয় শিল্পীরা অসভ্য primitive ব'লে থাকেন এবং আমরাও তাই সেগুলিকে কৃপার চক্ষে দেখতে থাকি। আসলে এই অতি-প্রাচীন ভারত-শিল্পেরই ছিটেফোঁটা যদি আজ কোনো দেশের শিল্পীর বোধগম্য হ'ত এবং তিনি যদি সেইমত আপনার পথ কেটে নিতে পারতেন, তাহ'লে আজ আবার বুদ্ধের মত প্রতিমূর্ত্তি, নটরাজের মত মূর্ত্তি নতুন ক'রে গড়তে দেখতে পাওয়া যেতো। নটরাজের মূর্ত্তির ভিতর অতি-প্রাচীন যুগের সেই সহজ সরল রেখা-ছন্দের যা গতি দেখতে পাওয়া যায়, তা' যে-কোনো দেশের যে-কোনো কালের শিল্পী ও রসিককে অভিভূত করবেই করবে। তাই আজ য়োরোপ আমেরিকার দেশের বিখ্যাত শিল্পী হ'য়েও তারে র এই ভারতী বা' নটরাজের ভিতর দিয়ে শিল্পী কত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচার ক'রে গেছেন তার রসাস্বাদ ক'রে মুগ্ধ জ্ঞান করেছেন। এ বিষয় তাঁর ফরাসী ভাষায় লেখা প্রবন্ধ পাঠে বেশ জানা যায়। তিনি এই মূর্ত্তিটির রেখা-ছন্দ ধরবার জন্যে কখনো একটিকে তীব্র আলোকে, কখনো ছায়ায়, কখনো মোমবাতি জেলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছিলেন এবং তাঁর সুললিত ভাষায় সেই সব ভাব প্রকাশ ক'রে গেছেন। মূর্ত্তিটির প্রতি-অঙ্গ যেন তাঁর কাছে কথা কয়েছে ব'লে মনে হয়। ভাবব্যঞ্জনার আতিশয্য এর কিন্তু কারণ নয়। মূর্ত্তিটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা দেখেছেন যে শিব জটা-জুট এলিয়ে তাণ্ডব-নৃত্যে রত। শারীরিক খুঁটিনাটি গঠনের ভিতর কোনো চাকল্য নেই, অথচ সমগ্র ভঙ্গী ও মাপটির ভিতর এমন একটি গতি ফুটে আছে যে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করলে মানুষের মনকে যে কোথায় নিয়ে যায় তা' বলা যায় না। এতে তানা লাগিয়ে মানুষ-পরীর ওড়ার মত—বিকট-ভাবে গতিচাঞ্চল্য দেখানো হয় নি—এতে সংযত রেখা-সঞ্চালনের ফলেই মূর্ত্তিটি এত মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে।

রেখা অর্থে এখানে সব বস্তুর এবং চিত্রের ভিতর যে সীমারেখা আছে সেটা রঙেরই হোক বা কোন বস্তুরই হোক তাকেই আমরা রেখা বলছি। তার সুসংযত প্রয়োগই হ'ল রেখা-ছন্দ। ছবি বা মূর্ত্তি গড়তে গেলেই তার ভিতর এই রেখা-সংস্থান আপনা থেকেই আসবে। এখন এই রেখার ভিতর কতটা প্রয়োজন এবং কতটা অপ্রয়োজনীয় বিচার করার শক্তিই শিল্পীর শক্তি। ছোট ছোট শিশুরা নানাপ্রকার ছবি আঁকে, এমন কি কোনো কোনো শিশু বেশ রাশটি ছবি আঁকে; কিন্তু তাদের সেই রেখার ছন্দ-বিচার থাকে না ব'লেই সেগুলিকে আর্টের কোঠায় ফেলা হয় না। অবশ্য এক হিসাবে কোঁদার কথায় ধরতে গেলে আর্ট জন্মায় নিজের নিজের কাজের ভিতর আনন্দ পেলেই, এবং এই শিশুরা ও আনন্দের আবেগে নিজের খেয়ালেই বেশীর ভাগ ছবি আঁকে। কিন্তু এই খেয়ালের মধ্যেও শিক্ষা, সংযম ও বিচারশক্তির পরিচয় লাভ করতে পারা যায় শিল্পীদের তুলির আঁচড়ের ভিতর। Van Gogh বা Gauguinএর আঁকা ছবি দেখলে মনে হবে, কেন, আমাদের অবনীর আঁকা ছবিও ত বেশ ভাল? কিন্তু এখানে রেখা-ছন্দের বিচারে এবং ভাবসংযমের কোঠায় একটি হ'ল শিল্প অপরটি হ'ল খেলা। তবে বড় শিল্পীরা খেলার ছলেই বড় বড় কাজ জগতে রেখে গেছেন। প্রাচীন ভারতের মূর্ত্তি বা ছবিগুলি দেখলে মনে হয় না যে সেগুলি খুব পরিশ্রম ক'রে তৈরী করেছেন শিল্পীরা। মনে হয় যেন অতি অবহেলায় সেগুলি রচনা করা। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবটিকে আনা সকল সময় সকল শিল্পীর দ্বারা হয় না। এক সাধনার ফলে এবং সংযমের গুণে আমাদের দেশের ঋষি-শিল্পীরা যে অতিমানুষিক পরিকল্পনা-শক্তি লাভ করেছিলেন, তা' তাঁদের গড়া মূর্ত্তি ও চিত্র আজও ভারতের নানান স্থানে যা' ছড়ানো আছে তা' থেকে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। আমরা এই প্রবন্ধটিকে একটি তালিকায় পরিণত করতে চাই না নতুবা দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বিশ্বর প্রস্তরমূর্ত্তির পরিচয় পাঠকপাঠিকাদের দিতে পারতুম। খাজুরাহো, কোণার্ক এই দুটি প্রাচীন মন্দিরের খোদাই কাজের ভিতর যে কাজের আনন্দ আছে তা' তার খোদিত চিত্রের বিষয়গুলিকে ছাড়িয়ে গেছে। খোদিত চিত্রের বিষয়গুলি সাধারণতঃ অতি কদর্য্য কিন্তু শিল্পকলার দিক থেকে মূর্ত্তিগঠনের রেখা-ছন্দ এত গতিশীল এত সহজ-সরল যে মনে হয় ভারতের এই সব শিল্পীরা শিল্পকলার এক সীমাস্থানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তা' ছাড়া ভারহুতের রেলিং এর মধ্যে কমলের ভিতর লক্ষ্মী ও যেরুতার মূর্ত্তিগুলি

কি সহজ ও সরল রেখাভঙ্গীতে গঠিত যে মনে হয় ইউরোপের অতি-আধুনিক শিল্পী এপ্‌স্টাইন আর এর চেয়ে কত নূতন তথ্য এই বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কার করতে পারবেন?

আমাদের বিশ্বাস, এই সকল প্রাচীন শিল্পীর পূর্বপুরুষ ৫০০ বৎসরেরও পূর্বে তাঁদের অতি-প্রাচীনতম শিল্পীদের নিকট এই রেখাছন্দের শিক্ষালাভ করেছিলেন, নতুবা সহসা এমন শিল্পজ্ঞান কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কখনো তাঁরা সহসা অর্জন করতে পারেন নি। দেখা যায় যে রেলিংগুলির গঠন প্রভৃতিতে তাঁরা অতি-প্রাচীন কাঠের তৈরী রেলিংয়ের ভাব বজায় রেখেছিলেন। সুতরাং কাঠের তৈরী বাড়ী যে খুব প্রাচীন যুগে ভারতে চলিত ছিল সেই যুগেই তার পরবর্তী যুগের প্রচলিত শিল্পকলারও প্রারম্ভ হয়েছিল। ভারতের নানান স্থানে মাটির ভিতর অনাবিষ্কৃত তথ্য অনেক নিহিত আছে; দেকথা প্রত্নতত্ত্ববিদেরা স্পষ্টই ব'লে থাকেন। তবে পাটলিপুত্রের আবিষ্কৃত শতস্তম্ভের প্রাসাদ, অনুরাধাপুরের প্রাচীন সহরের ভগ্নাবশেষের স্তূপের ভিতর যা' প্রাচীন ভারতের শিল্পকে আমরা আজ নানাস্থানে ছড়ানো দেখতে পাই তা' থেকে মনে হয় ভারতের সভ্যতা এবং ভারতের শিল্প খুবই বোনেদি এবং তার চিহ্নও স্তরে স্তরে নিম্নে গ'ড়ে উঠেছে, নতুবা এমন চারুকলার চিহ্ন সহসা যে দেশের মধ্যে গজিয়ে উঠেছিল তা' সহজে কেউ বিশ্বাস করবেন না। খ্রীষ্টিয়ে পাদ্রীদের মত ধর্মপ্রচারের সঙ্গেই দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই ভারতের শিল্পকলার প্রতিষ্ঠা, তাও আমাদের মনে হয় না। শিল্পীর কলম তখনই চলে যখন তার প্রতিভাকারের ইচ্ছা জাগ্রত হয়—আনন্দে লেগে যায় তুলি-কলম নিয়ে রচনায়।

অনেকে অজন্তা প্রভৃতি প্রাচীন চিত্র ও ভাস্কর্য্যকলার বিরাট ব্যাপার দেখে মনে করেন যে সেগুলি রাজাদেশে এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে তৈরী হয়েছে। আমাদের মনে হয়, প্রচুর অর্থব্যয়ে তাজমহল তৈরী সম্ভব হ'তে পারে বটে কিন্তু এরূপ চিত্র বা ভাস্কর্য্যকলার বিরাট অভিব্যক্তি কেবল পেটের জ্বালা মেটানোর দ্বারা কখনো সম্ভব হয় নি। শিল্পীদের পেটের জ্বরে মনের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় রাজারা করেছিলেন এত বড় স্থায়িত্বের ভার তাদের হাতে সঁপে দিয়ে। দেখা যায় পেট ভরা থাকলে হাত বেশী চলে না। অবশ্য দরিদ্রতাও একটি ব্যাধিবিশেষ। যাই হোক, এই অতি-প্রাচীন ভারতের কাছে আধুনিক ভারতের যে কত শেখবার আছে তার পরিমাণ করা সহজ নয়। তবে একথা ঠিক যে জাতীয় ঐতিহ্যের উপর যদি শিল্প না দাঁড়ায় তাহ'লে সেটা একটা Futurist, Cubist, Ultra-modernist এমনি ধারা কিছু হ'তে পারে বটে কিন্তু ভারতবর্ষের আর্টের কোঠায় তার স্থান যে কি তা' ভবিষ্যতের শিল্পরসিকদের হাতেই থাকুক।

জাতীয় ঐতিহ্যের উপর সব দেশের সব শিল্পই দাঁড়িয়ে আছে। এ বিষয় জাপানের শিল্পকলাকে যিনি বিদেশী শিল্পের চৌরাচ থেকে বাঁচিয়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন সেই স্বনামধন্য শিল্প-রসিক কাউণ্ট ওকাকুরার তিনটি কথায় আমরা আরো তিনটি ভাষা যোজনা ক'রে তার সারমর্ম এই নিম্ন-অঙ্কিত ছকটিতে ছ'কে দিলুম। সমকোণী

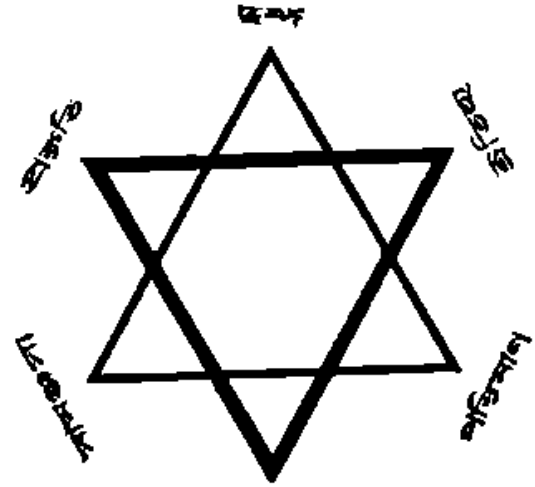

ত্রিভুজটির শীর্ষভাগে "জাতীয় ঐতিহ্য" (tradition), দক্ষিণে "প্রকৃতি" (Nature), বাম কোণে "পরিকল্পনা" বা "মৌলিকতা" (originality) এই তিনটি ওকাকুরা আমাদের বিশেষভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমরা এগুলির পুরো পরিচয়-লাভের জন্যে একটি সমকোণী ত্রিভুজ বিপরীত দিকে এঁকে তার দক্ষিণ কোণে "ছন্দ" (Rhythm), বাম কোণে "ওজন" বা "সামঞ্জস্য" (balance) ও নীচের কোণে "প্রমাণ, পরিমাণ বা মাপ" (proportion) যোজনা ক'রে দিয়েছি। এগুলি হ'ল

ওকাকুরা-বর্ণিত বিষয়গুলির প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা স্থানান্তরে করবার ইচ্ছা রইল।

এটি থেকে বোঝা যাবে দেশের শিল্পকলাকে জানতে বা বুঝতে হ'লে তার প্রাচীনতম শিল্পকে বুঝতে ও জানতে হবে; এবং তার সঙ্গে নিজের বুদ্ধি ও প্রকৃতির কিভাবকার রহস্যের সন্ধান করতে হবে। যে সাধনা নিয়ে অতি-আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীরা আজ অগ্রসর হচ্ছেন, আমাদের দেশের অতি-প্রাচীন যুগে সে সাধনার সমাধান ক'রে গেছেন সে যুগের ঋষি-শিল্পীরা। তাই আমরা আফ্রিকার কাফ্রীদের মত স্বধর্ম ছেড়ে অপরের ধর্মে কেন যোগ দেব? আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের অভাব যদি হ'ত —যদি ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়াখণ্ডকে শিল্পকলার অনুপ্রেরণা না যোগাতে পারতো তাহ'লে আজ আমরা লাল বেলনা-কোলুপ শিশুর মত দেশমাতার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বিদেশীর শিল্পকে তৎক্ষণাৎ বরণ ক'রে নিতুম। অতি সূক্ষ্ম রসবোধের দ্বারা দেশের প্রাচীন ভাবের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমরা নিজেদের যখন আত্ম-অবিশ্বাস ঘোচাতে পারব, তখন দেখবো—এই সকল প্রাচীন পাথরের ভাঙা স্তূপের মধ্যেও শিল্পের কত শত মণি ছড়ানো আছে—তখন আমরা বুঝবো যে দেশের শিল্পের জন্য বিদেশের পুঁজি ছাতড়াবার কোনোই প্রয়োজন নেই।

আমাদের দেশের তথাকথিত রুচিবাগীশেরা অনেকে প্রাচীন চিত্র ও ভাস্কর্যের অর্দ্ধনগ্নতা দেখে প্রায় মূর্চ্ছিত হন। এদিকে ইউরোপের শিল্পকলার প্রচণ্ড নগ্নতা এবং আধুনিক ইউরোপীয় মহিলাদের অর্দ্ধনগ্ন স্কার্ট পরাটা তাঁদের চক্ষে বেশ সহজেই স'য়ে গেল। রুচির সৃষ্টি যুগ-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে। আধুনিক যুগ ইউরোপীয় সভ্যতার যুগ। তাই আমাদের রুচি ইউরোপীয়-ঘেঁষা হ'য়ে পড়েছে; যদিও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। আমাদের দেশের বেশভূষার, আকার-প্রকারের পরিচ্ছদ এখন আর সেই প্রাচীন যুগের পরিচ্ছদের সঙ্গে খাপ খায় না। আমরা এখন বুঝতে পারি না কেন প্রাচীন যুগে মহিলার মূর্ত্তিতে সামাজিক ভাব-ভঙ্গীর একটা যেন বাড়াবাড়ি দেখা যায়। আমরা যদি লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব যে আধুনিক সহরে সভ্য ও শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে সেরূপ ভাবে দাঁড়ানো বা বসার ভঙ্গী বড় নেই কিন্তু সাধারণের ঘরে তা এখনো বিরল নয়। মুসলমানী আমোদে যাঁরা সাদা রাখা রুচিবিরুদ্ধ ছিল—তাম্বুল বা মিসি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এখনকার যুগে তা মনে হ'লেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মুসলমানী যুগে নাকে বেসর পরার রীতি ছিল। এখন কি কেউ সাধ ক'রে তা পরবেন? তেমনি ঐ সব প্রাচীন যুগের চিত্র ও ভাস্কর্য্য বুঝতে গেলে সে যুগের পরিচ্ছদ-অপরিচ্ছদের বিচার ক'রে তবে সেগুলিকে পরীক্ষা করা ভাল। প্রাচীন গ্রন্থ তার সহায়তা করতে পারে।

তবে এসব গেল বাইরের কথা। কিন্তু আসল কথা হ'ল এই যে প্রাচীন শিল্পের রেখা-ছন্দের সংযম এবং ভাব-ব্যঞ্জনার গাম্ভীর্য্য বোঝবার ও ভাববার বিষয়। ইউরোপ আমাদের বোঝাবে তার সাধনার দ্বারা সেই আশায় ব'সে না থেকে নিজেদের সাধনা করতে হবে এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। আনন্দের উৎস যেখানে সেখানে পুনরায় যা দিতে হবে তাহ'লে সেই প্রাচীন শিল্পের ছন্দ কথা আমাদের কাছে সোনার জীবনকাঠি-ছোঁয়া রাজকন্যার মতই জীবন্ত হ'য়ে উঠ্‌বে।

রামমোহনের ঋণ

শ্রী শান্তা দেবী বি-এ

গৃহই নারীর সাম্রাজ্য একথা আমাদের দেশে নূতন নয়। গৃহিণীই গৃহ অর্থাৎ গৃহের প্রাণস্বরূপ। মাতা কন্যা ভগিনী ও সহধর্ম্মিণীরূপে নারীর কর্ত্তব্য অধিকার ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের দেশে এতকাল ধরিয়া এত কথা বলা হইয়াছে যে কিছুদিন মানুষ সে বিষয়ে নীরব থাকিলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না।

কিন্তু গৃহের বাহিরে সমাজের কর্ম্মক্ষেত্রেও যে নারীর একটা স্থান আছে, সেখানেও যে তাহার কর্ত্তব্য ও অধিকারের কথা উঠিতে পারে একথা আমরা বহুদিন ভুলিয়া ছিলাম। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজই নূতন করিয়া সমাজের বহির্জগতে নারীর অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠাকে স্বীকার করেন ও তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে মানিয়া লন। সুতরাং রাজর্ষি রামমোহন রায়ের যুগ হইতে নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের পথের বিপুল বাধাগুলি দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে কায়মনপ্রাণে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সামাজিক দিক দিয়া দেখিলে ইহাই ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, তাহার অমর কল্যাণ-চেষ্টা। আমরা আজ ভারতবর্ষের নারীজাতিকে যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি তাহা পাশ্চাত্য জগতের নারীর স্থান অপেক্ষা বহু নিম্নে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন ভাবি ইহা কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের মুষ্টিমেয় কর্ম্মীর একশত বৎসরের চেষ্টার ফল তখন বিস্মিত হইয়া যাই ইহার আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রগতি দেখিয়া। সংখ্যার হিসাব করিয়া বিচার করিলে আমাদের মেয়েরা পাশ্চাত্যের মেয়েদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন বুঝিতে পারি, কিন্তু অধিকারের সীমারেখা ধরিয়া বিচার করিলে দেখি আমাদের মেয়েরা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নাই। এদেশের মেয়ের পক্ষে বহির্জগতের সকল জ্ঞান ও কলা-চর্চ্চায়, কর্ম্মক্ষেত্রে ও কল্যাণ-চেষ্টায় যোগ দেওয়া আজ সম্ভব এবং তাহাতে অশিক্ষিত জনসাধারণের চক্ষেও তিনি পতিত হন না ইহা বিস্ময় ও আনন্দের বিষয়। অবশ্য এমন মেয়ের সংখ্যা দেশে অতি সামান্য। ব্রাহ্মসমাজ যে দেশের মনোভাবকে স্ত্রীজাতির পক্ষে অনুকূল করিতে পারিয়াছেন এইটুকু দেখাইবার জন্যই শুধু একথা বলিলাম। স্ত্রীজাতির স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার কার্য্যে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি এমন অনেকে অক্লান্ত নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত নহেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবেই যে তাঁহাদের জাগরণ একথা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রী শান্তা দেবী বি-এ

থাক্ সে কথা। আমরা কি অধিকার পাইয়াছি দেখিতে গেলেই ভাবিতে হইবে সে অধিকারের মূল্যস্বরূপ আমরা কি দিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ লোকচক্ষে আমাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতে নারীজাতির ঋণের বোঝা বাড়িয়াছে। এই যে আমরা স্বচ্ছন্দে এতজন মিলিয়া আমাদের আত্মহিত-চেষ্টায় এই মিলনমঞ্চে মিলিতে পারিয়াছি ইহা কি ভারত-

নারীর পক্ষে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল না? পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও এতটা সহজে এত অনায়াসে আমরা যে-কোনো কার্য্যক্ষেত্রে যোগ দিতে ও সহানুভূতি দেখাইতে পারিতাম না। এই সুযোগলাভের জন্য আমরা কাহার কাছে ঋণী এবং কি উপায়ে আমরা সে ঋণ শোধ করিতে পারি তাহা আজ ভাবিয়া দেখা দরকার। দেখিতেছি আমাদের বর্ণজ্ঞান, আমাদের বিদ্যালাভ, আমাদের স্বাধীন চিন্তা, আমাদের যৌবনবিবাহ, এমন কি আমাদের সূর্য্যালোকে স্বচ্ছন্দ-বিহার পর্য্যন্তের জন্যও আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের নিকট ঋণী। মনুষ্যত্বের এই পূর্ণঅধিকার লাভে আমাদের সহায় হইয়া ব্রাহ্মগণ ও আমাদের যে ঋণপাশে বদ্ধ করিয়াছেন, সে ঋণ হইতে আমরা মুক্ত হইব সকল অধিকার আপনার হাতে অর্জ্জন করিতে শিখিয়া এবং সকল স্বদেশবাসিনীকে তাহা শিখাইয়া।

মেয়েদের এই জাগরণের জন্য এই প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যে সকল মহাপ্রাণ মানব আপনাদের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের হাতে-গড়া বাংলার মেয়েরা যদি তাঁহাদের সেই সেবাব্রতকে শতমুখে প্রবাহিত করিতে না পারেন তবে প্রকৃতির বিধি জগজ্জননীর বিধি লঙ্ঘিত হইবে। মাতা সন্তানকে আপনার প্রাণ দিয়া, আপনার দেহের শোণিতকণা ও স্তনের স্নেহামৃত ধারা দিয়া গড়িয়া তোলেন, সন্তান একদিন সে ঋণ শুধিবে বলিয়া। সৃষ্টি-ধারায় এক মাতার বহু সন্তান তাহাদের বহুতর সন্তান-পালন ও রক্ষণের ভিতর দিয়া বংশপরম্পরায় এই ঋণ শোধ দিয়া চলে। এক বৃক্ষ শত ফুল-ফলে প্রাণ সঞ্চারিত করে, সে ফুল-ফল আবার সহস্র বৃক্ষের সৃষ্টি করে, এমনি করিয়াই ত সৃষ্টির সকল রূপ বিকশিত হইয়াছে। আমাদের মেয়েদের নূতন প্রাণের সঞ্চার যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের ঋণও আমাদের এমনি করিয়া শোধ দিতে হইবে। প্রাণধারারই পাওনার সঙ্গে দেনা আছে সেকথা ভুলিলে চলিবে না; অধিকারমাত্রেরই দায়িত্ব আছে সেকথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে।

কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার কথা হইলেই মানুষ—বিশেষ করিয়া মেয়েরা—শক্তি ও সামর্থ্যের সীমার দোহাই দেয়। গৃহের কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া বাহিরের কাজে যোগ দিতে তাহাদের সময় ফুরায় না; গৃহের কর্ত্তব্য ফেলিয়া বাহিরে যাওয়া শোভন হয় না। কিন্তু বাস্তবিক দেখা গিয়াছে যে, যে-মানুষ শক্তি ও সময়ের যত অসদ্ব্যয় অথবা অপব্যবহার করে তাহারই তত কার্পণ্য বেশী। জগতে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকল কর্ম্মীকেই প্রায় ঘর ও বাহিরের অসংখ্য কাজে শক্তি ও সময় যোগাইতে দেখা যায়। নিষ্কর্ম্মারই সময় সকলের চেয়ে কম। যে মানুষ কাজ করিতে চায় সে তাহার জীবনের প্রত্যেকটি ঘণ্টা ও মিনিটের হিসাব রাখে; যাহার মনের গোপন কোণে অনিচ্ছার একটুখানি ফুটা আছে তাহার সেই ছিদ্র দিয়া শক্তি ও সময় কেমন করিয়া যে নিঃশব্দে আপনি বহিয়া যায় সে নিজেও টের পায় না। কর্ম্মস্পৃহাই হইতেছে মানুষের প্রকৃত জীবন-কাঠি। কর্ম্ম-স্পৃহ মানুষকে তাহার সমগ্র জীবনের ছবি পূর্ব্ব হইতেই আঁকিয়া দেয়। যাহার কর্ম্মস্পৃহা অল্পস্বল্প তাহার জীবনে সময়ও অফুরন্ত পাইবার ইচ্ছা থাকে। কিন্তু কে না জানে যে মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ, অতি অল্পদিনেই তাহার সীমা আসিয়া পড়ে? তাই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ভবিষ্যৎকে যতখানি বাড়াইয়া দেওয়া চলে মানুষের কর্ম্মস্পৃহা তাহার জীবনী-শক্তিকে ততখানি বাড়াইয়া দিবার জন্য অনুক্ষণ তাগিদ দিতে থাকে এবং সেই সমগ্র ভবিষ্যৎটি বিচিত্র কর্ম্মের রূপে উজ্জ্বল করিয়া তুলে। কর্ম্মের প্রেরণা জীবনে অবসাদ ও নিরাশাকে আসিবার অবসর দেয় না, বরং নূতন হইতে নূতনতর কর্ম্মের সন্ধানে মানুষকে ছুটায়।

এদেশের মেয়েদের মনে সেই কাজের প্রেরণা জাগাইতে হইবে যাহাতে তাহারা তাহাদের এই সীমাবদ্ধ জীবনের সমস্ত অবসরটুকু সফল করিয়া আপনাদের কর্ম্মযজ্ঞে আহুতি দিতে পারে। এই যজ্ঞেই আমাদের ঋণ শোধ হইবে। পিতা-মাতার নিকট প্রাণরসের যে অনন্ত ঋণ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, সৃষ্টিধারার সন্তানাদির ভিতর দিয়া তাহা যেমন আমাদিগকে শোধ করিতে হইবে তেমনি পিতৃপ্রতিম এই ঋষির নিকট মুক্তির ও নবজন্মের যে ঋণ লইয়াছি তাহাও ভবিষ্যৎ বংশকে দিয়াই আমাদের শোধ করিতে হইবে। ঋণ যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে শোধ করিবার তাগিদ আপনা হইতেই আসিবে। আমরা যে-সকল অধিকার পাইয়াছি, যে-যে পথে আমাদের মুক্তি দেখা দিয়াছে, সেই

সকল অধিকার এবং সেই সব মুক্তির পথ যদি আমাদের পূর্ণশক্তিকে পূর্ণতা না দিয়া থাকে এবং নবশক্তির উন্মেষ আমাদের মধ্যে না করিয়া থাকে তবে আমাদের অধিকার ও মুক্তি ত বৃথাই। আমাদের পঙ্গুতা ঘুচাইবার জন্যই ত সেই মহাঋষি এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দ সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সে পঙ্গুতা যদি ঘুচিয়া থাকে তবে আমাদের শক্তির পরিচয় দিতেই হইবে। শক্তিকে অপচয় করিয়া সেচ্ছার্জ্জিত পঙ্গুতা আনয়ন করিয়া আমরা লজ্জা ও ঋণের বোঝা বাড়াইতে নিশ্চয় চাই না।

যে মহাপুরুষের নিকট আমরা মুক্তির দীক্ষা লইয়াছি তাঁহার ঋণ আমাদের শোধ করিতে হইবে জগতে মহামানবী ও মহানারী সৃষ্টি করিয়া। পুরুষের পিছনে নারী ছায়ামাত্র নহেন এই কথাই ত সে মহাপুরুষ নারীদের বলিয়াছিলেন। আমরাও যে অমৃতের সন্তান ইহাই তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সেই অবমাননাও করিতে হইলে সে মহাপুরুষের যোগ্য-শিষ্যা মহানারীর প্রয়োজন। আজিকার ক্ষুদ্র নারীদেরই ক্ষুদ্র হাতে সে মহানারীবৃন্দ গড়িয়া উঠিবে। এই কথা মনে রাখিয়া নারীমাত্রের মধ্যেই যে মহত্বের সম্ভাবনা সুপ্ত আছে তাহাকে জাগাইবার সাধনা পরম শ্রদ্ধাভরে আমাদিগকে করিতে হইবে। এ সাধনা পতিতোদ্ধারের সাধনার মত দয়া কি অনুকম্পা লইয়া করিলে চলিবে না। নারীশক্তি, নারীর মনুষ্যত্ব ও নারীর ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই হইবে ইহার মূলসূত্র। *

কল্পনা ও বাস্তব

শ্রী প্রণব রায়

কম করপুটে নীলা-কুবলয়, নব কুরবক কবরী-কোণে,
লোধ্র-কুসুম-পাণ্ডু পরাগ রুচিরাননে,
বরতনুবিভা উষসীর সমা,
আঁখিতে উষর-তারার সুষমা,—
তোমারে তো আমি হেরিতে চাহি না মরত-অতীত মধুরূপে,
স্বপনে তোমায় আরতি করি না কল্প-ধূপে।

তব পথ চাহি' প্রহর গণি না পাখক-বিরল শিপ্রা-তটে,
চন্দ্র-তিলক আঁকা ধবে দূর বনানী-পটে,
বিবশ বায়ের মন্থর গোধায়
বন-জ্যোৎস্নায় তনু শিহরায়,
মধুবনস্ত উঠায় যখন পরাগ-সুরভি উত্তরীয়,
নহে সে লগনে—তখন আমারে দেখা না দিও।

এ যে হায় আজি নিদয় নিদাঘ,—তপন-তাপিত প্রখর বেলা,
বন-সন্তাপে ম্রিয়মান হ'ল যাদবী মেলা।
ধূত কুলদল পথ-ধূলি'পরে
হয়রৌদ্রের অভিশাপে ঝরে,
দেখা এসো তুমি—অলকায় নহে—এ মোর মাটির ঘর গেহে,
দু'চোখ ভরিয়া মরণের মতো শীতল স্নেহে!

নাই বা রহিল দুল-কঙ্কণ, ক্ষীণ শ্রোণী তটে মেখলা বাঁকা,
ছিন্ন আঁচলে থাকুক ধূলার চিহ্ন আঁকা।
আঁখি-কূলে যদি না-থাকে কাজল,
থাক্ তবে সেথা শুষ্কাশ্রুজল,
নামুক ঘেরিয়া স্নেহের তোমার মসিনকান্তি শ্যামল কায়া
নব-আষাঢ়ের নিশীথ-নিবিড় কৃষ্ণ মায়া!

ঘুচি যাক' আর কল্পনালোকে অপরূপ-রূপা ত্রিলোত্তমা,
চাহি শুধু তোরে রূপহীনা অয়ি ভুবন-রমা!
নহে নক্তশোভা দূর নীহারিকা,
তুমি হ'য়ো মোর গৃহদীপশিখা,
নহেক' মানসী—মানবী হইয়া বাড়ায়ো কক্ষ কয়টি তব,—
সৃজন করিব ধূলায় ধরার অলকা নব।

---

* রামমোহন গ্রন্থাবলীর অন্ত লিখিত।

বরণডালা

শ্রী আশীষ গুপ্ত

প্রফুল্লকুমার কলিকাতায় কোন মেসে থাকিয়া লেখাপড়া করে। পিতা জমিদারী ষ্টেটের ম্যানেজার। সেদিন তাঁহারই কাছ হইতে পত্র আসিয়াছিল।—

স্নেহাস্পদেষু,

পরমশুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনমিদং। পরে বাবাজী তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী৺স্থানে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি। তোমার লেখাপড়া সম্ভবতঃ উত্তম প্রকারেই প্রস্তুত করিতেছ। শ্রীশ্রী৺পূজা সমাগতপ্রায়। তোমার অবকাশের আর কত বিলম্ব আছে? অবকাশ হওয়ামাত্র কালক্ষেপ না করিয়া দেশাভিমুখে রওয়ানা হইলে, আনন্দলাভ করিবে। তোমার জ্ঞাত কারণ জানাইতেছি, মনিবের কার্য্যোপলক্ষে বরণপাহীতে গমন করিয়া এক অত্যন্ত দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার লাভ করি। কন্যাকে সৎপাত্রস্থা না করিতে পারায় ব্রাহ্মণের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, অবশেষে তিনি আমার হাতে পায়ে ধরিয়া পড়িলেন।

তোমরা সকলেই বড় হইয়াছ, এখন তোমাদিগকে রাখিয়া এ পৃথিবী হইতে যাইতে পারি, ইহাই মঙ্গলময় ভগবচ্চরণে অহর্নিশ প্রার্থনা। কিন্তু সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিতে চাহিলেই যদি তাহা পারা যাইত, তাহা হইলে ত আর কোনও চিন্তাই ছিল না।

আজ পক্ষকাল গত হইল তোমার নূতন মা'কে লইয়া গৃহে ফিরিয়াছি।—নারায়ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ব্রাহ্মণকন্যা অত্যন্ত সুশীলা, এবং ব্যবহারের দ্বারা এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সকলের প্রশংসালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা আমার পক্ষে সান্ত্বনার কথা।

বাতব্যাধিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি, হস্তমূলের যন্ত্রণাও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নপঙ্‌ক্তির একটি দাঁতও আর অবশিষ্ট নাই, উপরের পঙ্‌ক্তিরও অনেকগুলা গিয়াছে। যে কয়টা আছে সেগুলা অত্যন্ত নড়িতেছে, কিন্তু সহজে যে পড়িবে এমতও বোধ করিতেছি না। আর অধিক দিন এই আধিব্যাধিপূর্ণ সংসারে বাস করিব না—ইহাই একমাত্র ভরসা।

আর একবার দারপরিগ্রহ করাতে তোমার বড়মাতা বিশেষ সন্তুষ্ট হয় নাই। সে বরাবরই একরোখা মানুষ, তাহার বুদ্ধিশুদ্ধিও বিশেষ আছে বলিয়া কোনদিন মনে করি নাই।

বিবাহে আমারও মত ছিল না, আমার গৃহধর্ম্ম ভগবানের অভিপ্রেত হইলে আর তিনি তিন-তিনবার এমন করিয়া চোখে আঙুল দিয়া তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেন না। কিন্তু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—সংসার আমার পক্ষে অরণ্যস্বরূপ, অসুখ হইলে কেই বা সেবা করে? বাতব্যাধিতে ত প্রায়ই উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া থাকি—এককৌটা জল গড়াইয়া দেয় কে? এই যে দন্তহীন মুখে কোন জিনিষ ভালো করিয়া চর্ব্বণ করিতে পারি না বলিয়া কিছু হজম হইতেছে না, এই যে দাঁতের অভাবে এত কষ্ট পাইতেছি, এ সকলেরই বা খবরদারী কে করে? মেয়েরা ত শ্বশুরবাড়ীতেই, তোমার কনিষ্ঠা যে দুইজন আছে, তাহারা ত নিজেদের খেলাধূলা, পড়াশুনা এবং ভাইপো, ভাইঝিদের লইয়া আদর করিতেই ব্যস্ত। নিজের ছেলেদের তদ্বির করিতেই ত বধূমাতাদের দিন কাটে।

তোমার বড়মাতা রাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, পুত্রকন্যা, নাতী-নাত্নী, পুত্রবধূরা, সকলে মিলিয়াও কি আমার শুশ্রূষা করিতে পারিত না?

ইহা রাগারাগির কথা নয়,—আমার শরীর দিন দিন খারাপ হইতেছে, অথচ তেমন সেবা হইতেছে কই? তবুও তোমার মাকে যদি সে কথা বুঝাইতে যাই, তবে সে অসন্তুষ্ট হয়। থাক, সকলই আমার অদৃষ্ট। তোমার টাকা কয়েকদিন পরে পাঠাইতেছি। বৌমাদের, ছেলে-

মেয়েদের, তোমার বড়দা-মেজদার, তোমার নূতন-মা প্রভৃতির জন্ত পূজার বাজার তোমাকেই করিয়া আনিতে হইবে, বস্ত্র ও ভক্ষ্যদ্রব্যের ফর্দ্দ এবং উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ পরে প্রেরণ করিব।

আমার শ্বশুরমহাশয় সেদিন এখানে আসিয়াছিলেন, —তোমার বড়দা তাঁহাকে দেখিয়া আমাকে বলিল, "আপনি বলিলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কিন্তু উনি ত আমার সমবয়সী হইবেন।" তোমার বড়দার ধারণা, সে নিজে বৃদ্ধ নয়, তাহার সমবয়সী লোকেরও বৃদ্ধ বলা চলে না। সে এইরূপ ভাব দেখায় যেন আমার শ্বশুরমহাশয়কে 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া আমি একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। তাহার কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা ইঙ্গিত সব সময়েই প্রচ্ছন্ন এবং পরিস্ফুট দেখি, আমার আয়ুষ্কাল আর বেশীদিন নয়, অতএব আমার মৃত্যুর বাঁধনে আর একটি বালিকার মৃত্যুকে বাঁধিয়া অন্তায় করিয়াছি। এরকম কথা আমার পক্ষে পীড়াদায়ক। আমার আয়ুর সঙ্গে তোমার বড়দা কেমন করিয়া টের পাইল, তাহা জানি না। আমার বয়স হইয়াছে বলিয়াই যে আমি পূর্ব্বে গত হইব, এবং তোমার নূতন-মা'র বয়স কম বলিয়াই যে তিনি আমার পরে মরিবেন, এ ধারণা মনে পোষণ করিয়া তোমার বড়দা নিয়তিকে উপহাস করিতে চায়। ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বের মায়েরা পরলোকগতা হইতেন না;—তাঁহারা বয়সে আমার অপেক্ষা ছোট ছিলেন, এবং তোমার দাদার যুক্তি-অনুসারে বাঁচা উচিত ছিল তাঁহাদের, যাওয়া উচিত ছিল আমার। অথচ আমিই বাঁচিয়া আছি;—কিন্তু এসব কথা লইয়া আলোচনা করিতে ক্লেশ অনুভব করি।

আর যদি বাস্তবিক তোমার নূতন-মা'র পূর্ব্বেই এখান হইতে যাইতে পারি, তোমাদের সকলকে রাখিয়া সেই দিব্যধামে যাইবার মতন সৌভাগ্য যদি সত্যই আমার হয়, সেই পরমবাঞ্ছিত দিবস যদি আগতপ্রায় হইয়াই থাকে, তাহা হইলে এমন আশা কি করিতে পারি না যে, তোমরা সকলে মিলিয়া তোমার নূতন-মা'র সামান্ত ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিবে?

তোমার বড়দা ত প্রায়ই আমার সম্ভাব্য মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে, কিন্তু সে নিজেও ত অমর হইয়া পৃথিবীতে আসে নাই। মরিব ত আমরা সকলেই একদিন, বারম্বার নানাপ্রকারে সে কথাটা বলিয়া লাভ কি? —জীবন-বীমার দালালেরা চিঠিচিত্তা দেখাইতে আসিয়া যখন বলে, "যখন, আপনি আপনার বীমার টাকার মাত্র এক কিস্তি দিয়াই যদি অকালী কবলে পড়েন, তাহা হইলে আপনার স্ত্রীপুত্রপরিজনেরা সম্পূর্ণ টাকা পাইবে,—" তখন তাহাদের শুভানুধ্যায়িতায় মন বড়ই পীড়িত হয়, তোমার দাদার চিন্তাকাঙ্ক্ষিতায় তাহার অপেক্ষা কোন অংশে কম হয় না।

আমাকে শীঘ্রই সদরে যাইতে হইবে,—শালপুরের চৌধুরি লইয়া রাধেদের সহিত বিবাদ বাধিয়াছে, আমি না গেলে তাহার মিটমাট অসম্ভব। তোমার প্রয়োজনীয় অর্থ সদর হইতেই প্রেরণ করিব।

আবার বিবাহ করিতে আমার মোটেই আপত্তি ছিল,— মাসখানেক পূর্ব্বেও যখন বড়বাবু আমার এসম্বন্ধে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে স্পষ্ট জানাইয়া বলিয়াছিলাম, "পুত্রকন্তাদিগের মধ্যে ত আর কেহ ছোট নাই যে তাহার লালনপালনের নিমিত্ত আবার বিবাহ করিতে হইবে,— তবে, নিজের সেবাশুশ্রূষার কথা, সে যখন অপর কেহ তৎসম্বন্ধে কোনও চিন্তাই করে না, তখন আর বার্দ্ধক্যে ওরূপ বিড়ম্বনার প্রয়োজন কি?"—কিন্তু বরণডালাতে ঐ স্ত্রীলোক যেরূপ নির্ব্বন্ধসহকারে আমাকে ধরিয়া বসিলেন, তাহাতে আমার "না" বলিবার উপায় রহিল না।

তোমার দাদা বলে, তাহার জ্যেষ্ঠা কন্তা বরণার অপেক্ষাও নাকি তোমার নূতন-মা বয়ঃকনিষ্ঠা;—তোমার দাদার চিরকালই সকল কথা বাড়াইয়া বলা স্বভাব। তোমার নূতন-মা এবং বরণা খুব জোর সমবয়সী হইতে পারে, বরণা কিছুতেই বড় না।

আমি সেদিন স্নানাঘরের পাশ দিয়া নীলপুকুরে স্নান করিতে যাইবার সময় দেখিলাম, তোমার বড়দা তারী-গলায় বড়বধূমাতার কাছে বলিতেছে, "ওই শিশু-মেয়েটাকে এখন করিয়া বলি দেওয়া—"

ভাবিলাম, আমি কি আজই মরিয়াছি?—তোমার বড়দাদা কি ঘেঁটো-বক্তা হইয়া উঠিল?

এই সকল অত্যন্ত গরম গরম কথা শুনিয়া, আমি

তোমার নূতন মা'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার সহিত বিবাহ হওয়াতে দুঃখে-শোকে বেচারার বুক ফাটিতেছে কি না! তোমার নূতন-মা কথা না করিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন,—না, তিনি শান্তিতেই আছেন।

আমিও তাহাই বলি,—দরিদ্রের কন্যা, তোমার তাহার হাতে পড়িয়া সারাটা জীবন অসনে অর্দ্ধাশনে যাইবেন,—তাহার চেয়ে, এ কত ভালো হইয়াছে! খাওয়া-পরার ভাবনা নাই, সুখসুবিধার সীমা নাই,—বিধবা হইলেও কোনও অভাবই সহ্য করিতে হইবে না কোনদিন। আর সিঁথির সিঁদুর লইয়া, আমার পায়ে মাথা রাখিয়া যদি—এ সকল কথা তর্কের খাতিরে বলিতেছি, এরূপ ঘটনা যে আমার ঈপ্সিত তাহা নহে—যদি তিনি আমার পূর্ব্বেই যাইতে পারেন, তবে তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবতী কে?

তোমার নূতন-মা'র যদি দুঃখ হইত, তাহা হইলে কি তিনি কিছু বলিতেন না?

আমি ত দেখি, অত্যন্ত নিঃস্পৃহ তিনি সমস্ত দিন ঘর-সংসারের কাজ করেন, রাগ নাই, বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই।

তোমার দাদা সেদিন বলিল, শত অত্যাচার, সহস্র অপমান, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু যে মুখ বুজিয়া সহ্য করে' জীবনযাত্রার নিত্য অপমানের অস্ত্র ইঙ্গিত কুড়াইয়া, সর্ব্ব-গ্লানির কার্ব্বন ডায়অক্সাইড বিষকে বনস্পতির মত পান করিয়া,প্রতিদানে শুধু অক্সিজেনের অমৃতনিঃশ্বাসে পৃথিবীকে যে স্নান করায়, তাহারই নাম বাংলার মেয়ে, বঙ্গের বধূ। তোমার দাদার মতে, বাংলার মেয়ে শিবের মত নীলকণ্ঠ,—অঞ্জলি ভরিয়া গরল পান করিয়া, পীযূষ বিলাইয়া দেবী হইয়া গেছে। তোমার দাদা বলে, সর্ব্ব দেশের সর্ব্বযুগের নারীসমাজে শ্রেষ্ঠ আসন বাংলার কন্যা না চাহিয়াই পাইবে। সে আসন হইতে হাত বাড়াইলে আকাশ ছোঁওয়া যায়—আর কোনও দেশের মেয়ে তার নাগাল পায় না।

তোমার দাদা যে শুধু উকীল তাহাই নয়, সে রসায়ন-বিদ, এবং দার্শনিক ও কবিও বটে।

তোমার নূতন-মা'কে ঘরে আনার মধ্যে যে এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমস্যা ছিল, তাহা কি পূর্ব্বে জানিতাম?

তোমার বড় দা একবার বলে, "এমন নীরবে, এ'র শান্ত ঔদার্য্যের সাহত সকলকে ক্ষমা করিয়া, বিনাতন্ত্রে জীবনের বন্ধুর পথে যাত্রা করিতে পারে শুধু বাংলার মেয়ে।" —আমার অন্য সময়ে বলে, "এই শিশু, সংসারের কোন্ খবর এ জানে? পৃথিবীর কণ্টকসঙ্কীর্ণ পথে আরও কতকাল কেমন করিয়া টলিতে চলিতে হইবে,তাহার কিছু-মাত্র কি এ এখনও বোঝে?—ইহার পায়ের কষ্ট, ইহার সম্বল কই?" উকীল হিসাবে তোমার দাদার যথেষ্ট সুনাম আছে,—কিন্তু এক্ষণে সে তাহার নিজের যোকদ্দমা নিজে মাটি করিতেছে। স্বীয় অবস্থাটা সম্যকরূপে বুঝিবার মত বয়স যদি তোমার নূতন-মা'র নাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে তাঁহার চিত্তে সত্যকার কোনও দুঃখই উদিত হয় নাই, এই সিদ্ধান্তই কি যথার্থ নয়?

তোমার দাদা যে কি বলিতে চায়, তাহা আমার বোধ-গম্য হয় না,—মোটের উপরে বুঝিতে পারি যে, সে সহই হয় নাই এবং বাড়ীশুদ্ধ সকলকেই তাহার মতাবলম্বী করিয়া তুলিতেছে।

ওকালতিতে সে যথেষ্ট পয়সা উপার্জ্জন করে, এবং আমার সম্পত্তির উপরেও তাহার কোনই আকর্ষণ দেখি নাই কোনদিন, নহিলে তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিতাম।

সে এক এক সময় বলে যে, তোমার নূতন-মা যখন তাঁহার অবস্থাটা ঠিক করিয়া অনুভব করিতে পারিবেন, সেদিনই নাকি তাঁহার মৃত্যু হইবে! তাহার মতে, এ যেন ঘুপ্পুরাতের ভূমিকম্পে মাথার উপরে গৃহপতন,—অকস্মাৎ চমকিয়া যে মুহূর্ত্তে ভয় পাইয়া মানুষ জাগে, তাহার পরমুহূর্ত্তেই নাকি চিরকালের জন্য জ্ঞান হারায়। আজ তোমার নূতন-মা সহজে কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু নাড়ীযন্ত্র মন কোন্ সুদূরে কাঁদে,—তাঁহার জীবনে একটা অত্যন্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এখনই নাকি তিনি ইহার আভাস পাইতেছেন,—যেদিন অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া একথা তিনি বুঝিবেন, সেদিন তাঁহার সুপ্রসন্ন চিত্তকে আমরা হারাইব,—সেই হইবে নাকি এ গৃহ হইতে তাঁহার বিদায়!

তোমার দাদা যে কত কথাই বলিতে পারে!—সমস্ত শুনিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, সুস্থ শরীরকে নিরর্থক ব্যস্ত করিয়া তোলা ছাড়া তাহার আর অন্য কোনও

উদ্দেশ্য নাই। এক একবার মনে হয়, তাহার কি সাহসের অভাব হইয়াছে? কোর্টে কি আজকাল তাহার যথেষ্ট কর্ম্ম জুটিতেছে না? কিন্তু প্রতিমাসে সে যেরকম পকেট ভর্ত্তি করিয়া টাকা আনে, তাহাতে সে বাবাও যে সন্তা, তাহাই বা বলি কেমন করিয়া?

—শুনিতেছি, কলিকাতার টনসু বেজা বেশ দিয়াছে।—তুমি সাবধানে থাকিও। ভবতারণবাবুর বাড়ীর কোন সংবাদ অনেকদিন যাবৎ পাই না। তাহাদের বাড়ীর কে কেমন আছে, তোমার অবসরমত একদিন জানিয়া আসিয়ো।

শান্তিপুর হইতে চরম জানাকে সীমগড় যাইতে হইবে। বড়বৌর মাথের সঙ্গোবস্ত লইয়া ছোট-ভরফের সহিত মনোমালিন্য অনিবার্য্য। একটা রফা নিষ্পত্তি করাই আমাদের মনোগত বাসনা।

তোমার দাদা এই অত্যন্ত সহজ কথাটা কিছুতেই বুঝিতে চাহে না যে তোমার নূতন-মাকে আমাদের গৃহে আনিয়া, আমার শ্বশুরমহাশয়কে আমি একটা কত বড় দায় হইতে মুক্ত করিয়াছি। সর্ব্বস্ব খরচ করিয়া, পিতৃ-বিয়োগের ছিটামোটটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া তবে কিনা একটি তথাকথিত শূদ্রাত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিলেন,—এবং তাহার পরে নিজে আজীবন ভুগিয়া মরিতেন, এবং তবরঙ্গে তুলিতেন তাঁহার কন্যাটি,—এক দফা, পিতাকে নিঃস্ব করার জন্য আত্মায় নিতে; দুই দফা, শ্বশুর-গৃহের এবং স্বামীর চমৎকার আচরণে!—এই যে আমাদের বৃহৎ ধনী-পরিবারে, তোমার নূতন-মা ওইটুকু মেয়ে হইয়াও সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া বসিলেন, এই যে তাঁহার পিতাকে একটি অচল পাইপয়সা অবধি কন্যার বিবাহের জন্য খরচ করিতে হইল না, ইহার জন্য কি তোমার নূতন মা, এবং তাঁহাদের পরিবারস্থ লোকেরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়?

তোমার দাদার বড় বড় কথার অনেক সময় অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। সে বলিতেছে, তোমার নূতন-মা হয়ত সারাজীবন তাঁহার দুঃখের কোন কথাই বলিবেন না,—কিন্তু কোনদিন গৃহকোণে বসিয়া লোকলোচনের অগোচরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবেন,—কেহ সে সংবাদ জানিবে না;—ছোট একটুখানি নিশ্বাস, অথচ তাহাতেই নাকি উল্টা হাওয়ায় পৃথিবীর পাল ছিঁড়িবে,—আজ হউক, কাল হউক, এক বছর পরে হউক, দশ বছর পরে হউক,—উহা নাকি একদিন ঘটিবেই!—বিপদ মন্দ নয়! তোমার নূতন-মা যদি মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন, তাহা হইলে তোমার দাদা তাহার ওকালতি বুদ্ধিতে একটা চমৎকার মোকদ্দমা খাড়া করিবে,—আর যদি তিনি সমস্ত জীবনেও কিছু না বলেন তাহা হইলে তোমার বড় মা তোমার নূতন-মা'র দুঃখ, শোক, বেদনা, অশ্রু, মার দীর্ঘনিশ্বাস অবধি কল্পনা করিয়া লইয়া আরও চমৎকার এক আর্জ্জি গড়িয়া তুলিবে!—এরকম উকীল লইয়া সংসারে বাস করা দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই!

আশ্রমে তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল লিখিয়া সন্তুষ্ট করিয়ো। অদ্বৈত সমস্তই মঙ্গল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীঅদ্বৈতচরণ দেবশর্ম্মণঃ

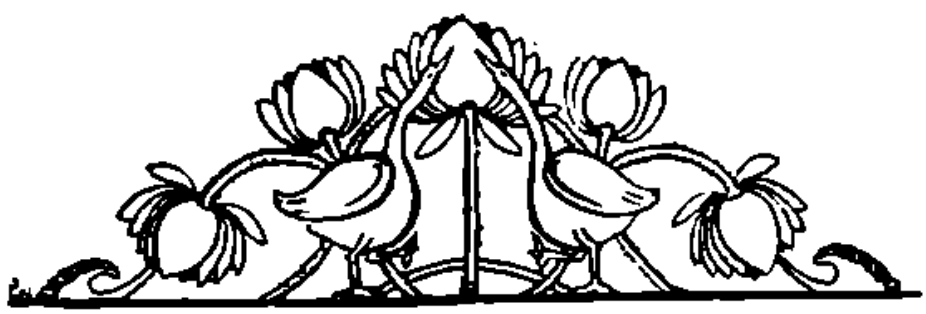

নদীতলে ভগ্নাবশেষ প্রতিমাদর্শনে

শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

হে প্রতিমা! বিসর্জ্জিত, নিমজ্জিত, বিস্মৃত, অতীত,
কোথা তব ভক্তদল, কোথা নব বসনভূষণ?
কোথা সেই আলোকিত পুলকিত পূজার প্রাঙ্গণ,
কোথা তব যৌবনের মন্ত্রমুগ্ধ শুদ্ধ পুরোহিত?
বেজেছিল যথাকালে বিজয়ার করুণ সঙ্গীত,
করেছিলে সোত্তাসারা, শূন্য করি' সকলের মন,
লভেছিলে নদীবক্ষে সনাতন শীতল মরণ,
তবে কেন রহিলে না চিরকাল তরে অন্তর্হিত?

নদী তব ছিল ঢাকি' সেদিনের অপরূপ লজ্জা,
নদী পুনঃ প্রকাশিল আজিকার রূপহীন লজ্জা।

এবে তুমি হতমান, ছিন্নমস্তা, সর্ব্বগর্ব্বনাশা,
তবু দু'দিনের তরে ছিলে শ্রেষ্ঠ তারনার ধন,
দু'দণ্ড মিটায়েছিলে মানবের আত্মার পিপাসা—
লহ তাই পথিকের ক্ষুদ্র এই অর্ঘ্য নিবেদন।

পুরীর শ্রীক্ষেত্র-তীর্থে

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

পুরীকে শ্রীক্ষেত্র বলে কেন?—বাক্ সে কথা হবে পরে। এখন গোড়া থেকে আরম্ভ করা যাক্।

বিগত অগ্রাণ মাসের প্রথম ভাগে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বৈঠক শেষ হওয়ায় পর শিমলা থেকে কলকাতা নেবে এলাম। হাতে কয়েক সপ্তাহ ছুটি ছিল, তাই ভাব্‌লাম কোথায় যাই। পুরী যাব কি আবার কোনো পাহাড়ে যাব তাই ভাব্‌ছিলাম।

বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই বল্‌লেন—"আরে, এখন কি পুরী যেতে হয়? এখন সেখানকার Season (যাত্রা ঋতু) নয়; এখন কোনো পাহাড়ে যান্।" আমার মন কিন্তু আমাকে পুরীর দিকে টেনে নিল। সে টানটা তীর্থে যাওয়ার টানের মত প্রাণের ভিতরের আহ্বান ব'লে মনে হ'ল।

ভোরবেলা আমাদের ট্রেণ পুরী ষ্টেশনে পৌছল। জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি দুটি লোক আমার কামরার সাম্নে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে আমার নাব্‌বার অপেক্ষায় রয়েছেন। স্বভাবতঃই মনে হ'ল হয়ত এঁরা পুরী-তীর্থের পাণ্ডা; আমাকে নবাগত যাত্রী মনে ক'রে হস্তগত করবার চেষ্টায় আছেন। গাড়ী থেকে নেবে এঁদের সঙ্গে আলাপ হবার পর বুঝলাম, এঁরা দুজনই বাঙ্গালী ভদ্রলোক, পুরীর পেশাদার পাণ্ডা নন্। তবে পাণ্ডা বটেন্; অর্থাৎ জগন্নাথ-মন্দিরের পাণ্ডা নন্, পুরীর বিধবাশ্রমের পাণ্ডা। একজনের নাম জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি; ব্যবসায় উকিল, ইনি বিধবাশ্রম কমিটির সম্পাদক। অপরটির নাম বীরেন্দ্রনাথ রায়; পুরীর একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী; ইনি বিধবাশ্রম কমিটির সহকারী সম্পাদক। এঁরা

আমাকে সাদর সম্ভাষণ ক'রে আমার উপর ভারী করলেন বিধবাশ্রমের ভবন—অর্থাৎ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর এক চিঠি। তাতে ছিল তাঁর সানুনয় অনুরোধ—যে বেলা তিনটার সময় যেতে হবে—আশ্রম ও আশ্রম-বিদ্যালয় দেখ্‌তে।

"বড়-মা'র অনুরোধ (শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী বোলপুর শান্তিনিকেতন ও কলিকাতা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতিতে সকলের কাছেই "বড়-মা" নামে পরিচিতা ও সমাদৃতা) সরোজনলিনী সমিতির প্রত্যেক বন্ধীরই শিরোধার্য্য। তাই আশ্রমের সহিত যথাসময়ে হোটেল থেকে রওয়ানা হ'য়ে আশ্রমে উপস্থিত হওয়া গেল।

এখানে আশ্রমের সূচনার বিষয়ে দু'চারটি কথা ব'লে নেওয়া দরকার। এই বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী। তাঁর স্বামী স্যর প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গবিধবার দুর্দ্দশামোচনের জন্য মনে অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা রেখে পরলোক গমন করেছিলেন। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন ও ইহার সুপরিচালনার জন্য ইহার পরিচালনার ভার চিরস্থায়ী ভাবে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির হাতে ন্যস্ত করেন।

বড়-মা বিগত তিনমাস-কাল বিধবাশ্রমে তাঁর আসন পেতে সেখানে এক নূতন প্রাণের প্রতিষ্ঠা করেছেন দেখলাম। আর সেই নূতন প্রাণের ধারা যে কেবল বিধবাশ্রমের মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সেখানে পৌঁছবামাত্রই সেটা বোঝা গেল। আশ্রমে উপস্থিত হ'তেই দেখি পুরীর গণ্যমান্য সরকারী বেসরকারী অনেক বাঙ্গালীই সেখানে উপস্থিত। এমন কি সেখানকার কলেক্টর মিঃ খাস্তগীর বাঙ্গালী না হওয়া সত্ত্বেও এই নূতন প্রাণের ধারায় আকৃষ্ট হ'য়ে এতে যোগ দিয়েছেন। তাঁরও সেদিন সেখানে উপস্থিত হবার কথা ছিল, কিন্তু কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃ আসতে পারেন নি। এঁরা সকলেই আশ্রম পরিচালনা কমিটির সভ্য হয়েছেন।

পুরীর স্থানীয় সরকারী বেসরকারী সকলকে এই আশ্রম কেন এতটা আকর্ষণ করেছে সেটা তলিয়ে দেখ্‌তে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে বড়-মা তাঁর সুচিন্তিত গঠন-প্রণালীর ও ব্যক্তিগত আদর্শের প্রভাবে এই আশ্রমে এক অভিনব শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন ও তার ফলে এই আশ্রমটি বিধবাশ্রমের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে একটি আদর্শ স্ত্রীশিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

১০।১২ জন হিন্দুবিধবা এই আশ্রমের বাসিন্দা। এদের শিক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য আশ্রমে তিনজন উপযুক্ত মাইনা শিক্ষয়িত্রীর বাসেরও বন্দোবস্ত আছে। প্রধান শিক্ষয়িত্রী একজন আইরিশ খ্রীষ্টান। এঁরা যে কেবল বিধবা ব্যবসায়ীদের সন্তান তা নয়। পুরী সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত সরকারী বেসরকারী বাঙ্গালী পরিবারের বালিকাদের সুশিক্ষালাভের জন্য এই আশ্রমে একটি বালিকাবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে; শিক্ষয়িত্রীরা এই আশ্রম-বালিকাবিদ্যালয়েও শিক্ষাদান ক'রে থাকেন,বালিকাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছোট ছোট ভাইরাও এখানে শিক্ষালাভ করতে আসে। পুরীর সরকারী বেসরকারী নিঃসন্দেহে সকল বিশিষ্ট বাঙ্গালীই তাঁদের মেয়েকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছেন। এমন কি পুরীর কলেক্টর হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও নিজের মেয়েকে এই বাঙ্গালী মেয়েদের স্কুলে ভর্ত্তি করেছেন। পরিণতবয়স্কা বিধবাদের ও অপরিণতবয়স্কা বালকবালিকাদের শিক্ষাক্ষেত্রে একত্র ঘনিষ্ট সংস্পর্শে যে একটা অভিনব ভাবের সৃষ্টি করেছে তা এই আশ্রমের জীবনে একদিনের জন্য দেখলেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

সাধারণতঃ বিধবাশ্রমের জীবনে একটা শুষ্ক নিরানন্দতার আবহাওয়া ও বিধিবিধানের কঠোর নিয়মনিষ্ঠার ভাব লক্ষিত হয়। আবার বাংলার সাধারণ প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়েদের পারিবারিক জীবনের ধারার সঙ্গে বিচ্ছেদ ও বিরোধের ভাব পরিলক্ষিত হ'য়ে থাকে। আশ্রমের সঙ্গে আশ্রম-বিদ্যালয়ের সমাবেশে একের উপর অপরের প্রভাবের ফলে এখানে এই উভয়বিধ দোষের আপনা থেকেই নিরাকরণ হ'য়ে যাচ্ছে দেখা গেল। আশ্রমের বিধবাগণ আশ্রমবিদ্যালয়ের বালকবালিকাগণের শিক্ষাবিষয়ে সবিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করছেন, ও বালকবালিকাদের লেখাপড়ায় ও পরিচর্য্যায় তাঁদের মাতৃহৃদয়ের কোমল স্নেহবৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ না থেকে

স্বাভাবিক প্রকাশের পথ ও প্রয়োগের ক্ষেত্র পেয়ে সহজ ভাবে বিকাশের সুযোগ লাভ করেছে। বালকবালিকারাও বালিকা শিক্ষয়িত্রীদের ও বিশেষভাবে আশ্রমের বিধবাদের স্নেহ লাভ ক'রে বিদ্যালয়কে অপ্রীতিকর স্থান মনে না ক'রে তার সঙ্গে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছে, ও বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিধবাদের জীবনের বৈচিত্র্যময় কাজের যোগ থাকায় পারিবারিক জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যে একটা অবিচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তার সহজ উপলব্ধি পাচ্ছে।

বালকবালিকাদের জীবনের সহজ আনন্দের সংস্পর্শে বিধবাদের জীবনে আনন্দের পুনরুদ্ভব হ'চ্ছে, আবার বিধবাদের জীবনের সংযত নিয়ম-নিষ্ঠার সংস্পর্শে বালিকাদের কোমল প্রাণে অলক্ষ্যভাবে জীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব-জ্ঞানের উপলব্ধি অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠছে। ফলে, আশ্রমটি একদিকে যেমন বিধবাদের পক্ষে একটি নিরানন্দের কারাগার না হ'য়ে নিত্য-নূতন আনন্দের আবাসভূমি হ'য়ে উঠেছে, তেমনি বিদ্যালয়ের বালকবালিকাদের পক্ষে ইহা একটি "দ্বিতীয় গৃহ" স্বরূপ হ'য়ে উঠেছে। বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হ'য়ে যাওয়ার পরও বালকবালিকারা আশ্রম ছেড়ে বাড়ী ফিরে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে না, আশ্রমের বিধবারাও তাদের ছেড়ে দিতে চায় না; বাইরে থেকে যে টম "ব স্"এর চালককে অনেক ডাকাডাকি ক'রে বালকবালিকদিগকে ঘরে যাবার জন্যে আশ্রম থেকে বের করতে হয়।

আশ্রমের মেয়েদের ও আশ্রম-বালিকাবিদ্যালয়ের বালকবালিকাদের উভয়ের জন্যই অতিরিক্ত বালিকা শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত ত আছেই, তা ছাড়া সুবন্দোবস্ত আছে শিল্পশিক্ষার ও শ্রমের গৌরব শিক্ষার, ব্যায়ামশিক্ষার ও স্বাস্থ্যোন্নতির, ধর্মশিক্ষার ও সঙ্গীতশিক্ষার এবং সর্বশেষে—ক্রীড়াশিক্ষার ও আনন্দের ব্যবস্থার।

বড়-মার প্রভাবে ও আগ্রহে অনুপ্রাণিত হ'য়ে একটি মহিলা সুবিস্তৃত শিল্পাগার নির্মাণের খরচ দিয়েছেন। তাতে ছোট বড় সব মেয়েরা বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-শিক্ষার ও স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জনের উপায় শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। ছোট বড় সব মেয়েরা আনন্দের সহিত আশ্রমের বাগানে নিজ হাতে কোদাল চালিয়ে সবজি চাষের কাজ করছে ও সেই সঙ্গে মনোৎপাদন ও স্বাস্থ্য-সাধনের উপায় শিক্ষা করছে। শিক্ষার মানে যে কেবল মনের শিক্ষা নয়, দেহের শক্তি ও স্বাস্থ্যচর্চা যে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ তা এই আশ্রমে কার্যক্ষেত্রে দেখানো হ'চ্ছে। শিল্পকার্য ও বাগানের কাজ ছাড়াও আশ্রমের মেয়েদের প্রতিদিন ভোরে রীতিমত ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে ও প্রত্যহ বিকালে অন্ততঃ একঘণ্টা-কাল সমুদ্র-তীরে খোলা হাওয়ায় বেড়াবার নিয়ম আছে। বড়-মার তত্ত্বাবধানে ধর্মজীবনের বিকাশের সুসঙ্গত ব্যবস্থা হয়েছে। প্রত্যহ ছোট বড় সব মেয়েরা একসঙ্গে সমস্বরে ঈশ্বরোপাসনার স্তব পাঠ করে। সেটি যে কি সুন্দর ও ধর্মভাব-প্রবোধক তা না শুনলে বোঝা অসম্ভব।

সংযমে ও আনন্দে যে প্রকৃতপক্ষে বিরোধ নাই তা বড়-মা কার্যকরীভাবে সুন্দররূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন ফলে, বিধবাদের জীবন যেমন একদিকে সুশিক্ষা ও নিয়মনিষ্ঠার দ্বারা সুসংযত, অপরদিকে আবার বালকবালিকাদের ও বিধবাদের একসঙ্গে নানাপ্রকার ক্রীড়ার বন্দোবস্ত থাকায় শরীর ও মনের সমবিকাশ ও জীবনের আনন্দবর্দ্ধন সুন্দর-ভাবে সাধিত হ'চ্ছে। সঙ্গীতশিক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা আছে। বড়-মা তাঁর নিজের গানগুলি নিজেই শিখিয়ে দিয়েছেন।

আশ্রমটির স্থান সমুদ্রতীরে নিরালা ফাঁকা জায়গায়। সুতরাং পরস্পর কড়াকড়ি বন্দোবস্তের কোন প্রয়োজন নাই। সহরের জীবনের কৃত্রিম বাঁধাবাঁধি এখানে নাই। মুক্ত আলো ও মুক্ত হাওয়ার অবারিত ছড়াছড়ি, নীল সাগরের দিগন্তব্যাপী সুন্দর দৃশ্য। সাগরের জলের সঙ্গে নিশে রঙ্গিন হ'য়ে প্রাণ যেন ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে নেচে উঠে। সেই মুক্ত আলোয় মুক্ত হাওয়ায়, সমুদ্রের মুক্ত উদার সুন্দর দৃশ্যের সামনে ছোট বড় মেয়েরা একসঙ্গে খেলা করছে, গান শিখছে, একসঙ্গে সুরে সুরে গান করছে, ও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার শিক্ষা, শ্রমের সাধন ও মনোৎপাদন শিক্ষা করছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্যের আবাসস্থল পুরীতেই

শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন উপাদানের এরূপ একাধারে সমাবেশের ব্যবস্থার সম্ভব।

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বহুলা ব্যক্তিগত চরিত্র-প্রভাবে আশ্রমের মেয়েদের সামনে জীবনের এক নূতন আদর্শ ধ'রে তুলেছেন। জীবনের সার্থকতা যে ভোগে নয়, ত্যাগে; নেওয়ায় নয়, দেওয়ায়;—যারা পরের সেবায় নিজের জীবন বিলিয়ে দেয় তারাই যে বাস্তবিক সুখ লাভ করে—এই মহান আদর্শে তিনি আশ্রমের বিধবাদের জীবন অনুপ্রাণিত ক'রে তুলছেন—এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে বিধবারা তাদের জীবনকে ব্যর্থতায় ও নিরানন্দতায় আধার ব'লে মনে করে না। তাদের প্রতিনিয়ত প্রায়ই বুঝিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে যে তারা একটি হারিয়ে বহুর মধ্যে অসীমের সন্ধান পাবার মহাসুযোগ পেয়েছে। পরিবারের গণ্ডী ভেঙে দিয়ে ঈশ্বর তাদের সামনে সমাজ-সেবার বিস্তৃত ক্ষেত্র খুলে দিয়েছেন। দেশের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার মহৎ কাজে ব্রতী হ'য়ে, দেশের দুঃখদুর্গতি দূর করবার সুযোগ পেয়ে তারা নিজের জীবনকে ধন্য করতে—সার্থক করতে পারবে এটা তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। ফলে তাদের জীবনে—এক অভিনব পরিবর্ত্তনের ভাব, এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্যমের ভাব এসে তাদের নূতন জীবনে উজ্জীবিত করছে।

তাই এই আশ্রমের সাধনা দেখে মনে হ'ল, এখানেই পুরীর শ্রীক্ষেত্র গঠন হ'চ্ছে; "শ্রী" লক্ষ্মীর অন্যতম নাম, আর "শ্রী" শব্দে বুঝায় পবিত্র সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মল ঐশ্বর্য্য। পুরীর জগন্নাথ-তীর্থে শ্রীক্ষেত্র আখ্যার অন্য কোন সার্থকতা থাকুক আর নাই থাকুক এই আশ্রমে যে শ্রীক্ষেত্রের বাস্তবিক সূচনা হ'য়েছে তা বিশেষ ক'রে উপলব্ধি করলাম। দেশের লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনতে হ'লে, দেশের আবার শ্রীবৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি করতে হ'লে যে দেশের মেয়েদের উপযুক্ত প্রণালীতে শিক্ষাই তার প্রকৃষ্ট উপায় তা আর আজকালকার দিনে কাউকে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন নাই। বিশেষ ক'রে দেশে যে লক্ষ লক্ষ বিধবার জীবন বছরের পর বছর ব্যর্থতায় অপচয় পাচ্ছে তাদের শিক্ষা দিয়ে জ্ঞানে সমুজ্জ্বল ক'রে সমাজের শিক্ষায় ও সেবার কাজে ব্রতী করতে পারলে দেশের যে কত মঙ্গল সাধিত হবে তা অভাবনীয়। ইউরোপ আমেরিকার অনেক মেয়েকে চিরকুমারী থাকতে হয়, আবার অনেকে স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচারিণী (nun) ব্রত অবলম্বন ক'রে জীবনকে ধর্ম্ম ও সমাজ-সেবার কাজে নিয়োজিত করেন। এই সব মেয়েদের সাধনার দ্বারা ইউরোপ আমেরিকার জাতীয় জীবনের যে কত বড় উন্নতি সাধিত হ'চ্ছে তার নিরূপণ করা অসম্ভব, অথচ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ বিধবার জীবন জ্ঞানের আলো ও কর্ম্মযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকায় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'য়ে আছে। এই বিধবাদিগের উপযুক্ত শিক্ষার সুব্যবস্থা ক'রে দেশের শিক্ষা ও সেবার কাজে লাগাবার জন্য শিক্ষাগার আমাদের গঠন ক'রে তুলতে হবে। সে-সব শিক্ষাগারই প্রকৃতপক্ষে এক একটা 'শ্রীক্ষেত্র' হবে।

বাংলাদেশের জন্য এরূপ শ্রীনিকেতন—এরূপ শ্রীক্ষেত্র গঠন করবার জন্য পুরীর মত আদর্শস্থল অন্য কোথাও নাই। স্বাস্থ্যকরতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সমুদ্রের খোলা হাওয়ার অবাধে মুক্ত বিচরণ ও স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রাণতার অনুপ্রাণনার সুযোগ ইত্যাদি নানাপ্রকার সুবিধার ফলে বাঙ্গালীজাতির শ্রীক্ষেত্র-গঠন পুরীতে যেমন সুসম্পন্ন হবে এমন আর কোথাও হ'তে পারে না।

আজ তাই দেশ-বিদেশের সকল বাঙ্গালী বন্ধুদের কাছে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—যেন তাঁরা পুরীতে এই শ্রীক্ষেত্র-আশ্রমকে সুগঠিত ক'রে ও সুবিশাল ক'রে তুলতে ও তার দ্বারা বাংলার জাতীয় জীবনের শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের জন্য সংশোধনশিনী নারীবন্ধন সমিতিকে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করেন।

আশ্রমের গান

আশ্রমের মেয়েরা আমার কাছ থেকে আমার রচিত গানগুলি একে একে আশ্রমের পরিচয় দিয়ে গেলেন, তারপর আমাকে অনুরোধ করলে যে আশ্রমের জন্য বিশেষ ক'রে একটা গান আমাকে রচনা ক'রে দিতে হবে। পুরীর শ্রীক্ষেত্র-তীর্থযাত্রা শেষ ক'রে যখন কলকাতা ফিরছি তখন ট্রেণেই এই অনুরোধের ফলে আশ্রমের জীবন বর্ণনা

ক'রে আশ্রমের জন্য এই গানটি রচনা ক'রে তাদের উপহার দিলাম :—

বেহাগ—একতালা

মোদের সাধের আশ্রমেতে নাই ভাবনা নাইকো ভয় ;
কোথায় আর আছে গো হায়, এমন শান্তিময় আলয় !
শিক্ষা-লাভের সরল রীতি
জাগায় প্রাণে সরল নীতি
সরল মনে সবার সনে সবাই মিশে সরল হয় ॥
ছোট বড় নাইকো সেথায়
সবাই বাধী সবার ব্যথায়
দশের সেবায় ব্রতের সাধন স্বার্থ-গরল করে ক্ষয়।
শিল্পালয়ে শ্রমের প্রভাব
ঘুচায় অলসতার স্বভাব
খোলা হাওয়ায় গানে খেলায় জীবন হয় আনন্দ-ময় ॥
হরণ করে মনের গ্লানি
ধ্বনিছে প্রকৃতির বাণী ;
সমুদ্র অনন্ত-রবে জগৎ-পিতার গাহে জয়।
দিকে দিকে মুক্ত গগন
উষাও হ'য়ে বয় সমীরণ
নীল সাগরের জলের সঙ্গে পরাণ মিশে রঙ্গিন হয় ॥

পাশ্চাত্য শিশুজগৎ

শ্রী শিশুসাথী

বিস্ময়, অনুসন্ধিৎসা ও কল্পনা এই ত্রিগুণত্রয় মিলিয়া শিশুদের মনকে স্বভাবতঃই আশ্চর্যভাবে শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছে। এই শক্তিশালী উদ্যম মনকে প্রগতির পথে পরিচালিত করিলে তাহার দ্রুততা বয়স্কদিগকেও অনায়াসে পরাজিত করিতে পারে। পাশ্চাত্য জগৎ তাহারই চেষ্টা করিতেছে এবং শীঘ্রই হয়ত এমন শুভদিন আসিবে যেদিন এক অপূর্ব্ব মনঃশক্তিশালী জাতি বিচিত্র ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিবে—ও সেজন্য ডাঃ কেরোনাকের সাহায্য লইতেও হইবে না।

আমাদের দেশের Syllabus অনুযায়ী পুঁথির বোঝা চাপাইয়া শিশুকে বিদ্যার জাহাজে পরিণত করিবার চেষ্টা তাহারা করে না। • উৎসাহবর্দ্ধক ও আনন্দকর উপায়ে হাতে-কলমে কার্য্যতঃ (practically) শিক্ষা-সাধনায় তাহাকে সুপটু করিয়া তোলা হয়। যথা—

আকাশ-যান না পরীর জাহাজ

• "যাহা আর্ট ক্লাসের ছেলের জন্য যে science-এর syllabus তৈয়ার হয় তাহা বোধ হয় আচার্য্য জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র দুই চারি বৎসরে আয়ত্ত করিতে পারেন না। আর সাহিত্য ও ইতিহাসের Syllabus যদি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও স্যার যদুনাথ নাড়া চাড়া করিয়া দেখেন, তাহা হইলে আতঙ্কে হয় ত মূর্চ্ছা যান।"—সত্যেন্দ্রকুমার।

ফরাসী শিশুটি জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা,—চমৎকার ঐ পরীর জাহাজে ক'রে পরীরা কোথায় ভেসে যাচ্ছে দেখেছ ?"

"বোকা ভাইটি,—পরীর জাহাজ নয় ও, উড়ো জাহাজ ; তবে ওতে আকাশে ওড়া যায় বটে !"

কৌতূহলী শিশু-মন আকাশে উড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে।

আকাশ-যান

"সত্য, এখনি কি এটা আকাশে উড়বে ?"

"হাঁ, এই রকম নমুনার বডি, এঞ্জিনিয়র ইঞ্জিন, কলকব্জা—এই সব দিয়ে ঠিকমত যোজনা করলে নিশ্চয়ই

এ আকাশে উড়বে এবং আমরাও তাতে চ'ড়ে আকাশে উঠতে পারব।"

শিশু মনে শিক্ষার বীজ রোপিত হইয়া গেল।

বয়-স্কাউট বা ব্রতী-বালক

ব্রুকলিন (মিউইয়র্ক)-এর ব্রতী-বালকদল তাহাদের দলপতির অধীনে মিলিয়াছে—পাহাড়ী সফরে চলিবার জন্য।

শুধু বেড়ানো নয়

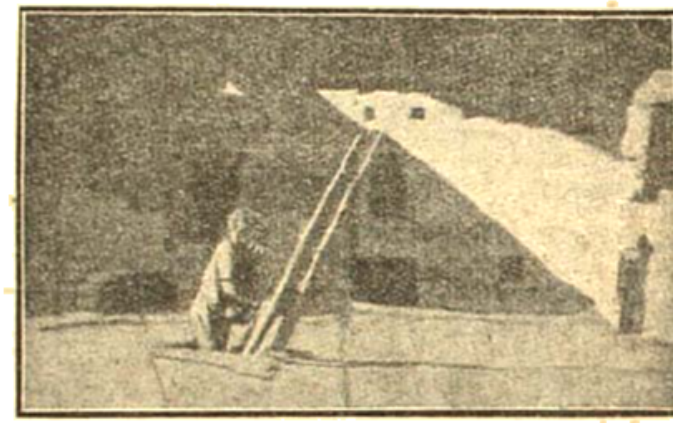

শুধু পাহাড়ী সফর নয় ; ব্রতী-বালকদল আমেরিকার টেক্সাসের এই প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক, ধ্বংসাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিতে চায় অধ্যয়ন কৌতূহলের সহিত।

প্রত্নতত্ত্ব-শিক্ষার বীজ শিশুহৃদয়ে উপ্ত হইল।

বাগান তৈরী

জার্ম্মানী, বার্লিনের এই উদ্যান-সমন্বিত বাড়ীগুলি "Homestead" নামে খ্যাত। বাগানের ঘণ্টায়

(Garden-hour) শিশুরা আনন্দে তাহাদের বাগানের কাজ করিতেছে।

হোমিওপ্যাথ

শ্রী অবনীনাথ রায়

কিছুদিন হইতে প্রিয়কুমারের শরীরটা ভাল ছিল না। ডাক্তার খুব পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন oxalates and epithelial cells পাওয়া গিয়াছে। আর বিশেষ কোন উপসর্গ নাই, কেবল দেহটা যেন অত্যন্ত ক্লান্তিতে ভরিয়া আছে এইরূপ অনুভব করেন। কোন কাজেই উৎসাহ নাই।

তখন সহরে ভূপাল ডাক্তারের খুব নাম। উনি হোমিওপ্যাথিক কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন। তাহার পর চিকিৎসক-জীবনে কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন। পয়সাকড়ি সম্বন্ধে কোন কড়াকড়ি নাই—কেহ দেয়, কেহ দেয় না। কিন্তু যে দেয় না সে-ও মনে মনে পরদুঃখকাতর লোকটিকে শ্রদ্ধা করে।

প্রিয়কুমার ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিন এই ভূপাল ডাক্তারকে কল্ দিলেন। উদ্দেশ্য—হোমিওপ্যাথিক মতে শরীরটাকে একবার যাচাই করিয়া লইবেন। তাহার পর ডাক্তার এবং রোগীর মধ্যে যে প্রশ্নোত্তরমালা চলিল তাহার অবিকল নকল আমরা নীচে দিলাম :—

'ক্ষুধা কেমন হয়?'

'খুব হয় না।'

'মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করে, না টক্ খেতে ইচ্ছা করে?'

'কোন কিছু খাওয়ার জন্যই আগ্রহ বোধ করি না।'

'প্রস্রাবের রং কি রকম?'

'গাঢ় হলুদ।'

'পরিমাণে কতটা হয়?

প্রিয়কুমার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বিপদ বুঝিয়া ডাক্তার বলিলেন, 'আচ্ছা, সে থাক্, দিনে-রাতে কতবার প্রস্রাব হয়?'

'ছয়-সাত বার হবে।'

'দিনে কয়বার, রাত্রে কয়বার?'

প্রিয়কুমার আবার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার পুনরায় তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, সে যেন খুব খুব শুণে' রাখেন নি, কিন্তু রাত্রে শেষ-প্রস্রাব কখন যান সেটা ত বলতে পারবেন?'

প্রিয়কুমার স্মরণ করিয়া বলিলেন, 'ভোররাত্রে, আন্দাজ ৪॰ টার সময় রোজই একবার প্রস্রাব যাই।'

'কোষ্ঠবদ্ধ আছে?'

'আজ্ঞে হাঁ, প্রায় সপ্তাহেই একবার ক'রে জোলাপ নিতে হয়।'

'মেজাজটা কি রকম? সামান্য কারণেই কি রেগে ওঠেন?'

প্রিয়কুমারের স্ত্রী এতক্ষণ পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া ডাক্তারের প্রশ্ন শুনিতেছিলেন। এইবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, 'আপনার এ প্রশ্নের উত্তর উনি দিতে পারবেন না, ডাক্তার সাহেব। এ প্রশ্নের উত্তর দেব আমি। ওঁর মেজাজটা বাস্তবিক খারাপ হ'য়ে গেছে, আর আমাকে সেজন্যে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছে—' বলিয়াই যেমন আসিয়াছিলেন আবার তেমনি অন্তরালে সরিয়া গেলেন।

ডাক্তার ঘাড় নাড়িলেন, তাঁহার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আবার প্রশ্ন করিয়া চলিলেন :—

'উকুন পেশাতে কোনরকম যন্ত্রণা অনুভব করেন?'

'আজ্ঞে হাঁ, মাঝে মাঝে কামড়ান মতন…'

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, 'ভাল ক'রে মনে ক'রে বলুন, কামড়ান, না চিবোনো?'

প্রিয়কুমার একটুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, 'চিবোনোই বলে বোধ হয়…'

'ঠাণ্ডা ভাল লাগে, না গরম ভাল লাগে?'

'আজ্ঞে গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা, আর শীতকালে গরম ভাল লাগে।'

ডাক্তার বলিলেন 'না, তা' নয়। আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য

এই যে সামান্য টাওা লাগলেই আপনার সর্দ্দি হয় কি না?'

'তা হয় বটে।'

'ঘুম কেমন হয়?'

'ভাল।'

'ঘুমিয়ে কখন স্বপ্ন দেখেন?'

এইবার প্রিয়কুমার বাস্তবিকই বিস্ময় বোধ করিলেন। ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'আজ্ঞে তা, মনে পড়ছে না ত···'

ডাক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, চুলকুলে রক্ত পড়ে?'

প্রিয়কুমার কোনদিন এই রকম কিম্ভূতে প্রশ্নের পাল্লায় পড়েন নাই। কিছুক্ষণ হইতে তিনি একেবারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন, এইবার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে জোরে চুলকুলে···'

ডাক্তারের মুখ উজ্জ্বল হাসিতে আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিল। মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'কিছু ভয় নেই, প্রিয়কুমার বাবু! নাইট্রিক এসিড্ ২০০ শক্তি একদাগ খেয়ে আপনি একঘণ্টা চুপ ক'রে থাকুন। তাতেই আপনার উপকার হবে।'

(৬ষ্ঠ)

ভূপাল ডাক্তার ঘরের মধ্যে বসিয়া একখানা বড়-বড় বেতারের পাতা উল্টাইতেছিলেন। পিয়ন আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি তার দিয়া গেল। পড়িয়া দেখিলেন, চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী একটি ষ্টেশন হইতে বাল্যবন্ধু তার করিতেছে, তাহার পুত্রের কঠিন পীড়া শীঘ্র এস। ডাক্তার টাইম টেবিলটা টানিয়া দেখিলেন আধঘণ্টার মধ্যে একখানি ট্রেন আছে। স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'দেখ, মন্মথর ছেলের অসুখ—আমি সেখানে যাচ্ছি। ফিরতে ২।১ দিন দেরি হবে' বলিয়া অন্যমনস্কভাবে বাহির হইয়া গেলেন। রওনা হইবার সময় কয়েকখানি ডাক্তারি বই এবং ঔষধের বাক্স ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার সঙ্গে গেল না।

মন্মথর ছেলেটি পাঁচ বছরের, আধাশরে ভুগিতেছে। রোগ তখন দ্রুত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এলোপ্যাথিক ঔষধে ফল না হওয়ায় অবশেষে ভূপালকে খবর পাঠান হইয়াছিল।

ভূপাল আসিয়া উপস্থিত হইলে মন্মথর প্রাণে যেন আশার সঞ্চার হইল। মন্মথ চিরকালই কম কথা বলে। কিছু না বলিয়া বাল্যবন্ধুর হাত ধরিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে টান করাইয়া দিলেন। আধাশরে রোগে ভুগিয়া ছেলেটি একেবারে বিছানার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার বুকের এবং হাতের শীর্ণ হাড়গুলি গুণিতে পারা যাইতেছিল। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হওয়ায় সে মাঝে মাঝে 'মা, মা' করিয়া চীৎকার করিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া ডাক্তারের চোখ কাঁটায় জল বাহির হইল।

সেইক্ষণ হইতেই ডাক্তার ছেলেটির চিকিৎসার এবং সেবার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া টেম্পারেচার নিলেন। কখনো অভিনিবেশ-সহকারে রোগীর Symptoms দেখিতে লাগিলেন, কখনো আবার বড় বড় বইগুলির মধ্যে একেবারে মগ্ন হইয়া গেলেন।

পরের দিন মন্মথর বড় ছেলে প্রফুল্ল ডাক্তারের কাছে গিয়া বলিল, 'জ্যাঠাবাবু খেতে আসুন, ভাত বেওয়া হ'য়েছে।' ডাক্তার তখন ঔষধের বাক্স খুলিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতেছিলেন। সেদিকে চক্ষু পড়িতেই প্রফুল্ল বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা জ্যাঠাবাবু, আমাকে এমন একটা ওষুধ দিতে পারেন যাতে আমার খুব বুদ্ধি হয়। তা'হলে স্কুলের মাষ্টার মশাইরা আর মারবেন আর মারধোর করতে পারবেন না।' ডাক্তার বলিলেন, 'পারি বৈকি বাবা'—বলিয়াই তৎক্ষণাৎ এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন।

মন্মথ ঘরের পাশ দিয়া যাইতেছিল, প্রফুল্লকে ঔষধ খাইতে দেখিয়া বলিল, 'ভূপাল, অসুখ ক'ল্লে ছেলেটার, আর ওষুধ খাওয়াচ্ছ বড় ছেলেটাকে?' ভূপাল লজ্জা পাইয়া বলিল, 'না ভাই, তা নয়। প্রফুল্ল একটু বুদ্ধির ওষুধ খেতে চাইলে তাই ওকে এক ডোজ Phosphorus খাইয়ে দিলুম। মাথাটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।' কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ মন্মথর দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, 'আরে, তোমার মাথার চুল পেকে গেছে নাকি? বোসো, বোসো, একদাগ ওষুধ দিচ্ছি—'বলিয়াই ঔষধ খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মন্মথ বলিল, আরে ভূপাল, তুমি কেপে গেলে নাকি?

চুলপাকার জন্যে আবার ওষুধ কি? তা'লে ত জগতে আর কারুরই চুল পাকত না;—ওষুধ খেয়ে সকলেরই চুল কাঁচা থাকত।'

ডাক্তার বললেন, 'আরে না না, তোমার ব্যাধি আমি জানি। এ সে রকম পাকা নয়। এ হচ্ছে রক্তশূন্যতা—শরীরের কোন একটা অঙ্গ যেমন শুকিয়ে যায়। আমি লাইকোপোডিয়াম্ ২০০ শক্তি একদাগ দিচ্ছি। খেয়ে দেখ, উপকার পাবে।'

মন্মথ অধিক বাক্যব্যয় নিরর্থক জানিয়া একদাগ দুইশত-শক্তি পলাথাকরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

(তিন)

ডাক্তারের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মন্মথর ছেলেটিকে বাঁচাইতে পারা গেল না। যখন ডুপাল আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তখন রোগীর মুখের উপর মৃত্যু তাহার করাল ছায়া বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। মুখের মধ্যে বা হাতখানায় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ আর খাওয়াইবার জো ছিল না। এমিটিন ইঞ্জেকশানে দাস্ত বন্ধ করিতে না পারিয়া এলোপ্যাথিক ডাক্তার জবাব দিয়া গিয়াছেন।

ডুপাল ডাক্তার আসা মাত্র কিন্তু হাল ছাড়েন নাই—দিন-রাত রোগীর চিন্তাই তাঁহার চিত্ত জুড়িয়া ছিল। আহার প্রস্রাবের জন্য অপরিহার্য অল্পক্ষণের সময় ব্যতীত তিনি রোগশয্যা আদৌ ছাড়িতে চাহিতেন না। কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ডাক দিয়াছেন তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার সাধ্য মানুষের নাই।

ছেলেটা যে রাত্রে হাঁক দিয়া পলাইল সে রাতটারও যেন একটা বিশেষত্ব ছিল। তখন চন্দ্রগ্রহণ শেষ হইয়া গিয়াছে—ধরণীর সর্বাঙ্গে অন্ধকারের ঘন ছায়,...

সেই অন্ধকারের বুক ভেদ করিয়া পুত্রহীনার করুণ আর্তনাদ বিধাতার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল। ছেলেটির মুখের সে "মা, মা" ডাক তখনো যেন দিক্‌চক্রবালে একেবারে মিলাইয়া যায় নাই।

৪৮ দিন যাইয়া ছেলেটির রোগশয্যাপার্শ্বে অনেকগুলি খেলার পুতুল, মটরগাড়ী প্রভৃতি জড় হইয়াছিল, মন্মথ সবগুলিই শ্মশানে পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন, 'ওতে ওর আত্মার তৃপ্তি হবে।'

রাত্রি প্রভাত হইলে ডাক্তারকে কিন্তু খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তাঁহার বই-এর আলমারীর ভিতর হইতে একখানি চিঠি আবিষ্কৃত হইল। মন্মথকে লিখিয়াছেন, 'ভাই, এতকাল যে বিদ্যার সাধনা করিয়া আসিয়াছি আজ স্বীকার করিতে লজ্জা নাই তাহা আমাকে এতটুকু সার্থকতার পথে আগাইয়া দিতে পারে নাই। একজন পরম স্নেহাস্পদের তিলমাত্র যন্ত্রণা লাঘব করিবার শক্তি এ বিদ্যার নাই। তাই আজ তাঁহাকেই জানিবার আকাঙ্ক্ষায় যাত্রা করিলাম, যাঁহাকে জানিলে রোগ-শোক দূরে পলায়ন করে। আর দেরি নয়—'

তাঁহার বড় আদরের বইগুলিও তিনি আজ ছাড়িয়া গিয়াছেন।

স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার

ডাঃ শ্রী পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, বি-এইচ-ডি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের সারাংশ—দুইটি সভায় 'স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের সমতা' (Women should have equal rights with men) সম্বন্ধে তর্ক (debate) শুনিয়াছিলাম। দুইটি সভাতেই সভাপতির সমান অধিকারের পক্ষপাতী দলের ভোটে জিত হইয়াছিল। দুই পক্ষের যুক্তি এখানে লিপিবদ্ধ হইল। সমান অধিকারের পক্ষপাতী দলকে এখানে 'স্বপক্ষ-পক্ষীয়' এবং তাহার বিপরীত মতাবলম্বী দলকে 'বিপক্ষ-পক্ষীয়' বলা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে (১) শিক্ষা, বিশেষতঃ উচ্চ ও উচ্চতর শিক্ষা-লাভের অধিকার, (২) বাহিরে গমনাগমনের অধিকার, (৩) স্বাধীন জীবিকা-অর্জ্জন করিবার অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন অন্যান্য অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে)।

বিবাহগত অধিকার

বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের দেশে তিনটি বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের অধিকারের সমতা দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে সে অধিকারগুলি স্ত্রী বা পুরুষের কাহারও নাই। এই তিনটি বিষয় হইতেছে—

(১) বিবাহের কাল-নিরূপণ,

(২) পাত্রপাত্রী-নির্ব্বাচন,

(৩) অসবর্ণ বিবাহ।

সকলেই অবগত আছেন যে এই তিন বিষয়েই স্ত্রী বা পুরুষের কাহারও কোনও অধিকার নাই বিষয়গুলি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাউক।

বিবাহের কাল-নিরূপণ :—বিবাহ করিব, কি না করিব, করিলে কত বয়সে করিব, এ সকল স্থির করিবার ক্ষমতা পুত্রেরও নাই, কন্যার ত নাই-ই। সর্ব্বদেশে জন্মাইলে মৃত্যু অনিবার্য্য, আমাদের দেশে জন্মাইলে বিবাহও অপরিহার্য্য। আমাদের দেশে আমরা বিবাহ করি না, আমাদের পিতামাতা বা অন্যান্য অভিভাবকই আমাদের বিবাহ দেন। বাস্তবিক বিবাহ ব্যাপারে যাঁহারা বিবাহ করিবে তাহাদের কোনও হাত নাই। আমি যদি পিতামাতার সুপুত্র হই তাহা হইলে আমার একান্ত কর্ত্তব্য হইবে এই যে, এই বিষয়ে পিতামাতা বা অভিভাবক যাহা ঠিক করিয়া দিবেন তাহাই অম্লানবদনে, বিনা-আপত্তিতে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অস্বীকার করিলে বাপের কুপুত্র হইব। অনেক ছেলে লেখাপড়া শাঙ্গ না করিয়া বা রোজগার করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু পিতামাতা ছেলের বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া একান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। পুত্রকে বিবাহ ক'রতেই হইবে। এক্ষেত্রে যদি কোনও দোষ থাকে, তাহা হইলে সে দোষও ছেলেদের নহে, বাপ-মায়ের। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় খাসা ছড়া লিখেন। একটি ছড়ায় তিনি লিখিয়াছেন—

না ক'রে রোজগার বিবাহ-কর্ম্ম
ভেড়া ছাগলাদি পশুর ধর্ম্ম।

এরূপ ছেলে যদি—

বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়ে কার বাপের অন্ন খায়,
তাড়াও তারে বাড়ী হ'তে পিঠে মেরে বেশ।

কিন্তু দত্তমহাশয় বেচারা ছেলেদের উপর বড়ই অবিচার করিয়াছেন। তাহাদিগকে বাপ মারিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইতে বলিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক দোষ ত তাহাদের নয়। তাহাদের বাপ মা'ই ত জানিয়া শুনিয়া অম্লানবদনে

করিবার জন্যই তাহাদেরকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়া থাকেন। যদি এখনো কোন মহাপুরুষ ছেলেকে রেহাই দিয়া তাহার বাপ-মাকে ধরিয়া তাড়াইবার রায় দেন তাহা হইলে আমি তাতে রাজি আছি। আমি নিজেই আঠার বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছি—তখন আমি সবেমাত্র এক-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িতেছি। আমি বিবাহ করিয়াছি বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে—সত্য কথা, বাপ-মা আঠার বৎসর বয়সে আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার বিষয়ে কল কলিতেও বেশী বিলম্ব হইল না। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির পরীক্ষা দিবার তিনমাস পূর্ব্বে হঠাৎ আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে আমি অন্ধকার দেখিলাম। একটি বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার হঠাৎ একদিনে আমার উপর পতিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে আমি ঐ বৃত্তি পাইয়াছিলাম—নহিলে আমাকে যাবজ্জীবন বহু কষ্টভোগ করিতে হইত। অল্পবয়সে বিবাহ-কর্ম্ম যে দূষনীয় এ বিষয়ে হতমহাশয়ের সহিত আমি একমত, কিন্তু তিনি যদি আঠার বৎসর বয়সে বিবাহ করার অপরাধে আমার উপর "পিঠে মেরে বশে"র ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে আমার উপর বড়ই অবিচার করা হইবে. কারণ আমার সাফাই হইতেছে—আমি ত বিবাহ করি নাই, বাপ-মা আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, বিবাহ করিব কি না, বা কোন্ বয়সে বিবাহ করিব, এ মীমাংসা করিবার ক্ষমতা আমাদের দেশে পুত্র বা কন্যা কাহারও নাই। পাশ্চাত্য দেশে এ বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষ স্বাধীন। অনেকে যাবজ্জীবন বিবাহই করেন না। কেউ ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে যেমন ইচ্ছা বিবাহ করিতেছেন। সাধারণতঃ পুরুষেরা উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করেন না। মেয়েরাও মনোমত বর না পাইলে বিবাহ করেন না—তা যত বয়সই তাহাদের হউক না কেন।

আমাদের দেশে কন্যার বিবাহ পিতামাতা বিবাহ বলেন না, বলেন কন্যাদায় হইতে উদ্ধার। যেখানে দায় হইতে উদ্ধারের ব্যাপার, সেখানে যে দায় হইতে যত শীঘ্র উদ্ধার হইতে পারা যায় ততই মঙ্গল। তাহারই ফলে ঘোষ হয় "অষ্টমে গৌরী, নবমে রোহিণী" প্রভৃতি বচনে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রলোভন সৃষ্টি হইয়াছে। স্বপক্ষীয়েরা বলিলেন—পুণ্যসঞ্চয় ত হইল, কিন্তু ভগবান না করুন, কলেরায় পটু করিয়া জামাটাটি মাথা গেলে কন্যার পক্ষে বালবৈধব্য খণ্ডাইবে কে? বালোমাতৃত্ব রোধ করিবেন কিরূপে? কন্যাকে কুড়ি পার হইতেই বুড়ী দেখিয়া যাইতে হইবে ত? সম্প্রতি আইন হইয়াছে যে অন্ততঃ চৌদ্দ বৎসরের কম মেয়ের ও আঠার বৎসরের কম ছেলের বিবাহ দিতে পারিবেন না। আপত্তি যে না হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহা টিঁকে নাই।

ছেলেদের মত মেয়েদের ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে পর অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিবার কথাটা হইতে পিতামাতা অব্যাহতি পাইবেন। বাস্তবিক চৌদ্দ বৎসর কি একটা ভারি বেশী বয়স হইল? সেদিন পড়িতেছিলাম যে বিলাতে মেয়েদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক বিবাহ হয় তেইশ বৎসর বয়সে। বহু নারী অবিবাহিতা থাকেন, স্বেচ্ছায় বিবাহই করেন না। এ সকল ধারণা স্ত্রীজাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রবেশ করিবে। এখন চৌদ্দ বৎসরই যাহাতে মেয়েদের বিবাহের উচ্চতম না হইয়া নিম্নতম বয়সরূপে গণ্য হয় তাহা হইলেই রক্ষা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবিষয়ে পুত্রকন্যার কাহারও হাত নাই, সবই অভিভাবকের মর্জ্জির উপরই নির্ভর করিতেছে। কিন্তু অভিভাবকেরা এখন হইতে সাবধান হউন—'বাপ-পেটার' জর হইয়াছে।

পাত্রপাত্রী-নির্ব্বাচন :—তার পর পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচনের কথা। এবিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের অধিকার সমান। পিতামাতা বা তাঁহাদের অবর্ত্তমানে কাকা, জেঠা মামা, মাসী, পিসে প্রভৃতি অভিভাবকেরাই পাত্র-পাত্রী স্থির করিয়া দেন, পাত্রের পাত্রী-নির্ব্বাচনের অধিকার নাই; পাত্রীর ত নাই-ই। পাশ্চাত্যদেশে মেয়ে ও পুরুষের উভয়েরই নির্ব্বাচনের ক্ষমতা আছে। তাহারা বিবাহের পূর্ব্বে নিজেদের পছন্দমত ব্যক্তি নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাকেই বিবাহ করে। অনেক সময় নির্ব্বাচনের বহু বৎসর পরেও বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহে পিতামাতার সম্মতির প্রয়োজন

হইয়া থাকে, কিন্তু নির্ব্বাচনের ক্ষমতা বরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলেরই আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের দেশে ঠিক উল্টা ব্যবস্থা। যাহাকে বিবাহ করিব, যাহার সহিত চিরকাল একত্র বাস করিতে হইবে তাহাকে বিবাহের আগে চিনিবার, জানিবার অধিকার নাই, দেখিবার অধিকারও নাই। আমাদের বিবাহে বর ও কন্যার প্রথম দেখা-শুনা হয় বিবাহকালে শুভদৃষ্টি সময়। সে সময় হয়ত দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা চতুর্থপক্ষে বিবাহপ্রয়াসী অশীতিপর বৃদ্ধ বা মাতালের লোলুপ দৃষ্টির বিনিময়ে শুভদৃষ্টি দান করিতে বাধ্য হইলেন। এ-কথা ঠিক—বাপমায়ের চেয়ে পুত্রকন্যার পরম মিত্র আর কেই বা হইতে পারেন? কিন্তু অর্থ বিবাহ-নির্ব্বাচনে বাস্তবিক একটা মহা অনর্থ। অর্থের লোভে বা অর্থের অনাটন-হেতু অথবা কুলরক্ষার মানসে অনেক পিতামাতা কিন্তু কন্যাকে বৃদ্ধ বরের নিকট বলি দিতে দ্বিধা বোধ করেন না বা সোনার চাঁদ পুত্রকে বিপুল বরপণের লোভে বা অন্য কারণে কুপথিত, এমন কি বিকলাঙ্গ কন্যার পাণিগ্রহণে বাধ্য করিতে সঙ্কুচিত হন না। পুত্রকন্যা উভয়কে নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা দিয়া উপযুক্ত বেশী বয়সে তাহাদের বিবাহ দিলে তাহাই আদর্শ বিবাহ হইবে—বলপন্থীদের এইরূপ মত। আপনারা সকলে রাজী আছেন ত?

অসবর্ণ বিবাহ

তৃতীয় কথা হইতেছে—অসবর্ণ বিবাহ। আমাদের দেশে জাতিভেদ-প্রথা বর্ত্তমান থাকাতে ভিন্ন জাতি বা বর্ণে বিবাহ সাধিত হয় না। শুধু তাহাই নহে। এক-একটা খণ্ডজাতির মধ্যে আবার এত বিভাগ আছে যে উপযুক্ত বরকন্যা খুঁজিয়া পাওয়াই দুষ্কর। কুলীন, মৌলিক, শ্রোত্রীয়, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, কাপ, তদ, মেল, পর্য্যায় প্রভৃতির চালে বিবাহের সময় পাত্রপাত্রী-নির্ব্বাচন এক বিষম সমস্যা। যদিই বা এত করিয়া এসব বিষয়ে মিল হইল, তারপর আবার কুষ্ঠী দেখা আছে। বরপণ, ঘাটপণ, দেবপণ সবই মেলা চাই, না হইলে বিবাহ ভাঙ্গিল। এত বাঁধাবাধির মধ্যে বিবাহ ব্যাপারটা বদ্ধ থাকাতে অন্ততঃ কন্যাকর্ত্তার প্রাণ ত বাহির হয় হয়। ইহার ফলে—পণপ্রথা। ইহাই আবার সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণের প্রধান বাধা, কারণ এইরূপ মেলামেশার ফলে যদি কোনও কায়স্থ যুবক কোনও ব্রাহ্মণকন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন তিনি ত তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবেন না। অসবর্ণ বিবাহ করিতে হইলে আইনতঃ পাত্রপাত্রীকে স্বীকার করিতে হয় যে তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান নহেন। সম্প্রতি এই আইন বদলাইতেছে। আইন বদলাইলেই যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইয়া যাইবে এরূপ আশা আদৌ করিতে পারা যায় না। জাতিভেদ-প্রথা হিন্দুসমাজের মেরুদণ্ড।

এই শত-শতাব্দীব্যাপী সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে আমাদেরকাল বহু হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। স্বয়ং বুদ্ধদেব, নানক, চৈতন্য, এবং আধুনিক কালে কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ বহু ধর্ম্মোপদেষ্টা জাতিভেদ-প্রথা উঠাইয়া বিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ফল হইয়াছে যে তাঁহাদের শিষ্যেরা আলাদিরা সম্প্রদায়-রূপে পৃথক হইয়া গিয়াছেন—হিন্দুরা পূর্ব্ববৎই রহিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে অসবর্ণ বিবাহও সর্ব্বাধিক প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা কম। বহু চেষ্টা করিয়া কুলীন, মৌলিক, রাঢ়ী, বারেন্দ্র ভেদই যাইতেছে না, অসবর্ণ বিবাহ বহু দূরের কথা। কিন্তু এইরূপ বিবাহ প্রচলিত হইলে সমাজের ও দেশের যে বহু মঙ্গল সাধিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই—বলপন্থীরা এই কথাই বলেন। বিবাহের গণ্ডী খুব বাড়িয়া যাইবে, পাত্রপাত্রী-নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র বহুল পরিমাণে প্রসারলাভ করিবে, পণপ্রথা উঠিয়া যাইবে, সব হিন্দু-জাতি এক হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের এই সঙ্কীর্ণতা আদৌ নাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেই এক জাতির স্ত্রী-পুরুষ অপর জাতিতে বিবাহ করিতে পারেন। ইংরাজ ফরাসী বিবাহ করিতেছেন, জার্ম্মান রুষ বিবাহ করিতেছেন। অখৃষ্টীয় জাতিতেও বিবাহ হইবার ব্যবস্থা আছে। সেদিন একজন ইউরোপীয় বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে তাঁহার মাতা রুষ, পিতা ফ্রেঞ্চ; তিনি আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমেরিকার লেখাপড়া শিখেন এবং তথায় একজন স্প্যানিস মহিলাকে বিবাহ করিয়া ভারতবর্ষে চাকরি করিতে আসিয়াছেন। বিবাহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য

জাতিরা সমগ্র পৃথিবীকে ক্ষেত্র করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের পুত্রকন্যার বিবাহের গণ্ডী অতীব সঙ্কীর্ণ। আমরা ভাল, না, উহারা ভাল?

এখন দেখা যাউক যে বিবাহগত কোন্ কোন্ বিষয়ে আমাদের দেশ স্ত্রী-পুরুষের অধিকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে লিখিতে হইতেছে :—

(ক) এক স্ত্রী বর্ত্তমানে পুরুষ বহু বিবাহ করিতে পারে, স্ত্রী পারে না।

(খ) বিপত্নীক পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিতে পারে, বিধবার বিবাহ হয় না।

(গ) স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হইলে বা অন্য কোনও কারণে পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে ও অন্য স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারে কিন্তু স্বামী দুশ্চরিত্র হইলে স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না।

এই তিনটি বিষয় বহুবিবাহ, বিপত্নীক ও বিধবার বিবাহ, ও বিবাহবিচ্ছেদ এই তিন নামে নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

বহুবিবাহ :—আমাদের দেশে পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ঐরূপ বিবাহ ভারতের বহুস্থানে সহজ পরিমাণে প্রবর্ত্তিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ' নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে বঙ্গদেশে একসময়ে কুলীন সমাজে কোনও কোনও পুরুষ পঞ্চাশের উর্দ্ধসংখ্যক বিবাহও করিতেন। তাঁহাদের পক্ষে বিবাহটা একটা মস্ত ব্যবসায়ের মত ব্যাপার ছিল। স্ত্রীরা প্রায়ই পিত্রালয়েই থাকিতেন, স্বামী নিজে যেখিয়া বিভিন্ন স্ত্রীর বাপের বাটীতে যাইতেন। সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট অর্থপ্রাপ্তিও ছিল। এখনও এই প্রথা খুবই হ্রাস পাইয়াছে। অন্নসমস্যা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা এই দুইএর ফলে এইরূপ গুরু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তথাচ বহুবিবাহ যে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে তাহা নহে। এখনও উহা দেখা যায়, তবে সচরাচর উহা খুব কম। রাজ-রাজড়ার ঘরে উহা এখনও খুব প্রচলিত। ফলে বাদ-বিসম্বাদ, নালিশ-মোকদ্দমা, এমন কি খুনখারাপি সতীনের সংসারে এখনও দেখা যায়। আমার এক দূর-আত্মীয়ের পিতা কোনও কারণে পুত্রের দুই বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন দুই বউই স্বতন্ত্রঘর করেন, ফলে বাটীতে কাক উঠে আর চিল পড়ে। আত্মীয় ভদ্রলোকটির পিতা বাটীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া এখন কাঁদেন আর বলেন, "আমি ছেলেটার পরম শত্রু ছিলাম রে!" তাহার উপর তাঁহার বউমা-দুটিই যথাসময়ে পুত্রকন্যার জননী হইয়াছেন। ফলে ভদ্রলোকটির ইতিমধ্যে আট-দুগুণে ষোলটি পুত্র-কন্যা হইয়াছে। আর্থিক অবস্থাও ভাল নহে, তাহাতে কষ্টের একশেষ হইয়াছে। আর এক সংসারে দেখিয়াছি যে কোনও ভদ্রলোকের তিন বিবাহ ছিল। একদা হঠাৎ তাঁহার স্বর্গলাভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে তিনটি স্ত্রীলোক একসঙ্গে বিধবা হইলেন।

অপর দিকে শুনিয়াছি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ও তিব্বতে একই স্ত্রীলোকের একসঙ্গে একাধিক স্বামী থাকিতে পারে। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা যে নিন্দনীয় সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ঐতিহাসিক বিবরণ, না, কবিকল্পনা? অথবা ঐ সময়ে ঐরূপ প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল?

পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রী বা পুরুষ উভয় পক্ষেই বহুবিবাহ আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। সেখানে একাধিক বিবাহে জেল হয়। স্বপক্ষীয়েরা বলিলেন যে আমাদের দেশেও ঐরূপ আইন প্রবর্ত্তিত না হইলে বহুবিবাহ একেবারে উঠিয়া যাইবে না। বিপক্ষীয়েরা বহুবিবাহ নিন্দনীয় স্বীকার করিলেও অতদূর যাইতে রাজী নহেন। আপনারা কতদূর যাইতে রাজী?

বিপত্নীক ও বিধবার বিবাহ :—মরণ কাহারও হাতধরা নয়। অকালমৃত্যু যখন রাজচক্রের রাজত্বকালেও হইয়াছিল, তখন কলিকালের ত কথাই নাই। তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ বিপত্নীক ও বিধবার অস্তিত্ব সর্ব্বদেশে। বিচার্য্য বিষয় এই যে, এই সকল বিপত্নীক ও বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন কি না? সর্ব্বদেশে বিপত্নীকের পুনর্ব্বিবাহে কোনও আপত্তি দেখা যায় না। আমাদের দেশেও না। কিন্তু আমাদের দেশে যুক্তি এই যে বরঞ্চ পাত্রী না পাওয়াতে ও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকাতে পঞ্চাশ-ষাট বৎসর বয়স্ক বিপত্নীকও বারোতেরো বৎসরের একটি শিশু-কন্যাকেই

বিবাহ করিতে বাধ্য হন। পাছার লোকে কন্যার পিতাকে কিছুদিন ধিক্কার দেন, তার পর সব একরকম মানাইয়া যায়. তবে বিধবার সংখ্যা তাহাতে নিশ্চয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তিন-চারি জন উপযুক্ত পুত্রবধূ বর্ত্তমানেও বহু বৃদ্ধ বিপত্নীককে পুনরায় বিবাহ করিতে দেখা যায়। অনেক সময়ে অনুশোচনা হয় ন তুলাজ্ঞা। বাস্তবিক মানুষের মানুষ্যুক্তির চরমোৎকর্ষ দেখা যায়—অধিকবয়স্ক বিপত্নীকের পুনরায় দার-পরিগ্রহ কালে। "আজে কি করি বলুন, আমার ত বিবাহের ইচ্ছা এতটুকুও ছিল না, ছেলে-পিলেরাও ভাগর হইয়া উঠিয়াছে, তা. মা যে ছাড়েন না, নাতজামাই ত আর নজর করা যায় না" ইত্যাদি অনুশোচনা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। কলকথা বয়স-বৈষম্য যেখানে নাই, সেখানে বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ নিন্দনীয় নহে। সকল দেশে ও সকল সমাজে উহা প্রচলিত।

আমাদের দেশের সমাজ বিপত্নীকের বেলায় যেরূপ উদার বিধবার বেলায় সেরূপ মোটেই নয়। পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু বিধবারা অবাধে পুনর্বিবাহ করিতে পারেন। মুসলমান-সমাজেও উহা প্রচলিত। কেবল হিন্দু-সমাজে উহা প্রচলিত নাই, হিন্দুসমাজে কঠোর সংযমের দ্বারা দেহ ও মনকে পবিত্র রাখিবার প্রথা বিধবার জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। দিনান্তে একাহার, একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস, অলঙ্কারাদি বর্জ্জন, গুরুবসন পরিধান, তীর্থদর্শন প্রভৃতি উপায়ে হিন্দুবিধবাকে দৈহিক বৃত্তির নিরোধ ও মনকে সংযত করিতে হয়।

স্বপক্ষীয়েরা বলিলেন—এ খুবই ভাল ব্যবস্থা, কিন্তু মুস্কিল এই যে হরকুমারের শরীরের ক্ষুধা অতৃপ্ত থাকিলে একাহার ও উপবাসের দ্বারা সে ক্ষুধা সর্ব্বত্র মিটে না। এই সংসারে বসবাস করিয়া, পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ভাসুর প্রভৃতির ভোগবিলাস চক্ষের সামনে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়া, সকল বিধবাই যে সন্ন্যাসিনীর ব্রত পালন করিতে পারিবেন এমন আশা সর্ব্বত্র করিতে পারা যায় না। গৃহ ত অরণ্য নহে, মুনি-ঋষির আশ্রমও নহে। প্রতি গৃহে ভোগবিলাসের বহু-সাধ্য আয়োজন বর্ত্তমান। সকলেই তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন, কেবল হতভাগা বিধবাই তাহা হইতে বঞ্চিত। এইরূপ ক্ষেত্রে অন্ততঃ বালবিধবারা কিরূপ ঘোরতর মানসিক কষ্ট ভোগ করেন তাহা সকলেই অনুমেয়।

বিপক্ষীয়েরা বলিলেন যে তাহা কেন হইবে, হিন্দু-বিধবা পৃথিবীর আদর্শ। তিনি মূর্ত্তিমতী দেবী, সর্ব্বত্যাগিনী, জগতে তাঁহার তুলনা নাই।

স্বপক্ষীয়েরা বলিলেন যে হিন্দুবিধবা যে ত্যাগে, সংযমে পৃথিবীর আদর্শ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। শুধু ভোগবিলাসই যে পৃথিবীর সেরা তাহা নহে, সংযমই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। শুভ্রবসনা, নিরাভরণা সংযত ও শুচির প্রতিমূর্ত্তি হিন্দুবিধবার তুলনা পৃথিবীতে কোথাও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু আমরা কি বাস্তবিক তাঁহার সে মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম। আমাদের মধ্যে যাঁহারা দুশ্চরিত্র তাঁহাদের কুদৃষ্টি সর্ব্বদা ইঁহাদের উপর তাহার উপর অনভোপায় বলিয়া বিধবা সংসারেই বিনা-মাহিনার ঝি ও রাঁধুনী, ছাট ফেলিতে তাহা কুলো। তাঁহাদের পারিবারিক দুর্গতির কথা সকলেই জানেন, মুখে স্বীকার করুন আর নাই করুন। মুখে যদি তিনি দেবী, কিন্তু কাজে তাঁকে অমঙ্গলের ঘরে কোনও মাঙ্গলিক-কার্য্যে যোগ দিতে দিই না। যাঁহারা সংযমে অক্ষুণ্ণ করিয়াছেন বা করিতে সমর্থ তাঁহারা নিশ্চয়ই করিবেন। সংযম ত বাস্তবিক স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বালবিধবার মধ্যে সকলেই যদি এরূপ সংযমে আস্থাবান করিতে সমর্থ বা ইচ্ছুক না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিবাহ দেওয়া কি খুব অন্যায় হইবে? আজ যিনি সধবাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার ভোগবিলাসের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া আছেন, কপাল পুড়িলে পূর্ণ-যৌবনাবস্থায় তাঁহাকে কাল হইতেই আজীবন যোগিনী হইতে হইবে—এরূপ ব্যবস্থা যিনি যেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবেন তিনি করুন। অপরাপর অবস্থায় তাঁহার পুনর্বিবাহ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত, এদেশে না হইবার কারণ কি?

বিপক্ষীয়েরা বলিলেন—তাঁ, বিধবার বিবাহ যে মহাপাপ, কারণ উহা অশাস্ত্রীয়, শাস্ত্রে উহার বারণ।

স্বপক্ষীয়েরা বলিলেন—বলেন কি মশাই? শাস্ত্র কতদূর পড়িয়াছেন? আপনারা প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অপেক্ষা হিন্দুশাস্ত্রে অধিকতর পণ্ডিত না কি?

হাইকোর্টের বিচারপতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্বর্গীয় তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা শাস্ত্র ও আইন-জ্ঞান আপনাদের বেশী না কি? ইঁহারা বাক্যে ও কার্য্যে সপ্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও নিষ্পাপ। ইঁহাদের উপর কথা বলিবার ক্ষমতা হিন্দু-শাস্ত্র ও আইনে অভিজ্ঞ আমাদের কাহারও নিশ্চয়ই নাই। বঙ্গের এই পুণ্যাত্মাক দুই মহাপুরুষদ বাক্য ও কার্য্যে বিধবাবিবাহের তথাকথিত অশাস্ত্রীয়তার আশঙ্কা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে ইঁহারা দুইজনই খাঁটি হিন্দু ও জাতিতে ব্রাহ্মণ,—একজন টোলের পণ্ডিত, অপরজন সংস্কৃতসাহিত্যে সুপণ্ডিত।

বিপক্ষীয়েরা বলিলেন—কিন্তু লোকমত বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে, হিন্দুসমাজে উহা প্রচলিত নহে।

স্বপক্ষীয়েরা বলিলেন—লোকমত এখন বদলাইতেছে। বহু জাতীয় ও মহাজাতির সামাজিক সভা-সমিতিতে অধুনা বিধবাবিবাহের অনুকূলে প্রস্তাব বিশেষ আগ্রহের সহিত গৃহীত হইতেছে। বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভা প্রতি বৎসর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ হইতে নবশাখ জাতির মধ্যে চারি-পাঁচশত বিধবাবিবাহ দেওয়াইতেছেন। আর বাস্তবিক বিধবাবিবাহ যে হিন্দুসমাজে অপ্রচলিত তাহা নহে। পশ্চিমাঞ্চলে বহু অচল জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত। বঙ্গদেশেই উহা নূতন প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বিধবাবিবাহ যে বহুলপরিমাণে প্রচলিত হইতেছে না, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে বিবাহান্তে কন্যার গোত্রান্তর-প্রাপ্তি। বিবাহের পর কন্যা পিতার অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া শ্বশুরকুলের সম্পত্তি হইয়া যায়। বিধবা হইলে অধিকাংশ স্থলেই কন্যা পিত্রালয়ে ফিরিয়া আইলেও সত্য কিন্তু পুনরায় তাহার বিবাহ দিবার ক্ষমতা পিতার থাকে না। সে ক্ষমতা এখন কন্যার শ্বশুর-কুলে বর্ত্তিয়াছে। শ্বশুরকুলের কাহারও এমন মাথা-ব্যথা নাই যে পরের মেয়ের পুনরায় বিবাহ দিয়া তজ্জন্য একটা সামাজিক পীড়ন ও অসুবিধা সহ্য করেন। মেয়ের দুঃখ দেখিয়া বাপ-মায়ের প্রাণ কাঁদিবে, শ্বশুরকুলের কাহারও সে ব্যথা নিশ্চয়ই হইবে না। অথচ তাঁহারাই বিধবার মালিক। কোনও কোনও স্থলে দেখা গিয়াছে যে শ্বশুর কুলের লোকেরা তাঁহাদের বিধবা-বধূর বিবাহের প্রতি-কূলাচরণ করিতেছেন ও ঐরূপ বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য রাজদ্বারে দরখাস্ত পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বিধবার বিবাহ দেয় কে? সেই জন্যই ত বিধবার বিবাহ হয় না। বিধবা-বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় নয় তাহা যথেষ্ট সপ্রমাণিত হইয়াছে।

বিপক্ষীয়েরা বলিলেন—মশাই, এমনই অনূঢ়া কন্যার বিবাহ দেওয়া শক্ত, আবার বিধবার বিবাহ হইলে অনেক মেয়েই আইবুড়ো থাকিয়া যাইবে।

স্বপক্ষীয়েরা উত্তরে বলিলেন—যে দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত সে দেশেও অনূঢ়া কন্যার বিবাহ হইতেছে। বিশেষতঃ বিপত্নীকেরা এখন দশবারো বৎসরের শিশু-কন্যাকে বিবাহ করিয়া নিজেরা বিস্তৃত হইতেছেন ও বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে তাঁহাদের একটা গতি হয় তাঁহারা বয়স্থা স্ত্রী প্রাপ্ত হন। সকল বিধবা ত বিবাহ করিতেছেন না। সকল বিপত্নীকও বিবাহ করেন না। যে স্বল্পসংখ্যক বিধবা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে সে অধিকার প্রদান করিলে অনেক মেয়ে আইবুড়ো থাকিবে না, ইহা সুনিশ্চিত মুসলমান-সমাজে কি মেয়েরা আইবুড়া থাকিতেছে?

স্বপক্ষীয়েরা বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে আরও একটা যুক্তি দেখাইলেন—হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস। দিন-দিন হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে। নানা কারণে উহা হইতেছে। অপর-দিকে মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার একটি কারণ হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের অপ্রচলন ও মুসলমান-সমাজে উহার প্রচলন। হিন্দুদের মধ্যে এমন লক্ষ লক্ষ বিধবা আছেন যাঁহারা পুনর্ব্বিবাহিত হইলে বহু পুত্রকন্যার জননী হইতে পারিতেন—তাহাতে ভারতবর্ষের হিন্দুর সংখ্যা বাড়িত। মুসলমান সমাজে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির ইহা অন্যতম কারণ।

বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা ত শুনিলেন। এখন আপনাদের মত কোন্ দিকে—স্বপক্ষে না বিপক্ষে?

বিবাহ-বিচ্ছেদ :—বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের দেশে স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের অসাম্য দুই হয় আর এক বিষয়ে—

পত্নীত্যাগে। পত্নী নষ্টচরিত্রা হইলে, বা দুশ্চরিত্রের দ্বারা ধর্ষিতা হইলেও স্বামীর ত্যাজ্যা হ'ন। বলিবনা না হইলে বা অন্য কারণে স্বামী স্ত্রী ত্যাগ করিলে স্ত্রী খোরপোষের দাবী করিয়া নালিশ করিতে পারেন। স্বামী অবশ্য যে-কারণেই হউক স্ত্রীত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীর কোনও কারণে স্বামীত্যাগের অধিকার নাই স্বামী দুশ্চরিত্র, বেশ্যাসক্ত হইলেও স্ত্রীর পূজনীয়, উপাস্যদেবতা। হাজার মারধোর লাথি ঝাঁটা খাইয়াও স্ত্রীকে স্বামীর সেবা করিতে হইবে—তাহার পক্ষে স্বামীত্যাগের অধিকারের কথা ত বহুদূরের কথা।

পাশ্চাত্য দেশে এ বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের অধিকার সমান। স্ত্রী অসতী হইলে স্বামী যেমন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে ও অন্য বিবাহ করিতে পারেন, সেইরূপ স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের সহিত একত্র বাস করিতেছেন প্রমাণিত হইলে স্ত্রীও স্বামীকে বর্জ্জন করিতে ও অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারেন এমন কি মারধোর প্রভৃতি দুর্ব্যবহার করিলেও স্ত্রী স্বামীবর্জ্জন করিতে পারেন ও অন্য বিবাহ করিতে সমর্থ। এরূপ ব্যবস্থার ফল এই হয় যে শুধু স্ত্রীই আজীবন সাধ্বী থাকিবেন এমন নহে, স্বামীকেও আজীবন চরিত্রবান থাকিতে হইবে এবং তিনি অপর স্ত্রীলোক বা বেশ্যার প্রতি আসক্ত হইতে পারিবেন না। স্বপক্ষীয়েরা আমাদের দেশেও এইরূপ বিবাহচ্ছেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন এরূপ ব্যবস্থা সমাজে প্রবর্ত্তিত না থাকাতে কলিকাতা প্রভৃতি সহরে রাস্তাঘাটে গলি-ঘুঁজিতে যেরূপ অত্যাচার এবং বহু সংসারে সাধ্বী স্ত্রী চরিত্র, মারধোর, বেশ্যাসক্ত স্বামীর দ্বারা প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইতেছেন। বিপক্ষীয়েরা কিন্তু স্ত্রী কর্ত্তৃক বিবাহচ্ছেদের ব্যবস্থা কাণেই তুলিতে চান না, কারণ বিবাহকালে পিতামাতা কন্যাকে একেবারে দান করিয়া দিয়া থাকেন এবং হিন্দু স্ত্রী কোনও কারণে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারেন না। স্বপক্ষীয়েরা উত্তরে বলিলেন যে পূর্ব্বে ত এরূপ ছিল না। স্বামী মৃত, ক্লীবতাদি স্ত্রীর প্রভৃতি হইলে শাস্ত্রে স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। তখন স্ত্রীজাতির অধিকার এখনকার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত ছিল বলিয়া মনে হয়। আর কন্যা ঘটি-বাটি প্রভৃতি তৈজসপত্রাদি নহে যে কন্যাসম্প্রদান মানে ঐরূপ পদার্থ দান। স্ত্রীজাতিও প্রাণবিশিষ্ট মানুষ। তাহারও অধিকার আছে। নহিলে বিবাহ-মন্ত্রে "যেনেয়ং দুহিতং মম তেনেয়ং দুহিতং তব" প্রভৃতি ভাষা ব্যবহৃত হইবে কেন? অধুনা আমরা স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা ভুলিয়াছি। সেইজন্য তাহাকে নিজের স্থাবরসম্পত্তি করিয়া রাখিতে চাই এবং যদৃচ্ছা উহাকে ব্যবহার করিবার দাবী করিয়া থাকি। তাহার অন্তরের ব্যথা দেখিবার ইচ্ছা নাই, নহিলে বেশ্যাসক্ত মাতাল স্বামী কোন্ লজ্জায় স্ত্রীর পূজা ও সেবার দাবী করিতে পারে? প্রচলিত প্রথা পুরুষের পক্ষে পূর্ণ সুবিধাজনক সন্দেহ নাই। অন্যের কথা এই যে স্ত্রীজাতি শিক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ যেরূপ তাহাদের ন্যায্য অধিকার বুঝিতে পারিতেছেন, তাহাতে সবাক ভয় আছে যে তাঁহারা বিবাহবিচ্ছেদের দাবী নিজেরাই একদিন করিয়া বসিবেন।

স্বপক্ষীয়েরা বড়ই রূঢ় কথা বলিতেছেন। অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়—বোধ হয় ইহাই আপনাদের মত।

বিবাহগত অধিকারের আলোচনা এখানেই শেষ হইল। স্বপক্ষ, বিপক্ষ, উভয় পক্ষই স্বীকার করেন যে স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহগত অধিকারের বৈষম্যের উপরই আধুনিক হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত। স্বপক্ষীয়েরা মনে করেন যে এই বৈষম্য অন্যায় ও অনীতিমূলক এবং সেইজন্য বর্জ্জনীয়। বিপক্ষীয়েরা তাহা স্বীকার করিতে অরাজী।

(ক্রমশঃ)

দোসর

শ্রী সতীশ রায়

(১৯)

স্বধীর চলিয়া গেলে সুরঞ্জন শরীরে টলিতে টলিতে উঠিয়া অশোক আয়নায় নিজের মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—একি তাহার মুখ! তাহার শরীর প্রায় সারিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু রোগের কীটগুলা যেন তাহার মুখের উপরে অসংখ্য পদ-চিহ্ন আঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। কৈশোরের সে সরল দীপ্যমান আভাটি আর নাই। নিজেকেই সেই নিজে চিনিতে পারিল না,—মনে হইল কাহাকে তার দেখাইবার জন্য সে যেন একটা বিকট মুখোস পরিয়াছে। সে মুখোসের ভিতর দিয়া চোখদুইটা কেবল জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে; তাই দেখিয়া এখনো বুঝিবার উপায় আছে,—"হাঁ, এই অশোক বটে।"

সে আয়না মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া দিল। সেগুলি যখন কুড়াইয়া ফেলিয়া দিতে গেল,—মনে হইল যেন শতটুকরা কাঁচগুলি তাহার মূর্ত্তি বুকে ধরিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে! ক্ষোভে নিজের লম্বা রুক্ষ চুলগুলি দুই হাতের মুঠিতে ধরিয়া, সে বিছানায় ফিরিয়া গিয়া বালিশের মধ্যে মুখ লুকাইল—দুঃখে তাহার চোখে জল আসিতেছিল।

মানুষের মুখচ্ছবি স্বর্গীয়। তাহার মনে হইল, কথাটা ভুল। বুকের খাঁচার ভিতর সেই অচিন পাখীটা মাঝে-মাঝে যাওয়া-আসা করে বটে, কিন্তু সুখে নয়। আর যদি কখনো শেফালির সঙ্গে দেখা হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া সে তাহার সামনে এই কদর্য্য কুৎসিত মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবে?—এর চেয়ে যে মৃত্যু ছিল ভাল!

তাহার মনে হইল, যে পৃথিবীর শ্যামলতা সূর্য্যচন্দ্রতারার এমন উজ্জ্বল—প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য যেখানে শেফালির মধ্যে রূপ ধরিয়া উঠিতেছে—সেই সৌন্দর্য্যের অমরাবতীতে তাহার মত কুৎসিতের থাকিবার অধিকার নাই। বিরহী যক্ষের মত এ অলকা হইতে তাহাকে চিরনির্ব্বাসনে যাপন করিতে হইবে। তাহার মন কাঁদিয়া বলিল, "এ জীবন গেল না কেন?" আবার ভাবিল, আয়নায় মুখ দেখি। আচমকা দেখিয়া হয়তো শীতল মনে হইয়াছিল—তেমনটি বোধ হয় না। কিন্তু আয়না সে ভাঙিয়াছে। কেন সে ভাঙিল? না তা সে ভালই হইয়াছে। তাহার মনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ নিজের আকৃতি দেখিয়া বড় আহত হইতেছিল—সে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেছিল! আয়নাটা কাছে থাকিলে ভাবনা-চিন্তার বেদনায় সে পাগল হইয়া যাইত। আপদ গেছে!

তার মনখানি যে এখনো তরুণ সবুজ—সবুজের রসধারায় সিঞ্চনে ভালবাসার গোলাপফুলটি এখনো ত শুকাইয়া যায় নাই!

আর কাহারও সামনে যাইতে তার কোনো সঙ্কোচ নাই—কিন্তু শেফালির জীবনের পথ হইতে সে যেন দূরে সরিয়া যায়। সুন্দরের সামনে অসুন্দরের যে বড় লজ্জা করে। নিজে সুন্দরতর না হইলে যে সুন্দরকে সেবা যায় না,—আর তাহা হইলে হয়ত তার সৌন্দর্য্যের মধুর স্বপ্নটি ভাঙিয়া যাইবে। ভালবাসা পাইয়া হারানো যে বড় মর্ম্মান্তিক। হঠাৎ তাহার মনে হইল, মানুষের এতবড় জীবনটা কি কেবল একখানা সুন্দর মুখের উপর নির্ভর করে? হয়, খানিকটা করে বৈকি! মনে পড়িল সে একদিন লিখিয়াছিল, "এই পৃথিবীতে সুন্দর হ'য়ে ওঠার সাধনার মত আর কোনো বেশী দরকারী কাজ থাক্ত পারে না।" কিন্তু কৈ নাত? বাহিরের পৃথিবীতে এতবড় একটা কাজের ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তার বয়স অল্প, কত জনের ঋণভার সে জন্ম থেকে কাঁধে করিয়া রহিয়াছে, তার এককণিকাও সে শোধ দেবার চেষ্টা করে নাই। কর্ত্তব্যের তার চোখ বুজিয়া এতদিন ধরিয়া সে ত কেবল স্বার্থপরের জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে! শীঘ্র, খুব শীঘ্র আমাদের এই অল্পদিনের জীবন শেষ হইবে। আমরা আমাদের জীবনের ঘটনা লইয়া পৃথিবী হইতে অপসারিত

হইয়া যাইব। অগণিত মানব যাহা জীবনের আনন্দস্রোতে যাত্রাপথ মুখরিত করিয়া, আমাদের সঙ্গে যাত্রারম্ভে সমভূমি করিয়া চলিয়া যাইবে। এ জীবন-যাপন করিয়া লাভ কি? যদি না আমরা কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম করি, যদি না এই বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ পৃথিবীকে,—আমাদের চলিয়া যাইবার পর যাহারা এখানে বাস করিতে আসিবে, তাহাদের মঙ্গলের জন্য মহত্তর পৃথিবীতে পরিণত করিয়া যাইতে পারি?

অশোকের হতাশ মন নবোৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেকালের সাধারণ প্রেমের পাশে, সমস্ত ভাবীযুগ পৃথিবীর কৃতজ্ঞতা কল্পনা করিয়া, সে এক বিরাট আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু গৌরব কি প্রেমের আসন অধিকার করিতে পারে? উত্তেজনা কাটিয়া গেলে আবার তাহার মন অবসাদে ভরিয়া পড়িল। আচ্ছা, সেকালে কি তাহার অসুখের কথা জানে না?—মনে হইল যেন একযুগ সে তাহাকে দেখে নাই।

খুট করিয়া একটি শব্দ হইল—দরজা সরাইয়া সুধীর ঘরে প্রবেশ করিল।

সে অশোককে নিঃশব্দে অভিনিবেশে পর্যবেক্ষণ করিতে দেখিয়া বলিল, "এমনের মুখে বেড়াচ্ছ কেন? ডাক্তারবাবু ব'লে গেছেন বাধ্যতিক বিশ্রাম করতে। শরীরে বল পাবার আগে এত চঞ্চল হ'লে তুমি ত শীঘ্র সুস্থ হ'তে পারবে না।"

অশোক বলিল, "ও কথা থাক্, দেখ তোমার হাতখানা, (তাহার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া) তুমি কি আমাকে সত্যি ভালবাস বন্ধু! আমার এই রোগাবস্থত, কুৎসিত মুখ দেখে তোমার কি ঘৃণা হয় না? সত্যি ক'রে বল!" অশোক সুধীরের মুখের পানে মিনতি-করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

সুধীর তাহার হাতে একটু চাপ দিয়া হাসিয়া বলিল, "হারি মেন্টিমেন্টাল তুমি! কেন, তোমার কি তাতে সন্দেহ হয় নাকি? তুমি ত জান, অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তনেই প্রকৃত ভালবাসা হ্রাস বৃদ্ধির না।"

"তোমার ঋণে আমি বেঁচে উঠ্‌ছি। কিন্তু এ জন্যে মোটেই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হ'তে পারছি না। মনে হ'চ্ছে না বাঁচলেই পারতে—"

"তোমাকে ত আমি বলা করিনি ভাই, যে তুমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবে? দু'টোই ভালবাসার কাছে খুব ছোট জিনিষ। এ সব ক্ষুদ্রতা নীচতার ঢের উর্দ্ধে আমাদের দুজনার বন্ধুত্ব—নয় কি?"

সুধীরের তীক্ষ্ণ চোখে মেহের মত হাসিভরা কোমল দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।

"এ জীবন আমার আর কোনো কাজে লাগ্‌বে না ভাই! আমি আমার জীবন-যাপন শেষ করেছি। এটা যদি তোমার কাছে এত মূল্যবান হয়, তবে তোমার যে-কোনো কাজে এটাকে লাগাতে পার।"

সুধীর হাসিয়া বলিল, "একটা জিনিষকে তুমি দু'বার দান করতে পার না। তিনি যদি আমার দাবী মেনিয়ে অনধিকার প্রবেশের নালিশ করেন,—তখন আমি ঠেকাব কি ক'রে?"

অশোক ম্লান হাসিল। হাসি দেখিয়া মনে হইল এ যেন সকল সুখ-আশা যে শ্মশানে শেষ হইয়া গিয়াছে সেই চিতার আগুনের লাল আলো!—সে শিহরিয়া উঠিল। বলা, কথাটা ছেলেমানুষের মত মোটেই ভাবিয়া বলে নাই।

অশোক তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অন্যকথা পাড়িল—লজ্জিত সুধীরও সেই কথার অবতারণা করিতে লাগিল।

অশোক বলিল, "তোমাদের মিটিংয়ে যাবার জন্য আমি কতদিন এ্যাপ্রুভ প্রকাশ করেছি। কোনোদিন তুমি সে কথায় সে রকম কাণ দাওনি। বন্ধুর কাছে কি কিছু গোপন করতে আছে ভাই?"

তাহাকে খুসী করিবার জন্য সুধীর একটু রহস্য করিয়া বলিল, "সেটা যদি কেবলমাত্র আমার বিষয় হোত তা-হ'লে তোমার কাছে গোপন করবার কিছুই থাকত না। কিন্তু সেটা ত নয়ের।"

"তা' কে কি আনি তোমাদের সেবা-সংঘের সেবার হব।"

সুধীর গম্ভীর হইয়া বলিল, "সেখানে সকলেই এক উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী বটে কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না। মুখে মুখোস প'রে যেতে হয়।"

"অদ্ভুত!—অদ্ভুতে কাণ্ড ব'লে মনে হচ্ছে!"

"না অদ্ভুত নয়, ভবিষ্যতের জন্যেই তার সমস্ত আয়োজন।

তুমি নিজেকে দিতে চাইছিলে, বাস্তবিক তুমি যদি তা' দিতে পার, ত দেশমাতার জন্য যাও। চল, দিনকতক পরে তোমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে মেধায় ক'রে দিয়ে আসি। এ সেবা-ব্রতের মধ্যে গেলে তুমি জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্ট অভাবঅভিযোগের কথা ভুলে যাবে। মানুষের মনের এমন কোনো দীক্ষা নেই যা' কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকলে নিরাময় হয় না।"

"কিন্তু সুধীদা পন্থা কেন? পাশ্চাত্য-জগতের গুপ্ত-সম্প্রদায়ের মত কেমন যেন একটা বিপ্লবের আভাস পাচ্ছি—মনে হ'চ্ছে।"

সুধীর গম্ভীরভাবে বলিল, "মুখের চেহারা আমাদের বড় misled করে। চিন্তা করবে মাথা, প্রেরণা দেবে হৃদয়, কাজ করবে হাত,—ব্যস্ চুকে গেল। এ ত আর আমাদের সামাজিক বৈঠক নয়, যে দুটো খোসগল্প ক'রে চ'লে আসব!"

দিন কতক পরের কথা, অশোক ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল। এখন সে সকালে বিকালে খুব খানিকটা বেড়াইয়া আসে। শরীরে বলও পাইতেছিল। একদিন সুধীর বিকালের দিকে আসিয়া বলিল, "চল আজ—"

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর সুধীর বলিল, "আর যেতে হবে না, এইখানেই।"

অশোক অবাক হইয়া বলিল, "মুশোস কই?"

সুধীর হাসিয়া বলিল, "ও তোমাকে অমনি ব'লেছিলাম। তুমি কি বল, শুনবার জন্য।"

অশোক কৃত্রিম রাগ দেখাইতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তারি অন্যায় তোমার! আমি রাশিয়ার নিহিলিষ্টদের মত বিপ্লবের কি একটা রহস্যময় গুহা আছে যাচ্ছি ব'লে উদ্দাম কল্পনায় মনকে adventureএর জন্য প্রস্তুত ক'রে এনেছিলাম—তুমি আমার সে স্বপ্ন একেবারে ভেঙে দিলে।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

"তবে বিপ্লবের পথ রুদ্ধ, আমাদের ত আর তা' ভবে একেবারে যে কুসুমিত, তাও ঠিক বলা যায় সভাপতির সহিত নূতন করিয়া পরিচিত হইবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না। কারণ তিনি তাহাদের পূর্ব-পরিচিত প্রফেসর হরমোহনবাবু। তিনি অশোককে নিকটে ডাকিয়া সে এখন কেমন আছে, তাহাকে এ-সভায় যোগ দিতে দেখিয়া তিনি খুব খুশী হইয়াছেন, প্রভৃতি মত প্রকাশ করিলেন।

হরমোহন বাবু সভার কার্য আরম্ভ করিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমরা এ সভায় কেন সমবেত হয়েছ, তা' সকলেই জান। কিন্তু আমার মনে হয়, এই সম্মিলনের উদ্দেশ্যটা তোমাদের অনেকের নিজের কাছে তেমন পরিষ্কার হয় নি। বিশেষ ক'রে আজ আমরা একটি নূতন সহকর্মী পেলাম,—আমাদের বলবৃদ্ধি হ'ল। নিজের ওপর তোমরা একটা অসীম শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস রেখ। ক্ষুদ্র তুমি না থাকলে এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকত না এটা যেন মনে থাকে। হাঁ, আমি বলছিলাম, এ সভার সম্মিলনের উদ্দেশ্যটা কি। তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে অতিক্রম ক'রে তোমাদের মনে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য একটা বিরাট ক্ষুধা জাগিয়ে তোলা এ সভার উদ্দেশ্য। যে জীবন সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন—সে নিজের আত্মার কল্যাণ-কামনাতেই থাকুক বা ঘরসংসারের স্বার্থপর সুখসম্ভোগেই লিপ্ত থাকুক—সে জীবন পশুর জীবনের চেয়ে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ নয়।"

তাঁহাকে বাধা দিয়া সুধীর উঠিয়া বলিল, "আপনার এই বিশ্বমানব কথাটা আমাদের অধিকাংশের কাছে বড় abstract. যে ব্যক্তি নিজের মা'কে ভালবাসতে পারল না, তার পক্ষে সকল নারীর মধ্যে মাতৃত্বের বিকাশ দেখা অসম্ভব। আমাদের নিজের দেশের কল্যাণ কামনায় ত্যাগ-স্বীকারে অভ্যস্ত না হ'লে, তার অভাব-দুঃখ-মোচনের মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে না পেলে আমরা কি ক'রে বিশ্বপ্রেমে পৌঁছব? মনের আদর্শ অন্তরেতেই হওয়া চাইত, যেটুকু কাজ আমরা তার অনুসরণে করতে পারি, সেইটুকুই না হয় এগিয়ে গেলাম।"

হরমোহনবাবু আলোচনাটির একটু মোড় ফিরাইয়া দিলেন, "সকলের সহযোগে আমাদের দেশের যতখানি উন্নতি হয়, আমি ততখানি কামনা করি। কারণ প্রকৃত স্বাধীনতার পথে কোনো জাত একলা যেতে পারে না।

দেহের কোনো অংশ অন্য সকল অংশের সহযোগিতা ছেড়ে দিয়ে, অনাবশ্যক স্থূল বা সূক্ষ্ম হ'য়ে উঠ্‌লে, যেমন তা' স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা যায় না—মানবসমাজ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।"

সুধীর বলিল, "সেই জন্যেই আমাদের সেই স্বাধীনতার প্রয়োজন যা' জগতের সকল জাতির সঙ্গে আমাদের একটা সহজ যোগ আনে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের লোকের দেহমন পীড়িত। যে দেশে একসময়ে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত, সেখানে এখন আট টাকাতেও এক মণ চাল পাওয়া যায় না। মানুষের মনের আনন্দ,—যা' জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে জয় ক'রে নেবার সঞ্জীবনী-সুধা যোগায়,—অভাব তা' শুষে ফেলেছে। সেই দুঃখপীড়িতের কানে আপনি যখন বিশ্বপ্রেমের কথা বলেন তখন সেটা উপহাস ব'লে মনে হয়। কারণ ওটা আমাদের বর্ত্তমান অভাব-ক্লিষ্ট দেশের মনের মাটিতে মূল বসাতে পারে না।—ওটা আপনার দার্শনিকতা, ভাবুকতার আকাশ-কুসুম'—মনের কল্পনা-বিলাস!"

তার মতকে খাড়া করাইবার যুক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া, হরমোহনবাবু গম্ভীরভাবে ব্রাউনিংয়ের কবিতার ঠেকো দিলেন,

"Ah, but a man's reach should exceed his grasp,
Or what's heaven for?

সুধীর হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আমরা যে এখনো আমাদের মাটিকেই আঁকড়ে ধরতে পারছিনে।—স্বর্গ সে ত অনেক দূরের কথা। এখনি অন্ন-সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রবল সমস্যা হ'য়ে পড়েছে; আর দিনকতক পরে যে আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাব—যখন আমাদের দেশের টাকায়, আমাদের দেশের উৎপন্ন দ্রব্যে বিদেশবাসীরা নবাবী ক'রে বেড়াবে।"

"তা প্রতিরোধ করতে গেলে আত্মিক প্রতিরোধ অবশ্যই বস্তুর আক্রমণকে বস্তু দিয়েই বাধা দেওয়া যায়—তার দিকে হয় না। সেই জন্যে আমাদের নৈষ্কর্মিকেরা কুকুরের ব্যবস্থা মুক্তির করেছেন—"

অশোক বাধা দিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমরা জীবন-যাত্রা কথাটির সঙ্গে পরিচিত; জীবন-সংগ্রাম ওটা পশ্চিমের কথা। এই সংগ্রাম ক'রে ইয়োরোপ আমাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের মনের শান্তি নষ্ট করছে, আমাদের সুখের বাসা ভেঙে দিয়েছে। জীবনের ধন্দা-বস্তিতে আমরা আর এই প্রবল প্রতিপক্ষের কাছে টিকে থাকতে পারছি না। এ দেশে নানা বিলাসোপকরণ ঘুগিয়ে আমাদের সরল জীবনযাত্রাকে ক্রমশঃ ওরা জটিল ক'রে তুলেছে। বাঁচবার একমাত্র পথ আছে,—যদি আমরা কৃষকের সেই সরল আদিম জীবন-যাত্রায় আবার ফিরে যেতে পারি।"

সুধীর হাসিয়া বলিল, "সে ত পালিয়ে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা, যা' হুড়মুড় ক'রে একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে তার ভয়ে; কুকুর-তাড়ানো নিরুপায় বরগোস গর্ত্তের মধ্যে যেমন মুখ গুঁজে, চোখ বুজে ভাবে এ যাত্রা সে বেঁচে গেল!"

সকলে হাসিয়া উঠিল, কেবল হরমোহনবাবু হাসিলেন না। তিনি বলিলেন, "অশোক, তুমি ঠিক-ই বলেছ। মৃত্যুর মধ্যে আমাদের যে পরম সম্পদ লুকানো আছে, আমরা যদি তার সন্ধান পাই তাহ'লে বেঁচে যাব। আমরা দেখছি, আজ পৃথিবীর ঘরে ডাকাতি ক'রে ইয়ুরোপের দেহ অসম্ভব স্থূল হ'য়ে পড়েছে—সেটা ঠিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। তাদের অন্তর যুদ্ধুর হ'য়ে রয়েছে। আর ভারতের গোপন ভাণ্ডারে তার বাঁচবার সেই অমৃত আছে। ভারত যেদিন সেই পরমার পরিবেশন করতে পারবে, সেদিন সে দিনতার মত মুক্তি পাবে; এই বোধ হয় বিধাতার বিধান। কিন্তু সেই শুভ অমৃত অন্বেষণ এবং অর্জ্জন করবার মত পরক্ষ কে আছে তোমাদের মধ্যে?"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

কৃপণ

শ্রী সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ছিল সে কৃপণ,—
যে ক'রেই হোক জমাবে সে টাকা
করেছিল পণ।
খেতো সে অল্প,—
কি যে খেতো, তা সে বললে তাও বুঝি
করবি গল্প!
বিশ্বাস তোরা কর্ বা না কর্,
ইচ্ছে ক'রে সে চালের সঙ্গে
মিশাত কাঁকর—
পাছে বেশী খায়!
পাছে বেশী খায়
সেই ভাবনায়
তরকারী মাঝে বেশী ক'রে দিত
লঙ্কা ও নুন;—
এত তার গুণ!
তরকারী?—তাও শুধু দেখো কচু,
আর ঘুনো শাক।
ন্যাকড়া কুড়িয়ে সেলাই ক'রে সে
করতো পোষাক।

এমনি ক'রেই কাটিয়ে দিল সে
করেক বছর।
যাক্,—তারপর
ক্রমে গেল শোনা
এতদিন ধ'রে জমাল সে নাকি
একহাল সোনা।

ন্যাকড়া কুড়িয়ে সেলাই ক'রে সে করতো পোষাক।

বড় সাবধানে!
সদা ভয় তার, পাছে কেউ তার
পায় সন্ধান।
একদিন সেবে
জরুরী কাজেতে ডাক হ'ল তার
বহুদূর দেশে।

ভয়ে ভাবনায়
ঘুম ছুটে যায়,—
সোনার ডালটা রাখে সে কোথায় ?
সাথে নিতে ভয়—
চোর ডাকাতেতে যদি কেড়ে লয় ?
বহু ভেবে পর
খুঁড়ে' তার ঘর
অতি সাবধানে রাখলো সে তারে
মাটির ভিতর

"বৃথা সন্ধানে,—সোনাটুকু মোর রাখিনি এখানে।"

তবু ভয় প্রাণে !—
কোনরূপে যদি কেউ কোথা হ'তে
সন্ধান জানে ?
ভাবে বসি' ফের,—
কি কর্‌লে পরে আর কেউ কভু
পায় নাক টের ?
অবশেষে তার
মাথায় জোগাল কল্পী অপার ;—
খুঁড়েছিল যেথা সে মাটির 'পরে
লিখে রাখলো সে বড় অক্ষরে

"বৃথা সন্ধানে,—
সোনাটুকু মোর রাখিনি এখানে।"
খুসী-মনে শেষে
গেল সে বিদেশে।

পাশের বাড়ীতে প্রতিবেশী তার
নাম 'ছল তার 'মোনা পোদ্দার',
এ বাড়ীতে তার ছিল আনাগোনা
জানা ছিল তার কৃপণের আছে
একডাল সোনা।
সন্ধান-তরে
সন্ধ্যার পরে
একদা সেদিন এল সে সেথায়
কৃপণের ঘরে,
চুপি চুপি একা।

"নেয় নাই সোনা ও বাড়ীর মোনা।"

খুঁজতে খুঁজতে দেখল সে সেই
কৃপণের লেখা ;
লেখে' তো তখুনি খুঁড়ে সেই স্থান
পেয়ে গেল 'মোনা' সেই সোনাখান ;
পকেটেতে রেখে'
চারিদিক দেখে'

আমার সেখানে ভেবি ক'রে সে
দিল মাটি ঢেকে।
স্থির নয় তবু তার মন—
সন্দেহ পাছে করে সে কৃপণ?
ভেবে সেই কথা
লিখে দিল তথা—
"নেই নাই সোনা
ও-বাড়ীর 'ঘোনা'।" *

চন্দ্রকুমারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সন্তোষকুমার সরকার

বেচারী গয়লানীর কথা অনেকদিন শুনিনি। মেয়েটিকে হারিয়ে পর্য্যন্ত সে একরকম পাগল হ'য়ে গেছল। তার এক বোন—এই রাজার রাজত্বে বাস করতো। সে ছিল গয়লানীর ছোট বোন। বড় বোনের এরূপ অবস্থা শুনে সে একদিন তাকে নিজের কাছে আনলে। সে অবধি সে ছোট বোনের কাছে আছে।

একদিন গয়লানী তার দুধের ভাঁড়টিকে নিয়ে ফিরছিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। যেমনি রাজার আমবাগানের তলায় এসেছে—অমনি আমটি তার খালি ভাঁড়ে টুপ ক'রে প'ড়ে গেল। গয়লানী শব্দ শুনে ভাঁড়ের ভেতর হাত দিয়ে দেখলে—রাজার গাছের আম। সে আগে এই আমের কথা শুনেছিল। তার প্রাণ ভয়েতে কেঁপে উঠলো—যদি কেউ দেখে ত তার নিস্তার নেই। কিন্তু ভয়টা অনেক কষ্টে দমন ক'রে সে যত শীগ্‌গির পারলে বাড়ীর দিকে চ'লে গেল। যখন বাড়ীতে পৌঁছল তখন রাত হ'য়ে গেছে। ছোট বোনকে একলে দেখে সব কথা বললে। ছোট বোনও ভয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। তারপর তারা যুক্তি করলে, সকাল হ'লেই আমটিকে খেয়ে ফেলবে—রেখে কাজ নেই।

কোন রকমে ভয়-ভাবনায় রাতটুকু তাদের কেটে গেল। সকালে উঠেই গয়লানী যেমন ভাঁড়টির কাছে গেল—অমনি শুনতে পেলে সেই ভাঁড়ের ভেতর যেন কে কাঁদছে—ছোট শিশুর কান্নার মতন! সে ত অবাক। দেখতে পেলে ভাঁড়ের ভেতরে একটি ছোট মেয়ে। আর ব'লে কোন জিনিষই নেই। সে মেয়েটিকে কোলে ক'রে নিয়ে ছোট বোনের কাছে ছুটে' গেল। ছোট বোনও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। এমন ব্যাপার সে কখনও দেখে নাই। গয়লানী বললে, "বোন! আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে ভগবান আমার দুঃখ দেখে একে পাঠিয়ে দিয়েছেন—এ সব তাঁরই খেলা!"

তারপর দেখতে দেখতে মেয়েটি বড় হ'য়ে উঠলো। রূপ যেন ফেটে পড়তে লাগলো। গয়লানী তার নাম রাখলে "ফুলকুমারী"।

এর কিছুদিন পরে—একদিন রাজা ঘোড়ায় চ'ড়ে গয়লানীর বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ফুলকুমারী তখন রাস্তার ধারের কুয়ো থেকে জল তুলছিল। রাজা তাকে দেখেই অবাক হ'য়ে গেলেন—ঠিক যেন চন্দ্রকুমারীর মতই তার রূপ! রাজা ঘোড়া থেকে নেমে পাহারাদারের কাছে এগিয়ে এলেন। ফুলকুমারী রাজাকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি জল নিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। রাজা গয়লানীর বাড়ীর কাছে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে, "কে আছ?—দরজা খোল!" গয়লানী দরজা খুলে দিলে—সে দেখলে একজন লোক দাঁড়িয়ে। রাজা ব'লে চিনতে পারলে না। কারণ রাজা তখন সওদাগর-বেশে; দেশবিদেশ ভ্রমণ ক'রে বাড়ী ফিরছিলেন। চন্দ্রকুমারীকে হারানর পর তিনি বড় বেশী নিজের দেশে থাকতেন না;—মনকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্য এদেশ ওদেশ ঘুরতেন। গয়লানী সওদাগরবেশী রাজাকে দেখে বিরক্ত হ'য়ে বললে, "আপনি ত' আচ্ছা লোক! দরজা ঠেলছেন কেন? আপনার কি দরকার?" রাজা বললেন, "আমি আমার স্ত্রীকে দেখেছি—এইমাত্র তোমার বাড়ীতে ঢুকেছে। আমাকে বাড়ীর ভেতর যেতে দাও!" গয়লানী হেসে বললে, "আপনি নিশ্চয় পাগল। যে মেয়েকে

* বিষয়টি চীনে গল্প হ'তে নেওয়া হয়েছে।

বাড়ীর ভেতর ঢুকতে দেখেছেন—সে আমার মেয়ে। আপনার স্ত্রী কি হুকুম!" গয়লানী আর কিছু না ব'লে দরজা বন্ধ ক'রে বাড়ীর ভেতর চ'লে গেল।

রাজা কিছুক্ষণ হতভম্ব হ'য়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন—হয় তো তাঁর ভুল হ'য়েছে। কি আর করবেন?—অতি দুঃখনে ঘোড়ায় চ'ড়ে ধীরে ধীরে চ'লে গেলেন।

তারপর রাজার একদিন কি মনে হ'ল। চন্দ্রকুমারীর চাকরাণীকে কারাগার থেকে মুক্ত করলেন। তাকে বললেন—সেই গয়লানীর বাড়ী যাবার জন্যে। আর সব ঘটনা খুলে বললেন চাকরাণী তখন গয়লানীর বাড়ী গিয়ে তার সঙ্গে সখী পাতালে। কথায় কথায় চন্দ্রকুমারীর সব বৃত্তান্ত বললে।

এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন গয়লানী রাজার আসের কথা বললে। এই কথা শুনে চাকরাণী খুব আনন্দিত হোল। সে ভাবলে, নিশ্চয়ই ছোট রাণী এ বাড়ীতে আছে। গয়লানীকে বললে, "দিদি! তুমি কি তোমার মেয়েকে তার জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করেছ?" গয়লানী বললে—"না, আমি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিনি।" চাকরাণী বললে, "দিদি তাকে আজই—এখানে ডেকে জিজ্ঞাসা কর'না—নিশ্চয়ই সে সব কথা বলবে।" কুলকুমারীকে ডাকা হ'ল। গয়লানী বললে, "মেয়ে, তুমি কে জানবার জন্যে আমার বড় আগ্রহ হ'য়েছে—তুমি আমার মেয়ের মতন। তুমি আগে কার মেয়ে ছিলে—আর কেমন ক'রেই বা এখানে এলে আমায় বল।"

কুলকুমারী বললে, "মা! আমি আজ তোমাকে আমার জীবনের কথা সব বলব। আমার আসল মা'ও একজন গয়লানী ছিল—অনেকটা তোমার মতন। আমি যখন খুব ছোট, মা রোজই আমায় নিয়ে দুধ বেচতে যেত। একদিন এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়—একটা মাঠের ধারে আমাকে শুইয়ে মা আমার পাশে ঘুমিয়ে পড়ল। একটা ঈগল পাখী তখন আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আমায় দেখে ঠোঁটে ক'রে কুড়িয়ে উড়ল। তারপর সেই ঈগল পাখী আমায় মানুষ করেছিল।" এই পর্য্যন্ত শুনে গয়লানী চীৎকার ক'রে বললে, তুমি আমার মেয়ে—আমার আদরের মেয়ে—আমিই সেই গয়লানী—আমিই তোমার মা! ভগবান আমায় হারানিধি মিলিয়ে দিয়েছেন।" কুলকুমারীও গয়লানীর গলা জড়িয়ে বলে, "মা—মা!—তাই নাকি! আমিও আজ বড় খুসী হ'লুম।" তারপর রাজকন্যের নব-বেধা থেকে সব কথা বললে—আরও বলে, "আমি ভগবানের দয়াতে ঐ আমের ভিতর ছিলুম।" চন্দ্রকুমারী মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলে—মা-মেয়ের আনন্দ ধরে না!

চাকরাণী খুব আনন্দিত হ'য়ে রাজাকে বলবার জন্যে ছুটে' গেল।

একদিন গয়লানী ও চন্দ্রকুমারী ঘরের ভিতর ব'সে গল্প কচ্ছিল। গয়লানী চন্দ্রকুমারীকে বলে, "মেয়ে—তোমার রাজাকে দেখতে ইচ্ছা হয় না? তুমি কি তাঁকে ভালবাস না?" চন্দ্রকুমারী মাথা হেঁট ক'রে বলে, "হাঁ মা! ভালবাসি বৈকি! স্বামীকে কে না ভালবাসে?..."

এমন সময়ে—বাইরে খুব গোলমাল উঠলো। গয়লানীর দরজায় কে ধাক্কা মারতে লাগলো। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে দেখে—রাজা দাঁড়িয়ে। রাজা কোন কথা না ব'লেই পাগলের মত ছুটে গিয়ে চন্দ্রকুমারীর হাত ধরলেন—খুব আনন্দিত হয়ে বলেন, "চন্দ্রকুমারী! আজ তোমায় পেয়েছি—আর ছাড়বো না—"রাজা কেঁদেই ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রকুমারীর চোখও জলে ভ'রে গেল।

তারপর খুব ঘটা ক'রে রাজা চন্দ্রকুমারীকে ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি গয়লানীকে অনেক টাকা, জমি দান করলেন। তার দুঃখও ঘুচলো—আর দুধ বিক্রী ক'রে খেতে হোল না।

কিছুদিন পরে রাজা একটা সভা করলেন। সভায় খুলে সকল ঘটনা বল্লেন, সকলে শুনে অবাক হ'য়ে গেল। তারপর বড়রাণীর বিচার হোল—বিচারে তাকে উপরে কাঁটা নীচে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলবার হুকুম হোল।

রাজা চন্দ্রকুমারীকে নিয়ে খুব সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। আবার রাজকার্য্যে মন দিলেন। প্রজারা পূর্ব্বে যেমন সুখে বাস করতো—আবার তেমনি সুখে বাস করতে লাগলো।

আমার কথাটি ফুরোলো।...

সম্পূর্ণ

পাথেয়

শ্রী সেবক

ও অ-সাবধানী অবোধ যাত্রি,
সাবধানে দেখে' চল্ —
তীর্থপুর ?— সে আছে বহুদূর,
ঘুরু-পথ অসরল।
মনের কথাটি মুখে না জানিস্,
ব্যথায় হাসির আড়াল টানিস্,
বন্ধু ?—বন্ধু বড় দুর্লভ !—
ছল খুঁজে' ফিরে খল।
সাবধানে দেখে' চল্॥

বক্ষ-যন্ত্রে যাত্রা-পাথেয়
যতনে রাখিস্ ঢাকি',
বন্ধুর ছলে বন্ধুর-পথে
তস্করে দিবে ফাঁকি।
সমবেদনার চেয়ে অপমান
দু'টি ভালো তোর,—ওরে হতমান,
বাহিরের শত সান্ত্বনা চেয়ে
সত্য প্রাণের বল।
সাবধানে দেখে' চল॥

জগতের ত্রাতা আপনি পরেছে
কাঁটার মুকুট শিরে,—
বেদনার ভারে আনত চলিছে
বিশ্বের পথে ধীরে।
বেদনা—বিজয়-টীকা দেবতার,
অপমান হোক্ কণ্ঠের হার,
আত্মার মান যদি না ঘোয়াস্—
কে কাড়ে তীর্থ-ফল ?
সাবধানে দেখে' চল॥

পূজোর চিঠি

শ্রী দীপ্তি দেবী

ভাই রাণী,

তোর চিঠি পেয়ে যে খুসী হ'লাম সেটা বলা বাহুল্য। আমি ত এই সবে বাড়ী ফিরছি। এতদিন কোথায় ছিলাম জানিস্? দিল্লীতে। বিশ্বাস হয়? না হবারই কথা, আমার মত কুনো বাংলাদেশের মেয়ে যে একেবারে তিন-শো মাইল দূরে পাড়ি দেবে এ কথাটা বড় বিশ্বাসযোগ্য নয়, না? যা হোক, সত্যি গিয়েছিলাম, আর শুধু দিল্লী নয় আগ্রাও দেখে এসেছি। কি কোরে এটা ঘ'টে উঠ্‌ল সেটা শুন্‌লে খুব বেশী আশ্চর্য্য হবি না।

আমার মামাতো বোন সুধীরাদিকে মনে পড়ে? সেই

যিনি বছর দুয়েক আগে বিলেত থেকে ডাক্তার হ'য়ে এসেন। তিনি এখন দিল্লীতে। ফেডী হার্ডিং মেডিকেল কলেজের বড় প্রোফেসর। দিল্লী সহরটা দেখ্‌বার জন্যে তিনি আমায় বহুবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গীর অভাবে যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি। এবার পুজোর ছুটিতে আমাদের কলেজের বিজ্ঞানি দিল্লী যাচ্ছিলেন, এই সুযোগে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। শোভাটাও ছাড়্‌লে না, সেও জুটে গেল।

১২ই সেপ্টেম্বর যাত্রার দিন স্থির হ'ল, কিন্তু তার দুপ্তাখানেক আগে থেকে গোছগাছের যে যে কি ধুম সে আর কি বলি! যা হোক, কোন রকমে বিকেলের এক্সপ্রেসে রওনা হওয়া গেল। কখনও বাড়ী ছেড়ে এমন ক'রে বেরুই নি, কেমন ভয় হ'তে লাগ্‌ল, অবিশ্যি বিজ্ঞানি সঙ্গে থাকলে ভয়ের যে কোন কারণ নেই সেটা বেশ ভাল ক'রেই জান্‌তাম। ভারতবর্ষের কোন দেশ নেই যা তিনি একা না ঘুরে দেখে এসেছেন। একটু সাহস থাকলেই হ'ল।

আচ্ছা, উষাকে মনে পড়ে? সেই গার্ড ইবারের দুই মেয়েটা। সে তার মা'র কাছে এলাহাবাদে যাচ্ছিল এই একই ট্রেনে। ও মেয়েটা যেখানে, সেখানে ভয়ভাবনা, দুঃখকষ্টের জায়গা কোথায়? এত রকমের বাজে গল্প বল্‌তে সুরু কর্‌লে যে হাসির চোটে প্রাণ যায় আর কি। ভাগ্যে আমরা ছাড়া গাড়ীতে আর কেউ ছিল না, তা না হ'লে নিশ্চয় তাঁরা আমাদের জন্যে পাগ্‌লা গারদের ব্যবস্থা ক'রে দিতেন।

এদিকে সন্ধ্যে না হ'তে হ'তেই শোভার খিদে পেয়ে গেল। কি আর করি, টিফিন-বাস্কেটটি বের কর্‌লাম। বাপ্‌রে! মা তাতে এত খাবার ভ'রে দিয়েছিলেন যে আমরা ১০ দিন খেয়েও তা শেষ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌তাম না। একদিকে লুচি, বেগুন ভাজা, ছোকা ইত্যাদি, অন্যদিকে কটি, মাখন, ডিম-সিদ্ধ, আলুর চপ, কাট্‌লেট্ আর ছাই কত কি, রসগোল্লা, সন্দেশের কথা ত ছেড়েই দাও। খুব আরামে ত' খাওয়া গেল, তারপর যে যার ঠাঁইয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। কেবল উষা ব'সে পাহারা দিতে লাগল—ওর আবার নাকি ট্রেনে ঘুম হয় না। আমাদেরই যদা,নিশ্চিন্তমনে ঘুম দিলাম।

চপুরের দিকে উষা এলাহাবাদে নেমে গেল, আমরা তিন জন দিল্লী-যাত্রী হ'য়ে গেলাম। এই সময় একটা মজার কাণ্ড হ'ল। যে ষ্টেশনেই গাড়ী থামে, দেখি একটা পুরুষ মানুষ আমাদের গাড়ীর সাম্‌নে এসে আমাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। প্রথম ভাব্‌লাম বাঙালীর মেয়েদের এ অঞ্চলে বড় বেশী দেখা যায় না তাই অবাক হ'য়ে দেখ্‌ছে: কিন্তু কানপুর ষ্টেশনে এসে যখন গাড়ী থাম্‌ল তখন বুঝ্‌লাম লোকটার মতলব অন্য। আমরা মেয়ে-গাড়ীতে ছিলাম, তাই পুরুষ টিকিট কলেক্টরের জায়গায় একজন মেম এসে আমাদের টিকিট দেখ্‌তে চাইলে, সে যখন আমাদের টিকিট তিনটে পরীক্ষা কর্‌ছে ঠিক সেই সময় পুরুষের সেই লোকটাও ঝুঁকে প'ড়ে আমাদের টিকিট দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে—বিজ্ঞানি'র যেই না তার দিকে চোখ পড়া অমনি তিনি চট্ ক'রে গাড়ী থেকে নেমে প'ড়ে গার্ডকে ডাক্‌লেন, লোকটাও তৎক্ষণাৎ ভীড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল। যে মেমটি টিকিট দেখ্‌ছিলেন তিনি বল্লেন যে তাঁর ধারণা ছিল লোকটা আমাদের পরিচিত, কারণ সে আমরা কোথাকার টিকিট কিনেছি ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন কর্‌ছিল। আমরা যখন বল্লাম যে লোকটা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত তখন ত গার্ড সাহেব গেলেন বেজায় চোটে, সে লোকটাকে খুঁজে বের কর্‌বার কত চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু আর তাকে দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। এর পর থেকে গাড়ী থাম্‌বামাত্র গার্ড সাহেব নিজে এসে আমাদের গাড়ীর সাম্‌নে পাহারা দিতে লাগলেন। তাঁর ভয়ে আমাদের জানালার কাছে কারুরই আস্‌তে সাহস হ'ল না। রাতটা ত' আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাটালাম, ভোরের দিকে গার্ড সাহেব হেঁকে বল্লেন,—"আপনারা প্রস্তুত হ'য়ে নিন, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে দিল্লী সহর এসে পড়্‌বে।" তাড়াতাড়ি বিছানাগুলি বেঁধে ফেলা গেল, সুটকেসগুলোও সাম্‌নে বের কোরে রাখ্‌লাম। মুখে চোখে জল দিয়ে চুলটা একটু ঝাঁচড়ে নিয়ে সাম্‌নের বেঞ্চটিতে বোসেছি আর অম্‌নি কুলিদের চীৎকার শোনা গেল—"দিল্লী সহর, দিল্লী সহর—"সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর গতিও মন্দ হ'য়ে এল। বেশ একটু শীতের বাতাস দিচ্ছিল, আমরা তাড়াতাড়ি ওভার-কোটগুলো পেড়ে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়্‌লাম।

নেয়েই বেশি সুধীরাদি' দাঁড়িয়ে—কতদিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল! ১০।১২ বছর বিলাতে থাকা সত্ত্বেও তাঁর বেশভূষা ইত্যাদির কোন পরিবর্তন হয় নি, বেশ পরিষ্কার বাংলাতেই আমাদের সঙ্গে কথা কইলেন। তাঁকে দেখে মনে হ'ল—ঠিক আমাদের মত নিতান্ত সাধারণ বাঙালীর মেয়ে। কিন্তু কি নিভীক তাঁর চাহনি, কি সুন্দর জ্যোতির্ময়ী চেহারা! বিভাদি' তখুনি আগ্রা যাবেন তাই ষ্টেশনে ওয়েটিংরুমেই ব'সে গেলেন, তাঁর ট্রেন ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এসে পড়বে ব'লে তিনি আমাদের সঙ্গে আর এলেন না, আমরা দু'জন সুধীরাদি'র সঙ্গে চললাম। সেই ভোরের স্নিগ্ধ আলোতে দু ধারে মোটরখানা ম ইলের পর মাইল ছুটে' চলল,—এ যেন স্বপ্ন! কখনও যে চর্মচক্ষে বিরাট আগ্রা দেখব তা ভাবি নি।

"কাশ্মিরী গেট" পেরিয়ে কিছুদূর যেতেই লেডী হার্ডিং-এর সীমা দেখা গেল—কি প্রকাণ্ড ব্যাপার! আর সব-চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে কেবল মেয়েরাই এই এত-বড় কলেজটা চালাচ্ছে, এখানে একটিও পুরুষ-ডাক্তার নেই, বড় বড় অপারেশন মেয়েরাই করছে। সত্যি এসব দেখে মনে হয় এঁদেরই জীবন সার্থক! ইংরেজ, পার্সি, পাঞ্জাবি, বাঙালী, সব জাতের মেয়েরা মিলে এই কলেজ চালাচ্ছে, কি সুন্দর!

সুধীরাদি'র বাংলোটা বেশ বড়, কলেজের ভিতরেই, তবে এটা ছোঁয়াচে রোগীদের জন্যে আগে তৈরী হয়েছিল ব'লে অন্যসব বাড়ীর কাছে থেকে অনেক দূরে। সামনেই মস্ত বড় বাগান, তার নীচেই লাল সুরকি ফেলা রাস্তা, পরে সবুজ ঘাসের লন। এক একটা বাংলো দুজনের ব্যবহারের জন্যে তৈরী, তবে সুধীরাদি'র সঙ্গে যাঁর থাকবার কথা তাঁর সম্প্রতি বিয়ে হওয়ায় তাঁর দিকের ঘরগুলো রাত্রে খালিই প'ড়ে থাকতো। সুধীরাদি' যে এতবড় বাড়ীতে কি ভোরে একা থাকতেন জানি না। রাত্রে তাঁর চাকরটাও কেউ থাকত না, কেবল একজন চৌকিদার পাহারা দিত। আমরা হ'লে কখনই থাকতে পারতাম না—সুধীরাদি' তয় কাকে বলে জানেনই না।

বাড়ী যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় ৯।০টা। নামতেই সুধীরাদি'র মুসলমান খানসামা এসে লম্বা এক সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। লোকটা ২০ বছর এক মেমসাহেবের কাছে কাজ ক'রে ইংরেজি কথাটা বেশ দুরস্ত ক'রে নিয়েছিল, আমা-দেরই সুবিধা হ'ল, এ সকলের লোকেরা আমাদের ভাঙা-চোরা হিন্দুস্থানী ছাপ বুঝতেই পারত না।

স্নানের বন্দোবস্ত আগে থেকেই ছিল, স্নান সেরে চা-টা খাওয়া গেল। সুধীরাদি'র ততক্ষণে কলেজে যাবার সময় হ'য়ে এসেছিল, তিনি চ'লে গেলেন। আমরা এই অবসরে বিছানা বাক্স খোলাপুলি যা করবার ছিল সেরে নিলাম। বেলা ১।০ টার সময় সুধীরাদি' কলেজ থেকে ফিরলেন, হাতে তাঁর এক নিমন্ত্রণপত্র। সুধীরাদি'র এক পার্সি বন্ধু, এখানকারই একজন ডাক্তার, আমাদের তাঁর ওখানে বিকেলে চা খাবার জন্যে ব'লে পাঠিয়েছেন। আসতে না আসতেই নিমন্ত্রণের ঘটা!—বড় মন্দ নয়!

ডাক্তার ওয়াডিয়ার ওখানে অনেক মহিলাদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সকলেই লেডী হার্ডিং-এ কিছু না কিছু কাজ করেন—কেউ বা ডাক্তার, কেউ বা প্রফেসর। অবসরকালে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন, তারপর টেনিস্, গানবাজনা, সাধ্যভোজন, ব্রিজ-খেলা, এসবও চলে, কিন্তু সকালে উঠে তাঁদের কাজের এতটুকুও ত্রুটি হয় না। এসব দেখে আমার বড় ভাল লাগল। আমার ধারণা ছিল যে যে-মেয়েরা রোজগার করে তারা সর্বদাই মুখ ভার ক'রে থাকে, হাসিঠাট্টা, আমোদআহ্লাদ করতে তারা মোটে জানেই না। লেডী হার্ডিং-এর মেয়েরা কিন্তু ঠিক এর উল্টো, কাজের বেলা কাজ, কিন্তু তারপর তাঁরা যথেষ্ট ফুর্তি করেন। প্রায়ই তাঁরা পরস্পরকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতেন, কখন কখন দল বেঁধে বনভোজনে বেরুতেন। মোট কথা, ছুটির সময়টা তাঁরা বেশ আনন্দের মধ্যেই কাটাতেন।

এখানে আসবার আগে বিভাদি' বলেছিলেন লেডী হার্ডিং-এ বড় চুরি হয়। আশ্চর্য নয়, প্রকাণ্ড জায়গা, কতরকমের চাকর-বাকর। সুধীরাদি'কে এই কথা বলতে তিনি ত গেলেন চোটেই। যা হোক, শুতে যাবার আগে সুধীরাদি, আমাদের সব গয়না আর টাকা নিয়ে তাঁর ক্যাসবাক্সে বন্ধ ক'রে রাখলেন। ক্যাসবাক্স আর কিছুই নয়, একটা টিনের

বাক্স তাতে বোধ হয় চার পয়সা দামের এক চাবি! এই বাক্সটা মামাবাবুর কাছে দেখেছিলাম, ওতে তাঁর তামাক, চুরুট, পাইপ, দিয়াশলাই, পেশাদ্ধ দেখবার তাস, ম্যাগেজিন ইত্যাদি সব থাকত। সুধীরাদি' যে কখন এসে ক্যাপবাক্সের পাশে উঠিয়েছিলেন তা' জানতাম না

এদিকে রাত্রে শোবার ঘরে গিয়ে দেখি—ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করবার উপায় নেই সর্ব্বনাশ! যে-সে যে ঘরের মধ্যে ঢুকে আসতে পারে। সুধীরাদি' বলেছিলেন একজন চৌকিদার রাত্রে পাহারা দেয়, ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু তিনিই রক্ষক তিনিই যদি ভক্ষক হন?

যা হোক, কোন রকমে রাতটা ত' কাটান গেল. পরদিন সুধীরাদি' নিজেই বল্লেন,—"দেখ্, ঘরে বড় গরম হয়, রাত্রে বারাণ্ডায় শুবি?" আমরা ত বেঁচে গেলাম। ৩' চারদিন বারাণ্ডায় শুয়ে শেষে আমরা ছোট্ট চারপায়াগুলো একেবারে মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে শুয়ে থাকতাম, কি সুন্দর লাগ্‌ত! চোখ খুলেই উপরে নীল আকাশ, তার বুকে জ্বলছে হীরের টুকরোর মত তারার মালা! আশে-পাশে বড় বড় গাছের ডালপালাগুলো ঝুঁয়ে পড়ে আমাদের ঘিরে থাকত। সুধীরাদি'র ঘরে সব মোটা মোটা বিলিতি কম্বল ছিল সব আমাদের বের ক'রে দিলেন। একটা গেপ, গোটাচেই কম্বল মুড়ি দিয়ে মিথ্যে আরামে ঘুম দিতাম। কোথাও জনপ্রাণী নেই কেবল বারান্দার শেষ প্রান্ত থেকে চৌকিদারের কম্বলের আলোটা দেখা যেত, মনে হ'ত যেন আমাদের দিকে চেয়ে আছে কোন্ দৈত্যের একটা চোখ।

প্রথম ক' দিন কেবল নিমন্ত্রণ খেতে খেতেই কেটে গেল। এদিকে ছুটিও ফুরিয়ে আসছিল দেখে সুধীরাদি' আমাদের দিল্লী সহরটা দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। একদিন বিকালে বেড়াতে বেরলাম। পুরান কেল্লা, হুমায়ুনের কবর, সফদর্‌জঙ্গের কবর, কুতুব মিনার, পৃথ্বীরাজের লৌহ-স্তম্ভ, সব একে একে দেখা হ'ল,—আশে পাশে কত বাদশা-বেগমের কবর। সত্যি, এ সব দেখে মন খারাপ হ'য়ে যায়,—সে মানুষরা সব কোথায়, কেবল তাদের স্মৃতিগুলোই প'ড়ে রয়েছে।

তখন সন্ধ্যা বেশ ঘনিয়ে এসেছে, একে একে তারাগুলো সব ফুটে উঠ্‌ল আকাশের গায়। গাছের আড়াল থেকে শুক্লাতিথির চাঁদ দেখা দিল। কোন সাড়া শব্দ নেই, কেবল দূর থেকে কোন্ এক মুসলমান ফকিরের মুখস্থ করার "আল্লা" নাম বাতাসের সঙ্গে ভেসে এল। কী মধুর, কী শান্তিময়ী সন্ধ্যা!

বাড়ী ফিরে এসে আমরা বার্ত্তা কইলাম না, তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ডাক্তার ওয়াড়িয়া আমাদের বেড়াতে নিয়ে গেলেন। এবার আমরা গেলাম অন্যদিকে। ব্রিজের ধারে ঘুরলাম, রিষ্টটিনি মেমোরিয়াল ও অশোকস্তম্ভ দেখে বাড়ী ফিরলাম।

সুধীরাদি'র আর এক বন্ধু আমাদের ওখ্‌লা দেখিয়ে আন্‌লেন। জায়গাটা দিল্লী থেকে বেশ খানিকটা দূরে। এটা আসলে যমুনার একটা বাঁধ। যমুনাতে তখন বেশী জল ছিল না তবে আগে পাশের বাগানটা দেখ্‌বার মত। একে একে অনেক মোটর এসে জুটল, কতকগুলি সাহেব-মেম গাছতলায় চা খাবার ব্যবস্থা করছেন দেখে আমরা আর সেখানে বেশীক্ষণ রইলাম না

মাসের শেষদিন মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা রাত সাড়ে-নটায় নিমন্ত্রণ করেছিল একটা অভিনয় দেখ্‌বার জন্যে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আবার ছদ্মবেশে আস্‌বার কথা, শুধু তাই নয় যাঁর সাজ সব থেকে ভাল হবে তার জন্যে একটা প্রাইজও ছিল। এদিকে, সুধীরাদি'র মাসকাবারের টাকা ফুরিয়ে এসেছিল, ৩'বার ব্যাঙ্কেও যাওয়া হয়েছিল কিন্তু কি একটা পূজোর ছুটির জন্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। যা হোক, আমাদের কাছে যা টাকা ছিল তাতে বাজারখরচও দু'চারদিন চল্‌ল আবার ছদ্মবেশেরও সব সরঞ্জাম কেনা গেল। বাড়ীর লোকেদের জন্যেও কিছু জিনিষপত্র এই সুযোগে কিনে নিলাম। বাজার কোরে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন হাতে ব'য়ে গিয়েছিল কেবলমাত্র ৫০টি টাকা।

পরদিন রাত্তে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে, পোষাক পোরে, চোখে কালো সাটিনের মাস্ক লাগিয়ে যাওয়া গেল।

সে বেশ ভালই হ'ল। তারপর লেমনেড, কফি, কেক,

চানচুট ইত্যাদি অনেক রকম খাবারেরও আয়োজন ছিল। যখন বাড়ী ফিরলাম তখন রাত দেড়টা। কাপড়চোপড় ছেড়ে, গয়নাগাটি বাক্সে তুলে শুতে শুতে প্রায় দুটো বেজে গেল।

তখনও সকাল হয় নি, হঠাৎ মনে হ'ল মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কে যেন কি বলছে,—প্রথমটা আমাদের বেয়ারার মত ব'লেই মনে হ'ল। প্রথমে ভাবলাম, বেলা হ'য়ে গিয়েছে ব'লে বুঝি তুলে দিতে এসেছে, তাই কোন সাড়া-শব্দ দিলাম না। বেয়ারাটা কিন্তু নড়ে না দেখে বিরক্ত হ'য়ে লোকটাকে ধমকে দেব ব'লে মাথা তুলতেই সে বল্লে—"বিস্ মাতা, বাক্স নেই হ্যায়!" বাক্স নেই হ্যায়? লোকটা বলে কি? কোন্ বাক্সের কথা বলছে? তারপর বুঝলাম ক্যাসবাক্সটা বেয়ারাদের উপর থেকে কে সরিয়েছে!—সর্বনাশ! তাতে যে আমাদের অনেক গয়না ছিল, এ ছাড়া সুধীরাদি'র সব গয়না, দরকারী কাগজপত্র, ৫০ টা টাকাও যে তারই মধ্যে ছিল! মুহূর্তের মধ্যে ঘুম কোথায় পালাল, তাড়াতাড়ি কাপড় তো পোরে নেওয়া গেল, সুধীরাদি' তখুনি পুলিশে খবর দিলেন, আর ব্যবস্থা কোরে দেবেন যাতে কলেজের কোন গেট না খোলা হয়।

বিষণ্ণমনে তিন জনে তিন পেয়ালা চা নিয়ে নাড়া চাড়া করছি এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিলে যে পুলিশের লোক এসেছে—তখুনি ত তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া গেল। কোথায় বাক্স ছিল, কি কি জিনিষ তাতে ছিল ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমরা তাদের বেশ ভাল কোরে বুঝিয়ে দিলাম যে টাকা আমরা চাই না, গয়না-গুলি ফিরে পেলেই যথেষ্ট।

পুলিশের আদেশমত আমরা জিনিষের একটা লিষ্ট্ করতে ব'সে গেলাম। তারা ততক্ষণ আশে পাশে খোঁজা-খুঁজি সুরু ক'রে দিল। সুধীরাদি' লিখতে বসলেন। সোজা বল্লে—"ও দিদি আমার মুক্তর মাফ্‌লারটার কথা লিখতে ভুল' না।"—"তা শুনে আমিও অমনি ব'লে উঠলাম—"আর আমার সেই হীরে-পান্নার ব্রোচটা—" দিদি আমাদের থামিয়ে দিয়ে বল্লেন—"দাঁড়া ছাই, একে একে লিখব ত?—আচ্ছা বলত, পিসিমা যে হারটা দিয়েছিলেন তাতে সবশুদ্ধ কতগুলো মুক্তো ছিল?" এমনি গোলমাল চলেছে এমন সময় বাইরের বারান্দায় কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। সোজা একবার উঁকি মেরে দেখেই ব'লে উঠল —"দিদি ও-ভাই, তোমার সেই মুস্কিলে ফেলাবাটা আবার লাফাতে লাফাতে এদিকে আসছে কেন? সকালে ও-হতভাগাটার মুখ দেখে উঠলাম, উঠেই শুনি গয়না চুরি গেছে, ওকে বাপু বিদায় কর—অলক্ষুণে কোথাকার!"—এমন সময় যার উদ্দেশ্যে গালাগালি দেওয়া হ'চ্ছিল সে নিজেই এসে খবর দিলে যে বাক্স পাওয়া গিয়েছে। হরিবোল! চ'ঘণ্টার মধ্যে কত কাণ্ড হ'য়ে গেল, বাক্স চুরি হ'ল, তখুনি আবার পাওয়াও গেল!

এতক্ষণে পাহারাওয়ালারও এসে পৌঁছেছে, হাতে তাদের সেই বাক্স, কিন্তু বাক্স যে খোলা! যেটুকু আশা হ'য়েছিল আবার ধপ্ ক'রে সব নিবে গেল—খালি বাক্স নিয়ে কি করব? যা হোক, বাক্সর টাকা ত' তোলা গেল —একি ব্যাপার! গয়না সবই ত' রয়েছে। একে-একে সব ভাল কোরে দেখা গেল, তারপর সব তলায় টাকার ব্যাগ ছিল সেটা খুলে দেখি একেবারে শূন্য! গয়নাগুলো ফিরে পেয়ে আমরা এত খুসী হ'য়ে গেলাম যে ৫০৲ টা টাকার কথা মনেই এল না, বরং পুলিশের লোক-দের কিছু বকশিস্ দেবার ছিল না ব'লেই যা দুঃখ। পাহারা-ওয়ালারা এদিকে একগাল হেসে, লম্বা সেলাম ঠুকে জানালে যে আমরা তাদের কাজে খুসী হ'য়েছি সেই তাদের যথেষ্ট পুরস্কার। গয়না পেয়ে আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, সুধীরাদি'ও নিশ্চিন্তমনে কলেজে চ'লে গেলেন।

সেইদিন বিকেলে রমেশদা'র আমাদের এখানে চা খাবার কথা ছিল। রমেশদা' সুধীরাদি'র মাসতুত ভাই, কি একটা ছুটি উপলক্ষে দিল্লীতে এসেছিলেন। সুধীরাদি'র বন্ধু ডাক্তার ওয়াডিয়ার সঙ্গে রমেশদা'র বিলেতে আলাপ ছিল ব'লে সুধীরাদি' তাঁকেও চা খেতে বলেছিলেন। চায়ের আগে সুধীরাদি' আমাদের "মেতর মনতর" দেখাতে নিয়ে গেলেন। এটা একটা "অবজারভেটরী"—জয়সিংহের সময়ে তৈরী। কলেজের খুব কাছে ব'লে আমরা সেখানে ছেটেই গেলাম। চারপাশে কি সুন্দর বাগান, কিন্তু "মনতর মনতরের" উপরে ওঠবার সিঁড়িগুলো কি উঁচু!

দু' এক ধাপ উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই হাঁপিয়ে গেলাম, সুধীরাদি' এদিকে টপ্‌টপ্‌ ক'রে একেবারে উপরে উঠে গেলেন। আমি সিঁড়ির ধাপের উপর বোসে প'ড়ে সুধীরাদি'কে বল্লাম—"দেখ ভাই, আমি যদি আর এক ধাপ উঠি তা হ'লে কিন্তু তোমার ডাক্তারি ব্যাগ খুল্‌তে হবে, ব্রিক্‌নিন ইন্‌জেক্‌শন না দিলে ত' আমার হার্ট ফেল করবে।" হঠাৎ ঐ সময় ঘড়ির দিকে চোখ পড়্‌তে দেখি—চারটে অনেকক্ষণ বেজে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা গেল। দু'জনকে গিয়ে দেখি রমেশদা' আর ডাক্তার ওয়াডিয়া দুজনেই এসে গিয়েছেন। অপ্রস্তুত হ'য়ে সুধীরাদি' তাড়াতাড়ি খানসামাকে চা আন্‌তে হুকুম করলেন আমি তখনও হাঁপাচ্ছিলাম, একে চলা অভ্যাস নেই তাতে সারা পথ প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেছি,—বেচারা সুধীরাদি' এর জন্যে রমেশদা'র কাছে কত বকুনি খেলেন—যদিও তাঁর কোন দোষ ছিল না, তিনি কি ক'রেই বা জান্‌বেন—আমি কত অকর্মণ্য! সহরের মেয়ে আমি, পায়ে হাঁটার অভ্যাস কৈ? আর এই পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে পারি না ব'লেই ত আমাদের জন্য কাজ হ'য়ে ওঠে

নেমন্তন্নবেরা পায়ে হাঁটছে, ট্রামে চড়ছে, বাসে চড়ছে, একা একা যাচ্ছে আস্‌ছে, কোন গোল নেই; আর আমাদের সে জায়গায় কি ব্যবস্থা! ঘরের গাড়ী চাই, ভাড়াটে গাড়ী বা ট্যাক্সি হ'লে সঙ্গে দরোয়ান পাইক পাহারা চাই। এসব লোকদের দিয়ে কতটুকু বা কাজ করান যায়? আমি কিন্তু এবার থেকে লেকের কাছে নেমে রোজ একমাইল কোরে হাঁটব ঠিক করেছি।

যা হোক, পরের কথা পরে, এখন ছুটির কথাটাই লিখে শেষ করা যাক। আমরা ঠিক করেছিলাম ছুটির কথা রমেশদা'কে কিছু বল্‌ব না—উনি অন্যতে বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন কিনা তাই। এদিকে ডাক্তার ওয়াডিয়া ত' আর আমাদের মতলব জানতেন না, উনি কথা-প্রসঙ্গে ছুটির কথা ব'লে ফেল্লেন—সেই শুনে রমেশদা' আমাদের কত কথাই না শোনালেন—"তিনজন মেয়ের যাবার এই বুদ্ধিটুকু জোগাল না যে পুলিসের কাছে টাকা চাই না এ কথা বল্‌তে নেই,—তোমাদের টাকার দরকার নেই তবে সেটা তারা কেন নেবে না?—এ-রকম ক'রে তোমরা চুরির প্রশ্রয় দাও! মেয়েরা আবার ভোট চান? যাক্‌ত যদি ওখানে একজনও পুরুষ মানুষ দেখ্‌তে কেমন না টাকা আদায় হ'ত—"ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা নীরবে সব শুনে গেলাম, কি আর বলা যায়? টাকা গেলে আবার টাকা হবে কিন্তু অতের যে ওয়া জিনিষ একবার গেলে কি আর পাওয়া যায়? এই সামান্য বুদ্ধিটুকু কি আর পুরুষমানুষের মাথায় আসে? ওঁরা কেবল টাকাই চিনেছেন, প্রিয়জনের দেওয়া একটা কাগজের টুক্‌রো যে কত মূল্যবান তা ওঁরা বোঝেন না।

যাক্‌, পরদিন ছিল পূর্ণিমা, ঐদিনই আমাদের আগ্রা যাবার কথা ছিল। আমরা ভেবেছিলাম ট্রেণেই যাব কারণ সুধীরাদি'র মোটরটা কারখানা থেকে তখনও আসে নি। রমেশদা' কিন্তু মোটর ভাড়া কোরে আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। ঠিক হ'ল বেরে বেরে দুপুরে বেরিয়ে বিকালে মথুরায় ডাকবাংলোতে চা খেয়ে সহরটা দেখে নিয়ে রাত ৮।৯ নাগাদ আগ্রা পৌঁছব। সেখানে রমেশদা'র এক ইংরেজ বন্ধুর ওখানে ওঠ্‌বার কথা ছিল, তাঁদেরই ওখানে ডিনার খেয়ে, রাত্রে চাঁদের আলোতে তাজ দেখে বাড়ী ফেরা যাবে। পরদিন ফেরা, সিকেন্দ্রাবাদ, ইংমদউদ্দৌলার কবর দেখে ফতেপুরসিক্রি হ'য়ে বাড়ী ফিরব। চমৎকার ব্যবস্থা!—রমেশদা'কে কি ক'রে যে ধন্যবাদ দেব বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না।

একটা সুটকেসে আমাদের তিনজনের কয়েকখানা কাপড় আর দরকারী দু' একটা জিনিষপত্র পুরে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। ডাক্তার ওয়াডিয়া আমাদের গহনা-গুলো কলেজের লোহার সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখ্‌বার ব্যবস্থা করলেন, অন্ততঃ সে ভরসা না দিলে রমেশদা' আমাদের মোটে নিয়েই যেতেন না।

মোটরখানা বেশ বড়ই ছিল। আমরা চারজন ভিতরে বস্‌লাম, ড্রাইভার আর তার একজন সঙ্গী বাইরে রইল। কি সুন্দর মোটরের রাস্তা! দুধারে মাঠ, মধ্যে দিয়ে লাল রাস্তাটি সোজা চলেছে। রাস্তার দুই পাশের বড় বড় গাছ-গুলো তাদের ডালপালা বিস্তার ক'রে সূর্য্যের প্রখর তাপটা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিল। ধানক্ষেতগুলি তাদের শিশুদের জড়িয়ে ধ'রে কেমন নিপুণ ভাবে এ ডাল

থেকে ও ডানে যাওয়া-আসা করে, একবারও ত' চৈ পড়ে না? মাঝে মাঝে বরমধু বয় দম ঠাহর উড়ে এসে গাড়ীর সামনে যখন দাঁড়িয়ে যেত; তখনকার সে দৃশ্য তোলবার নয়।

প্রায় ৩০ মাইল বেশ আরামে যাওয়া গেল, তারপর হঠাৎ বোমা ফাটবার আওয়াজে বুঝলাম একখানা টায়ার ফাটল। সময় নষ্ট না কোরে বাড়তি টায়ারখানা পরিয়ে নিয়ে যেতে বেশ খানিকটা বেলা হ'য়ে গেল।

তারপর মাইল পাঁচেক বেশ গাড়ী চল্ল, কিন্তু তারপরই আবার একটা টিউব ফাটল। সেটা জোড়বার জন্যে সলিউসন খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল সলিউসন মোটে আনাই হয় নি! কি করা যায়? আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর্‌লাম যদি কোন মোটর এই রাস্তা দিয়ে যায়, কিন্তু একটাও এল না—অবশেষে একজন পাহারাওয়ালা একটা বাইসিকেলে ক'রে এদিকে আস্‌তে তার কাছ থেকে সলিউসন নিয়ে টিউব জোড়া গেল। তারপর বোঝা গেল যে এ গাড়ীর একখানাও টায়ার বা টিউব নতুন নয়! ড্রাইভার টায়ার কি আকেল—৮০ মাইল পথ যাবে, একটা নতুন টায়ার ছেড়ে দাও, সলিউসন পর্যন্ত সঙ্গে আনে নি! হুমেলস্ ত রেগে খুন কিন্তু তখন ত' আর কোন উপায় নেই; অবশেষে আশে পাশে যেসব বড় বড় ঘাস ছিল তাই কেটে নিয়ে টায়ারের মধ্যে পুরে কোন রকমে যাওয়া গেল। সে যাত্রা যে কি সুখের তা বেশ বুঝতেই পার্‌ছিস্? গরুর গাড়ীও বোধ হয় এর চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি যেতে পারে। তার উপর সে কি ঝাঁকানি! হাড়গোড় সব চুরমার হ'য়ে যাবার দাখিল। বিকাল ৪টায় মথুরা পৌঁছবার কথা ছিল, তখন প্রায় ৭টা অথচ মথুরা থেকে আমরা অনেক দূরে। সেই ১টার সময় বেরিয়েছি, সঙ্গে কিছু খাবারও ছিল না, এক পেয়ালা চা-এর জন্যে জিব শুকিয়ে এসেছে! আমরা এই ঘাসের টায়ারে চ'ড়ে আর বেশীদূর যেতে পারলাম না। কাছেই যে রেলওয়ে ষ্টেশন পাওয়া যায় সেইখানেই পৌঁছে দেবার জন্যে ড্রাইভারকে বলা হ'ল। লোকটা এমন বদ, পাছে আমরা ট্রেনে যাই আর তাকে গাড়ী নিয়ে ফিরে যেতে হয় সেইজন্যে সে ব'লে বোস্‌ল যে মোটর আগ্রার পথ ছাড়া আর সে অন্য কোন রাস্তা চেনে না। যা হোক রাস্তার লোকদের জিজ্ঞেস ক'রে প্রায় রাত আটটার সময় মালপত্র সহ একটা ছোট্ট ষ্টেশনে এসে পৌঁছন গেল। ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল যে আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা ট্রেন আস্‌বে, সেটা ৪ঘণ্টার মধ্যে আগ্রা পৌঁছে দেবে। শুনে প্রাণে একটু আশা হ'ল, যা হোক—রাত ১২টার মধ্যেও পৌঁছন যাবে। এদিকে ধুলোতে ত গা মাথা ভরা! বহু কষ্টে ওয়েটিংরুমের দরজা খুলিয়ে, জল আনিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হওয়া গেল। আঃ এ সময় কেবল এক পেয়ালা চা! কিন্তু এ জঙ্গলে চা কোথায়? ষ্টেশনের ধারে একজন পুরী-মেঠাই বিক্রি করছিল বটে তবে আমরা মেঠাইয়ের জায়গায় কেবল মাছিই দেখ্‌তে পেলাম! সেখানকার জলও খেতে সাহস হ'ল না। কিছুক্ষণ পর ট্রেন এসে পড়্‌ল। ষ্টেশন-মাষ্টার বলেছিল যে আমরা ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে আগ্রা পৌঁছে যাব কিন্তু এই ট্রেন ৫ মিনিট অন্তর প্রতি ষ্টেশনেই বোধ হয় ১ঘণ্টা ক'রে দাঁড়াতে লাগল; যখন আগ্রা ক্যান্টনমেণ্টে পৌঁছলাম তখন রাত দুটো! কোথায় গেল মথুরার ভাজাগুলো আর গরম গরম চা, আর কোথায় গেল পূর্ণিমারাতের তাজ!

ষ্টেশনে নেমেই চায়ের জন্যে ছুটোছুটি! রাত দুটোয় চায়ের তাগাদা—লোকগুলো আমাদের পাগল মনে করল! ভোর ছ'টার আগে কেউ চা দিতে রাজি হ'ল না। কি আর করা যায়, সুটকেস মাথায় দিয়ে ওভারকোটগুলোকে বালিশ কোরে ওয়েটিংরুমেই রাত কাটান গেল। এ-রকম ক'রেই মানুষের সব আশা ধূলিসাৎ হয়। যা হোক, এড্‌ভেঞ্চারটুকু মন্দ হ'ল না। সকলেই নিরাপদে মোটরে কোরে দেশ-বিদেশে ঘুরে আস্‌ছে, ক'জন লোক কিন্তু আমাদের মত ঘাসের টায়ারে চ'ড়ে ওয়েটিংরুমে রাত কাটিয়ে তাজের অন্বেষণে বেরোয়? এর মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে তা' স্বীকার কর্‌তেই হবে।

ভোর বেলায় চায়ের ট্রে দেখে সে যে কি আরাম হ'ল সে তোকে আর কি বলব? "চাতালের" হাতে চায়ের বাটি—এ যেন মাতালের হাতে মদের বোতল। যত খাও তত তার কেবল পেট ভরে না হয়। পথশ্রান্ত পথিকের সব ভ্রম, সব ক্লান্তি চায়ের জলে ধুয়ে যাক্!

ষ্টেশনের বাইরে এসেই দেখি এক বাহাদুর আমাদের ন্যাজো গাড়ী দাঁড়িয়ে। টাকা না নিয়ে চার জনে এই গাড়ীতেই উঠে পড়্লাম। কেল্লার সাম্নে এসে দাঁড়াতেই একজন বৃদ্ধ মুসলমান "গাইড" পাওয়া গেল। লোকটাকে দেখে মনে হ'ল যেন কোন পুরুষ ছবির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা হোক, সে ত আমাদের ঘুরে ঘুরে সব দেখালে, দিলদরদ, রংমহল, আঙ্গুরীবাগ, মীনাবাজার সবই একে একে দেখা হ'ল—তারপর মতিমস্জিদ—মতিমস্জিদ দেখাতে গিয়ে বেচারার চোখে জল এসে গিয়েছিল! এই-খানে নবতাজ তাঁর ছেলে মেয়েদের নিয়ে নেমাজ পড়্তেন, বার বার একজা-গায় হাঁটু গাড়ার দরুন পাথরের এক অংশ একটু বেসে গিয়েছিল, সেখানটা দেখে আমাদেরই চোখের জল রাখা দায় হয়েছিল। কেল্লার সাম্নেই যমুনা। দুর্গের মধ্যে দিয়ে যমুনাতে স্নান করতে যাবার কি সুন্দর পথ! আকবর শা তাঁর হিন্দু স্ত্রীর জন্যে এই ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের দেখ্লাম "জ্যাস্মিন টাওয়ার"—এইটাই সাজা-হানের শেষ বন্দী, এইখানেই পুত্রকন্যা কর্তৃক পরিত্যক্ত, দুষ্টিহীন বৃদ্ধ সম্রাট কেবল প্রিয়ার স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে শেষ-নিশ্বাস ফেলেছিলেন! অদূরে নবতাজের মর্ম্মর-চিহ্ন, সাজাহানের "মোতিমহাল",—আর তার পায়ের কাছ দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে যমুনার কালো জল।

কেল্লা দেখ্তে দু'তিন ঘণ্টা কেটে গেল, তারপর কুক-সাহেবের বাংলোর উদ্দেশে যাত্রা। বাড়ী খুঁজে পেতে আরও ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। আমরা কেউই রাস্তা চিন্তাম না, গাড়োয়ানকে ভাল বোঝাতেও পারি নি, সে বেচারা কত গলিঘুঁজি, কত হাটবাজার পার হ'য়ে শেষে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় যখন পৌঁছে দিল তখন বেলা বারোটা। গত রাত্রে না আসার দরুন কুক-এজেন্সি তাবিত হ'য়ে পড়ে-ছিলেন, পরে পথের সব ঘটনা শুনে নিশ্চিন্ত হ'লেন। ড্রয়িংরুমে এসে বস্তেই বেচারা আমাদের জন্যে ঠাণ্ডা কমলা লেবুর সরবৎ এনে দিল। সে যে কি ভাল লাগ্ল কি বলি। তারপর মিসেস্ কুক আমাদের জন্যে যে ঘর ঠিক ক'রে রেখেছিলেন সেইখানে নিয়ে গেলেন

সাদা ধব্ধবে বিছানা, ড্রেসিং টেবিলের উপর চিরুনি, বুরুশ, ক্রিম, পাউডার, অডিকোলন ইত্যাদি সুন্দরভাবে গোছান, একদিকে একটা ছোট টেবিলের উপর একটি ফুলদানীতে একরাশ গোলাপ। বাথরুমের কাছে স্নানের আয়োজনটা কিন্তু খুব। বাটের কাছে টিপয়ের উপর খান-কতক গল্পের বই, ছোট কাঁচের জলের কুজো ও গেলাস। সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমাদের সুটকেস বেয়ারা ঘরে এনে দিয়ে গিয়েছিল, স্নান কোরে সাফ কাপড়চোপড় পোরে একটু বিশ্রামের আশায় বাটের উপর শুয়ে পড়্লাম। খাবার একটু দেরী ছিল কারণ আমরা যে দুপুরে এসে পড়্ব তা' তাঁর জানা ছিল না। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ হ'লেও গরম কমে নি। বিছানায় শুতেই চোখদুটো আপনিই জুড়ে এল, এমন সময় দরজা খোলার আওয়াজ হ'ল, কে ঘরে ঢুক্ছে দেখ্বার জন্যে চোখ খুলে দেখি দক্ষিণ-দিকের বারান্দার দরজাটা খুলে ঘরে ঢুক্ছে একটি মস্ত বড় বাঁদর হনুমান। কিছু না বোলে চোখ বুজে রইলাম, হনুমানটা আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

মিসেস কুক এইবার খাবার জন্যে ডেকে পাঠালেন। খাবার আয়োজন প্রচুর পরিমাণের ছিল আর আমরা তার বেশ সদ্ব্যবহারও করেছিলাম। বিকালে চা খেয়ে কেল্লা নিকেতনাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা গেল। কুক সাহেবের মোটরে কোরে আমরা আকবর শাহের কবর, ইতমদ-উদ্দৌলার কবর ইত্যাদি সব দেখে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন প্রায় তিনটের সময় হ'য়ে এসেছে। রাত্রের খাওয়াদাওয়া সেরে চাঁদের আলোয় তাজ দেখ্তে গেলাম। তাজের কারু-কার্য্যের সৌন্দর্য্য আমার চোখে বিশেষ ক'রে পড়্ল না—এই পাথরের কঠিন বুকের মধ্যে যে নারীর ক্ষুদ্র দেহখানি রয়েছে তারই কথা বার বার মনে পড়্তে লাগ্ল। এখানে সে সম্রাজ্ঞী নয়, সে রাজরাজেশ্বরী নয়, এখানে কেবল সামান্য একটি নারী যে ভালবেসেছিল ও ভালবাসা পেয়েছিল,—এই তার সারা জীবনের ইতিহাস। এই আলো-আলো আধো-আঁধারের মধ্যে শ্বেতপাথরের মস্ত স্তূপে রয়েছে—এই প্রেমময়ী নারীর পার্থিব চিহ্ন। চারিদিক নিস্তব্ধ, আশে পাশের বাউগাছগুলোর কালো ছায়ার মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো উঁকি মেরে যেন কান্নাহাসির সৃষ্টি করছিল। গলা রূপোর মত জ্যোৎস্নার ধারা বুকে নিয়ে যমুনার কালো জল শান্তভাবে ব'য়ে চলেছে। এই সব মিলে যে একটা

তাদের সৃষ্টি করেছিল সেটা দিনের আলোতে কেবল কারুকার্য্য খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে পাওয়া যায় নি। তাজ দেখে আমরা ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করলাম। ট্রেন থেকে অনেকদূর পর্য্যন্ত তাজের চূড়ো দেখতে পাওয়া গেল, তারপর টুণ্ডলা ষ্টেশন। ওঃ কী ভীড়, যেদিকে চাই কেবল চলন্ত মানুষের ছবি, সকলেই গাড়ীতে ওঠবার জন্যে ব্যস্ত. বহুকষ্টে একখানা খালি গাড়ী পাওয়া গেল। রাতটা কাটিয়ে ভোরের দিকে দিল্লী পৌঁছলাম। ষ্টেশনে নেমেই বিভাদি'র সঙ্গে দেখা। তিনি এই দুদিন হ'ল, আগ্রা থেকে দিল্লী এসেছেন। বেশ মজা!—আমরা যখন দিল্লীতে তখন বিভাদি' আগ্রায়, কের আমরা যখন আগ্রা গেলাম তখন তিনি দিল্লী দিয়ে গিয়েছেন। পরস্পরই আমাদের কোলকাতা ফেরবার কথা, সেই সব বিভাদি'র সঙ্গে ঠিক ক'রে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

দিল্লী থাকতে আমরা নেমন্তন্ন খেতেই এত ব্যস্ত ছিলাম যে তখনও পর্য্যন্ত আমাদের দিল্লীর কেল্লা দেখা হয় নি। এদিকে হাতে মোটে এই একটি দিন, তাও আবার রাত্রে রমেশদা'র এক হিন্দুস্থানী বন্ধুর ওখানে ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। তাই চটা না বাজতেই আমরা কেল্লা দেখতে বেরুলাম, পথে জুম্মা মস্‌জিদ্‌ও দেখে নিলাম। সেখানকার একজন বৃদ্ধ মুসলমান আমাদের দেখাবার জন্যে একটা সুন্দর কাজ করা বাক্স আনল, সেটা খুলতেই ফুলের গন্ধ, একরাশ শুকনো গোলাপের পাপ্‌ড়ির মধ্যে একটি মেথী পাতার মত করা চুল রয়েছে, এই নাকি মহম্মদের দাড়ির একটা চুল। সত্যি মিথ্যে জানেন বাপু, লোকগুলো ত' তাই বলে। কেল্লা দেখা শেষ হ'তে প্রায় রাত হ'য়ে এল। নিমন্ত্রণে প'রে যাবার কাপড় সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলাম, তাই লেডী হার্ডিঞ্জে ফিরে না গিয়ে কাছেই রমেশদা-র হোটেল ছিল সেইখানে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় বদলিয়ে মিঃ মোহনলালের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হ'লাম। তাঁর বাড়ী ঠিক যমুনার পারেই, সেখানকার পথটিই বা কী সুন্দর! দু'ধারে গাছের সার, আর পাশেই যমুনা। চাঁদের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল। আমরা ইচ্ছা ক'রেই মোটর ছেড়ে দিয়ে টঙ্গা নিলাম, এই পথে মোটর কেমন আনায় না,—এই সুন্দর সন্ধ্যটাকে মোটরের হুঙ্কারে ভাসিয়ে তোলবার ইচ্ছা আমাদের কারই ছিল না।

মোহনলাল বাবু ত' বেশ সাজিয়েছেন—ইংরেজি ও হিন্দুস্থানী দু'রকমই খাবার ছিল। ইংরেজ সাহেব মেম ক'জনও এই ডিনারে উপস্থিত ছিলেন—আজকালকার প্রথামত ইংরেজমহিলারা সকলেই পানীয় নানারকমের খেলেন, তারপর সিগারেটের ধুম। আমাদের এ সব অভ্যাস নেই শুনে সকলেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। অবশ্য আশ্চর্য্য হবার কি আছে? ইংরেজের যা' ভালগুণ আছে তা' আমরা নিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তা' ব'লে তাদের আচারব্যবহার ও পোষাকপরিচ্ছদের অনুকরণ করবার ত' আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। দুঃখের বিষয় এই যে দু'একজন এই বাইরের প্রলেপ জীবনের বিস্তৃত কর্ত্তব্যের মাঝে যথেচ্ছাচার ব'লে ভেবে নিয়েছেন এবং এইজন্যে এই রকম ভুল ধারণা এইসব মেম-সাহেবদের মনে হ'য়ে গিয়েছে

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলাম। পরদিন সকালটা বাঁধা-বাঁধিতেই কেটে গেল। বিকালে সুধীরাদি'র সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা ক'রে এলাম। যদিও এসব ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছিল কিন্তু তবুও বাড়ীর জন্যে মনটা বেশ একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। যতই বল্, বাড়ী ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও সুখ নেই,—ঠিক না? আচ্ছা, আজ আসি। উত্তর-টুত্তর দিবি ত'?

ইতি—

আভা।

প্রেভোকিয়ার সহধর্ম্মিণী

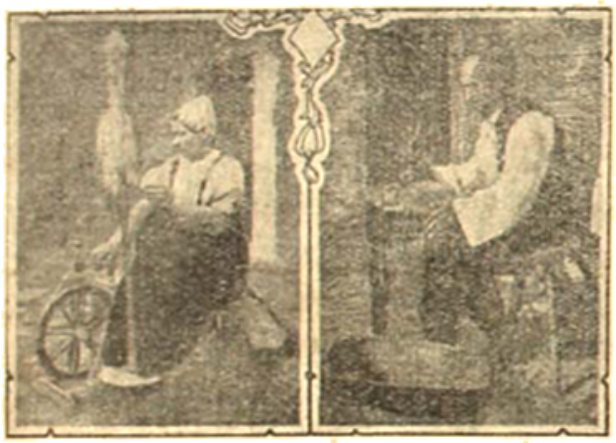

সহধর্ম্মিণী

স্বামী সমস্ত দিন সাংসারিক সকল প্রয়োজনীয়তা মিটাইয়া থাকেন স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া ; স্ত্রী শুধু রান্না-বান্না প্রভৃতি সাধারণ গৃহস্থালীর কাজই নয়, গৃহজাত পশম হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া, সূতা হইতে বস্ত্র, বস্ত্র হইতে পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া থাকেন স্বামীর জন্য এবং সমস্ত পরিবারের জন্য। স্ত্রী কিন্তু নিষ্কর্ম্মা নহেন।

বাঙালী গায়িকা মিস বীণা আত্যা

সম্প্রতি মিস বীণা আত্যা নাম্নী একজন গায়িকা বিলাতে যশস্বিনী হইয়াছেন। কলিকাতার ইটালী পল্লীতে ইঁহার গৃহ। প্রায় দুই বৎসর হইল ইনি ভারতবর্ষ ছাড়িয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি কিছুদিন রোমে ছিলেন। অতঃপর শ্রীযুতী বীণা লণ্ডনে আসেন। . মে-ফেয়ারের ১৬ নং চার্লস ষ্ট্রীট ছিলেন রোমান্ড প্রেভিলের বাড়ীতে ইনি সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। ভারতের কাইজারলিঙ্গ ও তাঁহার পত্নী এই বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। সঙ্গীত গায়িকা শ্রীযুতী বীণা সকলকে মুগ্ধ করেন।

পশুপোট্রেট (প্রতিকৃতি)-বিশেষজ্ঞা

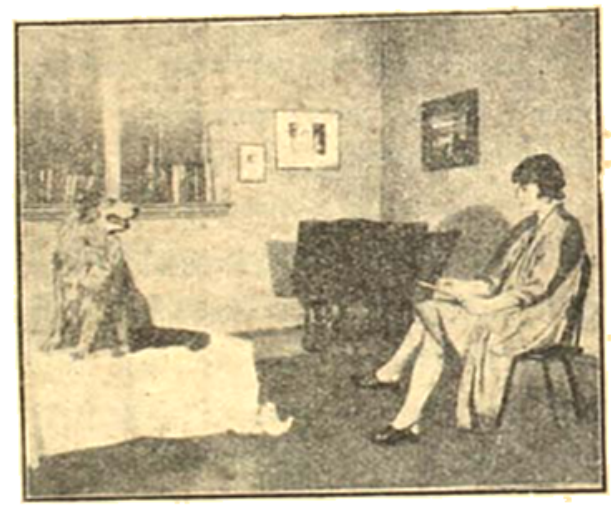

শ্রীযুতী ডাবেনা থর্ণে

শ্রীযুতী ডাবেনা থর্ণে পশু-প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং এই ব্যবসায় ইঁহার অন্য একজন ব্যারিষ্টারের আয়ের চেয়ে কম নয়। আয়ে কয়াসী না হইলেও চিত্রশালা পাইয়াছে।

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমে বালিকা

সম্প্রতি মিস্ গেৰী ডানকান নামক এক দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসিনী বালিকা সাঁতার দিয়া ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়াছেন। ইংলিশ চ্যানেল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যের সমুদ্র-

টুকরা নাও; ইহার বিস্তৃতি ২১ মাইল, এবং সকল সময়েই এই চ্যানেলে অল্প-বিস্তর স্রোত থাকে। ১৯২৮ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত অপর কেহই সাঁতার দিয়া চ্যানেল অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। চ্যানেল অতিক্রমকারিণী হিসাবে তিনি সপ্তম মহিলা। চ্যানেল পার হইতে তাঁহার ১৬ ঘণ্টা ১৭ মিনিট লাগিয়াছিল। পথে একটি জেলি মৎস্য তাঁহার পশুদেশে কাঁটা ফুটাইয়া দেয়। পারে পৌঁছিয়া তিনি বলেন,—"পুনরায় সাঁতার দিতে তেমন ইচ্ছা করি না; তবে বেশ করিয়া স্নান করার পর একটা সিগারেট-সেবন পাইলেই আমি সুস্থ হইব।"

মহিলা নাবিক

ক্যাপ্টেন ব্লাঙ্কি ডগলাস

শ্রীমতী ব্লাঙ্কি ডগলাস লেথার্ন-এর নাম সুদক্ষ মহিলা নাবিক হিসাবে ইংলণ্ড-আমেরিকাতেও সুপরিচিত। ইনি সুদীর্ঘ-কাল স্বয়ংচালিত সহিত 'মিসিসিপি' নদীতে জাহাজ পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ভারতবাসীর নিকট ইনি পৃথিবীর নবতম আশ্চর্য্য।

বায়ুপ্রতিযোগিতা-জয়িনী

বস্তুতঃ এদেশের সংবাদপত্র-পাঠকগণের নিকট শ্রীমতী মার্গারি ব্রাউনের নাম অপরিচিত নহে। শ্রীমতী ব্রাউন

শ্রীমতী মার্গারি ব্রাউন

কিছুদিন পূর্ব্বে বহু মাইল ব্যাপী সুদীর্ঘ আন্তর্জাতিক বায়ু প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করিয়াছেন

প্যানেল-ব্যবসায়িনী

কুমারী গ্রীনউড

কুমারী মেরী গ্রীনউড্ প্যানেল ব্যবসায় করিয়া লণ্ডনে সুপরিচিতা হইয়াছেন এবং সেখানে ইঁহার কাজের আদর যথেষ্ট বিদ্যমান। কুমারী গ্রীনউড্ ভ্রাম্যমাণ গৃহ বা 'হোম-বাডী'র জন্য এই প্যানেলটি প্রস্তুত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্য্য

কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে, শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্রকে লিখিত অধ্যাপক অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর খানতিনেক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সেদিন আমরা উহা পড়িতেছিলাম। পড়িতেছিলাম—"…(রবীন্দ্রনাথ) সমস্তক্ষণই এত ইন্‌স্পায়ার্ড থাকেন যে, যখনই যা বল্‌তেন তা কবিতার মত শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পায়। চিন্তার চরম ঐশ্বর্য্য পথে পথে ছড়িয়ে চ'লে যান।…" একজন বলিলেন, "দুর্ভাগ্য যে এই চরম ঐশ্বর্য্য থেকে আমাদের বঞ্চিত ক'রে বিদেশের পথকে সমৃদ্ধ কর্‌লেন তিনি।" অন্যজন বলিলেন,—"বিধাতা কথা। ঐশ্বর্য্য তিনি দেশের পথেও ছড়িয়েছেন অনেক; যদি সমৃদ্ধ না হ'য়ে থাকি ত সে আমাদেরই দোষ—আমরাই অনেকে তা পা দিয়ে মাড়িয়েছি।"

আমরা বলি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরম ঐশ্বর্য্য আমাদিগকেই দান করিয়াছেন। তিনি জগতের রবীন্দ্রনাথ হইতে পারেন. কিন্তু বিশেষ করিয়া তিনি আমাদেরই রবীন্দ্রনাথ—আমরা জানি।

শিক্ষার আদর্শ

'বঙ্গলক্ষ্মী'র বিগত সংখ্যায় "শিক্ষার আদর্শ" নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধে প্রবন্ধকার শ্রীযুক্ত শুকদেব দত্ত একটি সত্য কথা বার বার করিয়া বলিয়াছেন যে,বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ছাপই শিক্ষার আদর্শ নহে এবং বি-এ, এম-এ'র পদবৃদ্ধি দ্বারা জাতীর ঐশ্বর্য্য সূচিত হয় না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও তাঁহার বহু বক্তৃতায় অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মূলতঃ চিন্তাহীন করিয়া থাকে, মনীষা নহে। একবার তিনি চমৎকার একটি উদাহরণও দিয়াছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উচ্চতম দেতাবওয়ালাকে 'আর্ল্যাণ্ড' ও 'আইসল্যাণ্ড'র পার্থক্য বুঝাইতে তাঁহাকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল। যাহোক,—আমরা হক্তমহাশয়ের প্রবন্ধের কথা বলিতেছিলাম। তিনি 'শিক্ষার' আদর্শে আরও অনেক কথা বলিলেও প্রধান কথা এই যে—শিক্ষার সহিত সাধনার সামঞ্জস্যই আদর্শ শিক্ষা। ইহা শাশ্বত সত্য। দার্শনিক ক্যাণ্ট ইহাকেই সৎশিক্ষা বলিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে জাগতিক মঙ্গলের ইহাই মূল উপাদান :—It is through good education that all the good in this world arises.

চৈনিক প্রবাদ

চৈনিক পুরাণপ্রসঙ্গে আছে—কোন এক পরম-ধর্ম্মাত্মা চীনসম্রাট একদা বর্ষার দিনে তাঁহার প্রাসাদ-কক্ষের বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া, ছত্রহীন নিরাবরণ মস্তকে

ছবিতে পথিক-করিগণকে রাজপথে নিরুদ্বেগে চলিতে দেখিয়া, মনস্তুষ্টঅন্তঃকরণে তাঁহার অমাত্যবিশেষকে বলিয়াছিলেন সম্রাট যেন ভবিষ্যতে আর এরূপ দুর্দশা-গ্রস্তদের কদাচ চোখে দেখিতে না পান এবং অমাত্যবর্গ ইহার অনোঘ প্রতিকারে তৎপর হোন। অমাত্য, হস্তহীন মস্তকের জন্য চক্ষের বন্দোবস্ত না করিয়া মস্তকগুলিকেই সবত্নে দেহচ্যুত করিয়াছিলেন।

এই হাস্যকর চীনে গল্পটি আমাদের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—প্রাথমিক শিক্ষাবিলে প্রস্তাবিত নবতন শিক্ষাব্যয়ের জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা নূতন ট্যাক্স বসাইয়া তোলা হইবে জানিয়া।

বানান ভুল

প্রাচ্যের ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে বাংলা বানান ভুল সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে "...থাকিলেই বা, এত বড় পণ্ডিত দিনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাংলা রচনায় বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। বানানের স্থায়িত্বই বা কোথায়?..." তিনি এই অন্যায়ত্বের উদাহরণ দিয়াছেন—"কিং শব্দোদ্ভূত 'কি' এখন হইয়াছে 'কী'।" কিন্তু 'কি' 'কী' হয় নাই; 'কি' আছেই, তদুপরি 'কী' হইয়াছে। 'কি' এবং 'কী' ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। আর, বানান কি এতই অস্থায়ী? আমরা বানানকে এত তুচ্ছ মনে করি না। এবং স্বয়ং সেন মহাশয়ের লেখাতেও ত আমরা বানান ভুল পাই না।

যদিও—দুঃখের বিষয়, একশ্রেণীর লেখকদের বর্ণাশুদ্ধির বিষয় অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহা অক্ষমতার অপরাধই সূচিত করে। মাতৃভাষার প্রতি অবহেলাই ইহার কারণ। ইঁহাদের লেখায় প্রচুর বর্ণাশুদ্ধি দেখিতে পাই। এবং শুধু বর্ণাশুদ্ধিই নহে, অপ্রাসঙ্গিক অর্থহীন সন্ধি ও বাক্য প্রয়োগও ইঁহারা করিয়া থাকেন। সম্পাদকদের বিনয় হয় যে বিশুদ্ধির জন্য বাক্যাংশ পরিবর্তিত করিলে লেখকরা অসন্তুষ্ট হন এবং অনুযোগ করেন। অনেক সময় ইঙ্গিতে জানানো ছাড়া স্পষ্টভাবে মুখে বলা সম্পাদকদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

জড়িত ও অস্পষ্ট হস্তাক্ষর

শুধু বানান দুষ্ট নহে, জড়িত ও অস্পষ্ট হস্তাক্ষরও তথাকথিত লেখকদের অপর বিশেষত্ব। যাঁহারা সামান্য একটু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিলেই সুন্দর সুস্পষ্টভাবে লিখিতে পারেন তাঁহারাও কেন যে সেই সামান্য পরিশ্রম ও যতটুকু যত্ন স্বীকার করিতে রাজী নন, বলা যায় না। এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, চেষ্টা করিলেও হস্তাক্ষর পরিস্ফুট হয় না, এরূপ লেখকও অনেকে আছেন। অবশ্য যাঁহারা সর্ব্বদা সহস্র কাজে ব্যস্ত থাকেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সেকালে কিন্তু এরূপ ছিল না। তালপাতার পুঁথি যাঁহারা লিখিতেন তাঁহারা আক্ষরিক আর্টে সুপটু ছিলেন। ফারসী যখন রাজভাষা ছিল, তখন ত হস্তাক্ষর চিত্রবিশেষের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। কিন্তু সেকালেই বা কেন, একালেও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যস্রষ্টাদের হাতের লেখা মুক্তার মত সুন্দর ও ঝরঝরে। ইহার কারণ, ইঁহারা রচনাকে সখের নহে সাধনার জিনিষ মনে করেন। যাক, এসব কথা এই জন্যে বলা হইল যে ইহার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হয় দুর্ভাগা প্রেসকে ও বেচারা সম্পাদককে। আশাকরি, লেখকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

•

আইনস্টাইনের আবিষ্কার ও বিলাতী লর্ড-লেডীর শৃগাল-শিকার

সম্প্রতি 'প্রবাসী' পত্রিকায় জনৈক বিশিষ্ট লেখক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমাদের দেশের সংবাদ-পত্রে আইন্‌ষ্টাইনের আবিষ্কারের চেয়ে বিলাতী লর্ড-লেডীর শৃগাল-শিকারের কাহিনী সমধিক আড়ম্বরে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা সত্য কথা। কিন্তু একমাত্র সাংবাদিকদিগকেই এজন্য দায়ী বা দোষী করিলে ভুল করা হইবে। যাঁহারা চায়ের পাত্রে চুমুক দিতে দিতে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকেন দোষ তাঁহাদেরও। আর শুধু সংবাদপত্রই বা বলি কেন, পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি সকল রকম সাময়িক পত্রিকাদিতেও "সচিত্র শৃগাল-শিকারকাহিনী" প্রকাশিত

হইয়া থাং এবং শিক্ষাভিমানী পাঠকসাধিকাগণ, কিরূপ পোষাক পরিয়া শিক্ষয়িত্রীবিদায়িনীগণ উক্ত বিদায়-সান্ধ্য করিয়াছিলেন সাগ্রহে তাহার গবেষণা করিয়া থাকেন। ইহা পরদেশী অনুকরণ ও দাসমনোভাবের ফল

অনন্ত যৌবন

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটি বয়স আসে, যখন তাহার কর্ম ও চিন্তাশক্তি সর্বাধিক প্রকাশ পায়। এই বয়স হইল প্রৌঢ়াবস্থার প্রথম দিক। এই বয়সের পর হইতেই মানবের শক্তির একটানা স্রোতে যেন ভাঁটা পড়িতে থাকে। কিন্তু এই বয়সের প্রতিভা ও শক্তি যদি অপচিত না হইত, তবে বহু কর্মকুশল ব্যক্তিদের কর্ম দ্বারা জগতের বহু উন্নতি হইতে পারিত নিশ্চয়ই। কয়েক বৎসর হইল, শরীরের গ্রন্থিগুলির কার্যকারিতা প্রথম চিকিৎসকদের চোখে পড়ে। ক্রমে ইহাও আবিষ্কৃত হয় যে বিশেষ দুইটি গ্রন্থির কার্যের সঙ্গে যৌবন ও কর্ম শক্তির একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এই গ্রন্থি দুইটি সাধারণতঃ পুরুষের শরীরে তেরো-চৌদ্দ বৎসর হইতে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর পর্যন্ত কার্য করে। এবং এই সময়টিই হইতেছে মানুষের বিকাশের সময়। নারীর শরীরেও অবশ্য দুইটি গ্রন্থি আছে, তাহারাও তেরো-চৌদ্দ বৎসর হইতে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত কার্য করে, এবং এই দুই বয়সের মধ্যবর্তী বয়সই নারীর বিকাশের কাল। উভয় ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থি দুইটির কাজ বন্ধ হইলেই বার্দ্ধক্য আসিয়া চিন্তা, কর্ম ও উপভোগের শক্তি হরণ করিয়া লয়। অষ্ট্রীয়ার ডাক্তার ভোরোনাফ * দেখিলেন, প্রৌঢ়ের গ্রন্থিকে তরুণ-প্রয়োগে অল্প সময়ের জন্য উত্তেজিত করা যায় বটে কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না; কারণ গ্রন্থি আর নবযুবকের গ্রন্থির মত জোরে কাজ করিতে পারে না। তিনি অন্যদিকে দৃষ্টি দিলেন। বিজ্ঞানের মতে মানুষ বানরজাতির জ্ঞাতিভাই। ভোরোনাফের হঠাৎ খেয়াল হইল, অস্ত্রোপচার করিয়া তরুণ বানরের সবল গ্রন্থি যদি প্রাচীন মানুষের গ্রন্থিকোষে বসিয়া দেওয়া যায় এবং প্রাচীন গ্রন্থি দুইটিকে দূর করিয়া ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তবে নবযৌবনকে চিরস্থায়ী করার সম্ভাবনা থাকে। সাবধানে অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া তিনি দেখিলেন যে সেই সম্ভাবনাটা ফাটিয়া গেল। তিনি বার্দ্ধক্যকে দূর করিয়া দিলেন। ডাঃ ভোরোনাফ অবশ্য যে-সে বানরের গ্রন্থি লইয়া কাজ করেন নাই। তিনি বনমানুষের গ্রন্থি দিয়া তাঁহার চিকিৎসা সম্পন্ন করেন।

সম্প্রতি ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় তাঁহার চেয়েও যৌবনলাভের উপায়টিকে সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে তরুণতর বনমানুষের গ্রন্থিদ্বারা চিকিৎসা করার কোনও প্রয়োজন নাই, বাঙলা দেশের অতি সাধারণ বানরের গ্রন্থি মানবশরীরে সুচতুরভাবে দিলে যৌবন ফিরিয়া আসে। এই উপায়ে ডাক্তার রায় অন্যূন বিশজন বৃদ্ধকে চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদের লুপ্ত যৌবন ফিরাইয়া আনিয়া চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এইখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, একটি যৌবন ও নারীত্ব-লক্ষণ-হীনা নারীদেহে অস্ত্রোপচার করিয়াও তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

এই অঙ্গ-চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন। জগতের খুব কম চিকিৎসকই এইরূপ চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ডাঃ রায় এই চিকিৎসায় সফলকাম হইয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের গৌরব ও গর্বের বিষয়।

উত্তরাধিকার-সমস্যা

বৃটিশ সিংহাসনের অবিসা উত্তরাধিকারী কে হইবেন—এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় বৃটিশ রাজনীতিকগণ নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। প্রকাশ যে, এই সমস্যা-সমাধানের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্মিলনের মতামত গ্রহণ করা হইবে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ এখন বৃটিশ সিংহাসনে আসীন। তাঁহার পর যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ সিংহাসনারোহণ করিবেন। তিনি এখনও অবিবাহিত, আর, বোধহয় বিবাহও করিবেন না। সুতরাং তাঁহার পরে

* গত সংখ্যায় "নানা কথায়" ইহার বিষয় বলা হইয়াছে।

সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব ইয়র্ক সিংহাসন লাভ করিবেন। তিনি অবশ্য বিবাহিত। কিন্তু তাঁহারও পুত্রসন্তান এপর্য্যন্ত হয় নাই—দুইটি কন্যা লাভ হইয়াছে। ইহাতেই বৃটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী-নির্ণয়ের প্রশ্ন উঠিয়াছে। ডিউক অব ইয়র্ক যদি মরেন তাহা হইলে তাঁহার পর সিংহাসনে বসান হইবে কাহাকে? তাঁহার প্রথমা কন্যাকে?—না, দ্বিতীয়া কন্যাকে? ইংলণ্ডের প্রচলিত নিয়ম-অনুসারে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দুইজন হইতে পারেন না। অথচ আইনে আছে যে, প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাই পিতৃসম্পত্তির সমান অংশ দাবী করিতে পারেন। পুত্রসন্তানের বেলায় সেরূপ কোন আইন প্রচলিত নাই; সে স্থলে নিয়ম এই যে, জ্যেষ্ঠপুত্রই সিংহাসন লাভ করিবেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যাই সিংহাসন লাভ করিবেন, এরূপ কোন বিধি নাই। সুতরাং ডিউক অব ইয়র্কের দুই কন্যার যদি বৃটিশ সিংহাসন দাবী করেন তাহা হইলে আইনের চক্ষে কোনই অন্যায় হইবে না। বৃটিশ রাজনীতিকরা বলেন যে, এখনই সমস্যার মীমাংসা করা দরকার।

মীমাংসা-ফল জানিবার জন্য কৌতূহলী হওয়া অনেকের পক্ষেই আস্বাভাবিক নহে।

সমাজ-বিপ্লব

এখানে আমরা বিপ্লব কথাটা বিদ্রোহ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; আলোড়ন, ওল্ট-পালট বা স্বল্পক্রম পরিবর্ত্তন-সূচক তাৎপর্য্যে উহা ব্যবহার করা হইতেছে। কিম্বা ইহাকে অভিনব সংস্কার বলিলেই হয়ত যথাযথ বলা হয়। যুগে যুগে সমাজ-দেহে যেসব 'স্যাঁতলা' বা ঘাস পড়ে, বিপ্লব সেইসব মলিনতা দূর করিয়া তাহার মৌলিক উজ্জ্বলতা আনয়ন করে।

অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতীয় সমাজেও সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। বংশবিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়া আর জাতে মাথা কাটিবার অধিকার কেহই স্বীকার করে না। শূদ্র শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছেন—ব্রাহ্মণ অর্জ্জন করিতেছেন। অস্পৃশ্য, অন্যান্য ব্যবস্থাপক সভায় পদপ্রার্থী হইতেছেন—পদলাভ করিতেছেন। উদাহরণ আরও অনেক আছে। কিন্তু এখানে আমরা আমাদের নারী-সমাজের একটা অসাধারণ আশু-পরিবর্ত্তনের কথাই বলিতে চাই। ইহা বিধবাবিবাহ বা বালবিবাহ-নিরোধের বিষয় নহে, কিম্বা নারী-উত্তরাধিকার আইনের বিতর্ক নহে। আশ্চর্য্য! অসূর্য্যম্পশ্যরূপা অন্তঃপুরচারিণী পুরমহিলারা আজ দলে দলে রৌদ্রালোকিত রাজপথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, পুরুষ-নিরপেক্ষ হইয়াই। শুধু ব্যক্তি-বিশেষের গৃহের, শ্রেণী বা দল-বিশেষের গোষ্ঠীর অল্পেকজন মাত্র নহেন,—সর্ব্বজাতির, সর্ব্ব প্রদেশের, ভারতীয় অন্তঃপুরচারিণীরাই আজ পথের জনতায় বাহির হইয়া পড়িয়াছেন অবগুণ্ঠনহীন অবস্থায়, অসঙ্কোচে। ইহার কারণ বা ফলাফল লইয়া বিচার করিতে চাহিনা; শুধু ইহাই বলিতে চাই যে তাঁহারা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং বিপ্লবই তাঁহাদিগকে বাহির করিয়াছে।

•

মহিলা সঙ্কিনূত

চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের কনৈক উচ্চপদস্থা তরুণী কর্ম্মচারী—নাম তাঁর মিস লিউ যান—চীন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রাশার সহিত আলোচনা করিবার জন্য রিক্সতের রাজধানী লাসায় গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোন সঙ্গী ছিল না। সম্প্রতি তিনি নানকিংয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মিস লিউ একবৎসরেরও পূর্ব্বে লাসা যাত্রা করেন। সেই সময় সংবাদ বাহির হইয়াছিল যে, রাশার সহিত চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের একটা মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছে। মিস লিউ তেচুয়েনের পথে তিব্বত যান; অনেক মাস পদব্রজে ভ্রমণ করিতেও হইয়াছে। তেচুয়েন এবং তিব্বতের স্থানে স্থানে দস্যু-তস্করের ভয় আছে। এই ভয় অতিক্রম করিয়া মিস লিউকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। রাস্তায় একবার এই তরুণী অসুস্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু তথাপি তিনি ভ্রমণে বিরত না হইয়া চলিতেই থাকেন এবং অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া লাসা নগরে উপস্থিত হন। লাসায় পৌঁছিয়া মিস লিউ তিব্বত এবং জাতীয় গবর্ণ-

মেণ্টের সাদস্যদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ভাব দেখিতে পাইবেন।

আমাদের ভারতীয় শাস্ত্র নারীকে শক্তি বলিয়া থাকে।

•

এসিয়া নারী-মহাসম্মিলন

নিখিল এসিয়া নারীসম্মিলনের উদ্যোগ-কেন্দ্র হইতে সম্প্রতি একটি তথ্যপূর্ণ 'বুলেটিন' প্রকাশিত হইয়াছে। 'বুলেটিন' ভারতের নর-নারীগণকে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

এসিয়ার দেশসমূহের নারীদিগকে ভারতবর্ষে এক সম্মিলনে সমবেত করার প্রয়োজনীয়তা ভারতের নারীগণ উপলব্ধি করেন এবং তাঁহাদের এই প্রস্তাব এসিয়ার বিভিন্ন দেশে জ্ঞাপন করা হয়। যথেষ্ট সাগ্রহ উৎসাহপ্রদ উত্তর আসায় সম্মিলন করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া সিংহল, নেপাল জাপান, ব্রহ্মদেশ ইরাক, শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয়, পারস্য ও বেলুচিস্তান হইতে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিপূর্ণ উত্তর আসিয়াছে। সম্মিলনের কর্ম্মকেন্দ্র বিবেচনা করেন যে, ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এমন হইবে না, যাহাতে সম্মিলনের অধিবেশনে বাধা উপস্থিত হইবে বা প্রতিনিধি-বর্গকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। ১৯৩১ সালের ২৩শে জানুয়ারী হইতে ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত লাহোরে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। সম্মিলনের উদ্দেশ্য এই—

(১) একটি প্রাচ্য সভ্যতার সহযোগী রূপে এসিয়ার নারী-গণের মধ্যে একতা-বোধ জাগ্রত করা। (২) প্রাচ্য সভ্যতার গুণাবলী (সরলতা, ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম, মাতৃত্বের সম্মান, আধ্যাত্মিক অনুভূতি) নির্দ্ধারণ—যাহাতে ঐ গুলি জাতির ও পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সংরক্ষিত হয়। (৩) প্রাচ্য সভ্যতার বর্ত্তমানে যেসকল ত্রুটি (স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, শ্রমিকদের জন্য পারিশ্রমিক, শিশু-মৃত্যু বিবাহ-প্রথা) পরিলক্ষিত হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও তাহা দূর করার চেষ্টা। (৪) পাশ্চাত্য প্রভাবসমূহের মধ্যে যাহা এসিয়ার উপযোগী (শিক্ষা, পরিচ্ছদ, স্বাধীন গতি, বিনোদন, কলকব্জা) তাহা গ্রহণ। (৫) এসিয়ার বিভিন্ন দেশের নারীগণের অবস্থার (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত) অভিজ্ঞতা বিনিময় দ্বারা পরস্পরকে শক্তিশালী করা। (৬) পৃথিবীর শান্তিপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য।

শ্রীমতী সুব্বা লক্ষ্মা (ভারতীয় নারীসঙ্ঘের সভানেত্রী) শ্রীযুতা এম জেমিল বেগম (আরবের প্রসিদ্ধ নেত্রী), শ্রীযুতা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুতা ইনোই (জাপানী বিদুষী) ও শ্রীযুতা সান-ইয়েট সানের (চীনের নেত্রী) নাম সম্মেলনের সভানেত্রীত্ব প্রসঙ্গে উঠিয়াছে। ইঁহাদের মধ্য হইতে প্রতিনিধিবর্গের ভোটে সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইবেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যের "ফি" ১০ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সম্মিলনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও 'বুলেটিনে' বিবৃত হইয়াছে। নিখিল এসিয়া নারী মহাসম্মিলন, প্যালেস গার্ডেন্স, এগমোর, মাদ্রাজ—এই ঠিকানায় আবেদন করিলে 'বুলেটিন' পাওয়া যাইবে।

মিউজিলণ্ডের অকল্যাণ্ড হইতে সম্মিলনের প্রথম অভ্যর্থনীয় মহিলারূপে আসিয়াছেন—কুমারী ইসাবেল রবার্টসন।*

আমরা সম্মিলনের সাফল্য কামনা করি।

•

এসিয়া নারী-মহাসম্মিলন ও পারস্যের নারী

সম্প্রতি নিখিল এসিয়া নারী-মহাসম্মিলনের সেক্রেটারীকে (রাণী শ্রীযুতা লক্ষ্মীবাই রাজওয়াড়ে) তাঁহার আমন্ত্রণ-লিপির প্রত্যুত্তরে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি জানাইয়া পারস্যের জাতীয় মহিলাসঙ্ঘের সভানেত্রী একখানি সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি কথিত সভাসম্মিলনে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন এই যে, গত মহাযুদ্ধে তাঁহার পরিবারবর্গ এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত ও উৎপীড়িত হইয়াছেন যে তাঁহার যাত্রা এখনও তাঁহারা সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই এবং তাঁহার পক্ষেও এখন পার্শ্ব ত্যাগ

* মিউজিলণ্ডের অকল্যাণ্ড মহিলাসমাজের বিবরণ ও মিস রবার্টসনের বিষয় পূর্ব্বে 'বঙ্গলক্ষ্মী'র "বিদেশী মহিলার কথা"য় বিবৃত হইয়াছে।

করা সেইজন্যই সম্ভবপর নহে। তবে, সম্মিলনে একজন পারস্য-প্রতিনিধিকে পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন, তিনি বলিয়াছেন। যদিও অনবগুণ্ঠিতভাবে যাতায়াত 'পার' কর্তৃক অনুমোদিত এবং স্বামীদের সহিত স্ত্রীরা থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতিতে অ-বাধেই গমনাগমন করিয়া থাকে, তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, প্রকৃত সংস্কার (সামাজিক ও রাজনৈতিক) যাহাকে বলে সেখানকার মেয়েরা তাহাকে ছুঁইতে-ধরিতে পারিতেছেন না। প্যারিসের হীন অনুকরণকে তিনি ইহার অন্যতম কারণ মনে করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে দামাস্কাসে (সিরিয়া) শ্রীযুতী নুরী যাদুম হানেমাবেগ-এর সভানেত্রীত্বে যে প্রাচ্য মোসলেম মহিলা-সম্মিলনের অধিবেশন হয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, উক্ত সম্মিলন প্রমাণিত করে, যতদিন পর্য্যন্ত না নারীরা সাধারণ মানবীর অধিকারসমূহ হস্তগত করিতে পারিতেছেন ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত উন্নতির পথে তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিবেন না। উক্ত সম্মিলনে যদিও (১) বিবাহের নিম্নতম বয়স ১৬, (২) বহুবিবাহ নিরোধ, (৩) বিবাহ-বিচ্ছেদে স্ত্রী-পুরুষের জন্য সমান বিধান—এই তিনটি বিষয় প্রস্তাবিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সন্তোষজনক ভাবে উহা সমর্থিত হয় নাই। তিনি বর্ত্তমান সম্মিলনের সার্থকতা সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করেন। প্রাচ্য নারীপ্রগতি বিষয়ে তিনি নিম্নলিখিত কয়েকজন পুরুষ ও মহিলার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন—(১) শ্রীযুতী নুরী যাদুম হানেমা বেগ, (২) খুবাস যাদুম আশরাফ, (৩) মিঃ জোবেদা খান কোরবান। তুর্কীস্থানের মেয়েদের সম্বন্ধে বলশেভিক আন্দোলনের পরবর্ত্তী অবস্থা তিনি সঠিক জানেন না; পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের অবস্থা তাঁহার নিকট আশাপ্রদ ছিল। এই সম্পর্কে তিনি ট্রাসককেশিয়া ও কাজানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

•

পশ্চিমে প্রাচ্য মহিলা-সমিতি

সম্প্রতি মানসীয় কুমবিবাহের মহারাণীর অধিনেত্রীত্বে লণ্ডনে 'প্রাচ্যের ভগ্নীত্ব' (The Sisterhood of the East) বা "ভারতীয় ভগ্নীদের সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য তথা বিশেষতঃ ইংলণ্ডে প্রাচ্য তথা ভারতীয় নারীদের সভ্যতার মিলনের সূত্র স্থাপিত প্রতিষ্ঠা করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই সমিতি সম্পূর্ণরূপে অ-সাম্প্রদায়িক অ-রাজ ও অ-বর্ণনৈতিক। সমাজ-সংস্কার, পর্দ্দা-বিরোধ, শিক্ষা-সম্প্রসারণই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

শ্রীযুতী 'মংপুবাতিয়া' (জাপান রাজদূতের পত্নী, লণ্ডন) এবং শ্রীযুতী 'জী' (চীন রাজদূতের পত্নী) এই সমিতির কার্য্যে যোগদানের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুবিধিত ভারতীয় রমণীগণ যাঁহারা এই সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহার —বেগম শাহ্ নওয়াজ, ইন্দোরের মহারাণী, লেডী সফি, লেডী বমার হৈয়াবখান (এখনও পর্দ্দা ত্যাগ করেন নাই)। নিংহল-বাসিনী শ্রীযুতী (মিসেস্) দো সমরা ইহার অবৈতনিক সম্পাদিকা মনোনীতা হইয়াছেন। শ্রীযুতী (মিসেস্) এস, সি, মুখার্জ্জি এই সমিতি সংগঠনে দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন।

•

অবগুণ্ঠন-মোচন

সম্প্রতি দামাস্কাসে নিখিল প্রাচ্য মুসলমান মহিলাগণের যে সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে মিলিতভাবে ঐসলামিক্ সংস্কার অবগুণ্ঠন-মোচনের প্রস্তাবই সর্ব্বপ্রথম স্থান করিয়াছিল। এবং বহু বাদপ্রতিবাদের পর উহা সন্তোষজনকরূপে (?) সমর্থিত হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিও ঐ সঙ্গে সমর্থিত হইয়াছিল—

(১) বিবাহের পূর্ব্বে বর ও বধূ পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারিবে।

(২) পণপ্রথা বৈবাহিক অবশ্যকরণীয় নহে।

(৩) বিবাহ বিচ্ছেদে স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার থাকিবে।

(৪) বিবাহের নিম্নতম বয়স ১৮ বৎসর।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষা বালকবালিকা উভয়ের জন্য সমান বাধ্যতামূলক হইবে।

(৬) ১৪ বৎসরের নিম্নতম বালকবালিকাকে চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া হইবে না।

(৭) আরবীয় কৃষ্টি ও শিল্প ব্যাপক ভাবে প্রচার করিতে হইবে;

গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় নারী

সার মহম্মদ সফির কন্যা শ্রীযুতী সাহ নওয়াজ গোল-টেবিল বৈঠকের নারীপ্রতিনিধিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যগত স্বার্থ প্রকৃতপক্ষে এক এবং ভারতের নারীগণ কেহই সাম্প্রদায়িক মতভেদের নিমিত্ত, তাঁহারা দেশের উন্নতির জন্য মিলিতভাবে যে কার্য্য করিতে-ছেন, তাহা বন্ধ হইতে দেন নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ও বৃটেন উভয় দেশের প্রতিনিধিরা যদি পরস্পরে সহযোগিতার ভাবে প্রণোদিত হইয়া এবং সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে বৈঠকের সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই।

মেম অপসারিত হউক, আমরাও ইহা কামনা করি।

শিশু-স্বাস্থ্যাগার

গত বৎসর পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের অধীনে তিনটি শুল্ক শোষনাগার ছিল—১ নং ডিষ্ট্রিক্ট ১টি, ৪নং ডিষ্ট্রিক্টস্থিত চেতলায় ১টি এবং অপরটি পার্ক্ষেনরীচে। ঐ বৎসর ৩রা ডিষ্ট্রিক্ট এবং কালীপুরে আরও দুইটি শুল্ক শোষনাগার খোলা হইয়াছিল। সুতরাং সর্ব্বসমেত পাঁচটি শোষনাগার হইয়া-ছিল। এই সকল শোষনাগার ও শিশু-পরীক্ষাগার হইতে ঐ বৎসর মোট ৩৮৭টি শিশুকে বিনা পয়সায় শুল্ক সরবরাহ করা হইয়াছিল। যে দুগ্ধ সরবরাহ করা হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ২১৬৫ মণ ১৬ সের।

কলিকাতায় প্রসূতি-আগার

কলিকাতা কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে মোট সাতটী প্রসূতি-আগার আছে। ইহাদের মধ্যে সহরের চারি ডিষ্ট্রিক্ট চারিটি এবং সংযুক্ত অঞ্চলে অর্থাৎ তিনটি এই সকল প্রসূতি-আগারে পাঁচজন মহিলা-স্বাস্থ্যপরিদর্শক আছেন। এই পাঁচজনের মধ্যে তিনজন চারিটি ডিষ্ট্রিক্টে এবং একজন পার্ক্ষেনরীচে আছেন। মাণিকতলা ইউনিটে একজন ভারপ্রাপ্ত নার্স আছেন। কালীপুর কেন্দ্র একজন পারদর্শিনী ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে আছে। এই সকল প্রসূতি-আগারে সর্ব্বশুদ্ধ একুশজন ধাত্রী আছেন। ২ নং ইউনিট ব্যতীত অপর সকল ইউনিটের মহিলা-স্বাস্থ্যপরিদর্শকগণ পাশকরা ডাক্তার। মাণিকতলার ভারপ্রাপ্ত নার্স তাঁহার ইউনিটে যে সকল ধাত্রী আছেন তাঁহাদের কাজেরও তত্ত্বাবধান করেন। কালীপুর কেন্দ্রে যে দুইজন ধাত্রী আছেন তাঁহারা স্বাধীনভাবেই কাজ করেন। কিন্তু পারদর্শিনী ধাত্রীর উপরেই ইউনিটের ভার ন্যস্ত আছে।

এলাহাবাদে মহিলা-সভা

গত ৩রা অক্টোবর এলাহাবাদে মহিলা-ক্লাবে মহিলাদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুতী খুরেমান সভানেত্রীর আসন অধিকার করিয়াছিলেন। সংরাজ-নলিনী সাব্বা সভানেত্রী কুমারী নীরজ-বাসিনী ঘোষ বি-এ, বি-টি, বাঙলার মহিলাগণ সামাজিক ও শিক্ষা সম্বন্ধে যে উন্নতিসাধন করিয়াছেন তৎসম্পর্কে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সরোজনলিনী-সঙ্ঘের কার্য্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

শ্রদ্ধেয়া মিস্ ঘোষ আমাদের নারীমঙ্গল সমিতির একজন অতি প্রিয় সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়িনী।

প্রতীক্ষার দান

"আপন হাতে পেতেছ যে যেথায় আসন যার,
সেথায় তারে বসাও, তোমার এই ত সুবিচার।"
—হেমলতা দেবী

রাণী শ্রী সুরুচিবালা চৌধুরাণী

ইলোরা।—হাজার বছর আগে প্রাণ-দেওয়া কঠিন পাথর আজো যেখানে কোমলতম ভাবের সৃষ্টি করিয়া বাঁচিয়া আছে। চির সৌন্দর্য্যের উদ্বেলিত উৎস সেখানে বহিয়া চলিয়াছে অনাবিল ধারায়, সে ধারা শত ভাবের ঢেউ তুলিয়া কোথায় কোন্ রূপ-সাগরের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে আপনহারা হইয়া নিশিয়া যাইতে কে জানে? কোন্ অপূর্ব্ব শিল্পী প্রাণ-মন ঢালিয়া পাথরে প্রথম জীবনের স্পন্দন বহাইয়া দিয়াছিল, কঠিনতার ভিতর কোমল ভাবের রেখা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, আজিও যাহা সারা জগতকে বিস্ময়ে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শত শত ভাবুক সন্ধানী রসলিপ্সু দলে দলে সেখানে সেই সৌন্দর্য্যের মহা পীঠে উপনীত হয়—একবার সেই শ্রেষ্ঠ শোভারাশি দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করিতে। মনে হয়, সে শোভা দেখিয়া সন্তপ্ত শোক ভুলিয়া যায়, বাঞ্ছিতের বেদনা দূরে সরিয়া যায়, তখন তাহার আর কিছুই থাকে না, বুঝি থাকে শুধু অসীম উদ্বেলিত পুলক আর অবাধ অফুরন্ত আনন্দ।

তাই বুঝি অণিমা আসিয়াছিল তাহার দশ-বৎসরব্যাপী বেদনার বোঝা এইখানে কিছুক্ষণের জন্য নামাইয়া রাখিয়া বুকখানি অনেকটা হাল্কা করিয়া লইতে। সংসারে যত কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে অযাচিতভাবে সে তাহা সবই পাইয়াছিল। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, রূপ সবই তাহার ছিল পূর্ণ-মাত্রায় কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতে দেবতা তাহাকে কেন কোন্ নিষ্ঠুর বিধানের অনুশাসনে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সে বহুদিন ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারে নাই।

ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান সে, ধনীর দুলালের সঙ্গে বিবাহও তাহার হইয়াছিল একদিন—কিন্তু সে সুখস্মৃতি এই দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদে তাহার কাছে অনেকটা ম্লান হইয়া আসিয়াছিল—বিবাহ—ফুলশয্যা,—তারপরে হঠাৎ একদিন সেই অপরিচিত আপনজন কেন কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহা তাহার কাছে আজিও রুদ্ধ-যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত আছে।

বহুদিন পরে আজ অণিমা নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছে। সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একবার-দেখা মূর্ত্তিটি বার বার দেখিতেছিল। আজ তাহার এই প্রথম মনে হইল, অতিশপ্ত দশটি বৎসর যেন তাহার জীবন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে,—আর সে যেন চৌদ্দ বছরের বালিকা আজিও পিতামাতার স্নেহরসে সিঞ্চিতা হইয়া নব শাখা বিস্তার করিয়া মুকুলিতা হইতে চায়। হঠাৎ মায়ের ডাকে সে সচকিতা হইয়া উঠিল—"অণু, আজ আর না মা! আবার আওরঙ্গাবাদে ফিরে যেতে হবে তো?"

অণিমা দৃষ্টিতে অনুনয় ঢালিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর একটু থাকি না মা! দেখো না শিব আর পার্ব্বতীর বিয়ের মূর্ত্তি দুটি কি চমৎকার! পার্ব্বতীর মুখের ভাব দেখো বাবা,—কেমন লজ্জাশীলতা আর নম্রতা মাখানো! আর একটু দেখি বাবা?"

হরনাথবাবু স্নেহভরে কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর বড়-জোর আধঘণ্টা পরেই বেরুতে হবে মা! তার ভেতর আর একটু দেখে নাও,—আবার তো কাল আসতে পারবে।" পিতার আজ্ঞা পাইয়া অণিমা আনন্দিতা হইয়া আর একদিকে চলিয়া গেল। হরনাথবাবুর ও তাঁহার পত্নীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, তাঁহারা একদৃষ্টে কন্যার সচল গতিভঙ্গীর প্রতি বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।

বহু আশা করিয়া একমাত্র নয়নের মণি কন্যাকে

তাহার পিতামাতা চৌদ্দ বৎসরে অত্যন্ত জাঁক-জমকের সহিত পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। বিবাহের সময় অনেকে বলিয়াছিল, "ওদের সব ভালো মশায়, কিন্তু বংশে পাগল-মির ছিট্ আছে।" কিন্তু হরনাথবাবু ও অচলাসুন্দরী অনেকদিন ধরিয়া ভাল করিয়া দেখিয়াও যখন উমাতারার কোন চিহ্ন নীরদকুমারের ভিতর দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহারা আর কোনরূপ দ্বিধা বা সন্দেহ না করিয়া বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নীরদকুমার তখন বাইশ বৎসরের যুবক, তাহার সুন্দর মুখশ্রী ও শিক্ষাদীক্ষা দেখিয়া সকলে একমুখে হরনাথবাবুর জামাতৃ-ভাগ্যের প্রশংসা করিল। কিন্তু দিন কয়েক পরেই হঠাৎ একদিন যখন নব-বিবাহিত নীরদ নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, সেইদিন হরনাথবাবু ও অচলাসুন্দরী শয্যাগ্রহণ করিলেন, আর নীরদকুমারের পিতামাতা কাঁদিয়া কাটিয়া আর অপরা বৌয়ের মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন। প্রথম প্রথম হরনাথবাবু কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া যখন হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন ১০ বৎসর বয়িয়া কন্যাকে লইয়া বছরের ভিতর ৪।৫ মাস দেশবিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং অচলাসুন্দরী তাঁহার মত সাধু-সন্ন্যাসী ধরিয়া বাড়ীতে আনিয়া আদরআপ্যায়নে ত্রুটি করিতে লাগিলেন,—তাঁহার মনে হইত হয় ত গৈরিকের আবরণ ভেদ করিয়া তিনি তাঁহার হারানিধিকে খুঁজিয়া পাইতে পারেন। আর অণিমা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে-দেখা সেই একটি মুখ আঁকড়িয়া ধরিয়া দীর্ঘদিন কাটাইয়া দিয়াছে। তখন তাহার জ্ঞান বুদ্ধি ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহা না হইলে সে আরো কিছু জীবন-পথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিত। মুখখানা এতদিন পরে অনেকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে,—তবুও, তবুও তাহাকে জীবনের বাকি কয়টাদিন বাঁচাইয়া রাখিতে ইহাই যথেষ্ট যে।

অণিমার দিন এই রকমে কাটিয়া যাইত। ক্রমে হরনাথবাবু ও অচলাসুন্দরী কন্যার পাষাণপ্রতিমার মত নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যদি বিদেশে থাকিলে অণিমার ভিতর সজীবতার সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু পুরাতন স্মৃতি-ঘেরা নিজের বাড়ীতে আসিলেই তাহার সকল শক্তিকে যেন চুরি করিয়া লইয়া যায়। হরনাথবাবু একদিন বলিলেন "মেয়েটার জীবনটা এভাবে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, সে হতভাগা-টার যদি মৃত্যু-সংবাদও পেতুম তবে অণিকে বিধবাবিবাহ দিয়েও নিশ্চিন্ত হতুম।"

অচলাসুন্দরী কথাটা শুনিয়াই জিব কাটিয়া "ষাট্, ষাট্" বলিয়া মনে মনে নিকষিষ্ট জামাতার মঙ্গলকামনা করিলেন। তারপরে বিরক্তস্বরে বলিলেন, "বলি তোমার কি ভীমরতি ধরেছে? যা-তা বকতে আরম্ভ করেছ? মেয়েকে বলছো বিধবা হোক্! কি রকম আক্কেল তোমার গা?"

হরনাথবাবু বলিলেন, "বলছি কি আর সাধে? তুমি কি ক'রে বুঝবে আমার বুকের ভেতর কি জ্বালা! অণির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে ইচ্ছে করে আবার যা-কিছু আছে সব বিলিয়ে দিয়ে একদিকে চ'লে যাই। সংসারের যখন ঐ একটিমাত্র মেয়ে তার এই অবস্থা,—কি কুক্ষণে মাকে আমার এক কুলাঙ্গারের হাতে সম্প্রদান করেছি।"

গিন্নি চোখ মুছিয়া বলিলেন, "অদৃষ্ট ছাড়া কারো গতি নেই,—আমরা কি করবো? ওগো! এক কাজ করলে হয়, অনাথ শিশুদের একটা আশ্রম গ'ড়ে দাও, আর তার সমস্ত ভার অণুর উপর দাও—কাজের ভেতর দিয়ে যদি সে একটু নিজেকে ভুলে থাকতে পারে।"

হরনাথবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ। শোন, তুমি মাকে জিগ্যেস কর সে কি-পেলে খুসী হয়, ছেলেদের অনাথআশ্রম,—না হাসপাতাল,—না অতিথি-শালা—সে যা চায় তাই ক'রে দেবো, সম্পত্তি কার জন্য গিন্নি? সবই তো তার—তার যা ইচ্ছে হয় সে নিজে করুক।"

কয়েক মাসের ভিতর অণিমার অনাথ-শিশু-আশ্রম গড়িয়া উঠিল। এবং ক্রমে কয়েকটি বালকবালিকা তাহাতে স্থান পাইল। নূতন কাজের নূতন উৎসাহে সত্যই সে অনেকটা নিজেকে ভুলিয়া রহিল।

সেদিন আগরাজাবাদে ফিরিয়া আসিয়া অণিমা শুধুই

ভাবিতেছিল সেবলার্জীর বিবাহের মূর্ত্তিটি, আর সঙ্গে-সঙ্গে তাহার নিজের বিবাহের সেই দিনটা বার বার মনে পড়িতেছিল। শুভদৃষ্টির সময় সলজ্জ চোখদুটি সেও তো নীচু করিয়া রাখিয়াছিল, তাই বুঝি তাহার শুভ-দৃষ্টির শুভ মুহূর্ত্তে বিধাতা শুভ-আশীর্ব্বাদের পুষ্পাঞ্জলি তাহার শিরে বর্ষিয়া দেন নাই।

পরদিন ইলোরার পিতা অনিমা প্রথমেই সীতা-কা নাহানীতে প্রবেশ করিল। সর্ব্বাগ্রে তাহার দৃষ্টি পড়িল আর একটি সুন্দরী বাঙালী যুবতীর উপর। যুবতীটি একদৃষ্টে একটি মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ছিল; তাহার পার্শ্বে আর একটি প্রৌঢ় দাঁড়াইয়া ছিল। বিদেশে বাঙালীর মুখ দেখিয়া অনিমার ইচ্ছা হইল একটু আলাপ করে কিন্তু কি বলিয়া প্রথম আলাপ করিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। সে শুধু ধীরে ধীরে তাহাদের দলের অনতি-দূরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহারাও অনিমাকে দেখিয়াছিল,—এবং খানিক-ক্ষণ পরে একটি মহীয়সী মহিলা অনিমার কাছে আসিয়া তাহার আপাদ-মস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোত্থেকে আসছ বাছা?"

অনিমা উত্তর করিল, "কলকাতা থেকে।" অবশেষে তাহাদের সকলের পরিচয় আলাপ করিয়া অনিমা অত্যন্ত খুসী হইল। সে জানিল যুবতীটির নাম মুরলা, তাহার স্বামীর ব্যবসা বাণে বড় রকমের একটা কারবার আছে এবং সপরিবারে তাহারা সকলেই সেখানে বাস করে। এখানে মুরলা দিন কয়েকের জন্য স্বামীর নিকট হইতে ছুটি লইয়া আসিয়াছে তাহার পিতার সহিত ইলোরা দেখিতে।

সমস্ত অনিমাদের ৫ দিন আওরাঙ্গাবাদে থাকিবার কথা ছিল। কিন্তু হরনাথবাবু মাকে দিন কয়েক কিছু অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাহারা আরো কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া গেল। বিশেষতঃ অনিমার ইলোরা ছাড়িয়া মন কিছুতেই যাইতে চাহিতেছিল না। ইলোরা আশ্চর্য্য,—ইলোরার অতীত সৌন্দর্য্য সে মুগ্ধ হইয়া দেখিতে চায়,—দেখিতে দেখিতে সে তাহার অতিলুপ্ত জীবনের বিষন্ন

রাণী শ্রী সুরুচিবালা চৌধুরাণী

ভার অনেকটা লঘু বোধ করে। আর মুরলার সঙ্গ পাইয়া সে আরো আনন্দিতা হইয়া উঠিল।

গাড়ী কাটিয়া তাহারা বেশীদিনই থাকিত। হরনাথ বাবু বিদেশে গিয়া যেখানে সেখানে থাকিতে নারাজ তাই তিনি সর্ব্বদা ভ্রমণকালে এই ব্যবস্থা করিতেন।

মুরলারা উঠিয়াছিল ডাকবাঙ্গলোয়—ষ্টেশন হইতে খুব বেশী দূরে নহে। মুরলার সহিত অণিমা রোজ দেখা করিত এবং ক্রমে তাহাদের আলাপ-পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল।

অণিমাদের গাড়ী কাটিয়া যে সাইডিংএ রাখা হইয়াছিল, তাহার পাশে আরোহীদের উঠানামার সুবিধার জন্য একটি ছোট প্ল্যাটফর্ম্ম ছিল, সেইখানে সেদিন সন্ধ্যায় পূর্ব্বগগনে অণিমা ও মুরলা বসিয়া গল্প করিতেছিল। তখন পূর্ণ নবীনতা লইয়া বসন্ত-রাজ পৃথিবীর বুকে তাঁহার আগমনী ঘোষণা করিয়াছেন। সন্ধ্যারাণীর আঁচলা-করা মিষ্টি বাতাস কির্ কির্ করিয়া বহিতেছিল ঠিক যেন প্রিয়ের পেলব পরশের মত। মুরলা একমনে নিজের সৌভাগ্য বর্ণনা করিয়া বলিতেছিল,—কেমন করিয়া তাহার সঙ্গে এগারো বৎসর আগে মিঃ রায়ের দেখা হয়, তার পরে ছয়-মাসব্যাপী তাহাদের অবাধ মিলামিশা—তাহারা তখন দিল্লীতে থাকিত। মুরলার পিতা সেখানে কাজ করিতেন ও মিঃ রায় দেশভ্রমণোপলক্ষে সেখানে যান। তারপরে বিবাহ! স্বামীর প্রেম-ভালবাসায় ভরপুর মুরলা, সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চশিখরে অধিষ্ঠিতা হইয়া আপন গরিমায় আপনি বকিয়া যাইবার পর একটি আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আঃ, কি সুন্দর বাতাস! এমন দিনে একা একা আর ভাল লাগছে না—হাওড়াব্রীজে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।"

মুরলা কিছুক্ষণ অণিমার কোন উত্তর না পাইয়া চাহিয়া দেখিল বহুদূরে উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া অণিমা অন্যমনস্কা হইয়া আছে। মুরলা বুঝিতে পারিল তাহার অন্তর-মন্দির পূর্ণ করিয়া দেবতা অধিষ্ঠিত, সকল পূজা যে তাহার সার্থক হইয়া গিয়াছে। তাহার কানায় কানায় ভরিয়া-উঠা সুখের পাত্রখানি উছলিয়া উঠিয়া প্রেমের মন্দাকিনী বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু অণিমা অভাগিনী পূজার উপকরণ সাজাইয়া কতদিন ধরিয়া বসিয়া আছে—এতদিন ভ্রমরগুঞ্জন আশুলিয়া রাখিয়া বুঝি সে একেবারে হতাশ হইয়া গিয়াছে,—ব্যর্থ! তাহার সবই ব্যর্থ! কোন্ নিষ্ঠুরের কঠিন আঘাতে তাহা ধূলায় লুটাইতে চলিয়াছে—দেবতা কি তাহার আসিবে না?—জীবনটা কি তাহার স্বপ্নের মত শুধু মিলিয়া মিলিয়া ছাই হইয়া যাইবে?—ঐ পবিত্র-সৌরভ-দিক দোঁহায় কি দেবতার আহুতি হইবে না? মুরলা সখীর জন্য বড়ই বেদনা অনুভব করিল এবং অনিচ্ছায় নিজের সৌভাগ্য-সুখের স্মৃতি অণিমার সামনে মেলিয়া ধরিয়াছে বলিয়া একটু লজ্জিতা হইল—সে ঈষৎ লজ্জিত-স্বরে বলিল, "কি ভাবছ ভাই?"

অণিমা বহুদূর হইতে উদাস-দৃষ্টি সরাইয়া আনিয়া মুরলার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল—"না, কিছু না। কি আর ভাববো?"

মুরলা জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ভাই, তোর বরকে তোর মনে নেই?"

ঈষৎ হাসিয়া অণিমা উত্তর করিল, "কেন বলতো?"

মু—"না, এমনি জিগ্যেস করছি। আচ্ছা কেন চ'লে গেলেন তার কারণ কিছু জানিস না?"

অণিমা খানিকক্ষণ এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। তারপরে বলিল, "কারণ তো কেউই জানে না। তবে আমার এক মনস্ এক দিন আমাকে বলেছিল, তাঁর নাকি বিয়ে—মানে আমাকে বিয়ে করবার ইচ্ছে ছিল না। অন্য কাকে কোথায় দেখেছিলেন, তাকেই বিয়ে করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাপ-মায়ের অনুরোধ ঠেলতে পারেন নি। তবে আমি ঠিক জানিনে ভাই, একথা আর আমি কাউকে বলিও নি।"

মু—"তাই নাকি? তাহ'লে এমনি ক'রেই কি চির-জীবনটা কাটিয়ে দেবে?"

অণিমার শুষ্ক ওষ্ঠপ্রান্তে বিষাদ-হাসির রেখা খেলিয়া গেল। সে বলিল, "জীবন? কেন? আমার তো কষ্ট কিছু নেই।"

মু—"হাঁা, কষ্ট জিনিষটা মনে করলে আছে, না করলে নেই।"

অ—"ও জিনিষটা মন থেকে যত দূরে ঠেলে সরিয়ে রাখা যায় ততই ভাল। কি হবে বলতো মুরলা—বিষ্যে যা ফুরিয়ে গেছে, যা হয়তো এ জীবনে আর সম্ভব হবার নয় তার জন্য কষ্ট ক'রে লাভ কি?"

মু—"কেন হতাশ হ'চ্ছ? ভবিষ্যতের কথা কখনো কিছু

বলা যায় না অণু! হয়তো তিনি ফিরে আসতেও পারেন?"

অ—"আমিও ঐটুকু ব'লে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি ভাই! কিন্তু ফিরে আসবেন তিনি কিসের টানে, যশ-বন্ধুর তিনি ফিরে আসবার কারণ কোন কিছুই খুঁজে পেলেন না?—তাছাড়া মুরলা! আমি জানি না, আমার নোয়া-সিঁদুর ধারণ করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত আছে কি না—" অণিমা শিহরিয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর তাহার কাঁপিয়া গেল। খানিক চুপ করিয়া অর্দ্ধস্বরে সে বলিয়া উঠিল—"তার চেয়ে কিছু না জেনে এমনিভাবে দিন কাটানো আমার সব চেয়ে সুখের ভাই! সে নির্ম্মম বাস্তব—উঃ মুরলা! সে যে অসহ্য!"

মুরলা সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠিল—"সেদিন তোর জীবনে যেন কখনো না আসে অণু! ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি।"

অণিমা সে কথার কিছু উত্তর না দিয়া বলিল, "ফিরে আর আসবেন না তা জানি। কিন্তু তবু অন্তরের তলদেশ থেকে কে যেন আশার সুর কানে ঢেলে দেয় মুরলা,—তিনি আসবেন। জোর ক'রে সে আশাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাই,—কিন্তু সে যায় না। ঘুরে-ফিরে বার বার আমাকে নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্দীপনায় বাঁচিয়ে রাখতে চায়।"

মু—"আচ্ছা, শুনেছি ওদের বংশে নাকি পাগলামি আছে?"

অ—"কোনকালে কে পাগল ছিলেন শুনেছি। শুনেছি আমার দাদাশ্বশুর পাগল ছিলেন, কিন্তু যে ৫।৬ দিন আমি তাঁকে দেখেছি, পাগলামির কোন লক্ষণই তাঁর ভিতর ছিল না।"

মু—"তোর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতেন কিছু?"

অ—আমার বয়স তখন ১০।১১, আমি লজ্জা ক'রে কাছে যেতুম না। তা ছাড়া ওঁকে সর্ব্বদা গম্ভীর আর অন্যমনস্ক দেখে আমার ভয়ও হতো। তিনি আমার মুখের দিকে একদিনও চেয়ে দেখেছেন ব'লে মনে হয় না। সেইজন্য মাঝে মাঝে মনে হয় আমার নয়নের কথাবার্ত্তা হয়তো ঠিক। কেমন,—আমার জীবন কি অদ্ভুত! মাঝে মাঝে হাসিও পায়। এত বড় ব্যর্থতার বোঝা কেউ কখনো বয়েছে কি? প্রত্যক্ষ দেবতাকে সামনে রেখে জীবনের সর্ব্বস্ব নিবেদন ক'রে ধ্যানের পরে চোখ খুলে দেখি দেবতা আমার নেই! আমি কি করবো? মুরলা, কি করবো ভাই?" মুরলার চোখে সমবেদনার জল ভরিয়া আসিল। সে অণিমার হাত-খানি কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, "কি করবি, অণু? করবার কিছু নেই, তবে আমার মনে হয় তোর এ জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে না,—রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে নতুন আলো সঙ্গে ক'রে সূর্য্যদেব নিশ্চয়ই তোর জীবন-আকাশে হেসে উঠবেন।"

অণিমা খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিল, "এবার কলকাতায় ফিরে যেতে হয়—"

মু—"কেন, ইলোরা কি আর ভাল লাগছে না?"

অ—"ইলোরা ভালো লাগবে না! বলছিস কি? এখানে এসে আমি আমাকে ভুলে যাই। যা আমার নিজেকে ভুলিয়ে দিতে পারে, তা কি কখনো ভালো না লাগে?"

মু—"তবে যেতে চাচ্ছিস কেন?"

অ—"আমার কয়েকটি ছেলেমেয়ের চিঠি পেয়েছি, তারা লিখেছে 'মা শীগ্‌গির চ'লে এসো।' তাই কাল থেকে মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।"

মুরলা আশ্চর্য্য হইয়া খানিকক্ষণ অণিমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কি বলছিস অণু! তোর ছেলে-মেয়ে মানে?

অণিমা হাসিল "মানে? মানে আবার কি? আমার যে শ' খানেক ছেলেমেয়ে সেখানে রয়েছে, জানিস না?"

মুরলা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ও, তাই বল। অনাথ-ছেলেদের পড়াচ্ছিস বুঝি?"

অ—"না, আমার একটি অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য আশ্রম আছে। তারাই আমার ছেলেমেয়ে।"

মু—"বেশ ভালো। জীবনটা কাটিয়ে দেবার একটা অবলম্বনও তুই গ'ড়ে তুলেছিস।"

গম্ভীরস্বরে মুরলা আবার বলিল, "অণু। এতে অনেকটা শান্তি পাস তো?"

অণিমা স্থির-দৃষ্টিতে মুরলার দিকে চাহিয়া বলিল, "শান্তি? মুরলা, ওসব বই-এর কথা ভাই, যা বাস্তব জীবনে

খুব কমই কাজে আসে। তাতে অন্যের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তোলে, তারা না ব'লে যখন তাকে তখন প্রাণে কোথায় একটা অতৃপ্ত দুর্ব্বলতার কামনা উঁকি মারে। মনে হয়, যখন পরের ছেলের মা ডাকে এত মধু, এত উন্মাদনা তখন নিজের সন্তানের মুখে ঐ ডাকে কত শান্তি পাওয়া যায়?—একটা বিরাট আপশোষ, একটা অহ আত্মগ্লানি বুকটাকে চেপে ধরে; ইচ্ছে করে চীৎকার করি,—জগতকে, ঈশ্বরকে, সে নির্ম্মম বিধাতাকে প্রশ্ন করি—"কেন? কেন? কেন?" কিন্তু এ কেনর উত্তর কে দেবে?"

মুরলার পিতার অনুরোধে এবং অণিমার আগ্রহে হরনাথ-বাবু আরো কিছুদিন থাকিতে সম্মত হইলেন। অচলা-সুন্দরীর কিন্তু এ ব্যবস্থা ভাল লাগিল না। তিনি ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি যে বাবু, রোজ রোজ তোমাদের ঐ পাখপাখ্লি দেখতে ভাল লাগে তা তোমরাই জান।" কিন্তু অণুর ভাল লাগে,—ইহার উপর তাঁহার আর কোন কথা বলিবার নাই তাই তিনি অবশেষে চুপ করিয়াই রহিলেন।

দুই দিন পরে মুরলা সন্ধ্যার সময় আসিয়া খবর দিল "ওগো—কাল উনি আসছেন! কি রকম লোক ভাই? এই ক'টি দিন ছেড়ে থাকতে পারলেন না। আবার এখানে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছেন—ছি! আবার তারি লজ্জা হ'চ্ছে—বাবা কি ভাববেন কি জানি!"

অণিমা উত্তরে ঈষৎ হাসিল মাত্র, প্রথমটা সে কি বলিবে ঠিক করিতে পারিল না। জীবনে সে কোনদিন যাহা পায় নাই, তাহা সে বুঝিবে কেমন করিয়া? কেহ কোনদিন তাহার জন্য ছুটিয়া আসে নাই—বরং অবজ্ঞা করিয়া নিজে দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাই সে শুধু বলিল, "তবে খুব খুসী হয়েছ ভাই, তোর খুব আমোদ হ'চ্ছে না?"

মু—"খুব, আমোদ হ'চ্ছে না আরো কিছু? লজ্জায় ম'রে যাচ্ছি!"

অণিমা একটু আশ্চর্য্য হইল। সে যদি শুনিত আজ তাহার স্বামী আসিতেছে তবে সে কি আনন্দে আত্মহারা হইত না? কিন্তু মুরলা? হয়তো যারা সুলভ তাহার মূল্য সংসারে খুব কমই ধার্য্য হইয়া থাকে,—আর যাহা কিছু দুর্লভ তাহাই সংসারে আদৃত,—চির আকাঙ্ক্ষিত।

হরনাথবাবু ও অচলাসুন্দরী ইলোরায় আর যাইতেন না, তাঁহারা আওরাঙ্গাবাদেই বেড়াইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, কিন্তু অণিমা প্রায়ই মুরলাকে লইয়া ইলোরায় যাইত। সেদিন তাহারা খুব দলে ভারি হইয়া ইলোরা যাত্রা করিল। মুরলার স্বামী নীরেন্দ্র বেশ সুপুরুষ, উচ্চশিক্ষিত, আদব-কায়দা দুরস্ত। তাহার একটি স্বভাবগত সহজ-সরল ভাব ছিল যাহাতে সে প্রথমেই সকলকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিত। মুরলা অণিমার সহিত স্বামীর পরিচয় করাইয়া দিল।

ওরার বাহিরে মুরলা, অণিমা ও নীরেন্দ্র টিফিন-ক্যারিয়ার-স্থিত খাবারে জলযোগ সারিয়া, ঘাসের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল—কিছু দূরে মুরলার পিতা ও অন্যান্য কয়েকজন বসিয়া ছিলেন। নীরেন্দ্রনাথ অণিমার দিকে বারম্বার কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল বলিয়া অণিমা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তবুও সেদিনটা যে কোন্ দিক্ দিয়া নিমেষে চলিয়া গেল অণিমা তাহা বুঝিতে পারিল না, কারণ নীরেন্দ্রের সহিত নানাবিষয়ে আলোচনা করিয়া সে খুবই আনন্দ পাইল। তাহার শিক্ষা ও জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া অণিমা মুগ্ধ হইল।

ইলোরায় দিনগুলি তাহাদের বেশ ভালো ভাবেই কাটিতেছিল। নীরেন্দ্র, মুরলা ও অণিমা তিনজনে প্রায় একসঙ্গে বসিয়া গল্প করিয়া সময় কাটাইত। অণিমা ও নীরেন্দ্র যখন কোন বিষয় আলোচনা করিত, তখন তাহারা মুরলার অস্তিত্ব একেবারেই ভুলিয়া যাইত কিন্তু মুরলা একপার্শ্বে বসিয়া মাঝে মাঝে দু' একটি কথা বলিয়া তাহাদের আলোচনায় যোগ দিবার চেষ্টা করিত। এ৩ দিন তাহাদের বেশ সুখে কাটিল।

অণিমা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল—সে নীরেন্দ্রের সাহচর্য্যে নিজেকে অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার যে-ব্যথা অনাথআশ্রম ভুলাইতে পারে নাই, যে জ্বালা ইলোরার সৌন্দর্য্যসুষমা জুড়াইয়া দিতে পারে নাই,—তাহাতে নীরেন্দ্র-নাথের সঙ্গ অনেকখানি শান্তির প্রলেপ দিয়া দিয়াছে। অণিমা ভাবিল, নীরেন্দ্রনাথ সব বিষয়ে ভাল, কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তার ভিতর অণিমার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অনধিকার

আকর্ষণের আভাস পাইয়া সে মনে মনে একটুখানি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিল। পত্নীর প্রতি স্বামীর এ ভাব কেন? তা ছাড়া সে পত্নীগত প্রাণ, সে সচ্চরিত্র, তাহার এ ব্যবহার কেন? আর অণিমার সহিত ৭।৮ দিনের বেশী আলাপও তো তাহার হয় নাই।

যেদিন অণিমা আওরঙ্গবাদ ত্যাগ করিল সেদিন সে সত্যই একটুখানি ব্যথা অনুভব করিয়াছিল। নীরেন্দ্র ও মুরলা হায়দ্রাবাদে ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় মুরলা বলিল, "আমরা শীগ্‌গির কলকাতা যাচ্ছি ভাই,—আবার দেখা হবে।"

অণিমারা একমাস ঘুরিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। এবারে ভ্রমণ করিয়া অণিমা মুক্ত মনের ভাণ্ডারখানি অনেকটা পূর্ণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে তাহা সে নিজে যতখানি বুঝিতে পারিল তার চাইতে বেশী বুঝিলেন অচলা-সুন্দরী। কারণ তিনি দেখিলেন, পুরনো স্মৃতি-বিজড়িত বাড়ীটি এবারে অণিমাকে বিশেষ বিষাদক্লিষ্ট করিয়া তুলিল না, আই তিনি একদিন স্বামীকে বলিলেন, "দেখো, অণুকে দেখে এবারে বেশ ভালোই মনে হ'চ্ছে। শরীরটাও বেশ সেরেছে,—আর মনটাও বোধ হয় অনেকটা হাল্কা হয়েছে।"

হরনাথবাবু বলিলেন "হুঁ, এই রকম ক'রে যদি সত্যিই অণির মনটা একেবারে ভাল হ'য়ে যায়। আচ্ছা, মুরলাদের কলকাতা আসবার কথা ছিল না?"

অ—"শুনেছিলুম তো শীগ্‌গির আসবে।"

হ—"ওরা এলে অণির মনটা আরো ভালো হ'তে পারে —কারণ সদ্‌গুণে মানুষ অনেকটা বদলে যায়।"

অ—"তা ওরা লোক খুব ভাল গো। শুনেছি জামাইও সুন্দর মানুষ।"

হ—"শুনেছি কেন? আমার সঙ্গে তো দেখা হয় নি, তোমার সঙ্গেও কি হয়নি?"

অ—"না। দেখা আর হ'ল কবে? দুদিন আওরঙ্গাবাদে নেমন্তন্ন করেছিলুম তা দুদিনই সে আসতে পারেনি, কোথায় কি কাজে চ'লে গিয়েছিল। অণির মুখেই তার কথা যা শুনেছি!"

হরনাথবাবু হুঁকার নলটি মুখে তুলিয়া বলিলেন, "হুঁ, তারানাথবাবু তো জামাই বলতে একেবারে অজ্ঞান।"

স্বামী ও স্ত্রীর বক্ষ কাঁপাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস বা হয় দুইল জামাকৃতাগ্যে আজ তাঁহারাও তো গৌরব অনুভব করিতেন যথেষ্ট—কিন্তু অদৃষ্ট!

মুরলা ও নীরেন্দ্র কথামত শীঘ্রই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রথম দিনই মুরলা আসিয়া অণিমাকে লইয়া গেল। অণিমা, মুরলা ও নীরেন্দ্রকে পাইয়া আবার যেন সব ব্যথা ভুলিয়া গেল। সে প্রায়ই মুরলার বাড়ীতে যাইত, মুরলাও সর্ব্বদা আসিত, কিন্তু নীরেন্দ্র একদিনও অণিমাদের বাড়ী আসিল না, সেটা আর কেহ লক্ষ্য না করিলেও অচলাসুন্দরী লক্ষ্য করিলেন সবার চাইতে আগে। তবে তিনি কাহাকেও এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না।

সেদিন নীরেন্দ্র, মুরলা ও অণিমা একত্র বসিয়াছিল খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর অণিমা বলিল, "মুরা! এবারে বাড়ী যাবো ভাই। বেশী রাত হ'লে বাবা-মা ভাববেন।"

মুরলা বাধা দিয়া বলিল, "না, খেয়ে যেতে হবে। তাছাড়া মাসীমা আর মেসোমশায় তুমি এখানে আছ জানেন, তাঁরা কিছু ভাববেন না।"

মুরলার কথায় নীরেন্দ্র সায় দিয়া বলিল, "মুরা! তাহ'লে খাবার ব্যবস্থা কর, বেশী রাত ক'রে আর লাভ কি?"

মুরলা স্বামীকে অণিমার সহিত একা রাখিয়া যাইতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল এবং তাহার এই ভাব এই প্রথম দেখিয়া অণিমা একটু লজ্জিতা হইয়া উঠিল। মুরলার নির্ম্মল প্রাণে সন্দেহের কালো ছায়া পড়িবার কারণও ছিল যথেষ্ট, কারণ ইদানীং অণিমার প্রতি স্বামীর একটা অস্বাভাবিক টান লক্ষ্য করিতেছিল—যাহা দয়া নয়, মায়া নয়, স্নেহ নয়, অনুকম্পা নয়, আরো কিছু,—আরো যেন একটা কি! মুরলা প্রথমে নিজের মনের উক্তি নিজে বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু বহু রকমে তাহার স্বপক্ষে প্রমাণ পাইয়া আর অবিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারিল না, এবং অন্তরে সে বেদনা অনুভব করিলেও চুপ করিয়াই রহিল। নীরেন্দ্র মুরলাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "মুরা! অণিমাকে আমার কাছে রেখে যেতে ভয় করছ? কিছু ভয় নেই, ও এখন তোমার বন্ধু,

তখন ও আমারও একটা কিছু—যাও শীগ্‌গির খাবার যোগাড় কর গে।" এই কথা শুনিয়া মুরলা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া চলিয়া গেল। আর অণিমা নীরেন্দ্রের এইরূপ প্রগল্‌ভ উক্তিতে বাস্তবিক বিরক্ত হইয়া উঠিল। মুরলা চলিয়া যাইতেই নীরেন্দ্র অণিমার কাছে চেয়ারটি টানিয়া বসিতে—অণিমা উঠিয়া আর একটি চেয়ারে বসিল। নীরেন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "অণিমা, আমাকে এত ভয়?"

অণিমা উত্তাক্তস্বরে বলিল, "আজ আপনার কি হয়েছে নীরেনবাবু? ছি!—এসব আপনার কি ব্যবহার?"

নী—"ব্যবহার কিছু নয় অণিমা—"

বাধা দিয়া অণিমা বলিল, "আমার নাম ধ'রে ডাকবেন না—"

নী—"অণিমা, আমায় ক্ষমা কর—"

অণিমা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া রুদ্ধ স্বরে বলিল, "ছি নীরেনবাবু! আমাকে কেন যে আপনি আজ এভাবে অপমান করছেন তা জানি না—আপনার সঙ্গে মুরলার খাতিরে মেলামেশা করেছি তাই আপনি আজ সাহস ক'রে—"

অণিমার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল। নীরেন্দ্র আগাইয়া আসিয়া অণিমার দিকে চাহিয়া আবার বলিল, "অণিমা, জীবনে একবার ভুল হ'য়ে গেছে, তা ব'লে যদি আজ এ ভুল শুধরে নিতে চাই তাতে কি অপরাধ হবে? অণিমা আমায় ক্ষমা কর, আমায় গ্রহণ কর—"এমন সময় মুরলা ঘরে প্রবেশ করিল ও তাহাদের এরবস্থায় দেখিয়া বিবর্ণমুখে দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল। আর অণিমা কম্পিতপদে কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া মোটরে উঠিল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, চোখ ফাটিয়া জলের উৎস বহিতেছিল—সে কোনরকমে নিজেকে সংযত করিয়া ড্রাইভারকে আদেশ দিল, "চলো ঘর"।

সেদিন হরনাথবাবু ও অচলাসুন্দরীও একটু বিরক্তি-প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "অণি! অতটা মেলামেশা করিস্ না মা। লোকে কে কি বলবে কে জানে? আর সে জামাই কেমন লোক তাও ভাল বুঝলুম না। সে তো একদিনও এখানে এলো না। সেই যা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন তাও তো ভাল বুঝতে পারছি না।"

অণিমার বুকের ভিতর তখন তুফান বহিতেছিল। এ দেশের নারী সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে পারে কিন্তু নারীত্বের অপমান বুঝি সে কোনরকমেই পারে না। সে অন্তরে যদি বা কখনো দুর্বলতা প্রবেশ করে তবুও তাহার নারীত্বের চির পবিত্রতা কোন রকমে আকাতরে বিসর্জন দিতে পারে না। অণিমা নীরেন্দ্রকে শ্রদ্ধা করিত, ভক্তি করিত, হয়তো বা একটু ভালবাসিত—কিন্তু নীরেন্দ্র এ কি করিল? তাহার স্বচ্ছ সরসী-জল নির্দ্দয়ভাবে আলোড়িত করিয়া পঙ্কিল করিয়া তুলিল কেন? সে বহুকষ্টে কান্না বুকে চাপিয়া বলিল, "সত্যি মা, আর ওদের সঙ্গে মিশবো না।" তাহার মনে হইল যদি তাহার স্বামী,—তাহার ইহকাল-পরকালের রক্ষাকর্ত্তা, তাহার মান-সম্ভ্রমের অধিকারী, লজ্জাসংযমের আবরণ সেই স্বামী যদি তাহাকে আজ পরিত্যাগ করিয়া না যাইত তাহা হইলে কি আর নীরেন্দ্র আজ তাহাকে এই ভাবে অপমান করিতে পারিতেন? কখনই না। আর মুরলা সেই বা কি ভাবিল? অবিশ্বাসিনী, দুশ্চরিত্রা, কলঙ্কিনী, বন্ধুদ্রোহী কত কি সে ভাবিতেছে, কিন্তু সে কি জানিবে যে অণিমা একেবারে নির্দ্দোষী? আর কি করিয়া সে মুরলাকে মুখ দেখাইবে? অণিমা নিজের ঘরে শুইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অণিমা কয়েকদিন মুরলার কোন খবর না পাইয়া আরো বিষণ্ণ হইয়া রহিল। অন্তর তাহার জ্বলিয়া যাইতেছিল। মাকে নীরেন্দ্রের ও মুরলার বন্ধুত্ব পাইয়া যে শান্তিটুকু সে পাইয়াছিল তাহা একদিনের আঘাতে আবার একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল,—ক্ষণিক বিস্তৃত হতাশা ও ব্যর্থতা তাহাকে আরো সজোরে চাপিয়া ধরিল। দিন দাতেক পরে হঠাৎ একদিন মুরলা আসিয়া দেখা দিল। অণিমা তাহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইল কিন্তু মুরলা নানাকথা বলিয়া অণিমার বিব্রত ভাব সরাইয়া দিল। সে বলিল, "এতদিন আসতে পারিনি ভাই। চল আজ আমার ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ।"

অণিমা আশ্চর্য্য হইল। সেইদিন সে নিজের স্বামীকে ওরূপ অবস্থায় তাহার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে,

তাহাকে কিনা আবার আদর করিয়া নিমন্ত্রণ করা? কি জানি অণিমাকে কোনদিন এই অবস্থায় পড়িতে তো হয় নাই—সে যে সম্পূর্ণা হইলেও আজন্ম কুমারী-ভক্ত-ধাত্রী। সে মুরলার ভাব বুঝিতে না পারিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইল—"না।"

মু—"কেন?"

অ—"না,—এমনিই।"

মু—"ওঃ! সেইজন্য? খুব লাগল! উনি ঐরকমই ভাই। আচ্ছা, আমার মুখ চেয়ে ওঁকে মাপ কর। আর এমন হবে না। আমি মাসিমা আর মেসোমশায়কে ব'লে আসি।"

মুরলা কিছুক্ষণ মাসিমা ও মেসোমশায়ের সহিত আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিল। তারপরে বাপ-মায়ের কথায় ও মুরলার সনির্বন্ধ অনুরোধে, অণিমা আবার যে বাড়ী হইতে মাথা নীচু করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল সেই বাড়ীতে চলিল।

মুরলার বাড়ী সেদিন ফুলে ফুলে হাসিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যুষ একটা উৎসবের মৃদু গুঞ্জরণ যেন প্রতিস্থান হইতে ধ্বনিয়া উঠিতেছে। আনন্দ-হাসি যেন আজ মুরলার গৃহতলে আসন পাতিয়াছে—কিসের আনন্দ? কিসের উৎসব? অণিমা আশ্চর্য্য হইল, এবং আরো আশ্চর্য্য হইল, যখন সে দেখিল নীরেন্দ্রনাথ নির্লজ্জভাবে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে—তখন বাগানের চাঁদ আকাশে হাসিয়া উঠিয়াছে—একরাশ জ্যোৎস্না ঘরের ভিতর হাসিয়া লুটাইয়াছে। অণিমা ভাবিল, আজ আকাশে বাতাসে এত হাসির রোল কেন? সকল দুঃখের অবসান করিয়া কোন্ বিরহিণীর মিলন শঙ্খ বাজিয়া উঠিল গো? বাধার মেঘ ঘুরে সরাইয়া কোন্ প্রেমিকা জগৎ জুড়িয়া হাসির লহরী বহাইয়া দিল?

অণিমা এতক্ষণ অন্যমনস্কে বসিয়াছিল, হঠাৎ সে দেখিল মুরলা উঠিয়া গিয়াছে, আর নীরেন্দ্র তাহার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। অণিমা বিরক্তি ও ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মুরলা কোথায় গেল?"

নীরেন্দ্র অণিমার সম্মুখ-পথে দাঁড়াইয়া বলিল—"অণিমা,—আমায় ক্ষমা কর; আমায় গ্রহণ কর।" অণিমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে কঠিন স্বরে বলিল, "নীরেনবাবু! এভাবে বাড়ীতে ডেকে এনে ভদ্রলোকের মেয়েদের অপমান করবার মানে কি?"

নী—"মানে কিছু নয় অণিমা! আমি তোমার কাছে বড় অপরাধী, আমায় ক্ষমা কর।" অণিমার অবশ বোধ হইল, সে তীব্রস্বরে বলিল, "এসব বলবার আপনার কোন অধিকার নেই।"

নী—"অধিকার আছে অণিমা, আছে।" নীরেন্দ্র দুই-পা আগাইয়া আসিল। অণিমা ভয়বিহ্বল অবস্থায় চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মুরা,—মুরলা—"

হাতে দুই-ছড়া মালা লইয়া মুরলা প্রবেশ করিল ও অণিমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"হয়েছে কি?"

অণিমার সবই অত্যন্ত রহস্যজনক মনে হইতেছিল। এত বড় একটি কাণ্ড স্বামী করিতেছে আর মুরলা দিব্য নির্ব্বিকারভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "হয়েছে কি?" অণিমা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হয়েছে কি? মুরলা! তোমার স্বামী অত্যন্ত নীচ পশু, নারীর সম্মান রাখতে জানেনা,—আর কখনো—"

মুরলা বাধা দিয়া শান্তস্বরে বলিল, "অণি! থাম। আমার স্বামী যদি নীচ পশু হন, তবে তোর স্বামীও তাই,—আমার স্বামী যদি নারীর সম্মান রাখতে না জানেন, তবে তোর স্বামীও জানেন না।... ওকথা আর বলিসনে—" বলিয়া মুরলা মালা দুইটির একটি নীরেন্দ্রের গলায় আর একটি অণিমার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, "দিদি! স্বামীর পায়ে মাথা রেখে এতদিনের জ্বালা জুড়িয়ে নাও—আর তোমার যত দুঃখের মূল আমি, আমাকে মাপ্ করো—"

মুরলা চলিয়া গেল। অণিমা অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় মাটিতে বসিয়া পড়িতে নীরেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "আমি নীচ, পশু, নয়,—তবে অবিবেচক, মূঢ়, অপরিণত চেতনবুদ্ধি, সমাজদ্রোহী;—থাক্ অণিমা! জীবনে বড় ভুলই ক'রে ফেলেছি। ক্ষমা কর, আমাকে গ্রহণ কর।... প্রথমটা মুরলার সঙ্গে আমার দেখা হয় দিল্লীতে, অজনার নিয়ে আমি প্রথম থেকে তাদের সঙ্গে মিশি, এবং আমি

মুরলাকেই ভালবেসেছি ভেবেছিলুম। তারপরে বাবা-মা'র অনুরোধে পড়ি—ধনীর মেয়ে দেখে তাঁরা ঘ'রে বিয়ে দেন। তাই তোমায় বিয়ে ক'রে পালিয়ে এসে আবার মুরলাকে বিয়ে ক'রে ঘরসংসার পেতে বসলুম। ভাবলুম, আমার হৃদয়ের উপর বাবা-মা'র কোনও অধিকার নাই। বাবা, মা মারা গেলেন, তারপরে আর গরিবের কোন টানই রইল না। খেয়ালের উপর দিয়ে এতদিন কেটে গেল। দেরাদুন ইস্কোলা থেকে মুরলার চিঠিতে তোমার বাবার নাম দেখে আমার যেন কেমন পরিচিত ব'লে মনে হ'ল। তারপরে তোমার কথা প'ড়ে বাস্তবিক আমি তোমাদের চিনতে পেরে নিজেকে ধিক্কার দিলুম ও তোমাকে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি ভেবে অনুতাপে দগ্ধ হ'তে লাগলুম, এবং তোমাকে দেখবার জন্য উৎসুক হ'য়ে আগ্রায় এলুম। তুমি আমাকে চিনতে পারনি, কিন্তু আমি পেরেছিলুম, আর তোমার বাবা-মা পাছে আমায় দেখে চিনতে পারেন সেই ভয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করলুম না। তারপর তো জানই। সেদিন—যেদিন তোমার দিকে আমি এগিয়েছিলুম সে আমার ঘৃণা ভেবেই। অণিমা! সেইদিনই মুরলাকে আমি সব কথা খুলে বলেছি। ভুলটা একটি হয়, সে যে মুছে নয়—দেবতা। সে আমাকে আজ ক্ষমা করেছে—এ ব্যাপার সবই মুরলার। তোমার প্রতি যত অন্যায়-অবিচার করেছি সেসবের বোঝা মুরলাই যেন মাথা পেতে নিয়েছে। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি,—অণিমা, ক্ষমা কর, আমায় গ্রহণ কর।"

অণিমা নীরবে স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখে একটিমাত্র শব্দ বাহির হইল—'মুরলা!' এমন সময় ওপাশের ঘরটা খুলিয়া হরনাথবাবু ও অতসীসুন্দরী প্রবেশ করিলেন। হরনাথবাবু আহ্বান-কণ্ঠে বলিলেন, "অণিমা আমার! আমার নীরদ কোথায়?" পরক্ষণে দেখা গেল—মুরলা অনাথাশ্রমের শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে।

সাধ

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

নারীজন্মে বহু দুঃখ ঘটিল এবার,
তবু ঘুচিলনা সাধ নারী হইবার।
জন্ম যদি বিধি মোরে দাও পুনরায়
হয় যেন নারীজন্ম,—মিনতি তোমায়॥
মা হইব, ধন্য আমি স্নেহের ভরিতা,
ছোট ভাইটির দিদি, নাথের বনিতা।
যে জন্ম লভিয়া বহু ঘরের পার্ব্বতী,
তার বেশী আর কিছু চাহেনাক মতি॥
ত্রিতাপহারিণী তারা, সুধার-জননী,
অন্নপূর্ণা, মহামায়া, শিবের ঘরণী।
পতিতপাবনী গঙ্গা, শিবের ঈশ্বরী
দুর্গা দশভুজা, যাঁর বাহন কেশরী॥
স্বজাতি হইতে চাই কমলা যাহার,
অনন্ত শয্যার সাথী কেশবকুমার;
ত্রিলোক-বন্দিতা দেবী অনুঢ়া বাণীর,
ব্রহ্মার মানস কন্যা বীণাবাদিনীর॥
সাবিত্রীসমানা, স্নেহে মূর্ত্ত-মঙ্গলিনী,
শুচির সুন্দর চিত্তে অমৃতবাহিনী॥

শিশুরক্ষণ-কেন্দ্র

শ্রী সীতা দেবী বি-এ

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার বহুলপরিমাণে হয়, ইহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই চাহেন। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পথে ছোটবড় অনেক যে অন্তরায়, তাহা অনেকেই বিশেষ তলাইয়া দেখেন না, দেখিলেও কি উপায়ে সেগুলি দূর করা যায়, সে বিষয়ে কিছু ভাবেন না। সম্প্রতি নানা-স্থানে এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে বোঝা যায়। তাহারই ফলে মহিলা শিক্ষা-সম্মিলনীতে সম্প্রতি একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—"যেসকল স্থানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানে যেন স্কুলের নিকটেই এক একটি শিশু-শিক্ষালয় এবং শিশুরক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইহাতে দরিদ্র পিতামাতাদের অনেক সাহায্য হইবে।"

স্ত্রীশিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইলে এই রকম কোনো ব্যবস্থা না করিলেই চলিবে না, কারণ বালিকাদের স্কুলে যাইতে পাওয়া বা না পাওয়া, অনেকাংশে এই ব্যবস্থাটির উপরই নির্ভর করে। বালকদের স্কুলে পাঠাইবার জন্য সকল পিতামাতাই যথাসম্ভব যত্ন করেন, কারণ শিক্ষা না পাইলে ভবিষ্যতে ইহারা উপার্জনক্ষম হইবে না। কিন্তু বালিকাদের বেলা অন্য রকম ব্যবহারই দেখা যায়। বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে তাহারা যদি ৩০টা দিন স্কুলে যাইতে পায় ত ঢের। মা'দের এদিকে কোনোই উৎসাহ নাই। গৃহস্থ-ঘরেই যখন এই দশা, তখন নিম্নশ্রেণীগুলির ভিতর স্ত্রীশিক্ষা চালাইতে গেলে যে পদে পদে কি বিষমভাবে ঠোকর খেতে হয় তাহা বুঝাই যায়। শিশুরক্ষণ-কেন্দ্র এবং শিশু-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত না হইলে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ বালকবালিকাদের শিক্ষালাভেরও অনেক বাধা ঘটিবে, বিশেষ করিয়া বালিকাদের।

এখনও বালিকাদের স্কুলে পাঠানর বিপক্ষে অনেকেই মত দেন। শিক্ষিতা মহিলা সম্বন্ধে বিরুদ্ধতার অভাব নাই, নানাপ্রকার অভদ্র ব্যঙ্গ এবং কুৎসা এখনও তাঁহাদের লইয়া করা হয়। নিম্নশ্রেণীর পিতামাতা ভাবে, মেয়ে হইবে ত পানওয়ালা না হয় গাড়োয়ানের স্ত্রী, তাহার আবার লেখা-পড়ার কি প্রয়োজন? তাহার মা, মাসীর যদি লেখাপড়া না শিখিয়া দিন কাটিয়াছে, তাহা হইলে মেয়েরও কাটিবে। বেশী লেখাপড়া শিখিলে সেটা যেন মেয়ের একটা অপরাধ বলিয়াই গণ্য করা হয়। উচ্চশ্রেণীর গৃহস্থ-সমাজেও ভাব প্রায় একই রকম। "মেয়ে কি জজ হবে?" "মেয়ে কি শামলা মাথায় দিয়ে ওকালতি করবে?" এই সব প্রশ্ন লাগিয়াই আছে। এ ব্যাপার যে শুধু আমাদের দেশেই বিশেষ করিয়া ঘটে, তাহাও নয়। ইংলণ্ডেও পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিতা নারীকে একটা অদ্ভুত জীব বলিয়া গণ্য করা হইত। "কলেজের মেয়ে" শুনিলে সেখানকার লোকেরও প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত,—কলেজের মেয়ে যেন কি একটা আজব দেশের জীব! উপহাস করিয়া শিক্ষিতা মেয়েদের বলা হইত "Blue stocking।" তাঁহাদের নাকি সর্ব্বদাই নাকে চশমা এবং মুখে পুরুষালি কথাবার্ত্তা। আমাদের দেশে নিজেরা যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা বুদ্ধিমতী স্ত্রী পাইতে অবশ্যই চাহেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রথমত হইতে হইবে "স্ত্রী" তাহার পরে "বুদ্ধিমতী"। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ লোকে এখনও স্কুলে-কলেজে পড়া-মেয়ে বিবাহ করিতে দীক্ষিতও তত্তই পায়।

মা'রা যে মেয়ের স্কুলে পড়া বিষয়ে খুব বেশী উৎসাহ প্রকাশ করেন না, তাহার প্রধান একটা কারণ এই যে মেয়েরা তাঁহাদের গৃহকর্ম্মে যথেষ্ট সাহায্য করে। আমাদের দেশের যা অবস্থা তাহাতে কয়জন আর ঝি-চাকর রাখিতে পারেন? বাসন-মাজা ছুটাইতে পারিলেই ঢের। বাড়ীর মধ্যে উপার্জ্জক হয়ত একজন মাত্র, তিনি দিনের বেশী ভাগ সময়টা অফিসে বা আদালতে কাটাইয়া দেন। বাড়ীতে থাকিলেও গৃহকর্ম্মে বা শিশুরক্ষণে সাহায্য হাজারের ভিতর একজন পুরুষও করেন কিনা সন্দেহ। তবে নিতান্তই

মেয়েদের ব্যাপার। অবশ্য মেয়েরা যতদিন পরের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া থাকিবেন, ততদিন এ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিবারও অধিকার তাঁহাদের নাই। সংসারে শ্রমবিভাগ বলিয়া ত একটা জিনিষ আছে? অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিবার ভার যদি কেবলমাত্র কর্ত্তার উপরে থাকে, তাহা হইলে গৃহকর্ম্ম এবং শিশুপালনের সম্পূর্ণ ভার গৃহিণীকে লইতেই হইবে। কিন্তু মানুষের কাজ করিবার ক্ষমতার ত একটা সীমা আছে? কাজেই গৃহিণীর যখন যি-চাকর রাখিবার ক্ষমতা নাই, তখন ছেলেমেয়েদের দিয়া যেটুকু সাহায্য তাঁহার হয়, তাহা তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু ছেলের স্কুল যাহাতে কামাই না হয়, সেদিকে বাধ্য হইয়া দৃষ্টি রাখিতে হয়, না হইলে বড় হইয়া করিয়া খাইবে কি-প্রকারে? কিন্তু মেয়ের ত সে বালাই নাই, কোনমতে একটা বিবাহ দিয়া দিতে পারিলেই তাহার খাওয়া-পরার সমস্যা চিরদিনের মত মিটিয়া গেল। মেয়ে বিধবা হইতে পারে, বা জামাই অকর্ম্মণ্য কিম্বা পীড়িত হইতে পারে, এ সব সম্ভাবনার কথা ত আর কেহ আগে ভাবিতে বসে না? সুতরাং মেয়েকে স্কুলে পাঠাইবার দরকার কি? একটা ছোট মেয়েতে কি কম কাজ করে? ছোট ভাই-বোন সামলান, উনুনে কাঠ দেওয়া, চাল ধোওয়া, তরকারি কোটা, পান সাজা, পুঁথি দিয়া তরকারি নাড়া, খাইবার জায়গা করা প্রভৃতি হাজার কাজ তাহাকে দিয়া করাইয়া লওয়া যায়। না হইলে মা একলা হাতে সংসার সামলাইবেন কি প্রকারে? দরিদ্রের সংসারে ছয়-সাত বৎসরের মেয়েতে এই সকল কাজই করে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা যদি বালিকাদের জন্য চালানও যায়, তাহা হইলেও বিশেষ লাভ হইবে না। ছোট ভাই-বোন ফেলিয়া বালিকারা অধিকাংশ দিনই স্কুলে আসিবে না। তবে প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী শিশুশিক্ষালয় এবং শিশুরক্ষণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিলে, এ সমস্যার একটা ভাল মীমাংসা হয় বটে। বালিকাস্কুলের সঙ্গেই কিম্বা অতি নিকটেই এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জায়গা দিতে হইবে। তাহা হইলে ছোট ভাইবোন সঙ্গে করিয়াই গরীবঘরের মেয়েরা স্কুলে আসিতে পারিবে। পিতামাতাও খানিকটা নিশ্চিন্ত হইবেন, কারণ নিজের লোক একজনও কেহ কাছাকাছি আছে জানিলে, ছেলেপিলে সম্বন্ধে অতটা ভয় থাকে না। এবং ছেলেমেয়ের বোঝা ঘাড় হইতে যদি নামিয়া যায়, তাহা হইলে বড় মেয়েদের স্কুলে যাইতে দিতেও মায়েরা আপত্তি করিবেন না। তাঁহাদের বরং খুসী হইবারই কথা। নিরুপদ্রবে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে পাইবেন, ইচ্ছা হইলে অন্য কাজও কিছু করিতে পারিবেন।

বালিকাদের স্কুলে যাওয়া সম্ভব করিবার জন্যই যে শুধু শিশুরক্ষণ-কেন্দ্র প্রয়োজন তাহা নয়। ইহার অন্য বিশেষ প্রয়োজনও আছে। আমাদের দেশে আর্থিক সমস্যা ত ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। একজনের রোজগারে ভাল করিয়া সংসার চালান এখন প্রায় অসম্ভবই হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সকলেই আজকাল বুঝিতে পারিতেছেন, এবং প্রতিকারের চেষ্টাও স্থানে স্থানে হইতেছে। আরো বহুল পরিমাণে যে হইতেছে না, তাহার কারণ আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাব, অবরোধপ্রথা এবং স্ত্রীলোকদের অবসরের অভাব। স্কুল কলেজে শিক্ষা যাঁহারা পান নাই, তাঁহারা অবশ্য শিক্ষয়িত্রীর কাজ, সম্পাদিকীর কাজ প্রভৃতি করিতে পারিবেন না। কিন্তু এমন বহুই কাজ আছে, যাহাতে বেশ উপার্জ্জন হয়, অথচ বেশী লেখাপড়া জানার প্রয়োজন হয় না। নানাপ্রকার সেলাই, বয়ন, সুতা কাটা, কাপড় রং করা, সূক্ষ্ম সূচের কাজ, মূর্ত্তি গড়া, পুতুল গড়া, ছবি আঁকা প্রভৃতি অসংখ্য কাজ আছে। এসব কাজ আরো বেশী সংখ্যায় মেয়েরা করেন না কেন? কারণ এই যে, অধিকাংশস্থলে যেসকল মহিলাদের প্রয়োজন বেশী তাঁহাদেরই সময়ের অভাবও বেশী। বিবাহের পূর্ব্বে আর্থিক সমস্যা বিশেষ প্রবল থাকে না। অনেক মেয়ে সখ করিয়া কাজ করেন বটে, পিতামাতার সাহায্য করিবার জন্যও কেহ কেহ করেন, কিন্তু বিবাহের পর এবং সন্তান হইবার পরই বেশীর ভাগ স্থলে অর্থের অনটন প্রবল হইয়া উঠে। তখন যা হয়ত ইচ্ছা করেন, কোনো না কোনো উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করিয়া স্বামীর ভার লাঘব করিতে, কিন্তু সময় এবং সুবিধা করিয়া উঠিতে একেবারেই পারেন না। বাহিরে যাইয়া উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা এবং শক্তি হয়ত তাঁহার আছে, কিন্তু শিশুসন্তান রাখিয়া যাইবেন কোথায়? সহরে আসিয়া বাস করার ফলে, অধিকাংশে ঘরেই স্বামী, স্ত্রী এবং

ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য লোক থাকে না। স্বামী-স্ত্রী দুই জনেই যদি উপার্জ্জন করিতে বাহির হইয়া যান, তাহা হইলে ঘর-সংসার, শিশুরা কাহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে? স্ত্রী উপার্জ্জন করিলে একজন আয়া বা ঝি রাখা হয়ত যায়, কিন্তু তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, সমস্ত কিছু তাহার হাতে ফেলিয়া যাওয়া কঠিন। যাঁহাদের বাহিরে গিয়া কাজ করা কোনোকারণে চলেনা, তাঁহারাও অবসর পাইলে অনেক কাজ ঘরে বসিয়াই করিতে পারেন। পাড়ায় যদি দুইএকটি এইরূপ শিশুরক্ষণ-কেন্দ্র বা শিশুবিদ্যালয় থাকে, তাহা হইলে এই-সকল মহিলাদের কত যে উপকার হয় তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। শিশুদেরও ইহাতে অপকার কিছু নাই। তাহারা যাহাতে ধূলা এবং আনন্দে থাকিতে পারে, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা এই সকল রক্ষণ-কেন্দ্রে করা হইবে।

প্রত্যেক রক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষিতা ধাত্রী থাকিবেন, এবং শিশুবিদ্যালয়গুলিও উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা চালিত হইবে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের উপরেই এইগুলির ভার ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। তাঁহাদের এমনই যথেষ্ট কাজ থাকে। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা সাহায্য করিতে পারেন। সপ্তাহে অনেক ঘণ্টা তাঁহাদের ছুটি থাকে, তখন তাঁহারা গিয়া শিশুদের দেখাশোনা করিতে পারেন, অপেক্ষাকৃত বড় শিশুদের কিছু কিছু শিক্ষাও দিতে পারেন। ইহারাই ত অচিরে তাঁহাদের ছাত্রছাত্রীর দল বৃদ্ধি করিবে।

এই সকল শিক্ষালয় এবং রক্ষণকেন্দ্রগুলি বেশ সাধাসিধাভাবেই চালান যায়, বিশেষ আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। দুইটি বড় ঘর, এবং খানিকটা খোলা জমি হইলেই হইল। একটি ঘরে একেবারে শিশু যাহারা, তাহারা নার্সের তত্ত্বাবধানে থাকিবে, অন্য ঘরখানিতে একটু বড় ছেলেমেয়েরা থাকিবে এবং খেলা করিবে। যখন বেশী রৌদ্র বা বৃষ্টি না থাকিবে, তখন খোলা জায়গায় খেলা করিবে। বৃষ্টির সময় খেলিবার জন্য একটা ছাদওয়ালা বড় বারান্দা থাকিলে ভাল। ধাত্রী রেখনা অনেক রাখিবার প্রয়োজন নাই। পরিষ্কার বালি এবং মাটি প্রচুর পরিমাণে থাকিলে, তাহা লইয়াই ছেলেমেয়েরা নানারকম খেলা খেলিবে, কিছু বড় হইলে সরু মাটির দাহায্যে বর্ণমালাও খানিক খানিক শিখিতে পারিবে। রং করা বল্ এবং রঙীন ছোট ছোট ইট এখেত্রে-শিশুর দেওয়া যাইতে পারে। বড় ছেলেমেয়েরা তাহা দিয়া কল ফুল পাখী মাছ প্রভৃতি গড়িতে শিখিতে পারে।

যেসকল বালকবালিকা গল্প বুঝিতে পারে তাহাদের নানারকম পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক গল্প বলা যায়, উপকথাও যে না বলা যায়, এমন নয়, তবে আগাগোড়া সব গল্পই উপকথা না হওয়া ভাল। ছবির বই জোগাড় করিতে পারিলে ছবি দেখান যায়। গান শুনিলে প্রায় সব ছেলেমেয়েরই খুসী হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিবার এবং নাচিবার চেষ্টা করে। এই সকল স্বাভাবিক ইচ্ছাকে ঠিক পথে চালিত করিবার ভার শিক্ষয়িত্রীর লওয়া উচিত। ছেলেমেয়েরা যাহাতে নোংরামি এবং মিথ্যাবাদিতা না শেখে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

একেবারে শিশু যেগুলি, তাহারা ঠিক সময় এবং ঠিক ভাবে খাইতে পাইতেছে কিনা দেখা দরকার। কাপড়-চোপড় ভিজাইতেছে কিনা, মাটি হইতে কুড়াইয়া খাইতেছে কিনা, এ সকল দিকে নার্সেরা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। চোখদুটি না থাকিলে তাহারাও খোলা জায়গায় বাহির হইতে পারে। নানাবয়সের শিশু একত্র হইলে পরস্পরের কাছে কুশিক্ষা, গালাগালি প্রভৃতি শেখার ভয় আছে। একজনের রোগ আর একজনে সংক্রামিত হওয়াও অসম্ভব নয়। এইসকল দিকে শিক্ষয়িত্রীকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মারামারি কমাটাও যেন অতিরিক্ত রকম না হয়।

শিশুকালে এইভাবে শিক্ষিত হইলে এবং পরে অন্ততঃ প্রাথমিক স্কুলে কিছু শিক্ষালাভ করিলে, ভবিষ্যৎ জীবনে বালকবালিকারা সময় কাটাইবার জন্য সন্তবতঃ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া অশ্রাব্য গালাগালি এবং নানারকম কুৎসিৎ আচার শিখিবেনা। ছোকরা-জোটএর অধিবাসীও করিবে।

যাহারা বিশেষ লেখাপড়া জানেন না, বা অন্য এমন কোনো কাজ জানেন না, যাহাতে উপার্জ্জন করা যায়, তাঁহারা এইরূপ রক্ষণকেন্দ্র চালাইবার চেষ্টা করিতে

পারেন। নারীমাত্রেই শিশু ভালবাসেন এবং তাহাদের পালন করিতে খানিকটা অন্ততঃ পারেন। অভিজ্ঞ লোকের কাছে দুইচারিটি বিষয়ে পরামর্শ লইলে, এই কাজ চালান কিছু কঠিনতা হইবে না। পরিচ্ছন্নতা এবং সতর্কতা থাকিলেই চলিবে। প্রত্যেক শিশু পিছু কিছু কিছু বেতন লইলে, খানিকটা উপার্জ্জনও হয়। যাঁহাদের উপর ঘরসংসার বা শিশুর ভার বেশী নাই, তাঁহারা অনায়াসে এ কাজ করিতে পারেন। ইহাতে নিজেরা স্বাধীন হইতে পারেন, এবং বহু নারীকে পরাধীনতা মুক্ত হইতে সাহায্য করিতে পারেন। আশা করি সকলেই এবিষয়ে ভাবিয়া দেখিবেন।

কার্ত্তিক মাসের 'স্ত্রীধর্ম্ম' নামক পত্রিকায় শ্রীমতী ওম্ হেমন্তমান্ এই বিষয়ে মোটামুটি কিছু আলোচনা করিয়াছেন। উহা ইচ্ছা করিলে পাঠিকারা পড়িয়া দেখিতে পারেন। এখানে তাহার অধীনতা এখন সকল দেশেই চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য সামাজিক আচারব্যবহারের স্বাস্থ্য অনুযায়ে এই সমস্যার সমাধানও বিভিন্ন রকম হইবে প্রত্যেক জাতিকে নিজের নিজের পথ বাছিয়া নিতে হইবে। আমরা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মেয়েদের দিক হইতে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিলাম। আমরা যেরূপ আড়ম্বরহীনভাবে শিশুরক্ষণ কেন্দ্রগুলি আরম্ভ করিতে বলিয়াছি, তাহার চেয়েও সাদাসিধাভাবে কাজ আরম্ভ করা যায়। অনেক পরিবারেও এমন বিধবা বা সন্তানহীনা নারী থাকেন, চলুরবেলা যাঁহাদের কোনই কাজ থাকেনা। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে পাড়ার দু'চারিটি শিশুরক্ষণের ভার কয়েকঘণ্টার মত বেশ লইতে পারেন। বাড়ীরই একখানা ঘরে ইহাদের তখনকার মত থাকিবার ব্যবস্থা করা যায়। খরচপত্র পরিবার এবং বেশী কিনিষপত্রে তৃপ্তি না হলেই হইল। প্রথমেই বাড়ীভাড়া করার উৎপাতটা তাহা হইলে আর থাকে না। নিজেদের ঘরে থাকাও হয়, উপার্জ্জনের একটা পথও হয়।

কোনো নূতন জিনিষকেই আমাদের দেশে সহজে কেহ গ্রহণ করেনা। তাহার পক্ষের যুক্তগুলির দিকে না তাকাইয়া, তাহার বিপক্ষে কি কি বলিবার আছে, সেইদিকেই সকলের চোখ পড়ে বেশী করিয়া। ছোট ছেলেকে পরের কাছে ফেলিয়া রাখার বিরুদ্ধে বলিবার কথা অবশ্য যথেষ্টই আছে। কিন্তু তাহাদের মানুষ করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্যও মাতাকে খানিকক্ষণ শিশুপালন হইতে অবসর লইতেই হইবে। অজ্ঞাতকুলশীলা মাহিনা করা ঝিয়ের হাতে ফেলিয়া না রাখিয়া, পরিচিতা তত্ত্বাবধান করার কাছে রাখার সুবিধা অনেক আছে। মেয়েদের উপার্জ্জন করাটা যদি অপরাধ বলিয়া গণ্য না হয়, তাহা হইলে এই-সকল শিশুরক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে সন্তান প্রেরণ করাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবেনা। শুধু মাত্র যে কাজ করিবার অবসর পাইবেন তাহা নয়, বয়োজ্যেষ্ঠা বালিকার নিয়মমত স্কুলে যাইতে এবং পড়া করিতে সময় পাইবে। যে রমণীর কাছে শিশুগুলি দুপুরে থাকে, তিনি যদি বুদ্ধিমতী এবং স্নেহপরায়ণা হন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা শিশুদের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; বরং উপকারই হইতে পারে। তাহারা সদভ্যাস শিক্ষা করিতে পারে, এবং ভ্রমক্রান্তা মাতা ও ভগিনীদের অযথা প্রহারের হাত হইতেও খানিকটা নিষ্কৃতি পায়।

পথ-হারা

শ্রী লীলা দেবী

কেহ নাই, একাকিনী কোথা যেতে চাই,
এ পথে যে নাই কেহ পথিক সুজন—
অতি দুর্গম পথ: বলো, কোথা যাই
একেলা যাত্রিত ভ্রান্ত অবশ চরণ।

এখন ত নাহি আর ফেরার উপায়
কেমনে ফিরিব গৃহে?—অবসর দেহ।
তবে কি মরণ এই অরণ্যে নিশায়
এ ঘন তিমির মাঝে? নাহি বন্ধু কেহ।

সন্ধ্যা ও সিন্ধু-শ্রী—শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে আট আনা ও পাঁচ আনা।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া সত্যই আমরা আনন্দলাভ করিলাম। স্বভাবসুন্দর কবিতাগুচ্ছ। কোন নিরালা-নিকুঞ্জে বসিয়া কবি যেন 'আপন মনের সমস্ত মাধুরীটুকু মিশাইয়া' সুরের পর সুর গাহিয়া চলিয়াছেন কবাংশুশ্রীর চরণোদ্দেশে। সে সুরের বিচিত্রতায় বনরাজি বাসন্তীশ্রীর মত হইয়া উঠিয়াছে, বাতাস গন্ধ-মন্থর—আকাশ অম্লান।

বাংলার শ্যামল মাটিতে কবির অভাব কোনদিন হয় নাই। কত কবি আপন নিভৃত নীড়ে কাব্যসাধনায় রত থাকেন, কে তাহার খবর রাখে। যাঁহার কবিতা মাসিকের পৃষ্ঠায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ পায় তাঁহারই কথা আমরা জানিতে পারি। তাহাও সবসময় ভালভাবে জানা হইয়া উঠে না। অমিয়বাবু যদি তাঁহার কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ না করিতেন তবে আরো কতদিন যে তিনি বঙ্গসাহিত্যে প্রচ্ছন্ন রহিতেন কে জানে। আমরা তাঁহাকে সাদরে বঙ্গবাণীর পূজামন্দিরে আহ্বান করিতেছি।

সন্ধ্যার কবিতাগুলির মধ্যে হারানো প্রিয়জনের স্মৃতির বেদনা অনুস্যূত হইয়াছে। সারাদিনের কর্ম্ম-কোলাহল-ব্যস্ততার পর সন্ধ্যার নিবিড় শান্তি যখন নামিয়া আসে তখন কি যেন একটা অভাব মানুষকে চিরদিনই ক্রন্দনাতুর করিয়া তুলে। কবি তাঁহার কাব্যে সেই 'কি যেন কি'-টিকেই খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন—

"কোন কথায়, কোন গানে
আছ তুমি কোনখানে?
কোন সুরের কোন তানে
আছ তুমি কোন প্রাণে?"

সারা বিশ্বের কোনখানে তাহাকে পাওয়া গেল না, তাই কবি অসহায়ের মত বলিতেছেন—

খুঁজে দেখি
সব খানে
খুঁজতে কোথাও নাই বাকি,
তোমার তরে
পথ যাবা
এতি তবে সব ফাঁকি।"

এই বেদনা-বোধকে স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্য কবি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন—

যাবা হাহার জানবে দাও
আমার বুকে যা দিয়ে,—
যে তাহার বুকে কাও
আমায় কিছু না দিয়ে।"

এত করিয়াও তাহাকে জানা হইল না—পাওয়া হইল না—তখন কবি বিশ্বের অন্তরালে আপন অন্তরের মধ্যে শুধু একটিবার প্রিয়জনের দর্শন ভিক্ষা করিয়া বলিতেছেন—

"বিশ্ব হ'তে আজ করেছি দুয়ার বন্ধ—"
এখন তুমি এসো—
"আজকে সাঁঝে
তোমার অভিসারের কথা জানবে নাকো কেহ।"

এখনো কবির আশা পূর্ণ হইল না। সন্ধ্যার এই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা কবিকে কত সুরে বাঁধাইল। বিশ্বের

কিন্তুরে বা বাহিরে কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না, কবি তখন হতাশ কণ্ঠে গাহিতেছেন—

"পাইব কি আর শুধু হতাশায়···
কখনো কি তারে পাবো না?"

সকাতরতাতেই এ প্রশ্ন করুণ এবং প্রাণস্পর্শী।

সিন্ধু শ্রীর সমস্ত কবিতাগুলিই পুরীর সমুদ্রকূলে রচিত। সিন্ধু সান্নিধ্য যে বিরাটত্বের ইঙ্গিতে কবিপ্রাণকে আন্দোলিত করে ছন্দের মধ্যে তাহাই সুপ্রকাশিত হইয়াছে। সমুদ্রের শান্ত সৌম্য ভীষণ রুদ্র প্রভৃতি সমস্ত রূপগুলিই কবির নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি বর্ণনা এমন প্রাণময় যে সমুদ্রের ছবিখানি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

সাগরশ্রী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছেন—

"ঝিকিক ঝিক
বালুর চিক"

•

"পায়ের তল—
ছলাৎ ছল"

•

"ঢাকের সাড়া
আঁচল ওড়া

•

"ছলাৎ ছল
আঁখির জল"

এই সাগরতীরে কবির আত্মবিস্মৃতিখানি "স্বপ্নে পাওয়া"—

"পুণ্যস্মৃতি ঘিরে রাখার একটি উপাদান,
সর্ব্বহারার এই জীবনে কম করা যান।"

এইখানে "সিন্ধুর জল আছড়ে পড়ে
পায়ের তলায় এসে,
উদাস বাতাস ব্যথন করে
গভীর দিশেহারা।"

এই নিরালা ঘরে তিনি আপন সাধনায় রত। এইখানে সেই সুচিরু-বাঞ্ছিতের জন্য কবির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহাকে দেখিতেছেন অথচ পাইতেছেন না—

"সাথী-হীন এই ভোরের বেলায়—
শুনি তব কথা শুনি কাণে কাণে।"

তাই কবি সিন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ওগো সিন্ধু···

চিরদিন ধরে আসে চাহিয়াছি যারে
সুদূরীর বুকে তব রেখেছ কি তারে,
বিজনে বসিয়া কিসে গাঁথে মণিমালা,
নিজমনে গাহে গান—ঘর করে আলা।
সুনীল বরণ তব পাড় নীলিমার,
আঁক ওগো আভা তার আঁখি-তারকার?"

কত রূপে কত সুরে কবি তাঁহার বাঞ্ছিতাকে ডাকিতেছেন। এখনও সময় আছে; "হয়তো বা এর পরে—

এই কাজ-ভরা জীবনের মহা কোলাহল
অবিরাম রবে ঘিরে'।"

এমন "তুমি শুধু বস পাশে
মধুর আঁখির হাসে,
আমি শুধু আঁখি মেলে
আপনারে যাবো ভুলে।"···

যার এই কয়েকটা মুহূর্ত্তই তোমায় আঁখি মেলিয়া দেখিয়া লই।

তারাদাস

জীবনের গৌরব

শ্রী অনুরূপা দেবী

বিদ্যার এবং বিদ্বানের গৌরব শুধু এই বর্ত্তমান যুগের অথবা কোন দেশের বা জাতির বিশেষ ধর্ম্ম নহে, সকলদেশে এবং সকলকালেই বিদ্যা বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়া আসিয়াছে। আমাদের এদেশে আমাদের মনীষী শাস্ত্রকারগণ তো বিদ্যার স্থান জগতের সমুদয় ঐশ্বর্য্য-সম্ভারের উপরেই দাবী করিয়া গিয়াছেন—

"বিদ্যাবিহীনা পশুভিঃসমানা"—"বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ"—"বিদ্যারত্নং কুলাগারং"—"জ্ঞানহীনা জীবনং বৃথা"—"সর্ব্ববিদ্যাসমোবন্ধু"—"যথা পণ্ডিতের ভণ্ডাঃ সভে মূর্খ দোষোহিতেকলং"—ইত্যাদি অজস্র নীতি-গ্রন্থে বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"—এই বাক্যে বিদ্বানের স্থান রাজপুরুষেরও উর্দ্ধে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এর চেয়ে বেশী গৌরব আর কোন্ যুগে কোন্ জাতি দিতে পারিবে?

ইহা ব্যতীত আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞানধর্ম্মের মাহাত্ম্যে বিদ্যাদানকে সকল দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর দান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋষিদের মতে—

"ইতিহাস পুরাণানি নির্দ্দিশ্য যঃ প্রযচ্ছতি
ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিজসত্তমঃ।"

—অর্থাৎ যিনি ইতিহাস পুরাণেত্যাদি রচনা করেন, তিনি ব্রহ্মদানের চেয়েও দ্বিগুণ পুণ্যলাভ করিয়া থাকেন। তাঁরা আরও বলিয়াছেন—

'জ্ঞানেন ন কৃতং যস্তি বিদ্যারত্নং মহাধনম্'

—এই মহাধন স্বরূপ যে বিদ্যারত্ন ইহা দানের দ্বারায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ইহাই এ দানের বিশেষত্ব।

আমাদের ছোটবেলায় বাংলা পাঠ্যপুস্তকে পদ্য মুখস্থ করিয়াছি—

"এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
বহুই করিলে দান তত যাবে বেড়ে।"

সেইজন্যই বলিতেছি নর বা নারীর শিক্ষাপ্রসারের যদি আমরা একান্তভাবে সহায়তা করিতে পারি, তার চেয়ে বড় কাজ আমাদের আর বেশী করিবার থাকে না।

শুধু এদেশেই নয়, যেমন প্রাচ্যে তেমনই পাশ্চাত্যেও সেদেশের মনীষীরা যেন আমাদের শাস্ত্রকারদিগেরই জ্ঞানের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

"Ignorance is the root of all evil"—
"অজ্ঞতাই সকল পাপের মূল।"
"All gifts that of learning is the highest.—"
"সমস্ত দানের মধ্যে বিদ্যাদানই শ্রেষ্ঠতর।"

ভিক্টর হিউগোর মতে—যিনি একটি বড় রকম স্কুল স্থাপন করেন,—তিনি একটি কারাগারের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন।

এই সর্ব্ব-সম্মত সকলজন-সম্পূজিত বিদ্যার প্রচার যে শুধুই পুরুষের পক্ষে আবশ্যক তাহা নয়, নারীর জন্যও যে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা এখনে কাহাকেও বলিবার অপেক্ষা করে না। তাই নারীশিক্ষা-সমিতি প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা ছিল, এবং আজও ইহাকে বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজনীয়তার শেষ হইয়া যায় নাই। কিন্তু "নারীশিক্ষা-সমিতি"র—এই যে একটি বৎসরের ইতিহাস, সমিতির এই নবজন্মের প্রথম বৎসরের কাহিনী এ পূর্ণতার গৌরবে গৌরবময়, উন্নতির সাফল্যে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই, এ কথা আমাদের পক্ষে লজ্জার এবং দুঃখের বিষয় হইলেও এই সত্য আমাদের সলজ্জ ভাবেই আজ স্বীকার করিতে হইবে। যতদূর আশা লইয়া আমরা এই লক্ষ্যে অতীতবর্ষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলাম, আমাদের স্বভাবজ অনাগ্রহ, আলস্য এবং প্রয়োজনীয়তা-বোধ সম্বন্ধে অজ্ঞতার আমরা সাধারণভাবে সফল হইলেও সে পরিমাণে যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারি নাই, সমিতির কার্য্যবিবরণীর মধ্যেই এ কথার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম বৎসরে আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই বলিয়াই যে দ্বিতীয় বৎসরে আমরা আশাতীত ফললাভ করিতে পারিব না এমন কথা বলা যায় না। বেহারের সুপ্রসিদ্ধ আম, কিছুই এক এক বৎসর বাদ দিয়া সুপ্রচুর-রূপে ফলিয়া থাকে। অতএব আসুন, আমরা এই দ্বিতীয় বর্ষারম্ভে এবার আবার নূতন করিয়া নবোৎসাহের সহিত আমাদের এই নারীশিক্ষা-সমিতির মর্য্যাদাকে সার্থকতা দান করিবার জন্য সংহতিবদ্ধ হইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে চেষ্টিত হই। নিশ্চেষ্টতার চেয়ে অন্ততঃ মানসিক চেষ্টাও অনেক ভাল, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।"

কর্ম্ম আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া আছেই, ভগবান

বলিতেছেন, বাহিরে কর্ম্মত্যাগ করিলেও মনের মধ্যে কর্ম্মত্যাগী হওয়া সহজ নয়, আমরা কর্ম্ম করিতে যে সহজেই এত ভীত হই, উহার কারণ নিশ্চয়ই বৈরাগ্য নহে, আলস্য।

'একদিনে কোন বড় কাজই হয় না, মৃদুঃ পন্থা—এক পায়ের পর এক পা ফেলিয়া—এক সিঁড়ির ধাপের পর আর এক সিঁড়ির ধাপে পা তুলিয়া তবেই আমাদের পথ চলা বা উপরে উঠা করিতে হয়, কিন্তু শুধু যদি একই স্থানে দাঁড়াইয়া ড্রিল করা হয় সিপাহীদের মতন পা তুলিয়া আর পা ফেলিয়া রাইট-লেফ্‌ট, লেফ্‌ট-রাইট করিতে থাকি, কোন জন্মেই আমাদের অগ্রসর হওয়া ঘটিবে না, তবে হাঁও বলি,—এতে অগ্রসর হওয়া ঘটিবে না বটে, তথাপি বিছানায় শুইয়া বসে থেকে চটিতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঐ রাইট-লেফ্‌ট এবং লেফ্‌ট রাইট করাও অনেকটা ভাল, কারণ তাহাতে কোন একদিন চলার আবশ্যকতা যে ঘটিতে পারে, এবং সেদিনে সবার সঙ্গে একসঙ্গে পা ফেলিয়া সমানভাবে চলিয়া যাইতে হইবে, এই কথাটাও মনে পড়াইয়া দিতে থাকে এবং পা দুখানাকেও চলার জন্য একটুখানি তৈরী করিয়া রাখে। এই এক বৎসরের তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে আমাদের সমিতির ইতিহাসে, নারীশিক্ষার ইতিবৃত্তে মহান লক্ষ্যের উপযুক্ত কোন বড় ঘটনা ঘটে নাই বটে, তথাপি এরই মধ্যে ইহাদের চেষ্টা ও যত্নের দ্বারায় একটি নৈশ্যাচক শিল্প-শিক্ষার ক্লাস, এবং একটি মেয়েদের সাপ্তাহিক মেলামেশার ক্লাব খোলা হইয়াছে। চাপমান বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সহায়তায় শিল্প ক্লাসের এবার সাড়ী। সুবিধা হওয়ায় আমাদের আশা আছে এই প্রচেষ্টাটি এবারে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। অন্তরঙ্গী বন্ধু এবং মেয়েদের এইভাবে পরস্পরে বিদ্যা-বিনিময় এবং মেলা-মেশার প্রয়োজনীয়তা আমি স্বীকার করি। ইহাদেরই একদিন সংসারের কর্ত্রী এবং সমাজের নেত্রীস্থানীয়া হইবেন। সংসারের কর্ত্তব্যের পর সামাজিক একটা কর্ত্তব্য সকল সভ্য সমাজের নরনারীর আছে উহাও আমাদের পক্ষে অবশ্য। ইহার জন্য এই গুলি প্রাথমিক শিক্ষা। কেবল-মাত্র গৃহকর্ত্রী ও গৃহবধূরূপে পারিলেই সামাজিক মানুষের সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়া যায় না। সামাজিকতা শিক্ষাও একটা মস্ত বড় শিক্ষা এবং সংসারে সকল বস্তুই শিক্ষাসাপেক্ষ। পূর্ব্বে আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী অনেক বিভিন্ন ছিল। যৌথ পরিবার এবং বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে আত্মীয়স্বজন কুটুম্ব প্রতিবেশীর মধ্যে বাস করায় সামাজিকতা শিক্ষার জন্য আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু এখনকার দিনে জীবনযাপনের রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। গৃহ এখন আর মেয়েদের শিক্ষাকেন্দ্র নাই, উহা এখন শুধুই জীবনযাপনের আশ্রয়-স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পর্দ্দার জন্য বহুস্থলে প্রতিবেশীদের সঙ্গেও মেলামেশা সম্ভবপর হয় না। এই সকল কারণে এইরূপ ক্লাব বা মিলনশিক্ষা-ক্লাসের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। আমার মনে হয়, এ হিসাবে আমাদের এই সেলাই-ক্লাসটি এখান তরুণী মেয়েদের পক্ষে বেশ উপযোগীই হইয়াছে। এই দ্বিতীয় বর্ষে ইহার উন্নতিসাধন এবং মধ্য টিকে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পরিবর্ত্তিত করা এই দুটিই সকল সভ্যদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই এক বৎসরে অনেকেই এদের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়।

আর একটি কথা; আমাদের মধ্যে অনেকমেয়ে পুরুষের বিশ্বাস আছে, মেয়েদের সঙ্গে যারা বেশী মেশে তারাও অন্ততঃ আধখানা মেয়ে হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। ক্লাসে সকলেই মেয়েদের মিলিবার ব্যবস্থা করায় এই উপকার হইতে পারে যে দূরে থাকা যে মেয়েদের অদ্ভুত একটা কিছু বোধ থাকে, তাহারা হতে সেটা বরং বিদূরিত হইয়া যায়। তারপর ব্যক্তিগতভাবে দেখা কাহারও প্রতি কোনই বিদ্বেষ নাই, যিনিক মিশতে চাহিবেন কেনই বা না মেলামেশা করা যাবে? ইহার দ্বারা উভয়পক্ষই উপকৃত হইতে পারেন যদি আমাদের মধ্যে প্রকৃত দেশহিতৈষিণী ও তেজস্বিনী মহিলা বর্ত্তমান থাকেন। উহাদের মধ্যের ভাল এবং আমাদের মধ্যের ভাল মিলাইয়া দেখিবার মত এবং দেখাইবার মত দৃষ্টি এবং ক্ষমতা থাকিলে এ সুযোগ নিতান্ত তুচ্ছ করার যোগ্য নহে। আমরা সচরাচর উহাদের বাহিরটুকু চকিতের মতই দেখি, খাওয়া পরা বেড়ানর অনুকরণ করি, সহস্র সদ্‌গুণের কত অল্পই না আমাদের চোখে পড়ে! আর উহাদের? সে আর না বলিলেও চলে; রাস্তার কুলী নাড়ী, আয়া, অবকাশের বেশীর ভাগ অনাথারা আর মিস মেয়োর বর্ণনা।

অজন্তার অন্ধকারে কোণে বসিয়া দিন কাটানোর কাল চলিয়া গিয়াছে, তবু যে বলিয়া আছি এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর হয় না।*

* কেন এক সভায় পঠিত।

সমিতির কথা

"আমি তাই আমাদের দেশের মা-বোনদের অনুরোধ করি, দেশে চলুন, প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলা-সমিতি স্থাপন করুন, স্বাধিকার লাভের জন্য দেশ ছেয়ে ফেলুন, তা ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন, নতুবা মতই স্বাধীনতার আশা করি না কেন, সবই বিফল হবে।"

—সরোজনলিনী

নেত্রকোণা

নারীজাতির হিতসাধনকল্পে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা ৩৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমার হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছিল। নারীগণ প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম করিবার পথে যে সমূহ অন্তরায় থাকা স্বাভাবিক, আমাকে তাহার অধিকাংশেরই সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অন্তরের আবেগ দমন করিতে না পারিয়া একমাত্র মাতৃস্থানীয়া শ্রীযুক্তা প্রমোদসুন্দরী দেবী মহাশয়ার নিকট তাহা প্রকাশ করিলাম। যাহা হউক বিগত ১৩৩৪ সনের মাঘ মাসে আমাদের নিখিলনাথ রায়চৌধুরী লাইব্রেরীতে যে পুরস্কারবিতরণী সভা হয়, সেই সভাতে ভদ্রমহিলাদিগকে আহ্বান করি, তাঁহারা সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক সমবেত হন। তখন তাঁহাদিগের সমক্ষে বিশেষভাবে একটি নারীসমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করি এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাদের প্রত্যেকের সহানুভূতি প্রাপ্ত হই। শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা চিন্ময়ী দেবী মহাশয়া আমার এই প্রস্তাবে বিশেষভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন। তাঁহারই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমি অবশেষে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা হই।

১৩৩৫ সনের ১৫ই চৈত্র আমাদের স্মরণীয় দিবস। ঐ দিবসে পূর্ব্বপ্রস্তাবানুযায়ী ভদ্রমহিলাগণকে এক মহতী সভায় আহ্বান করা হয় এবং নারীজাতির কর্ত্তব্য ও সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিশেষ বিষয়সমূহের বিশদ আলোচনা করিয়া উক্ত সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

অতঃপর ১৩৩৬ সনের ১৫ই বৈশাখ দ্বিতীয় সভায় অধিবেশন করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্তা প্রমোদসুন্দরী দেবীকে সভানেত্রী, শ্রীযুক্তা শৈলবালা মুস্তফীকে সম্পাদিকা এবং শ্রীযুক্তা চিন্ময়ী দেবীকে সহকারিণী সম্পাদিকা নিযুক্ত করা হয়।

উক্ত সভায় এই প্রতিষ্ঠানকে "নেত্রকোণা নারী-মঙ্গল সমিতি" নামে অভিহিত করা হয় এবং ঐ সমিতির নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হয়। ১৩৩৬ সনের ১লা বৈশাখ নারীমঙ্গল সমিতির তৃতীয় অধিবেশন হয়। সভায় সভানেত্রী মহাশয়া "প্রকৃতি ও শিক্ষকথা", সহকারিণী সম্পাদিকা মহাশয়া 'নারীর কর্ত্তব্য', শ্রীযুক্তা বিদ্যুল্লতা চৌধুরী মহাশয়া 'স্বাস্থ্য' এবং শ্রীযুক্তা হৈমবালা দত্ত মহাশয়া 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এইরূপে বাহাতে সাংসারিক কার্য্যে নারীজাতি ও মহিলাগণের চিন্তাধারা অন্তর্দিকে প্রবাহিত হয় তজ্জন্য তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করা হয়।

১৩৩৬ সনের আষাঢ় মাসে নারীমঙ্গল সমিতির চতুর্থ অধিবেশনে মহিলাগণের কুটীরশিল্পের একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করা হয়। প্রদর্শনীর মধ্যে শ্রীযুক্তা সভানেত্রী মহাশয়া আচার, বড়ী ইত্যাদি, শ্রীযুক্তা সহকারিণী সম্পাদিকা মহাশয়া সার্ট, প্যান্ট, সেমী, ফ্রক ইত্যাদি, শ্রীযুক্তা বিদ্যুল্লতা চৌধুরী মহাশয়া সলিতা ও শ্রীযুক্তা হৈমবালা দত্ত মহাশয়া ছিকা, পলি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ের জন্য প্রথম প্রদর্শন করেন এবং স্বহস্তে প্রস্তুত সামগ্রী প্রদর্শনের জন্য অন্যান্য সকলকেই তাঁহারা অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী অনেক মহিলাই উক্ত প্রদর্শনীতে আপন আপন হস্তশিল্প প্রদর্শন করিয়া প্রদর্শনীকে গৌরবমণ্ডিত করিতে চেষ্টা করেন। প্রথম প্রদর্শনীতেই ৩২৲ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হয়। তদ্ভিন্ন পরিবারে স্বহস্তপ্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদি বিক্রয় করা অন্যায় ও নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত কিন্তু প্রথের বিষয় আজ নারীমঙ্গল সমিতির কল্যাণে ঐরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব দূরীভূত হইয়া গিয়াছে এবং সকলেই শ্রমের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছেন।

১৩৩৭ সনের আষাঢ় মাসে সমিতির পঞ্চম অধিবেশন হয় এবং প্রদর্শনীও খোলা হয়। তাহাতে সহরের ও মফঃস্বলের বহু ভদ্রপরিবার হইতে বিভিন্নজাতীয় বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় ও প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত করেন। বর্ষার জন্য প্রদর্শনী অধিকক্ষণ খোলা রাখিতে পারা যায় নাই। তবু অল্প সময়ের মধ্যে ন্যূনাধিক ২০৲ টাকার শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রীত হইয়াছে। ঐ অধিবেশনে শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী সাহা ১৭৷৵০ আনা চাঁদা ও ৩০খানি পুরাতন কাপড় মহিলার দান করিয়াছেন। নারীমঙ্গল সমিতি হইতে আরও ১১৷৵০ দিয়া মোট ৩০৲ টাকা ও ৩০খানি কাপড় কুমিল্লা অভয়াশ্রমে পাঠান হয়।

১৩৩৮ সনের শ্রাবণ মাসে সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশন হয়।

সমিতির কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে হইলে এবং সমিতির উদ্দেশ্যের প্রসারের নিমিত্ত অর্থের আবশ্যক, সেজন্য সমিতির প্রত্যেক সভ্যের চাঁদা দেওয়ার একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় শ্রীযুক্তা আশালতা দেবী, শ্রীযুক্তা সৌদামিনী মজুমদার, শ্রীযুক্তা চিন্ময়ী দেবী, শ্রীযুক্তা সরোজিনী রায়, শ্রীযুক্তা হৈমবতী দত্ত, শ্রীযুক্তা বিদ্যুল্লতা চৌধুরী শ্রীযুক্তা প্রমদাসুন্দরী দেবী, শ্রীযুক্তা শরৎকামিনী বসু, শ্রীযুক্তা সুখদাসুন্দরী দেবী ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী সেনগুপ্তা প্রত্যেকের মাসিক ১৲ টাকা করিয়া এবং অন্যান্য সভ্যাগণের মাসিক ।০ আনা করিয়া চাঁদা ধার্য্য করা হয়। উক্ত শ্রাবণ মাস হইতেই অনেক মহিলা সভ্যশ্রেণীভুক্তা হইতে থাকেন।

১৩৩৬ সনের ভাদ্র মাসে সমিতির সপ্তম অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে শ্রীযুক্তা বিদ্যুল্লতা চৌধুরী মহাশয়া এই টাউনের মহিলারা যাহাতে একজন শিক্ষিত ধাত্রীর সাহায্য পাইতে পারেন তাহার প্রস্তাব করেন। ঐ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ায় 'নারীমঙ্গলসমিতি' হইতে প্রস্তাবিত মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়।

১৩৩৬ সনের আশ্বিন মাসে সমিতির অষ্টম অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে নারীজাতির ভবিষ্যৎ ও মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ঐ অধিবেশনের একটি শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়। তাহাতেও মহিলাগণ যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য দিয়া প্রদর্শনীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উক্ত প্রদর্শনীতে টাউনের প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকদিগকেও নিমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের সেই ক্ষুদ্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করিয়া এবং শিল্পদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আমাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ প্রদর্শনীতে ৬৬৲০ আনার শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়াছে।

১৩৩৬ সনের কার্ত্তিক মাসে সমিতির নবম অধিবেশন হয়। অধিবেশনে সমিতির উন্নতি ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশন ও প্রদর্শনী সম্বন্ধে পুনরালোচনা হয়।

সমিতির দশম অধিবেশনের প্রারম্ভে ময়মনসিংহের জনপ্রিয় সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শুকদয় দত্ত মহাশয় এই স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন। তিনি আমাদের সমিতি ও প্রদর্শনী দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় ঐ সময় সমিতির একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। প্রদর্শনী দর্শনান্তে শ্রীযুক্ত শুকদয় দত্ত মহাশয় অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সমিতিকে দশ টাকা দান করিয়া যান এবং উপস্থিত ভদ্র-মহিলাদিগকে সমিতির উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বুঝাইয়া তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। তাঁহার এই সহানুভূতির জন্য আমরা তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সমিতির একাদশ অধিবেশনে শ্রীযুক্তা বিদ্যুল্লতা চৌধুরী পূর্ব্বোক্ত ধাত্রী সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐ বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটিতে যে দরখাস্ত দেওয়া হয় তাহার কোন উত্তর না পাওয়ায় পুনরায় ৭০ জন মহিলার নাম স্বাক্ষরিত করিয়া আর একটি দরখাস্ত করা হয়। তদুত্তরে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহোদয় যথাসময়ে আমাদিগকে জানান যে, তিনি ঐ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। আমরা এক্ষণে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি এবং আশা করি, তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া যথাশীঘ্র সত্বর আমাদের একটি বিশেষ অভাব দূর করিবেন।

সমিতির কার্য্য অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় শ্রীমতী বীণাপাণি দাস গুপ্তাকে সহকারিণী সম্পাদিকার সাহায্যকারিণী নিযুক্ত করার জন্য আর একটি প্রস্তাব ঐ অধিবেশনে গৃহীত হয়।

সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সমিতির প্রথানুযায়ী শ্রীযুক্তা সত্যানেত্রী শ্রীভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং বালিকারা সঙ্গীতালাপ করে। অতঃপর সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

বিগত ১৩৩১ সনের ফাল্গুন মাসে স্থানীয় ভদ্র হিন্দুগণের নিকট হইতে একত্রিশ টাকা বার আনা ৩৸০ আনা সংগৃহীত হয়। তৎপর ১৩৩৬ সনের ১৫ই চৈত্র হইতে এক শতনীল দান বাবদ পুনরায় ৬৯৲ টাকা সংগৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত সভ্যাগণের নিকট হইতে বাৎসরিক চাঁদা বাবদ ২২১৲ টাকা এবং প্রদর্শনীর জিনিষ বিক্রয় করিয়া কমিশন বাবদ ৫৸১০ পয়সা মোট ২২১৸১০ পয়সা সমিতির তহবিলে জমা হয়। তন্মধ্যে শ্রীযুক্তা ভগ্ন ব্রতের সাহায্য বাবদ ১২৸০ আনা এবং সমিতির ও অধিবেশনের আনুষঙ্গিক খরচ ৭০৸৵ আনা মোট খরচ ৮৩৸০ আনা বাদে ১৮০৲ টাকা তফসিল মোন-আফিসে অস্থায়ী আমানতে আছে এবং বাকী ৫৮/১০ হাতে আছে।

শ্রী শৈলবালা মজুমদার
সম্পাদিকা

বেহেলী (শ্রীহট্ট)

গত ২৭শে ভাদ্র যোড়শী সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সমিতি পরিদর্শনার্থ কলিকাতাস্থ কেন্দ্রসমিতি হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন এবং সহঃ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ার আগমন উপলক্ষে এই বিশেষ অধিবেশন হয়। হিন্দু মুসলমান ও নানাজাতীয় স্ত্রী পুরুষ প্রায় ৪০০ পাঁচ শত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত

ছিলেন। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী রায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—"৮।৯ মাস হইল আমাদের এই সমিতি গঠিত হইয়াছে, সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা হইয়া থাকে। কিন্তু কাজে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারা যাইতেছে না। তাহার কারণ মাতৃগণের উপস্থিতি বড়ই নিরাশাপ্রদ। এর প্রধান কারণ পুলিশ-ভীতি। কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ও পরশ্রী-কাতর লোক পুলিশ কর্ম্মচারীকে বুঝাইয়া দেন যে, এই সমিতি রাজনৈতিক সভা। সেজন্য মধ্যে মধ্যে সভাস্থলে পুলিশের আগমন হইয়া থাকে। তাই আমাদের মাননীয়া অতিথি মহোদয়ার নিকট সবিনয় অনুরোধ, যেন তিনি সমবেত মহিলাবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন যে তাঁহাদের ভয় ও বাধা অমূলক।

বিগত ২৮শে আষাঢ় এই মহিলাসমিতির জন্ম, কিন্তু এরি মধ্যেই এই সমিতি রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থান বলিয়া পুলিশের নজর আকৃষ্ট করিয়াছে। মহোজনিনী নারীমঙ্গল সমিতির আদর্শ লইয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং উহা উক্ত সমিতির শাখারূপে গণ্য হইয়াছে। গ্রামের মহিলাগণ সমিতি গঠিত করিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেন। এই মূল উদ্দেশ্য নিয়া এই সমিতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই। তাহা কার্য্যে পরিণত করার মানসে নিম্নলিখিত কার্য্যকরী প্রস্তাবগুলি আলোচনা করা হয়:—

১। ঘরে ঘরে নারীগণকে, বিশেষ ভাবে বিধবাদিগকে সূতা-কাটা ও অন্যান্য গৃহশিল্পের শিক্ষাদান ও তাহাদের প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা।

২। অন্যত্র হইতে লোকদ্বারা বাড়ী আনিয়া বাড়ী-বিদ্যালিক্ষার সুব্যবস্থা করা।

৩। গ্রামের ছাত্র ও ছাত্রদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।

৪। এই সমিতি পরিচালনের জন্য প্রত্যেক সভ্যাকে মাসিক /০ এক আনা চাঁদা দিতে হইবে।

৫। এই সমিতি কলিকাতা মহোজনিনী নারী-মঙ্গল সমিতির আদর্শ সর্ব্বথা সতর্কতার সহিত পালন করিবে।

আজ কিছু বলিবার পূর্ব্বে সে মহীয়সী মহিলার নামে এই সমিতির নামানুকরণ হইয়াছে সর্ব্বাগ্রে তাঁর স্বর্গগত আত্মার প্রতি আমার ভক্তি প্রদান করি। তারপর শ্রীযুক্তা সাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেনকে যেজন্য মহোজনিনী নারী মঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুক্তা সাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী মহাশয়া ও শ্রীযুক্ত শৈলেশবাবু যে পরিশ্রম করিয়া আমাদের এই সমিতিতে সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য আমি সমিতির পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

তদনন্তর শ্রীযুক্তা সাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী মহাশয়া নারীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এ বক্তৃতা অতীব মূল্যবান ও আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতার সমুদয় ভাব চিত্র সাহায্যে শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রত্যেকটি বিষয় বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন।

শ্রী সরোজিনী রায় (সভানেত্রী)
শ্রী অমলাময়ী বসু (সম্পাদিকা)

মহা-অষ্টমী

শ্রী হেমাঙ্গিনী সেন

হে জননী তুমি এলেছ আবার শিবের কলহে,
ভাঙিয়া তুলেছ কত না বুকীর কত পারাবার-বে।
চলন নিশুর আনন্দ-হাসি ফুটায়াছ কত ঘরে,
নিলন-মুখর রজনীরে ও যাছে কত সুখরে।
আনন্দ মায়ের অক্ষ-ছে যে প্রবাসী কন্যাটিরে,
অজানার বুকে ফুটায়ে তুলেছ মধুর হাসিটি ধীরে।
নীড়ের হারা ও মরুপথিকে এনেছে হেথা টানি,
ধরার প্রাসাদে অরূপরূপেরে এনেছ রাণেন্দ্র বাণী।
হে করুণাময়ী! সারা বৎসরের হরিতে বেদনাভার,
যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা রেখে আর তুমি যাবে না।
কোন পাষাণ আসনে জননী লুকায়ে তুলেছ তায়,
চাহ না থাকিতে—"শুধু দুটিদিনের তরে গড়া এই বাসা;
মুছে ফেল আজি এক্ষণের তব মহা-অষ্টমী দিনে,
নশ্বর সাথে—সত্যের পথ নে হে অজানা চিনে'।"

হাই যদি যাগো বাসনা তোমার, ঘুচিয়ে নয়নধার —
আগমনী সুরে ভরে থাকে আজ জননীর চারাচর।
নুকাবে রাখি না সন্তাপ জ্বালা বিশ্বের কলাপে,
হে করুণাময়ী, সাধের এ মাঝ পূর্ণ কর মা এবার।
তোমারি যে ছবি বিশ্ব জননী মাতৃত্বরের মুখে,
তুলিয়া লয় মা বক্ষের পুটে অসীম শান্তি সুখে
যাও মা জননী আজিকার দিনে হেমাঙ্গিনী সাথেই,
তোমারি অমিয়-পরিত্র-নামে পূর্ণ করি ও ভবন।
চলি যেন যাগো তোমারি এ ধরা বন্দিয়া আনত শিরে;
তুমি ও জননী ফিরিয়া চলিলে—ফিরিও আবার ফিরে'।
সান্ত্বনা এই সাথী হোক মম বিষাদ অন্ধকারে,
নিবেদন যাগো শেষের সে দিনে মিলায়ে তোমারি সাথে!

কেন্দ্রসমিতির কথা

শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারকার্য্য

গত ৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির সাধারণ-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারকার্য্যের জন্য কলিকাতা হইতে রওনা হন। ৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি মহকুমার স্থানীয় মহিলাসমিতির উদ্যোগে স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়গৃহে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। প্রাক্তন শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্তা লাবণ্য-লেখা চক্রবর্ত্তী ঐ সভায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প বিষয়ে নারীর উন্নতি সম্বন্ধে আলোকচিত্র-সাহায্যে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিভিসনাল শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় এবং উকিল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এবিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর শিলচরে শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় ট্রেনিং-স্কুল-প্রাঙ্গণে পুরুষ ও মহিলাদের একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। কাছাড় জেলার ডিসি মিষ্টার জে. ডি ওয়াকার-এর নির্দ্দেশ অনুসারে প্রচারকগণ এই সভায় "শিশুই জাতির সম্পদ ও ভবিষ্যৎ" এই বিষয়ে আলোকচিত্র সহযোগে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় সভায় বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়। ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল ও মাতৃমঙ্গল সমিতির সম্পাদক রায় সাহেব তারাচন্দ্র চৌধুরী এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন এবং নারী-মঙ্গল কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করেন। সভায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত সাধারণ কর্ম্মী সেন, মিত্তির স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক এবং প্রায় ৪০০ শত মহিলা উপস্থিত হন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর প্রচারকগণ করিমগঞ্জে উপস্থিত হন এবং ঐদিন সন্ধ্যাকালে স্থানীয় টাউনহলে পুরুষ ও মহিলাদের একটি মিলিত সভায় মহিলাসমিতি ও তাহার কার্য্যাবলী বিষয়ে বক্তৃতা দেন। পুরাতন মৃতপ্রায় মহিলাসমিতির কার্য্যে এই বক্তৃতাফলে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, মিশনারী বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিস্ ইভান্স্, সিভিল্-সার্জ্জন এবং স্থানীয় উকিল মোক্তারগণ এই কার্য্যে সাহায্য করেন। ১১ই সেপ্টেম্বর প্রচারকগণ শ্রীহট্ট হইতে সুনামগঞ্জ যাইবার জন্য রওনা হন। ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা সুনামগঞ্জ মহিলাসমিতির উদ্যোগে আহূত একটি মহিলাসভায় শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ে আলোকচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা দেন। সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নলিনীপ্রভা সেন এবং গভর্ণমেণ্ট হাই-স্কুলের প্রধান পণ্ডিত মিঃ জে, এন বিদ্যাভূষণ এই সভার কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১২ই সেপ্টেম্বরের রাত্রে প্রচারকগণ সুনামগঞ্জ হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে বেতেশ্বর গ্রামে বক্তৃতা করার জন্য নৌকাযোগে রওনা হন। ১৩ই সেপ্টেম্বর বেতেশ্বর মহিলাসমিতির উদ্যোগে পুরুষ ও মহিলাদের একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। মহিলা-সমিতির কার্য্য, স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বেতেশ্বর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে প্রচারকগণ স্থানীয় জমি-দারের বিশেষ অনুরোধে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখ পুনরায় সুনামগঞ্জ টাইগুল-প্রাঙ্গণে পুরুষ ও মহিলাদের মিলিত একটি বিরাট সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির কার্য্যাবলী আলোকচিত্র সাহায্যে প্রদর্শিত হয় এবং শিল্প, স্বাস্থ্য ও সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে অতি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা হয়। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর মৌলবিবাজারে স্থানীয় মহিলাসমিতির উদ্যোগে টাউন-হলে একটি পুরুষ ও মহিলাদের সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। প্রায় তিন শতাধিক পুরুষ ও মহিলা এই সভায় যোগদান করেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত ঘোষ, স্কুল সাব-ইন্‌স্পেক্টর মিষ্টার এম. এম, মজুমদার, সেট সাব ইনস্পেক্টর অব পুলিশ মহাশয় এইচ্ আমাদ এবং অন্যান্য স্থানীয় অনেক পুরুষ ও মহিলা এই কার্য্যে সাহায্য করেন। এই সভায় মহিলাসমিতির কার্য্য সম্বন্ধে সম্পাদিকার লিখিত একটি বিবরণী পাঠ করা হয়। সম্পাদিকা মহিলাসমিতির প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য ক্রয় করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। স্কুল সাব ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের সদুদ্যোগে মহিলাদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের একটি প্রদর্শনী করার প্রস্তাব করেন। ১৮ই ও ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রচারকগণ হবিগঞ্জে দুইটি মহিলাসভায় বক্তৃতা করেন। প্রথম দিন ১৮ই সেপ্টেম্বর টাউনহলে প্রায় ৫০০ শত মহিলা সভায় যোগদান করেন। ঐ দিন আলোক-চিত্র সাহায্যে নারীপ্রগতি বিষয়ে বক্তৃতা হয়, পরদিন স্থানীয় কালীবাড়ীতে প্রায় ৫০০ মহিলা ও ২০০ শত পুরুষ ঐ সভায় যোগদান করেন, ঐ দিন আলোকচিত্র সাহায্যে বিদেশে নারীর শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

প্রচারকগণ গত ২০শে সেপ্টেম্বর সুরমা টি এষ্টেট-এর সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্ট মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা শৈলবালা বিশ্বাসের আহ্বানে সেখানে উপস্থিত হন। ২১শে সেপ্টেম্বর প্রচারকগণ চেলিয়াপাড়া মহিলাসমিতির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তৃতা দেন। গত ২২শে সেপ্টেম্বর কুশিয়ারা নারীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে টাউনহল-প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সাধারণ সভার অধিবেশন হয়; প্রায় এক সহস্র পুরুষ ও মহিলা এই সভায় যোগদান করেন। প্রচারকগণ আলোকচিত্র সাহায্যে মহিলাদিগের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প-বিষয়ক উন্নতি কি ভাবে সম্ভব, বিস্তৃত মহিলাসমিতির কার্য্যাবলী প্রদর্শন করিয়া তাহা বুঝাইয়া দেন। প্রচারকগণের এই প্রচার-সঙ্কল্পের ফলে নূতন মহিলাসমিতি স্থানে স্থানে

প্রদর্শিত হইয়াছে এবং দোকানের মধ্যে নারীমঙ্গল কার্য্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। জাতি, বর্ণ নির্ব্বিশেষে সরকারী বেসরকারী উচ্চ, নীচ বহু কর্ম্মীরা সরল ঐকান্তিকতার সহিত আমাদের এই কার্য্যে সাহায্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীহট্ট জেলার ডি সি মিঃ বে, ডাক্তার, চন্দন এই কার্য্যে ঐকান্তিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আসাম গভর্ণমেণ্ট এই শিল্প ও শিক্ষা বিষয়ক প্রচার-সঙ্করের জন্য ২০০৲ শত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। সেলিমপাড়া মহিলাসমিতির সম্পাদিকা আমাদের বিশিষ্ট মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা শৈলবালা। বিশ্ব নাই এই দীর্ঘ সফরের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার নিপুণ নির্দ্দেশ-অনুসারে পরিচালিত এই প্রচারকার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় তাঁহারই ঐকান্তিকতা প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার এই উৎসাহ এবং কর্ম্মনিষ্ঠা সকলেরই বিশেষ অনুকরণীয়।

পুরী আশ্রম-বালিকা-বিদ্যালয়

পুরী বসন্তকুমারী বিদ্যাগৃহ অন্তর্গত একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পুরীতে তাদৃশ বালিকাবিদ্যালয় ছিল না। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির আনুকূল্যে ও শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর অক্লান্ত চেষ্টায় এখানে একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীগণের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টি মাত্র গত মাসে হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে এখানে ৩০জন ছাত্রী হইয়াছে। সম্প্রতি পুরী মিউনিসিপ্যালিটি এই স্কুলের জন্য মাসিক ৪০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

নূতন মহিলাসমিতি

মধুসূদন ষ্টেট বারিপদ গ্রামে সম্প্রতি সেই স্থানের বহু মহিলা মিলিত হইয়া একটি মহিলাসমিতি গঠন করিয়াছেন। বহু অশিক্ষিতা উড়িয়া মহিলা এই সমিতিতে যোগদান করিয়াছেন এবং শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। শ্রীযুক্তা সুধীরা বসু এই সমিতির সম্পাদিকা। এই সমিতি সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কুচবিহার মহিলা সমিতি

সম্প্রতি কুচবিহারে একটি মহিলাসমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা কিরণপ্রভা সে, কুচবিহার কলেজের প্রিন্সিপালের পত্নী, এই সমিতির সম্পাদিকার কার্য্য করিতেছেন। সম্পাদিকা মহিলাসমিতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। মহিলারা যে টাকা সংগ্রহ করিবেন তাহা দ্বারাই বোধ হয় এই বিদ্যালয় চলিবে। সম্পাদিকা এ বিষয়ে কুচবিহারের মহারাণীর নিকটও পত্র লিখিয়াছেন।

লেক রোডে মহিলাসভা

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার লেক রোডে শিশু ও মাতৃমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। ঐ পল্লীর বহু শিক্ষিত বিশিষ্ট মহিলা ঐ সভায় উপস্থিত হন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্তা সুষমাময়ী রায় বি-এ এই সভায় উপস্থিত হন এবং নারীমঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা করেন। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশ-চন্দ্র সেন বি-এ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী শিশু-মঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল বিষয়ে আলোকচিত্র সাহায্যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শিশুমঙ্গল-সমিতি একটি মহিলা-সমিতি গঠনে উৎসাহী হইয়াছে। শিশুমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা মিসেস সীতা বোস এবং সম্পাদক মিষ্টার জে, সি, বোসের উৎসাহেই এই সভার আয়োজন হয়।

কুমিল্লায় মহিলাসমিতি

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর কুমিল্লা টাউনহল প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। মহিলা সমাজের পক্ষ হইতেই এই সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় প্রায় সহস্রাধিক পুরুষ ও মহিলা যোগদান করিয়া-ছিলেন, সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ এই সভায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শিল্প বিষয়ে মহিলার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। কুমারী লাবণ্য চন্দ বি-এ মহিলাসমিতি গঠন করিতে উৎসাহী হইয়াছেন।

খুলনায় প্রচারকার্য্য—কাঁঠাল মহিলাসমিতি

গত ২৪শে আশ্বিন শনিবার সন্ধ্যার সময় খুলনা জেলার কাঁঠাল গ্রামে স্থানীয় মহিলাসমিতির উদ্যোগে বালিকা-বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে পুরুষ ও মহিলা ভরে একটি বিরাট সভা হয়। সভায় প্রায় পাঁচ শতাধিক মহিলা এবং বহু পুরুষ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল কেন্দ্র-সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী মাসিক গঠন সহযোগে মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য-গঠন-প্রণালী এবং মহিলাসমিতির বিভিন্ন বিভাগ শিল্পচর্চ্চা ও মেলামেশা দ্বারা সামাজিক ও আর্থিক সমস্যার সমাধানে মহিলারা যে কতদূর যোগ্যতর তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরদিবস ২৫শে আশ্বিন রবিবার আবার একটি সভা হয়। কেন্দ্রসমিতির প্রচারক পণ্ডিত মহা-শয় আলোকচিত্রসাহায্যে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা ও চিকিৎসালয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এদিনও বহু মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

[illegible] মহিলাসমিতি

গত [illegible] আশ্বিন [illegible] গুলনা জেলার [illegible] গ্রামে স্থানীয় যুবক ও মহিলার উদ্যোগে [illegible] উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে স্থানীয় মহিলাদের একটি বিরাট সভা হয়। শ্রীযুক্ত বিনোদিনী সেন সভানেত্রীর কার্য্য করেন। একটি যুবক সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া অতি সংক্ষেপে একটি সারগর্ভ ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা করিলে পর সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-চরণ শাস্ত্রী মহাশয় [illegible] সহযোগে মহিলা বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য, গঠন-প্রণালী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ধাত্রী-বিদ্যাশিক্ষা ও শিশুপালন সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় পাঁচ শতের মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন কিন্তু এত লোক সমাগমের স্থানীয় যুবক কর্ম্মী-দের কার্য্য-পরিচালনার বিশৃঙ্খলার ফলে কোনরূপ গোলযোগ হয় নাই। প্রচারক মহাশয়ের বক্তৃতার ফলে সভাস্থলেই মহিলারা একটি মহিলাসমিতি ও ধাত্রীশিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদ্যোগিত হন এবং শ্রীযুক্তা বেণুকা বিশ্বাসকে সম্পাদিকা করিয়া তখনই একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত ও তাহার কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হয়। সম্বরই এই সমিতি কেন্দ্রীয় সমিতির সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। স্থানীয় যুবক ও মহিলাদের উৎসাহ অতুলনীয়।

বাকাই মহিলাসমিতি

গত ১লা কার্ত্তিক শনিবার সন্ধ্যার সময় বাকাই পল্লী-সঙ্ঘ ও বাকাই মহিলাসমিতির উদ্যোগে বাকাই এম, ই স্কুলগৃহে স্থানীয় মহিলা ও পুরুষদের একটি মিলিত সভা হয়। ঢাকার উকীল শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি নির্ব্বাচন সমর্থন-সময়ে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় দেশের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভা-ষণে মহিলাদের দ্বারাই যে বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব, এই কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় সরল ও সুন্দর সহযোগে মহিলাসমিতির আবশ্যকতা, উদ্দেশ্য, গঠনপ্রণালী এবং কিরূপে সঙ্ঘবদ্ধভাবে মহিলা-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা ও শিশুপালনের দ্বারা জাতীয় উন্নতিতে প্রভূতভাবে সাহায্যকারিণী হইতে পারেন, পরিশেষে তাঁহারাই যে একমাত্র অবলম্বন, এই ভাবে বক্তৃতা করেন। এই সভার কার্য্য সাফল্যের জন্য সভাপতির ও প্রচারকের সম্পাদক ও বিশেষ সহায়গণ যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে কুসুম কোমল কান্তিও ম্লান হয়

এখন হতে নৈমিক প্রসাধনে "হিমানী স্নো" ব্যবহার করুন

রূপ ও সৌন্দর্য্য অটুট রাখা যায়

—আবিষ্কার ও সৃষ্টি একমাত্র—

হিমানী ওয়ার্কস

হিমানীর পুরস্কারের নূতন ব্যবস্থাপত্রের জন্য চিঠি লিখুন।

সেল এজেন্টস :—লক্ষ্মী ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং ৬৩ ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা।

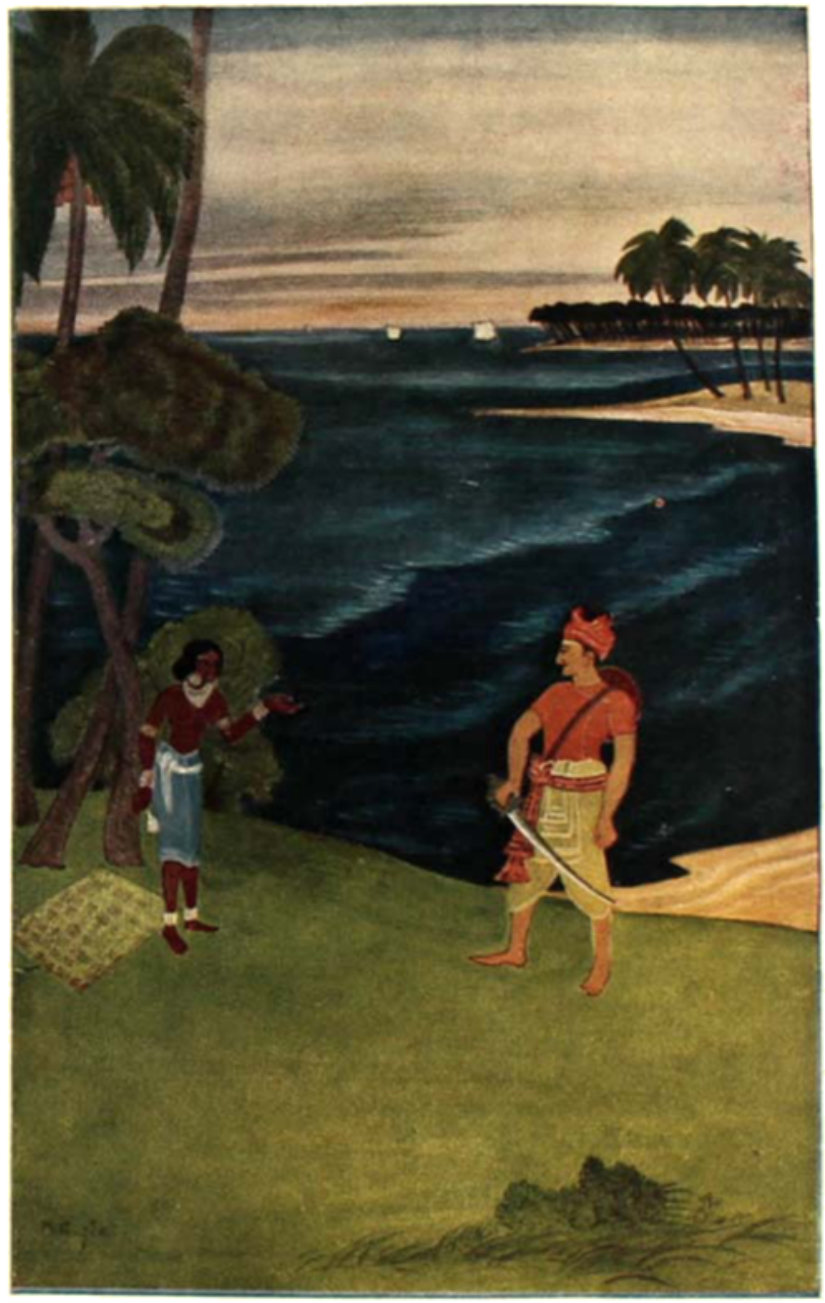

সিংহলে বিজয়সিংহ

বিজয়সিংহ সিংহলে ওই
হাতেতে কৃপাণ :
শত্রু তাহার কাহার লাগি ?—
মিথ্যা কি সন্ধান !

শিল্পী—শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত